ISSN : 2582-3841 (O)
2348-487X (P)

এবং প্রান্তিক

Ebong Prantik

বর্ষ ১০, সংখ্যা ২৪, সেপ্টেম্বর, ২০২৩

এবং প্রান্তিক

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal
SJIF Approved Impact Factor : 8.111
Vol. 10th Issue 24th, Sept., 2023

দ্বিতীয় খণ্ড

সম্পাদক

আশিস রায়

কার্যকরী সম্পাদক

সৌরভ বর্মন

এবং প্রান্তিক
চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০১০২

Ebong Prantik
A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal
SJIF Approved Impact Factor : 8.111
[ISSN : 2582-3841(O), 2348-487X(P)],
Published & Edited by Dr. Ashis Roy, Chandiberiya, Saradapalli, Kestopur, Kolkata - 700102, and
Printed by Ananya, Burobattala, Sonarpur, Kolkata - 150,
Vol. 10th Issue 24th, 25th Sept., 2023, Rs. 850/-
E-mail : ebongprantik@gmail.com
Website : www.ebongprantik.in

প্রকাশ
১০ ম বর্ষ ও ২৪ তম সংখ্যা
২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

ISSN : 2582-3841 (Online)
2348-487X (Print)

কপিরাইট
সম্পাদক, এবং প্রান্তিক

প্রকাশক
এবং প্রান্তিক
আশিস রায়
রেজিস্টার্ড অফিস
চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০ ১০২
ফোন - ৯৮০৪৯২৩১৮২
সার্বিক সহয়তা - সৌরভ বর্মন
ফোন - ৮২৫০৫৯৫৬৪৭

মুদ্রণ
অনন্যা
বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০ ১৫০
ফোন - ৯১৬৩৯৩১৪৬৫

মূল্য : ৮৫০ টাকা

এবং প্রান্তিক

উপদেষ্টামণ্ডলী

ড. মানস মজুমদার, ড. ব্রততী চক্রবর্তী, স্বামী তত্ত্বসারানন্দ, স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ,
ড. অমলেন্দু চক্রবর্তী, ড. সেলিম বক্স মণ্ডল,
ড. মনোজ মণ্ডল, সুজয় সরকার

বিশেষজ্ঞমণ্ডলী

ড. মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায় (বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সৌমিত্র শেখর (উপাচার্য, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুমন গুণ (তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুব্রত জ্যোতি নেওগ (অসমীয়া বিভাগ, তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অচিন্ত কুমার ব্যানার্জী (বাংলা বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অজন্তা বিশ্বাস (ইতিহাস বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. হোসনে আরা জলী (বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুমিতা চ্যাটার্জি (বাংলা বিভাগ, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. দীপঙ্কর মল্লিক (বাংলা বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির)
ড. বিনায়ক রায় (ইংরাজি বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অজিত মণ্ডল (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অনির্বাণ সাহু (বাংলা বিভাগ, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. মৃণ্ময় প্রামাণিক (তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. ইনতাজ আলী (ইংরেজি বিভাগ, নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়)

সম্পাদকমণ্ডলী

রচনা রায় (বাংলা বিভাগ, আমডাঙ্গা যুগল কিশোর মহাবিদ্যালয়)
ড. অজয় কুমার দাস (বাংলা বিভাগ, বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়)
শর্মিষ্ঠা সিন্‌হা (বাংলা বিভাগ, ক্ষুদিরাম বোস সেন্ট্রাল কলেজ)
ড. অজয় ঘোষ (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ)
ড. আশীষ কুমার সাউ (আর্য মহিলা পি. জি. কলেজ, বারাণসী)
ড. শান্তনু দলাই (এগরা সারদা শশিভূষণ কলেজ)

কার্যকরী সম্পাদক - সৌরভ বর্মন

সহ-সম্পাদক - ড. টুম্পা রায়

প্রধান সম্পাদক - ড. আশিস রায়

লেখা পাঠানোর বিষয়ে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়

১. সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ পাঠাতে হবে। ২০০০ - ২৫০০ শব্দ সংখ্যা এবং সঙ্গে ৪০০/৫০০ শব্দের সারাৎসার পাঠাতে হবে।
২. পেজমেকার/ওয়ার্ড ফাইলে লেখা পাঠানো যাবে। ১৪ ফন্টে লেখা পাঠাতে হবে এবং সঙ্গে পি ডিএফ ও সফট কপি (লেখা নির্বাচিত হলে) পাঠাতে হবে। হাতে লেখা হলে মার্জিনসহ পরিচ্ছন্ন লেখা পাঠাবেন।
৩. অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হবে না। লেখার কপি রেখে লেখা পাঠাবেন।
৪. পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা প্রকাশ করা হয় না।
৫. কোনো লেখা ছাপার জন্যে নির্বাচিত হয়েছে কিনা তা জানতে ৩/৪ মাস সময় লাগতে পারে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

প্রধান কার্যালয়

চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০১০২

ফোন : ৯৮০৪৯২৩১৮২

Registered Address

Ebong Prantik, Chandiberiya, Saradapalli,
Kestopur, Kolkata - 700102
Ph. No. : 9804923182
E-mail : ebongprantik@gmail.com

ব্রাঞ্চ অফিস

ভগবানপুর, বি. এইচ. ইউ, বারাণসী - ২২১০০৫ / বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০১৫০

পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ১৫০০ টাকা এবং
ডাকযোগে পত্রিকা পাঠাতে হলে ডাক খরচ গ্রাহককে বহন করতে হবে

প্রাপ্তিস্থান

দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা / পাতিরাম বুকস্টল, কলেজ স্ট্রিট / ধ্যানবিন্দু, কলকাতা / এবং পত্রিকা দপ্তর

বিস্তারিত জানতে দেখুন
Website : www.ebongprantik.in

সূচিপত্র

ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মদর্শন : 'বিশুদ্ধ মানব সম্বন্ধ নির্মাণ বিষয়ক চিন্তাবিশ্ব' প্রসঙ্গ - 'সভ্যতার সংকট'
আরিফা সুলতানা ১৫

'পদ্মরাগ': নারী জাগরণের আলোকবর্তিকা
শম্পা সিনহা বসু ২৬

টেনিদার অভিযান কাহিনি : অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ
হাসনারা খাতুন ৩৩

মহানুভবতার মাধুর্য ও 'গড়ালবাড়ি'
সুভাষ চন্দ্র দাস ৪১

একুশ শতকে সমাজ ও নারী অভিজ্ঞতার প্রতিফলন : বিনতা রায়চৌধুরীর নির্বাচিত ছোটগল্প
সুস্মিতা মুখার্জী ৪৭

বাঙালি নারীর বয়ানে দেশবিভাজনের স্মৃতি : আত্মকথা ও স্মৃতিকথা একই আধারে দুই সংরূপ
পৌলমী সিনহা ৫২

'পদসঞ্চার' : স্থির না থাকার ইতিহাস (পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক)
রানা সরকার ৬৩

রবীন্দ্র কাব্যনাট্য 'নরকবাস' : একটি বিশ্লেষণ
শতাব্দী ভৌমিক ৭১

সামাজিক অধিকারে প্রাচীন ভারতের নারী
ঋতুপর্ণা সরকার ৭৮

সীতা ও দ্রৌপদী : নারী ও পুরুষ কবির চোখে – একটি বিশ্লেষণী পাঠ
বীণা মণ্ডল ৮৬

ঋত্বিক ঘটকের 'কাঞ্চন': 'বাড়ি' থেকে পালিয়ে 'এলডোরেডোর' খোঁজে
দেবলীনা সেন ৯৫

ধর্মীয় কুসংস্কারের আলোকে 'দেবী' গল্প
সিলভিয়া সুলতানা ১০৬
'Free Style' : শিল্পীর জন্ম ও একটি উপন্যাস
নুনম মুখোপাধ্যায় ১১৪
পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক হিংসা, সন্ত্রাস ও দুর্বৃত্তায়নের অতীত
বর্তমান ও ভবিষ্যৎ : একটি ধারাবাহিক পর্যালোচনা
জয়ন্ত কুমার বর্মন ১২২
সুকুমারী ভট্টাচার্যের প্রবন্ধে বৈদিক প্রসঙ্গ
সুস্মিতা ঘোষ ১৩২
কান্তারা; একটি পরিবেশ চেতনা ও আদিবাসী চৈতন্যের গল্প
প্রকাশ বিশুই ১৪১
আধুনিকতা, উত্তর-আধুনিকতা এবং জীবনানন্দ দাশের
পঁচিশ বছর পরে কবিতাটির একটি ভিন্ন পাঠ
মনস্বিতা মণ্ডল ১৫০
জন সেবাব্রতী সুরেশচন্দ্র মিত্র (১৮৭২-১৯৪৩)
কৃষ্ণ কুমার সরকার ১৫৬
প্রসঙ্গ বাংলা মঙ্গলকাব্যে শৈশব : কৃষ্ণ কেন্দ্রিক
শৈশবের সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টি
আবুল হোসেন আনসারী ১৬৬
রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় সমবায় ও গ্রামোন্নয়ন
জয়দীপ ঘোষাল ১৭৩
শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের গৈরিক পতাকা : দেশপ্রেম
সৈয়দ রাফিকা সুলতানা ১৭৭
সেকালের কাশিমবাজার বন্দর ও বাংলার অর্থনৈতিক-সংস্কৃতি :
একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা
অরিন্দম মণ্ডল ১৮৫
রবীন্দ্র-কাব্যে প্রণয়ের স্বরূপ
সুনন্দা মিত্র ১৯৩

ভিন্ন স্বাদে বাংলা সাহিত্যের সহবস্থানে সমগোত্রীয় দুই সম্রাট
রিয়া মন্ডল ২০০
ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে 'হাস্যরস'-এর সন্ধ্যান
বিউটি খাতুন ২০৩
সমাজ-রাজনীতি ও লীলা রায়
বিদ্যুৎ সরকার ২১১
স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে মহাভারত-চর্চা : প্রসঙ্গ দ্রৌপদী
(নির্বাচিত গ্রন্থ্ অবলম্বনে)
সঞ্চারী হালদার ২২২
ছিন্নপত্রে বর্ণিত পদ্মা-নদী ও প্রকৃতি
সুস্মিতা দত্ত ২৩১
মুসলিম বিবাহ - বর্তমান সমাজের নিরীখে এর
প্রাসঙ্গিকতা ও পরিবর্তিত রূপ
পৌলমী সাহা ২৩৭
উড়িষ্যার নৃত্য – মাহারী থেকে গোটিপুঅ নৃত্য
গরিমা ভট্টাচার্য্য ২৪৭
সুবোধ ঘোষের ছোটগল্প : মধ্যবিত্ত জীবনের রূপরেখা
শ্রেয়সী দাস ২৫৩
অহনা বিশ্বাসের ছোটোগল্প : প্রসঙ্গ বিশ্বায়ন
সৈকত মিস্ত্রী ২৬০
বিমল করের নির্বাচিত ছোটগল্পে মৃত্যুচেতনা
শঙ্খ দত্ত ২৬৯
বৈষ্ণব দর্শনে মুক্তি
বাসুদেব হালদার ২৭৬
'সূর্য-দীঘল বাড়ী' : বহুস্বরের সঙ্কট
মুঈদুল ইসলাম ২৮৪
প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পে পতিতা জীবনের চিত্র
নিতাই পাল ২৯৩

অন্তর্মুখী ও আধ্যাত্মিক মঙ্গলকাব্যে জাদুবাস্তবতার প্রভাব
রিম্পা হাটি ৩০১
স্বপ্নময় চক্রবর্তীর নির্বাচিত ছোটগল্পে পরিবেশ ও
মানুষের দ্বান্দ্বিক খতিয়ান
দীপা ঘোষ ৩১০
নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দ) সন্ন্যাস-পূর্ববর্তী জীবনে সংগীত :
একটি তাত্ত্বিক আলোচনা
প্রীতম কাঠাম ৩২১
মাহমুদুল হকের 'খেলাঘর' : আত্মগ্লানির মর্মমেঘে
স্বাধীনতার হাতছানি
আব্দুল সামাদ ৩৩০
কমলকুমার মজুমদারের 'অন্তর্জলী যাত্রা' : 'মায়া' প্রসঙ্গের
এক অনবদ্য রূপায়ণ
ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য্য ৩৪০
উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর
ক্ষমতায়ন ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটভিত্তিক একটি অনুসন্ধান
প্রসেনজিৎ সাউ
পঞ্চানন দেওয়াশী ৩৪৮
বাংলা নাটকে জাতীয় সংহতি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি
সেখ ইদ মহাম্মদ ৩৫৩
কাব্যতত্ত্বে যতীন্দ্রনাথ : কবিতায় দ্যুতি ও দীপ্তি
শম্ভুনাথ কর্মকার ৩৬৪
কমল চক্রবর্তীর পরিবেশ চেতনা : প্রসঙ্গ 'অরণ্য হে'
রাখী গরাঁই ৩৭২
ভরত নাট্যশাস্ত্রে সংগীততত্ত্ব : একটি সমীক্ষাত্মক আলোচনা
কল্পিতা দাস ৩৮০
কাশীদাসী মহাভারত : কচ ও দেবযানীর উপাখ্যান
সৌমিলি দেবনাথ ৩৮৯

বিব্লিওমানিয়া, গ্রন্থ সংগ্রহের মোহ ও আসক্তি : একটি আলোচনা
নান্টু আচার্য্য ৩৯৪
বাংলা কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের বিকাশে পত্রপত্রিকার ভূমিকা
সুচন্দ্রা রায় ৪০৩
জীবজগতের অস্তিত্ব সংকট : পরিত্রাণের খোঁজে ব্যবহারিক
নীতিবিদ্যার ভূমিকা
মারুফা খাতুন ৪১২
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : প্রসঙ্গ আরণ্যক চেতনা
বৈদ্যনাথ বাস্কে ৪১৯
কবিতা সিংহের নির্বাচিত ছোটগল্পে অফিসকর্মী নারী : সংকট ও উত্তরণ
সায়ন্তনী ব্যানার্জি ৪২৭
কৃষ্ণনগর মহকুমার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নদী, বিল, জলাশয় ও
মৎস্যজীবীদের ভূমিকা এবং তার পর্যালোচনা
রাস মোহন সরকার ৪৩৪
আয়ুর্বেদশাস্ত্রে আচার রসায়ন : সুস্বাস্থ্যের নব উন্মেষণ
অরিজিৎ দাস ৪৪৩
কথাকার মীনাক্ষী সেনের কলমে রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ
দীপিকা মণ্ডল ৪৫০
গুরুবিভ্রাট ও মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় : শৈলবালা
ঘোষজায়ার কথাসাহিত্য (নির্বাচিত)
রিঙ্কু রায় ৪৫৭
নিম্নবর্গের সামাজিক সচলতা : সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে প্রতিফলন
কুন্তলা রায় ৪৬৫
'নবান্ন' নাটকে দুর্ভিক্ষ-অনাহার এবং আত্মসম্মানের লড়াইয়ে নারী
ইন্দ্রজিৎ বিশ্বাস ৪৭২
প্রসঙ্গ : মনসা মঙ্গল কাব্য ও হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির মিলন তীর্থ
চৈতালী ঘটক রায় ৪৭৯

তুলনামূলক সাহিত্য ও সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র
('বিবিধ প্রবন্ধ'-এর প্রথম ভাগের আলোকে)
বিভাস দত্ত ৪৮৫
প্রাবন্ধিক সুচিত্রা ভট্টাচার্য
সুমিতা মণ্ডল ৪৯৩
শাক্তগানে নজরুল : ভিন্ন স্বাদের সন্ধানে
অপি হালদার ৫০২
অভিজ্ঞানশকুন্তলমের বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা
মধুমিতা জানা ৫০৯
আদিবাসী নৃতাত্ত্বিক নৈতিকতা : একটি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি
পিয়ালী ঘোষ ৫১৫
রামপ্রসাদ ও তাঁর সময় : সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের নির্বাচিত
ছোটগল্প ও উপন্যাসে
সুকান্ত মণ্ডল ৫২২
দাঙ্গার দিনগুলি ও একটি উপন্যাস : প্রসঙ্গ সেলিনা হোসেনের
'সোনালি ডুমুর'
বিশ্বনাথ কুইরী ৫৩০
Kaivalyopanisad and its' Commentators:
A Survey
Monalisa Dutta ৫৪২
A comparative study between the Buddhist and
Hindu philosophy on women's rights and education
Ghaneshyam Mandal ৫৫০
ONLINE TEACHING-LEARNING AND ACADEMIC
ACHIEVEMENT OF UNDERGRADUATE STUDENTS
DURING COVID-19 SITUATION
Asim Datta ৫৫৯
Sundarban - In Dichotomy of Development and Marginality
Moumita Ghosh ৫৬৬

Yoga and Self – Realization : An Indian
Philosophical Perspective
Sk Nur Upsar ৫৭৫
Analysis of the National Education Policy 2020
Subrata Acharyya
Nasiruddin Khan ৫৮৭
The contribution of 'Samyaraj Party' to the spread of
Communist Party and Communist ideology in Bengal
Bhabananda Roy ৫৯৩
A brief discussion on the relationship between
religion and symbol
Sangeeta Bhattacharyya ৬০২
Early Phase of Worker and Employee Organizations
and Movements : A Study of Calcutta Port and Dock
Chitrabhanu Biswas ৬০৬
Distance education in West Bengal and the role
of educational institutions : a general study
with special reference to NSOU and
Ravindra Mukta Vidyalaya
Sabana Begum ৬১৬
"Bidrohi" : Unveiling Posthumanist Undercurrents
amidst Shifting Historical Tides
Rajarshi Das ৬২৪
Six years of Challenging Patriarchy & Amplifying
Voices : The Interplay between #MeToo Movement,
LoSHA and Gender Activism in
Jawaharlal Nehru University Campus
Shreyasi Biswas ৬৩৩
Some Glimpse on the Conception of
Kathā in the *Nyāya* Philosophy
Koushik Sarkar ৬৪৬

সম্পাদকীয়

হাজারো ভাবনায় গ্রন্থিত হতে থাকে ছোট ছোট সূত্র। প্রয়োজন উপলব্ধির। শানিত উপলব্ধি দুর্বলতাকে শিথিল করে। যতটা হোঁচট খাওয়া যায় ততটাই শানিত হওয়ার প্রবণতা বাড়ে। সূত্রেরা মজবুত হয় আপনার শানিত ভাবনায়। যতটা বিস্তারিত হবে যুক্তিজাল ততটাই মধুরতা ছড়াবে। আক্ষেপ আর অপেক্ষাও নতুনতর ভাবনায় উদ্বেলিত করে তুলবে। হাজারো ভাবনা মিলে হয় এক। একের সন্ধানেই এবারের ‘এবং প্রান্তিক’।

ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মদর্শন : ‘বিশুদ্ধ মানব সম্বন্ধ নির্মাণ বিষয়ক চিন্তাবিশ্ব’ প্রসঙ্গ - ‘সভ্যতার সংকট’

আরিফা সুলতানা
প্রভাষক, বাংলা, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ,
বাংলাদেশ আর্মি ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি,
কাদিরাবাদ, নাটোর

সার-সংক্ষেপ : বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার নব প্রভাত সঞ্চারকারী বিশ্ব নন্দিত বাঙালি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। বিংশ শতকের আধুনিকবাদী মানসকাঠামোর সমন্বয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্টিতত্ত্বের বিপুল ঐশ্বর্য বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর জীবনচেতনায় প্রাগ্রসর নান্দনিক অভিযাত্রা চিহ্নিত করে। স্বচেতনার রহস্যগর্ভ থেকে কবিগুরু যেমন আত্মস্থ করেছেন প্রকৃত শিল্পের নান্দনিক স্বর তেমনি সমাজ আদর্শের প্রকৃত স্বরূপ নিরুপণে তাঁর জীবন দর্শন শতভাগ পরিশীলিত অভিনিবেশ জ্ঞাপন করেছে। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিবৃত্ত ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক তৎপরতা এবং ভারতবর্ষীয় সমাজের মূলানুগ যে সংকীর্ণতা সে সম্পর্কিত মৌলিক কিছু প্রশ্ন ‘সভ্যতার সংকট’ (১৩৪৮) প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন। এ প্রবন্ধটি বিশ্লেষণ করলে শিল্পী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্পী মনন গড়ে ওঠার আকড় যেমন খুঁজে পাওয়া যায় তেমনি একটি সমাজঅন্বিষ্ট চিন্তকের সমাজসত্তার যথার্থ বিকাশের স্বপ্নে যা কিছু রাজনৈতিক, সামাজিক অর্থাৎ উপনিবেশ নির্মিত অন্তরায় তা উপলব্ধি করা যায়। একই সঙ্গে এ প্রবন্ধটি সভ্যতার প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে এক গভীর মানবতাবাদী দার্শনিক অভিপ্রায় ব্যক্ত করে। আলোচ্য প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘সভ্যতার সংকট’ প্রবন্ধের আলোকে বিশুদ্ধ মানব সম্বন্ধ ধারণা সম্পর্কিত চিন্তাবিশ্ব উপনিবেশিত ভারতবর্ষের রাষ্ট্রকাঠামোয় কীভাবে বিকশিত হয়েছে সে বিষয়টি বিশ্লেষিত হবে। যার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্পমানস সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা পাওয়া যাবে। এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষে উপনিবেশের তীব্র সমালোচনা করে এক নতুন জাতীয়তাবাদী ভারত তথা বিশ্ব জুড়ে বিশুদ্ধ মানব সম্বন্ধের বিকাশ ঘটাতে মানবাত্মার জয়গান ধ্বনিত করেছেন তা বিশ্লেষিত হবে।

মূল শব্দ (Keywords) : উপনিবেশ, সমাজ, প্রথা, সভ্যতা, জাতি, মানবিক অধিকার, বিশুদ্ধ মানব সম্বন্ধ, সদাচার, মানবিক বিশ্ব।

মূল প্রবন্ধ (Discussion):

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিশ্বনন্দিত সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। তাঁর বিপুল সাহিত্য কীর্তির বৈচিত্র্যপূর্ণ রস, রূপ তথা শিল্পসুষমায় বিংশ শতকের বাঙালি নবজাগরণের এক নব প্রবহমানতা উপলব্ধি করে সমগ্র বিশ্ববাসী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণের সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও তাঁর চিন্তাবিশ্বের মননশীল বহিঃপ্রকাশ এখনো সংঘাত-সংঘর্ষপূর্ণ অমানবিক বিশ্বে ততোটাই গুরুত্ব বহন করে। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক সকল গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তাঁর চিন্তাশীল যুক্তিনিষ্ঠ পদক্ষেপ ভারতবর্ষের জাতীয় সংহতি রক্ষায় ভূমিকা রেখেছে। ভারতবর্ষের প্রগতিশীল শিল্পীগোষ্ঠীর সঙ্গে তিনি বরাবরই নিজেকে যুক্ত রেখেছেন। উপনিবেশিত ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন ভারতবাসীর জন্য যে আদৌ সফলতা বয়ে আনছে না এই নিরেট সত্য ইংরেজ শাসনের নিকটবর্তী থেকেও প্রকাশের সততা তাঁকে অনন্যতায় নিয়ে গেছে। রবীন্দ্র শিল্পচেতনার স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে ইংরেজ প্রদর্শিত সাহিত্যাদর্শের প্রতিফলন ঘটলেও ইংরেজ শাসনের প্রতি তাঁর প্রশ্নহীন সমর্পণ কখনোই ছিলো না। তিনি মূলত প্রগতিশীল জীবন-যাপনের ইতিবাচক প্রাণস্পৃহা শৈশব থেকে আত্মস্থ করেছিলেন বলেই তাঁর আত্মদর্শনে কোনো সংকীর্ণ জীবনচেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি। ফলে পাশ্চাত্যের উন্নত সাহিত্যাদর্শ, জীবনচেতনার রস তিনি আস্বাদন করেছেন, অকপটে তাই তার দানকে স্বীকার করেছেন আবার সমাজসত্তার প্রকৃত বাস্তব অবনতির মূল ক্রিড়াণক হিসেবে উপনিবেশের তৎপরতার অকপট তীব্র সমালোচনা করতেও পিছপা হননি। ভারতবর্ষের স্বাধীকার তথা মানুষের উপযোগী মানবিক রাষ্ট্র নির্মাণে তিনি সর্বাত্মক সাধনায় রত হয়েছেন। রবীন্দ্র জীবনাদর্শের এই সরল সমাজঅন্বিষ্ট প্রাণসম্পদ সম্পর্কে বিশ্বজিৎ ঘোষ মন্তব্য করেন :

> "জন্মগত উচ্চ অভিজ্ঞতা, ঠাকুরবাড়ির গৌরবিত জীবনাচার, ব্রাহ্মধর্মদর্শন, উপনিষদীয় প্রতীতি এবং পাশ্চাত্য চিন্তাস্রোতে অঙ্গীকৃত করেই রবীন্দ্রনাথ নিরন্তর রূপান্তরিত হয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত সুস্থিত হয়েছেন প্রগতিশীল সমাজচেতনা ও বিশ্ব-মানবমুক্তির সার্বজনীন দার্শনিক প্রত্যয়ে"।[১]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমগ্র জীবনদর্শনে মানবমুক্তির প্রতীতি ব্যক্ত হয়েছে। তিনি এমন একটি মানবিক বিশ্বের আকল্প দেখতে চেয়েছেন যেখানে জাতিগত সংকীর্ণতার উর্ধ্বে সকল যুদ্ধ, হত্যা, রক্তপাত, অনাচার দূর হয়ে বিশুদ্ধ মানব সম্বন্ধের সুচারু সমন্বয় হবে। কিন্তু পরপর ঘটে যাওয়া দুইটি বিশ্বযুদ্ধে বিশ্ব ইতিহাসে মনুষ্যত্বের চরম লাঞ্ছনা, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রযন্ত্রের তিক্ত অভিজ্ঞতায় নিমজ্জিত ভারতবর্ষের করুণ প্রতিচ্ছবি তাঁর মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। সমগ্র জীবন মানব সাধনায় ব্রত হয়ে মানবের এই পরিকল্পিত অচলায়তন তাঁর সমগ্র অস্তিত্বকে জীবন সায়াহ্নে বিপর্যস্ত করে তোলে। আশি বছরের দীর্ঘ তিক্ত অভিজ্ঞতা জারিত হৃদয়ে 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে তিনি উন্মোচন করছেন তাঁর আত্মদহনের নামলিপি। জীবনের প্রারম্ভিক পর্ব থেকে আত্ম

উপলব্ধির এই চূড়ান্ত মুহূর্তে যা কিছু একান্ত ব্যক্তিগত আত্মদর্শন তার সমস্তটা অকপটে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমাজভাবনার অন্তরঙ্গ দর্শন জীবনের শেষ পর্বে উন্মীলন করলেন ‘সভ্যতার সংকট’ প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি যেন তাঁর সমস্ত জীবনের সার তাৎপর্য নিয়ে কালের খেয়ায় অম্লান হয়ে রইলো। তাঁর সমগ্র জীবনের মূলসুর “সভ্যতার সংকট’ প্রবন্ধে ধৃত হয়েছে। রবীন্দ্রাথ ঠাকুরের আত্মদর্শনে সমাজ অন্বিষ্ট চিন্তা সর্বদা বিদ্যমান ছিলো বলেই বিশ্ব মানবত্মার পীড়ন তাঁকে প্রতিবাদমুখর করেছিলো। ফলে ব্রিটিশ উপনিবেশের চরিত্র উন্মোচনেও তাঁকে কখনো দ্বিধাগ্রস্ত হতে হয়নি। বিশ্বজিৎ ঘোষ তাঁর রাজনৈতিক প্রগতিশীল জীবনদর্শন সম্পর্কে বলেন :

> “ব্যুয়র যুদ্ধ, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকা, থেকে আরম্ভ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্য পর্যায় পর্যন্ত, যখনই বিশ্ব মানবসমাজের কোন অংশ অত্যাচারী শাসকের হিংস্র আগ্রাসনের শিকার, যখনি পৃথিবীর কোন প্রত্যন্ত অঞ্চলে শান্তি বিঘ্নিত, বিশ্ব মানবতার অপ্রতিম প্রতিনিধি নিয়ত-জাগর রবীন্দ্রনাথ তখনি প্রতিবাদে মুখর, দ্রোহিতায় শাণিত”।[২]

ফলে ব্রিটিশ উপনিবেশের চরিত্র উন্মোচনেও তাঁকে কখনো দ্বিধাগ্রস্ত হতে হয়নি। তবে ‘সভ্যতার সংকট’ প্রবন্ধে কবিগুরুর অকপট আত্ম অনুশোচনার ভঙ্গিমা দেখে বিস্মিত হতে হয়। একইসঙ্গে এক বিপুল শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হয় যখন তিনি আত্মস্বীকারোক্তির ভাষায় বাঙালির সম্মুখে উন্মোচন করেন তাঁর সৃষ্টি রহস্যের প্রেরণা উৎস। ইংরেজ সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি তথা সামগ্রিক ইংরেজ সভ্যতার ঔদার্যের প্রতি তাঁর অকৃপণ অভিনিবিষ্টতা এখানে তিনি স্বীকার করেছেন। আবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর জীবনসায়াহ্নে দাঁড়িয়ে ভারতবাসীর সম্মুখে ইংরেজ রাজশক্তির প্রতি তাঁর যে তিক্ত মনোভাব ব্যক্ত করেছেন তাতে বিজাতীয় সভ্যতা ও ভারতীয় সভ্যতার ধারণা বিষয়ে এক গভীর পর্যবেক্ষণ উঠে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ সেখানে স্পষ্ট পার্থক্য করে দেখালেন ভারতবাসীর সভ্যতার মানদণ্ড সম্পূর্ণ এদেশের আচরিত সংস্কৃতি থেকে উত্থিত। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের সংস্কৃতিতে সদাচারের যে দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছিলো তা ছিল প্রথা নির্ভর। যে প্রথা বা সংস্কারে আছে নিজস্ব জাতির প্রতি অবহেলা, ঔদাসীন্য প্রাবন্ধিকের ভাষায় ‘নিষ্ঠুরতা এবং অবিচার’। যেটি ভারতবর্ষের একান্ত নিজস্ব সংকীর্ণ সংস্কৃতি পরিচয়বাহী। যেখানে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব বিস্তারের আগেই ভারতীয় একান্ত স্বকীয় সভ্যতার ধারণাই বিশুদ্ধ মানব সম্বন্ধ তৈরি বা প্রতিপালনে বাধা হয়ে আছে বা থেকেছে। অর্থনৈতিক বৈষম্য, জাতি বৈষম্য, সাম্প্রদায়িক বিভাজন সদাচারের নাম নিয়ে মানুষের স্বাধীন বিকাশের অন্তরায় হয়ে থেকেছে। রবীন্দ্রনাথ ‘সভ্যতার সংকট’ প্রবন্ধে তার স্বসমাজের এই প্রকাশ্য অসভ্য আচরণের সংকীর্ণতাকে চিহ্নিত করে বলতে চেয়েছেন কেন ইংরেজ শাসনের সূচনালগ্নে প্রগতিশীল গোষ্ঠী কেন ‘বিজিত জাতির মুক্তির পথ অন্বেষণ করেছিলো বিজয়ী জাতির দাক্ষিণ্যের দ্বারা। অকপটে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘সভ্যতার সংকট’ প্রবন্ধে বলেন :

> "এই কারণে প্রচলিত সংস্কার আমাদের আচার ব্যবহারকেই প্রাধান্য দিয়ে চিত্তের স্বাধীনতা নির্বিচারে অপহরণ করেছিলো। সদাচারের যে আদর্শ একদা মনু ব্রহ্মাবর্তে প্রতিষ্ঠিত দেখেছিলেন সেই আদর্শ ক্রমশ লোকাচারকে আশ্রয় করলে। আমি যখন জীবন আরম্ভ করেছিলুম তখন ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে এই বাহ্য আচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেশের শিক্ষিত মনে পরিব্যপ্ত হয়েছিলো।...এই সদাচারের স্থলে সভ্যতার আদর্শকে আমরা ইংরেজ জাতির চরিত্রের সঙ্গে মিলিত করে গ্রহণ করেছিলেম। আমাদের পরিবারে এই পরিবর্তন, কী ধর্মমতে, কী লোকব্যবহারে, ন্যায়বুদ্ধির অনুশাসনে পূর্ণভাবে গৃহীত হয়েছিলো"।[৩]

ভারতীয় সভ্যতায় লোকায়ত জীবন পর্যন্ত এই সংকীর্ণ সমাজনিয়মের বন্ধন থেকে মুক্তির একটি প্রদর্শক ছিলো ইংরেজ সভ্যতা। একটি সমাজ পরিচালিত হয় যে ন্যায়বান জীবনাদর্শ থেকে তা যথার্থভাবে ভারতীয় সংস্কৃতিতে বিদ্যমান ছিলো না। মনু কর্তৃক নির্ধারিত সদাচারকে কালের বিবর্তনে মুষ্টিমেয় ক্ষমতাধরেরা আত্মস্বার্থ চরিতার্থে অকপটে ব্যবহার করেছিলো বলেই ইংরেজ চরিত্রের মহানুভব ঔদার্য মুক্তমনা শিক্ষিত বাঙালির জীবনাচারে এক নতুন সমাজধারণা তৈরি করেছিলো। তখন থেকেই ইতিবাচক পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে। বিংশ শতকের নবজাগরণের জোয়ারে ইংরেজ সভ্যতা হয়ে উঠলো ভারতীয় জীবনাদর্শের জীয়নকাঠি। ফলে প্রগতিশীল গোষ্ঠীর চিন্তাচর্চায় সমাজ সম্পর্কের মূল্যায়নের মানদণ্ড পরিবর্তিত হতে থাকলো। অর্থাৎ স্বকীয় সংস্কৃতির সংস্কারাচ্ছন্নতা থেকে একটি উদার গণতান্ত্রিক মনোভাব তৈরির আকড় হিসেবে রবীন্দ্রনাথ সর্বাংশে ইংরেজ মতাদর্শ, রাজনীতি কি সংস্কৃতি সকল বিষয়ের প্রতি আন্তরিকভাবে অভিনিবেশ করেছিলেন। যেটি অস্বীকার করা যায় না প্রকৃত ইতিহাস বিশ্লেষণ করে। কিন্তু ভারতীয় সভ্যতার বিকাশে ইংরেজদের কর্মতৎপরতা এক সময় তাসের দেয়ালের মতো তাঁর সামনে ভেঙে পড়তে থাকলো। সমগ্র ইউরোপে ইংরেজ জাতির সাম্রাজ্যবাদী অভীপ্সা যে ভয়ানক নখদন্ত দেখাতে শুরু করেছিলো তার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রথম পর্বের আস্থার সেই অভূতপূর্ব ভিত তা যেন টলে পড়তে থাকলো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে স্পষ্ট করলেন ভারতবাসীর জন্য ইংরেজ জাতির সভ্য আদর্শের মানদণ্ড কতোটা নেতিবাচক ও অন্যায়মূলক ছিলো। অকপটে তিনি স্বীকার করলেন এই মহান জাতির প্রতি অগাধ বিশ্বাসের ভিত কীরূপে তার চৈতন্য থেকে অধঃপতিত হলো। এখানেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বাতন্ত্রের স্থান। তিনি অকপটে ইংরেজ সভ্যতার কুৎসিত রূপ সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা করলেন। অত্যন্ত ঋজু ভাষায় তাঁর আত্ম উপলব্ধির স্বরূপ তিনি গঠনমূলক সমালোচনা সমেত তুলে আনলেন। যেখানে দুইটি বিষয়কে তিনি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেছেন। একটি হলো সভ্যতার মানদণ্ডে ইংরেজ জাতি তার নিজের জন্য কী করেছে এবং ভারতবাসীর জন্য কী করেছে। ভারতবাসী তার সজাত্যবোধের ধারণা কীভাবে

বিস্মৃত হয়েছে ইংরেজের প্রত্যক্ষ ষড়যন্ত্রে। ইংরেজ জাতির দুইশত বছরের শাসনে কোন ভঙ্গুর মানসিক অবস্থানে এসে পৌঁছেছে ভারতীয়ের মনোভাব সে সম্পর্কে তিনি দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তিনি এক ভিন্ন রবীন্দ্রনাথে পরিণত হয়েছেন যেন জীবনের এই সায়াহ্ন পর্যায়ে পৌঁছে। আত্ম উপলব্ধি ব্যক্ত করে তিনি জানান :

> "নিভৃতে সাহিত্যের রসসম্ভোগের উপকরণের বেষ্টন হতে একদিন আমাকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিলো। সেদিন ভারতবর্ষের জনসাধারণের যে নিদারুণ দারিদ্র আমার সম্মুখে উদঘাটিত হলো তা হৃদয়বিদারক। অন্ন বস্ত্র পানীয় শিক্ষা আরোগ্য প্রভৃতি মানুষের শরীরমনের পক্ষে যা কিছু অত্যাবশ্যক তার এমন নিরতিশয় অভাব বোধ হয় পৃথিবীর আধুনিক শাসন-চালিত কোনো দেশেই ঘটেনি। অথচ এই দেশ দীর্ঘকাল ইংরেজকে তার ঐশ্বর্য জুগিয়ে এসেছে।...যে যন্ত্রশক্তির সাহায্যে ইংরেজ আপনার বিশ্বকর্তৃত্ব রক্ষা করে এসেছে তার যথোচিত চর্চা থেকে এই নিঃসহায় দেশ বঞ্চিত"।[৪]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমাজঅন্বিষ্ট এই উপলব্ধি স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভারতীয়ের জীবনের অপরিসীম বৈষম্যমূলক অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক নিপীড়নের বাস্তব চালচিত্র থেকে ব্যক্ত হয়েছে। মোহাম্মদ আজম 'বাংলা ভাষার উপনিবেশায়ন ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে জানান তাঁর এই আত্মদর্শন যেভাবে তৈরি হয়েছিলো তা সম্পর্কে। মোহাম্মদ আজম বলেন :

> "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন কেটেছিলো ব্রিটিশ ভারতে। তাঁর জন্মের বছর তিনেক আগেই ভারতে রানির শাসন জারি হয়। বলা যায়, তাঁর জন্ম হয়েছিলো ঔপনিবেশিক শাসনের স্বর্ণযুগে। পারিবারিক অভিজ্ঞতার মধ্যে-প্রধানত পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর আর অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কল্যাণে-ব্রিটিশ শাসনের আর্থিক প্রশাসনিক চালচিত্র খুব কাছ থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। আবার কলকাতায় জাতীয়তাবাদী চিন্তাচেতনা ও কর্মকাণ্ডের সূচনাপর্বেই এর সঙ্গে তিনি যুক্ত হয়ে যান-প্রধানত জ্যোতিরন্দ্রনাথ ঠাকুরের সূত্রে। আমৃত্যু তিনি উপনিবেশিত কলকাতার উৎপাদন-বণ্টন থেকে শুরু করে রাজনীতি-সংস্কৃতির কেন্দ্রভাগে সক্রিয়ভাবে উপস্থিত ছিলেন"।[৫]

কলকাতার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পরিমন্ডল সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলেই উপনিবেশিত শাসন ব্যবস্থার বৈষম্য তাঁকে তাড়িত করেছে। তিনি বিচলিত হয়েছেনও যথেষ্ট। ইংরেজ চরিত্রের দ্বি-চারিতা তাঁকে বেদনার্ত করেছিলো। কারণ এই প্রবন্ধে তিনি তাঁর জীবনাদর্শ তৈরির ক্ষেত্রে কতিপয় খ্যাতনামা ইংরেজ মহানুভব চরিত্রের প্রতি কৃতজ্ঞতাও স্বীকার করেছেন। মোহাম্মদ আজম বলেন :

> "রবীন্দ্রমানস ইংরেজ শাসন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এক ধরনের মোহ ছিলো। মোহটা এসেছে পশ্চিমা সভ্যতার সংস্পর্শের সুযোগ আর এর ফলে কলকাতায় বিকশিত নতুন চিন্তাচেতনার বরাতে। আবার এ সম্পর্কে তার এক

ধরনের দ্বিধাও ছিল। ঔপনিবেশিক শাসনের প্রত্যক্ষ নানা অভিজ্ঞতা প্রধান শাসকগোষ্ঠীর বর্ণবাদী আচরণ আর দমন-নিপীড়ন-সেই দ্বিধার উৎস"।[৬]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের আন্দোলন যখন দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ আসন্ন করে তুলেছে তখন বৃহত্তর ভারতের অখণ্ডতা, ভারতবাসীর মৌলিক অধিকার প্রশ্নে ব্রিটিশ রাজশক্তির অমানবিকতা তাঁকে আলোড়িত করেছে। জাতি হিসেবে ভারতীয়ের ঐক্যে চিড় ধরিয়ে তাঁকে আপাদমস্তক দলিত করে একটি নিঃস্বার বর্বর সভ্যতার নিমজ্জিত ভবিষ্যতের মধ্যে ঠেলে দিতে ইংরেজদের কূটচারিতার সমালোচনা করেন তিনি। রাষ্ট্র অধিকারের ভাগ বাটোয়ার প্রশ্নে ভারতীয় হিন্দু এবং ভারতীয় মুসলমানের মধ্যে জাতিগত বিদ্বেষ তরান্বিত করে ইংরেজ ভারতবাসীর স্বকীয় জীবনযাপনের ঐক্যের মধ্যে চিড় ধরিয়েছে এই মতামত স্পষ্ট জানান তিনি। 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে তিনি বলেন :

> "সভ্য-শাসনের চালনায় ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে যে দুর্গতি আজ মাথা তুলে উঠেছে সে কেবল অন্ন বস্ত্র শিক্ষা এবং আরোগ্যের শোকাবহ অভাবমাত্র নয়; সে হচ্ছে ভারতবাসীর মধ্যে অতি নৃশংশ আত্মবিচ্ছেদ।...আমাদের বিপদ এই যে, এই দুর্গতির জন্যে আমাদের সমাজকে একমাত্র দায়ী করা হবে। কিন্তু এই দুর্গতির রূপ যে প্রত্যহই ক্রমশ উৎকট হয়ে উঠেছে, সে যদি ভারত শাসনযন্ত্রের উর্ধ্বস্তরে কোনো এক গোপন কেন্দ্রে প্রশ্রয়ের দ্বারা পোষিত না হতো তা হলে কখনোই ভারত ইতিহাসের এত বড় অপমানকর অসভ্য পরিণাম ঘটতে পারতো না"।[৭]

মানব সম্পর্কের বিশুদ্ধ সত্যরূপ কীভাবে ঔপনিবেশিক পর্বে দলিত হয়ে ভারতবাসীর মধ্যে চিরস্থায়ী বিভাজন রেখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন তিনি। সভ্য শাসনের পরিবর্তে ভারতীয়দের জন্য নির্মিত ভারত শাসন আইনের বৈষম্যমূলক অপনীতির সমালোচনা করে তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে আরো জানান :

> "এই বিদেশি সভ্যতা, যদি একে সভ্যতা বলো, আমাদের কী অপহরণ করেছে তা জানি, সে তার পরিবর্তে দণ্ড হাতে স্থাপন করেছে যাকে নাম দিয়েছে- বিধি এবং ব্যবস্থা, যা সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস, যা দারোয়ানি মাত্র। পাশ্চাত্য জাতির সভ্যতা অভিমানের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা অসাধ্য হয়েছে। সে তার শক্তিরূপ আমাদের দেখিয়েছে, মুক্তিরূপ দেখাতে পারে নি। অর্থাৎ মানুষে মানুষে যে সম্পর্ক সবচেয়ে মূল্যবান এবং যাকে যথার্থ সভ্যতা বলা যেতে পারে, তার কৃপণতা এই ভারতীয়দের উন্নতির পথ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করে দিয়েছে"।[৮]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঔপনিবেশিক শক্তির মদমত্ততা সম্পর্কে স্পষ্টভাবে জানালেন। একটি মহাজাতি নির্মাণের আকল্পে মানুষে মানুষে সম্পর্কের যে মূল ভিত্তি তার ভাঙন নিশ্চিত করেছে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রশক্তি। ভারতীয় সভ্যতার মূলভূমিতে একটি পরম আত্মগত সংকট তারা ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। যাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন 'আত্মবিচ্ছেদ'।

যেটি রোধ করবার এক তীব্র তৎপরতা রবীন্দ্র সাহিত্যে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়েছিলো সর্বাবস্থায়। ভারত স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভারতীয় হিন্দু-মুসলিম এই দুই প্রধান জাতি সম্প্রদায়ের মানুষের এক অপরের প্রতি লালিত আত্মাভিমান, অহংকার, হিংসা-দ্বেষ যেমন করে তিনি প্রতিপালিত হতে দেখেছেন যার প্রেক্ষাপটে ভারতের রাজনৈতিক দ্বিধা, সংকট, সংকীর্ণতা জাতি হিসেবে ভারতবাসীকে অধোগতির দিকে নিয়ে গেছে তা অনুধাবন করে তিনি বেদনাসিক্ত হয়েছেন। ক্ষমতাসীন ইংরেজদের এবং ভারতীয় নেতৃত্বের রাষ্ট্র পরিচালনার ভাগ বণ্টন নীতির সমালোচনা করে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধিত্বশীল রাষ্ট্র পরিচালনার অসাম্প্রদায়িক, সাম্যবাদী তথা মানবকল্যাণমুখী কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদাহরণও তিনি তুলে ধরেছেন। রাশিয়া , জাপান, ইরানের প্রতিষ্ঠিত জাতি ধারণার সুফল তুলে ধরে তিনি জানান :

ক) “মস্কাও শহরে গিয়ে রাশিয়ার শাসনকার্যের একটি অসাধারণতা আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছিলো- দেখেছিলেম, সেখানকার মুসলমানদের সঙ্গে রাষ্ট্র অধিকারের ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে অমুসলমানদের কোনো বিরোধ ঘটে না, তাদের উভয়ের মিলিত স্বার্থসম্বন্ধের ভিতরে রয়েছে শাসন ব্যবস্থার যথার্থ সত্য ভূমিকা”।[৯]

খ) “আর দেখেছি রাশিয়ার মস্কাও নগরীতে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের আরোগ্য বিস্তারের কী / অসামান্য অকৃপণ অধ্যাবসায়- সেই অধ্যাবসায়ের প্রভাবে এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের মূর্খতা ও দৈন্য ও আত্মাবমাননা অপসারিত হয়ে যাচ্ছে। এই সভ্যতা জাতি বিচার করেনি, বিশুদ্ধ মানব সম্বন্ধের প্রভাব সর্বত্র বিস্তার করেছে”।[১০]

সম্যক বিষয়ে মহাজাতি নির্মাণের যে সজীব আকল্প নিয়ে তিনি বঙ্গভঙ্গ রোধের বিরোধিতা করেছেন, ভারতীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের মুসলমানের সঙ্গে সৌহার্দপূর্ণ আচরণ অব্যাহত রাখার স্বপ্ন লালন করেছিলেন, সবার উপরে মানবাত্মার জয়গান ঘোষণা করেছিলেন তার এমন নিষ্কৃত্রিম অপমান তাঁর কাছে অসহ্য মনে হয়েছে। আহমদ রফিক *আরেক কালান্তর* গ্রন্থে বলেন :

ক) “রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণার সুস্পষ্ট বিকাশ প্রধানত উনিশ শ’ সালের প্রথম দিক থেকেই, যখন তিনি স্বাদেশিকতার প্রশ্নে আত্মশক্তির উদ্বোধনে ও জাতীয়তার সংজ্ঞায় নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন, ইংরেজ শাসন ও পরিণাম সম্পর্কে আপন বিশ্লেষণগত বক্তব্য তুলে ধরেছেন”।[১১]

খ) “উপনিবেশিক শাসকের চরিত্র হলো বিভেদ-নীতির মাধ্যমে আপন উপনিবেশিক স্বার্থ রক্ষা করা।...রাবীন্দ্রিক ভাষ্যে হিন্দু সমাজের চূড়ান্ত রক্ষণশীলতা (যা কবির ভাষায় পাপ বলে চিহ্নিত) হিন্দু-মুসলমানের

> অর্থনৈতিক বৈষম্য, আধুনিক শিক্ষায় মুসলমানের পশ্চাদবর্তিতা এবং জাতীয়তার খণ্ডিত - চেতনা ইংরেজের ভেদবুদ্ধির সফলতার কারণ।[১২]

রবীন্দ্রনাথ যেন একজন প্রজ্ঞাবান ধীর, স্থির দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ভবিষ্যতের উদগাতা হয়ে মানবসভ্যতা বিশেষত ভারতবাসীর ভবিষ্যৎ পরাজিত জীবন পরিক্রমা অবলোকন করে মন্তব্য করলেন :

> "ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারত সাম্রাজ্য রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে, তখন এ কী বিস্তৃর্ণ পঙ্কশয্যা, দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে? জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল"।[১৩]

বাংলা ভূখণ্ডের এই প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব সাহিত্যিক, সমাজচিন্তক হিসেবে যার সমগ্র জীবন গোটা বাঙালি এবং ভারতীয়দের নিকট অনুস্মরণীয়, সেই বিশাল বটবৃক্ষ স্বরূপ কাণ্ডারী যখন তাঁর সমগ্র জীবনের অর্জনকে দেউলিয়া বলে ঘোষণা করেন তখন এই মহানায়কের বিনয়ের প্রতি, তাঁর অসহায় আর্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে সমস্ত হৃদয় আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে পড়ে। একই সঙ্গে তাঁর দেয় ভবিষ্যতবাণীর মর্মার্থ দেশভাগের উত্তঙ্গ মুহূর্তে কেমন হতাশাদীর্ণ রক্তাক্ত ভারতের প্রতিচ্ছবি তৈরি করেছিলো ইতিহাস আজীবন তার সাক্ষী হয়ে থাকবে। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনসাধনার আদর্শ নির্মাণ যখন ক্রমান্বয়ে ইংরেজ শাসনের ষড়যন্ত্রে ভারতবাসীর উদার গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব নির্মাণের মিথ্যা প্রশ্রয়ে ধ্বসে পড়তে থাকে তখন তাঁর শিল্পীমন কেবল হাহা ক্রন্দন আর অনাগত ভবিতব্যের জন্য আরও কিছু শুভ আশা রেখে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না। যেখানে উপলব্ধি করা যায় একজন মানবতাবাদী স্বপ্নদ্রষ্টার স্বপ্ন ভাঙ্গা-গড়ার সারবত্তা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় :

> "আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি- পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিতকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ! কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করবো। আশা করবো মহাপ্রলয়ের পর বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে"।[১৪]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্ত ভবিষ্যৎবাণী সাতচল্লিশোত্তর স্বাধীন ভারতবর্ষে এবং বিভাগোত্তর বাঙলার আর্থ সামগ্রিক বিশেষত রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বাস্তবতায় ভারতবাসীর সম্মুখে স্পষ্ট হতে থাকে। যেখানে একটি উপনিবেশিত শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রের কতিপয় সংকট বিশুদ্ধ মানব সম্বন্ধের যে ধ্বস তৈরি করেছে তা দৃশ্যগত হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বাঙালি মুসলমানের সঙ্গে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর

অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক বৈষম্য, বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐক্যের প্রতি বিদ্বেষ চরমে পৌঁছায় তেমনি স্বাধীন ভারতবর্ষে একবিংশ শতকেও রাষ্ট্র অধিকার প্রশ্নে একই সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ জাতীয়তার ধারণায় চিড় ধরায়। প্রগতিশীল উদার গণতান্ত্রিক যে ধারণার উপর কবিগুরুর শিল্পসত্তা আকণ্ঠ নিমজ্জিত থেকে জাতি ধারণার আকল্প ভৌলিক সীমারেখার বাইরে মানবের মানস সরোবরের সজীব মানস সত্তায় দৃঢ় মনোবলের মতো গড়ে দিতে আজীবন কর্মঠ ছিলো তা আজও বাস্তবায়িত হয়নি। 'সভ্যতা অভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ' আজও মানবতাকে লাঞ্ছিত করছে অবিরল গতিতে। তারপরেও কবিগুরুর জীবনাদর্শের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রবাহ আমাদের আজকের পৃথিবীর জন্যেও অনুস্মরণীয়। কেননা ক্ষমতার দৌরাত্মের করতলগত হয়ে কোথায় যেন মিইয়ে যাচ্ছে এই ন্যায় অন্যায় বোঝার সুদৃঢ় সক্ষমতা। আজকের শিক্ষিত শ্রেণি শিল্পী, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ বড় বেশি আপোষকামী। তাই আজকের সভ্যতার মানদণ্ড মাথার উপর যখন স্বাধীন আকাশ তখন মানবাত্মার মুক্তির পথ কেন অবরুদ্ধ রয়ে যাবে? তাই আমাদের ফিরতে হবে অসীমের কারুণিকের মহত্বময় জীবন গঠনের মর্মার্থের প্রতি। রবীন্দ্রনাথ জানান :

> "আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন, প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ বলে মনে করি"।[১৫]

"মৃত্যুর মাস কয়েক পূবে রচিত এ প্রবন্ধে মনুষ্যত্বের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অবিচল আস্থার কথা পূনর্ব্যক্ত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ এবং মনুষ্যত্বের অবমাননায় রৈবিক-উদ্বেগ সভ্যতার সংকট প্রবন্ধটিকে এনে দিয়েছে কালোত্তীর্ণ মহিমা"।[১৬] মানুষের প্রতি আস্থা রেখে ক্ষমতার দম্ভ যে ক্ষমতাশালীর চূর্ণ হবে এই বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আজীবন লালন করেছেন। যেটি তার সমস্ত সৃষ্টিকর্মের মূলসুর, তাঁর প্রণীত আত্মদর্শন। নবজীবনের প্রতি এক পরিপূর্ণ বিশ্বাস তিনি জ্ঞাপন করে শেষবারের মতো উচ্চারণ করেছেন : "আজি অমরাত্রির দুর্গতোরণ যত/ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন/। উদয়শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব/ নবজীবনের আশ্বাসে।/জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়/ মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে"।[১৭]

মানবাত্মার সার্বিক স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ নিশ্চিতকল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আজীবন তাঁর সাহিত্য সাধনায় নিজেকে রত রেখেছেন। উপনিবেশিত ভারতবর্ষের জঠরে পুষ্ট হওয়া সভ্যতা আদর্শের ভিত্তি দিয়ে তাঁর মেধা ও মনন বিকশিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু উপনিবেশিত শাসকগোষ্ঠীর ভারতবর্ষের উপর লালিত বিরুদ্ধ মনোভাব ও কর্মপরিকল্পনার সার্বিকভাবে বিরোধিতা করেছেন তিনি। তাদেরকে অনুধাবন করাতে চেয়েছেন মানবের জন্য নির্মিত এই পৃথিবীতে মানবিক সভ্যতার সুচারু মানদণ্ড কেমন হওয়া উচিত। সে প্রসঙ্গে তিনি বিশ্ব সভ্যতার প্রতিনিধিত্বশীল রাষ্ট্রব্যবস্থার উদাহরণও এ প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন। একইসঙ্গে ভারতবাসীর আত্মবিচ্ছেদ ঔপনিবেশিক পর্বে কীভাবে

ইংরেজদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হয়েছে, আদৌ স্বাধীনতার প্রকৃত মর্মার্থ ভারতবাসী উপলব্ধি করতে পারবে কি না এ বিষয়েও তিনি বেদনার্ত হৃদয়ের আর্তি প্রকাশ করেছেন। 'কালান্তর' প্রবন্ধে সাম্রাজ্যবাদের ছোবল থেকে মানবিকতা রক্ষার যে আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে, মানবিকতার উদ্বোধন আকাঙ্ক্ষার সে আহ্বানই আরো সংহতরূপে বাণীবদ্ধ হয়েছে 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে।[১৮] একজন মানবতাবাদী দার্শনিক স্বপ্নদ্রষ্টার মতো জীবনের শেষ পর্বে এসেও বিশেষত ভারতবর্ষের সম্প্রীতির বন্ধন দৃঢ় রাখতে তিনি পরিত্রাণকর্তার আহ্বান জানিয়ে মানবতার প্রতি জয়গান ঘোষণা করে গেছেন। বাংলা ও বাঙালির প্রতি, সর্বভারতীয় জাতিয়তাবোধের প্রতি সর্বোপরি বিশ্বমানবতার প্রতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মদর্শন যা তাঁর রচিত সাহিত্যাদর্শে এবং জীবনাদর্শে প্রতিফলিত তার প্রাসঙ্গিকতা কখনো মানবসভ্যতার ইতিবাচক কল্যাণ নিশ্চিতকল্পে ম্লান হবার নয়।

তথ্যনির্দেশ :

১. বিশ্বজিৎ ঘোষ (সম্পা.); *তোমার সৃষ্টির পথে* ; "আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলন এবং রবীন্দ্রনাথ"(ঢাকা : নান্দনিক : ২০১৩), পৃ.৩৩৯।

২. তদেব, পৃ.৩৩৯।

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; *কালান্তর,* 'সভ্যতার সংকট'; (ঢাকা : আফসার ব্রাদার্স : ২০১৩), পৃ.১৫৭

৪. তদেব, পৃ.১৫৭

৫. মোহাম্মদ আজম; *বাংলা ভাষার উপনিবেশায়ন ও রবীন্দ্রনাথ* ; (ঢাকা : আদর্শ : ২০১৯), পৃ.২৭৪

৬. তদেব, পৃ.২৭৪

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *কালান্তর,* 'সভ্যতার সংকট'; (ঢাকা : আফসার ব্রাদার্স : ২০১৩), পৃ.১৫৮

৮. তদেব, পৃ.১৫৮

৯. তদেব, পৃ.১৫৬

১০. তদেব, পৃ.১৫৬

১১. আহমদ রফিক; *আরেক কালান্তর* ; (ঢাকা : বাংলা একাডেমি :১৯৭৭), পৃ.১২

১২. তদেব, পৃ.১৪

১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *কালান্তর,* 'সভ্যতার সংকট'; (ঢাকা : আফসার ব্রাদার্স : ২০১৩), পৃ. ১৫৯

১৪. তদেব, পৃ.১৫৯

১৫. তদেব, পৃ.১৫৮

১৬. মোহাম্মদ আজম; *বাংলা ভাষার উপনিবেশায়ন ও রবীন্দ্রনাথ* ; (ঢাকা : আদর্শ : ২০১৯),পৃ.৩৬৮
১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *কালান্তর* , 'সভ্যতার সংকট'; (ঢাকা : আফসার ব্রাদার্স : ২০১৩), পৃ.১৫৯
১৮. রবীন্দ্র রচনাবলী , ষড়বিংশ খণ্ড বিশ্বভারতি, কলকাতা, ১৩৮৪ সংস্করণ, পৃ. ৬৩৩-৪১

‘পদ্মরাগ’: নারী জাগরণের আলোকবর্তিকা

শম্পা সিনহা বসু
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
দি ভবানীপুর এডুকেশান সোসাইটি কলেজ

সারসংক্ষেপ : বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রগতিশীল কথা সাহিত্যিক বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২)। রোকেয়ার অন্যতম জনপ্রিয় উপন্যাস ‘পদ্মরাগ’ (১৯২৪)। ‘তারিণী ভবন’ কে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে ‘পদ্মরাগ’ উপন্যাসটি। দীনতারিণীর অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়ে ওঠে একটি বিধবা-আশ্রম। ‘তারিণী-ভবন’ বিধবা আশ্রম হলেও তাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল একটি বালিকা বিদ্যালয়। হিন্দু, মুসলমান ব্রাহ্ম, খ্রিস্টান প্রভৃতি সমস্ত সম্প্রদায়ের শোষিত বঞ্চিত নারী আশ্রয় নিয়েছিল তারিণী ভবনে। সিদ্দিকা, সৌদামিনী প্রমুখ নারীর যন্ত্রণাময় জীবনের কথা ব্যক্ত হয়েছে উপন্যাসে। দীনতারিণীর প্রচেষ্টায় উপযুক্ত শিক্ষার মধ্য দিয়ে তাদের অন্ধকার জীবন পুনরায় আলোয় ভরে উঠেছে। বিগত দিনের সমস্ত অভিশপ্ত ঘটনা ভুলে মাথা উঁচু করে তারা সমাজে নিজেদের স্থানটি পাকা করেছে। সিদ্দিকা, দীনতারিণী, সৌদামিনী প্রমুখ নারীর মধ্য দিয়ে শিক্ষিত আধুনিক প্রগতিশীল রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন রোকেয়া। ‘পদ্মরাগ’ উপন্যাসটি নারী চেতনাবাদের অন্যতম দলিল।

সূচকশব্দ : ‘তারিণী- ভবন’, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ, নারীশিক্ষা, আত্মসম্মান, স্বনির্ভরতা।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সমাজ বিশেষত মুসলমান সমাজ ছিল রক্ষণশীলতার মোড়কে ঘেরা। কুসংস্কার, অশিক্ষা সমস্ত সমাজকে আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরে রেখেছিল। সেই কাল পর্বে আবির্ভাব হয়েছিল নারী প্রগতির অন্যতম কথা সাহিত্যিক বেগম রোকেয়ার (১৮৮০-১৯৩২)। বেগম রোকেয়ার আবির্ভাবে বাংলা সাহিত্য যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয়েছিল। মুসলমান নারী সমাজের অবদমিত রূপটিকে তিনিই প্রথম জনসমক্ষে আনেন তার লেখনীর মাধ্যমে।

ভাগলপুরের অধিবাসী খান বাহাদুর সৈয়দ সাখাওয়াতের মত প্রগতিশীল জীবনসঙ্গীর সান্নিধ্য পেয়েছিলেন রোকেয়া। খান বাহাদুরের সাহচর্যে রোকেয়া পারদর্শী হয়েছিলেন ইংরেজি ভাষাতে। স্বামী সান্নিধ্যই রোকিয়াকে উৎসাহিত করেছিল সাহিত্য রচনায়। ‘নবনূর’ (১৩১০), ‘মহিলা’ (১৩৩১) প্রভৃতি পত্রিকায় প্রবন্ধ ও কবিতা রচনার পাশাপাশি উপন্যাস লেখাতেও তিনি হয়ে উঠেছিলেন দক্ষ। অজস্র প্রবন্ধ গ্রন্থের রচয়িতা রোকেয়ার উপন্যাসের সংখ্যা মাত্র একটি। পদ্মরাগ (১৯২৪) উপন্যাসের মধ্য দিয়ে সাহিত্য, বিশেষত মুসলমান সাহিত্যে প্রথম নারী চেতনবাদী রূপটি প্রতিভাত হলো।

আঠাশটি পরিচ্ছেদে নির্মিত 'পদ্মরাগ' উপন্যাসটি দীনতারিণী নির্মিত 'তারিণী-ভবন'কে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। ব্যারিস্টার তারিণীচরণ সেনের অকাল মৃত্যুর পর তার বিধবা স্ত্রী দীনতারিণী এই বিধবা আশ্রমটি প্রতিষ্ঠা করেন। বিধবা আশ্রম ছাড়াও সেখানে বালিকা বিদ্যালয়, আতুর আশ্রমও গড়ে তুলেছিলেন তিনি অসহায় নারীদের উদ্দেশ্যে। 'তারিণী ভবনের বিরাট অট্টালিকার এক প্রান্তে বালিকা বিদ্যালয়, অপর প্রান্তে বিধবা আশ্রম। কিন্তু ক্রমে তাঁহাকে তৎসংলগ্ন একটা আতুর-আশ্রমও স্থাপন করিতে হইল' [১] সর্বধর্ম সমন্বয়ের মিশ্রণ হল তারিণী ভবন। হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খ্রিস্টান প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নারী ছিল এই ভবনের সদস্য, যারা পরস্পরকে ভালোবেসে হয়ে উঠেছিল একই পরিবারের সদস্য। 'মুসলমান, হিন্দু, ব্রাহ্ম,খ্রিস্টান সকলে যেন এক মাতৃগর্ভজাতা সহোদরার ন্যায় মিলিয়া মিশিয়া কার্য করিতেছেন'[২] তারিণী ভবন নির্মাণ করার পেছনে দীনতারিণীর উদ্দেশ্য ছিল পুরুষ কর্তৃক নিপীড়িত শোষিত নারীদের আশ্রয় দেওয়া ও তাদের স্বনির্ভর করা। সিদ্দিকা, সৌদামিনী, হেলেন হরেস, তরুবালা দত্ত এরা প্রত্যেকে পুরুষের দ্বারা পীড়িত। তারিণী ভবন এদের কাছে ছিল প্রধান আশ্রয়স্থল। লেখিকার ভাষায় তারিণী ভবন হল –'যে বিধবার তিন কুলে কেহ নাই, সে কোথায় আশ্রয় পাইবে? তারিণী ভবনে। যে বালিকার কেহ নাই, সে কোথায় শিক্ষা লাভ করিবে? - তারিণী বিদ্যালয়ে, যে সধবা স্বামীর পাশবিক অত্যাচারে চূর্ণ-বিচূর্ণ জরাজীর্ণ হইয়া গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য হয়,সে কোথায় গমন করিবে? ঐ তারিণী কর্মালয়ে'[৩] দীনতারিণী তথা রোকেয়ার স্বপ্নের বাসভবন ছিল তারিণী ভবন। যেখানে ছিল না কোন সাম্প্রদায়িক বিভেদ, যার মূল কথা ছিল মানবতাবোধ। । গোলাম মুরশিদের কথায় - 'দীনতারিণী ব্রাহ্ম, কিন্তু তার আশ্রম এবং বিদ্যালয় হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান-সকলেরই এক ইউটোপিয়ান মিলনস্থান। আশ্রম ও বিদ্যালয়ের কর্মীরা কেউ হিন্দু কেউ মুসলমান কেউবা খ্রিস্টান এবং প্রায় অবাস্তব এক সদ্ভাব তাদের মধ্যে বর্তমান। বাস্তবে রোকেয়া সেকুলার পরিবেশ তৈরি করতে পারেননি তার সাখাওয়াত মেমোরিয়ালে তারিণী ভবন তা-ই এবং এর মধ্য দিয়ে তার মনের প্রশস্ত অসাম্প্রদায়িক আদর্শই প্রতিফলিত হয়।'[৪] দীনতারিণী এই অসহায়া অবলা নারীদের শিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে সবলা, দৃঢ় প্রত্যয়ী নারীতে পর্যবসিত করতে চেয়েছে, যা পরোক্ষে রোকেয়ারই সুপ্ত বাসনা। 'ছাত্রী দিগকে দুই পাতা পড়িতে শিখাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁচে ঢালিয়া বিলাসিতার পুত্তলিকা গঠিত করা হয় না, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ভূগোল, খোগোল, ইতিহাস অঙ্ক শাস্ত্র - সবই শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু শিক্ষার প্রণালী ভিন্ন। মিথ্যা ইতিহাস কণ্ঠস্থ করাইয়া তাহাদিগকে নিজের দেশ এবং দেশবাসীকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা দেওয়া হয় না।'[৫] তারিণী ভবনে গার্হস্থ্য ধর্মের পাশাপাশি স্বদেশপ্রীতি তথা দেশকে ভালোবাসার, শ্রদ্ধা করার শিক্ষাও দেওয়া হয়। শিক্ষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নারীদের স্বনির্ভর সাবলম্বী করাও ছিল দীনতারিণীর উদ্দেশ্য। তাই চরকা কাটা, মিষ্টি তৈরি করা প্রভৃতি বিভিন্ন কাজের জন্য তাদের প্রস্তুত করা হয়। শিক্ষিকা, নার্সিং বা

টাইপিং কে পেশা হিসেবে নির্বাচন করার লক্ষ্যে অনেকেই উক্ত বিষয়গুলিতেও শিক্ষা গ্রহণ করেছে।

'পদ্মরাগ' উপন্যাসে সিদ্দিকা রোকেয়ার মানস-কন্যা। তারিণী ভবনের বাকি সদস্যদের মতো সিদ্দিকাও পুরুষ কর্তৃক লাঞ্ছিত ও পীড়িত হয়ে আশ্রয় নিয়েছে তারিণী ভবনে। সুশিক্ষিত ব্যারিস্টার আলমাসের সঙ্গে সিদ্দিকা ধর্মীয় মতে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল। পরবর্তী ক্ষেত্রে অভিভাবকদের পরামর্শে আলমাসের দ্বিতীয় বিবাহ মেনে নিতে পারেনি সিদ্দিকা। অথচ মুসলমান সমাজে পুরুষের একাধিকবার দ্বার পরিগ্রহণ ছিল খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। একটি পুরুষের একাধিক বিয়ে তৎকালীন সমাজের সাধারণ ঘটনা হলেও সেটি যে নারী সমাজের কাছে কতখানি অপমানের, অসম্মানের তা লেখিকা সিদ্দিকার মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। আত্মমর্যাদাবোধে উদ্দীপ্ত সিদ্দিকা জানিয়েছে –'তাহারা আমার সম্পত্তি চাহিয়াছিলেন-আমাকে চাহেন নাই। আমরা কি মাটির পুতুল যে, পুরুষ যখন ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করিবেন, যখন ইচ্ছা গ্রহণ করিবেন? আমি সমাজকে দেখাইতে চাই যে 'সুযোগ' জীবনে একবার ছাড়া দুইবার পাওয়া যায় না। তোমরা পদাঘাত করিবে আর আমরা তোমাদের পদলেহন করিব, সেদিন আর নাই।'[৬] পুরুষতন্ত্রের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরব হতে প্রথম দেখা গেল 'পদ্মরাগ' উপন্যাসের নায়িকা সিদ্দিকাকে। বাংলা সাহিত্যে প্রথম প্রতিবাদী নারী চরিত্র হিসেবে সিদ্দিকার নাম উল্লেখ করা যেতেই পারে।

'পদ্মরাগ' উপন্যাসের সিদ্দিকাকে প্রগতিশীল নারী হিসেবে চিত্রিত করেছেন লেখিকা। তারিণী দেবী সিদ্দিকাকে তারিণী ভবনের কাজকর্মের পাশাপাশি সংসার ধর্ম করার কথা জানালে সিদ্দিকা তার প্রতিবাদ করেছে। যে ব্যক্তির অনৈতিক কাজকে সমর্থন করতে না পেরে সে সংসার ত্যাগ করেছে, সবকিছু বিস্মৃত হয়ে পুনরায় সে সেই ব্যক্তির কাছে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে না, সিদ্দিকা স্বামী বা সমাজ অপেক্ষা তার আত্মমর্যাদাবোধকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছে।। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী একজন পুরুষ (বিবাহিত/ অবিবাহিত) নানারকম অন্যায় কাজ করার ছাড়পত্র পায়। সেখানে সেই পুরুষটির অন্যায় কাজকর্মকে সমর্থন জানানোই হলো নারীটির প্রধান ধর্ম। এমনকি বিবাহিত হলেও নারীটিকে তার স্বামীর সমস্ত অন্যায় কাজকে মেনে নেওয়াটাই তার স্ত্রীধর্মের আচার বলে মনে করা হয়। সিদ্দিকা পুরুষতন্ত্রের এই নিয়মের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে। আলমাস তার স্বামী হলেও সিদ্দিকার দৃষ্টিতে সে অপরাধী, দ্বিতীয় বিয়ের মধ্য দিয়ে আলমাস শুধু যে সিদ্দিকাকে অপমান করেছে তাই নয়, তার বিশ্বাস অনুভূতি সবকিছুর সঙ্গে সে প্রতারণা করেছে। তাই প্রতারক প্রবঞ্চক ব্যক্তিকে সিদ্দিকা পুনরায় জীবনসঙ্গীর মর্যাদা দিতে চায়নি। সিদ্দিকা আলমাসকে মার্জনা করে তার সঙ্গে সংসার করলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ব্যঙ্গ, উপেক্ষা তাকে সহ্য করতে হবে এমনকি তার স্থান যে অনেকটা নীচে নেমে যাবে তাসিদ্দিকা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেছে –'নারী যতই উচ্চশিক্ষিতা, উন্নতমনা, তেজস্বিনী মহীয়সী

হউক না কেন, ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার আমাদের পদতলে পড়িবেই পড়িবে! আমি সমাজকে দেখাইতে চাই, একমাত্র বিবাহিত জীবনই নারী জন্মের চরম লক্ষ্য নহে; সংসার ধর্মই জীবনের সারধর্ম নহে'[৭]

রোকেয়া নারীর গার্হস্থ্য ধর্ম পালনের বিরোধীতা কোনদিনই করেননি, সুগৃহিনী বা সুমাতাকে তিনি সর্বদাই সম্মান জানিয়েছেন, তবে নারীর আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধ বিক্রি করে নয়। পুরুষের অবহেলা বা অবজ্ঞার পাত্রী হিসেবে নারীর পরিচিতিকে কখনোই প্রাধান্য দেননি রোকেয়া।তাই সিদ্দিকা ওরফে জয়নব, আলমাসের পুনরায় তাকে ঘরণী করার প্রস্তাবকে সরাসরি নাকচ করে জানিয়েছে –'তুমি তোমার পথ দেখো আমি আমার পথ দেখি।'[৮] যেদিন আলমাস সিদ্দিকার সঙ্গে প্রতারণা করেছে, সেদিন থেকেই সিদ্দিকা তার চলার পথ ভিন্ন করেছে, তার সেই পথ চলাতে আলমাসের কোন স্মৃতি সিদ্দিকা রাখতে চায়নি। তার নতুন চলার পথে সে রাখতে চায়নি বিবাহিত জীবনের কোন পিছুটান, সম্পূর্ণ নতুনভাবে নতুন রূপে সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কাছে। সমাজের সমস্ত নিয়মকে অগ্রাহ্য করে সিদ্দিকা তার স্বতন্ত্রতা বজায় রেখেছে। সিদ্দিকার কথার সমর্থন করে তারিণী ভবনের অন্যতম সদস্য উষা জানিয়েছে -'এই যে প্রতি পরম গুরু- এই ভাবটাই মারাত্মক। পুরুষ যাহাই করুন না কেন, - অবলা সরলার জন্য 'পতি পরম গুরু' 'পতি বিনে নাহি গতি' কেন বাপু? এত বড় বিশাল ধরণী কি তোমাদেরই একচেটিয়া বাসস্থান' [৯]

পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অন্যায় নিয়ম নীতির বিরুদ্ধাচারণ করেছেন রোকেয়া। তাই উপন্যাসে দীনতারিণী দেবী তার স্বামীর মৃত্যুর পর পরিবারের আত্মীয়দের অগ্রাহ্য করে দুঃস্থ নারীদের কথা ভেবেছে, তাদের উদ্দেশ্যে তারিণী ভবন নামক বিধবা আশ্রম স্থাপন করেছে। শুধু তারিণী বা সিদ্দিকাই নয়, রাফিয়ার যন্ত্রণাময় জীবনের কথা, তার সংগ্রামের কথা, স্পষ্ট ভাবে বর্ণিত করেছেন রোকেয়া। লতিফ বিপত্নীক হলে পুনরায় সিদ্দিকাকে গৃহলক্ষ্মীর মর্যাদা দিতে চাইলে সিদ্দিকা লতিফের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছে। অপরের সেবাতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োজিত করেছে সিদ্দিকা। সংযম, স্পষ্টবাদীতা,দৃঢ়তা, সিদ্দিকাকে প্রগতিশীল নারীতে পর্যবসিত করেছে। উপন্যাসের শেষে রোকেয়া সিদ্দিকা ও লতিফের পুনর্মিলন দেখাননি, সেখানে আত্মসম্মানবোধে বলীয়ান সিদ্দিকাকে তার স্বভাব ধর্ম থেকে বিচ্যুত করেননি লেখিকা বরং তার সচেতনতাবোধ ও আত্মসম্মানকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন।সিদ্দিকার মধ্য দিয়ে আধুনিক প্রগতিশীল নারী চরিত্রের সৃষ্টি করেছেন রোকেয়া। নারী মুক্তির অন্যতম পথিকৃৎ রোকেয়ার লক্ষ্য ছিল নারী জাগরণ তথা নারী চেতনার উন্মেষ ঘটানো। লেখিকার মতে-'বালিকাদিগকে অতি উচ্চ আদর্শের সুকন্যা, সুগৃহিণী ও সুমাতা হইতে এবং দেশ ও ধর্মকে প্রাণের অধিক ভালবাসিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। বিশেষত তাহারা আত্ম-নির্ভরশীলা হয় এবং ভবিষ্যৎ জীবনে যেন কাষ্ঠ পুত্তলিকাবৎ পিতা, ভ্রাতা বা স্বামী-পুত্রের গলগ্রহ না হয়, এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা হয়।'[১০]

শিক্ষিত হওয়ার মধ্য দিয়ে নারীর আর্থিক স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন লেখিকা। রোকেয়া জানতেন পুরুষশাসিত সমাজ নারীদের শিক্ষার পথে প্রধান বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে। লেখিকার কথায় –‘স্ত্রী শিক্ষার বিরুদ্ধে অধিকাংশ লোকের কেমন একটা কুসংস্কার আছে, যে তাঁহারা ‘স্ত্রীশিক্ষা’ শব্দ শুনিলেই ‘শিক্ষার কুফলের একটা ভারী বিভীষিকা দেখিয়া শিহরিয়া উঠেন। অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের শত দোষ সমাজ অম্লানবদনে ক্ষমা করিয়া থাকে, কিন্তু সামান্য শিক্ষাপ্রাপ্ত মহিলা দোষ না করিলেও সমাজ কোন কল্পিত দোষ শতগুণ বাড়াইয়া সে বেচারীর ঐ ঘাড়ে চাপাইয়া ‘শিক্ষার’ দেয় এবং শতকণ্ঠে সমস্বরে বলিয়া থাকে ‘স্ত্রীশিক্ষাকে নমস্কার।’[১১] রোকেয়া অবগত ছিলেন যে, নারী শিক্ষিত হলেই মুক্তি ঘটবে অবরোধ প্রথার। রোকেয়া ‘পদ্মরাগ’ উপন্যাসে তারিণী ভবনের সিদ্দিকা সহ অন্যান্য সদস্যদের শিক্ষিত হওয়ার মধ্য দিয়ে আত্মনির্ভর ও স্বাবলম্বী করতে চেয়েছেন। রোকেয়া বিশ্বাস করতেন অন্ধকার কুঠুরিতে চিরকাল পড়ে মার খাওয়ার জন্য নারী জন্মায়নি, নিজেদের চেষ্টায় নারীকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। তার কথায়- ‘আমরা সমাজেরই অর্ধ অঙ্গ। আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কি রূপে? ... পুরুষের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে - একই... আমরা যাহাতে তাঁহাদের পাশাপাশি চলিতে পারি, আমাদের এরূপ গুণের আবশ্যক... আমরা অকর্মণ্য পুতুল- জীবন বহন করিবার জন্য সৃষ্ট হই নাই, একথা নিশ্চিত।’[১২]

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর লাঞ্ছনা বঞ্চনা ভীষণভাবে পীড়িত করেছিল রোকেয়াকে। সমাজে নারীর এই দুরাবস্থার অবসান চেয়েছিলেন তিনি। চেয়েছিলেন অন্দরমহলে বন্দী নারী পুরুষের সমকক্ষ হয়ে সসম্মানে সমাজে তার স্থান করে নেবে। শিক্ষার মধ্য দিয়ে যেমন তারিণীভবনের সদস্যদের চেতনার বিকাশ ঘটাতে চেয়েছিলেন দীনতারিণী, একইভাবে রোকেয়া চেয়েছিলেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর বোধোদয় ঘটাতে। লেখিকার কথায়- ‘আমাদের অবস্থা আমরা চিন্তা না করিলে আর কেহ আমাদের জন্য ভাবিবে না।’[১৩] রোকেয়া পুরুষ বিদ্বেষী ছিলেন না, কিন্তু পুরুষের অন্যায়কে প্রশ্রয়ও তিনি দেননি। তাই ‘পদ্মরাগ’ উপন্যাসের সিদ্দিকাকে তালাকের মধ্য দিয়ে আলমাস মুক্তি দিতে চাইলে সিদ্দিকা তার কাছ থেকে সামাজিক নিয়মে মুক্ত হতে চায়নি। কারণ মানসিক দিক থেকে বহু পূর্বেই আলমাস ওরফে লতিফের কাছ থেকে সে নিজেকেমুক্ত করেছে। সামাজিক নিয়মে মুক্ত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করেনি সিদ্দিকা। ‘পদ্মরাগ’ উপন্যাসের মধ্য দিয়ে রোকেয়া নারীর সার্বিক মুক্তি তথা তাদের উন্নয়নের স্বপ্ন দেখেছিলেন। অবরোধ প্রথা বা সাম্প্রদায়িক সমস্যার মতো ঘটনাগুলো চিরতরে বিলোপ ঘটাতে চেয়েছিলেন রোকেয়া।

‘পদ্মরাগ’ উপন্যাসে নারীর জীবিকা অর্জনের একাধিক উপায়ের উল্লেখ আছে। ‘তাঁহারা বিবিধ সূচিকর্ম করেন, চরকা কাটেন, হাতের তাঁতে কাপড় বোনেন, পুস্তক বাঁধাই করেন, নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করেন। ... এতদ্ব্যতীত - দেশের

অন্যান্য হিতকর কার্য যথা দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারী - পীড়িত লোকেদের সাহায্য করিবার নিমিত্ত এই বিভাগ হইতে মহিলাগণ তন্ডুল, বস্ত্র ও ঔষধ বিতরণ এবং রোগী সেবা করিতে গিয়া থাকেন।'[১৪] পুরুষতান্ত্রিক সমাজ দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষকতার পেশাকেই নারীর জীবিকার একমাত্র পথ বলে মনে করেছিল। সমাজের দীর্ঘদিনের প্রচলিত নিয়মকে এক লহমায় ভেঙে দিয়েছেন রোকেয়া। পুরুষের ন্যায় সমাজে নারীর কর্ম পরিধিকে করেছেন বিস্তৃত। জীবিকা ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্যের ধারণাটি একেবারেই নস্যাৎ করে দিয়েছেন রোকেয়া। এদিক থেকে প্রগতিশীল রোকেয়ার ' পদ্মরাগ' উপন্যাসটি আধুনিক ধারণারই প্রবর্তক বলা যেতে পারে।

'পদ্মরাগ' উপন্যাসে 'তারিণী ভবনে'র মধ্য দিয়ে রোকেয়ার লিঙ্গ বৈষম্যহীন নতুন পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে যেখানে নারী পুরুষের মধ্যে থাকবে না কোন বৈষম্য। পুরুষের সঙ্গে সমানতালে পা মিলিয়ে নারী এগিয়ে যাবে তার লক্ষ্যে, যেমন ভাবে সিদ্দিকা সমস্ত পিছুটান ছেড়ে বৃহৎ কর্মের উদ্দেশ্যে এগিয়ে গেছে। সিদ্দিকার দেখানো পথেই যে ভবিষ্যতের নারী মাথা উঁচু করে এগিয়ে যাবে, তাদের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করবে এমনটাই আশা করেছিলেন রোকেয়া। তাই সিদ্দিকা অবলীলাক্রমে বলেছে- 'আমি আজীবন তারিণী ভবনের সেবা করিয়া নারী জাতির কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করিব এবং অবরোধ প্রথার মূলোচ্ছেদ করিব।' [১৫] এখানে সিদ্দিকা অনন্যা, আধুনিক। রোকেয়া 'পদ্মরাগ' উপন্যাসে শুধুমাত্র নারী শিক্ষা বা নারীর অবরোধ মোচনের কথাই বলেননি, নারীচেতনা বা নারী জাগরণের মধ্য দিয়ে নারীর নবজন্মের কথাও তুলে ধরেছেন, যা পরবর্তী সাহিত্যিকদের পথ চলার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা হয়ে থেকেছে।

তথ্যসূত্র :

১। রায়, গৌতম, সংকলিত ও সম্পাদিত, রোকেয়া রানা সংগ্রহ, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৮, পৃ. ১২৮।
২। তদেব, পৃ. ২১৯
৩। তদেব, পৃ. ২১৮
৪। গোলাম মুরশিদ, নারী প্রগতির একশো বছর, রামসুন্দরী থেকে রোকেয়া, অবসর, ২০১৩, পৃ. ১৯১।
৫। রায়, গৌতম, সংকলিত ও সম্পাদিত, রোকেয়া রানা সংগ্রহ, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৮, পৃ. ২১৯-২২০।
৬। তদেব, পৃ৩১১ .
৭। তদেব, পৃ৩১১ .
৮। তদেব, পৃ৩১৬ .
৯। তদেব, পৃ. ৩১১

১০। তদেব, পৃ২২০ .
১১। তদেব, পৃ৩৩-৩২ .
১২। তদেব, পৃ. ৩৬-৩৭
১৩। তদেব, পৃ৩৪ .
১৪। তদেব, পৃ২২০ .
১৫। তদেব, পৃ. ৩১১

টেনিদার অভিযান কাহিনি : অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ

হাসনারা খাতুন
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

বলা হয়, বাঙালির পায়ের তলায় সরষে। অজানাকে জানার উদ্দেশ্যে সুদূরের পানে পাড়ি দেওয়ার ধাত রয়েছে বাঙালির প্রাণে। ছাপোষা মধ্যবিত্ত বাঙালি সাধ্যের তোয়াক্কা না করেই বেরিয়ে পড়ে হাওয়া বদলের সন্ধানে। বাঙালির এই উড়ুক্কু স্বভাব সাহিত্যের মধ্যে দিয়েও স্বাদ পূরণের নেশায় মত্ত। তাই বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের এত রমরমা। সেই সঙ্গে, সুদূরের হাতছানি এনে দেয় 'ভ্রমণ গাইড'। পূজা-পার্বনে ছোঁ মেরে বেরিয়ে পড়ার নেশায় বাজারি 'ভ্রমণ গাইড'এর বেশ চাহিদা। ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকতেও দেখা যায়। ইতিহাস বলে, উনিশ শতকের গোড়া থেকেই বাংলায় অ্যাডভেঞ্চার কাহিনির সূত্রপাত। যদিও বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের নিদর্শনের দিকে তাকালে বাণিজ্য পথযাত্রী বাঙালির কথা জানা যায়। তবে সেই সব কাহিনির মধ্যে সেই অর্থে অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ নয়, নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে নায়কের ঘরে ফেরার কাহিনিই প্রধান। বাধা বিপত্তি কাটিয়ে দেশে ফিরে সংসার জীবনে স্থায়ী ভাবে বসবাস করার উদ্দেশ্যেই কবি সাহিত্যিকগণ নায়ককে এই অভিযানে 'সওয়ার' করাতেন। কিন্তু অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে বিপদ সঙ্কুল পরিবেশের যাপনও উপভোগ্য হয়। সব বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে ফিরে আসার পরেও 'মন কেমনে'র বিষাদ টেনে নিয়ে যেতে চায় আবারও। অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ আসলে অজানাকে জানা, অচেনাকে চেনার আবিষ্কারের নেশায় সমস্ত বয়সের মানুষকে টানে। অ্যাডভেঞ্চার সাহিত্যও তাই বাঙালির কাছে চির আকর্ষণীয়।

উনিশ শতকে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের 'দূরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' দিয়েই বাঙালির অভিযান কাহিনির শুরু। বাঙালির কালাপানি পার বিষয়ক নিষেধাজ্ঞা, সেই আকাঙ্ক্ষাকেই জাগিয়ে তুলেছিল। ক্রমে ক্রমে বিশ শতকের পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক পট-পরিবর্তন, বাঙালির মধ্যে 'খোঁজে'র চাহিদাকে বাড়িয়েই তুলেছিল।

অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনির সঙ্গে কিশোর সাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য যোগকে ঘিরেই এই আলোচনা। তাই সূত্র খোঁজার আয়োজন তো করতেই হয়। শিশু-কিশোর সাহিত্যের গোড়াপত্তনের কাল থেকেই বিভিন্ন স্থানের বর্ণময় বর্ণনার হাতছানি হাজির করা হতে থাকে, বাঙালি শিশুর সামনে। ঔপনিবেশিক উপযোগবাদী শিক্ষা ব্যবস্থায় নীতিশিক্ষার আসরে 'গোপাল' তৈরির কারখানার বিপরীতে 'রাখালে'র খামখেয়ালিপনার হাত ধরেই বাংলা শিশু সাহিত্যের পথচলা। সেই সঙ্গে অজানা দেশের ভৌগোলিক বর্ণনা কিশোর এবং প্রাপ্ত বয়স্কের অন্যতম চ্যালেঞ্জকে তৈরি করতে থাকে। তাই বাংলা সাহিত্যে

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের পর সুকুমার রায় এবং সত্যজিৎ রায়ের অমর সৃষ্টি বাঙালি শিশুর বড় হওয়াকে আডভেঞ্চার বহুল করে তোলে।

শিশু-কিশোরদের জগতে অ্যাডভেঞ্চারের রোমান্টিকতা খানিকটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবেই ব্যবহৃত হয়েছিল। 'মৌচাক' পত্রিকায় হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'যকের ধন' (১৯২৪) উপন্যাসটি প্রকাশিত হলে, এই ভূমিকায় লেখক লেখেন,----

> "বাঙালি ছেলেদের দেহের সঙ্গে মনও যাতে বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে, স্বদেশকে ভালোবেসেও তাদের চিত্ত যাতে বিপুল বিশ্বের জলে-স্থলে-শূন্যে বেপরোয়া হয়ে ছড়িয়ে পড়ে, ... নানা বিরোধী ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতেও সমান অটল থেকে তারা যাতে নিজেদের জীবনগঠন করতে পারে, ... (আমার যকের ধন) উপন্যাস রচনার আসল উদ্দেশ্যই হচ্ছে তাই।"[১]

অর্থাৎ জ্ঞানের জগতে বিচরণ করার পাশাপাশি সামাজিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিস্থিতির মোকাবিলা করার দৃঢ় মানসিকতার নির্মাণেও অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনিগুলি কিশোর জীবনের প্রয়োজনীয় অঙ্গ। আর এক্ষেত্রে আমরা মা-ঠাকুমার বলা রূপকথার গল্পগুলোকেই বা বাদ দিই কেমন করে! রূপকথার রাজকুমারের রাজকুমারীরকে উদ্ধারের গল্পই হোক বা রাক্ষসীর কবল থেকে রাজ্য উদ্ধার--- সব ক্ষেত্রেই শিশুর জীবনে আনা হয়, নানা মাত্রার অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ। আসলে আগামী জীবনের পথচলায় বন্ধুর পথে, শিশুর মানসিক দৃঢ়তার লক্ষ্যে নানা অ্যাডভেঞ্চারের ক্ষেত্রকে ধরিয়ে দেওয়া হয়। গল্প শোনার পর্যায় পার করে, পড়তে শুরু করার মুহূর্ত থেকেই তাই অসম্ভবের নানা কাহিনি শিশু-কিশোরদের প্রাণে অক্সিজেনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই অ্যাডভেঞ্চারের ক্ষেত্র রূপকথার জগত থেকে বাস্তবের মাটিতে চলে আসে। সেখানে জীবন উপভোগের বিষয়টি প্রধান হয়ে ওঠে। তাই অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনিতে বিপজ্জনক পরিস্থিতি যত ভয়ঙ্কর, সেই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ ততই রোমাঞ্চকর এবং উপভোগ্যতাও ততই গভীর ও আনন্দজনক। কখনও ভৌগলিক প্রতিবন্ধকতার বেড়া পার করা, আবার কখনও রহস্য উদ্ধারের আস্বাদ – বাঙালি কিশোরের মনে-প্রাণে সেই অ্যাডভেঞ্চারের ক্ষেত্র, চিরনবীন।

বাংলা কিশোর সাহিত্যেও তাই অ্যাডভেঞ্চার কাহিনির তালিকাও বেশ লম্বা। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে, প্রযুক্তিবিদ্যার সঙ্গে হাত মিলিয়ে আজও কিশোরদের সামনে অ্যাডভেঞ্চার কাহিনির রমরমা। খগেন্দ্রনাথ মিত্রের ভোম্বল সর্দার, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের টেনিদা, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাকাবাবু, বুদ্ধদেব গুহর ঋজুদা, সমরেশ মজুমদারের অর্জুন, তপন গঙ্গোপাধ্যায়, পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ এক গুচ্ছ নাম আমরা পাই।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের টেনিদা এবং তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের অভিযান কাহিনি আলোচনার প্রয়োজনেই এই গৌরচন্দ্রিকা। পটলডাঙ্গার বিখ্যাত টনিদা, চাটুজ্যাদের

রোয়াকে বসে ক্যাবলা, হাবুল, প্যালা সহযোগে আড্ডার মুড়ে অতিরঞ্জিত বীরত্বের গল্প বলে। আবার কখনো এই চার জনেই বেরিয়ে পড়ে অজানার উদ্দেশ্যে। নানা দুর্গম পরিবেশে রহস্যের উন্মোচনে সেই 'বেরিয়ে পড়া' পরিণত হয়, অ্যাডভেঞ্চারের কীর্তিতে।

এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন হতে পারে, অন্যান্য কাহিনি থেকে টেনিদার পার্থক্য কোথায়। ধরা যাক, ফেলুদার কথা। সত্যজিৎ রায়ের 'প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর' ফেলুদা, ছ'ফুট লম্বা, যোগ ব্যায়াম করা শরীর, রিভলভার চালাতে পারে, সমস্ত রকম জ্ঞানের এনসাইক্লোপিডিয়া তো বটেই বুদ্ধিমত্তা এবং সুস্বাস্থ্যেরও অধিকারী। আবার প্রফেসর শঙ্কুর অ্যাডভেঞ্চার মোকাবিলায় অগাধ জ্ঞানের প্রয়োগ। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাকাবাবু জ্ঞানের ভাণ্ডার তো বটেই, শারীরিক অক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করে তিনি প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করার ক্ষমতাও রাখেন। সমরেশ মজুমদারের অর্জুনের মধ্যেও রয়েছে, বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। কিন্তু টেনিদা! ম্যাট্রিক পাশ করতেই যাকে তিন বছর পার করতে হয়েছে। রোগা জীর্ণ শরীরে 'ব্রহ্মজ্বালা' যুক্ত উদর নিয়ে, সে চাটুজ্জেদের রোয়াকে বসে আড্ডা মারে, আজগুবি গল্প করে, আর সারাক্ষণ খাই খাই করে। তবে শরীর চর্চায় তার বেশ আগ্রহ। সেজন্য তার অহমিকাও রয়েছে। রোয়াকে বসে, আজগুবি গল্পগুলির মধ্যে নিজের কৃতিত্ব ফলানোর কাজটা ভালোই পারে। কিন্তু পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে তাই স্বভাবতই হোঁচট খেতে দেখা যায়। টেনিদা, প্যালা, ক্যাবলা এবং হাবুল – এই চারজনকে নিয়েই তাদের 'চারমূর্তি'র দল। টেনিদা, তাদের 'লিডার'। দলের 'লিডার' টেনিদার ভূত, জন্তু-জানোয়ার ইত্যাদি সমস্ত রকমের ভয় রয়েছে। টেনিদা আসলে বাস্তবেরই এক রক্ত-মাংসের মানুষের আদলে সৃষ্টি। লেখকের পটলডাঙ্গার ভাড়া বাড়ির মালিকের কথা মাথায় রেখেই সৃষ্টি টেনিদার।

টেনিদা সহ চারমূর্তি বিভিন্ন সময়ে বেরিয়ে পড়েছে, অ্যাডভেঞ্চারের টানে। কখনও দানো ভূত, কখনও বুনো জন্তু, আবার কখনও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ – বিভিন্ন ক্ষেত্রে টান টান উত্তেজনায় বা হাস্যরসের খোরাকে তাদের অভিযান কিশোর সমাজে উপভোগ্য হয়েছে। আর শুধু কিশোরই বা বলি কেন, প্রাপ্ত বয়স্কের মনে কি সেই উত্তেজনা রোমাঞ্চ জাগায় না? কিশোরদের অভিযান কাহিনি বলে দাগানো এই গল্পগুলি সর্বকালের সব বয়সের পাঠককেই সমান আকর্ষণ করে।

অ্যাডভেঞ্চার স্বাভাবতই কিশোরমনকে নাড়া দিয়ে যায়। কিন্তু অ্যাডভেঞ্চারকে অতিক্রম করে মানুষের জন্য নিঃস্বার্থ সেবার আনন্দ কিশোরমনকে স্বভাবতই উদ্দীপ্ত করে। আর সেজন্যই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় টেনিদা সিরিজের 'চারমূর্তি', 'চারমূর্তির অভিযান, 'কম্বল নিরুদ্দেশ' 'ঝাউ বাংলোর রহস্য' উপন্যাসগুলি আর টেনিদা সংক্রান্ত একাধিক গল্পগুলিতে চারমূর্তির অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনি বাংলা কিশোরসাহিত্যের পাঠকদের কাছে স্থায়ী হয়ে রয়েছে। আমরা 'চারমূর্তি' উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদ 'মেশোমশায়ের অট্টাহাসি'তে টেনিদার ভ্রমণ কাহিনি ও তাদের অ্যাডভেঞ্চারের কথা

জানতে পারি। এখানে লেখক টেনিদা-হাবুল-ক্যাবলা আর প্যালারাম এই চরিত্রগুলি উত্তর কলকাতার মধ্যবিত্ত পরিসর থেকে উঠিয়ে নিয়ে এসে অ্যাডভেঞ্চারের মোড়কে পাঠকের সামনে হাজির করলেন। তাদের প্রথম ভ্রমণ রাঁচির কাছাকাছি পাহাড়। হাজারিবাগ আর রামগড় থেকেও এই পাহাড়ে যাওয়া যায়। সেখানে তাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে ক্যাবলার মেসোমশায়ের পাহাড়ের টিলায় অবস্থিত বাংলোতে। বাংলোটি তিনি এক সাহেবের কাছ থেকে কিনেছিলেন। এই বাংলোতে পৌঁছানোর মধ্যেই একটা অ্যাডভেঞ্চার রয়েছে— 'বাস থেকে নেমে গোরুর গাড়ি চড়ে মাইল-তিনেক পথ'[২] যেতে হবে। এই যে গরুর গাড়ি করে যাওয়া— উত্তর কলকাতার এই চারমূর্তির কাছে এক ধরনের অ্যাডভেঞ্চার নিঃসন্দেহে। আর যে বাংলোতে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে সেখানে রাত্রি বাস করার মধ্যেও রয়েছে—

> —ওখানকার সাঁওতালেরা বলে, বাড়িটা নাকি দানো-পাওয়া। ওখানে নাকি অপদেবতার উপদ্রব হয় মধ্যে-মধ্যে। কে যেন দুম-দাম করে হেঁটে বেড়ায়— অদ্ভুতভাবে চেঁচিয়ে ওঠে—অথচ কাউকে দেখতে পাওয়া যায় না।[৩]

বোঝায় যাচ্ছে এমন ভুতুড়ে বাড়িতে রাত্রিবাসের মধ্যেও রয়েছে অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ। আর যেখানে ভূতের ভয়ে ভিতু— 'টেনিদা বললে, ছোঃ! ওসব বাজে কথা! ভূত-টূত বলে কিছু নেই মেসোমশাই। আমরা চারজনেই যাব। ভূত যদি থাকেই, তাহলে তাকে একেবারে রাঁচির পাগলাগারদে পাঠিয়ে দিয়ে তবে ফিরে আসব কলকাতায়'।[৪]

ক্যাবলার মেসোমশাইয়ের দৌলতে টেনিদা ও তার তিন সাথী রাঁচী ভ্রমণের জন্য রওনা হয়। পথে দেখা হয় ভণ্ডসাধু ঘুটঘুটানন্দ'র সাথে। এরপর উপন্যাসে টেনিদা'দের ভ্রমণ কাহিনি রাঁচি অভিযানে পরিণত হয়। ভৌতিক পরিবেশের বর্ণনা আর প্যালার কথায় ভূতেরা কাটামণ্ডু নিয়ে নাচ করে শুনে ক্যাবলা ভূতকে চ্যালেঞ্জ করে বসে— 'কাটা মণ্ডুর নাচ আমি কখনও দেখিনি, বেশ মজা লাগবে! আচ্ছা আমি ওয়ান-টু-থ্রি বলছি। ভূতের যদি সাহস থাকে, তাহলে থ্রি বলবার মধ্যেই এই ঘরে ঢুকে নাচতে আরম্ভ করবে। আই চ্যালেঞ্জ ভূত! ওয়ান-টু—'[৫] কাহিনির ঘটনায় ক্রমশ গতিতে তারা ভণ্ড সাধুবাবা ও বেআইনি জাল নোটের কারবারী একদলের গোপন রহস্য উদ্ঘাটন করে ফেলে। আর তাদের পুলিশে ধরিয়ে দিয়ে শাবাশা নেয়—

> দারোগা হেসে বললেন, শাবাশ ছোকরার দল, তোমরা বাহাদুর বটে। খুব ভালো কাজ করেছ। এই দলটাকে আমরা অনেকদিন ধরেই পাকড়াবার চেষ্টা করছিলুম, কিছুতেই হদিস মিলছিল না। তোমাদের জন্যেই আজ এরা ধরা পড়ল। সরকার থেকে এ-জন্যে মোটা পুরস্কার পাবে তোমরা'।[৬]

'চারমূর্তির অভিযান' উপন্যাসে লেখক উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্সের প্রকৃতিকে অ্যাডভেঞ্চারের প্রেক্ষাপট হিসেবে ব্যবহার করেছেন। আর টেনিদার কুট্টিমামার জন্য তাদের এই ভ্রমণ—এখানে বন্য জন্তুদের সঙ্গে রোমাঞ্চকর লুকোচুরির অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনি বর্ণিত

হয়েছে। এই উপন্যাসেই পটলডাঙার চারমূর্তির প্রথম বিমান যাত্রা। টেনিদার খিদের জন্য তাদের এই প্রথম বিমানে ভ্রমণ মাটি হতে যেতে বসেছিল—

> টেনিদা বললে, প্যালা। যাই বল বাপু, আমার খিদে একটু বেশি। বামুনের পেট তো—প্রত্যেক মিনিটেই একবারে ব্রাহ্মতেজে দাউ-দাউ করে ওঠে
> কিন্তু কী খাই বল তো?[৭]

টেনিদার এই খিদে নিবারণের তাগিদ থেকেই চারমূর্তি চৈনিক রহস্য উদঘাটন করে।

> হাবুল বললে, অই তো একটা বস্তা ফুটা হইয়া কী জ্যান পড়তে আছে! লবন মনে হইত্যাছে। খাইব্যা?
>
> ... .
>
> একলাফে দাঁড়িয়ে পড়ল টেনিদা। বললে, দেখি কী রকম লবণ!
> বলেই বস্তা থেকে খানিকটা আঙুলের ডগায় তুলে নিলে। তারপর চেঁচিয়ে বললে, ডি-ল্যা-গ্র্যাণ্ডি! ইউরেকা!
> আমরা বললুম, মানে?
> —বস্তার রহস্যভেদ। মানে বস্তায় চৈনিক রহস্য।[৮]

বিমানের মধ্যে বস্তাবন্দি চিনির সন্ধান পেয়ে তারা চিনি সাবাড় করতে শুরু করল। অতঃপর তাদের বিমান থেকে মাটিতে অবতরণ ও কুট্টিমামার আবির্ভাব। কুট্টিমামার বাড়ি আসলে চা বাগানের কোয়ার্টার। সেখানকার স্বাভাবিক বন্য-প্রকৃতির পরিবেশের সাথে চারমূর্তির পরিচয় ছিল না। বনের বিভীষিকা আর বাঘ, ভাল্লুক, হাতি, বানরের ন্যায় বন্যজন্তুতে একেবারেই অভ্যস্ত ছিল না। বনজঙ্গলের শোভা দর্শনে গিয়ে টেনিদা হাতি দেখে ভয়ে গাছে উঠে পড়ে। তারপর টেনিদা গাছের ডাল ভেঙে হাতির পিঠে পড়ে—

> হাতিটা তখন ঠিক গাছটার তলায় এসে পড়েছে। আর সেই মুহূর্তেই অঘটন ঘটল একটা। মড়মড় করে ডাল ভাঙবার আওয়াজ এল, একটা চিৎকার শোনা গেল টেনিদার তারপর—
> তারপর রোমাঞ্চিত হয়ে আমরা দেখলুম, টেনিদা পড়েছে হাতির পিঠের ওপর। উপুড় হয়ে দু'হাতে চেপে ধরেছে হাতির গলার চামড়া। আর পিটের উপর খামকা এই উৎপাতটা ভাদ্রমাসের পাকা তালের মতো নেমে আসাতে হাতিটা ছুট লাগিয়েছে প্রানপণে।
>
> ....
>
> হাতি জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে যাওয়ার আগে আমরা শুনলুম টেনিদা ডেকে বলছে: তোদের পটলডাঙার টেনিদাকে তোরা এবার জন্মের মতো হারালি! বিদায়—বিদায়— [৯]

কুট্টিমামার সাথে চারমূর্তির বাঘ শিকারে যাওয়া, হাতির ভয়ে গাছে উঠে পড়া ও গাছের ডাল ভেঙে হাতির পিঠের উপর পড়া এবং শেষে টেনিদা'র 'বিদায়—বিদায়—' আকুতি পাঠকদের মনে যেমন রোমাঞ্চের সৃষ্টি করে তেমনি আপামোর বাঙালির মতে ডুয়ার্সের জঙ্গলের প্রাকৃতিক শোভা দর্শনের তৃষ্ণা জাগিয়ে তোলে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কম্বল নিরুদ্দেশ' আসলে অ্যাডভেঞ্চারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক উপন্যাস। এখানে পটলডাঙার বাসিন্দা বদ্রীবাবুর ভাইপো কম্বলের নিরুদ্দেশ হওয়ার কাহিনি বর্ণিত রয়েছে। কাহিনিতে এই নিরুদ্দেশের খবর শুনে কম্বলকে উদ্ধারের জন্য চারমূর্তি এগিয়ে আসে। যদিও কাহিনিতে কম্বল নিরুদ্দেশ হয়নি, তার কাকি'মা দশাসই মাস্টারমশাইয়ের হাত থেকে বাঁচাতে কম্বলকে চিলেকোঠার ঘরে দিনকতক লুকিয়ে রেখেছিল। আগের দু'টি উপন্যাসের মতো এখানে কোনো অভিযানের কাহিনি নেই, কিন্তু কম্বলকে উদ্ধারের জন্য চারমূর্তির এগিয়ে আসার মধ্যে কিশোর ধর্মের সংবেদনশীলতা, পরোপকারিতা ও প্রতিবাদী মননকে অ্যাডভেঞ্চারের কৌশলে কাহিনিতে তুলে ধরা হয়েছে। কম্বল নিরুদ্দেশের পর, তার এক্সাসাইজ বুকের পাতার মধ্যে পাওয়া চিঠি থেকে রহস্য উন্মোচন ও চোরাকারবারীদের স্বরূপ বের করে এই চারমূর্তি। চিঠিতে লেখা ছিল—

> চাঁদ-চাঁদনি-চক্রধর। চন্দ্রকান্ত নাকেশ্বর। নিরাকার মোষের দল। ছল ছল খালের জল। ত্রিভুবন থর-থর। চাঁদে চড়- চাঁদে চড়।[১০]

চারমূর্তি এই ধাঁধার সূত্র ধরে চোরাকারবারী চক্রধর সামন্ত, স্বামী বিতকেলানন্দ, বিন্দেবন, খগেন সহ পুরোদলটাকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। আর তার জন্য তারা যে পদক্ষেপ নিয়েছে তা নিঃসন্দেহে পাঠককে রোমাঞ্চিত করে—তারা রহস্য উদ্ধারের জন্য গিয়ে হাজির হয় 'চন্দ্র নিকেতন' নামক বাড়িতে। সেখানে তাদের শত্রু বলে চিনে নেয়—

> সেই প্রকাণ্ড জোয়ান লোকটা হঠাৎ ঘর ফাটিয়ে একাই হুঙ্কার করল। বললে, 'চন্দরদা, সর্বনাশ হয়েছে। এরা শত্রু।
>
> ....
>
> ... এরা সেই পটলডাঙার চারজন—চাটুজ্যেদের রোয়াকে বসে থাকে, আমার সেই বিচ্ছু ছাত্র কম্বলকে এদের পিছে-পিছেই আমি ঘুর-ঘুর করতে দেখেছি![১১]

কিন্তু, এই বিপদের পরিস্থিতিতে চারমূর্তি ঘাবড়ে না গিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করে বিপদ থেকে উৎরানোর পরিকল্পনা করেছে। তা আমরা কথকের কথা থেকেই জানতে পারি—

> আমরা পটলডাঙার চারজন—বিপদে পড়লে কি আর ভয়-টয় পাই না? আমি যখন আগে ছোট ছিলুম, ... ভয়ে আমার দম আটকে যেত। তারপর বড় হলুম, দু-একটা ছোটখাটো অ্যাডভেঞ্চার জুটে গেল বরাতে। তখন দেখতে পেলুম, বিপদে ঘাবড়ে যাবার মতো বেকুবি আর কিছু নেই। তাতে বিপদ কমে না—বরং বেড়েই যায়।[১২]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় চারমূর্তি কর্তৃক চোরাকারবারীদের রহস্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের মধ্যে অ্যাডভেঞ্চারের যাবতীয় কলা-কৌশল প্রকাশিত করেছেন। বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে অকুতোভয়, দুঃসাহসের পরিচয় এবং তার পাশাপাশি চারমূর্তির পারস্পরিক ক্রিয়াকলাপ হাসির উদ্রেক ঘটায় বটে, কিন্তু তা টেনিদা সিরিজের কাহিনিগুলির বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আর এরমধ্যে দিয়ে স্বকীয়তা বজায় রেখেছেন লেখক।

'ঝাউবাংলোর রহস্য' নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত টেনিদা সিরিজের আর একটি উপন্যাস। এখানেও অ্যাডভেঞ্চারের কথা রয়েছে। তবে তা অন্যভাবে লেখক উপস্থাপন করেছেন। টেনিদার উপন্যাসগুলির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল ভ্রমণে বেরিয়ে ঘটনাক্রমে অ্যাডভেঞ্চারে জড়িয়ে পড়া। এই উপন্যাসে চারমূর্তি দার্জিলিং ঘুরতে এসেছে। সেখানে সাতকড়ির ঝাউবাংলোয় যাত্রা। সেখানে গিয়ে তাদের কাগামাছি আর কাটামণ্ডুকে নিয়ে চারমূর্তির কাণ্ড যেমন রোমাঞ্চিত করে, তেমনি হাস্যরসের সৃষ্টি করে। 'ঝাউবাংলোর রহস্য' উপন্যাসগুলি থেকে কিছুটা ভিন্নধর্মী। এই উপন্যাসে গোয়েন্দা কাহিনির লেখক পুণ্ডরীক কুণ্ডু তার প্রকাশক জগবন্ধু চাকলাদারকে নিয়ে গল্পের প্লট খুঁজতে দার্জিলিং আসে। সেখানে তিনি চারমূর্তি দেখে মনে মনে গল্প রচনার জন্য প্লট সাজানোর পরিকল্পনা করে ফেলেন। এই উপন্যাসে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার রঙ মিলিয়ে কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। এখানে বাস্তবের চেয়ে কল্পনার প্রলেপ গাঢ় হলেও তা অ্যাডভেঞ্চারের গতিতে কখনো সমস্যা ফেলেনি। বরং কল্পনার ছোঁয়ায় কমেডির টানটান উত্তেজনায় পাঠককে প্রথম থেকে শেষ অবধি ধরে রেখেছে।

বাংলা কিশোরসাহিত্যে টেনি-হাবুল-ক্যাবলা-প্যালারাম চরিত্রগুলি এবং তাদের অ্যাডভেঞ্চার বাঙালি মননে চিরস্থায়ী আসন অলঙ্কৃত করেছে। কলকাতার মধ্যবিত্ত পরিসর থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসা কিশোরদেরকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বাঙালি পাঠকদের সামনে হাজির করেছেন, নানা উপাদান আর অ্যাডভেঞ্চারের মোড়কে। কাহিনিতে আড্ডা, ভ্রমণপিপাসা, অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে অ্যাডভেঞ্চারে ঝাঁপিয়ে পড়া, চরিত্রগুলিকে আলাদা মাত্রা দিয়েছে। যা বাংলা কিশোর সাহিত্যে জুড়ি মেলা ভার। লেখক কাহিনিতে অতিরঞ্জিত বর্ণনা না করে, স্বাভাবিক যুক্তিবোধ আর কমেডি-মিশ্রিত অ্যাডভেঞ্চারের মধ্য দিয়ে এই চারমূর্তিকে পাঠকের সামনে হাজির করেছেন।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নানা অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপ ও ধর্মীয় ভণ্ডামিতে দেশ ছেয়ে যাচ্ছিল। সমাজতাত্ত্বিক বীক্ষণের চালচিত্রে টেনিদা'দের এই অভিযান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তখনকার বাঙালির কাছে দক্ষিণ বিহার, রাঁচি, হাজারিবাগ, উত্তরবঙ্গ, ডুয়ার্স, কিংবা দার্জিলিং ছিল হাওয়া বদলের জন্য আদর্শ স্থান। কাহিনিতে ভৌতিক পরিবেশের বর্ণনা, প্রাকৃতিক শোভা-দর্শন আর সর্বোপরি রহস্যের জাল ভেদ চোরাকারবারীদের বেআইনি জাল নোটের কারবার, ভণ্ডসাধুদের ধর্মীয় মোড়কের আড়ালে নানা অপসামাজিক ক্রিয়াকলাপ ও সমকালীন আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বাঙালি মননকে প্রতিবাদী করে তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে চারমূর্তির আহারাদির

মধ্য দিয়ে কমেডির উপাদান দিয়ে অ্যাডভেঞ্চারকে এক পৃথক বৈশিষ্ট্যে উপনীত করেছেন লেখক। যার মধ্যে থেকে পাঠকেরা এক ভিন্নধর্মী অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ পেয়ে থাকবেন নিঃসন্দেহে।

তথ্যসূত্র :

১. অশোক সেন (সম্পা:), 'অ্যাডভেঞ্চারের গল্প', কলকাতা, শিশু সাহিত্য সংসদ, ২০০০, পৃ. ৬
২. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'চারমূর্তি', 'টেনিদা সমগ্র', প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় (সং. ও সম্পা:), কলকাতা, আনন্দ, ২০১৬, পৃ. ১৫
৩. তদেব। পৃ. ১৫
৪. তদেব। পৃ. ১৫
৫. তদেব। পৃ. ৩৩
৬. তদেব। পৃ. ৮০
৭. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'চার মূর্তির অভিযান', 'টেনিদা সমগ্র', প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় (সং. ও সম্পা:) কলকাতা, আনন্দ, ২০১৬, পৃ. ৮৯
৮. তদেব। পৃ. ৮৯
৯. তদেব। পৃ. ১১৮
১০. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'কম্বল নিরুদ্দেশ', 'টেনিদা সমগ্র', প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় (সং. ও সম্পা:), কলকাতা, আনন্দ, ২০১৬, পৃ. ১৫০
১১. তদেব। পৃ. ১৮৩
১২. তদেব। পৃ. ১৮৪

মহানুভবতার মাধুর্য ও ‘গড়ালবাড়ি’

সুভাষ চন্দ্র দাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
দিনহাটা কলেজ, কোচবিহার

সারসংক্ষেপ : জীবনের বিচিত্র বৈভব যেমন আছে তেমনি তার বহুমাত্রিক জটিলতাও তাকে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা দান করে। একটা জীবনালেখ্য একাধারে যেমন মানব সমাজের যুগ যুগান্তরের কথা হয়ে ওঠে তেমনি তা একটা সামাজিক সত্তাকেও নির্দিষ্ট করে। একদিকে কিছু লোকের প্রভূততম উচ্চাকাঙ্ক্ষা আবার তারই বিপরীতে প্রচুরতম নিরীহ মানুষের সাধারণ চাওয়া-পাওয়ার পরিসর এবং অবশেষে আশা থেকে হতাশা অতিক্রম করে বিদ্রোহী হয়ে ওঠা।আর এ প্রসঙ্গে গল্পকার অসীম রায়ের ‘গড়ালবাড়ি’ গল্পটি মানুষের সেই সামাজিক পরিচয়ের সাথে সাথে তার মানবিক মাধুর্যকেও বিমূর্ত করে তোলে।জীবনের যন্ত্রণার মধ্যে থেকেও তার সত্য – সুন্দর রূপটিকে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি অনাবিল মহত্ত্বের অবিমিশ্র মোহ দিয়ে।
শব্দ সূচক : মাধুর্য - প্রতিবাদ - আন্দোলন – মহত্ত্ব – মানবতা - ‘গড়ালবাড়ি’।

মূল প্রবন্ধ :

জীবনযাপনে সম্পর্কের যান্ত্রিক জটিলতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আশা থেকে হতাশা, জীবনকে বেশি করে পেতে গিয়ে তার মানেটাকেই হারিয়ে ফেলার ব্যর্থতা প্রভৃতি নানা দিক মানুষের জীবনকে যেমন বিড়ম্বিত করে তেমনি তার সমাধানের অবসরে মানব মনের স্বচ্ছন্দ গতিও নির্দিষ্ট হয়।বস্তুত, মানুষ যদি আত্মমগ্ন হতে ভুলে যায় তাহলে তার সঙ্গে একটা সামান্য কীটেরও কোনো ভেদ থাকে না। আসলে বেঁচে থাকার মানেই তো মগ্ন চৈতন্যের নিরবচ্ছিন্ন অভিসার। আর এই যে অস্তিত্বের অভিসার তথা চৈতন্যেরগুরুত্ব তা থেকেই মানুষের জীবনের বিবিধ প্রতিবাদ - আন্দোলন - রাজনীতি - সমাজনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়েরসার্বিক সংস্থান।আর এই মানবিক সংস্থানের আধারে গল্পকার অসীম রায়ের ‘গড়ালবাড়ি’ গল্পটি এক স্বতন্ত্র সংযোজন।

‘গড়ালবাড়ি’ (প্রথম প্রকাশ - ‘দেশ’, ১৯৭৫) গল্পে দেখা যায় যে, একটা আন্দোলন, একটা প্রতিরোধ, নির্দিষ্ট গন্ডিতে আবদ্ধ হলেও সব হারানো কিছু মানুষের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটা মানবিক বিপ্লব বিধৃত হয়েছে প্রাক্তন ‘কমরেড অমিতা’ ওরফে এক প্রতিষ্ঠিত ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদক অমিতাভ বোসের স্মৃতি বিজড়িত সময়ের কথায়। উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি শহর থেকে বাইশ মাইল দূরে অবস্থিত মুসলমান অধ্যুষিত গ্রাম গড়ালবাড়ি। ইংরেজী দৈনিকের সম্পাদক অমিতাভ বসুর প্রথম যৌবনের পিঠস্থান এই গড়ালবাড়ি। অমিতাভ তার সম্পাদকীয়ের শব্দ চয়ন করতে

করতে এক প্রকার বিমর্ষ হয়ে পড়েন পাঁচ বছর আগের নিজেকে ভেবে। পাঁচ বছর আগে ফরিদপুরের ইস্কুল মাস্টারের ছেলের পক্ষে যা যা করা সম্ভব তিনি তা সব করেছেন। হুগলীর গ্রামে প্রাইমারি স্কুলে মাস্টারি, মাঝে মাঝে কবিতা লেখা, জলপাইগুড়ি কর্মাস কলেজে লেকচার দেওয়া - এগুলো সবই তাঁর বাবার কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করতে করতেই হয়ে গেছে। এগুলো তাঁর ভাবনার মধ্যে আসলেও গাঁয়ের স্কুলে পড়ানো কিংবা কর্মাস কলেজের চেয়ার ও টেবিল ভাঙা ছেলেদের সামলানো তাঁর কাছে স্বাভাবিক ঠেকলেও কাগজের সম্পাদকীয় লিখতে গিয়ে নিজেকে কিছুটা বেমানান মনে হয় তাঁর। কালের গতি যদি আরো খানিকটা সরল হতো তাহলে তিনি হয়ত গড়ালবাড়িতেই থেকে যেতে পারতেন এবং সেটা হলে তাঁর মন ও প্রাণ দুই-ই শান্তি পেত।

অমিতাভর কাছে জলপাইগুড়ির কর্মাস কলেজে পড়ানোটা ছিল একটা ছুতো। আসল উদ্দেশ্য ছিল গড়ালবাড়ি। এক প্রবল অহঙ্কারের বশে রাজনীতি করতে নেমেছিলেন তিনি। চাষী ও মধ্যবিত্তের মাঝখানে যে অনড় দেয়াল তা ভেঙে ফেলাই ছিল তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য। তাই কলেজের কাজ কোনো রকমে শেষ করে বাইশ মাইল সাইকেল চেপে পৌঁছে যেতেন তাঁর স্বপ্নের গড়ালবাড়িতে। পাল্টে যাওয়া তিস্তার খাতের কাছে দেবদারু, শিমুল আর অর্জুনের ফাঁকে তাঁর নিজের তৈরি স্কুলবাড়ি এবং আরো খানিকটা দূরে চীনেবাঁশের ঝোপ আর শিমুলছিটানো যে চারশো বিঘে জমি সেখানেই তাঁর কাঙ্ক্ষিত স্বর্গ। সেই চারশো বিঘে জমি সেখানকার কিষানসভা ছিনিয়ে নিয়েছেনবাবের দখল থেকে।আর এই ছিনিয়ে নেবার আন্দোলনে অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন তিনি। অমিতাভ বসু অর্থাৎ ‘কমরেড অমিতা’র নেতৃত্বেই এক সময় জেগে উঠেছিল গড়ালবাড়ি অঞ্চলের অতিসাধারণ মানুষগুলি।

গত পাঁচ বছর অমিতাভ এ অঞ্চল ছেড়ে অন্যত্র ইংরেজী দৈনিকের সম্পাদক।কিন্তু যেখানে যেভাবেই থেকেছেন বছরান্তে অন্তত একবার তিনি পাড়ি দিয়েছেন গড়ালবাড়ি। ছুটে গিয়ে উঠেছেন তাঁর বন্ধু শইমুদ্দিনের কাছে। শইমুদ্দিন বাঙালি চাষী হলেও তার ব্যক্তিত্ব কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির। তেভাগার আমল থেকে সে পার্টির অনেক উত্থান পতনের সাক্ষী হয়েছে।এক রাতের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে অমিতাভ বলছেন –

> “মনে আছে ভোটের আগের এক রাত। মেঝের ওপর বাঁশের মাচায় পুরু করে খড় পাতা। তার ওপর কম্বল পেতে উত্তরবাংলার নিত্যসঙ্গী আমার দাদুর দেওয়া গলাবন্ধ অলেস্টার চাপিয়ে শুয়েছি। মাঝরাতে শইমুদ্দিন একটা ভোজালি আমার বালিশের নীচে গুঁজে দিয়ে গেল। শহর থেকে গাড়ি নিয়ে আসার সমস্ত পথ রুদ্ধ করা হয়েছে রাস্তার এ-মোড় ও-মোড় বিশাল নালা খুঁড়ে, গাছ ফেলে। কারণ এই রাতেই সচরাচর শহরের

> বাবুরা আসেন জীপে ভোট কিনতে। তাই সব পথ বন্ধ এবং পাহারা, কিন্তু সাবধানের মার নেই। সেজন্য আত্মরক্ষার এই ব্যবস্থা।”[১]

গড়ালবাড়ির জীবনে রাজনীতির এই চাপা উত্তেজনাময় অবস্থা একদিন তিনি নিজে থেকে উপলব্ধি করেছেন, চাষীদের মজুরদের সঙ্গে নিজের রক্তের ধারাকে মেলাতে চেয়েছেন। আর পরবর্তীতে সম্পাদক হিসেবে বামপন্থীদের মধ্যে মতান্তর, শাসকদের অন্তর্দ্বন্দ্ব, রাজনৈতিক জগতে নৈতিক মানোন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি নানা বিষয়ে একটা চটকদার সম্পাদকীয় লিখে রোজ সকালে টাটকা পরিবেশন করেছেন।সরকারী ঋণ পাওয়ার জন্য দরখাস্ত, ধরাধরি, চোখ রাঙানো, প্রয়োজনে ডাক্তারি প্রভৃতি সমাজ ও জীবনের নানা খুঁটিনাটি দিয়ে ভরে উঠেছিল তাঁর প্রতিদিনের হিসেব-নিকেশ।কিন্তু এককালে ‘গড়ালবাড়ির পীর’ হিসেবে তাদের সমস্ত উৎসবে, শোকে জড়িয়ে থেকে যে আত্মসুখ অনুভব করতেন একসময় তা আর সম্ভব হয় না।

লক্ষণীয়, এই গড়ালবাড়ির হিসেব-নিকেশকেই কিছুটা হলেও ওলোট পালট করে দেয় বন্যার তিস্তা। টিনের চালের ওপরে বসে সারা রাত ধরে জলের তান্ডব সহ্য করেও তাঁর মন ভাঙে না। কিন্তু যখন দেখা যায় দশ বছর ধরে লেখা গড়ালবাড়ির ডায়েরিটাও কাদায় মাখামাখি তখন তাঁর মনটা খারাপই হয়। তাঁর লেখক সত্তা আহত হলে বিমর্ষতাই প্রাধান্য পায়। বন্যা এসে তাঁর ডায়েরিটার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকেও যেন অনেকখানি ভাসিয়ে নিয়ে যায়। অবশ্য সেই বন্যার জলেই শেষ বারের মতো জেগে ওঠেন তিনি। প্লাবনের দিন তিনেক পরেই ভোরবেলা ছুটে এসে শইমুদ্দিন শোনায় –

> “আমাদের পাশের গ্রাম দিয়ে তিস্তা বাঁক নিয়েছে দু’শো ঘর বাস্তহারার দরমার বেড়া ভাসিয়ে। সেই বানে ভাসা জোয়ান মরদ, বুড়োবুড়ি, শিশু আমাদের নবলব্ধ নবাবের জমিতে আশ্রয় নিয়েছে। গ্রামে প্রচন্ড বিক্ষোভ। এখনই খুনোখুনির সম্ভাবনা।”[২]

এই কথা শোনামাত্র অমিতাভ গড়ালবাড়ির তরুণদের সামিল হওয়ার হুকুম দেন। নিজে ছুটে যান তড়িঘড়ি। এদিনের অভিযানের কথা বলতে গিয়ে অমিতাভ জানিয়েছেন –

> “আমার রাজনৈতিক জীবনে এরকম অন্তর্দ্বন্দ্বের মাঝখানে আমি কখনও পড়িনি। বামপন্থী পার্টির আভ্যন্তরীণ লড়াই, যা অনেক কমরেডের মাথা প্রায় খারাপ করে দিয়েছিল, তা আমাকে খুব গভীরভাবে স্পর্শ করেনি। তার চেয়েও বেশী করুণ অবস্থা, যাদের জন্যে আমরা লড়ছি, তাদের মধ্যে ভেদ।”[৩]

কেননা সেদিন যখন ছুটে গিয়ে তিনি গড়ালবাড়িতে পৌঁছলেন তখন সেখানকার দৃশ্য দেখে তিনি বাকরুদ্ধ হয়ে যান। তখন দুপুর তিনটে -

> “খোলা উনুনগুলোয় ভাত ফুটছে। আর কিছু লোক খেতে বসেছে। সেই বানে ভাসা শিশু-রমণী-বৃদ্ধের দল আমার দিকে

> স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।তাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ আলাদা করে খেতে বসেছে। কলায়ের থালা থেকে সদ্যনামানো ফেনা ভাতের ধোঁয়া উঠছে।আমি সামনে এগিয়ে গিয়ে থালার দুদিকে দুপা দিয়ে গর্জন করে উঠলাম, 'এক ঘন্টার মধ্যে এখান থেকে হটে যেতে হবে।' বৃদ্ধ আমার লুঙ্গির পাশ দিয়ে ঢালের নীচে চেয়েছিল যেখানে শইমুদ্দিনের সঙ্গে গড়ালবাড়ির তরুণের দল লাঠি, সড়কি হতে দাঁড়িয়ে। আরও এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে আমি ফিরলাম। সেদিন সন্ধের আগেই নবাবের জমিতে আমাদের ছেলেরা কাজে ফিরে গেল।"[৪]

সেদিনের সেই অমানবিক ঘটনাটাও অমিতার গড়ালবাড়ি থেকে বিদায়ের ক্ষণ নিশ্চিত করার পক্ষে অনেকটাই ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। অবশ্য অমিতাভ এই ঘটনার জন্য নিজের মনে প্রবল বেদনার সঙ্গে এই ভেবে গর্বও অনুভব করেন যে, শইমুদ্দিনদের তিনি ঠকাননি।

পৃথিবীতে কিছু লোক মিসফিট থাকবেই, ধনতান্ত্রিক সমাজেও আছে, সমাজতান্ত্রিক সমাজেও থাকবে। খবরের কাগজের অফিসে কাজ করতে করতে অমিতাভ বোসের মাঝে মাঝে এমনটাই মনে হয় এবং তিনি নিজেকেও কখনো কখনো সেই দলের মনে করেন।বাল্য স্মৃতি ঘাই মারে মনের মধ্যে।যৌবনের গড়ালবাড়ি একপ্রকার বন্যার মতো প্লাবিত করে তাঁর মনকে। তাই বছরান্তে জানুয়ারী মাস এলেই তিনি পাড়ি দেন গড়ালবাড়ি। গিয়ে ওঠেন শইমুদ্দিনের কাছে। তাঁর প্রতি - শইমুদ্দিনের একরোখা টান তিনি উপেক্ষা করতে পারেন না। এবার আটান্ন বছর বয়সে শইমুদ্দিন আবার সন্তানের জনক হয়েছে।তাঁর মায়ের তৈরি করে যাওয়া একটা নক্সীকাঁথা নিয়ে তাই হাজির হয়েছেন শইমুদ্দিনের বাড়ি। এবারের যাত্রায় শইমুদ্দিন তাঁকে যেন আরেক ভুবনের অন্য মানুষের সন্ধান দিল। অমিতাভ গড়ালবাড়ি পৌঁছে সেদিন দেখেছিলেন শইমুদ্দিন বাড়ি নেই, তাকে এগিয়ে নিয়ে আসার জন্য শহরে গিয়েছে। অবশেষে তাঁকে না পেয়ে শইমুদ্দিন মাঝরাতে কাঁধে একটা কালো বাছুর নিয়ে ফিরে আসে। বাছুরের চোট লাগতে পারে বলে সে বাসে চড়েনি। শহর থেকে আরও ষোল মাইল উজিয়ে শোভার হাট থেকে বাছুর কিনে এত মাইল বাছুর কাঁধে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরেছে সে।অমিতাভর অনেকদিন পর আবার কথা জমেছে তার। এবং এই আলাপের সূত্রেই উঠে আসে দুঃখের কথা। কেননা নবাবের লোকেরা আবার জমি কেড়ে নিয়েছে তাদের।অমিতাভ তাই পরামর্শ দেয় যে, এবার থেকে তাদের নিজেদেরই আন্দোলন করতে হবে এবং এসব নানা রকম আলাপ আলোচনা শেষে ঠান্ডায় এক প্রকার জড়োসড়ো হয়েই শুয়ে পড়ে অমিতাভ।শইমুদ্দিন বলে শুয়ে পড়তে, কিন্তু সে নিজে অন্ধকার শীতে বসে থাকে। তারপর অনেক রাতে শইমুদ্দিন এসে অমিতাভকে ডেকে তুলে বলে - 'তোমার কম্বলটা দেবে?' শইমুদ্দিনের প্রশ্নে তিনি অত্যন্ত লজ্জিত বোধ

করেন। তার ছোট ছেলেটি যে শীতে প্রচন্ড কষ্ট পাচ্ছে, এটা তার আগেই ভাবা উচিত ছিল।প্রবল আত্মগ্লানিতে লাফিয়ে উঠে অমিতাভ তার কম্বলটি শইমুদ্দিনের হাতে তুলে দেন।শইমুদ্দিন কোনো কথা না বলে কম্বলটি নিয়ে বেরিয়ে যায়। অমিতাভও তার ছেলেটিকে দেখার জন্য ঝাঁপ সরিয়ে বেরিয়ে আসেন। এবং পরবর্তীতে অবাক বিস্ময়ের মুহূর্তটিকে ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি জানান –

> “কিন্তু শইমুদ্দিন কোন দিকে চলেছে? লম্বা হাতে সে পাশের ঘরে না ঢুকে দাওয়া পেরিয়ে এগোতে থাকে। আমিও সঙ্গে সঙ্গে এগোই।এবার স্পষ্ট বুঝতে পারি, সে ভেতরের দিকে বাঁধা বাছুরটার দিকে এগোচ্ছে। লম্পটা দেওয়ালের আংটায় লাগিয়ে সে আমার কম্বলখানা আষ্টেপৃষ্টে ঢাকা দিয়ে তার চারপাশের খুঁটি বাছুরের পায়ের সঙ্গে বেঁধে দিতে থাকে।আটান্ন বছর বয়সে সর্বপ্রথম সে একটা এঁড়ে বাছুরের মালিক।”[৫]

আসলে ‘গড়ালবাড়ি’ একটা আন্দোলন, একটা হৃদয়বৃত্তীয় দ্বীপ আবিষ্কারের মতোই তা সত্য। লেখক অসীম রায় তাঁর নিজ জীবনের অন্তরিক অভিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দিয়েই ‘কমরেড অমিতা’ তথা অমিতাভ বোসের গড়ালবাড়ি, শইমুদ্দিন আর সেখানকার মানুষগুলিকে চিনিয়ে দিয়েছেন।বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের নানা পরিবর্তনশীল সংঘাত আর চিন্তা চেতনার বৈভব ও আদর্শকে যুগধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে চেয়েছেন। জীবনকে অনুসন্ধান করা, বাস্তব জগতের ঘটনাকে বিশ্লেষণ করা, প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধের তুল্যমূল্য নির্দিষ্ট করা প্রভৃতি জীবন জিজ্ঞাসার আবহ দিয়ে রচনা করেছেন তাঁর ‘গড়ালবাড়ি’।

তথ্যসূত্র:

১। অসীম রায়, ‘গড়ালবাড়ি’, ‘গল্প সমগ্র-১’, উজ্জ্বল রায় কর্তৃক সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, এপ্রিল ১৯৯৪, পৃষ্ঠা ৩৩৪

২। তদেব, পৃষ্ঠা ৩৩৬

৩। তদেব, পৃষ্ঠা ৩৩৭

৪। তদেব

৫। তদেব, পৃষ্ঠা ৩৪৬

আকর গ্রন্থ:

১। অসীম রায়, ‘আধুনকি ছোটগল্প গল্পমালা/১ - অসীম রায়ের ছোটগল্প’,‘লেখকের জবানবন্দী’, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-১৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ১৯৯২।

২। অসীম রায়, ‘গল্প সমগ্র-১’, উজ্জ্বল রায় কর্তৃক সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, এপ্রিল ১৯৯৪।

৩। অসীম রায়, ‘রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর উত্তরাধিকার’, স্বরলিপি, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৮৬।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। অলোক রায়, ‘বিশ শতক’, প্রমা প্রকাশনী, ৫ ওয়েস্ট রেঞ্জ-এলগিন, কলকাতা – ১৭, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১০।

২। স্বপন দাসাধিরী (সম্পাদনা),‘অসীম রায় : ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিগত’, জলার্ক প্রকাশন, হাওড়া- ৭১১৩০৬, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৯৬।

৩। তপোধীর ভট্টাচার্য, ‘ছোটগল্পের বিনির্মাণ’, অঞ্জলি পাবলিশার্স, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা - ৯, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, জুলাই ২০০৬।

সহায়ক পত্র-পত্রিকা:

১। ‘কথাসাহিত্য : কিছু প্রশ্নোত্তর’, ‘পিলসুজ’, সংখ্যা ৯, পৌষ ১৩৮৩।

২। ‘কোরক’ সাহিত্য পত্রিকা, ছোটগল্প সংখ্যা, বিশেষ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৯৫।

৩। অলোক রায়, ‘অসীম রায় : কালান্তরের কথাকার’, ‘সাহিত্য ও সংস্কৃতি’, ‘বাংলা ছোটগল্পের মূল্যায়ণ’, বিশেষ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন এবং জুলাই-সেপ্টেম্বর, যুগ্ম সংখ্যা, ১৯৯৯।

একুশ শতকে সমাজ ও নারী অভিজ্ঞতার প্রতিফলন : বিনতা রায়চৌধুরীর নির্বাচিত ছোটগল্প

সুস্মিতা মুখার্জী
স্বাধীন গবেষক ও প্রাবন্ধিক

সারসংক্ষেপ : যে সামাজিক সংস্কার বা নিয়ম নারীসমাজকে নিপীড়িত, নির্যাতিত করে তা কেবল নারীর ক্ষতি করে না, পুরো জনগোষ্ঠীর জীবনকেই বিপন্ন করে তোলে। ফলে মানবিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রগতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যা আজকের দিনেও ঘটে চলেছে। ঘরে-বাইরে নারীর শারিরিক-মানসিক নির্যাতন এখনও দৈনন্দিন ঘটনা। তবে ক্রমশ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নারীর যে চিত্র পিতৃতান্ত্রিক সমাজ এঁকেছে তা বর্ণহীন হয়ে আসছে। নারীর স্বতন্ত্র স্বকীয়তায় গড়ে উঠছে আর এক "মানবী"। বিনতা রায়চৌধুরীর ছোটগল্পে বর্তমান সময়ের নারীর সে অভিজ্ঞতাগুলো বর্ণময় রুপ পেয়েছে।

মূল আলোচনা

জীবনের কিছু কিছু অভিজ্ঞতা-উপলব্ধির অংশীদার নারী-পুরুষ উভয়েই সমভাবে হলেও এমন কিছু কিছু অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি আছে যা, দুজনের দু'রকম। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র অর্জনের পথে নারীকে বহু অনভিপ্রেত ও অনাকাঙ্ক্ষিত সত্যের মুখোমুখি হতে হয়েছে এবং আজও হতে হচ্ছে। অন্দরের সংকীর্ণ গণ্ডি ছেড়ে ধীরে ধীরে সদরের বৃহত্তর জগতের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়েছে। আর তবেই সে জগতের সঙ্গে পরিচিতি ঘটেছে। "কারণ নারী সমাজে তার যথাযোগ্য মর্যাদা কবে পেয়েছে বলা কঠিন সৃষ্টির আদিপর্ব থেকে পুরুষ সমাজ পরিচালনা করছে নারী তার সহচরী।"[১] চিত্রা দেব এর এই বক্তব্যে সমাজে নারীর অবস্থানটা স্পষ্ট হয়ে যায়। কাজেই মেয়েদের পুরুষতন্ত্র নির্ধারিত জগত থেকে বেরিয়ে অনেক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ছেলেদের জগতে অংশীদার হয়ে শিক্ষা-সংস্কৃতি-রাজনীতিতে সমানভাবে শরিক হতে হয়েছে।

আজকের সময় আধুনিকতার পালে হাওয়া লাগিয়ে দ্রুতগতিতে ধাবমান। দ্রুত নগরায়ন, স্বার্থকেন্দ্রিকতা, অর্থনীতি, উদ্দাম যৌনতা, আত্মসংযমের অভাব, ভোগ্য পণ্যের মাদকতা, আগ্রাসী লোভাতুরতা সমাজ, পরিবার ও মানুষের মূল্যবোধে গভীর প্রভাব ফেলছে। যার প্রতিফলন ঘটছে ব্যক্তিগত সম্পর্কেও। ক্রমশ যেন যান্ত্রিকতার মোড়কে আটকে যাচ্ছে জীবনের সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর অনুভূতিগুলো। বদলে যাচ্ছে সমাজ। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়েই চলছে মেয়েদের ঘরে বাইরে সংগ্রাম। যখন মেয়েরা আজ গোটা বিশ্বে তাদের সক্ষমতার ছাপ ফেলছে, ছুঁয়ে ফেলেছে আকাশটাকে, তখনো ক্রমান্বয়ে তাদের এক বড় অংশকে অত্যাচারের শিকার হতে হচ্ছে। অবাধে চলছে তাদের উপর

ঘরে-বাইরে শারীরিক-মানসিক পীড়ন। যা সমাজের এগিয়ে চলার পথে বাঁধার সৃষ্টি করে চলেছে।

বড় বিস্ময় জাগে সত্যিই কি এগিয়েছি আমরা? নারীর উপর অত্যাচার, বধূ হত্যা, কন্যাভ্রুণ হত্যা, ধর্ষণ প্রভৃতির মত ঘৃণ্য অপরাধ বর্তমান সময়েও ঘটে চলেছে। যা বড়ই চিন্তিত করে তোলে। তবে অনেকক্ষেত্রেই নারী আজ সচেতন হয়ে উঠেছে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রথাগত ছককে অস্বীকার করে বেরিয়ে আসছে। যার প্রকাশ ঘটছে সাহিত্যেও। সাহিত্য তো সমাজেরই দর্পণ। সেখানে সমাজের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ভাষা পায় প্রতিবাদী স্বর। মল্লিকা সেনগুপ্ত এই প্রসঙ্গে বলেছেন- "নারীর জন্য নির্দিষ্ট মাতৃত্ব - গৃহস্থালি - যৌনতা - গৃহশ্রমের ওই ছকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ছক ভেঙে বেরিয়ে আসার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নারীর নতুন প্রতিকৃতি নির্মাণ হয়। এবং তার ছাপ সাহিত্যেও পড়ে।"[২]

বিনতা রায়চৌধুরীর বাংলা ছোটগল্পে বর্তমান শতকে সমাজে হয়ে চলা নারীর শারীরিক - মানসিক নির্যাতন যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমনি নারীর ছক ভেঙে নিজ জীবনে এগিয়ে চলার চিত্রও অঙ্কিত হয়েছে।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী তো বরাবরই ভোগ্যপণ্য। বর্তমান সময়েও সবচেয়ে বেশি বিকোয় নারীর শরীর। নারীর পন্যায়নও খুব সহজেই হয়। নারীর দেহ নিয়ে চলে অর্থ উপার্জন। বিনতা রায়চৌধুরীর "উজান রাগিনী" গল্পে যা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। ক্ষুধার অন্নও জোগাড় করতে হয় শরীর দিয়ে যার শিকার হয়েছে তাঁর "মেলোডি" গল্পে এক শিশুকন্যা।

"আমাদের দোতলায় যে লোকটি থাকে, সে একদিন সন্ধেবেলা সিঁড়ির নিচে একা পেয়ে আমাকে..., আমার এত লাগল। আমি ককিয়ে উঠলাম। সে সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখে হাত চাপা দিল। তারপর বলল, বোকা মেয়ে, কাঁদছিস কেন? রাতের বেলা সিঁড়ির নীচে এখানে দাঁড়িয়ে থাকিস, তোকে দশ টাকা দেব।"[৩]

যৌন নিগ্রহ, যৌন হয়রানি, যৌন উৎপীড়ন- শব্দগুলি সংবাদপত্র, টেলিভিশন, সোশ্যাল মিডিয়া খুললেই চোখে পড়ে যে অ্যাবিউস করছে সে ভাবেই না মেয়েটির উপর অন্যায় করছে কারণ মেয়েটা তো মানুষ নয়, যেন খেলনা।

নারীর বহুমাত্রিক সমস্যার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হল নিরাপত্তাহীনতা। নারীর বিপন্নতার কারণ লিঙ্গ পরিচয়ে সে নারী বলেই। তার সবথেকে নিরাপদ আশ্রয় পিতা-মাতা। কোন লিঙ্গ সেখানে বিচার্য নয় যতক্ষণ না সমাজ, অর্থনীতি সেখানে প্রবেশ করছে। যখই লাভ-ক্ষতির হিসাব শুরু হয়ে যায় তখনই একদিকে পুত্র সন্তানের পাল্লা ভারী হতে থাকে আর কন্যা সন্তান চলে যায় লোকসানের খাতায়। কারণ পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারীকে বরাবরই সামাজিক অধিকার ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে রেখেছে। আজকের সময়েও পরিবারে, সমাজে পুত্র সন্তানেরই কদর বেশি। শিশুকন্যা

অবহেলার বস্তু। তাই তো বিনতা রায়চৌধুরী "নষ্টকুসুম" গল্পে রুপার কন্যাসন্তানের জননী হওয়ার সাধপূরণ হয়না। তার সংসার কন্যাসন্তান চায়না, তাতে কেবল ক্ষতি।

"দেখ নাতবউ, তোকে একটা কথা বলি। মেয়ে জন্মানোর অনেক জ্বালা। তাকে সাবধানে বড় করে তোলো, মানুষ করো, তারপর ভালো ছেলে খুঁজে তার বিয়ে দাও। তার সঙ্গে আবার পণ হিসেবে সর্বস্ব ঝেড়ে ঝুড়ে দাও। কোনও লাভ নেই।"[৪]

পুত্র না হলে তো বংশরক্ষা হয়না। সামাজিক নিয়ম অনুযায়ী বিবাহের পর কন্যার উপর কোন অধিকার থাকে না পিতা-মাতার। সেইসঙ্গে তাদের বার্ধ্যকের ভরসাও পুত্রসন্তান, যে সমাজ নির্ধারিত পরিবারের ভবিষ্যৎ কর্তা। কন্যাসন্তান কেবল খরচের খাতায়। লাভ-ক্ষতির হিসাবে সমাজে, পরিবারে পুত্র-কন্যার ভেদ বরাবরই ছিল, যা আজও স্পষ্ট। তাইতো "বিকিকিনি" গল্পে দেখি বাবা-মা পুত্রের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করে কন্যার বিনিময়ে। ছেলের শখ পূরণের জন্য মেয়েকে ভাসিয়ে দেয় এক অন্ধকার জগতে। চন্দ্রার স্বপ্ন থেকে যায় অধরা।

সংসারে নারীর চাওয়া-পাওয়া তো দূর মানুষ হিসেবেই তাকে গণ্য করা হয় না। এই সময়ে দাঁড়িয়েও নারী গর্ভধারণ করতে চাই কিনা বা কতবার চায় সে সম্বন্ধে তার মত প্রায় গ্রাহ্যতা পায়না বললেই চলে। পুত্রসন্তানের জন্ম না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী নিরন্তর আশঙ্কায় ত্রস্ত থাকে। সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মায়ের মতামত কোনো গুরুত্ব পায় না। আসলে সন্তান তো অনেক পরের কথা, আমাদের আইন অনুযায়ী বিবাহিত নারীর অভিভাবক তার স্বামী আর অবিবাহিতার বাবা। সে কখনই স্বাধীন নয়। সুতরাং সন্তানের ক্ষেত্রে অভিভাবকত্বে বাবার অধিকার প্রায় নিরঙ্কুশ আর যে মা শরীরে বহন করে সন্তানকে জন্ম দিল, তার কোন দাবি নেই। এখনও বেশিরভাগ পরিবারে সন্তানের যেকোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয় অভিভাবক স্বরূপ বাবাই। তাইতো "হীরের বোতাম" গল্পে মৃত্তিকা নিজের ছেলেকে কাছে পায় না কারণ তার স্বামীর কথায় ছেলে তার কাছে থাকলে কোন ম্যানার্স শিখতে পারবে না।

যেখানে নারীর অন্ন সংস্থান করে স্বামী ও শ্বশুর বাড়ি সেখানে স্বামীই প্রাধান্য পায় দম্পতির অবস্থানে। বধূর পোষ্যতাই তার বশ্যতাকে বাধ্যতামূলক করে তোলে। যার প্রকাশ পায় "এক গৃহবধূর চিঠি" গল্পের বন্দনার কথায়-

"জানো তো বউদি, বউয়ের চাকরি করা ও একেবারে পছন্দ করে না। বলে হাতে টাকা থাকলে বিগড়ে যায় মেয়েমানুষ। তখন নাকি আর মেয়ে মেয়ে থাকে না। কেমন যেন 'মানুষ মানুষ গন্ধ বেরোয়'।"[৫]

সমাজে এখনো নারীর এই রূপটিই স্বীকৃত; সে পুরুষের তুলনায় হীন। স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির উপরে একান্ত নির্ভরশীল ও আশ্রিত। সমাজ এই আয়োজিত নির্ভরশীলতাকে ব্যবহার করে চলেছে নারীকে অধীনে রাখার প্রয়াসে। অনেক ক্ষেত্রে নারী নিজ মনে দীর্ঘ লালিত সামাজিক মূল্যবোধ থেকেও বেরিয়ে আসতে পারে না। যা আদর্শ স্বরূপ তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে পৌঁছে দিয়েছে সমাজ। সংসারে পুরুষ যথেচ্ছাচার করতে

পারলেও নারীকে থাকতে হবে আদর্শে অটল। যার ফলস্বরূপ বয়ে বেড়ায় অসুখী দাম্পত্য যা দেখি “শ্বেতসায়র” গল্পে রাকা ও “অপচয়” গল্পে সুমনার জীবনে।

সমাজের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক নিরাপত্তার কারনেও নারীকে বেছে নিতে হয় পুরুষের আশ্রয়। আর যেখানে নারী আর্থিকদিক থেকে স্বাধীন সেখানেও সে নিজের উপার্জিত অর্থে বেশিরভাগক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অধিকার পায়না। যা আজও হয়ে ছলেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে বাপের বাড়িতে সাহায্য করতে পারে না। যদিও বা করে স্বামীর অনুমতি নিয়ে এবং কুণ্ঠার সঙ্গে। স্বামীর মত না থাকলে ঘটে বিবাদ যা ঘটেছে “ঘর নেই” গল্পে রিমির জীবনে। যে কারণে তাকে খুঁজতে হয়েছে থাকার আলাদা বাসস্থান। আসলে অধিকার একতরফা পুরুষের। এইখানেই বৈষম্যের ভিত্তি, সমস্যার বীজ। সমাজে একা নারী এখনও নিরাপত্তাহীন। তাই স্বামীর সঙ্গে আপোষ করে থাকতে বাধ্য হয়েছে রিমি।

একদিকে যেমন চলছে নারীর প্রতি লাঞ্ছনা, অবমাননা, অপমান তারই পাশাপাশি পিতৃতান্ত্রিক এই পটভূমিতে দাঁড়িয়ে নারীবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে জেগে ওঠা নতুন আলোয় নারীর ছকে বাঁধা ভূমিকা ভাঙার চেষ্টা শুরু হয়েছে। পাশাপাশি ছকে বাঁধা ভূমিকা গুলিকে প্রশ্ন করতেও শুরু করেছে। শুরু হয়ছে নারীর নতুন অভিজ্ঞতা। এই নতুন অভিজ্ঞতার বর্ণময় প্রতিফলন দেখা যায় “তুমিই সে”, “চিনি নাই তারে” “কস্তুরী” গল্পে। নারী চাইছে মাতৃত্ব নিরপেক্ষ যৌনতা। যেখানে নিজের অস্তিত্বের অর্ধাংশ খুঁজে নিচ্ছে মেয়েরা। পাশে থেকে নিজের নির্বাচিত জীবনসঙ্গীকে গড়ে তুলছে, তাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে যেন বদ্ধপরিকর।

“সারা জীবন মানুষ যা খোঁজে - আস্থা বিশ্বাস নির্ভরতা। নিজের অস্তিত্বের অর্ধাংশ - সত্তার অর্ধাংশ সবাই তো পায় না। আমি পেয়েছি। চৈতালি এই - ই সে।”[৬]

পুরুষতন্ত্র ও বিশ্বায়নের আগ্রাসী যাত্রাপথে আমরা বিনতা রায়চৌধুরীর ছোটগল্পে খুঁজে পেয়েছি নারী কণ্ঠের গুরুত্ব। যেখানে নারীর যাত্রা প্রকৃত অর্থেই প্রান্তিকীকরণ থেকে ক্ষমতায়নের অভিযান। একুশ শতকে স্পর্শকাতর সংবেদনশীল প্রতিটি মেয়েই স্বপ্ন দেখে নিজেকে প্রকাশ করতে যা স্বতন্ত্র যা তার একান্ত নিজস্ব, তাতে যদি মেয়েদের সঙ্গে ছেলেদের, মেয়েদের সঙ্গে মেয়েদের যুদ্ধ বাদে তো বাধুক, নতুন বোঝাপড়া তৈরি হয় তো হোক। প্রাপ্তির ভাঁড়ার এখনো শূন্য হয়ে যায়নি। বিশ্বায়নের মুক্ত হাওয়া অনেক রুদ্ধ প্রকোষ্ঠেই প্রাণসঞ্চার করেছে।

তথ্যসূত্র :

১) দেব চিত্রা, “অন্তঃপুরের আত্মকথা”, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা- ৭০০০৯, প্রথম সংস্করণ বইমেলা ১৯৮৪, নবম মুদ্রণ অক্টোবর ২০১৭ পৃষ্ঠা- ৪।

২) সেনগুপ্ত মল্লিকা, "বিবাহবিচ্ছিন্নার আখ্যান : বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে একটি নারীবাদী সমাজতাত্ত্বিক পাঠ্য বিশ্লেষণ", প্যাপিরাস, কলকাতা প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০০৭, পৃষ্ঠা- ৭৮৭।

৩) রায়চৌধুরী বিনতা, "পঞ্চাশটি গল্প", আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০৯১, প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ২০১২, দ্বিতীয় মুদ্রণ জুলাই ২০১৮, পৃষ্ঠা- ১৭১।

৪) তদেব, পৃষ্ঠা- ২৪৫।

৫) তদেব, পৃষ্ঠা- ৩২৫।

৬) তদেব, পৃষ্ঠা- ১২২।

সহায়ক গ্রন্থ-

১) ভট্টাচার্য সুতপা, "মেয়েলি পাঠ", পুস্তক বিপণি, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০০।

২) মুরশিদ গোলাম, "নারী প্রগতি : আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গ রমনী", নয়া উদ্যোগ, কলকাতা ৭০০ ০০৬, প্রথম ভারতীয় সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৪।

৩) সেনগুপ্ত মল্লিকা, "স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ", আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪।

৪) সেনগুপ্ত মল্লিকা, "পুরুষ নয় পুরুষতন্ত্র", বিকাশ গ্রন্থ ভবন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০০২।

বাঙালি নারীর বয়ানে দেশবিভাজনের স্মৃতি : আত্মকথা ও স্মৃতিকথা একই আধারে দুই সংরূপ

পৌলমী সিনহা
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : স্মৃতি ও সাহিত্যের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সাহিত্যে স্মৃতি কতটা গুরুত্বপূর্ণ- এই লেখায় তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। 'আত্মকথা' ও 'স্মৃতিকথা'- এই দুই সংরূপ সাহিত্যে পৃথক হয়েও, কেমনভাবে নারীর কথনে একাত্ম হয়ে গিয়েছে সেই ধারা বিবরণীর অনুসন্ধান হয়েছে আলোচ্য লেখাতে। আবার এর পাশাপাশি দেশভাগ বিষয়ক সাহিত্যে, বাঙালি নারীর লেখা স্মৃতিকথা বা আত্মকথাগুলিতে বর্ণিত ভাষিক বয়ানকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে নারীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেশভাগকে দেখার শূন্যস্থানকে পূরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে, এই আলোচনার মাধ্যমে। উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে- একটি আত্মকথা; মণিকুন্তলা সেনের *সেদিনের কথা* এবং একটি স্মৃতিকথা; উমা বসুর *বিপন্নকালের ভেলা*-কে।
সূচক/মূল শব্দ : স্মৃতি, সাহিত্য, দেশভাগ বিষয়ক সাহিত্য, দেশভাগের নারী স্মৃতিকথা, দেশভাগের নারী আত্মকথা।

.

মূল আলোচনা :

দেশভাগের অভিঘাত উপমহাদেশে শুধু দুটো আলাদা রাষ্ট্রই তৈরি করেনি; বরং সাধারণ জনমানসে যে 'দেশ' নামক চৈতন্য বিরাজ করত তাকে খণ্ডিত, আক্রান্ত বা লাঞ্ছিত করে তোলে। এই আহত চৈতন্য থেকেই দেশভাগের বহু পরেও, দেশবিভাজনকে ঘিরে লেখা হয়ে চলেছে দেশভাগের স্মৃতি-কথা।

দেশভাগের যে সমস্ত ইতিহাস আজও অবধি রচিত হয়েছে, তার একটি মৌলিক বিতর্কের জায়গা হল — ইতিহাস ও স্মৃতির সম্পর্ক। সাধারণত স্মৃতির উপর নির্ভর করেই মানুষ অতীত জীবনে ফিরে তাকায়। সাধারণভাবে বলা যায়, স্মৃতি একটি প্রক্রিয়া বিশেষ, যা স্মরণ কার্যের দ্বারা সম্পন্ন হয়। এর সঙ্গে মিশে থাকে নির্বাচন ক্ষমতা, যার নির্দিষ্ট একটি method আছে। আমরা অতীতের কিছু বেছে নিয়ে বাকি বাদ দিয়ে থাকি। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আব্দুল কাফি এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন-

> তাই বলা যেতে পারে, আদত ব্যাপারটি ওই স্মরণের ক্ষমতা, যার দ্বারা আমরা কল্পনা করে নিই, কোথাও 'গভীর' কোনও প্রদেশে আমারই চৈতন্যের কোনোও অতল আঁধারে রয়ে গেছে পূর্ব সংস্কারের কিছু ছবি- চিত্রমালা- আমারই বিশেষ এক ক্রিয়াতে সে সব ছবির কতক 'উপরে উঠে আসে' সেই অতলের অন্ধকার প্রকোষ্ঠ

থেকে। সেই প্রকোষ্ঠটিকে কখনও আমরা স্মৃতি বলি, কখনও আবার চিত্রগুলিকে।[১]

আখ্যান মাত্রই স্মৃতিনির্ভর। কখনও তার গঠনেই থাকে পূর্বনির্মিত স্মৃতি, কখনও আবার গঠনকর্তা নিজেই প্রত্যক্ষ স্মরণকে রচনাতে কাজে লাগাতে পারে। এই স্মৃতি, স্মরণ, নির্বাচনের মধ্যে দিয়েই কালের প্রেক্ষিতে রচিত হয় একটি সার্থক স্মৃতিকথা।

স্মৃতি, ইতিহাস ও সাহিত্যের এক জটিল সম্পর্ক বারবার কিছু প্রশ্নের উত্থান করে, সেগুলি হল — ইতিহাস কি স্মৃতিকে বিশ্বাস করে? ইতিহাসের আখ্যানে স্মৃতির জায়গা কতটুকু নির্ধারিত? কীভাবেই বা সাহিত্য স্মৃতিনির্ভর হয়ে ওঠে? এইসব প্রশ্নের আলোচনার পূর্বে 'স্মৃতি' ব্যাপারটি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা প্রয়োজন। স্মৃতির অর্থ হল যে কোনও প্রকার তথ্য সংরক্ষণ করা। মনোবিজ্ঞানীরা স্মৃতির সমস্ত বৈশিষ্ট্য ও সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে স্মৃতিকে মোট চারটি ভাগে ভাগ করেছেন, যথা— গ্রহণ (Reception), ধারণ (Retention), স্মরণ (Recall) ও প্রত্যাভিজ্ঞা (Recognition)।[২] এইভাবে মানুষ তথা প্রাণীদের পূর্ববর্তী শিখনের প্রক্রিয়া, অভিজ্ঞতাজনিত তথ্য সংরক্ষণ ও কোন উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া হিসেবে তার পুনরুদ্রেকের ক্ষমতায় হল 'স্মৃতি'। মানুষ স্মৃতির মাধ্যমেই কখনও সচেতনভাবে আবার কখনও অসচেতনভাবে অতীতের ঘটনাকে মনে রাখে।

কিন্তু প্রথাগত ইতিহাস চায় উপযুক্ত প্রামাণ্য তথ্যসূত্রসহ ঘটনার বিবরণ। যেহেতু স্মৃতি মাত্রই ব্যক্তিগত এবং ব্যক্তিভেদে তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাই স্মৃতি কোনও প্রমাণিত সত্য নয়। ব্যক্তি নির্ভর হওয়ায়, একজনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে অপর কোনও অভিজ্ঞতার মিল পাওয়া দুষ্কর হয়ে পরে। তাই নির্দিষ্ট কোনও সিদ্ধান্ত ভিন্ন ভিন্ন বিক্ষিপ্ত স্মৃতি থেকে পাওয়া যায় না। স্মৃতির মধ্যেই লুকিয়ে থাকে বিস্মৃতির প্রক্রিয়া। এই বিস্মরণের প্রক্রিয়াকে স্মরণ অপেক্ষাও অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। সচেতন বা অসচেতনভাবে স্মৃতির মধ্যে সততই চলতে থাকে নির্বাচনের প্রক্রিয়াটি। বহু স্মৃতির ভিড়ে বাছাই হয়ে, যে নির্বাচিত স্মৃতিটি উপনীত হয়, তার যৌক্তিক ভিত্তিও অস্পষ্ট হয়ে থাকে। এই জন্যই অনেকে স্মৃতিকে মিথ্যাবাদী বা মিথ্যে ভারাক্রান্ত বলেছেন। রণবীর সমাদ্দারের লেখা থেকে বোঝা যায়, তিনি ইতিহাসের সঙ্গে স্মৃতির অমিলের কথা বলেছেন তাঁর 'The Historiographical Operation: Memory and History'(২০০৬) প্রবন্ধে। ইতিহাসে স্মৃতি একটি ইতিহাসবোধেরই সংকট তৈরি করে। স্মৃতি আসলে যথার্থ ইতিহাসকে প্রতিস্থাপিত করতে চায়। ইতিহাস ও স্মৃতির প্রসঙ্গে দীপেশ চক্রবর্তী লিখেছিলেন-

সুতরাং, ঐতিহাসিকরা যেটুকু উদ্ধার করতে পারেন, স্মৃতি জিনিসটা তার চেয়ে অনেক বেশি জটিল, আর যে সন্ধানী-ইতিহাসবিদ অতীতের দিকে তর্জনী

উঁচিয়ে বলেন, 'সবটা বলো', অতীতের আদ্যোপান্ত যিনি খুঁড়ে দেখতে চান, তাঁর দিকেও একটা নৈতিক চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয় স্মৃতি।[৩]

এইসব ইতিহাসে স্মৃতির বিপক্ষতা সত্ত্বেও প্রশ্ন ওঠে তবে দেশভাগ বিষয়ে মানুষের স্মৃতি কীভাবে এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল? দেশভাগের ইতিহাস চর্চার একটি বড় বাঁকবদল ঘটেছিল নব্বইয়ের দশকে; যখন 'হাই-পলিটিক্স' বা 'দায়-অভিযুক্তকরণ'-এর ইতিহাস থেকে বেরিয়ে ব্যক্তিক স্মৃতি আখ্যানের মধ্য দিয়ে পার্টিশনের ফলস্বরূপ মানবিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিকের অনুসন্ধান শুরু হয়। তখন সেইসময় থেকেই মানুষের স্মৃতির সঙ্গে ইতিহাসকে সম্পৃক্ত করা শুরু হয়।

দেশভাগের প্রেক্ষিতে এইভাবেই স্মৃতির গুরুত্ব বাড়তে থাকে। এখানে শুধু ব্যক্তিগত স্মৃতি নয়, 'narratives' বা 'আখ্যান'-এর স্মৃতি-সমষ্টি সংগ্রহের মাধ্যমে এই বৃহত্তর সামাজিক চেতনা আরও দৃঢ় হয়। 'Narrative' হল সেই আখ্যান যা ঐতিহাসিক এবং জনসাধারণের মিলিত বা একত্রিত স্মৃতিসমষ্টি, যা ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলির কারণ খুঁজতে বা তার অর্থ বুঝতে সাহায্য করে। দেশভাগের ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে হিংস্রতার যে পরিব্যপ্ত ট্র্যাজেডি ও ট্রমা উৎসারিত হয়েছে, তা দেশভাগের ঘটনা সমূহ থেকেও দেশভাগের স্মৃতিকে বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। তাই স্মৃতিকে সতর্কভাবে ইতিহাসে প্রয়োগ করলে, তা ইতিহাসের তথ্য সন্ধানে সহায়ক হয়ে উঠবে বলে মনে হয়।

দেশভাগের ইতিহাসই নয়, দেশভাগের সাহিত্যও বিকশিত হয়েছে 'স্মৃতি' ও 'অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন' — এই দুই মাত্রাকে কেন্দ্র করে। পার্টিশন স্মৃতির অতীতচারিতার মূল দুটি দিক হল— নস্টালজিয়া ও ট্রমা। তাই দেশভাগের সাহিত্যের একটা বড়ো অংশ জুড়ে রয়েছে- ফেলে আসা যন্ত্রণার স্মৃতি ও তার প্রকাশ। দেশভাগের স্মৃতি ও অস্তিত্ব নিয়ে, স্বনামধন্য সাহিত্যিক দেবেশ রায় কিছু প্রশ্ন তুলেছিলেন— দেশভাগের স্মৃতি কি আমাদের অস্তিত্ব হয়ে গেছে? দেশভাগের স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকা কি আমাদের চেতনা হয়ে উঠেছে?[৪]

তাঁর মতে বাংলায় 'দেশভাগের সাহিত্য' ও ইংরেজিতে প্রচলিত 'পার্টিশন সাহিত্য' শব্দ দুটি সমার্থক নয়। দেশভাগ সংক্রান্ত সাহিত্যের নির্মাণ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন-

> দেশভাগের আগে, দেশভাগের পরে, দেশভাগ নিয়ে হিংসা-রিরংসার বীভৎস কালে আমরা যে-সাহিত্য তৈরি করেছি তাতে বেদনামথিত উৎখাত, আত্মবিস্মৃত স্মৃতি, চিরকালীন নিরাশ্রয়ও শেষহীন অধঃপাত এই ছিল আমাদের সাহিত্য- প্রধানত কবিতা, গল্প-উপন্যাস, কিছু নাটক ও সিনেমা। এটাই আমাদের দেশভাগের সাহিত্য। সে-সাহিত্যের উৎস এক নিরন্তর আত্মবিলাপ।[৫]

বাংলাতে ‘সাহিত্য’ অর্থে মূলত বোঝায় — গল্প-কবিতা-নাটক-নিবন্ধ ইত্যাদি সংরূপগুলি কিন্তু ইংরেজিতে এমন সীমাবদ্ধতা নেই। ইংরেজিতে ‘লিটারেচার’ শব্দটি অনির্দিষ্ট রূপ বর্তমান। কোথাও বেড়ানোর খবর দিয়ে ট্র্যাভেলিং লিটারেচার বা ব্যাঙ্কের নানান প্রকল্প নিয়ে ‘ব্যাঙ্কিং লিটারেচার’ ইংরেজি লিটারেচারের অন্তর্গত। ফলে ইংরেজি ‘লিটারেচার’ শব্দটির প্রসার বহুল বিস্তৃত একথা অনস্বীকার্য। দেশভাগের স্মৃতি, নানান রাজনৈতিক সভার পাঠ্য নিবন্ধ অর্থাৎ পার্টিশান সংক্রান্ত যা কিছু তথ্য সমস্তই ‘পার্টিশান লিটারেচার’-এর অন্তর্গত হয়েছে। ‘দেশভাগের সাহিত্য’ বলে তাই তিনি দেশভাগের স্বরূপকে সীমাবদ্ধ করতে চাননি। দেশভাগকে তিনি পার্টিশন লিটারেচারের ব্যাপক প্রেক্ষাপটেই দেখতে চেয়েছেন। ‘দেশভাগের সাহিত্য’ নাম বর্জন করে তিনি সাহিত্য-স্মৃতির এই ধারাকে ‘দেশভাগ বিষয়ক বিভিন্ন রচনা’ বা ‘বিষয়: দেশভাগ’ এই নামে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন।[৬] তাঁর মতে,

...‘পার্টিশান’ শব্দটি ‘দেশভাগ’-এর চাইতে অনেক বেশি বাংলা।[৭]

নতুন আত্মপরিচয় সন্ধানী উদ্বাস্তু মানুষ তাদের জীবনপ্রবাহকে সাহিত্যিক প্রতিমান হিসেবে গড়ে তুলেছেন। এইভাবে কবিতা-গল্প-উপন্যাস-ছোটগল্প-নাটক সাহিত্যের প্রায় সবগুলি সংরূপকে আধার করেই দেশভাগের স্মৃতি বিস্তৃত হয়েছে। এর মধ্যে বেশ কিছু আখ্যান রচিত হয়েছে ‘স্মৃতিকথা’-র আদলে, যা দেশভাগের বহুমাত্রিক প্রতিবিম্বন ঘটিয়েছে।

দুই।

সাহিত্যে ‘স্মৃতিকথা’ সংরূপটি নতুন নয়। সাধারণ অর্থে স্মৃতিকথাগুলি হল- অতীত স্মৃতির চারণা। কোনও সাহিত্যিক যখন অতীতে ঘটে যাওয়া কোনো প্রত্যক্ষদর্শী ঘটনা লেখনীর গুণে বর্ণনা করেন, তখন একটি স্মৃতিকথার সৃষ্টি হয়ে থাকে। প্রকৃতিগত বিচারে স্মৃতিকথাকে লৌকিক জ্ঞানও বলা যেতে পারে। স্মৃতিকথা কখনও কখনও যৌথ স্মৃতি বা কালেক্টিভ মেমরি হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করতে পারে। লেখকের বিগত দিনের ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলির সম্পর্কে এক গভীর অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ হয়ে থাকে স্মৃতিকথাতে।

স্মৃতিকথার ইংরেজি পরিভাষা হল ‘memoire’, যা ফরাসি শব্দ ‘Memoira’ বা ‘Memoria’ থেকে এসেছে, যার অর্থ হল ‘স্মৃতি’ বা ‘স্মৃতিচারণ’। ‘স্মৃতিকথা’ ও ‘আত্মজীবনী’ সংরূপদুটি প্রায় একই ঘরাণার হলেও তাতে সূক্ষ্ম কিছু পার্থক্য থেকেই যায়। স্মৃতিকথায় আত্মপ্রাধান্য তুলনামূলক কম, এখানে পরিচিত মানুষকে খানিকটা নিরপেক্ষভাবেই দেখা হয়। আত্মজীবনীগুলিতে লেখকের জীবনের সামগ্রিক বর্ণনার পাশাপাশি সামাজিক সত্তা ও তার নিজের অন্তর্দর্শনের প্রকাশ পাওয়া কাম্য, কিন্তু স্মৃতিকথা শুধুমাত্র একটি অংশ বা লেখকের জীবনের একটি নির্দিষ্ট সময়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। স্মৃতিকথা শুধুমাত্র কৃতি ব্যক্তিরাই লেখেন না, বরং অনেক সাধারণ মানুষ নিজের অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করার জন্য স্মৃতিকথার লেখক হয়ে ওঠেন। পাশ্চাত্য

সাহিত্য এমনকি বাংলা সাহিত্যেও বহু আত্মকথা ও স্মৃতিকথার নির্মাণ হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের আত্মকথা ও স্মৃতিকথাগুলির একটি দীর্ঘ তালিকা অধ্যাপক বরেন্দু মণ্ডল *দীপন* পত্রিকাতে করেছেন। উনিশ শতকের এক আলোড়নকারী লেখা রাসুসুন্দরী দেবীর *আমার জীবন* (১৮৭৫) রচনার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে প্রথম পূর্ণাঙ্গ আত্মকথার প্রকাশ ঘটে। এরপর বহু বিখ্যাত মানুষ নিজের জীবনকে আত্মকথার আকারে নির্মাণ করেছেন।

এরপরে প্রশ্ন ওঠে, নারী রচিত আত্মজীবনী কি পুরুষদের আত্মকাহিনির মতনই নাকি অন্য রকম; ইংরেজি ভাষায় মেয়ে ও পুরুষের আত্মকথনের পার্থক্যগুলি একটি তাত্ত্বিক কাঠামোয় ধরে দেখার চেষ্টা শুরু হয় এস্টেল সি জেলিনেক (সম্পা.) *Women's Autobiography: Essays in Criticism* (১৯৮০) গ্রন্থটি থেকে। আঠারো শতকে ইংল্যান্ডের মেয়েদের লেখা আত্মকাহিনিতে প্রধানত তিনটি ঝোঁক শনাক্ত করেছেন জেলিনেক। ঐতিহাসিক ঘটনার তুলনায় ব্যক্তিগত বিবরণের উপর ঝোঁক, বহির্জগতের তুলনায় পারিবারিক বর্ণনা, কালানুক্রম বহির্ভূত এলোমেলো, ঠিক বিপরীত গুনাবলী দিয়ে ওই শতকের পুরুষের আত্মকথা চেনা যায় বলে মনে করেন জেলিনেক।[৮] পার্থক্যের বিষয়টিতে বেশি জোর দিতে মেয়েদের আত্মকথার জন্য ডমনা সি স্ট্যানটন তাঁর *The Female Autograph: Theory and Practice of Autobiography from the Tenth to the Twentieth Century* (১৯৮৪) বইতে তৈরি করেছেন নতুন একটি শব্দ অটোবায়োগ্রাফির বদলে 'অটো গাইনোগ্রাফি'-

> Here I was sure to find the secondary sources for my text on autobiographical writing by woman- what I would term autogynography.[৯]

লিঙ্গভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি যোগ করে যাঁরা সাহিত্য সমালোচনার নতুন মাত্রা এনেছেন, তাঁদের মধ্যে সিডনি স্মিথ তাঁর *A Poetics of Women's Autobiography: Marginality and the Fictions of Self-Representation* (১৯৯২) নামক বইতে বলেছেন 'আত্মজীবনী' নামক সাহিত্যিক ধারাটি বিশেষ ভাবে পুরুষালি। অন্যদিকে, লিঙ্গ রাজনীতির শিকার হিসেবে দেখিয়ে মেয়েদের আত্মকাহিনিকে এহেন একমাত্রিক ছকে বেঁধে ফেলার চেষ্টার বিরুদ্ধে ডরিস সামনার তাঁর *Not Just a Personal Story: Women's Testimonios and the Plural Self* গ্রন্থের 'Life/Lines: Theorizing Women's Autobiography' (১৯৮৮) প্রবন্ধে। তিনি লাতিন আমেরিকার মেয়েদের নিজ জীবনের সাক্ষ্য আলোচনা করে বলতে চেয়েছেন: মেয়েলি আত্মকথার কোনও একমাত্রিক সংজ্ঞা হয় না। সামনার আলোচিত মেয়েরা তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত যন্ত্রনার, রাষ্ট্রীয় পীড়নের বিবরণ দিয়েছেন নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গিতে। তাদের

বচনে 'আমি মেয়ে সব সময়েই' আত্মকথনে ব্যক্তি বোঝোতে 'আমরা' শব্দটি এসেছে। তখন সে মনে রেখেছে সে আসলে এক গোষ্ঠীর সদস্য।[১০]

যে কোনও স্মৃতিকথার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল- কোনও এক ঘটনা জনিত কারণে অনুভূতির প্রাবল্য। দেশভাগজনিত নারী স্মৃতিকথাগুলিতেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। আত্মপরিচয় সন্ধানী নারীদের এই স্মৃতিকথাগুলি আবার পুরুষালি আত্মকথন বা স্মৃতিকথন থেকে অনেকাংশেই আলাদা হয়ে যায়। দেশভাগের নারী স্মৃতিকথাগুলির মধ্যে লেখিকাদের একান্ত ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গিতে আসলে দেশভাগের প্রত্যক্ষ ইতিহাস ধরা পড়েছে। এই খণ্ডিত স্মৃতির ইতিহাস আসলে প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাসের বিকল্প নয় ঠিকই, কিন্তু কোনও অংশেই এর মূল্য কম নয়। বাংলা সাহিত্যে দেশভাগ সংক্রান্ত যে নারী স্মৃতিকথাগুলি স্থান পেয়েছে, তা দেশভাগের সময় নারীদের অবস্থানের ইতিহাসকে অনুসন্ধান করতে বিশেষ সাহায্য করেছে।

তিন।

অনেক সময় 'আত্মকথা' ও 'স্মৃতিকথা' সংরূপ দুটি এমন ভাবে একত্রে অবস্থান করে যে তাকে পৃথক করে নির্বাচন করা কঠিন হয়ে পড়ে। বিশেষ করে বিশেষ কোনও সময়ের প্রেক্ষিতে লেখা আত্মকথা বা স্মৃতিকথার বৈশিষ্ট্য প্রায় একই হওয়ার করণে আপাতভাবে দুটিকে একই সংরূপের আধারে লেখা মনে হতে পারে। দুটি সংরূপের উদাহরণস্বরূপ ধারণা ব্যক্ত করা যেতে পারে; বাংলায় রচিত নারী আত্মকথাগুলির মধ্যে মণিকুন্তলা সেনের (১৯১০-১৯৮৭) *সেদিনের কথা*-তে (প্রথম প্রকাশ- ১৯৮২) দেশভাগের স্মৃতি রয়েছে যথেষ্ট। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির একনিষ্ঠ সদস্য মণিকুন্তলা সেন ছিলেন বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন ও নারী আন্দোলনের অন্যতম কর্ণধার। পূর্ব বাংলার নারকেল বীথি ও কীর্তনখোলা নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত সুন্দরী বরিশালের আপন তনয়া মণিকুন্তলা সেন, কলকাতার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সাথে যুক্ত হয়ে দেশের মানুষকে অপরিসীম ভালবেসেছিলেন। দীর্ঘ ২৫ বছরের রাজনৈতিক জীবনের নানান অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি লিখেছেন তাঁর অসামান্য আত্মজীবনী *সেদিনের কথা*। তিনি শুধুমাত্র নেত্রী হিসেবে গ্রাম বাংলার মহিলাদের সংগঠিত করার প্রাথমিক দায়িত্ব নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন নি। বরং তিনি তাঁর অক্লেশ পরিশ্রমের মাধ্যমে গ্রাম বাংলার প্রতিটি বাড়িতে নারীদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন করার গুরু দায়িত্ব নিয়েছিলেন নিজের উপর। পূর্ববঙ্গের মুক্ত আকাশ, নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য, হিন্দু-মুসলমানের সৌহার্দ্য তাকে প্রকৃতই মুক্ত মনের অধিকারী করেছিল। দেশভাগ তাঁর উদার মনকে নাড়া দিয়েছিল ভীষণভাবে। তিনি আত্মকথার প্রথমে বরিশাল অংশে লিখেছিলেন-

> দেশটা কেন যে ভাগ হল! আমাদের বাড়িরই অর্ধেক রইল সেখানে আর অর্ধেক রইলাম এখানে। আর ওদের জন্য নিত্য আমার বুক কাঁপুনি।[১১]

পরবর্তী জীবনে কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক দেশভাগ মেনে নেওয়াটা তিনি নিজের সবচেয়ে বড় দুঃখের কারণ বলে মনে করেছিলেন-

> আমি তো এই পরিবেশে মানুষ, এই বরিশালে মানুষ। তাই ভাগ হওয়াটা যে আমার কতখানি বুকে বিঁধেছিল তা আর বোঝায় কাকে? আমার কমিউনিস্ট পার্টিও যে ভাগ হওয়াটা মেনে নিল সে ছিল আমার সবচেয়ে বড়ো দুঃখ।[১২]

সেদিনের কথা-এর 'দাঙ্গা, দেশভাগ আর স্বাধীনতা', 'দ্বিখন্ডিত দেশ: বাস্তুহারার মিছিল', 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হে' এই অধ্যায়গুলিতে রয়েছে তার দেশভাগের অভিজ্ঞতার বিস্তারিত বিবরণ। দেশভাগ এই আত্মকথার বহু অংশে থাকলেও ‘দেশভাগের স্মৃতি’ কেবলমাত্র এর প্রধান উপজীব্য নয়। মণিকুন্তলা সেন একজন অনুপ্রেরণাময় প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেত্রী। তাঁর সামগ্রিক রাজনৈতিক কর্মজীবনের এক ধারাবাহিক বর্ণনা পাওয়া যায় এই লেখনী থেকে। হৃদয়গত পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুভূতি নয় বরং বাস্তব অভিজ্ঞতার ‘ঘটনা-বহুল স্মৃতি’ লেখিকার নিজের জীবনকে ব্যক্ত করেছে। তাই *সেদিনের কথা* হয়ে উঠেছে দেশভাগের স্মৃতিময় একটি সার্থক আত্মজীবনী রচনা। এমনই দেশভাগের অনুষঙ্গ পাওয়া যায় আরও কিছু নারী রচিত স্মৃতি-বিজরিত আত্মকথনে; যেমন, সীমা দাশ-এর লেখা *দ্যাশ থেকে দেশে* (২০১০) বা উদ্বাস্তু দলিত লেখিকার আত্মকথা হিসেবে, অনন্ত নৈঃশব্দের মধ্য থেকেই লেখা কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়ালের (১৯৬৫) *আমি কেন চাঁড়াল লিখি* (২০১৬)।

আবার; দেশভাগের স্মৃতিতে ভর করে বাংলা সাহিত্যে রচিত হয়েছে বহু নারী স্মৃতিকথা; সুনন্দা সিকদারের *দয়াময়ীর কথা* (২০০৮), ছায়া দের *ঝিনেদা, শ্যামবাজার এবং ছাপান্ন বছর (২০১৫)*, রূপা সেনগুপ্তের *কাটাঘুড়ি ও জাদুকরী (২০১৯)*, সুমনা দাস সুরের দেশভাগ: *স্মৃতি যাত্রায় চার প্রজন্মের মেয়েরা (২০২০) -এই অনবদ্য লেখাগুলির পাশাপাশি, দেশবিভাজনকেন্দ্রিক স্মৃতির ভাণ্ডারে* একটি অন্যতম লেখনী হল উমা বসুর-*বিপন্নকালের ভেলা*। ২০১১-তে প্রকাশিত ঝর্ণা বসু ও মফিজুল হক সম্পাদিত *অবরুদ্ধ অশ্রুর দিন* বইটির প্রবেশক নিবন্ধ ‘যে আলোয় পথ চলেছি’র বিবর্ধিত রূপ *বিপন্নকালের ভেলা* বইটি। বইয়ের সম্পাদক ঝর্ণা বসু গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন-

> উমা বসুর ‘বিপন্নকালের ভেলা’ শুধুমাত্র একাত্তরের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ কালের অন্যতম বিশ্বস্ত দলিল নয়, মর্মবস্তুর দিক থেকে দেশভাগের স্বাধীনতার কালাতিক্রমী দর্পণ।[১৩]

উমা বসু একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে শহীদ বাগেরহাটের সম্পন্ন ব্যবসায়ী ভোলানাথ বসুর স্ত্রী। দেশভাগের বিভিন্ন বিধ্বস্ত পরিস্থিতিতে যন্ত্রণাময় জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লেখিকা উপলব্ধি করেছেন প্রতিনিয়ত। যুদ্ধ-দাঙ্গা-দেশভাগের মাঝেই কেটেছে তাঁর

জীবন। দেশভাগ থেকে মুক্তিযুদ্ধের সমস্ত রাজনৈতিক আলোড়নময় ঘটনায়- সহজ এই নারী চরিত্রটির জীবনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। লেখিকা উমা লিখেছেন-

> কিন্তু কী আশ্চর্য, আমার এই তুচ্ছ জীবনটা সাল তারিখ আর রাজনৈতিক ওঠাপড়ার সঙ্গে জড়িয়ে গেল। রাজনীতি 'র'ও জীবনে বুঝিনি, তবু রাজনীতিই হয়ে গেল আমার ভাগ্যনিয়ন্তা।[১৪]

লেখিকার জন্ম দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দশ বছর আগে, ৩ জানুয়ারি ১৯২৮-এ পরাধীন খুলনা জেলার মূলঘরে। দেশভাগকে তিনি কোনও বাল্য স্মৃতি থেকে নয় বরং সাবালক অভিজ্ঞতায় প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেছিলেন। দেশভাগের অন্যান্য নারী স্মৃতিকথা রচয়িতাদের সঙ্গে এইখানেই তাঁর মূল পার্থক্য। তাই দেশভাগ ও মুক্তিযুদ্ধের সমস্ত রাজনৈতিক ঘটনাগুলি তাঁর স্মৃতিকথাতে খুব স্পষ্টভাবে ধরা দিয়েছে। স্মৃতিকথার একদম প্রথম দিকেই রয়েছে, কিশোরী বেলায় তাঁর বিবাহের কথা। পাত্র তথা উমারানির স্বামীর নাম ভোলানাথ। শিব-পার্বতীর অমর যুগলের মত ভোলানাথ ও উমারানির দাম্পত্যও যেন স্বর্গীয় নির্দেশে তৈরি। দেশভাগ-মুক্তিযুদ্ধের বিষাক্ত হিংস্রতা সত্বেও, তাঁদের অপার দাম্পত্য প্রেমের অপূর্ব কাহিনী শোনায় *বিপন্নকালের ভেলা*।

মুক্তিযুদ্ধে শহীদ স্বামীর জন্য নিবেদিতপ্রাণ এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ নারী দীর্ঘ চল্লিশ বছর নিজে ভিটেমাটি আঁকড়ে পড়ে থেকেছেন। তাঁর অনুপ্রেরণাময় জীবন উত্তর প্রজন্মের পাঠককে শুধুমাত্র দেশভাগের নৃশংসতায় দেখায়নি; বরং দেখিয়েছে শত অন্ধকারময় পরিস্থিতিতেও কেমন করে প্রেম মানুষকে মহত্তর আদর্শে উন্নীত করে, মুক্তি দিয়ে থাকে সেই রাস্তা। এই হৃদয়স্পর্শী স্মৃতিকথা বাংলার সাধারণ নারীর অসীম ধৈর্যশক্তি ও সহ্য ক্ষমতার অপূর্ব নিদর্শন। দেশভাগ তথা মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ এই স্মৃতিকথাকে বাদ দিয়ে অবশ্যই অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

দেশভাগ উত্তর পর্বে মেয়েদের লেখা স্মৃতিকথা বা আত্মকথাগুলিতে রয়েছে বাঙালি নারীদের একটি সত্তা নির্মাণের নিজস্ব সংগ্রাম-কথা। নারী চৈতন্যের এক সার্বিক রূপ চিনতে সাহায্য করে বাংলা ভাষায় রচিত দেশভাগ সংক্রান্ত এই নারী রচনাগুলি। স্মৃতির ব্যক্ত আপেক্ষিকতা ও আত্ম-প্রবঞ্চনা সত্ত্বেও এই স্মৃতিচারণাগুলির মধ্যে একাধিক নারীর বহুস্বরের মিলিত রূপ খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। দেশভাগের ঘটনার থেকে বেশি দেশভাগের স্মৃতি দুই বাংলা নারীদের কিভাবে তাড়িত করেছে, সেই জটিল মনস্তত্ত্বের স্বরূপ সন্ধান করার পাশাপাশি; পুরনো স্মৃতি বহন করেও, সত্তার নবনির্মাণের দ্বারা মুক্ত সমাজে বাঙালি নারীর অবগাহনের বিবর্তনের ধারা উন্মোচন করেছে এই লেখনীগুলি।

তথ্যসূচি:

১) কাফি, আব্দুল; *দেশ* পত্রিকা, 'আধুনিকতার অসুখ-বিসুখ ও বিভূতিভূষণ', ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯, পৃষ্ঠা- ২১

২) Educostudy, 'What is Memory? Stage of Memory', by Educo Group, April 26, 2020 https://www.educostudy.in/2020/04/memory-stage-of-memory.html?m=1

৩) ঘোষ, সেমন্তী (সম্পাদনা); *দেশভাগ: স্মৃতি আর স্তব্ধতা,* দীপেশ চক্রবর্তীর 'বাস্তুহারার স্মৃতি ও সংস্কার: ছেড়ে আসা গ্রাম' শীর্ষক প্রবন্ধ, গাঙচিল, পঞ্চম মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৮, পৃষ্ঠা- ১৫৬

৪) মন্ডল, মননকুমার (সম্পাদনা); *পার্টিশন সাহিত্য: দেশ-কাল-স্মৃতি,* দেবেশ রায়ের 'সাত ভাই চম্পা জাগো রে' শীর্ষক প্রবন্ধ, গাঙচিল, তৃতীয় মুদ্রণ এপ্রিল ২০২১, পৃষ্ঠা- ৪৩

৫) তদেব, পৃষ্ঠা- ৫০

৬) তদেব, পৃষ্ঠা- ৪৩

৭) তদেব, পৃষ্ঠা- ৪৪

৮) চন্দ, পুলক (সম্পাদনা); *নারীবিশ্ব,* ঈশিতা চক্রবর্তীর 'অন্দর থেকে বাহির, বাহির থেকে অন্দর: আত্মকথনে বাঙালি মেয়েরা (১৮০৯-১৯৩৪)', গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ ২০০৮, পৃষ্ঠা- ৩৩৫।

৯) Stanton, Domna C; *The Female Autograph: Theory and Practice of Autobiography from the Tenth to the Twentieth Century,* CHAPTER ONE Autogynography: Is the Subject Different? , University of Chicago Press, 1987, page no. 5

১০) চন্দ, পুলক (সম্পাদনা); *নারীবিশ্ব,* ঈশিতা চক্রবর্তীর 'অন্দর থেকে বাহির, বাহির থেকে অন্দর: আত্মকথনে বাঙালি মেয়েরা (১৮০৯-১৯৩৪)', গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ ২০০৮, পৃষ্ঠা- ৩৩৬

১১) সেন, মণিকুন্তলা; *সেদিনের কথা,* নবপত্র প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ ২৩ শ্রাবণ ১৩৫৯, পৃষ্ঠা- ১৫

১২) তদেব, পৃষ্ঠা- ১৭

১৩) বসু, উমা; *বিপন্নকালের ভেলা,* গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১৫, ভূমিকা, পৃষ্ঠা-৭

১৪) তদেব, পৃষ্ঠা-২৪

সহায়ক পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থপঞ্জি :

১। পাল, মধুময় (সম্পাদনা); *দেশভাগ বিনাশ ও বিনির্মাণ*, গাঙচিল, দ্বিতীয় মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০২০

২। ঘোষ, সেমন্তী (সম্পাদনা); *দেশভাগ স্মৃতি ও স্তব্ধতা*, গাঙচিল, পঞ্চম মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৮

৩। বিশ্বাস, অধীর (সম্পাদনা), *বর্ডারঃ বাংলা ভাগের দেওয়াল*, গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১৬

৪। মন্ডল, মননকুমার (সম্পাদনা), *পার্টিশন সাহিত্যঃ দেশ-কাল-স্মৃতি*, গাঙচিল, তৃতীয় মুদ্রণ এপ্রিল ২০২১

৫। হীরা, আশিস (সম্পাদনা); *দেশভাগ ও নারীঃ ভাঙা দেশ নতুন গড়ন*, গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ২০২১

৬। হীরা, আশিস; *উদ্বাস্তুঃ ইতিহাসে ও আখ্যানে*, গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৯

৭। মন্ডল, মননকুমার; *বাংলার পার্টিশন কথাঃ উত্তর প্রজন্মের খোঁজে*, পরিবেশক দে'জ পাবলিশিং, ডিসেম্বর ২০২০

৮। চন্দ, পুলক; *নারীবিশ্ব*, গাঙচিল, দ্বিতীয় মুদ্রণ আগস্ট ২০১৮

৯। নাথ বসু, সোমেন্দ্র ;*বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনী*, টেগর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৫ মার্চ ১৯৯৩

১০। কাফি, আব্দুল; *দেশ* পত্রিকা, 'আধুনিকতার অসুখ-বিসুখ ও বিভূতিভূষণ', ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯,

১১। সেন, মণিকুন্তলা ;*সেদিনের কথা*, নবপত্র প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ ২৩ শ্রাবণ ১৩৫৯

১২। সিকদার, সুনন্দা; *দয়াময়ীর কথা*, গাঙচিল, দ্বাদশ প্রকাশ মার্চ ২০১৬

১৩। দে, ছায়া; *ঝিনেদা, শ্যামবাজার এবং ছাপান্ন বছর*, গাঙচিল, দ্বিতীয় মুদ্রণ নভেম্বর ২০১৮

১৪। সেনগুপ্ত, রূপা; *কাটাঘুড়ি ও জাদুকরী: এক উদ্বাস্তু-পরিবারের গল্পকথা*, গাঙচিল, এপ্রিল ২০১৯

১৫। বসু, উমা; *বিপন্নকালের ভেলা*, গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১৫

১৬। দাস সুর, সুমনা; *দেশভাগ: স্মৃতিযাত্রায় চার প্রজন্মের মেয়েরা*, গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০২০

১৭। দাস, সীমা; *দ্যাশ থেকে দেশে*, মিলেমিশে প্রকাশনা, কলকাতা, ২০১০

১৮। ঠাকুর চাঁড়াল, কল্যানী; *আমি কেন চাঁড়াল লিখি*, চতুর্থ দুনিয়া, ১৬ই আগস্ট, ২০১৬

১৯। সিকদার, দেবারতি; *স্মৃতিকথাঃ প্রেক্ষিত বঙ্গবিভাজন*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ- ২০১৯

২০। সিকদার, অশ্রুকুমার; *ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য,* দে'জ পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০০৫

২১। চট্টোপাধ্যায়, ভবানীপ্রসাদ; *দেশভাগ: পশ্চাৎ ও নেপথ্য কাহিনী,* আনন্দ পাবলিকেশন, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৩

২২। চ্যাটার্জী, জয়া; *দেশভাগের অর্জন,* মাওলা ব্রাদার্স প্রকাশনা, তৃতীয় মুদ্রণ জানুয়ারি ২০২০

২৩। Stanton, Domna C; *The Female Autograph: Theory and Practice of Autobiography from the Tenth to the Twentieth Century*, University of Chicago Press, 1987

২৪। Brée, Germaine. Life/Lines: Theorizing Women's Autobiography. Edited by BELLA BRODZKI and CELESTESCHENCK, Cornell University Press, 1988. JSTOR, http://www.jstor.org/stable/10.7591/j.ctvr7f414. Accessed 2 Aug. 2023.

‘পদসঞ্চার’ : স্থির না থাকার ইতিহাস (পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক)

রানা সরকার
স্নাতকোত্তর, বাংলা বিভাগ,
গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস ‘পদসঞ্চার’ থেকে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের বাংলা তথা ভারতবর্ষের প্রায় সম্পূর্ণ একটা ধারণা অনুধাবন করতে পারি। পর্তুগীজরা শুধুমাত্র বাণিজ্য করতে এলেও তাঁদের মনে কিভাবে শাসন করার ইচ্ছা জাগ্রত হয় এবং তারা কতটা সক্ষম হয়েছেন সেই নীতিতে, তাই ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। পর্তুগীজদের কথা লিখতে গিয়ে শুধুমাত্র বাণিজ্যের কথাই নয় সেই সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে তৎকালীন ধর্মীয় ভাবনা, বাংলার শাসন ব্যাবস্থা, সামাজিক পারিবারিক আচরণ, প্রেমভাবনা, প্রতিবাদী সত্ত্বা। পদসঞ্চার নামকরণের মাধ্যমেই থেমে না থাকার একটা ইতিহাস তুলে ধরেছেন। পরিবর্তনই পৃথিবীর নিয়ম, সেই নিয়মেই একে একে প্রত্যেক জাতির ভাগ্য পরিবর্তন হয় নিজেদের কার্যকলাপে। যখনই পৃথিবীর কোনপ্রান্তে সমস্ত দরজা বন্ধ হয়ে যাবে ঠিক তখনই আবার নতুন কোন একটা দিক খুলে যায় এবং সেই খুলে যাওয়ার দিকটির পেছনে যে জাতি সঠিক পথে শ্রম দেবে তারাই টিকে থাকবে, ইহাই পৃথিবীর নিয়ম। এভাবেই রোজ স্থির না থেকে প্রতিনিয়ত পৃথিবীর ইতিহাস পরিবর্তন হচ্ছে।

শব্দ সূচক : পর্তুগীজ, পোর্টো গ্রান্ডি, ক্রিশ্চান, আরব জাতি, জলদস্যু, ভাস্কো-ডা-গামা, দেবদাসী, চট্টগ্রাম, মশলা।

‘পদসঞ্চার’। পদসঞ্চার অর্থাৎ স্থির না থাকা, কোন বাঁধা না মানা, ক্রমশই এগিয়ে চলা। পৃথিবীর আদি লগ্ন তথা মানব সভ্যতার জন্ম কাল থেকেই মানুষ ক্রমশই এগিয়ে চলেছে আর সেই সঙ্গে এগিয়ে চলছে সময়। যেহেতু সময় স্থির নয় সেহেতু সভ্যতাও স্থির নয়। একের পর এক সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে, আর সেই সঙ্গে নব সভ্যতা জন্ম লাভ করেছে। আর ইতিহাস থেকে জানতে পারি ভারতবর্ষে যুগে যুগে বিভিন্ন জাতির পদসঞ্চার ঘটেছে। যেমনটা করে হরপ্পা সভ্যতার অবসানের পর আর্য জাতির পদসঞ্চার ঘটেছিল, ঠিক তেমনটাই একে একে নন্দ বংশ, গুপ্ত বংশ, মৌর্য বংশ, শুঙ্গ, কনিষ্ক, পাঠান, মোগল, পর্তুগীজ, ইংরেজ-দের পদসঞ্চার ঘটেছে এ-দেশে। প্রকৃতির নিয়মে যখনই এদেশে নতুন জাতির পদসঞ্চার ঘটেছে তখনই পূর্ব জাতির অবসান ক্রমশই ঘনিয়ে এসেছে। যখন কোন দেশে নতুন জাতির পদসঞ্চার ঘটবে, তখনই সেই জাতির

সঙ্গে নিজস্ব ধর্মীয় ভাবনার প্রতিফলন দেখা দেবে সেই সমাজে, এটাই স্বাভাবিক। ইতিহাস থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধর্মের প্রভাব সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। ভারতবর্ষে যেহেতু একাধিক জাতির দখলিকরণ হয়েছিলো সেহেতু এখানে বৈদিক ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম, মুসলিম ধর্ম, শাক্ত ধর্ম, বৈষ্ণব ধর্ম প্রভৃতির একাধিক ধর্মীয় ভাবনারও পদসঞ্চার ঘটেছিলো। প্রত্যেক জাতিরই একটা নিজস্ব ইতিহাস থাকে। কোন জাতি যখন কোন দেশে যুদ্ধ বা বাণিজ্য করে থাকে তখন সেই দেশে উক্ত জাতি প্রভাব ফেলবে এটাই স্বাভাবিক। আর হিংস্র কোন জাতিকে বাঁধা দেওয়া হলে তার ফলাফল যে খুব একটা সুমধুর হবে এটা প্রত্যাশা করা বৃথা। আজ থেকে প্রায় পাঁচশো বছর পূর্বে এমনি একটা জাতির এবং তৎকালীন সমাজের ধর্মীয় প্রভাবের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে চলেছি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পদসঞ্চার' উপন্যাসকে অবলম্বন করে। 'পদসঞ্চার' উপন্যাসটি আলোচনার পূর্বে লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নেওয়া আবশ্যক।

"বাঙালি জীবনের এই প্রখর রাগদীপ্ত প্রত্যন্ত প্রদেশ আধুনিক যুগের যে সমস্ত ঔপন্যাসিকের তীব্র কৌতূহল ও ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত করিয়াছে তাহাদের মধ্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সর্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও শ্রেষ্ঠতম।"[১] তিনি ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৯১৮ সালে অবিভক্ত বাংলার (অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত) অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার বালিয়াডাঙ্গিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি ছোটবেলা থেকেই লেখালেখি শুরু করেন। তাঁর প্রথম লেখা ছাপা হয় মাস পয়লা 'শিশু মাসিকে'। এছাড়া তিনি 'সন্দেশ', 'মুকুল', 'পাঠশালা', 'শুকতারা' প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'উপনিবেশ' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৪৩ সালে। তাঁর রচিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উপন্যাস গ্রন্থগুলি হল 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী', 'মহানন্দা', 'স্বর্ণসীতা', 'লালমাটি', 'শিলালিপি', 'অসিধারা', 'অমাবস্যার গান' এবং আমাদের আলোচ্য 'পদসঞ্চার' উপন্যাস। 'পদসঞ্চার' উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায়। তারপর গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স থেকে ১৯৪৯ সালে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ পায়। যদিও উপন্যাসটি পূর্বে সংক্ষিপ্ত আকারে ছোটগল্প রূপে 'আনন্দ বাজার' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন আমৃত্যু কমিউনিস্ট। সুতরাং প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে তাঁর রচিত বেশির ভাগ উপন্যাসে রাজনীতির একটা আভাস পাওয়া যায়। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন- "এই সমস্ত রচনাতেই তাঁহার কয়েকটি বিশেষ মানস প্রবণতা ও তাঁহার উচ্ছ্বাসময়, সংকেত দ্যোতনা দীপ্ত, বর্ণনা ভঙ্গির পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। প্রায় সমস্ত উপন্যাসেই তাঁহার ইতিহাস-চেতনা ও রাজনৈতিক বোধের প্রখর প্রাধান্য তাঁহার ঔপন্যাসিক জীবন দৃষ্টিকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করিয়াছে।"[২] আর এই দৃষ্টিভঙ্গি আমরা তাঁর 'পদসঞ্চার' উপন্যাসেও লক্ষ্য করি। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই উপন্যাসটি আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সংশায়িত ভাবে এক অনন্য সংযোজন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘পদসঞ্চার’ উপন্যাসটি একটি অনন্য উপন্যাস। যেহেতু এই উপন্যাসটি প্রায় ষোড়শ শতকের ইতিহাসকেন্দ্রিক সেহেতু রয়েছে প্রচুর প্রাকরণিক বিষয়, যথা- তৎকালীন দেশীয় বাণিজ্য নীতি, তৎকালীন ধর্মীয় ভাবনা, তৎকালীন সমাজ, তৎকালীন শাসক গোষ্ঠীর আচার-আচরণ, তৎকালীন নরনারীর প্রেম ভাবনা এবং লেখকের মূল আলোচ্য বিষয় পর্তুগীজের পদসঞ্চার। এই উপন্যাস সম্পর্কে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নিজে লিখেছেন- “ ‘পদসঞ্চার’ ইতিহাসভিত্তিক উপন্যাস। বাঙলা দেশে কেমন করে প্রথম ইউরোপীয় বাণিজ্যের পদক্ষেপ ঘটলো, কিভাবে পশ্চিমের লক্ষ্মী বাঙ্গালীর ঘটে অধিষ্ঠান করলেন, সেই পূর্বাভাসটিই এই উপন্যাসে দিতে চেয়েছি।”[৩] পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের দুর্ধর্ষ জলদস্যু পর্তুগীজদের আধুনিক যুব বংশধর, আরাকানিদের বন্য ব্যাবহার, শাক্ত শক্তির ধীরে ধীরে অবলুপ্তি, বৈষ্ণব ধর্মের উত্থান, অসামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতার রক্তবাহী বহু ঘটনার সাক্ষী বাঙলা তথা ভারতবর্ষ সবকিছুই যেন বিনি সুতোর মালার মতন গেঁথে রেখেছেন লেখক।

যেহেতু আধুনিক লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ‘পদসঞ্চার’ উপন্যাসে মূলত তিনটি বিষয় যথা- তথা তৎকালীন বাঙালির সমাজ ও বাণিজ্য নীতি, তৎকালীন ধর্মীয় ভাবনা এবং পর্তুগীজদের পদসঞ্চার স্বতন্ত্রভাবে উপস্থাপন করেছেন, সেহেতু আমরা তাঁর এই তিনটি বিষয়কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে ইতিহাসের সাথে মিলিয়ে নিতে চাই। লেখক এই উপন্যাসে পর্তুগীজ জাতিকেই একটি চরিত্র রূপে উপস্থাপন করেছেন। তাই আলোচ্য প্রবন্ধের সূচনাতে পর্তুগীজদের স্বতন্ত্র আলোচনা করবো। পরবর্তীতে তৎকালীন সমাজ ও বাণিজ্য নীতি ও ধর্মীয় ভাবনাকে আরেকবার ফিরে দেখা যাবে।

উপন্যাসের শুরুই হচ্ছে একটি মূল মন্ত্র দিয়ে- “চাই ক্রিশ্চান, আর চাই মশলা।” কিন্তু পর্তুগীজদের এই মূলমন্ত্রের কারণ লেখক উপন্যাসের কথামুখ অংশে আলোচনা করেছেন। মাত্র ১৪ জন পর্তুগীজ সমুদ্রপথে রাজা মনোএল-এর নির্দেশে কালিকটে ব্রাহ্মণ রাজা জামোরিণের নিকটে আসে বাণিজ্য চুক্তি করতে। কিন্তু কালিকট বাণিজ্য করে আরব বণিকদের সঙ্গে। তবুও সামান্য উপহারের বিনিময়ে ব্রাহ্মণ রাজা জামোরিণ তাদেরকে বাণিজ্য করার ছাড়পত্র দিয়ে দেয়। আর এখান থেকেই শুরু হয় দ্বন্দ্ব। পর্তুগীজ এবং আরব দুটোই হিংস্র জাতি। যেহেতু আরব বণিকরা সংখ্যায় বেশি এবং তারা প্রাচীন তাই নবাগত পর্তুগীজদের দৈনন্দিন ঠকিয়ে চলে তারা। রাজা জামোরিণ যখন সবটা জেনেও চুপ থাকে তখন তাদের মন ক্ষোভে ফেটে পড়ে। শুধু বাণিজ্যের ক্ষেত্রেই নয় পর্তুগীজদের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে হত্যা করেছে আরব বণিকরা। আর এরই প্রতিশোধ তুলতে পরবর্তীতে পর্তুগীজরা লিসবোয়ার রাজা মনোএল-এর নির্দেশে কামান সহযোগে কালিকট দখল করে। কালিকট দখল করতে যে কোনো অসুবিধা হবে না, এ সম্পর্কে তিনি আগের থেকেই জানতেন; কারণ স্বরূপ আমরা তার মুখ থেকে শুনেছি- “কারণ এইটেই এদেশের বিশেষত্ব। এরা বিচ্ছিন্ন,

পরস্পরের প্রতি ঈর্ষার শেষ নেই এদের। এই অস্ত্রে মুসলমান একদিন এদেশ জয় করেছিল, আজ আবার ক্রিশ্চানের পালা।" পর্তুগীজ সরকারের নির্দেশে তারা বাণিজ্য এবং ধর্ম প্রচার করতে এসেছিলেন ঠিকই কিন্তু তাদের এই পদসঞ্চার খুব একটা সুখের হয়নি। তবুও সবশেষে তারা পশ্চিম উপকূল কিছু অংশ দখল করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পশ্চিম উপকূল দখল করলেও তাদের মূল লক্ষ্য ছিল 'পোর্টো গ্রান্ডি' অর্থাৎ চট্টগ্রাম বন্দর এবং 'বেঙ্গালার রেশম ও সোনার প্রতি'। আর পুরো উপন্যাস জুড়ে এই বাংলা দখলের যে প্রয়াস পর্তুগীজদের তা মার্টিন অ্যাফেনসো ডি মালো চরিত্রের মাধ্যমে দেখিয়েছেন ঔপন্যাসিক। নিম্নে পর্তুগীজদের এই প্রয়াস নিয়ে আলোচনা করা গেল।

"শক্তির নেশায় মাতাল হয়ে উঠল নবজাগ্রত পর্তুগাল।" "নতুন দেশ চাই নতুন অধিকার।" ভারতের পশ্চিম উপকূল দখল করলেও তাদের কল্পনায় রয়েছে সেই 'পোর্টো গ্রান্ডি' অর্থাৎ চট্টগ্রাম। তারা কবি কামোয়ানসের 'লুসিয়াদাস' গ্রন্থ থেকে জানতে পেরেছিলেন- 'সোনার দেশ বাংলা, ভারতের স্বর্গ এই বেঙ্গালা-তার উচ্চতর চুড়োয় আসন এই চট্টগ্রামের।" ডি মালো এই কবিতা যতবার পড়েন ততবারই অন্তরের অন্তরে বাংলার প্রেমে পড়েন। তার ইচ্ছা এই বাংলার সাথে যুদ্ধনীতি নয় বন্ধু-নীতি তৈরি করবেন। তিনি এখান থেকে নিয়ে যাবেন মসলিন, পট্টবস্ত্র, রেশম, কস্তুরী, জাবাদ, ঢাকাই, শঙ্খ, গৌড়ের গুড়, মোম, লাক্ষা, শুকনো লঙ্কা। আর দেবেন মালদ্বীপ থেকে নানা আকারের খোলা তিনেভেলির শঙ্খ, মালাবারের গোলমরিচ, সিংহলের দারুচিনি, মুক্তা আর হাতি। কিন্তু বাংলাদেশ তখনও অনেক দূরে। "ভাস্কো-ডা-গামা যে দেশের কাহিনী শুনেছিলেন স্বপ্নের মতো। তখনও সেই প্যারাডাইজ অব ইন্ডিয়া পরম শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে তার আম-কাঁঠালের স্নিগ্ধ ছায়ায়। তখনও তার ধানক্ষেতে ফলছে নিরুদ্বেগ সোনা, 'পোর্টো গ্রান্ডি' চট্টগ্রামের আরব বাণিজ্য তরীর পাশাপাশি নোঙর ফেলছে বাঙালি বণিকের সপ্তডিঙ্গা মধুকর। আর তাঁতি তখনও নিপুণ হাতে বুনছে অপূর্ব মসলিন, আর তার আকাশে বাতাসে ভাসছে চন্ডীদাসের গান।"

পর্তুগীজ সরকারের নির্দেশে ডি মালোরা সমুদ্রপথে যতই বাংলার তথা 'পোর্টো গ্রান্ডি' অর্থাৎ চট্টগ্রামের দিকে যাত্রা করছেন ততই তারা কপটতার শিকার হয়েছেন। তবুও ডি মালো হার মানেন না। তিনি এই বাংলা দেখবেন এবং সন্ধি স্থাপন করবেন। তাকে সন্ধি স্থাপনের জন্য সম্মুখীন হতে হয়েছিল যুদ্ধের, আত্মীয় বিয়োগের, সহযোদ্ধার মৃত্যুর, নিদারুণ অপমানের এবং জেলের যন্ত্রনা ভোগের। তবুও তিনি হার মানেননি। শেষ পর্যন্ত তার নেতৃত্বে সাময়িকভাবে এবং আংশিক হলেও বাংলা দখল হয়েছিল। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এই পর্তুগীজদের দখলীকরণ চিত্র আঁকতে গিয়ে তৎকালীন বাংলা শাসনকর্তা তথা গৌড়ের মামুদ শা এবং দিল্লির শের খাঁ-এর আংশিক চিত্র এঁকেছেন। এখানে তিনি দেখিয়েছেন বিলাসের স্রোতে মেতে রয়েছেন বাংলার শাসনকর্তা মামুদ শা। বিভিন্ন আমোদ-প্রমোদে তিনি মত্ত। উপস্থিত সিদ্ধান্ত নিতে তিনি ছিলেন অক্ষম।

আর এই অক্ষমতাই তার পতনের মূল কারণ। তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র ফিরোজ শা-কে সন্দেহের বশে হত্যা করেন। ফিরোজকে হত্যা করে তিনি অনুতাপে ভুগতে থাকেন। সেই সময়ে তিনি সম্মুখীন হয়েছিলেন চট্টগ্রামে আসা পর্তুগীজদের এবং তাদের বারেবারে তিনি অন্যায় ভাবে বন্দী ও অত্যাচার করেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে মামুদ শা নিজ ভুল বুঝতে পেরে তাদের বাণিজ্য করার সুযোগ করে দেয়। শুধুমাত্র একটি শর্তে। শর্ত হল- শের খাঁ আক্রমণ করতে আসছে গৌড় আর সেই যুদ্ধে পর্তুগীজরা কামান এবং সৈন্য সহযোগে সুলতান মামুদ শা-কে সাহায্য করবেন। শর্ত চুক্তি হলেও পরবর্তীতে বিনা যুদ্ধে শের খাঁ-এর সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে নেন মামুদ শা। আর এভাবেই অপদার্থ ভোগবিলাসী সম্রাট চরিত্র ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক দুর্বলতার পদক্ষেপ চিত্রটি আঁকলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

ঠিক একইভাবে তিনি বাংলার তৎকালীন বাণিজ্য যাত্রা এবং দুজন নারী পুরুষের প্রেম ভাবনাকে তুলে ধরেছেন। এই উপন্যাসে আমরা বাংলার প্রতিনিধি হিসেবে শঙ্খ দত্ত, ধন দত্ত, রাজশেখরের কাহিনীকে যুক্ত হতে দেখি। ধন দত্ত হলেন শঙ্খ দত্তের পিতা। তিনি বহুবার সমুদ্রপথে যাত্রা করেছেন বাণিজ্যিক সূত্রে। আর এখন তার বয়স হয়ে যাওয়াতে তার পুত্র শঙ্খ দত্ত সমুদ্রপথে বাণিজ্য যাত্রায় বেরিয়েছেন। তিনি ছিলেন কালীভক্ত সোমদেবের শিষ্য। বাণিজ্য যাত্রার সময় তিনি জগন্নাথ দেবের মন্দির দেখতে যান। সেখানে গিয়ে তিনি পান্ডার থেকে জানতে পারেন এই মন্দিরে দেবদাসীর নিত্য হয়। আর সে সেই মন্দিরে পান্ডার সাহায্যে রাত্রে দেবদাসী শম্পার নগ্ন নৃত্য দেখতে যায়। এরপরে শঙ্খ দত্ত শম্পাকে দেখে তার প্রেমে পড়ে যান। কিন্তু শম্পা দেবদাসী। সে হৃতা অর্থাৎ অপহৃতা নারী। এখানে দেবদাসীরা কোথা থেকে আসে সে সম্পর্কে নারায়ণবাবু খুব সুন্দর নির্দেশিকা দিয়েছেন- "সে ভারী বিচিত্র কাহিনী,... কেউবা মন্দিরে নিজেকে দান করে দেয়- তাকে বলে দান। কেউবা দেবতার পায়ে নিজেকে বিক্রি করে দেয়- সে হলো বিক্রিতা। কেউ ভক্তি করে মন্দিরের সেবায় নিজেকে নিয়োগ করে- সে হলো ভক্তা। রাজা-মহারাজারা বহুমূল্য অলংকারে সাজিয়ে কাউকে মন্দিরে দান করেন- সে অলঙ্কৃতা, কেউ বেতন নিয়ে নৃত্যগীত করে- সে গোপিকা। আবার যাকে অপহরণ করে মন্দিরে নিবেদন করে দেওয়া হয়- সে হৃতা।" আর এই হৃতা নারী শম্পাকে শঙ্খ দত্ত যত দেখছেন ততই তার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। তিনি মনে মনে এই কল্পনা করতে লাগলেন, শম্পা তাকে বলছে- "তার প্রতিটি দেহরেখা যেন নিঃশব্দ ভাষায় বলতে চাইছে, এ আমার কারাগার- এ আমার অভিশাপ। এখান থেকে উদ্ধার কর তুমি আমাকে- এই অসহ্য বন্ধন থেকে তুমি মুক্তি দাও।" এরপর শঙ্খ দত্ত মনে মনে শপথ করে বসলেন যে শম্পাকে সে দেবতা থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসবেন। আর তিনি তাই করলেন যেন দৈত্যপুরীর রাজকন্যাকে উদ্ধার করলেন।

কিন্তু এরই মাঝে আমরা গোলাম আলীকে দেখতে পাই তিনি শঙ্খ দত্তকে সতর্ক করে দিচ্ছেন পর্তুগিজ সম্পর্কে। তারা বাণিজ্যের নাম করে ‘এক হাতে মশলা কেনে, আর এক হাতে গলা কাটে।’ গোলাম আলী বাণিজ্যের পরিস্থিতি সম্পর্কে শঙ্খ দত্তকে সাবধান করে দিয়েছিলেন বারেবারে। শঙ্খ দত্ত যখন শম্পাকে অপহরণ করে নিজ জাহাজে নিয়ে এসে যাত্রা শুরু করেছিল। তার কিছুদিনের মধ্যেই পর্তুগীজ জাহাজ থেকে কামানের গোলা দিয়ে তার জাহাজে হামলা করেছিল। ভাগ্যক্রমে দুজনেই বেঁচে গিয়েছিলেন, কিন্তু এখানেই ঘটলো বিচ্ছেদ। আসলে শম্পা ছিল ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। সে কখনো সাধারণের হতে পারে না। কিন্তু উপন্যাসে আমরা লক্ষ্য করে শম্পার চিত্তেও শঙ্খ দত্ত একটি সূক্ষ্ম স্থান করে নিয়েছিলেন। যেহেতু সে দেবদাসী তাই এই বিষয়টি সে প্রশ্রয় দিতে পারেনা। উক্ত দুর্ঘটনা ঘটনার পরেই দুজনেরই জীবন দুদিকে গতি পেল।

ঔপন্যাসিক তাঁর এই উপন্যাসে ধর্মকে বিশেষ স্থান দিয়েছেন। তিনি অসাধারণ প্রতিভার সহিত এই উপন্যাসে ধর্মের পদসঞ্চার দেখিয়েছেন। এই ধর্মীয় দিকের প্রধান চরিত্র রূপে দেখতে পাই সোমদেবকে। তিনি হলেন শাক্ত ও শক্তির প্রতিনিধি। তিনি ছিলেন বীর কালীভক্ত। তিনি সবসময় নানা দেশ ঘুরে বেড়ান আর সারাদেশ জুড়ে শাক্ত শক্তির দীক্ষা নেন। কিন্তু একই সঙ্গে শাক্ত শক্তির বিপরীত দিক থেকে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্মের উত্থান দেখতে পাই। সোমদেব এই বৈষ্ণবদের ঘৃণার চোখে দেখতেন। বৈষ্ণবদের উদ্দেশ্য ছিল হিংসা নয়, অহিংসা এবং প্রেম মানুষের অস্ত্র হোক। কিন্তু সোমদেব এই নীতিকে দুর্বলদের নীতি বলে প্রচার করতে লাগলেন। তিনি মনে করিয়ে দেন বৌদ্ধদের ক্লীবতায় একদিন যেভাবে পাঠান মোগল প্রবেশ করেছিল ঠিক একইভাবে এখন বৈষ্ণবদের ক্লীবতার জন্য প্রবেশ করবে খ্রিস্টান। সোমদেবের শিষ্য রাজশেখর তার মেয়ের জন্য শিবের মন্দির গড়তে চেয়েছিলেন কিন্তু তার গুরু কালী শক্তির মন্দির গড়তে বলেন। আর এই শক্তিপুজোর জন্য বলি হতে হয়েছিল পর্তুগীজ নিরীহ যুবক গঞ্জালেস’কে। গঞ্জালেসের মৃত্যু রাজশেখরের মেয়ে সুপর্ণাকে বোবা ও অবচেতন করে দিয়েছিল। রাজশেখর এই ঘটনাকে মোটেই ভালো দৃষ্টিতে নেননি। তিনি গুরুদেবকে বলেন- “দেশে বিধর্মী না থাকলে হয়ত সবাই খুশি হয়, কিন্তু থাকলেই বা ক্ষতি কি? প্রথমে যারা অপরিচিত শত্রু হয়ে এসেছিল, তারা আজ ঘরের লোক হয়ে দাঁড়িয়েছে, আস্তে আস্তে আত্মীয় হয়ে উঠেছে বিশেষ করে যেসব পাঠান এ দেশে এসে বাসা বেঁধেছে -এক ধর্ম ছাড়া তো তাদের সঙ্গে আর কোন ব্যবধান নেই। এমনকি নিজেদের ভাষা পর্যন্ত ভুলতে বসেছে তারা। সুখ-দুখে-বিপদে-সম্পদে ডাক পড়লেই এসে দাঁড়ায় পাশে।” সুপর্ণা পরবর্তীতে শঙ্খ দত্তের ভালোবাসা ও প্রেমে এবং যত্নে সুস্থ হয়েছিলেন। সোমদেব সব সময় চেয়েছিলেন শক্তির জয় ঘটুক। তিনি কোনদিনই অস্ত্রের পরিবর্তে শিষ্যের হাতে খোল-করতালকে মেনে নিতে পারেননি।

কিন্তু তার এই রুক্ষ মনোভাব নীতি বৈষ্ণব ধর্মে প্রভাব ফেলতে অক্ষম হয়েছে। কারণ- "দলবদ্ধ হয়ে বৈষ্ণব ভক্তরা তাঁদের ভক্তি ব্যাকুলতা প্রকাশ করতেন তাতে অনধিকারের ভেদ ছিলনা। সকলেই যোগদান করত।"[৪] গুরুর অন্যতম শিষ্য কেশবও বলেছিলেন অন্য সমাজ গড়ে তোলার কথা। অর্থাৎ ধর্মের মধ্যে নমনীয় মনোভাব নিয়ে আসা। কিন্তু সোমদেব কিছুতেই এই নীতিকে গ্রহণ করলেন না উল্টে আরো দূরে ছুড়ে দিলেন কেশবকে, আর এখানেই সোমদেবের পরাজয় ঘটলো। কেশবও ছুটল বৈষ্ণব ধর্মের দিকে। এভাবে শক্তির পরাজয় ঘটলো অহিংস শক্তির কাছে।

উপন্যাসটি পাঠ করে পাঠকেরা স্পষ্ট বুঝতে পারবেন যে পর্তুগীজরা ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে অক্ষম হয়েছেন। "সমুদ্র উপকূলই তারা ঘুরে বেড়িয়েছে। হার্মাদ বলেই তাদের জানি আমরা।"[৫] আর এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে অবলম্বন করে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পর্তুগীজদের সংগ্রামের কথা তুলে ধরেন। তাঁর মূল উপজীব্য বিষয় ছিল পর্তুগীজদের পদসঞ্চার। যদিও তিনি পর্তুগীজদের জলদস্যু রূপেই এঁকেছেন। তবুও তাদের কালিকট দখল, বাংলা দখল করতে যে সংগ্রাম, যে আত্মত্যাগ করতে হয়েছিল, তা ইতিহাসকে অবলম্বন করে তিনি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। সেই সঙ্গে স্পষ্ট করেছেন পর্তুগীজরা রাজনীতি থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে বেশি এগিয়ে। আর এটাই উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু।

এছাড়াও খুব সূক্ষ্মভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের উত্থান, তন্ত্র শক্তির বীভৎসতা, বৌদ্ধ ধর্মের নিরুত্তাপ উপস্থিতি, দেবদাসী প্রথা, সেই সঙ্গে শঙ্খ দত্ত-শম্পা-সুপর্ণা রোমান্স কাহিনী যুক্ত হয়েছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ভারতবর্ষের বিশেষত বাংলাদেশের পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর ইতিহাসকে দেখেছেন এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে। বিশিষ্ট আলচকের মতে- "যেই মুহূর্তে আমাদের মনে হচ্ছে কালের গতি রুদ্ধ হচ্ছে সেই মুহূর্তেই কালস্রোত আহত করে সেই রুদ্ধতাকে। ভারতবর্ষের ইতিহাসও তাই বলে। পৃথিবীর ইতিবৃত্তও তাই।"[৬] অতএব যুগের পর যুগ যে নিয়মে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপায়ে পৃথিবীর গতিচক্র আবর্তিত হচ্ছে তা কখনই থেমে যেতে পারে না। এই উপন্যাসের মাধ্যমে আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সমাজ তথা দেশের তথা পৃথিবীর গতিময়তার অর্থাৎ স্থির না থাকার ইতিহাসই অনুধাবন করতে পারি।

গ্রন্থপঞ্জি :

আকরগ্রন্থ

১) গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, 'পদসঞ্চার', 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী', পঞ্চম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮৮।

তথ্যসূত্র :

১) বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, ‘বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা’, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, সপ্তম সংস্করণ, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা- ৩৩৬।

২) তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৩৯।

৩) গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, ‘পদসঞ্চার’, ‘নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী’, পঞ্চম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮৮, পৃষ্ঠা- ৩, লেখকের কথা।

৪) গঙ্গোপাধ্যায়, ড. শম্ভুনাথ, “মধ্যযুগের ধর্মভাবনা ও বাংলা সাহিত্য”, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা- ১০০।

৫) দত্ত, ড. বিজিতকুমার, ‘বাংলাসাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস’, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, চতুর্থ সংস্করণ, ১৮/০১/১৯৯৬, পৃষ্ঠা-৩৩৬।

৬) তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৩০।

রবীন্দ্র কাব্যনাট্য ‘নরকবাস’ : একটি বিশ্লেষণ

শতাব্দী ভৌমিক
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

ঊনবিংশ শতকে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনিকে অবলম্বন করে সাহিত্য রচনার যে ধারার সূচনা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথও তা থেকে বিচ্যুত হননি। তিনি যে কটি কাব্যনাট্য রচনা করেছিলেন সেগুলি হল ‘চিত্রাঙ্গদা’ (১৮৯২), ‘বিদায়-অভিশাপ’ (১৮৯২), ‘গান্ধারীর আবেদন’ (১৯০০), ‘সতী’ (১৯০০), ‘নরকবাস’ (১৯০০), ‘লক্ষ্মীর পরীক্ষা’ (১৯০০), ‘কর্ণকুন্তী সংবাদ’ (১৯০০) প্রভৃতি। এগুলির মধ্যে ‘সতী’ ও ‘লক্ষ্মীর পরীক্ষা’ এই দুটি কাব্যনাট্য ছাড়া সবকটি কাব্যনাট্যের বিষয়বস্তু রবীন্দ্রনাথ সংগ্রহ করেছেন মহাভারত থেকে। যদিও রবীন্দ্র সাহিত্যের বিভিন্ন আঙ্গিকে মহাভারতের প্রসঙ্গ বারেবারে উঠে এসেছে। কখনো সাহিত্যের নতুন পরীক্ষায় তিনি নিয়জিত হয়েছেন। কখনো নিজস্ব বক্তব্যকে প্রকাশের ক্ষেত্রে নানা উপকরণ আহরণ করছেন রামায়ণ মহাভারত থেকে। আসলে রমায়ণ মহাভারতকে রবীন্দ্রনাথ কেবল মহাকাব্য হিসেবে দেখেননি। তিনি এই দুই মহাকাব্যের মধ্যে প্রাচীন ঐতিহ্যের সন্ধান করেছেন। ‘প্রাচীন সাহিত্য’ গ্রন্থের ‘রামায়ণ’ প্রবন্ধে তিনি লিখছেন-

“... রামায়ণ-মহাভারতকে কেবলমাত্র মহাকাব্য বলিলে চলিবে না, তাহা ইতিহাসও বটে; ঘটনাবলীর ইতিহাস নহে, কারণ সেরূপ ইতিহাস সময়বিশেষকে অবলম্বন করিয়া থাকে- রামায়ণ-মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস। অন্য ইতিহাস কালে কালে কতই পরিবর্তিত হইল, কিন্তু এ ইতিহাসের পরিবর্তন হয় নাই। ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা, যাহা সংকল্প, তাহারই ইতিহাস এই দুই বিপুল কাব্যহর্ম্যের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান।”[১]

রবীন্দ্র কাব্যনাট্যে মহাভারতের ঘটনা তথা চরিত্র ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। তিনি কাহিনির সূত্রটিকে গ্রহণ করেছেন কেবলমাত্র কিন্তু তার সংযোজন পরিবর্ধন করেছেন নিজস্ব অভিপ্রায় অনুসারে। আমাদের আলোচ্য রবীন্দ্রনাথের ‘নরকবাস’ কাব্যনাট্যটি। যেখানে রবীন্দ্রনাথের মানবধর্ম সম্পর্কিত ভাবনার রূপায়ণ ঘটেছে। মহাভারতের বনপর্বের অন্তর্গত একশত পাঁচতম অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির এবং মহর্ষি লোমশের কথোপকথনের মধ্যে উঠে এসেছে রাজা সোমকের বৃত্তান্ত। যেখানে কাহিনিধারা এরূপ, মহর্ষি লোমশ যুধিষ্ঠিরকে বলেন যে সোমক নামে এক ধার্মিক রাজা ছিল যার একশজন পত্নী ছিল। অনেক চেষ্টার পরেও রাজার কোনো পুত্র সন্তান ছিল না। ক্রমে বৃদ্ধ বয়সে তাঁর ‘জন্তু’ নামে এক পুত্র জন্মে। সেই পুত্রকে নিয়ে রাজার সকল মহিষীরা সবসময় ব্যস্ত থাকতেন। একদিন এক পিঁপড়ের কামড়ে সেই শিশুসন্তানটি কাঁদতে শুরু করলে

তাঁর মায়েরা অর্থাৎ সকল মহিষীরা কাঁদতে শুরু করে। ফলে এক তুমুল পরিস্থিতির শুরু হয়। রাজা তখন মন্ত্রীসভা থেকে সেই আওয়াজ শুনে দৈবারিককে পাঠালে, তিনি এসে রাজাকে সকল বৃত্তান্ত জানান। তারপর রাজা নিজে গিয়ে পুত্রকে শান্ত করে আবার মন্ত্রী ও রাজন্যর্গদের কাছে এসে উপস্থিত হন। সোমক তখন বলেন-

“ধিগস্ত্বিহৈকপুত্রত্বমপুত্রত্বং ববং ভবেৎ।
নিত্যাতুবত্বাদ্‌ভূতানাং শোক এবৈকপুত্রতা।।১২।।”[২]

অর্থাৎ পুত্র না হওয়া বরং ভাল কিন্তু একমাত্র পুত্র সবসময় উদ্বেগের কারণ হয়। তাই তিনি ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস করলেন যদি এমন কোনো উপায় থাকে যাতে তাঁর একশত পুত্র হওয়া সম্ভব হয়। ব্রাহ্মণ তখন জানান-

“যজস্ব জন্তুনা বাজংস্তং ময়া বিততে ক্রতৌ।
ততঃ পুত্রশতং শ্রীমদ্ভবিষ্যত্যচিরেণ তে।।১৯।।”[৩]

যজ্ঞের সময় তিনি যদি তাঁর পুত্রকে যজ্ঞাহুতি দেন তাহলে তাঁর একশ সুন্দর পুত্র হবে এবং একমাত্র পুত্র জন্তু সেই মায়ের গর্ভেই আবার জন্মগ্রহণ করবে। তখন সেই পুত্রের বাঁ হাতে একটি স্বর্ণচিহ্ন থাকবে। রাজা সোমক ব্রাহ্মণকে নির্দেশ দিলেন যা যা করণীয় তিনি যেন সেইরূপ করেন, যাতে তাঁর একশ পুত্রের জন্ম হয়। লোমশ জানান, যজ্ঞের সময় যখন জন্তুকে আহুতি দেওয়ার সময় হল তখন তাঁর মায়েরা তাকে ধরে প্রবলভাবে কাঁদতে থাকে। তখন ব্রাহ্মণ জোর করে পুত্রকে হোমাহুতি দেন, তা দেখে মায়েরা নিচে পড়ে যান এবং সেই হোমের আঘ্রাণে মায়েরা সকল গর্ভধারণ করেন। তারপর দশমাসে সোমক রাজার একশ পুত্র সন্তান হয়। জন্তু জ্যেষ্ঠ সন্তান হিসেবে হাতে সেই চিহ্ন নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তারপর ব্রাহ্মণের মৃত্যু হয়। কিছুদিন পর রাজাও মৃতুবরণ করেন। মৃত্যুর পর রাজা সোমক সেই ব্রাহ্মণকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে দেখেন। কারণ জানতে চাইলে ঋত্বিক জানান-

“তমব্রবীদ্‌গুরুঃ সোহথ পচ্যমানোহগ্নিনা ভৃশম্‌।
ত্বং ময়া যাজিতো রাজংস্তস্যেদং কর্ম্মণঃ ফলম্‌।।৩৩।।”[৪]

অর্থাৎ রাজা সোমকের জন্য যজ্ঞ করার ফলস্বরূপ ব্রাহ্মণকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে। রাজা তখন যমের কাছে ব্রাহ্মণের প্রতিনিধিরূপে নিজে নরকে গিয়ে ব্রাহ্মণকে মুক্ত করে দেওয়ার আর্জি পেশ করেন। ধর্ম্মরাজ রাজাকে জানান যে, কোনো ব্যক্তিই অন্যের পাপফল ভোগ করতে পারে না। তখন রাজা জানান যে তিনি ব্রাহ্মণকে ছাড়া স্বর্গলোক কামনা করেন না কারণ তিনিও একই দোষে দোষী। তাই উভয়ের পাপপুণ্যের ফল সমান হোক। ধর্ম্মরাজ তখন জানান-

“যদ্যেবমীপ্সিতং রাজন্‌! ভুঙ্‌ক্ষ্বাস্য সহিতঃ ফলম্‌।
তুল্যকালং সহাননে পশ্চাৎ প্রাপ্স্যসি সদ্‌গতিম্‌।।৩৮।।”[৫]

অর্থাৎ রাজা যদি মনে করেন তাহলে ব্রাহ্মণের সঙ্গে একই সময়ে পাপফল ভোগ করে সদ্‌গতি লাভ করতে পারেন। এরপর রাজা ব্রাহ্মণের সঙ্গেই পাপফল ভোগ করে নরক

থেকে মুক্ত হন। এই ছিল মহাভারতের মুল আখ্যান। রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাট্যে রাজা সোমক নিজেই বক্তা এবং কাহিনির সূচনায় তিনি নিজেই নিজের পরিচয় দিয়েছেন।

"সোমক। ... ...
সোমক আমার নাম, বিদেহভূপতি।"[৬]

এখানে কাহিনি শুনতে আগ্রহী রাজা যুধিষ্ঠির নন, বরং এখানে চরিত্র হিসেবে স্থান করে নিয়েছে নরকবাসী প্রেতেরা, যারা রাজা সোমকের কাছে কাহিনি শুনতে চেয়েছে। এখানে প্রেতেরা রাজাকে সম্বোধন করেছে নরপতি বলে। যেন তারা রাজার সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে সচেতন। এই ভদ্রতা যেন তাদের অতীতের উত্তরাধিকার হিসেবে প্রাপ্ত। রবীন্দ্রনাথ প্রেতেদের যেন এক অন্য মাত্রায় নিয়ে গেছেন। যেন তারা মানুষের মতোই অনুভূতিপ্রবণ। তাই তারা মানুষের মতোই গল্প শুনতে আগ্রহ বোধ করে। দুঃখ এবং আনন্দের অনুভব যেন তাদের মানুষের মতনই। প্রেতেরা রাজার কাছে তাঁর কাহিনি শুনতে চাইলেও পরে সেই কাহিনিতে কথকের ভুমিকা গ্রহণ করেছে ঋত্বিক এবং প্রেতগণ উভয়েই। মূল মহাভারতে এই বৃত্তান্তে রাজা, ব্রাহ্মণ এবং ধর্মরাজ যমের মধ্যেই সংলাপ সীমিত ছিল। এখানে দেবদূত এবং প্রেতের উক্তি যুক্ত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। মহাভারতে রাজা সোমকের পরিচয় আমরা পাচ্ছি পাঞ্চাল রাজা, পাঞ্চালকন্যা দ্রৌপদীর প্রপিতামহরূপে। এখানে তিনি নিজের পরিচয় দিয়েছেন বিদেহভূপতি বলে। মহাভারতে সোমকের পুত্রসন্তানের নাম আমরা পেয়েছি জন্তু। নরকবাসে সেই নামের কোনো উল্লেখ করেননি রবীন্দ্রনাথ।

এই কাব্যনাট্যে আলো এবং আঁধারের বৈপরীত্যকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ। রাজা সোমক যখন ডাক শুনেছেন, তখন কোনো কিছুই তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়নি।

"সোমক। কে ডাকে আমারে
দেবদূত? মেঘলোকে ঘন অন্ধকারে
দেখিতে না পাই কিছু,- হেথা ক্ষণকাল
রাখো তব স্বর্গরথ।"[৭]

এর পাশাপাশি আালোর সহাবস্থান অন্ধকারকে আরো গাঢ়তর করে তুলেছেঃ

"প্রেতগণ। স্বর্গের পথের পার্শ্বে এ বিষাদলোক,
এ নরকপুরী। নিত্য নন্দন-আলোক
দূর হতে দেখা যায়,..."[৮]

আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথের পূর্বে নরকের চিত্র অঙ্কন করেছিলেন মধুসূদন দত্ত তাঁর 'মেঘনাদ বধ কাব্য' (১৮৬১) এর অষ্টম সর্গে। যদিও দুটি রচনায় পরিবেশ এবং পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পৃথক। মহাভারতে শত পুত্রের আকাঙ্ক্ষা ছিল রাজা সোমকের। কিন্তু এখানে একমাত্র পুত্রের স্নেহে আকুল রাজা, তার ক্রন্দন ধ্বনি শুনে সভা ছেড়ে ছুটে যান পুত্রের কাছে। ঠিক সেই সময় ঋত্বিক তথা রাজপুরোহিত দূর্বা হাতে রাজাকে

আশিস জানাতে আসছিলেন, কিন্তু ব্যস্ত রাজা তখন ঠেলে চলে যান অন্তঃপুরে। দূর্বা ঋত্বিকের হাত থেকে মাটিতে পড়ে যায়। অপমানিত ঋত্বিক রাজার প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা সত্ত্বেও বিদ্বেষের তাপে রাজার কাছ থেকে সুকৌশলে আদায় করে নেয় ক্ষত্রিয়ের পণ।

"ঋত্বিক্। শুন তবে। আমি করি যজ্ঞ-আয়োজন,
তুমি হোম করো দিয়ে আপন সন্তান।
তারি মেদগন্ধধুম করিয়া আঘ্রাণ
মহিষীরা হইবেন শতপুত্রবতী-"[৯]

রবীন্দ্র কাব্যনাট্যে কার্যকারণ বদলে গেছে। রাজার ইচ্ছার পরিবর্তে সংযোজিত হয়েছে ব্রাহ্মণত্বের অহংকার। তাই ব্রাহ্মণ এখানে নরক যন্ত্রণা ভোগ করছে তাঁর কৃত পাপের জন্য।

"ধর্ম। যে ব্রাহ্মণ
বিনা চিত্তপরিতাপে পরপুত্রধন
স্নেহবন্ধ হতে ছিঁড়ি করেছে বিনাশ
শাস্ত্রজ্ঞান-অভিমানে, তারি হেথা বাস
সমুচিত।"[১০]

ব্রাহ্মণ একদিকে পুত্রকে পিতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে অপরাধ করেছে, অন্যদিকে চরম অপরাধ করেছে বিনা পরিতাপে শিশুকে হত্যা করে। আর তাই তাঁর এই নরকবাস। শুধু তাই নয় মনে পড়ে ব্রাহ্মণের স্বীকারোক্তি-

"ঋত্বিক। ... উঠিল জ্বলিয়া
ব্রাহ্মণের অভিমান..."[১১]

অন্যদিকে রাজা সোমক স্বর্গযাত্রী হলেও সে এতদিন নিজের পাপজ্বালায় দগ্ধ হয়েছে। শিশু সদা চঞ্চল। মাতাপিতার ওপর শিশুটি নির্ভর করে।সরল, চঞ্চল শিশু আগুনকে খেলনা মনে করে দুহাত মেলে বিশ্বাসভরে জড়িয়ে ধরেছিল। তাই সোমক বলেঃ

"সোমক। ... হে নরক, তোমার অনলে
হেন দাহ কোথা আছে যে জিনিতে পারে
এ সন্তাপ। আমিও কি যাব স্বর্গস্বারে!
দেবতা ভুলিতে পারে এ পাপ আমার,
আমি কি ভুলিতে পারি সে দৃষ্টি তাহার,
সে অন্তিম অভিমান?..."[১২]

যার প্রতি সম্পূর্ণ অধিকার এবং বিশ্বাস, তাঁর প্রতিই অভিমান জন্মে। শিশুর প্রতি 'অভিমান' শব্দটির আরোপ করে রবীন্দ্রনাথ এই নাট্যকবিতাটিকে অন্য মাত্রায় নিয়ে গেছেন। যা পাঠকের মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। তাই অন্তরের নরকানলে দগ্ধ হলেও রাজা সোমকের মনে হয়েছেঃ

"সোমক। আচম্বিত বহ্নিদাহে ভীত কাতরতা
পিতৃমুখপানে চেয়ে, পরম বিশ্বাস
চকিতে হইয়া ভঙ্গ মহা নিরাশ্বাস,
তার নাহি হবে পরিশোধ।"[১৩]

সোমক রাজার জন্য ধর্ম্মরাজের বিধান স্বর্গলোক। কারণ অন্তরনরকানলে তাঁর সমস্ত পাপ পরিশুদ্ধ হয়ে গেছে। পাপের ভার ভস্ম হয়ে ক্ষয় হয়ে গেছে। কিন্তু রাজা যিনি ক্ষাত্রধর্মকে বজায় রাখতে, বীর্য সমাজে প্রচার করতে, নরধর্ম, রাজধর্ম, পিতৃধর্মকে আগুনে ভস্ম করেছেন, তিনি চান না স্বর্গ। নিত্য যে অন্তরের নরক আগুনে তিনি জ্বলছেন, তা থেকে মুক্তি পেতে তিনি নরকহুতাশনে হোম করতে চান ঋত্বিকের সঙ্গে মিলে। এই ছিল রাজার প্রার্থনা ধর্মের কাছে।

"ধর্ম। মহান্ গৌরবে হেথা রহ মহীপতি।
ভালের তিলক হোক দুঃসহদহন,
নরকাগ্নি হোক তব স্বর্ণসিংহাসন।"[১৪]

উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা দেখলাম কীভাবে রবীন্দ্রনাথ কাহিনি বা প্লটের প্রতিগ্রহণ করছেন। এরপর আমাদের আলোচ্য হল চরিত্র। রবীন্দ্রনাথ রাজা সোমকের স্নেহবিমূঢ় অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন অত্যন্ত নিপুণভাবে। অন্যদিকে ঋত্বিকের এক ভয়াল হিংস্র চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি রাজার বিপরীতে। এই ঋত্বিকই হল ঘটনার প্রধান নিয়ন্ত্রক। রাজাকে কর্তব্যপথে তথা রাজধর্মে চালিত করা রাজপুরোহিতের প্রধান কর্তব্য। কিন্তু রাজধর্মের অজুহাতে তিনি নিজস্ব আহত অহংকারকেই চরিতার্থ করতে এক পৈশাচিক হত্যায় মেতেছেন। অন্যদিকে রাজা ক্ষাত্রধর্ম রক্ষা করতে রাজপুরোহিতের নির্দেশ পালন করলেও নিজ পুত্র হত্যার নিদারুণ পাপের জ্বালায় আজীবন দগ্ধ হয়েও তিনি নিস্তার পান নি। তাই মর্ত্যের হিসাব মিটে গিয়ে স্বর্গের পথে যাত্রাকালে অতীত স্মৃতিচারণায় তিনি যে সারাজীবন অনুতাপ জ্বালায় দগ্ধ হয়েছেন, তা থেকে নিষ্কৃতি পান নি সে কথাই উঠে এসেছে তাঁর কণ্ঠে বারে বারে।

ঋত্বিকের কোনো অনুতাপ ছিল না। সে কারণেই তাঁর বিচার হয়েছে নরকযন্ত্রণা ভোগ। অন্যদিকে নরকবাসী ঋত্বিক একই অপরাধে অপরাধী রাজার স্বর্গলোক প্রাপ্তিতে ঈর্ষান্বিত হয়েছে।

"ঋত্বিক। যেয়ো না যেয়ো না তুমি চলে
মহারাজ। সর্পশীর্ষ তীব্র ঈর্ষানলে
আমারে ফেলিয়া রাখি যেয়ো না যেয়ো না
একাকী অমরলোকে।"[১৫]

অর্থাৎ সে রাজাকে তাঁর প্রাপ্য পূণ্যফল থেকে সরিয়ে দিতে চাইছে। সেই সাথে সুপ্ত আছে হিংসা ও প্রতিশোধের স্পৃহা। 'নরকবাস' এ প্রেতেরা রবীন্দ্রনাথের স্বতন্ত্র সৃষ্টি।

অনেক্ষেত্রেই তাদেরকে মানুষদের থেকে আলাদা করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাঁরা মানুষের মতোই দুঃখে দুঃখী। ঋত্বিকের ভয়াবহ কৃতকর্মের কাহিনি শুনে তাই তাঁরা বলেছেঃ

"প্রেতগণ। থামো থামো, ধিক্ ধিক্।
পূর্ণ মোরা বহু পাপে, কিন্তু রে ঋত্বিক্,
শুধু একা তোর তরে একটি নরক
কেন সৃজে নাই বিধি...।"[১৬]

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর 'মেঘনাদ বধ কাব্য' এ নরকের বীভৎস রূপ অঙ্কন করেছেন। কিন্তু প্রেতগণকে সম্পূর্ণ মানবিক করে তোলা, এ সম্পূর্ণ রবীন্দ্রনাথের স্বতন্ত্র সৃষ্টি। অন্যদিকে রবীন্দ্র অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সুন্দর-কুৎসিতের এক মিশ্র রূপ তুলে ধরেছিলেন তাঁর 'স্বপ্ন-প্রয়াণে'। রবীন্দ্রনাথ ওপরে স্বর্গ, নীচে মর্ত্য এবং মধ্যে নরকের অবস্থানকে সুন্দরভাবে এঁকেছেন। রবীন্দ্রনাথের নরক, স্বর্গের পথের পাশেই কিন্তু তাদের মাঝে রয়েছে ব্যবধান। স্বর্গের আলো এবং নরকের অন্ধকারকে, আলো আঁধারের পাশাপাশি সহাবস্থান নরকের অন্ধকারকেই আরো গাঢ় করে তোলে। তাই মহাভারতে সোমক রাজার উপাখ্যানকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'নরকবাস' কাব্যনাট্যে এক আলাদাই মাত্রা দান করলেন। যেখানে শৈলীগত পরিবর্তন এর পাশাপাশি চরিত্র, কাহিনি, ঘটনা-সংস্থান এবং সংলাপগত পরিবর্তন রবীন্দ্রনাথের 'নরকবাস' কে দিয়েছে এক স্বতন্ত্র সৃষ্টির মর্যাদা।

তথ্যসূত্র :

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চম খন্ড, প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৩৪৭, পুনর্মুদ্রণ আষাঢ় ১৩৬২, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ৫০৩

২। শ্রী হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য (অনূদিত), মহাভারতম্, বনপর্ব্ব ৮ (জন্মশতবার্ষিক-সংস্করণম্), প্রথম প্রকাশ ১৩৪০ বঙ্গাব্দ, দ্বিতীয় (বিশ্ববাণী) সংস্করণ মহালয়া ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ১০৬২

৩। তদেব, পৃষ্ঠা ১০৬৩

৪। তদেব, পৃষ্ঠা ১০৬৬

৫। তদেব, পৃষ্ঠা ১০৬৭

৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চম খন্ড, প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৩৪৭, পুনর্মুদ্রণ আষাঢ় ১৩৬২, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ১০৮

৭। তদেব পৃষ্ঠা ১০৭

৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চম খন্ড, প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৩৪৭, পুনর্মুদ্রণ আষাঢ় ১৩৬২, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ১০৭

৯। তদেব পৃষ্ঠা ১১১

১০। তদেব পৃষ্ঠা ১১৪

১১। তদেব পৃষ্ঠা ১০৯
১২। তদেব পৃষ্ঠা ১১৩
১৩। তদেব পৃষ্ঠা ১১৪
১৪। তদেব পৃষ্ঠা ১১৫
১৫। তদেব পৃষ্ঠা ১১৪
১৬। তদেব পৃষ্ঠা ১১২

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :

১। বীতশোক ভট্টাচার্য, পুরাণপ্রতিমায় রবীন্দ্রনাথ, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুআরি ২০০৭, বাণীশিল্প, কলকাতা
২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চম খন্ড, প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৩৪৭, পুনর্মুদ্রণ আষাঢ় ১৩৬২, বিশ্বভারতী, কলিকাতা
৩। শ্রী হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য (অনূদিত), মহাভারতম্, বনপর্ব্ব ৮ (জন্মশতবার্ষিক-সংস্করণম্), প্রথম প্রকাশ ১৩৪০ বঙ্গাব্দ, দ্বিতীয় (বিশ্ববাণী) সংস্করণ মহালয়া ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলিকাতা

সামাজিক অধিকারে প্রাচীন ভারতের নারী

ঋতুপর্ণা সরকার
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
বিধান চন্দ্র কলেজ, আসানসোল

সারসংক্ষেপ : প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পড়তে গিয়ে বারংবার কৌতূহল দ্বারা তাড়িত হয়েছি, কৌতূহল ছিল নানা বিষয়ে। কিন্তু যেকোনো দেশের ইতিহাস কে জানতে গেলে সে দেশের সমাজ ব্যবস্থার প্রতি অবশ্যই জ্ঞান থাকা উচিত। আর সেই প্রসঙ্গে প্রাচীন ভারতে নারীদের সামাজিক অধিকারের বিষয় ভাবনাটি উত্থাপিত হয়েছে। এক্ষেত্রে আলোচনা প্রসঙ্গে এসেছে প্রাচীন ভারতের সামাজিক অধিকারে নারীদের শিক্ষার অধিকার এবং দেখা গেছে এদেশে প্রাচীন ভারতে নারীশিক্ষা অধিকারের কথা কোথাও কোথাও বলা হলেও তার সঙ্গে হৃদয়ের যোগ ছিল যথেষ্টই অল্প। সাধারণত সাংসারিক কাজেই তারা আবদ্ধ থাকত। ব্যাতিক্রম ছিল, কিছু হাতেগোনা ব্রহ্মবাদিনীর সংখ্যা আঙ্গুলে গোনা যেত। শিক্ষার অধিকারে বঞ্চিত, স্বাধীন অর্থনীতি থেকে অপসারিত, রাজনীতির আঙিনা থেকে বিতাড়িত নারী ঐতিহ্যময় ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতায় কেমন ভাবে দিন অতিবাহিত করত তাই এই গবেষণা মূলক লিখনটির মূল বক্তব্য।
মূল শব্দ : প্রাচীন ভারত, নারী, শিক্ষা, সমাজ, অধিকার।

বৈদিক যুগ হতে ভারতবর্ষে ঐতিহাসিক পর্বের সূচনা হয়েছে, একথা হয়তো অনেকেই স্বীকার করবেন না তবু আমাদের আলোচনা শুরু হয়েছে সেই বৈদিক যুগ থেকেই। বৈদিক যুগ বলতে যে যুগে বৈদিক সাহিত্য রচিত হয়েছিল, তাই বুঝতে হবে। এ সাহিত্য ছিল প্রধানত সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ ও সূত্রসাহিত্য অর্থাৎ শ্রৌত, গৃহ্য এবং ধর্মসূত্র।[1] আধুনিক সমস্ত পণ্ডিতই প্রাচীনতম বেদ অর্থাৎ ঋগ্বেদকে খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ শতক থেকে দশম শতকের শেষ বা নবমের শুরুর রচনা বলে মনে করেন। তাহলে খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ থেকে খ্রিস্টীয় চতুর্থশতক এই দেড়হাজারের কিছু বেশি সময় এবং এর শেষ হাজার খানেক বছরের ইতিহাসে সাহিত্য ছাড়াও অন্য উৎস যেমন প্রত্নতত্ত্ব, শিলালিপি, তাম্রশাসন, মহাকাব্য দুটি, প্রথম যুগের পুরাণ, বৌদ্ধসাহিত্য ইত্যাদি

---

[1] বেদের ছয়টি অঙ্গের একটি অঙ্গ কল্প। এই পর্যায়ের গ্রন্থ গুলির নাম কল্প সূত্র। বেদবিহিত আচার অনুষ্ঠানের আলোচনা আছে এই গ্রন্থগুলিতে। সূত্রাকারে গ্রথিত এই গ্রন্থগুলির চারটি ভাগ - শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র ও শূল্বসূত্র। এসব গ্রন্থ মোটামুটি ভাবে ৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে রচিত হয়েছিল।
ডঃ দিলীপ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ভারত ইতিহাসের সন্ধানে (কলকাতা ২০০০) পৃঃ ৩২

থেকে সমাজের যে চিত্রসংগ্রহ করতে পারি তার মধ্যে খুঁজব নারীর স্থান ও তার অধিকার।

প্রাচীনকালে ভারতীয় সমাজে পিতা-মাতা পুত্রসন্তানের জন্মকে সৌভাগ্য সূচক এবং কন্যাসন্তানের জন্মকে দুর্ভাগ্যজনক বলে মনে করতেন।[2] ভারতীয় সমাজতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ বলেন নিজ সন্তান সম্বন্ধে এইরূপ বিপরীত মনোভাব গড়ে ওঠার মূল কারণ হল ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের উচ্চারিত কয়েকটি বাক্য- "যাহা পুত্রকামনা তাহাই বিত্তকামনা এবং যাহা বিত্তকামনা তাহাই পুত্রকামনা" (৩/৫/১)।[3] এই শব্দ কয়েকটি মাত্র গ্রহণ করে এবং তারই উপর ভিত্তিস্থাপন করে স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ যে সামাজিক অনুশাসন প্রবর্তন করলেন তাতে বলা হল পুত্রসন্তান পিতাকে "পুন্নাম " নরকে (পুত্র সন্তান লাভ না করলে যে নরকে মানুষকে পতিত হতে হয়) পতিত হওয়ার আশংকা থেকে মুক্ত করে।

কোশল সংযুক্ত[4] নিকায় থেকে জানা যায় যে কোসলরাজ প্রসেনজিৎ রাজমহিষী মল্লিকাদেবীর কন্যাসন্তান প্রসবের খবর শুনে বিমর্ষ হলে বুদ্ধদেব তাঁকে উপদেশ দিচ্ছেন কন্যাযদি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন, ধর্মপ্রাণ এবং স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয় তবে সে পুত্রাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়ার যোগ্যতা রাখে। চেতিয় জাতকে মহাপুরোহিত কপিল চেতিরাজ অপচরকে তার মিথ্যাভাষণের জন্য অভিসম্পাত করেছেন- "জানি শুনি যেই জন, করে অবিচার / পুত্র না জন্মিয়া শুধু কন্যা জন্মে তার / সত্য যদি বল তবে পাইবে আবার / সমস্ত ঐশ্বর্য, পূর্বে যাছিল তোমার"- "থিয়ো তস্স পজায়ন্তি, ন পুমা জায়রে কলে .... পুত্র না জন্মিয়া শুধু কন্যা জন্মে তার" - এই বাক্যাংশটির ভাবার্থ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে সাধারণত লোকেরা কন্যাজন্মকে অবাঞ্ছনীয় ও দুর্ভাগ্যজনক বলে মনে করতেন। জন্মলগ্ন থেকেই বিমুখতার শিকার নারী তাই সন্তান হিসেবে প্রাচীন সমাজে তার স্থান ও অধিকার যে কতখানি গভীর হবে তা সহজেই অনুমেয়। এমনিতেই এদেশে সন্তানের জন্মকে কিছুটা লভ্যাংশের দৃষ্টিতে দেখা হত। তাই পূর্বে লাভক্ষতির হিসাব পরে স্নেহ, মায়া, মমত্ব। সেই অঙ্ক মেলাতেই পালিসাহিত্যের অন্তর্গত অঙ্গুত্তর নিকায় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে কেন কন্যা অপেক্ষা পুত্র পিতা মাতাদের নিকট অধিক বরণীয়।

প্রথমতঃ পুত্র মাতা পিতাকে ভরণ পোষণ করে।

দ্বিতীয়তঃ পুত্র অর্থকরী কর্ম করে।

তৃতীয়তঃ পুত্র পিতার বংশধারা অব্যাহত রাখে।

চতুর্থতঃ পুত্র তার মৃত পূর্বপুরুষকে পিণ্ডদান করে।

পঞ্চমতঃ পুত্র পিতার ধন সম্পদের অধিকারী হয়।

---

[2] ডঃ বাণী চট্টোপাধ্যায়, পালি সাহিত্যে নারী, (কলকাতা৩০পৃঃ (১৯৯০-

[3] স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, উপনিষৎ গ্রন্থাবলী, তৃতীয় ভাগ,পৃঃ ২৩৩-২৩৪

[4] Mrs. Phys Devis Cf. Kindered saying Vol.-1, Sanjukta Nikaya 2/3/6

উপরিউক্ত কারণগুলি প্রমাণ করে দেয় নারী কন্যা অবস্থা থেকে স্বাধীন অর্থকরী বৃত্তি ও ধনসম্পদের অধিকার থেকে বঞ্চিত। শুধু তাই নয় কন্যার পূর্বপুরুষকে পিণ্ডদান করার কোন অধিকার নেই, গোত্রান্তর হওয়ার দরুণ সে অন্য পরিবারভুক্ত হয় বলে পিতৃবংশরক্ষা করার কোন সম্ভাবনাও নেই, শুধুমাত্র এই কারণে সে পরিবারে উপেক্ষিত। প্রথম থেকেই পিণ্ডদানের অধিকার অমান্যকরা নারীকে এক চূড়ান্ত সামাজিক অপমানের সম্মুখীন করেছিল। তাই সমাজের চোখে সে অপরাধী। পুত্র সন্তান পৃথিবীর আলো দেখার পূর্বেও পরে নানা সংস্কারের দ্বারা অভিষিক্ত হয় যা শৈশব থেকে তাকে দ্বিজত্বের সম্মান দেয়, বিপরীতে কন্যাসন্তানের জন্য কোন সংস্কার অপেক্ষা করে না, তার জন্মকে সমাজ অবৈধ না বললে ও দ্বিজত্বের মহিমায় মহিমান্বিত করে না। অথচ পালিসাহিত্যে সন্তান কামনায় নারী পুরুষ বৃক্ষদেবতার পুজো[5] করে কিন্তু এতকিছু করে যখন কন্যা জন্মায় তখন চারিদিকে সৃষ্টি হয় নিরানন্দের বাতাবরণ। শুধুমাত্র নারীর ক্ষেত্রেই এই মনোভাব চিরকাল অক্ষুণ্ণ ছিল এবং এখনও তার আভাস পাওয়া যায়, যখন কন্যা ভ্রুণ হত্যা নিবারণের জন্য এদেশে আইন প্রণয়ন করতে হয়, সেমিনার করতে হয়, দূরদর্শনের বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জনসাধারণকে আর্জি জানাতে হয়।

তবু কিছু কিছু ক্ষেত্রে কন্যা আদরণীয় হত হয়ত সেখানেই তারা অন্তত স্নেহের অধিকারে কিছুটা আশ্বস্ত। এদের মধ্যেই অবদান শতকের সুপ্রিয়া (সুপ্রিয়া অবদান, সংখ্যা ৭২) অন্যতম। শ্রাবস্তীর অনাথপিন্ডদ গৃহপতির কন্যা সুপ্রিয়ার আগমন সংবাদে শ্রাবস্তীর অধিবাসীরা আনন্দে উদ্বেল হয়েছিল। কিন্তু এমন উদাহরণ, বড়ই অল্প বরং তার চাইতে অবহেলার দৃষ্টান্তই বেশী।

যাযাবর পশুচারী আর্যরা এল উত্তর ভারতে যেখানে "সিন্ধু সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত ছিল, এরা কৃষিজীবী এবং নগর সভ্যতার যুগে বাস করত, ধাতুর দিকে যুগটা ছিল ব্রোঞ্জযুগ। ইতিহাসের সাক্ষ্য হল বৈদিক আর্যদের সঙ্গে লোহা ঢোকে ভারতবর্ষে। যাযাবর পশুচারী আর্যরা এদেশে এসে ধীরে ধীরে অনার্যদের পরাজিত করে প্রায় সমস্ত আর্যাবত অধিকার করে। প্রাগার্যদের সঙ্গে বিয়ে ও প্রতিবেশীত্বের মধ্যে দিয়ে আর্যরা ক্রমে চাষ করতে শেখে ও যাযাবর থেকে গ্রামীণ মানুষ হয়ে ওঠে।[6] কিন্তু একটি ব্যাপারে ক্রমশ পরিণতির দিক এগোচ্ছিল সমাজে শূদ্র ও নারীর স্থানের অনিবার্য অবনমন, অর্থাৎ ক্রমেই নারীর স্থান সমাজে ও পরিবারে নেমে যাচ্ছিল।

সোমযোগের একটা পর্বে যজ্ঞের কয়েকটি পাত্রকে মাটিতে রাখা হয় বাকি কয়েকটিকে ওপরে তুলে ধরা হয়, এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে সেই জন্যে সদ্যোজাত শিশুকন্যাকে মাটিতে রাখা হয়, শিশুপুত্রকে তুলে ধরা হয় (তৈত্তিরীয় সংহিতা ৬/৫/১০/৩) সমাজে নারী জন্মাবধি এই স্থানই পায়; পুরষের নিচে।

---

[5] Anguttara Nikaya (P.T.S.) Vol - III. P-43

[6] অবশ্য অনেকেই মনে করেন, প্রধানত পশুচারী হলেও আর্যরা কৃষিকাজও জানতেন।

শিক্ষার অধিকার যখন সঙ্কুচিত তখন নারীর জন্য একটি পথই খোলা থাকে পরিপূর্ণভাবে সংসার জীবনে প্রবেশ করা, সমাজ একটা নতুন নাম দিল তার "বিবাহ"।[7] মনুসংহিতা সহ অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রগুলি প্রাচীন ভারতে আট রকমের বিবাহ ব্যবস্থার উল্লেখ করেছে, যথা- ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, অসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ। মনু প্রত্যেকটি বিবাহের সংজ্ঞা সম্পর্কে যে মতামত দিয়েছেন সেগুলি হল- পিতা বা অভিভাবক যখন বস্ত্র ও অলঙ্কার দিয়ে সাজিয়ে কন্যাকে বিদ্বান ও চরিত্রবান পাত্রের হাতে সমর্থন করতেন, তখন সেটি হত ব্রাহ্মবিবাহ, যজ্ঞের অনুষ্ঠান কালে পুরোহিতকে সালংকরা কন্যা দানের নাম দৈব। যখন পিতা বরের কাছ থেকে একটি গরু ও একটি বলদ অথবা দুইজোড়া বলদ গ্রহণ করে কন্যাকে পাত্রস্থ করতেন তখন সে বিবাহকে আর্য বলা হত। "তোমরা দুজনে গার্হস্থ্য ধর্মপালন কর" এই শুভকামনা জানিয়ে পিতা বা অভিভাবক পাত্রের হাতে কন্যাকে সমর্পন করলে তা হত প্রাজাপত্য বিবাহ। পাত্র ও পাত্রী উভয়ে পরস্পরকে ভালবেসে যে বিবাহ করেন তার নাম গান্ধর্ব। কন্যাকে গায়ের জোরে হরণ করে যে বিবাহ তার নাম রাক্ষস এবং নিদ্রিত, পানাসক্ত বা বিকৃতমস্তিষ্ক নারীকে নিয়ে নির্জনে গমনের নাম পৈশাচ বিবাহ (মনুসংহিতা, ৩/ ২৭, ৩/২৮, ৩/২৯, ৩/৩০, ৩/৩১, ৩/৩৩, ৩/৩৪) । প্রায় সকল স্মৃতিশাস্ত্রকারগণই প্রথমোক্ত ছয়টি বিবাহ পদ্ধতিকে ধর্মসংগত বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। প্রসঙ্গত লক্ষণীয় পৈশাচ বিবাহকে একযোগে সকলেই ঘৃণ্য ও নিম্নরুচির পরিচায়ক বলে বর্ণনা করেছেন, "সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং যা রা হা যাত্রাপসাচ্ছতি/স পাপিষ্ঠো বিবাহনাং পৈশাচশ্চাষ্টমোহধমঃ" (৩/ ৩৪, মনুসংহিতা)। চিরকালই সমাজ বধূ হিসাবে সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, পরিশ্রমী কন্যা চেয়ে এসেছে যে সংসারের জন্য। উদয়াস্ত খাটতে পারবে, যার নিজস্ব বলে, মন বলে কিছু থাকবে না, প্রাচীন ভারতেও এধারণার ব্যত্যয় ঘটেনি। সেক্ষেত্রে আইন রক্ষকদের কন্যার প্রতি এ হেন সহানুভূতি তাপিত হৃদয়কে কিছুটা শান্তির আশ্বাস দেয়। এদেশে প্রাচীন যুগে পরস্পরকে ভালবেসে অথবা সভামধ্যে মনোমত পাত্র পছন্দ করে বিবাহের রীতি ছিল, নারী স্বাধীনতা সম্পর্কে নারাজ এবং নারী বিশ্বাসের যোগ্য নয় এমন মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে এরকম ছাড়পত্র সত্যই বিস্ময়ের নজির গড়ে। আসলে নারীরা যে অত্যাচারিত, অবহেলিত সে কথা আইন

[7] যদি মানব সংসার গঠনের প্রথমযুগে কোনো নীতি নিয়ম ছিল না। নিয়ম কানুনের বন্ধন মুক্ত নরনারী ইচ্ছামত একত্রে বাস করে সন্তান লাভ করত-

"অনাবৃতাঃ কিল পুরাষ্ট্রিয় আসন বরাননে।

কামাচার বিহারিণাঃ স্বতন্ত্রশ্চারুহাসিনি।" (মহাভারত, আদি ১২২/৫)

তাদের এই ব্যাভিচারেঅধর্ম হতনা, পূর্বে এই আচারই ধর্ম বলে পরিগণিত হত।

সংহিতাকারগণও বুঝতে পেরেছিলেন তাই মানবিক সহানুভূতি কিছুটা এসেই পড়েছিল। তবুও দমবন্ধ পরিবেশ ছিল আর সেই পরিবেশেই নারীর অস্তিত্ব কেমন ছিল সেটাই দেখার বিষয়।

পন্ডিতগণের মতে মহাভারতের রচনা কাল খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক পর্যন্ত। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যেই যখন কোন এক বিখ্যাত সংহিতাকার বলেছেন "সংসারে মানবগণকে কলঙ্কিত করাই স্ত্রী জাতির স্বভাব, একারণ পণ্ডিতবর্গ স্ত্রী জাতি সম্বন্ধে কখনই অনবধান হবে না"- "স্বভাব এষ নারীণাং নরাণামিহ দূষণং / আ তা হর্যান্ন প্রমাদ্যপ্তি প্রমাদাসু বিপশ্চিতঃ (৩/২১৩, মনুসংহিতা), তখন সেখানে প্রকাশ্যে নারীদের যুক্তি তর্ক যথেষ্ট তাৎপর্য বহন করে। অর্থাৎ সমাজে নারী পুরুষের সমকক্ষ না হলে ও অনেকাংশে তার আচরণের স্বাধীনতা ছিল। সাহিত্য সমাজের দর্পণ তাই মহাকাব্যগুলিতে তার প্রভাব যে পড়বে তা স্বাভাবিক। কিন্তু যদি সার্বিক উন্নয়নের কথা বলতে হয় তবে সত্য স্বীকার করতেই হবে নারীদের লাঞ্ছনার ভাগটাই ছিল আনুপাতিক হারে বেশি।

এদেশে বহু বৈদেশিক অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। এরা প্রথমে আক্রমণকারী হিসাবে আসত তারপর ধীরে ধীরে এদেশের অধিবাসীতে পরিণত হত। ইতিহাস পড়লে দেখা যায় বিভিন্ন সময়ে এই বৈদেশিক অনুপ্রবেশ সমাজপতিদের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কুষাণ রমণীদের কথাই ধরা যাক এরা অত্যন্ত উশৃঙ্খল জীবন যাপন করত। রূঢ়ভাষণ, অবাধ যৌনচার এদের কখনও বিব্রত বোধে আচ্ছন্ন করতনা। বাৎস্যায়ন স্বয়ং গুজরাট ও মালব রমণীদের নিন্দা করেছেন, এরা প্রকাশ্যে সুরাপান করত, নিন্দাছিল পাঞ্জাব রমণীদের সম্পর্কেও। এদের স্বভাব সনাতন ভারতীয় নারীদের ভাব মূর্তিকে নষ্ট করছিল, ভয় ছিল মিশ্রবর্ণের মত কুস্বভাব এদেশে প্রবেশ করবে কিনা, তাই কঠোর সংহিতা রচনা করে, পর্দাপ্রথা সুনিশ্চিত করে নারীকে শাসনে বেঁধে রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিছু সংখ্যক নারীর জন্য আপামর ভারতীয় নারীগণ বঞ্চিত হয়েছিল তাদের সামাজিক সম্মান ও স্বীকৃতি থেকে। বিষাক্ত আবহাওয়া ছড়িয়েছিল সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে।

"প্রাপ্তঃ চারিত্র সন্দেহা মম প্রতিমুখে স্তিতা।
দীপা নেত্রাতুরস্যেব প্রতিকূলাসি মে দৃঢ়া।।
তদ্ গচ্ছত্বানুজানেহদ্য যথেষ্টং জনকাত্মজে।
এতা দিশ দিশো ভদ্রে কার্যমস্তি ন মে ত্বয়া।।" (রামায়ণ, ৬/১১৫ / ১৭ - ২১)

এদেশে নিয়োগ প্রথা চালু হয়েছিল বৈধব্য জীবনে নিঃসঙ্গ, নিঃসন্তান বিধবাদের সন্তান আকাঙ্খা ও মাতৃত্বের স্বাদকে পূর্ণ করার জন্য। কিন্তু পরবর্তীকালে তা সমাজেরই স্বার্থ সিদ্ধির কাজে লেগেছিল। সেই ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই অনেক সময় নিজের ইচ্ছার বিরোধী হয়ে সহবাসে অক্ষম স্বামী ও তার পরিবারকে পুন্নাম নরক থেকে বাঁচতে ঋষি সরদণ্ডায়নের পত্নীর ন্যায় কোন নারীকে রাজপথে দাঁড়াতে হত। ঋষি নির্দ্বিধায় বলতেন

সুবেশ ধারণ করে রাজপথে দাঁড়িয়ে কোন সদ্‌ব্রাহ্মণকে আহ্বান করে পুত্র উৎপাদন কর (মহাভারত, আদিপর্ব)। সৎবংশের স্ত্রী, সৎবংশের কন্যা পুত্রের জন্য পথে নামবেন, তাহলে একজন সাধারণ দেহপসারিণীর সঙ্গে তাঁর তফাৎ কোথায় ? অথবা গালব মাধবীর উপাখ্যানে মাধবী পিতৃ অর্থ সংকটকে দূরভীত করবেন তিন বছর ধরে তিনজন রাজার কাছে শরীর বিক্রী করে (মহাভারত ৫ / ১১৮ -২২)।

এত অবরোধ করেও সমাজই নারীকে গণিকাবৃত্তির দিকে ঠেলে দিয়েছে, বাধ্য করেছে মনোরঞ্জনের মাধ্যম হতে তারপর তাকে আখ্যাদিয়েছে "নরকের দ্বার" হিসেবে। এত করেও কিন্তু অসতী নারীর সংখ্যা খুব একটা কম ছিল না, অন্তত সংস্কৃত সাহিত্যগুলিতে যেভাবে অবৈধপ্রণয়ের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে তাই এবাক্যের সত্যতা প্রমাণ করে। সবক্ষেত্রেই ভালমন্দ রয়েছে, নারীদের ক্ষেত্রেও ভাল মন্দ ছিল, কিন্তু সমাজের চোখে তার মন্দ দিকটাই বহুলরূপে উদ্ঘাটিত। প্রাচীন সমাজে তাই নারী মহিমা কীর্তিত হলেও তার অসতীত্ব প্রমাণের জন্য সমাজপতিরা সদাব্যস্ত থাকতেন । দোষ পুরুষতন্ত্রের নয়, দোষ সমাজ ব্যবস্থার, সমগ্র মনুষ্য চিন্তাধারার, তাই বারংবার প্রাচীন ভারতে নারী প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলেই সীতার চরিত্রের কথা উল্লেখ করা হয়, তার অগ্নিপরীক্ষার কথা সগর্বে উচ্চারিত হয়, কখনও ব্রহ্মজ্ঞান নিয়ে গার্গীর তর্কের কথা উচ্চারিত হয়না। বারংবার ধর্মের ধ্বজা তুলে মানুষ বলে কিভাবে সততার পরীক্ষায় উত্তীর্ণা সীতা দেবী মাধবীর কোলে আশ্রয় নিলেন, অথচ একথার মধ্যে নারীজাতির কতবড় লজ্জা, কতবড় অভিমান লুকিয়ে রয়েছে তা দেখার প্রয়াস প্রাচীন ভারতে ও ছিল না আজ এই শতকের আধুনিক ভারতেরও নেই। সীতা বলেন –

"যথাহং রাঘবাদান্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি।।
মনসা কমর্ণা বাচা যথা রামমর্ভ্যচয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি।।
যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্মি রামাৎ পরং ন চ ।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি।। (রামায়ণ ৭/৯৮/৭,৮)

-"রাঘব ছাড়া অন্য কাউকে যদি মনেও না চিন্তা করে থাকি, তবে মাধবী দেবী (পৃথিবী) আমাকে বিবর (আশ্রয়) দিন। মনে, কাজে, কথায় যদি রামকেই অর্চনা করে থাকি, তবে মাধবী দেবী বিবর দিন। রাম ছাড়া আর কাউকেই জানি না। একথা যদি সত্য বলে থাকি তবে মাধবী দেবী বিবর দিন।"এই একটি বক্তব্যের মধ্যে দিয়েই নারীর সম্মান, অধিকার, স্বীকৃতি, সমাজে তার সম্পর্কে মনোভাব পরিষ্কার হয়ে যায়। সীতার পাতাল প্রবেশ তাই শুধু সত্য প্রমাণ নয়, আসলে সমাজের সুকঠিন চাপে নারী যে নিচের তলার জীব তারই বাস্তব দলিল, আর এই দলিলই প্রমাণ করে সমাজে তার অধিকার কেমন ছিল।

সহায়ক গ্রন্থসূচী :

অমূল্যচন্দ্র সেন -বুদ্ধকথা (কলকাতা, ১৯৫৫)
করুণাসিন্ধু দাস (অনুবাদক) -শ্রীহর্ষঃ নৈষধীয়চরিত (কলকাতা, ১৯৮২)
গজেন্দ্র মিত্র -পাঞ্চজন্য (কলকাতা, ১৩৯৪)
জ্যোতিভূষন চাকী ও অবনী ভট্টাচার্য (অনুবাদক) - বাণভট্টঃ হর্ষচরিত (কলকাতা, ১৯৮২)
দিলীপ কুমার গঙ্গোপাধ্যায় -ভারত ইতিহাসের সন্ধানে (কলকাতা, 2000)
নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ী -প্রবন্ধঃ ফুলডোরে বাঁধ ঝুলনা (দেশপত্রিকা, কলকাতা, ১৯ শে নভেম্বর, ১৯৯৯)
রাজশেখর বসু -মহাভারত (সারানুবাদ, কলকাতা, ১৩৫৫)
রবিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (অনুবাদক) -ভাসঃ অভিষেক (কলকাতা, ১৯৮০)
শ্যামাপদ ভট্টাচার্য (অনুবাদক) -শ্রীহর্ষঃ প্রিয়দর্শিকা
শ্রীজীবন্যায় তীর্থ -পরাশর সংহিতা (বঙ্গানুবাদ, কলকাতা, ১৩৬৯), - বৃহস্পতি সংহিতা (বঙ্গানুবাদ, কলকাতা, ১৩৬৯)
সুকুমারী ভট্টাচার্য -প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য (কলকাতা, ১৯৮৮), -রামায়ণ ও মহাভারতঃ আনুপাতিক জনপ্রিয়তা (কলকাতা, ১৯৯৬), -বেদের যুগে ক্ষুধা ও খাদ্য (কলকাতা, ১৯৯৮), -বিবাহ প্রসঙ্গে (কলকাতা, ১৯৯৫)
সতী চট্টোপাধ্যায় -স্মৃতি সংহিতা, ফিরে দেখা (বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ, কলিকাতা,১৯৯২)।
সুকুমার সেনগুপ্ত -বৌদ্ধ ভারতে নারীর স্থান (কলকাতা, ১৯৪০)।
সুরেন্দ্রনাথ দেব (অনুবাদক) -বিশাখদত্ত ঃ মুদ্রারাক্ষস (কলকাতা, ১৯৭৮) -ভাস: উরুভঙ্গ (কলকাতা, ১৯৮০)।
Altekar, A.S. -Position of Women in Hindu civilization (Beneras, 1958).
Basham, A.L. -The Wonder That Was India (New Delhi, 1963).
Barua, Beni Madhab -Asoka and his Inscriptions (Calcutta, 1946).

Bhattacharyya, N.N.	-Ancient Indian History and civilization: Trends and perspectives (New Delhi, 1988).
Chattopadhyaya, Sudhakar	-Social Life In Ancient India, In the Background of The Yajnava Lkya-Smriti (Calcutta, 1965).
Ganguly, Dilip kumar	-Aspects of Ancient Indian Administration (New Delhi, 1979).
Hardy, E	-Anguttara Nikaya, Vol, III (P.T.S.). – Samyutta Nikaya, Vol, II, IV (P.T.S.).
Leon Feer, M	-Samyutta Nikaya, Vol, II, IV,(P.T.S.)
Law, B.C.	-Buddhist Bhekshunis in Inscriptions (Epigraphica India, Vol XXV).

সীতা ও দ্রৌপদী : নারী ও পুরুষ কবির চোখে – একটি বিশ্লেষণী পাঠ

বীণা মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : সীতা ও দ্রৌপদী - ভারতবর্ষের দুই আদি মহাকাব্যের প্রধান দুই নারী। তাদের জীবনের দুঃখ, দুর্দশা, লাঞ্ছনার আলেখ্য মহাকাব্যদ্বয়ের পাতায় যেমন স্পষ্ট, তেমনি পরবর্তীকালে আধুনিক কবিদের কবিতাতেও তা নানারূপে, নানা আঙ্গিকে উঠে এসেছে। আধুনিক কবিতায় এই দুই নারীর পুনর্নির্মিত রূপ আর মহাকাব্য নির্দিষ্ট পথে চলে এক রৈখিক থাকেনি। তা যেমন সময় থেকে সময়ান্তরে বদলে গিয়েছে, তেমনি পুরুষ ও নারী কবিদের রচিত কবিতাগুলিকে দুটি ভিন্ন পংক্তিতে রেখে যদি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করা যায়, তবে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রকাশের সূক্ষ্ম পার্থক্যও সহজেই প্রতিভাত হয়। পুরুষ কবিদের কলমে এই নারীদের যন্ত্রণা, লাঞ্ছনার ইতিবৃত্ত মহনীয় ভঙ্গিমায় উঠে এসেছে, এবং তা গৌরবান্বিত এক মিথের রূপ লাভ করেছে। অপরদিকে, নারী কবিরা সীতা ও দ্রৌপদীর লাঞ্ছনাকে কেবল মহাকাব্যের যুগে আবদ্ধ রেখে তাদের মুখে প্রতিবাদের ভাষা রোপণ করে, গৌরবান্বিত করতে চাননি। বরং, এই দুই নারীর যন্ত্রণার মূল শিকড়টিকে স্পর্শ করে, সেই যন্ত্রণার ধারার সঙ্গে সর্বকালের সর্বযুগের নারী হৃদয়ের ব্যথাতুর চিত্রকে মিলিয়ে দিয়েছেন। কয়েকজন কবির কবিতার পাঠ বিশ্লেষণের মধ্যদিয়ে সেই তুলনাকেই স্পষ্ট করা হল এই প্রবন্ধে।
মূল শব্দ : মহাকাব্য, রামায়ণ, মহাভারত, নারী, পুরুষ, কবিতা, অগ্নিপরীক্ষা, লাঞ্ছনা।

মূল আলোচনা :
'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' এই দুই মহাকাব্যের কেন্দ্রে আছে দুই নারী, সীতা ও দ্রৌপদী। মূলত এদেরকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে মহাকাব্যদ্বয়ের কাহিনি। কিন্তু বিরাট মহাকাব্যের বিশাল গৌরবময় অধ্যায়ে পুরুষের উন্নত চরিত্রের উজ্জ্বল উপস্থিতির কাছে সেই কেন্দ্রীয় নারীর অবস্থান ম্লান হয়েগিয়েছে। মহাকবির দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই থেকে গিয়েছে স্ববিরোধ। মহাকাব্যিক চরিত্রগুলির উপস্থাপনের মধ্যেই আছে ভিন্নতা, তাদের গঠনও একরৈখিক নয়। রামায়ণে সীতা উদ্ধারের লক্ষ্যেই রামচন্দ্র লঙ্কায় প্রবেশ করেন এবং সেখানে রাম-রাবণের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণের 'যুদ্ধকাণ্ড'এ বর্ণিত আছে সীতাকে সতীত্বের অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তবেই স্বামীর সঙ্গে অযোধ্যায় প্রবেশের অধিকার অর্জন করতে হয়েছে। আবার 'উত্তরকাণ্ড'এ প্রজানুরঞ্জনের জন্য

রামচন্দ্র গর্ভবতী পত্নীকে নির্বাসন দিয়েছেন। শেষে দুই সন্তান সহ সীতাকে পুনরায় গ্রহণ করতে চাওয়া রামচন্দ্র ও অযোধ্যাবাসী দ্বিতীয় অগ্নিপরীক্ষার আয়োজন করেন, যার ফলশ্রুতিতে সীতার রসাতল প্রবেশ ঘটেছে। অন্যদিকে মহাভারতে তৃতীয়পাণ্ডব অর্জুন দ্রৌপদীকে স্বয়ম্বর সভা থেকে জয় করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পঞ্চপাণ্ডবকেই বিয়ে করতে হয়েছে তাকে। এরপর 'সভাপর্ব'এ প্রথমপাণ্ডব যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় পণ রাখেন দ্রৌপদীকে। সভাগৃহে পঞ্চস্বামীর সম্মুখেই দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ও চরম অপমানে উদ্যত হয় দুর্যোধন ও দুঃশাসন। দ্রৌপদীর প্রতিজ্ঞানুসারেই দীর্ঘ বনবাসের পর 'ভীষ্মপর্ব'এ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধপর্বে দুর্যোধন ও দুঃশাসনের যথা নিয়মে মৃত্যু হয়। কিন্তু যুদ্ধ শেষে 'স্ত্রীপর্ব'এ দেখা যায় পঞ্চপুত্র ও অভিমন্যুকে হারিয়ে দুঃখী, অসহায় দ্রৌপদীর ছিন্ন-ভিন্ন হৃদয়ের আকৃতি। এরপর রানী দ্রৌপদীর উজ্জ্বল উপস্থিতির আতিশয্য সম্পূর্ণ ম্লান। আবার 'মহাপ্রস্থানিক' পর্বে স্বর্গ যাত্রার পথে দ্রৌপদীর পতনের কারণ হিসেবে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীমের প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন – "দ্রৌপদী আমাদের সকলের অপেক্ষা অর্জুনের প্রতি সমধিক পক্ষপাত করিতেন, এই নিমিত্ত আজি উঁহাকে তাহার ফলভোগ করিতে হইল।"[১]

মহাকাব্যের চরিত্র ও ঘটনা প্রবাহকে আধুনিক দৃষ্টিকোণে দেখা ও তার বিচারবিশ্লেষণের সূচনা উনিশ শতকে মাইকেল মধুসূদনের হাতে। তাঁর 'মেঘনাদ বধ' কাব্য আধুনিক মানুষকে শেখিয়েছে ভক্তির অন্ধ আনুগত্য ও আচরণ থেকে বের হয়ে যুক্তি দ্বারা ঘটনা প্রবাহকে বিচার ও বিশ্লেষণ করতে। অন্যদিকে 'বীরাঙ্গনা' পত্রকাব্যেই প্রথম পৌরাণিক নারীর দৃপ্ত প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শোনা যায়। সে কাঙ্ক্ষিত পুরুষ অথবা স্বামীর কাছে দীর্ঘ পত্রদ্বারা কৈফিয়ৎ তলব করেছে তার সঙ্গে ঘটে যাওয়া অপমান ও প্রবঞ্চনার। বিশ শতকের আধুনিক কবিগণ তাঁদের কবিতায় তুলে ধরেছেন নানা মহাকাব্যিক চরিত্র ও প্রেক্ষিতকে। আধুনিক কবিরা চিরপরিচিত মহাকাব্যিক কাঠামোকে সামনে রেখে তাঁদের ব্যক্তিগত ও সমসাময়িক সামাজিক নানা অনুভূতি, প্রশ্ন ও অভিব্যক্তিকে ব্যক্ত করেছেন। এই মহাকাব্যিক ভাবনাকে আধুনিকতায় ফুটিয়ে তোলা কবিদের, ভাবনা ও প্রকাশ ভঙ্গিমার মধ্যেও সময় থেকে সময়ান্তরে ঘটেছে পরিবর্তন। বদলে গিয়েছে একই চরিত্র ও ঘটনা কেন্দ্রিক ভাবনাগুলি। বিশ শতকের নানা দশকে পুরুষ কবির পাশাপাশি অনেক নারী কবির কবিতাতেও উঠে এসেছে নানা মহাকাব্যিক প্রসঙ্গ। একই মহাকাব্যিক চরিত্র ও কাহিনির পুনর্নির্মাণ ঘটেছে নারী ও পুরুষ কবির হাতে। আর স্বাভাবিক ভাবেই বদলে গিয়েছে বিশ্লেষণের ধরন, উপস্থাপনের ভঙ্গি ও আঙ্গিক।

বিশ শতকের তিরিশের দশকের উল্লেখযোগ্য কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র। তাঁর 'কখনো মেঘ' (১৯৬০) কাব্যগ্রন্থের 'সীতা' কবিতায়, 'রামায়ণ'এর 'উত্তরকাণ্ড'এ সীতার রসাতল প্রবেশের ঘটনার ইঙ্গিত দিয়ে, যেন মুগ্ধ হয়ে তার বন্দনা করেছেন। তিনি সীতার যন্ত্রণাকে সুদূর অতীতের মহাকাব্যিক আবরণে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই সীতার কাছেই

কবি তাঁর হৃদয়ের আকৃতি জানিয়েছেন, আবার কখনো তাকে ফিরে পাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন – "আরবার হল-মুখে ফিরে কভু পাব সেই সীতা।"[২] সত্তরের দশকের কবি সব্যসাচী দেবের 'স্তব্ধ স্মৃতি বহমান স্রোত'(১৯৮৫) কাব্যগ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা 'সীতা'। দ্বিতীয় অগ্নিপরীক্ষার বিশেষক্ষণে দাঁড়িয়ে সীতার নিভৃত হৃদয়ের আবেগকে ব্যঞ্জনাময়ভাবে সব্যসাচী তুলে ধরেছেন তাঁর কবিতায়। 'প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড'র সামনে একাকী দাঁড়িয়ে সীতা। তার মনে একে একে ভিড় করছে পূর্ব স্মৃতি। সে যেন বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে তার অবস্থানকে। তার হৃদয়ে উঠে আসা সম্ভাবনাময় নানা প্রশ্ন ও যন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন কবি। সীতার মনে প্রশ্ন জেগেছে –

"দূরে সিংহাসনে বসে আছেন রামচন্দ্র ;
প্রিয়তম তাঁর ! –
সে তো আজ মূঢ়তার স্তুতিধন্য,
দেবতার মতো প্রেমহীন,
তাহলে কোথায় আশ্রয় !"[৩]

পুরুষের অপমানে ও অবহেলায় লাঞ্ছিতা ও যন্ত্রণাদগ্ধ এই সীতার কাছে আর্য-অনার্য, রাম–রাবণ, দেবতা–নর কোন ভেদ নেই। সকলেই আসলে পুরুষ। সকলের কাছেই নারী পণ্য মাত্র, শুধুই সম্পত্তি –

"স্বর্ণলঙ্কায় ছিল বিপুল বৈভবের বিভা,
আর এই অযোধ্যায় কুল–অহংকার।"[৪]

এই অন্তিম পরীক্ষার মুহূর্তে দাঁড়িয়ে সব্যসাচীর সীতা ভাবে ভুল ছিল তার স্বয়ম্বরের শর্তের মধ্যে। যে 'কঠিন মাটির বুকে শস্যের দিগন্তপ্লাবী শোভা' আনতে পারবে, তাকেই তো সীতা সমর্পণ করা যায়। যে রামচন্দ্র সীতা অধিকার করেছিলেন তার প্রতি সীতার উক্তি –

"ভালোবাসা নয়। রামচন্দ্র শুধু চান অধিকার ;
যে-মাটি ফসলে ভরে গোলা
সেই মাটি, সে-ফসল আর
মাটির সন্তানের দ্বিধাহীন আত্মসমর্পণ।"[৫]

আধুনিক যুগের পুরুষ কবির চোখে যে সীতা একবার মাত্র 'চিরন্তন জননী ও জায়া' বলে আখ্যাত হয়ে পরমুহূর্তেই ভূমিকন্যার মিথে নিমজ্জিত হয়েছে। সেই সীতাকে অযোধ্যাবাসীর সামনের অগ্নিপরীক্ষার মঞ্চে দাঁড়ানো মহাকাব্যিক নায়িকার আবরণ খসিয়ে, সেখান থেকে ধূলিধুসরিত মর্ত্যভূমিতে নামিয়ে এনে বর্তমান কালের সকল নারীর জীবনযন্ত্রণার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন নবনীতা দেবসেন ও মল্লিকা সেনগুপ্ত। প্রতিটা নারীকেই কীভাবে জীবনের প্রতিটি ধাপে পরীক্ষা দিতে হয় তা উঠে এসেছে নবনীতার 'সীতার পাত্রসন্ধানে' কবিতায়। একটি মেয়ে যতই উপযুক্ত ও স্বনির্ভর

হোকনা কেন, সমাজের কঠোর নিয়মে তাকে যথা সময়ে পাত্রস্থ করতেই হয়। এ বিষয়ে চিরাচারিত প্রথায় বিনা অপরাধেই সে বাবা-মায়ের একমাত্র দুশ্চিন্তার পাত্রী হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত তাকে বলি হতে হয় সমাজের কঠোর কঠিন যূপকাষ্ঠে। প্রতিনিয়ত সমাজের প্রতিটি মেয়ের এই অগ্নিপরীক্ষা কোন পুরুষের পক্ষেই বোঝা সম্ভব নয়। সেই কারণেই সমাজের সকল কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার কন্যা হয়েই সীতা উঠে এসেছে নবনীতার কবিতায়। এই সীতাকে যে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হচ্ছে, যে আগত নির্বাসিত বনবাসের সংকেত সে পেয়েছে তা কোন মেয়ের কাছেই অপরিচিত নয়, তাইতো পাত্রসন্ধানে ব্যাকুল বাবার পথে নামা তাকে কষ্ট দেয়, অস্ফুট এক যন্ত্রণায় ভরে ওঠে তার হৃদয়। আজকের সীতার এই কষ্ট পাওয়ার ধরণও কোনও মহাকাব্যিক মহনীয়তায় আবর্তিত নয়, তা আমাদেরই পরিচিত ছবি-

"কেউ দ্যাখেনি ওপর-ঝরোকাতে
কে দাঁড়িয়ে, জানলায় চোখ ভরা-
আধ্-খাওয়া এক পেয়ারা ডান হাতে
অন্য হাতে আনমনে শিক্ ধরা।"[৬]

'রামায়ণ'র শ্রীরামচন্দ্রের নামে প্রচলিত রামরাজ্যের প্রথাগত ধারণাকে নস্যাৎ করে দিতে 'রামরাজ্য' কবিতায় সীতার যন্ত্রণাকে মহাকাব্যিক আবরণে তুলে আনলেও এক আধুনিক দৃষ্টিকোণে তাকে উপস্থাপন করেছেন কবি। 'রামায়ণ' অনুসারে রামচন্দ্র ভরতকে সাম্রাজ্যের সঙ্গে সীতার অধিকারও দিতে চেয়েছেন, এবং সীতাকেও প্রস্তাব দিয়েছেন ভরত, শত্রুঘ্ন, লক্ষণ যাকে ইচ্ছা অঙ্কশায়ী করার। একজন স্বামী যখন তার পতিব্রতা স্ত্রীকে এমন প্রস্তাব দেন তা কখনোই উদারতার পরিচায়ক নয়। বরং পুরুষটির সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত মন ও নারীর প্রতি অত্যন্ত অপমানকর মানসিকতারই পরিচয় দেয়, একথা একজন নারীই বলতে পারেন। যেমনটা বলেছেন মল্লিকা-

"সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত এই যুবকের
পত্নীপ্রেম তবু নাকি ভারত বিখ্যাত!"[৭]

'অশোকবনে সীতা সরখেল' কবিতায় কোন মহাকাব্যিক কাহিনির আশ্রয় নেননি মল্লিকা। কিন্তু এক শিক্ষিতা আধুনিক নারীর জীবনের চরম ঘটনা উঠে এসেছে মহাকাব্যিক সীতার পরিণতির আধুনিক সংস্করণ রূপে। মুক্তিকামী বনমিলিশিয়াদের নেতা আরণ্যকের হাতে বন্দী হয়েছে লালপাহাড়ির বিডিও ম্যাডাম সীতা সরখেল। এই আরণ্যক রাবণেরই প্রতিভূ আর বনমিলিশিয়ারা সভ্য সমাজের কাছে অনার্য রাক্ষস। সীতা সরখেলের অপহরণে প্রশাসন নিরুত্তাপ। শাশুড়ির একমাত্র উদ্বেগ- বনেজঙ্গলে সীতার আব্রু থাকছে তো ? সাংবাদিকের মার্জিত ভাষায় -

"বিডিও হলেও তিনি একজন ভারতীয় বধূ
রাক্ষসে ছুঁলে লজ্জায় তাঁর মাথা কাটা যাবে।"[৮]

শেষ পর্যন্ত আরণ্যক ও প্রশাসনের মধ্যস্থতায় সীতা ঘরে ফেরে, কিন্তু শাশুড়ি ও স্বামীর সন্দিগ্ধ প্রশ্ন বিদ্ধ করে তাকে –

"কোনও ক্ষতি হয়নি তো বউমা তোমার ?
....।।
.........ওরা গায়ে হাত দেয়নি তো ?
জংলি বর্বর সব, অশ্লীলতা করেনি তো কেউ ?"[৯]

সীতার মনে হয় সে মধ্যযুগে ফিরে গেছে। তার কর্মনিষ্ঠার প্রতি প্রশাসনের সন্দেহ আর আপনজনদের অপরিচিত রূপ তাকে এক নতুন অভিজ্ঞতার সামনে দাঁড় করায়। শেষ পর্যন্ত সব সন্দেহ আর কৌতূহলের অবসান ঘটিয়ে সীতা সখরেল চলে যেতে চায় অশোক বনে, যেখানে আছে বনমিলিশিয়ারা। সীতা তাদের কাছে আহ্বান করবে শান্তি কল্যাণের, অস্ত্র থামানোর। আধুনিক সীতার এই পরিণতি ও জীবনযন্ত্রণাকে প্রতিটি শিক্ষিতা ও কর্মরতা নারীর জীবনের সঙ্গে এক করে দিয়েছেন মল্লিকা। প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর পুরুষ চোখে ভূমিকন্যা সীতা ও সীতার যন্ত্রণাকে দেখে আবারও 'ছায়া' নয় 'কায়া' হয়ে জন্মানোর আহ্বান করেছেন। মল্লিকা, নবনীতা সমাজের প্রতিটি স্তরে সেই সীতাকেই খুঁজে পেয়েছেন। সব স্তরের নারীর যন্ত্রণার মধ্যে সীতাকে দেখেছেন, নারী হৃদয় দিয়ে তাকে উপলব্ধি করেছেন ও প্রকাশ করেছেন।

এরপর আসা যাক দ্রৌপদীর প্রসঙ্গে। অষ্টাদশ পর্বের বৃহৎ মহাভারতের সর্বাধিক চর্চিত ও প্রধাণ নারী চরিত্র দ্রৌপদী। যিনি পাঞ্চালী ও কৃষ্ণা নামেও পরিচিত। কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'সায়ম্'(১৯৪১) কাব্যগ্রন্থের 'কৃষ্ণা' উল্লেখযোগ্য একটি কবিতা। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস রচিত মহাভারতের 'আদিপর্ব'র 'চৈত্ররথপর্বাধ্যায়' অংশে বর্ণিত যজ্ঞবেদীতে দ্রৌপদীর জন্মবৃত্তান্ত থেকে শুরু করে 'সৌপ্তিকপর্ব'র 'সৌপ্তিকপর্বাধ্যায়' ও 'ঐষিকপর্বাধ্যায়'এ বর্ণিত অশ্বত্থামা কর্তৃক দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রের হত্যা এবং অশ্বত্থামার প্রতি কৃষ্ণের অভিশাপ, তার থেকে হরণ করে আনা শিরোমণি দ্রৌপদী কর্তৃক যুধিষ্ঠিরের মস্তকে স্থাপন পর্যন্ত কাহিনির সুচারু উল্লেখ আছে এই কবিতায়। দ্রৌপদী তথা কৃষ্ণার প্রতি অসীম শ্রদ্ধায় কবি তাকে কখনো দেবী কখনো মা বলে সম্বোধন করেছেন –

"অবলার দলে তুমি বলবতী
হে দেবী, আপন পুণ্যে-পাপে,
আঁকিতে তোমার মর্মের ছবি
ভারত-কবিরও লেখনী কাঁপে।"[১০]

সভামাঝে একাকী উপস্থিত অপমানিতা, লাঞ্ছিতা দ্রৌপদীর উদ্দেশ্যে কবি–

"পুরুষের মাঝে বিবস্ত্রা তুমি
ধর্মমেষেরা শাস্ত্র ভাবে !
পুরুষ ছিল কি সেই সভাতলে

যারে দেখে তুমি লজ্জা পাবে?
শুধু বুঝে নিলে নরের রাজ্যে
কত নিরুপায় নিখিল নারী,”[১১]

ভরা সভামাঝে কোন নারীর বস্ত্রহরণ করা হল, অপমানিতা সেই নারীর লজ্জা ও সম্মান কাপুরুষ বা সুপুরুষের তাত্ত্বিক আলোচনায় ব্যাখ্যা করা যায়না। কোন পুরুষের চোখেই নারীর এই সূক্ষ্মলজ্জাশীলতার আভরণ খানিক অধরা থেকে যাওয়া হয়তো খুব আশ্চর্যের নয়। একজন নারীর পক্ষে সেই সূক্ষ্ম অনুভূতিকে স্পর্শ করা, তাকে অনুভব করা হয়তো অনেক বেশী স্বাভাবিক। নারীর সেই অনুভূতিকে আত্মস্থ করেই ‘দ্রৌপদীজন্ম’ কবিতায় মল্লিকা অবলীলায় পুরুষ জাতির প্রতি কটাক্ষ হেনেছেন –

“হে পুরুষ !
রূপ দেখলেই কেন হাতের মুঠোয় চাও জ্যান্ত মানবীকে !
না পেলে তারই শাড়ি টেনে ধরে অশ্লীল হাসিতে
তার মুখ কালো করে দিতে চাও।”[১২]

যতীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষে দ্রৌপদীর আকাঙ্ক্ষিত প্রতিহিংসা পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু অশ্বত্থামার হাতে নিহত হয়েছে তাঁর পঞ্চপুত্র। এরপরই প্রশ্ন ওঠে , দ্রৌপদী তার অপমানের প্রতিশোধ নিয়ে সুখী হতে পেরেছে কী? শূন্য হৃদয়ের একাকীত্ব কী তাকে প্রকৃত বিজয়ীর আনন্দ উপভোগ করতে দিয়েছে? না সে তার কাঙ্ক্ষিত সুখ ও মর্যাদা ভোগ করতে পারেনি। ‘স্ত্রীপর্ব’র সেই ব্যথিত হৃদয়া একাকিনী নারীর চিত্র উঠে এসেছে এই কবিতায়। কবিতার শেষ পঙক্তিতে কবি দ্রৌপদীকে সম্বোধন করেছেন – “হে কৃষ্ণা, অয়ি কৃষ্ণ সখি !” বলে। তবে কী দ্রৌপদীর সমস্ত যন্ত্রণা, যাকিছু তার কাম্য ছিল তা সবই পাওয়া বা না পাওয়ার মাঝে এই একটি পরিচয়ই কী তার শেষ ঘুঁটি, শেষ সম্বলের মতো রয়ে গেলো? সভাগৃহে চরমমুহূর্তে বস্ত্রহরণের লজ্জা থেকে রক্ষা করেছে যে কৃষ্ণ, দ্রৌপদী শুধু তারই সখি! বৈচিত্র্যময় জীবনের অনেককিছু হারানোর একমাত্র সান্ত্বনা এই কৃষ্ণ সখি পরিচয়ই কী কবি দিতে চেয়েছেন দ্রৌপদীকে? অন্যদিকে ‘দ্রৌপদীজন্ম’ কবিতায় মল্লিকা ঠিক এই প্রসঙ্গ থেকেই প্রশ্ন তুলেছেন –

“দ্রৌপদীর চোখে তিনি তো রীতিমত হিরো, হিম্যান। কিন্তু ভাবুন তো বেচারা রাধার কথা। তার তো যত সর্বনাশের মূলে কৃষ্ণ স্বয়ং।”[১৩]

কৃষ্ণের এই দায়িত্ববোধ, এই সখা ভাব, রক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়াকে সর্বতভাবে প্রশ্ন করতে পারেন একজন নারীই। যেমনটা করেছেন মল্লিকা। বিভিন্ন পুরুষের থেকে বঞ্চিত, অপমানিত, দুঃখী কৃষ্ণাকে কোন এক নির্ভরযোগ্য পরুষের পাশে রেখে তাকে পুরুষ মনে সান্ত্বনা দিতে চেয়েছেন যতীন্দ্রনাথ। আর এক্ষেত্রে সেই নির্ভরযোগ্য পুরুষ স্বয়ং কৃষ্ণ অপেক্ষা উন্নত আরকে হতে পারেন ? কিন্তু কোন আধুনিক নারীই জীবনের চরম বঞ্চনার অন্তিমে কোন পুরুষের ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিতে

চায় না, সেখানে সে নিরাপত্তা অনুভব করেনা। কারণ সে জানে, পুরুষ কর্তৃক নারী উদ্ধার এক প্রহসন মাত্র, এক নারীর প্রতি সদয় হলেও অন্য নারী ঠিকই দলিত হয়েছে তার পৌরুষত্বের অহংকারের চাকায়। ঠিক যেমন কৃষ্ণ রাধাকে প্রবঞ্চনা করে দ্রৌপদীকে সহায়তা করেছেন।

সব্যসাচী দেবের কৃষ্ণা দ্যূতসভায় দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে বিদ্ধ করেছে পঞ্চপাণ্ডব সহ কুরুকুলের মহারথীদের। যতীন্দ্রনাথের মতো সব্যসাচী দেবের কৃষ্ণাও কুরু-পাণ্ডবের তুলনায় রত –

> " ভেদ নেই ধর্মপ্রাণ যুধিষ্ঠির, শক্তিমান ভীম, প্রেমিক অর্জুন
> আর লোলুপ ধৃতরাষ্ট্রনন্দনদের মধ্যে।"[১৪]

তৃতীয়পাণ্ডব অর্জুনই দ্রৌপদীর একমাত্র কাঙ্ক্ষিত পুরুষ। সেই কারণেই সব্যসাচী দেবের কৃষ্ণা তার সকল অভিমান আর যন্ত্রণা নিয়ে তীব্র বিদ্রুপে দগ্ধ করেছে অর্জুনকে –

> " .... কৈশোর থেকে তুমি
> জেনে এসেছ বীরভোগ্যা পৃথিবী আর রূপমুগ্ধা নারী ;
> ....
> অর্জুন, প্রথম দেখার মুহূর্তে আমার হৃদয় দিয়েছিলাম তোমাকে ;
> অথচ আমার শরীরকে প্রথম আলিঙ্গন করলেন
> ওই মহাভাগ, যাঁর খ্যাতি ধর্মপুত্র বলে ।
> ....
> আর অর্জুন, অন্তঃপুরে যাও, সেখানে তোমার জন্য
> স্নিগ্ধ শরীর সাজিয়ে রেখেছে তোমার কোনো প্রেয়সী।"[১৫]

সব্যসাচীর দ্রৌপদী নিজের কষ্ট ও বেদনাবোধ থেকে এমনই নানা প্রশ্ন ও অভিযোগ করেছে, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের অবস্থান এবং অধিকার বিষয়ে সে নীরব থেকেছে। আসলে সেখানেই পুঞ্জীভূত হয়ে আছে তার সকল লাঞ্ছনা আর অবমাননার মূল। মল্লিকার দ্রৌপদী প্রথমেই সেই প্রশ্ন করেছে –

> "স্ত্রীকে পণ রাখবার অধিকার কে দিল স্বামীকে?"[১৬]

রাজকন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরসভা থেকে অর্জুন তাকে জয় করেছেন। যুধিষ্ঠির সেখানে কোন্ অধিকারে তার স্বামী হতে পারেন এবং পুরুষের দ্যূতক্রীড়ায় পণ রাখতে পারেন সেই স্ত্রীকে? এই প্রশ্ন একজন নারী কবির সৃষ্টি দ্রৌপদীর মুখেই উচ্চারিত হতে পারে। কারণ একজন নারীই পারে অন্য নারীর হৃদয়ের প্রকৃত যন্ত্রণাকে আনুধাবন করতে। অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদীর পক্ষপাতিত্ব স্বাভাবিক, কিন্তু ব্যাসদেবের মহাভারতের 'মহাপ্রস্থানিক' পর্বে যুধিষ্ঠির জানিয়েছেন সেই কারণই তার পতন, অর্থাৎ এ তার অপরাধ ও তার সকল যন্ত্রণার মূলে। সব্যসাচীর দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের অবস্থানে তাঁর

কৃতকর্মে দুঃখ পেলেও সরাসরি তাঁকে কোন প্রশ্ন করতে পারেনি, মল্লিকার দ্রৌপদী প্রতিবাদী নারীর সেই শক্তি অর্জন করে এই প্রশ্ন করতে পেরেছে।

সীতা ও দ্রৌপদীর যন্ত্রণা, অবমাননা আধুনিক নারী ও পুরুষ উভয় কবির কবিতাতেই একাধিক আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে উঠে এসেছে। মহাকাব্যিক সাম্রাজ্ঞীর যন্ত্রণার মিথ্ আধুনিক ভঙ্গিতে মহনীয় ভাষায় প্রেমেন্দ্র মিত্র, যতীন্দ্রনাথ, সব্যসাচী দেব প্রমুখের কবিতায় উঠে আসলেও, সেই যন্ত্রণার মধ্যে সুপ্ত থাকা সর্বকালের সকল নারীর চিরকালীন মনোবেদনা ও যন্ত্রণার নিভৃত মর্মগাঁথা কোথাও যেন মহনীয়তার আড়ালে, তাঁদের পুরুষ হৃদয়ে তা অধরাই রয়ে গিয়েছে। এই পুরুষ কবিরা কোথাও যেন তাঁদের পুরুষ মন দিয়ে নারী হৃদয়ের সেই গুপ্ত কুঠুরিতে হানা দিয়ে, তাদের যন্ত্রণাহত সেই আহত হৃদয়কে সহমর্মিতায় স্পর্শ করতে অপারগ। অপর দিকে নারী কবি নবনীতা দেবসেন ও মল্লিকা সেনগুপ্ত নারী হৃদয় দিয়ে সীতা ও দ্রৌপদীর যন্ত্রণাদগ্ধ হৃদয়ের মূল শিকড়টিকে ছুঁতে পেরেছেন এবং তার সঙ্গে যুক্ত থাকা সমাজের সকল স্তরের নারীর যন্ত্রণাকে তাঁরা একাত্ম করতে পেরেছেন। যা তাঁদের কবিতায় সার্থকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। যার ফলে সীতা ও দ্রৌপদী পুরুষের চোখে দেখা দুঃখী ও সহনশীল মহাকাব্যিক নারী কেবল হয়ে থাকেনি, তাঁরা সমাজের প্রতিটি নারীর যাপিত জীবন ও যন্ত্রণার সঙ্গে একাত্ম হয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১। কালীপ্রসন্ন সিংহ, ‘মহাভারত’(দ্বিতীয় খণ্ড), প্রথম প্রকাশ, বেণীমাধব শিল’স লাইব্রেরী, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৭ সন, পৃ : ১৪২২

২। প্রেমেন্দ্র মিত্র, ‘সীতা’ ‘কবিতা সমগ্র’, সম্পাদনা–ডঃ সরোজমোহন মিত্র, নিরঞ্জন চক্রবর্তী, প্রথম সংস্করণ, গ্রন্থালায় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২৫শে বৈশাখ, ১৩৯৬, পৃ : ১৭৯

৩। সব্যসাচী দেব, ‘সীতা’ ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’, তৃতীয় সংস্করণ, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০১৮, পৃ : ৭৩

৪। ঐ : পৃ : ৭৪

৫। ঐ : পৃ : ৭৫

৬। নবনীতা দেবসেন, ‘সীতার পাত্রসন্ধানে’ ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’, ষষ্ঠ সংস্করণ, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, অগ্রহায়ণ, ১৪২৬, পৃ : ১৬০

৭। মল্লিকা সেনগুপ্ত, ‘রামরাজ্য’ ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’, চতুর্থ সংস্করণ, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, মাঘ, ১৪২৪, পৃ : ৭২

৮। মল্লিকা সেনগুপ্ত, ‘অশোকবনের সীতা সরখেল’, ‘কবিতাসমগ্র’, সম্পাদনা-সুবোধ সরকার, প্রথম সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, মার্চ, ২০১২, পৃ : ৫৪৭

৯। ঐ : পৃ : ৫৫২
১০। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, 'কৃষ্ণা', 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' সুশান্ত বসু সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ, ভারবি, কলকাতা, সেপ্টেম্বর, ২০০১, পৃ : ৮৪
১১। ঐ : পৃ : ৮৬
১২। মল্লিকা সেনগুপ্ত, 'দ্রৌপদীজন্ম' 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', চতুর্থ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, মাঘ, ১৪২৪, পৃ : ৮৫
১৩। ঐ : পৃ : ৮৭
১৪। সব্যসাচী দেব, 'কৃষ্ণা' 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', তৃতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০১৮, পৃ : ৪২
১৫। ঐ : পৃ : ৪১
১৬। মল্লিকা সেনগুপ্ত, 'দ্রৌপদীজন্ম' 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', চতুর্থ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, মাঘ, ১৪২৪, পৃ : ৮৩

ঋত্বিক ঘটকের ‘কাঞ্চন’: ‘বাড়ি’ থেকে পালিয়ে ‘এলডোরেডোর’ খোঁজে

দেবলীনা সেন
গবেষক, বাংলা বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ/Abstract : ১৯৫৮। ঋত্বিক ঘটকের পরিচালনায় মুক্তি পেয়েছিল বাংলা চলচ্চিত্র ‘বাড়ি থেকে পালিয়ে’। title চলাকালীন, যদিও ঋত্বিক বলে দিয়েছিলেন শিবরাম চক্রবর্তীর মূল কাহিনী অবলম্বনে (শিবরামের ‘বাড়ি থেকে পালিয়ে’ কিশোর উপন্যাসটির প্রথম প্রকাশ ১৯৩৭), কিন্তু দুই স্রষ্টার দৃষ্টিকোণের ভিন্নতার কারণে প্রোট্যাগনিস্ট চরিত্রটির নাম একই থাকলেও, দু ক্ষেত্রেই কাঞ্চন বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলেও এবং অন্যান্য কিছু কিছু ঘটনার খানিক সাদৃশ্য থাকলেও সাহিত্য থেকে সিনেমার আবেদন ও বক্তব্যে যে তারতম্য ঘটে গেছে তা লক্ষ্য করা যায়। আরও একটি বিষয়, আখ্যানের সময়পর্ব বিশ শতকের প্রথম দুই দশক অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসিতপরাধীন ভারতবর্ষ আর সিনেমাটি যে সময়কে কেন্দ্র করে তৈরি হল, সেখানে দেখা গেল সদ্য স্বাধীন দেশ। সাহিত্য থেকে সিনেমার বৈচিত্র্যগুলি দেখানোর অবকাশ এখানে নেই, তাই সরাসরি চলে আসা যাক মূল আলোচনায়। ‘বাড়ি থেকে পালিয়ে’ সিনেমাটির ইংরাজী টাইটেল দেওয়া হয়েছিল, ‘Runway’ or ‘The Runway’. আট বছরের বালক কাঞ্চন। কাজলদীঘি নামক বাংলাদেশের এক প্রত্যন্ত গ্রামের সন্তান সে। বাড়ি থেকে পালিয়ে সে চলে এসেছিল কোলকাতায়। কিন্তু সিনেমার শেষে দেখা গেল আবারও বাড়িতেই ফিরে আসে এই কিশোর। কিছু প্রশ্ন তৈরী হয় এখান থেকে, এই কিশোর আদৌ কোথা থেকে পালাতে চেয়েছিল, বাড়ি বলতে এখানে কি কেবল ইট-কাঠের গড়া এক জড় কাঠামো, কেন পালাতে চায় কাঞ্চন, এই পলায়নকে কি escapism বলা যায়? যদি সে বাড়ি থেকে পালিয়েই যেতে চেয়েছিল, তাহলে ঋত্বিক কি কেবল মিলনাত্মক পরিণতি দেখানোর জন্যই কাঞ্চনকে আবার বাড়িতেই ফিরিয়ে নিয়ে এলেন? এরকমই কিছু প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে এই আলোচনা।

মূল শব্দ/Key Words : শৈশব, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, শাস্তি,শৃঙ্খল,পলায়ন।

মূল প্রবন্ধ :

কাঞ্চন গ্রাম্য বালক। সিনেমায় তাঁর যে পরিবারটিকে দেখানো হচ্ছে, সেখানে মূল সদস্য সংখ্যা তিন – কাঞ্চন, তার মা, কাঞ্চনের বাবা। এবং রয়েছে ভৃত্য নন্দ। একটি গ্রামীণ পরিবারের পক্ষে সদস্য সংখ্যা এত কম, সেখানে কাঞ্চনের পিতামহ বা পিতামহী কেউই উপস্থিত নেই, এমনকি পরিবারে কোনো দুসম্পর্কের আত্মীয় নেই এটা একটু

চোখে পড়ার মত। এ খানিক শহুরে মধ্যবিত্ত পরিবারের মত – বাবা, মা ও এক সন্তান। এবং লক্ষ্য করা যাচ্ছে, পরিবারটি গ্রামে বসবাস করলেও, পরিবারের আয়ের উৎস কোনোভাবেই প্রাথমিক উৎপাদনের সঙ্গে সংযুক্ত নেই। কাঞ্চনের বাবা কাজলদীঘি স্কুলের হেডমাস্টার। একটু দেখার মত, এই সিনেমায় কাঞ্চনের বাবা, মা এবং কাঞ্চনের পদবীর কোনো উল্লেখ নেই, শহরে যতবার কাঞ্চনকে তার নাম জিজ্ঞাসা করা হল সে কেবল তার নাম বলেছে, পদবী নয়। একটি মানুষের পদবী তার ইতিহাসের সাথে সংযুক্ত, পদবী তার বংশপরিচয়, তার শ্রেণী, বর্ণ, ধর্মকে ধরে রাখে এবং ভারতবর্ষীয় গ্রামীণ সমাজে, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষের জাত-পাত-ধর্ম-বর্ণ মানুষকে মান্যতা দেওয়ার অন্যতম প্রধান মাপকাঠি। আম্বেদকর বলেছিলেন, একজন মানুষ একমাত্র তার এই পরিচয়গুলিকে ছেড়ে স্বাধীনভাবে উপার্জন করতে পারে শহরে এসে। সিনেমাটি যে সময়কে অবলম্বন করে আছে তা স্বাধীনতা-উত্তর ভারত, কোলকাতা শহর কল্লোলিনী তিলোত্তমা হতে ছুটছে তখন, শহর পৌঁছে যাচ্ছে গ্রামে। তাই কি গ্রামীণ বালক কাঞ্চন শহরে এসে যতবার তার পরিচয় দেয়, নিজের নামের সাথে আর কিছু জুড়ে দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেনা সে। তাই কি পরিচালক দেখান, বিনোদ যখন পৈতে ধরে কাঞ্চনকে ব্রক্ষশাপ দিতে যায়, পৈতে তখন ছিড়ে যায়, স্বাধীন ভারতবর্ষ, যে সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো থেকে বাণিজ্যিক পুঁজিবাদ হয়ে শৈল্পিক পুঁজিবাদের দিকে এগোচ্ছে সেখানে ব্রাহ্মণত্ব দিয়ে আর টিকে থাকা যাবেনা। এমনকি এখানে আরও যত মা, বাবারা এসেছেন, বিনোদের বাবা, মিনির মা, মিনির বাবা, চন্দনের মা কারোর নাম এবং পদবীর কোনো উল্লেখ নেই, খুব বেশী হলে, তারা পরিচিত হয়েছেন সন্তানের নাম দিয়ে। তাহলে কি এখানে বাবা, মা এরা কোনো বিশেষ ইঙ্গিত নিয়ে এখানে উপস্থিত ? সিনেমায় দেখা যাচ্ছে, স্কুল যাওয়ার পথে বিনোদের মাথায় দইয়ের হাঁড়ি ভাঙে কাঞ্চন, এবং স্কুলে না গিয়ে সেদিন বই ফেলে রেখে নৌকা আর দাঁড় নিয়ে জলাশয়ের মধ্যে দক্ষিণ আমেরিকা অভিযানের খেলা খেলতে থাকে সে। বাবা নন্দকে দিয়ে ছেলের খোঁজ পাঠালেও নন্দকে প্রত্যাখ্যান করে কাঞ্চন। এবং এর পরে বিনোদের সাথে সব মিটমাট হয়ে গিয়ে যখন এল ডোরেডোর স্বপ্নে মশগুল হয়ে কাঞ্চন তাকে এই সব পেয়েছির দেশের কাহিনি শোনাতে থাকে, তখনই লাঠি উঁচিয়ে বজ্রনিনাদে বাবা হাজির। এই মুহূর্তে কাঞ্চন পালাল। কিন্তু এটাই কি একমাত্র কারণ ? না কি স্ফুলিঙ্গ দেখা গিয়েছিল আরও আগে থেকেই ? একেবারে প্রথম দৃশ্যে চলে আসা যাক। কাঞ্চন তার 'পড়ার বই' র মধ্যে এল ডোরেডো বইটি রেখে পড়ছে। আর কয়েকটি দৃশ্য এগোলেই দেখা যাবে, কাঞ্চন স্কুল না গিয়ে 'পড়ার বই' রাস্তায় ফেলে রেখে দক্ষিণ আমেরিকা অভিযানের খেলা খেলে, যে বই নন্দ তাকে খুঁজতে এসে খুব যত্ন করে তুলে রাখে। স্কুল নামক যে প্রতিষ্ঠানটি আলথুসারের মতে ISA, সেই প্রতিষ্ঠানের যে অন্যতম হাতিয়ার 'পড়ার বই' আট বছরের বালক তার মধ্যে কোনো অর্থহীনতা খুঁজে পাচ্ছেনা, তাকে অস্বীকার করতে চাইছে সে তা প্রথম দৃশ্যেই দেখিয়ে দেওয়া হল। এখানেই

কাঞ্চনের সাথে তার মায়ের কিছু কথা একটু লক্ষ্য করার মত। কাঞ্চন বলে, সে একটু দুষ্টুমি করলেই বাবা তার সাথে সাথে তার মাকেও বকে। 'দুষ্টুমি করিস কেন' মায়ের এই প্রশ্নের উত্তরে কিশোরের খুব স্বতস্ফূর্ত উত্তর 'ভালো লাগে।' এখানেই দেখা যাবে, কাঞ্চন, একটি আট বছরের বালক নিজে মনে করে এখন সে 'বড়' হয়ে গেছে, পরেও দেখা যাবে, হরি দাস যখন মিনিকে বুলবুল ভাজা দিয়ে কাঞ্চনকে দিতে যায়, কাঞ্চন বলে, ওসব বাচ্চাদের জন্য। অর্থাৎ কাঞ্চনের ধারণা বাচ্চা দশা থেকে ইতিমধ্যেই তার উত্তরণ ঘটে গেছে। কাঞ্চন কি কেবল বয়সের বৃদ্ধির নিরিখেই এ কথা বলে ? না কি আজ আট বছরের একটি কিশোরের সামনে পরিবারের Power structure টি খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠার কারণে তাকে এই কথা বলতে হয় ? মাকে সে বলে, 'একদিন অনেক দূরে চলে যাব, তারপর অনেক বড় হয়ে আবার তোমার কাছে ফিরে আসব।' মার তাতে প্রত্যুত্তর, 'তবে আর কি, আমার দুঃখ ঘুচে যাবে ...' অর্থাৎ এখান থেকে স্পষ্টত, কাঞ্চনের মা বর্তমানে যে পরিস্থিতিতে আছেন,তা সুখের নয়। এবং মায়ের দুঃখ ঘোচানোর জন্য কাঞ্চনের হাতে একমাত্র উপায়, তাকে প্রথমে মায়ের থেকে বিযুক্ত হয়ে অনেক দূরে চলে যেতে হবে, তারপর আবার দুঃখ মোচনের উপায় বের করে মায়ের কাছে ফিরে আসতে হবে। সেই উপায় কি? বিনোদের সাথে কাঞ্চনের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে যায়, এর একমাত্র উপায় 'প্রচুর পয়সা করা' এবং সেই পয়সা করতে গেলে আট বছরের স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষের একটি বালক জানে গ্রামের সীমানার মধ্যে আটকে থাকলে চলবেনা, তার জন্য শহর দরকার। কোন্ শহর? কোলকাতা শহর, যেখানে রাতের বেলায় দিনের মত আলো জ্বলে, এবং এখানেই ঘটে কাঞ্চনের সেই সমীকরণ কোলকাতাই এলডোরেডো। এবং কেন প্রচুর পয়সা করতে চায় কাঞ্চন? তার একমাত্র উদ্দেশ্য মাকে একটু ভালো রাখা – আমার বাবা না আমার মাকে কিচ্ছু কিনতে দেয়না – শাড়ি না, গয়না না, কিচ্ছু না। বলেন ও সব বিলাসিতা। আমি চাই যে আমার মা একটু বিলাসিতা করুক। বিলাসিতা করলে না আমার মাকে ভারি ভালো দেখায়। একটি দৃশ্যে দেখা যাবে, কোলকাতায় রাস্তায় যখন কাঞ্চন চুড়ি, ফিতের ফেরিওয়ালাকে দেখে, কাঞ্চন দিবাস্বপ্ন দেখে, গ্রামে মায়ের কাছে এক বিশাল পার্সেল গেছে এই বিলাসিতার সামগ্রী নিয়ে। শহরে গিয়ে হরিদাসের সাথে প্রথম সাক্ষাতে কাঞ্চনের অনবদ্য স্বীকারোক্তি বাবা আছে বলেই তো মায়ের দুঃখ। ত্রৈলোক্যনাথের 'কঙ্কাবতী' তে দেখা গিয়েছিল, খেতুর বাবা মারা গেলে, গ্রামে দরিদ্র ব্রাহ্মণী খেতুর মায়ের জীবনধারণ অচল হয়ে পড়লে খেতু শহরে আসে মায়ের দুঃখ দূর করবে বলে। কিন্তু এখানে পরিস্থিতি একটু ভিন্ন। 'ইচ্ছাপূরণ' গল্পে ছেলে যেমন বারবার বাবা হতে চায় অর্থাৎ বাবা যে স্বাধীনতা, কতৃত্ব উপভোগ করে ছেলে তা যেমন পেতে চায়, এখানে দেখা যাচ্ছে কাঞ্চন কেবল আরও বড় হতে চায়, বিনোদকে বলে, 'যখন আরো বড় হব, গায়ে অনেক শক্তি হবে তখন সে বাড়ি ফিরে যাবে আবার।' কারণ আরও বড় না হলে, আরও শক্তি না অর্জন করলে, প্রচুর পয়সা না করলে বাবা নামক বিরোধী শক্তির

মুখোমুখি দাঁড়াতে পারবেনা, এই বন্দীদশা থেকে মায়ের ও নিজের মুক্তি ঘটাতে পারবেনা কাঞ্চন। এই পরিবারে বাবার অধীনে মায়ের অবস্থা ঠিক কেমন তা একবার দেখে নেওয়া যাক। ঠাকুরের ভোগ চুরি করে খাওয়ার অপরাধে কাঞ্চনের বাবা তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিতে চাইলে, মা সেই ভয়ংকর শাস্তি থেকে কাঞ্চনকে রক্ষা করতে গিয়ে বাবাকে বলেন, *‘তুমি সারাজীবন আমার সাথে যা ইচ্ছা তা করতে পারো। কিন্তু ছেলেটাকে ...’* বাবার তাতে প্রত্যুত্তর –*‘ছেলেটাকে তোমার হাতে ছেড়ে দি, তোমার বাপের বাড়ির শহুরে শিক্ষা দিক্ষা পেয়ে সে একেবারে লায়েক হোক। আমাদের বংশে ওইসব কুশিক্ষা চলবে না।’*এই পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে প্রতি মুহূর্তে মায়ের অস্তিত্ব, যে অংশের মধ্যে রয়ে গেছে মায়ের বংশপরিচয়, মায়ের বেড়ে ওঠা, মায়ের চিন্তা, ভাবনা, চেতনা ইত্যাদি তাকে প্রতিমুহূর্তে নস্যাৎ করে দেওয়া হচ্ছে। সংসার চালনা থেকে ছেলেকে বড় করে তোলা কোনো ব্যাপারে মায়ের কোনো নিজস্ব অধিকার নেই। অতএব বাবার অধীনে মায়ের সত্ত্বা বিপন্ন। Jacques Lacan তাঁর ‘Name of the Father’ তত্ত্বকে মিলিয়ে নেওয়া যায় এর সঙ্গে।

কাঞ্চনের নিজের সাথেও তার বাবার সম্পর্ক খুব স্নেহের, বাৎসল্যরসে আদ্র নয়। এখানে ঋত্বিক কেবলমাত্র ইডিপাস কমপ্লেক্সকে তার কারণ হিসেবে দেখাতে চাননি বোধহয়, তা একটি কারণ হতে পারে হয়ত, কিন্তু এখানে বাবা যেহেতু কেবল একজন ব্যক্তিমানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তাই আরও কিছু কারণ রয়ে গেছে সেখানে। সিনেমায় দেখা যাবে বাবা নামক বিষয়টি কাঞ্চনের কাছে এতটাই আতঙ্কের যে, শহরে এসে কাঞ্চন যতবার স্বপ্ন দেখে একেবারে শেষের স্বপ্ন ছাড়া বাকি দুবারেই বাবা সেখানে ভয়ের মূর্তি নিয়েই হাজির হন। লক্ষ্য করে দেখার মত কাঞ্চনের প্রতি স্বপ্নের কেন্দ্রে থাকে মা, প্রথম দুই স্বপ্নে কাঞ্চন দেখে, সে মায়ের সমস্ত দুঃখ দূর করে দিয়েছে, তা সে সীতার মত বউ নিয়ে গিয়েই হোক বা বিলাসিতার সামগ্রিতার বিশাল পার্সেল পাঠিয়েই হোক। প্রথম স্বপ্নে তাদের সেই সুখছবি ভেঙে যায় লাঠি উচিয়ে বাবার উপস্থিতিতে। স্বপ্নেও কাঞ্চন পালায় বাবার থেকে। কিন্তু দ্বিতীয় স্বপ্নে দেখা গেল, পার্সেলওয়ালার বাবার উদ্দেশে এই কথা দিয়ে শেষ হল –‘কেমন জব্দ! কেমন জব্দ! কাঞ্চনের ক্ষেত্রে কেমন জব্দ!’ স্বপ্নে অন্তত কাঞ্চন এবার প্রস্তুত বাবার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাকে অস্বীকার করার জন্য। আর এতক্ষণ পর্যন্ত যে কাঞ্চন মায়ের দুঃখ দূর করার নেশায় ছুটছিল, শেষ স্বপ্নে দেখা গেল, সে মাকে পরম আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরেছে নিজে একটু আশ্রয় পাওয়ার আশায়। কাঞ্চনের স্বপ্নের গতিপ্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে গেছে। বাবা সে স্বপ্নে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। স্বপ্নে একসাথে মিশে থাকে wish এবং fear. যে কাঞ্চন স্বপ্নে বারবার দেখে মায়ের খুশী চেহারা, কিম্বা মায়ের স্নেহাচলে যে আশ্রয় খুঁজতে চায়, বোঝা যায় চলচ্চিত্রপরিচালক হয়ত শিশুর জন্য এই পৃথিবীই চান। একটু দেখার মত, কাঞ্চনের বাবার মধ্যে একসাথে উপস্থিত রয়েছে ‘বাবা’ নামক পরিবার প্রতিষ্ঠানটির অধিকর্তার চরিত্র, সাথে সাথে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের হেডমাষ্টার তিনি। একটু

লক্ষ্য করে দেখার মত, উনিশ শতকের শেষ থেকে যখন এই দেশের শিশুদের উপনিবেশের স্বার্থক প্রজা বানিয়ে তোলার উপক্রম চলছে, স্বাধীন দেশের নাগরিক কাঞ্চনের বাবা কিন্তু ছেলেকে শহুরে রীতি-নীতিতে বড় করতে চাননি। ইংরাজী বিষয়ে কাঞ্চনের জ্ঞান খুব প্রশস্ত যে নয়, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে, বিয়েবাড়িতে মিনি, ভোম্বলের মত শূর্পণখা বানান না জানা কিন্তু maintain বানানে অভিজ্ঞদের মত কাঞ্চন ইংরাজীতে সড়গড় নয়, বা মিনির ছোড়দার ব্যাঙ্গাত্মক ইংরাজী translation সে করতে পারেনি। কাঞ্চনের পোশাকও সেই প্রমাণ বহন করে। আসলে কাঞ্চনের বাবা ছেলেদের চাণক্য শ্লোক অনুসারে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে বিশ্বাসী। প্রথম দৃশ্যেই দেখা যায়, কাঞ্চনের মা যখন জানতে পারেন, কাঞ্চন আসলে বইয়ের মধ্যে লুকিয়ে রেখে 'আজগুবি গপ্পের বই' পড়ছে, মা ও যিনি পুরুষতন্ত্রের দাসত্ব স্বীকার করে নিতে নিতে, বাহক হয়ে উঠেছেন তার, তিনি বলেন, 'এ কথা শুনলেই বাবা রাগ করবে' এবং তারপরেই তার জিজ্ঞাসা, 'চাণক্য শোলোক মুখস্থ আছে তো ?' কি সেই শ্লোক, কাঞ্চনের মতে যার পাল্লায় পড়ে বাবা একেবারে গেছেন – মিনিকে কাঞ্চন বলে, 'চাণক্য তো সংস্কৃতে বলেই গেছে, ছেলে পিটিয়ে মানুষ করতে হবে, পিটিয়েই তো সব হয়, লোহা পিটিয়ে হাতুড়ি, সোনা পিটিয়ে গহনা আর ছেলে পিটিয়ে মানুষ ...' দেখা যাবে, মিনির বাবার সাথেও খুব সাবলীলভাবে মিশে উঠতে পারবেনা কাঞ্চন যতটা পেরেছিল প্রথম দেখাতেই মিনির মাকে মাসি সম্বোধনে বেঁধে ফেলতে। কাঞ্চনের খুব দৃঢ় বিশ্বাস বাবাদের সাথে ভাব হয়না। এর সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যায়, ছেলেদের মানুষ করার বিষয়ে বিদ্যাসাগরের নির্দেশনামাকে। সতীশচন্দ্রের 'সন্তানের চরিত্রগঠন' এও শোনা গিয়েছিল প্রায় এক কথা।

শিশু যাতে রাষ্ট্রের বাধ্য প্রজা হতে পারে, সেহেতু বারবার পরিবার এবং স্কুলের মিলন কামনা করেছেন সমাজপরিচালকেরা। এই দুই প্রতিষ্ঠানের মূলসূত্র কিন্তু কাঞ্চনেরও চোখ এড়িয়ে যায়না। হরিদাসকে কাঞ্চন বলে, - *'বাবারা এবং মাষ্টাররা কথায় কথায় চাণক্য শ্লোক বলে।'* এই ব্যবস্থা থেকে কাঞ্চন আসলে পালাতে চেয়েছিল, যে ক্ষমতাতন্ত্র প্রতিমুহূর্তে একজন মানুষের স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অধিকার, ভালোলাগা- মন্দলাগাকে অস্বীকার করে। কেবল অ্যাডভেঞ্চারের শখ নয়, পরিবার, স্কুল প্রভৃতি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে পিষে যেতে যেতে মানুষগুলির যে দুঃখ কাঞ্চন সেখান থেকে সমাধানের উপায় হিসেবে পালিয়ে যাওয়াকে বেছে নিয়েছিল, এই প্রতিষ্ঠান থেকে অনেক দূরে চলে যেতে চেয়েছিল। আসলে অচলায়তনের হোতারা বুঝে উঠতে পারেন নি, - *"ছেলেদের মন হচ্ছে একটা অন্য জিনিস। তাকে নজর করতে হয়। ভালোবাসতে হয়। যে ছেলে যত দামাল তার তত বেশী প্রাণ।"*তারা বোঝেন নি ফুকোর মতন 'there is no glory in punishing.'দ্বিতীয় দৃশ্যে ভোগ চুরি করে খাওয়ার অপরাধে, কাঞ্চনের বাবা তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল ঘন জঙ্গলে, ঘোষণা করেছিল, 'আর একটি নালিশ শুনেছি কি মালখানা থেকে চাবুক

বেরোবে।'অর্থাৎ আমরা এদের জন্য প্রতিক্ষেত্রে শৃঙ্খলার আয়োজন করে রেখেছি, আর তা না মানলে আছে শাস্তি,ফুকো যাকে বলেছিলেন discipline and punishment. ফুকো দেখাচ্ছেন কীভাবে আমাদের সমাজের প্রতিটাক্ষেত্রে অবস্থান করছে শৃঙ্খলার জাল, এবং সেই জাল ছিঁড়ে বেরোতে গেলেই রয়েছে শাস্তির আয়োজন, এভাবেই ঘটছে 'birth of prison'. এবং বাচ্চাদের উপর এই যে পরিবার, স্কুল কর্তৃক যে প্রত্যক্ষ শাস্তিব্যবস্থা তাকে repressive method বলা যেতে পারে। বালক ছোটো থেকে শুনছে, আর পড়ছে তাকে 'গোপাল' র মত হতে হবে, আর রাখালের মত হওয়া যাবেনা একে যদি আমরা ideological apparatus বলতে পারি, তবে তার রাখালসুলভ কোনো আচরণের জন্য সে যদি শিক্ষক বা বাবা মায়ের কাছে তিরষ্কৃত বা প্রহৃত হয়ে থাকে, তাকে repressive apparatus বলা যেতে পারে। শিশুকে সবসময় ছোটো থেকে এটাই বলা হচ্ছে গুরুজনেরা শাসন করেন তার ভালোর জন্য। একইভাবে উপনিবেশের মালিকেরাও উপনিবেশের প্রজাদের বুঝিয়েছিল, তারা যা করছে তা এদের ভালোর জন্যেই, আসলে এভাবেই শাসক শোষণ বিস্তার করে। এভাবেই তৈরি করা হচ্ছে মানুষের সুপার ইগোকে। দেখা যাবে ওই দৃশ্যের কিছু পরেই তার কিছু সময় পরেই কাঞ্চন এই কর্তৃত্ব কে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, পরিবারের খাঁচা ভেঙে পালিয়ে গেল। আরও একটি বিষয়, একেবারে প্রথম দৃশ্যে মা যখন কাঞ্চনের বউ এর স্বপ্ন দেখছেন, কাঞ্চন একজায়গায় বলে, *'আমি বসব রাজার মতন'* , যে ছেলের ভেতরে রয়ে গেছে রাজকীয় চরিত্র, তাকে কর্তার ভূত চালনা করতে পারে কি আদৌ ? এই পালিয়ে যাওয়া কেবল খেলা নয়, কাঞ্চন যে দক্ষিণ আমেরিকা অভিযানের খেলা খেলত, তা আসলে ছিল ওই রাষ্ট্রযন্ত্রের কঠোর শৃঙ্খলা, বালকদের স্বাধীন কল্পনাকে আটকে রাখার যে আয়োজন, তার বিরুদ্ধে এক ধরনের প্রতিবাদ। আর একটু দেখার মত, কাঞ্চনের যে স্বাভাবিক মানসিক প্রকৃতি, তা থেকে বোঝা যায়, তাকে যে কোনো বন্ধনেই তা সে স্নেহেরই হোক না কেন তাকে বেঁধে ফেলা সম্ভব নয়, শহরে হরি দাস, মিনির মা, চন্দনের মা কিন্তু তাকে স্নেহাদ্র, খুব নৈকট্যময় ছায়া দিতে চেয়েছিল, কাঞ্চন সেই প্রতিটি আশ্রয় থেকে পালিয়েছে। আসলে চন্দনের মায়ের কথাই ঠিক, এ ছেলে ঘরছাড়া বাউণ্ডুলে প্রকৃতির, রক্তে তার অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের, অভিযানের নেশা, এ যেন আর এক তারাপদ। অতিথির মতই তার আগমন, কিন্তু স্থবিরতা তার প্রকৃতিতে নেই। রাষ্ট্রযন্ত্র তাকে পোষ মানাবে কি করে ? কিন্তু এই পালিয়ে গিয়ে কাঞ্চন যে সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিল আদৌ তা কতটা স্বার্থক হল? কোনো বিকল্প রাস্তা খুঁজে পেল কি কাঞ্চন ?

বিনোদ যে কাঞ্চনের মত 'ভূগোল' এ এত ভালো নয়, সে বলেছিল কোলকাতা ছেলেধরার রাজ্য আর কাঞ্চনের কাছে কোলকাতা ছিল মজার শহর, কোলকাতা সম্পর্কে এই দুই পরস্পরবিরোধী অভিমত ঋত্বিক একেবারে প্রথমেই দিয়ে দিলেন। কাজলদীঘিতে থাকাকালীন এবং কোলকাতায় এসেও প্রথমদিকে কাঞ্চনের

ধারণা ছিল এ শহর এক দারুণ মজার জায়গা, কিন্তু ঋত্বিক নিজের জীবন দিয়ে জানতেন, কাঞ্চনের এই ধারণা শেষপর্যন্ত হয়ত আর টিকে থাকবেনা। পালিয়ে এসে যে কোলকাতাকে এই বালক তার কল্পনা দিয়ে সমাধানের উপায় ভেবেছিল, সেই এল ডোরেডো কাঞ্চনকে কোথায় পৌঁছে দিল। অনেক স্বপ্ন নিয়ে, অনেক কাঁটাতার তৈরি করে যে স্বাধীনতা এসেছিল, সেই স্বাধীন ভারতবর্ষ শিশুদের কতটা নিরাপদ জীবন দিতে পেরেছিল ঋত্বিক তা দেখাতেও ভোলেন না। একটি দৃশ্য – কোলকাতায় প্রথম এসে বিস্মিত গ্রামীণ বালক কাঞ্চন রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আকাশছোঁয়া একটি বাড়ি কত তলা গুনছে, ঠিক সেই মুহূর্তে একটি গাড়ি এসে পড়ে তার সামনে, প্রায় তাকে চাপা দিতে যাবে এমনসময় ওই বহুতল বাড়ির মাথায় উড়তে দেখা যায় স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বাধীন পতাকা। হরিদাস তাকে টেনে নেয়। এবং সিনেমার প্রায় শেষে হরি দাস এবং মিনিকে কাঞ্চন বলে গিয়েছিল ওরা বিশ্বাস না করলেও সে ওদের রোজগার করে দেখিয়ে দেবে। কিন্তু তা সফল হোল না। কয়লা কুড়িয়ে পয়সা করার পথের সন্ধান তাকে একজন দিলেও কাঞ্চন জানল কয়লার সেই চোরাকারবারের রাস্তাও তার জন্য খোলা নেই। শেষপর্যন্ত হাত পেতে ভিক্ষা করতে হল কাঞ্চনকে, তবুও মিলল না কিছু। তার পোশাক ছিঁড়ে গেছে, চটি চুরি হয়ে গেছে, মুখে চোখে কালি মাখা, তবুও প্রচুর পয়সা করা হোলনা। ক্লান্ত, বিশ্রস্ত কাঞ্চনকে এ সময় এক মজুর শ্রেণীর লোক তাকে বলে, এ কোলকাতা মারদাঙ্গার জায়গা, লড়াইয়ের জায়গা, এখানে রাগ, মান, কান্না, অভিমানের কোনো মূল্য কেউ দেবেনা। কাঞ্চনকে সে মাসির কাছে ফিরে যেতে বলে। কাঞ্চন যখন ১৭নং পলাশবাগানের দিকে পা বাড়ায় আরও একবার একটি বহুতল বাড়ির মাথায় দেখা যায় উড্ডীয়মান ভারতের স্বাধীন পতাকা। ঋত্বিক দেখাতে চাইলেন স্বাধীন রাষ্ট্র শিশুর সামনে এই বিপন্ন ভবিষ্যৎ রেখেছে। নিরাপত্তা, নিশ্চিন্ত জীবন দিতে পারেনি শিশুকে। ঋত্বিক এই সত্যি তুলে ধরার জন্য কোলকাতা পর্বে আরও বেশ কিছু শিশুর ছবি নিয়ে এলেন। এ স্বাধীন দেশের স্বাধীন শহরে কোনো শিশুকে ভেল্কিওয়ালার কাছে মরণবাঁচন খেলা দেখিয়ে বেঁচে থাকতে হয়, কাউকে আবার ম্যানহোল থেকে ময়লা তুলতে হয়, কোনো বাচ্চা মেয়েকে আবার গান গেয়ে উপার্জন করতে হয়। একদিকে ভদ্রলোকেরা কাটলেট গলাধঃকরণ করেন, অন্যদিকে এক পিতা যিনি দুর্ভিক্ষের সময় গ্রাম থেকে এসেছিলেন, কুকুরের সাথে মারামারি করে তিনি ডাস্টবিন থেকে খাবার তুলে তার সন্তানের পেটে দুটি খাবার দিতে চান। ছেলেধরাদের পাল্লায় পড়ে এই শহরে ছোটো ছোটো শিশুদের বোবার অভিনয় করে ছবি এঁকে পয়সা উপার্জন করতে হয়, আর সে পয়সা চলে যায় মালিকের কাছে, খিদে পায় তাদের কিন্তু ক্ষুধা মেটানোর কোনো উপায় তাদের নেই। কাঞ্চনকে সে বলে, 'সারা কোলকাতায় এদের দল আছে। কত ছেলে মেয়ে ওরা এইভাবে ধরে নিয়ে গিয়ে পুষছে। ওরা ভয়ানক লোক।' ছেলেবেলার কথা জিজ্ঞেস করলে এই বাচ্চাটি বলে, - তার বাড়ি নেই, সে ভুলে গেছে ছোটোবেলার কথা। আবছা আবছা মনে পড়ে হয়ত। এবং তার কথা

শেষ হয় এই দিয়ে, কিছুই মনে নেই যে। সিনেমায় বাউলের গানের background এ দেখা যায়, কাঞ্চন ঘুরে ঘুরে বস্তি, অস্থায়ী কিছু ছাউনি দেখছে, সেই ছবিতে চলে আসছে কঙ্কালসার শিশুদের ছবি, বা হরিদাসের মত বাস্তুহারাদের বস্তিতেও দেখা যায় অনেক শিশু যারা ঠিকমত পরিধানের পোষাক পায়নি। স্বাধীন রাষ্ট্র শিশুকে বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকার খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান দিতে পারেনি। পড়াশোনার সুযোগ দিতে পারেনি, দিতে পারেনি কল্পনার মুক্ত অবকাশ। শিশুদের শ্রমকে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই স্বাধীন রাষ্ট্রের অধিকাংশ শিশুর ছবি। তাদের শৈশব কোথায় ? কোলকাতা ঠিক পালনোর উদ্দেশ্যকে কতটা স্বার্থক করতে পারে সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে ঋত্বিক এনে ফেলেন আরও কয়েকটি চরিত্র – হরিদাস, রেস্টুরেন্টের ওই যুবকগুলিকে, যারা প্রত্যেকে একদিন বাড়ি থেকে পালিয়েছিল, কোলকাতায় এসেছিল রোজগার করবে বলে, ভালো থাকবে বলে, জীবন-জীবিকার নিশ্চয়তা পাবে বলে। কিন্তু কোথায় হল সেই ইচ্ছাপূরণ। এই 'মৃতনগরী' মানুষের স্বপ্নেরও মৃত্যু ঘটায়। এই যান্ত্রিক শহরের দ্রুতির কাছে চিলও মুখ থুবড়ে পড়ে। এই সত্যিগুলির সাক্ষাতে শেষপর্যন্ত কাঞ্চনকেও আসতে হয়। তাই যে কাঞ্চনের কাছে কোলকাতা ছিল স্বপ্নপূরণের পৃথিবী, সেই কাঞ্চন হরিদার কাছে এই প্রশ্ন রাখে সিনেমা মোটামুটি অর্ধেক পার হয়ে গেলে, *'এই শহরে এত দুঃখ কেন ?'*

তবে কি কোনো সমাধান নেই ? বাজারের লোভে যে পরিচালক সিনেমা করেন নি, যিনি স্পর্ধাভরে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলির মুখোশকে খুলে দেন, তিনি হয়ত জানেন পরিত্রাণের পথ আজ অসম্ভব। যে দিকেই যাওয়া হোক না কেন, রাষ্ট্রযন্ত্র তার কল নিয়ে বসে আছে, তবুও তার স্বপ্ন রয়ে যায় এক বিকল্প বাঁচার, যেখানে শিশু বাঁচতে পারবে ভালোবাসার মুক্তিতে। এই সিনেমায় আসলে কথা বলছেন ঋত্বিক। তিনি কেমন শৈশব চান, শিশুর জন্য কোন্ পৃথিবী চান ? ঋত্বিকের জন্ম ১৯২৫ ঢাকা, অবিভক্ত বাংলায়। বেশ অল্পবয়সেই দেশভাগের আগেই চলে আসতে হয় তাঁকে ও তার পরিবারকে এ পার বাংলায়। প্রথমে বহরমপুর, সেখান থেকে কোলকাতা। তাই কোলকাতার বাস্তবতা একজন উদ্বাস্তুর থেকে কেই বা বেশী অনুভব করবে ? তবুও আশা রয়ে যায়। আসলে কাঞ্চনদের চোখরাঙানি দিয়ে, অর্থহীন শৃঙ্খলার বেড়ি পরিয়ে, কঠোর অনুশাসন দিয়ে RSA বা পরিবার, স্কুল প্রভৃতি ISA দিয়ে কৌশলেকোনোভাবেই মগজধোলাই করা যাবেনা। তাদের উপলব্ধি করতে হবে, বুঝতে হবে। কিন্তু বাবা বা মাষ্টার নামক কর্তারা তাদের অনুশাসন চাপাতে ব্যস্ত এদের উপরে। অন্যদিকে স্নেহের যে অফুরন্ত ভাণ্ডার মাতৃপ্রতিমেরা, এই সিনেমায় দেখা যায় সেই মায়েরা খুব বিপন্ন। গ্রামে থাকাকালীন কাঞ্চন শুধু জানত, তার মায়ের দুঃখ। কিন্তু শহরে এসে সে দেখল, মায়েরা চন্দনের মা, মিনির মা প্রত্যেকেই বিপর্যস্ত আজ। মায়েরা ধূলো মেখে দাঁড়িয়ে আছে আজ। তবে উপায় ? স্বাধীন রাষ্ট্র যেখানে শিশুর জন্য নিরাপত্তাহীন, অস্বাস্থ্যকর জীবন দিচ্ছে, সমাজহোতারা যেখানে কড়া হাতে সন্তানের

চরিত্রগঠন করতে চাইছে, তখন একটি মানুষ, যে নিজে দেশে প্রাইমারি স্কুলের মাষ্টার ছিল, স্বাধীন দেশে ১০ বছর ঘুরে ঘুরে যে একটা চাকরী পাইনি, আজ যার নিজের বলতে কেউ নেই, বসবাস করার মত একটা উপযুক্ত ঘর নেই, যার ইতিহাস, ভবিষ্যত দুইই বিপন্ন, সেই মানুষটি পরম স্নেহে নিজে থেকে কাছে টেনে নেন শিশুদের, তার আগমনে আনন্দের সাড়া পড়ে যায় শিশুদের মধ্যে, বুলবুল ভাজা বিক্রি করেন তিনি শিশুদের মধ্যে, বিক্রি বললে হয়ত ভুল হবে, কারণ সেখানে কেবল অপার খুশী দেওয়া আছে, বিনিময়ে কোনো অর্থমূল্য নেওয়া নেই, কেবল ওদের হাসিমুখ থেকে। তিনি 'ইয়া লম্বা লম্বা দাঁড়ি পড়েন, কারণ ঠাকুরদার মত এত বড় বড় দাঁড়ি না পরলে তো বাচ্চারা কাছে আসে না। এ তো সেই ঠাকুরদা, যাকে আমরা ঘুরে ঘুরে কখনো 'রাজা' য় কখনো 'ডাকঘর', কখনো আবার 'অচলায়তন', কখনো বা 'শারদোৎসব' কখনো 'মুক্তধারা' নাটকে দেখতে পাই। যিনি ক্রৌঞ্চদ্বীপের স্বপ্ন দেখাতে পারেন বালকদের, যিনি ছেলে খেপিয়ে বেড়াতে পারেন, ছেলে ভোলানোই তার কাজ। একে একে পাঁচ ছেলে মারা যাওয়ার পরও এনি জীবনকে নেতির চোখ দিয়ে দেখেননি। একটু লক্ষ্য করে দেখার মত ১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটের সিনেমায় হরিদাসের বুলবুলভাজা বিক্রিসংক্রান্ত গানটি দুবার এসেছে। স্বাধীন দেশের প্রতি ক্ষেত্রে যেখানে বৈষম্য, এই গানে সেখানে রাণী ভিক্টোরিয়া আর প্রজার মধ্যে কোনো ফারাক করা হোলনা। কোলকাতায় এসে প্রচুর খারাপ লাগা, প্রচুর দুঃখের মুখোমুখি হয়েছে কাঞ্চন, স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে পুরোপুরি, রোজগার করতে পারেনি মায়ের জন্য, মাসির আশ্রয়ও ভেঙে গেছে মিনির মা মারা যাওয়ার ফলে, তবু যে কাঞ্চন বেঁচে থাকার প্রতি, জীবনের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টি হারালো না তা হরিদার জন্য তো খানিক বটেই। ওই যে গাড়ির তলায় চাপা পড়া থেকে কাঞ্চনকে বাঁচিয়েছিল হরি দা একেবারে কোলকাতায় আসার মুহূর্তেই, সেই দৃশ্যই ইঙ্গিত দিয়ে দিয়েছিল অসংখ্য খারাপের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও হয়ত কাঞ্চন জীবনস্রোত থেকে হারিয়ে যাবে না। আক্ষরিক অর্থে কাঞ্চন প্রচুর পয়সা হয়ত করতে পারেনি হয়ত, কিন্তু উপার্জন করতে পেরেছে হরিদার দাঁড়ি আর ঝোলা। যে দাঁড়ি আর ঝোলা প্রচুর অভিজ্ঞতাকে, প্রচুর দেখাকে ধরে রেখেছে। শুধু কাঞ্চন নয়, এই শহরের বুকে, রাষ্ট্রের বুকে যেখানে শিশুর শৈশব, কিশোরের কৈশোরের অবাধ ডানাকে, কল্পনার রঙিন চোখকে ছেঁটে ফেলার আয়োজন চলেছে, সেখানে এই হরিদাসদের থাকতে হবে তাদের বাঁচাতে। মনে পড়ে যাবে, সেই দৃশ্য, যেখানে হরি দা কাঞ্চনকে বাড়ি ফিরে যেতে বললে, কাঞ্চন হরিদাকে তার সাথে যাওয়ার কথা বলে, তাতে হরিদার প্রত্যুত্তর, *'আমার কোত্থাও যেতে নেই, তোমার মতো আরও তো সব ছেলেরা আসবে বাড়ি থেকে পালিয়ে, তাদের দেখবে কে! ...আমি ওই বিল। তোর মত কত পাখি আসবে, বসবে, আবার চলে যাবে। আমি বুক পেতে থাকব।'* এর সাথে সাথে visual টা খেয়াল করার মত।

শেষদৃশ্যে দেখা গেল, কাঞ্চন ফিরে গেল 'বাড়ি' তেই। ফিরে গেল 'দেশে'। যে 'বাড়ি' থেকে পালাতে এত আয়োজন, সেখানেই তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন ঋত্বিক ! দেশভাগের ফলে তাঁর নিজের যে বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা, তার জন্যই কি তিনি এই মিলনাত্মক সমাপ্তি দেখালেন ! কিন্তু দেখা যাবে, যে 'বাড়ি' ছিল সিনেমার শুরুতে, যে 'বাড়ি' থেকে বারবার পালাতে চেয়েছিল, সিনেমার শেষে বাড়ি বদলে গেছে। 'বাড়ি' থেকে পালানো যেখানে ছিল 'বাবা' র হাত থেকে পালানো সেই 'বাবা' র প্রকৃতিতে বদল এসে গেছে। শেষদৃশ্যে কাঞ্চনের বাবার অঙ্গভঙ্গি, গতি, গলার স্বর সমস্ত কিছুতে বিশাল বদল এসে গেছে। কাঞ্চনের ফিরে আসতে দেরি হওয়ায় মা যখন বাবাকে বলেন তুমি গেলে না কেন, বাবার তাতে উত্তর, *'আমায় দেখলে যদি আবার পালিয়ে যায় ...এলেই আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাব, নইলে ও ভয় পাবে। তুমি এক কাজ কোরো, ওকে একটু আদর কোরো। কত কষ্ট করেছে হয়ত, হয়ত কতদিন ওর খাওয়া হয়নি ...'* এ তো ঠিক আমাদের সমাজকর্তাদের নির্দিষ্ট করে দেওয়া বাবার মূর্তি নয়, যিনি মালখানার থেকে চাবুক বের করে সন্তানের চরিত্র গঠন করতে চান। মিনির বাবাকে দেখে কাঞ্চন যে বলেছিল, 'তোমার বাবা আসলে একটা লুকোনো মা' এ তো সেই লুকোনো মা রই ছবি। তাই ফিরে এসে মায়ের কোলে মাথা রাখার পরও দেখা যায়, বাবা কাঞ্চনের হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে, আর বাবার ভেতর থেকে আজ সেই লুকোনো মাকে চিনতে পেরে কাঞ্চনের সিদ্ধান্ত *'বাড়িই সবচেয়ে ভালো বাবা, বাড়িই সবচেয়ে ভালো।'* সমাজহোতারা 'বাবা' কে যেভাবে অনুভূতিহীন করে দিয়ে 'দৃঢ়', 'দাঢ্য' করে গড়ে তুলে নিজেদের উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করিয়ে নিচ্ছিলেন তাদের মধ্যে দিয়ে, সেই চক্রান্ত থেকে আজ বেরিয়ে আসতে পেরেছে কাঞ্চনের বাবা।

শেষ করা যাক আলোচনা শেষ একটি বিষয়ের সামান্য উল্লেখের মধ্যে দিয়ে। কাজলদীঘি স্টেশন থেকে বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করে যখন কাঞ্চন তখন সে ফেরে জলের উপর দিয়ে। ডিঙিতে চেপে জল নিয়ে খেলতে খেলতে তার বাড়ি ফেরা। কাঞ্চনের স্বপ্নেই এসেছে এই নদী। স্বপ্নে মিনিকে ডিঙিতে চাপিয়ে নিয়েই সে এসে পৌঁছায় মায়ের কাছে। আর সিনেমা শেষ হয় এই দৃশ্য দিয়ে হরিদাসের দাঁড়ি পরে কাঞ্চন দাঁড় হাতে নিয়ে জলের উপর ডিঙি নিয়ে খেলা করছে। মাতৃজঠরে শিশুর চারণ জলের মধ্যে, জল ক্লেদতা থেকে প্রাণের ইঙ্গিতবাহী। জল মুক্তির বাণী, তাই বোধহয় মিনির মা বলেন, 'কতদিন নদী দেখিনি!' জলের এত কাছাকাছি, প্রকৃতির এত নিকটে কাঞ্চনকে এনে ঋত্বিক কি বলতে চাইলেন শিশুরা প্রাকৃতিক ? প্রকৃতির মুক্ততার সাথে শিশুপ্রাণের যোগ থাকলেও শিশুরা সরল, তরল রোম্যান্টিকদের এই ধারণাও বোধহয় ঋত্বিকের ছিল না। কারণ পরিস্থিতি এমন, চারিদিকের সমাজ, রাজনীতিতে এত খাদ, এত দুঃখ পৃথিবীজুড়ে যে তার থেকে মুখ ঘুরিয়ে থাকার উপায় নেই, শিশুর জীবনও সেই দুঃখের মুখোমুখি দাঁড়াচ্ছে। তবুও স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখতে হবে কাঞ্চনদের। 'বাড়ি' ফিরে আসার আগে হরি দা কাঞ্চনকে বলেছিল, *'এবার তোমার সাজার পালা। তুমি*

এগুলো পড়ে অনেক নতুন দেশ খুঁজতে বেরুবে ...' সেই স্বপ্ন দিয়েই শেষ হয় এই সিনেমা, মূল উপন্যাসে মায়ের কাছে টাকার বৃষ্টি করেছিল কাঞ্চন। ঋত্বিক জানতেন, শিবরামের এই স্বপ্ন আজ আর স্বাধীন দেশে, দুটো বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে সম্ভব নয়। কাঞ্চনের মত শিশুরাও আজ দুঃখের থেকে মুখ ফিরিয়ে বাঁচতে পারবেনা, ঋত্বিক তাই কাঞ্চনকে কোলকাতায় এনেছিলেন সেই সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করানোর জন্য, এ ভিন্ন রাস্তা নেই, কিন্তু তাতে শেষ হয়ে যায়না। তবুও কাঞ্চনদের অপরাজিত করতেই হবে। কাঞ্চনের সামনে এখন অফুরান পথ, যে পথ দেশ ছেড়ে বিদেশের দিকে, সূর্যোদয় ছেড়ে সূর্যাস্তের দিকে, জানার গণ্ডী ছাড়িয়ে অপরিচয়ের উদ্দেশে শুধু এগিয়ে চলে।

গ্রন্থঋণঃ-

সহায়ক বাংলা বইঃ-

- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'অপরাজিত', দে'জ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৪।
- শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, 'গোপাল রাখাল দ্বন্দ্বসমাস উপনিবেশবাদ ও বাংলা শিশুসাহিত্য', কারিগর, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৫।

সহায়ক ইংরাজী বইঃ-

- Louis Althusser, 'Ideology and Ideological State Apparatuses', 1970.
- Michel Foucault, 'Discipline and Punish: The Birth of the Prison', Vintage Books, Second edition 1995.
- Sigmund Freud, 'The Interpretation Of Dreams', Amazing Reads, 1995.

ধর্মীয় কুসংস্কারের আলোকে ‘দেবী’ গল্প

সিলভিয়া সুলতানা
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ,
বিজয় নারায়ণ মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কারে প্রভাবে কিভাবে একটি পরিবারের নিদারুণ পরিণতি হয়েছে তা গল্পে ফুটে উঠেছে। অন্ধবিশ্বাসের কারণেই তরতাজা প্রাণের বলি হয়েছে, পরিবারের বুকে নেমে এসেছে ট্রাজেডি।একজন সাধারণ মানবি থেকে দেবীতে পরিণত হওয়া এবং তার পরিণতি আত্মহত্যা – এ সমস্ত কিছুই গল্প মধ্যে ফুটে উঠেছে।
সূচক : ধর্মান্ধতার কারণে পারিবারিক ট্রাজেডি।

মূল আলোচনা :

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল হাস্য রসের অবতারণা। তাঁর বেশিরভাগ গল্পেই তিনি হাস্যরসের বিষয়টিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। লঘুরসের সাধনায় তাঁরঅন্যতম বিষয়। কিন্তু ‘দেবী’ গল্পটি সম্পূর্ণ বিপরীত ধারার একটি গল্প। এই গল্পটি কৌতুকরসের গল্প নয়, কিভাবে অন্ধ কুসংস্কারে বলি হয়েছে সাধারণ একজন মানবী, তারই কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে গল্পকার এই গল্পের প্লট নিয়েছেন। গল্পটির নির্মাণশৈলীও অসাধারণ।

গল্পটি মূলত সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অন্তর্গত একটি পরিবারের চিত্র। অন্ধ ধর্মীয় কুসংস্কারের ফলে গোটা পরিবার কিভাবে ধ্বংস হয়ে যায় সেটাই গল্প মধ্যে ফুটে উঠেছে। মানুষ কতটা ধর্মান্ধ হলে একজন সাধারণ মানবীকে দেবীর আসনে অধিষ্ঠিত করতে পারে, এই সমস্ত কিছুই গল্প মধ্যে ফুটে উঠেছে। গল্পটিতে প্রায় একশ বছর আগের কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে। এক লহমায় একটি সাধারণ মেয়ে কিভাবে দেবীতে পরিণত হয় এবং সেই দেবী রূপে অধিষ্ঠিত মানবী কে কেন্দ্র করেই ঘটনা ধারা আবর্তিত হয়েছে।

গল্পের কাহিনীর সূত্রপাত হয়েছে পৌষ মাসের রাতে এক বিবাহিত দম্পতির কথোপকথনের মধ্য দিয়ে। কুড়ি বছরের যুবক উমাপ্রসাদ এবং তারষোল বছরের পত্নী দয়াময়ীর প্রণয়ের কাহিনী দিয়ে। বিবাহের পাঁচ - ছয় বছর অতিক্রান্ত হলেও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের গাঢ়ত্ব সবে শুরু হয়েছে।নব নবপ্রণয়ের সূচনালগ্নে উভয়ের মধ্যে রাত জেগে নানা ধরনের কথোপকথন গল্প মধ্যে ফুটে উঠেছে। উভয়ের কথোপকথনে একটা রোমান্টিক আবহ তৈরি হয়েছে। চুম্বনাদি,আলিঙ্গন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে উভয়েই উভয়ের প্রতি ভালোবাসা ব্যক্তকরেছে। ভবিষ্যতে একত্রে সুখে শান্তিতে বাঁচার স্বপ্ন দেখে তারা। উমাপ্রসাদ তার স্ত্রীকে বলে “দেখ্, আমি পশ্চিমে চাকরি করতে বেরুব”।[১] এ কথা শুনে

দয়াময়ীর প্রতিক্রিয়া – "তোমার আবার চাকরি করা কেন? তোমার কিসের দুঃখ? জমিদারের ছেলে হয়ে কেউ চাকরি করে নাকি?"[২] অর্থাৎ ষোলবছর বয়সী দয়াময়ীর কাছে তার স্বামীর পশ্চিমে চাকরি করতে যাওয়াটা আশ্চর্যের বিষয়। কারণ, তার কাছে জমিদার পুত্রের চাকরি করতে যাওয়াটা নিতান্ত তাচ্ছিল্যের ব্যাপার। অপরদিকে, উমাপ্রসাদ শুধুমাত্র তার স্ত্রীর সাহচর্য পাওয়ার জন্য ব্যাকুল।তাই সে দয়াময়ীকে নিয়ে নিজেদের এক রঙিন ভবিষ্যৎ কল্পনা করে।উমাপ্রসাদ আক্ষেপ করে স্ত্রীকে বলেছে – "আমার দুঃখ তোমাকে নিয়েই বটে। সমস্ত দিন আমি তোমায় পাইনে। শুধুরাত্তিরটি পেয়ে সাধ মেটে না। বিদেশে চাকরি করতে যাব, সেখানে তোমায় নিয়ে যাব, কেমন দুজনে একলা থাকব, সারাদিন সারারাত"![৩] জমিদার পরিবারের ছোট বউ দয়াময়ী। সংসারের নানা রকম কাজ নিয়ে সারাদিন সে ব্যস্তথাকে।স্বামীর সাথে সেভাবে সময় কাটাতে পারেনা। পশ্চিমে যাবার ব্যাপারে দয়াময়ীর মনেও নানারকমপ্রশ্নআসে। উমাপ্রসাদ সারাদিন কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকবে তাকে সময় দেবে কি করে! এছাড়া, তাকে কি সবাই যেতে দেবে! এরকম চিন্তা ভাবনার উদয় হলে তাকে নিশ্চিন্ত করে উমাপ্রসাদ বলে, সময় দেওয়ার জন্য কাছারির কাজ তাড়াতাড়ি সেরে সে চলে আসবে এবং তাকে পশ্চিমে নিয়ে যাবে তার বাপের বাড়ি থেকে। উমাপ্রসাদের কথায় –"যখন শুনব তুমি বাপের বাড়ী রয়েছতখন চুপি চুপি এসে তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে যাব"।[৪] উমাপ্রসাদের বড় দাদা তারাপ্রসাদের একমাত্র সন্তান গল্পে যে 'খোকা' নামে পরিচিত, তার প্রতি দয়াময়ীর যেগভীরটান, আবার অপরপক্ষে দয়াময়ী অর্থাৎ কাকিমার প্রতি খোকারও টান লক্ষণীয়।বাইরে গিয়ে অনেক বছর থাকার প্রসঙ্গ এলে খোকাকে ফেলে দয়াময়ী বিদেশ-বিভুঁয়েগিয়েঅতবছর কি করে থাকবে, সেটার কথা তার স্বামীকে জানালেসে তার প্রত্যুত্তরে জানায় – "ততদিন তোমারও একটি খোকা হবে"।[৫] নিজেদের সুন্দর একটি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বীজ এর মধ্যে নিহিত আছে।।

জমিদার পরিবারের সংসার সামলানো সাধারণ একজন রমণী দয়াময়ী। জমিদার বাড়িতে দাস দাসীর অভাব না থাকলেও 'গৃহকার্য্যের অধিকাংশ দয়া স্বহস্তে করিত'।[৬] বিশেষত, সে তার শ্বশুর কালীকিঙ্করের পূজা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ নিজের হাতে সামলাতো। কালীকিঙ্কর ছিলেন একজন ধর্মান্ধ মানুষ। পরম পন্ডিত এই মানুষটি ছিলেন শক্তি উপাসক – 'একজনপ্রকৃত সিদ্ধ পুরুষ, আদ্যাশক্তির বিশেষ অনুগৃহীত'।[৭] গ্রামের ছোট থেকে বড় সকলের কাছেই তিনি পরম শ্রদ্ধেয়। এই কালীকিঙ্কর হঠাৎ কাকভোরে নিদ্রাচ্ছন্ন পুত্র ও পুত্রবধূকে ডাকতে আসেন।শ্বশুরের ডাকে প্রথম ঘুম ভাঙ্গে দয়াময়ীর। তারপরদয়াময়ীর ডাকে উমাপ্রসাদ জেগে ওঠে এবংঅবাক হয়ে বলে'এত ভোরে পিতা ত কখনওডাকেন না'।[৮] তার উপরে আবার পিতার গলার স্বরটাও কাঁপা এবং অন্যরকম মনে হয় উমাপ্রসাদের কাছে।পিতার এহেন ব্যবহারে তারাশঙ্কিত হয়ে পড়ে। মনে করে হয়তো বা খোকারকিছু হয়েছে। কিন্তু এই ধারণা পরক্ষণেই ভেঙে যায়, যখন দেখে 'পিতার পরিধানে রক্তবর্ণকৌষেয়বস্ত্র,স্কন্ধেনামাবলীউত্তরীয়,গলেরুদ্রাক্ষমাল্য লম্বমান'।[৯]

পিতাকে এরকম পূজার বেশ পরিধান করতে দেখেউমাপ্রসাদ অবাক হয়ে যায়। কালীকিঙ্করদয়াময়ীর উদ্দেশ্যে বলে“বাবা, ছোটবউমা কোথায়”?[১০] এবং পরক্ষণেই বধূকে দেখা মাত্রই তাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে। পিতার এই আচরণে উমপ্রসাদ হতবাক্ হয়ে যায়। দয়াময়ীও নিশ্চুপ হয়ে যায়। দয়াময়ীকে প্রণাম করার জন্য পিতা যখন উমপ্রসাদকেআদেশ দেয়, তারপ্রত্যুত্তরে উমাপ্রসাদের উক্তি“বাবা ! - আপনি কি উন্মাদ হয়েছেন”?[১১] হঠাৎ করেগৃহবধূর প্রতি এরকম আচরনের কারণদুজনের কেউই বুঝতে পারে না।পিতার এরকম ভাবমূর্তিউমাপ্রসাদ আগে কখনো দেখেনি। কলীকিঙ্কর রাতে স্বপ্ন দেখেন, স্বয়ং মাকালীই নাকি তার ছোট বউমার রূপ ধরে তাঁর গৃহে আবির্ভূত হয়েছেন – “মা জগন্ময়ী কৃপা করে ছোট বউমার মূর্ত্তিতে আমার গৃহে স্বয়ং অবতীর্ণা হয়েছেন”।[১২] এই ঘটনায় তার জীবন ধন্য হয়েছে, কুল পবিত্র হয়েছে এবং বহুদিনের সাধনা সফল হয়েছে। একলহমায় দয়াময়ী একজন সাধারন মানুষ থেকে দেবীতে পরিণত হয়ে যায়। ‘দয়াময়ী ছিল মানবী - সহসা দেবীত্বে অভিষিক্ত হইল’।[১৩]

হঠাৎ করে কিছু বুঝে ওঠার আগেই একজন সাধারন সংসার সামলানো গৃহবধূ থেকে দয়াময়ী দেবীতে পরিণত হল।ধূপ - দীপ জ্বালিয়ে, শঙ্খ ঘন্টা বাজিয়ে, ষোড়শো পচারে তার পূজা শুরু হয়, বহুছাগ বলিও হয়। সেদিনের ঘটনার পর থেকে তিন দিন অতিবাহিত হয়েছে। আশেপাশের অনেক গ্রামে এই খবর ছড়িয়ে পড়েছে। বহু মানুষজনের আগমন ঘটেছে জলজ্যান্ত এই দেবীকে দেখার জন্য। দয়াময়ীর দেবীত্বকে নিয়ে যেখানে কলীকিঙ্কর কিংবা ধর্মীয় বিশ্বাসে আচ্ছন্ন সাধারণ মানুষের মধ্যেউৎকণ্ঠার অবধি ছিল না, সেখানে দয়াময়ী ছিল নিতান্ত অসহায়। এই ধরনের অভাবনীয়, অদ্ভুত ঘটনায় দয়াময়ী মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তিন দিন ধরে পূজো পেলেও সে কিন্তু কেঁদেই চলেছিল।‘আহার নিদ্রা একপ্রকার ত্যাগ করিয়াছে বলিলেই হয়’।[১৪] এসব ঘটনার পূর্বে সেছিল বাড়ির সামান্য একজন বধূ। যে কিনা শ্বশুর - ভাসুরের সামনে আসতো না এবং মুখে ঘোমটা দিয়ে থাকত। কিন্তু এখন আর সেসবের কোন প্রয়োজন নেই কারণ এখন দয়াময়ী একজন দেবী। তাকে দেখার জন্য অগণিত ভক্তের ভিড়। ফলে, সে ‘শূন্য-দৃষ্টিতেপাগলিনীর মত চাহিয়া থাকে’।[১৫] একটা স্বাভাবিক সাধারণ জীবন-যাপন থেকে হঠাৎ করে জীবন ধারার আমূলপরিবর্তন - যা ছিল তাদের কল্পনাতীত।

উমাপ্রসাদ তার পিতার মতো ধর্মপরায়ণ ছিল না।সে শাক্ত পরিবারের সন্তান হলেও বিবাহিত জীবনের মধ্যেকোনদিনও তার স্ত্রীর কাছে মুদ্রাপ্রকরণবা মাতৃকান্যাসেরকোন প্রসঙ্গ উত্থাপন তো করেই নি এমনকি যম-নিয়মাদি সংক্রান্ত বিষয়েও তার স্ত্রীকে কোন কথা বলেনি।। কিন্তু, উমপ্রসাদ তার পিতার অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারেনি। সেদিন ভোরের ঘটনার পর উমাপ্রসাদের সাথে তার স্ত্রীর আর সাক্ষাৎ হয়নি। তিনদিন পর রাত্রি দ্বিপ্রহরে সে তার স্ত্রীরসাথে গোপনে দেখা করতে আসে। দয়াময়ী ও উমাপ্রসাদেরজীবনের এই অকস্মাৎ পরিবর্তনেউভয়েই

হতবাক্। উমাপ্রসাদ দয়াময়ীকে দেখে বলে ওঠে"দয়া! একি হল?"[১৬] মানবী দয়াময়ী কিছুক্ষণের জন্য স্বামীর সান্নিধ্য পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। গত তিন দিন অন্ধ ভক্তের 'মা-মা' শব্দে সে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। স্বামীকে পেয়ে সে স্বামীর বুকে মুখ লুকায়। উমাপ্রসাদ তার স্ত্রীর দেবিত্বকে কোনভাবেই মেনে নিতে পারেনি। সন্ধ্যার আরতিতে কোনদিন সে থাকতে পারেনি। শঙ্খ-ঘণ্টার ধ্বনিতে চণ্ডীমণ্ডপ ফেটে যেত, পূজা আরম্ভ হলে উমাপ্রসাদ সেই আওয়াজ সহ্য করতে না পেরে বাড়ি ছেড়ে গ্রামের বাইরে চলে যেত।এইসমস্ত ঘটনায় হতবাক্ হয়েসে পরিস্থিতিকে মেনে নিতে পারেনি। বারবার বলতে থাকে"দয়া! একি হল - একি হল?"[১৭] উমাপ্রসাদ তার পিতার অন্ধবিশ্বাসের ওপর নিজের বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেনি, সে বলে – "দয়া! তোমার কি মনে হয় যে এ কথা সত্যি? তুমি আমার দয়া নও, তুমি দেবী?"[১৮] দয়াময়ীরনিজের মানবত্বে বিশ্বাস ছিল, তাই সে বলে, "আমি তোমার স্ত্রী ছাড়া আর কিছু নই, আমি তোমার দয়া ছাড়া আর কিছু নই-আমি দেবী নই – আমি কালী নই"।[১৯] দয়া খুব ভালো করে জানেসে একজন সাধারণ মানবী মাত্র। কিন্তু দুজনেই অসহায়, নিরুপায়। পরিস্থিতি মেনে নেওয়া ছাড়া করার কিছু নেই। দুই অসহায় হৃদয়ের কাতর আকুতি উভয়ের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে।

বেঁচে থেকে দিনের পর দিন নরক যন্ত্রণা ভোগ করা উভয়ের পক্ষেই কঠিন হয়ে পড়েছিল। উমাপ্রসাদ তার স্ত্রীকে নিয়ে দূরদেশে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সাত দিন সময় নিয়ে উমাপ্রসাদ স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নেয়। এই সাত দিনে দয়াময়ীর কাছে বহু মানুষের আগমন ঘটেছে।আশি বছরের এক বৃদ্ধ তার শিশু নাতিকে বাঁচানোর জন্য দেবীর আসনে অধিষ্ঠিত মানবী দয়াময়ীর কাছে প্রাণভিক্ষা চেয়েছে। দয়াময়ীর শ্বশুর কালীকিঙ্করসেই বৃদ্ধকে নির্দেশ দেয় – "দাদা! তোমার নাতিকে এনে মার পায়ের কাছে ফেলে রাখ, যমের বাবার সাধ্য হবে না এখান থেকে নিয়ে যেতে"।[২০] বৃদ্ধতার নাতিকে এনে দয়াময়ীর পায়ের কাছে রেখে দেয় এবং চরণামৃত খাওয়াতে থাকে। অপরদিকে দয়াময়ীর হৃদয় ব্যথিত হয়ে ওঠে শিশুটির মাকে দেখে। দয়াময়ী প্রার্থনা করে"হে ঠাকুর, আমি দেবতা হই, কালী হই, মানুষ হই, যেই হই – এই ছেলেটিকে বাঁচিয়ে দাও ঠাকুর"।[২১] দয়াময়ী নিজে কি, সেটা নিয়ে তার মনে যথেষ্ট সংশয় আছে। অন্যের বিশ্বাসে সে দেবী কিন্তু নিজের কাছে সে নিতান্তই সাধারণ মানবী মাত্র। শিশুটি কাকতালীয় ভাবে বেঁচে ওঠে এবং এই সংবাদ চারিদিকে খুব দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ে। এর পরের ঘটনা একটি গর্ববতী মেয়ের।সে প্রসব যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ওঠে। সেই মেয়েটিকে ও দয়াময়ীর চরণামৃত খাওয়ালে সে রাজপুত্রের মতো পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়। এসব ঘটনার পর দয়াময়ীর দেবীত্বে মানুষ আরো বেশি বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। একশ্রেণীর মানুষের অন্ধবিশ্বাস এবং তাদের আরোগ্য লাভের জন্য অপর কোন মানুষের জীবনে যে ট্রাজেডি নেমে আসতে পারে তা দয়াময়ীর জীবনেরঘটনা দেখেই বোঝা যায়। এসব অলৌকিক, অভাবনীয় ঘটনার ফলে দয়াময়ীর নিজের দেবিত্বের উপর আস্থা

জন্মাতে শুরু করে। উমাপ্রসাদ পূর্ব কথামত সমস্ত বন্দোবস্ত করে ফেলে তার স্ত্রীকে নিয়ে দূরদেশে চলে যাওয়ার জন্য। কিন্তু দয়াময়ী তাতে আপত্তি জানালে উমাপ্রসাদ প্রথমে হেসে ওঠে, সেভাবে হয়তো দয়াময়ী মজা করছে। কিন্তু পরক্ষণেই উমাপ্রসাদ বজ্রাহত হয়ে দয়াময়ী কে বলে ওঠে – “দয়া, তুমিও পাগল হলে?”[২২] আসলে এই সাত দিনের ঘটনায় দয়াময়ী নিজেকে দেবী ভাবতে শুরু করেছে।স্পষ্টভাবে উমা প্রসাদ কে সে জানিয়ে দিয়েছে – ‘আমি যে দেবী নই, আমি যে তোমার স্ত্রী, তাআরআমি নিশ্চয় করে বলতে পারিনে’।[২৩] উমাপ্রসাদের কাছ থেকেসে স্ত্রীর অধিকার কেড়ে নেয়, স্ত্রী ভাবে তাকে স্পর্শ করতেও নিষেধ করে। কারণ, এতে নাকি উমাপ্রসাদের অমঙ্গল হবে বলেজানায়সে। আসলে অন্যান্য লোকজনদের মতো দয়াময়ীরনিজের দেবিত্বে বিশ্বাস জন্মেছে। অলৌকিকভাবে মানুষ রোগ থেকে মুক্তি লাভ করছে, সে সবকিছুই কি ভ্রান্ত! উমাপ্রসাদ তাকে নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করে, কিন্তু সে বিফল হয়। অনুনয়, বিনয়, অশ্রুমোচন - এসব বৃথা চেষ্টার পর উমাপ্রসাদ তাদের বিবাহ সম্পর্কিত নানারকম যুক্তিপূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করতে থাকে।“আমি যে তোমাকে বিবাহ করেছি, এতদিন যে আমি তোমার স্বামীর আসনে অধিষ্ঠিত রয়েছি, এতেই ত বোঝা যাচ্ছে যে আমিও মানুষ নই, - আমিও দেবতা, আমি স্বয়ং মহেশ্বর”![২৪] এসবযুক্তিপূর্ণ কথা শুনে দয়াময়ী বলে“যদি তাই হয়, তবে আমি তোমার স্ত্রী। দেবী হই, মানুষ হই, আমি তোমার স্ত্রী”।[২৫] প্রথমেদয়াময়ী তার স্বামীর কথাতে রাজি হয় এবং স্বামীর সাথে যেতে রাজি হলেও নৌকাতে চড়ার আগে দৃঢ় স্বরে বলে ওঠে “আমি যাব না”।[২৬] আসলে দয়াময় চায়নি সকলের বিশ্বাসে আঘাত আনতে তাই তার যুক্তি “আমি যদি দেবী, তুমি আমার স্বামী মহেশ্বর, তবে দুজনেই এখানে থাকি, দুজনেই পূজা গ্রহণ করি, পালাব কেন? এত জনের ভক্তিতে আঘাত দেব কেন?”[২৭] গ্রাম গ্রামান্তরের অন্ধবিশ্বাসের দ্বারা পূর্ণ মানুষের সংখ্যা অনেকটাই বেশি। তাদের বিশ্বাসের ওপর কোনোভাবেই দয়াময়ী আঘাত হানতে চায়নি।তাদের অন্ধবিশ্বাসের ওপর দয়াময়ীর বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেইকারণে, দয়াময়ী পুনরায়দেবীর আসনে অধিষ্ঠিত হল আর উমাপ্রসাদ সেই রাত্রির অন্ধকারে দূরদেশে পাড়ি দিল। গল্পের বাকি অংশে তার আর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। দয়াময়ীর সাথে উমা প্রসাদের চিরবিচ্ছেদের একটা আভাস গল্পমধ্যে পূর্বেই পাওয়া গেছে। উমাপ্রসাদ যখন একটু আলাদা রকম ভাবে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখেএবং দয়াময়ীর সাথে এ বিষয়ে যখন কথোপকথন চলতে থাকে, তখন দয়াময়ী খোকার না আসার কারণে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলে ওঠে, “দেখ, আজ আমার মনটা কেমন হয়ে গেছে”।[২৮] অপরদিকে উমাপ্রসাদ তার পত্নীর মন খারাপের কারণ খোকার না আসাটা বলে মনে করেনি; তার পশ্চিমে চাকরি করতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়াটাই দয়াময়ীর মন খারাপের কারণ বলে উমাপ্রসাদের মনে হয়েছে। উমাপ্রসাদ দয়াময়ীকে কাছে টেনে নিলে দয়াময়ী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলতে থাকে, “আমি বুঝতে পারছিনে। মনে হচ্ছে

যেন আর তোমার সঙ্গে দেখাহবেনা”।[২৯] দয়াময়ীর চিন্তার দূরদর্শিতা পরবর্তী ক্ষেত্রে গল্প মধ্যে ফুটে উঠেছে।

মানবী দয়াময়ীর নিজের দেবিত্বে বিশ্বাস স্থাপনের পরের ঘটনা খুব দ্রুতগতিতে এগিয়েছে। দয়াময়ীর দেবীত্বে বাড়ির সকলে বিশ্বাস স্থাপন করলেও তার জা হরসুন্দরী বিন্দুমাত্র বিশ্বাস স্থাপন করেনি। তাই দয়াময়ীর নিজের দেবিত্বে যখন প্রথমে বিশ্বাস হয়নি, তখন হরসুন্দরী ছিল তার একমাত্র আশ্রয়স্থল। দয়া তার কাছে গিয়েই নিজের মনের বেদনা ব্যক্ত করত। পরবর্তী ক্ষেত্রে দেখা যায় দয়াময়ীসহ বাড়ির অন্যান্য সদস্যের কারণেই হরসুন্দরীর জীবনে নেমে আসে বিপর্যয়। তার একমাত্র পুত্র ‘খোকা’ অসুস্থ হয়ে পড়ে। খোকা জ্বরে দিনের পর দিন শুকিয়ে যেতে থাকে। হরসুন্দরীতার স্বামী তারাপ্রসাদ কে ডাক্তার এনে চিকিৎসার কথা বলতেই সে বলে ওঠে – “খবরদার, ও কথা বোলোনা, ছেলের অকল্যাণ হবে।মা যা করবেন তাই হবে”।[৩০] কারণ সে পিতার বিশ্বাসকে বেদের মতো মান্য করে চলে। তাই হরসুন্দরীর প্রস্তাব কে সে গ্রাহ্য করে না। আবার হরসুন্দরী লুকিয়ে একজন ঝিকে দিয়ে কোন একজনকবিরাজের কাছে ওষুধ আনতে পাঠালেসেও প্রত্যাখ্যান করে। কারণ দয়াময়ীর শক্তিতে বিশ্বাসী সেই কবিরাজনিজের জিহ্বাদংশন করে জানান, স্বয়ং দেবী যখন নিজে থেকে বলেছেন যে তিনি খোকাকে সুস্থ করে দেবেন, তখন সেক্ষেত্রে কোনোভাবেই তিনি ওষুধের ব্যবস্থা করে অপরাধী হতে পারবেন না। এরকম পরিস্থিতিতে খোকার মা নিতান্ত নিরুপায় হয়ে যাকে দেখতে পায়, তাকে দেখেই ক্রন্দনরতা অবস্থায় নিজের অসহায় পরিস্থিতির কথা বলতে থাকে। সকলেরমুখে একই ধরনের কথা“তোমার ভাবনা কি? তোমারঘরে স্বয়ং আদ্যাশক্তি বিরাজ করছেন”।[৩১]

গল্পের শেষ পর্যায়ে এসে দেখা যায়, দয়াময়ীর কোলে রোগাক্রান্ত খোকার মৃত্যু হয়েছে। যে দয়াময়ী নিজের দেবিত্বের উপর বিশ্বাস রেখে তার শ্বশুরকে আশ্বস্ত করে বলেছিলযে, খোকাকে সে নিজেই ভালো করবে; কিন্তু খোকার মৃত্যুতে সমস্ত কিছুই তাদের হাতের নাগালের বাইরে চলে যায়। খোকার গায়ে হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করেখোকাকে আপ্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করে দয়াময়ী।কলীকিঙ্করের তখনও দয়াময়ীর দেবীত্বের প্রতি বিশ্বাস অটুট আছে। তিনি বলেন, “মা, খোকাকে ফিরিয়ে দে। এখনও দেহ নষ্ট হয়নি। ফিরিয়ে দেমা ফিরিয়ে দে”।[৩২] খোকার বাবা তারাপ্রসাদ দয়াময়ীকে ‘রাক্ষসী’ বলে সম্বোধন করে, খোকার মা হরসুন্দরী শোকে বিহ্বল হয়ে পড়ে এবং সুস্থ হওয়ার পর দয়াময়ীকে নানারকম ভাবে দোষারোপ করতে থাকে।দয়াময়ী খোকাকে বাঁচানোর জন্য প্রথমে যমরাজকে আদেশ এবং পরে অনুরোধ করে তার দেহে আত্মা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু যখন কোনভাবেই কোন কিছু করা গেল না, তখন দয়াময়ীর সম্বিত ফিরে আসে – ‘তখন নিজের দেবীত্বে দয়ার অবিশ্বাসজন্মিল’।[৩৩] সে বুঝতে পারে তার নিজের ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণে তারই সবচেয়ে প্রিয়, বাড়ির সকলের আদরের খোকাকে সে হারিয়ে ফেলেছে। নিজের গৃহের এত বড় ক্ষতি হওয়ার পর

তারপরিবারের, গ্রামের সব মানুষের দয়াময়ীর দেবীত্বের প্রতি অবিশ্বাস জন্মায়। কারণ, তার পূজা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। কেউ তার কাছে আসে না। দয়াময়ী অন্ধবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে নিজের জীবনে ট্রাজেডি নিয়ে আসে।নিজের স্বামীর সান্নিধ্য প্রত্যাখ্যান করেছে, প্রাণের চেয়েও প্রিয় খোকাকে হারিয়েছে। তার জীবনে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। বেঁচে থাকার রসদ সমস্তটাই ফুরিয়ে গেছে। তাই দয়াময়ী কেশেষ পর্যন্ত আত্মহননের পথ বেছে নিতে হয়েছে।

কালীকিঙ্করের কারণেই উমাপ্রসাদ ও দয়াময়ীর জীবন সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। একজন মানুষের ধর্মান্ধতার কারণে গোটা পরিবারে কিভাবে বিপর্যয় নেমে আসে, তা গল্প মধ্যে ফুটে উঠেছে। দয়াময়ী একজন সাধারন মানবী অন্ধবিশ্বাসের বশবর্তীহয়ে নিজেকে দেবী ভাবার ফলস্বরূপ সর্বস্ব হারিয়ে ফেলে। দেব-দেবীরা কখনো আত্মহত্যা করতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জীবিত-মৃত' গল্পে 'কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল, সে মরে নাই'।[৩৪] এখানে ঠিক তারই প্রতিচ্ছবি লক্ষণীয়। দয়াময়ী আত্মহত্যা করে প্রমাণ করে সে দেবী নয়, একজন সাধারন মানবী মাত্র। অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, অলৌকিকতার দোলাচলতায় 'দেবী' গল্পটি এক অসামান্য সাহিত্যকীর্তি।

তথ্যসূত্র:-

১। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'গল্পসমগ্র', যূথিকা বুক স্টল, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৫, চতুর্থ প্রকাশ বইমেলা ২০১৩, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ২৬৬।

২। তদেব – পৃষ্ঠা ২৬৬।

৩। তদেব – পৃষ্ঠা ২৬৬।

৪। তদেব – পৃষ্ঠা ২৬৭।

৫। তদেব – পৃষ্ঠা২৬৭।

৬। তদেব – পৃষ্ঠা২৬৭।

৭। তদেব – পৃষ্ঠা২৬৫।

৮। তদেব – পৃষ্ঠা ২৬৮।

৯। তদেব – পৃষ্ঠা ২৬৮।

১০। তদেব – পৃষ্ঠা ২৬৮।

১১। তদেব – পৃষ্ঠা ২৬৮।

১২। তদেব – পৃষ্ঠা ২৬৮।

১৩। তদেব – পৃষ্ঠা ২৬৮।

১৪। তদেব – পৃষ্ঠা ২৬৯।

১৫। তদেব – পৃষ্ঠা ২৬৯।

১৬। তদেব – পৃষ্ঠা ২৬৯।

১৭। তদেব – পৃষ্ঠা ২৬৯।

১৮। তদেব – পৃষ্ঠা ২৬৯।
১৯। তদেব – পৃষ্ঠা ২৬৯।
২০। তদেব – পৃষ্ঠা ২৭০।
২১। তদেব – পৃষ্ঠা ২৭১।
২২। তদেব – পৃষ্ঠা ২৭১।
২৩। তদেব – পৃষ্ঠা ২৭১।
২৪। তদেব – পৃষ্ঠা ২৭১।
২৫। তদেব – পৃষ্ঠা ২৭২।
২৬। তদেব – পৃষ্ঠা ২৭২।
২৭। তদেব – পৃষ্ঠা ২৭২।
২৮। তদেব – পৃষ্ঠা ২৬৭।
২৯। তদেব – পৃষ্ঠা ২৬৮।
৩০। তদেব – পৃষ্ঠা ২৭২।
৩১। তদেব – পৃষ্ঠা ২৭২।
৩২। তদেব, পৃষ্ঠা ২৭৩।
৩৩। তদেব, পৃষ্ঠা ২৭৩।
৩৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'গল্পগুচ্ছ', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ কলকাতা, তিন খন্ডে প্রথম প্রকাশ ১৩৩৩, চতুর্থখন্ড আশ্বিন ১৩৬৯, কলকাতা ১৭, পৃষ্ঠা ৯১।

সহায়ক গ্রন্থ.

১। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'গল্পসমগ্র', যূথিকা বুক স্টল, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৫, চতুর্থ প্রকাশ বইমেলা ২০১৩, কলকাতা ৭০০০৭৩।
২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'গল্পগুচ্ছ', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ কলকাতা, তিনখন্ডে প্রথম প্রকাশ ১৩৩৩, চতুর্থখন্ড আশ্বিন ১৩৬৯, কলকাতা ১৭।
৩। শিশিরকুমার দাশ, 'বাংলা ছোটগল্প' (১৮৭৩-১৯২৩), দেজ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ১৯৬৩, পুনর্মুদ্রণ নভেম্বর ২০১৬, কলকাতা ৭০০০৭৩।
৪। উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (সম্পাদক), 'গল্পচর্চা', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম সংস্করণ প্রজাতন্ত্র দিবস ২০০৮, কলকাতা ৭০০০০৯।
৫। বীরেন্দ্র দত্ত, 'বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ' (প্রথম খন্ড), পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ অগাস্ট ১৯৮৫, দশম মুদ্রণ নভেম্বর ২০২১, কলকাতা ৯।

'Free Style' : শিল্পীর জন্ম ও একটি উপন্যাস

নুনম মুখোপাধ্যায়
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ (Abstract) : বাংলা সাহিত্যে বৈচিত্র্যময় ধারাগুলি নিয়ে উপন্যাস লেখা হলেও শিল্প বা নৃত্যকেন্দ্রিক উপন্যাসের সংখ্যা নগণ্য। মহাশ্বেতা দেবীর 'মধুরে মধুর' উপন্যাসে প্রেম মনস্তত্ত্বের পাশাপাশি শিল্পের একটি বিশেষ শাখা 'নৃত্য' সার্বিকভাবে বিকাশ লাভ করেছে। নৃত্য বলতে প্রথমেই ভরতনাট্যম, মণিপুরীর মতো শাস্ত্রীয় নৃত্যগুলির কথাই স্মরণে আসে। কিন্তু মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসটিকে সঠিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে হাজারো নাচের ভঙ্গিমা জুড়ে জুড়ে আদতেই জন্ম হয়েছে নতুন এক সৃজনশীল নৃত্যধারার। যেখানে লোকনৃত্য, শাস্ত্রীয় নৃত্য, পুতুল নাচ এমনকী দৈনন্দিন কর্মমুখর জীবনের যাপনচিত্রও মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। free style dance form যেমন তিলে তিলে বিকাশ লাভ করেছে তেমনই ভারতবর্ষের বুকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নতুন নতুন নৃত্যধারাকে জীবনের ঝড় ঝাপটার মধ্য দিয়ে আয়ত্ত করতে গিয়ে একদিকে আত্মপ্রকাশ করেছে আবার অপর দিকে হারিয়েও গেছে বহু শিল্পী। কখনো শিল্পীর সাথে শিল্প একাত্ম হয়ে গেছে, কখনো সম্মিলিত অনুশীলন, অধ্যবসায় জন্ম দিয়েছে নতুন ট্রুপের। আলোচ্য প্রবন্ধে 'মধুরে মধুর' উপন্যাসের নির্যাস থেকে একটি বিশেষ ধারা হিসাবে সৃজনশীল নৃত্য কীভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এবং সমান্তরালে ব্যক্তি সাধনের অপরাজেয় জীবন-যুদ্ধে তাঁর শিল্পী তথা নৃত্য পরিকল্পক হয়ে ওঠার যাত্রাপথ অনুসন্ধান করা হয়েছে।

সূচক শব্দ (Key word) : Free style, মণিপুরী, ভরতনাট্যম, কাঠ পুতুল নাচ, জারি, সারি, জিপসি, নিউ ট্রুপ, হাঁসুলি, 'ব্রহ্ম রসো বৈ সঃ', 'রুসালী মাধব', 'কাঁহি চরাবত গাবইয়া'

মূল আলোচনা (Discussion) :

অধিকাংশ বাঙালিই বিশ্বায়নের দৌলতে free style শব্দদ্বয়ের সঙ্গে বিশেষ ভাবে পরিচিত। কিন্তু অধিকাংশই জানেন না ফ্রি স্টাইল আদতে কী। অনেকে মনে করেন এটি ভারতীয় নৃত্যগুলোর মতোই এক বিশেষ প্রকার নাচ। যেমন ভরতনাট্যম, কথাকলি, ছৌ কিংবা ঝুমুর, হিপ্ হপ্ কিংবা সালসা— তেমনই ফ্রি স্টাইল। এই নাচ আসলে কোনো চিরাচরিত নৃত্যধারা নয়। আবার অনেকে মনে করেন ফ্রি স্টাইল মানে যেমন খুশি নাচো। তাও একেবারেই নয়। ফ্রি স্টাইল আসলে যুগের সঙ্গে, গানের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে অনেকগুলি আসল ডান্স ফর্মের একত্র সমাবেশ। যিনি এই

ধরনের নাচ সৃজন করবেন তাকে দেশ-বিদেশের নৃত্যশৈলীর সঙ্গে যথাযথভাবে পরিচিত হতে হবে। তাকে জানতে হবে উপযুক্ত পোষাক, মেকআপ এবং গহনার ব্যবহার। একটি সাঁওতাল রমণীর চরিত্রে যেমন কখনোই সোনার হার এবং উজ্জ্বল সাদা চড়া মেকআপ মানাবে না, তেমনই কৃষ্ণপ্রেয়সী রাধা চরিত্রে কালো রঙ, গলার হাঁসুলি কিংবা কানে মাকড়ি মানাবে না। নৃত্যের ভঙ্গিমা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও ধান রোয়ার দৃশ্যে যদি তাণ্ডব নৃত্য দেখানো হয় তাও হবে তেমনি বিসদৃশ। নৃত্যের আঙ্গিকে সৃজনশীল নৃত্য বা free styleকে যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করার জন্য একজন নৃত্যনির্মাতার সুদূরপ্রসারী কল্পনা করার ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। নৃত্যটি কেমন হবে, কে কোথায় দাঁড়াবে, কী পোষাক পরবে, কে কোন দৃশ্যে ঢুকবে এবং বেরোবে, কার কোন দৃশ্যে পোষাক পরিবর্তিত হবে, এর পাশাপাশি নির্মিত নৃত্যটি বাস্তবের সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে তাও একজন নৃত্য পরিকল্পকের চিন্তনে স্পষ্ট থাকবে। এমনকি দর্শকের গ্রহণ ক্ষমতারও অনুপুঙ্খ হিসেব তাঁর কাছে থাকবে।

মহাশ্বেতা দেবীর একটি বিখ্যাত উপন্যাস 'মধুরে মধুর' (১৯৬৯)। নৃত্যশিল্পীদের জীবনের প্রতিটি কোণার মণিমুক্তা দিয়ে উপন্যাসটিকে ঢেলে সাজিয়েছেন তিনি। নৃত্যশিল্পী যে আকাশের বস্তু নয়, কিংবা কোনো অমরলোকের কিন্নর কিন্নরী নয়, সেই বোধের অনেক ঊর্ধ্বে তাদের শোক, দুঃখ, প্রেম, হতাশা, যন্ত্রণার কথাই যেন তুলে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন তাঁর রচনায়। উপন্যাসের ঠাস বুননে কাহিনিমালাটিকেই স্বয়ং সম্পূর্ণ করে গড়ে তুলেছেন তিনি। দর্শক নৃত্যশিল্পীকে দেখে একদিন, যেদিন সে চূড়ান্ত প্রস্তুত! তাতে এতটুকু ফাঁক থাকে না। খুঁত ধরার অবকাশ থাকে না। কিন্তু যে সময় সে অনুশীলন করে সে সময়ে থাকে হাজারো ফাঁক। সেই সময়টুকু একজন নৃত্যশিল্পীর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আর সেই কথাই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন লেখিকা। কেবলমাত্র একজন নয়, শয়ে শয়ে নৃত্য ও সঙ্গীতশিল্পীরা তাদের জীবন দিয়ে প্রকৃত শিল্পীর সংজ্ঞাটুকু নির্ধারণ করে দিয়ে গেছেন। এখানেই উপন্যাসটির সার্থকতা।

'মধুরে মধুর' উপন্যাসে Free Style বা সৃজনশীল নৃত্যধারা কোনো বাঁধাধরা শাস্ত্রীয় নৃত্যের ব্যাকরণের কাছে নতিস্বীকার করেনি। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বলা ভালো সমগ্র পৃথিবী জুড়েই প্রতিনিয়ত নাচের যে ছন্দ সৃষ্টি হয়ে চলেছে, যে উন্মাদনা, আনন্দে ভরে উঠছে হৃদয়-মন, তার সবটুকু অণু-পরমাণুতে আছে নাচ! গাছের পাতার দোদুলদুল, নদীর কুলুকুলু কলতান, মরুভূমির ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া রিমঝিম বাতাস— সবটুকুর মধ্যেই যে সুপ্ত নাচের ছন্দ নিহিত তাতেই আকৃষ্ট হয়েছিল জাতশিল্পী সাধন। পল্লী বাংলার ঘরে ঘরে যে ধান্য উৎসবের আয়োজন, সন্ধ্যার উলুধ্বনি, শঙ্খ নিনাদ, সকালে নারীদের কলসী বয়ে জল এনে গোবর লেপা, এই স্নিগ্ধ সরস প্রকৃতির রূপ-লাবণ্যকেই সাধন বারবার ব্যবহার করতে চেয়েছে তার নিজস্ব প্রোডাকশনে। তার কম্পোজিশনগুলি তাই সব সময়েই মাটির কোল-ঘেঁষা।

উপন্যাসটি মূলত তিনটি চরিত্রকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। এই তিনটি চরিত্রের ভিত গড়তে এবং সম্পূর্ণতা দিতে এসেছে আরো কিছু চরিত্র। শিল্প সততই বহির্মুখী। নিঃসঙ্কোচে বিলিয়ে দিতে চায় নিজের শেষ বিন্দুটুকুকেও। তবে তার প্রকাশ ঘটে লাখে একজনের মধ্যে। সাধনের মধ্যে সেই প্রতিভাই বিকশিত হয়েছিল শিশুকাল থেকে। তার মধ্যে যে অস্থিরতা, ছটফটানি— তা কেবল নিজেকে বিলিয়ে দিতে না পারার। ছেলেবেলা থেকেই সাধন সংসার-বিমুখ। স্নেহের কাঙাল সাধন নাচের মধ্যেই মাতৃস্নেহের ভাবরস আস্বাদন করেছে। তাই একসময় অধৈর্য অশান্ত মন নিয়ে সরস বাংলা ছেড়ে উপস্থিত হয়েছে পার্বত্য দেশ মণিপুরে, কণ্ঠমণি ঠাকুরের আশ্রম 'মধুকুঞ্জে'। এখানে এসে তার মনে হয়েছে : "অন্তত সেই যে অদ্ভুত অশান্তির একটা দাহন, যা তাকে কোথাও স্থির থাকতে দেয় না, গতানুগতিক জীবনের কক্ষপথ থেকে তাকে বারবার ছিনিয়ে এনে ঠেলে দেয় একবার সনাতন দাসের আখড়ায়, জলবেদেদের ভরার নৌকায়, যাত্রাদলের সঙ্গে এখানে সেখানে— এবার সেই অশান্তির হাত থেকে সে ঠিক নিস্তার পাবে।"[১] কিন্তু নিস্তার সে পায় না। তার চোখের সামনে বারবার ভেসে ওঠে যাত্রাদলে সুবলসখার নাচ, শরতের ভরা নদী, নৌকোয় মেয়ে পুরুষের নাচ গান, পাতলা ফুরফুরে পাকা চুল দাড়ি নেড়ে সনাতন দাসের প্রেম ঢালা গান। আর নাচ তো কেবল পুঁথিগত বিদ্যা নয়, তা গুরুমুখী। তাই উপযুক্ত গুরুর অতৃপ্তিজনিত কারণেও ক্রমশ আগুন ধরেছে সাধনের মনে : "আমাদের দেশে কতো ছাঁদের যে নৃত্য প্রচলিত আছে সাধন— যদি সুযোগ পেতাম ঘুরে ঘুরে শুধু দেখতাম।"[২]

আর সেই টানেই অতি দ্রুত সাধন শিখে নিয়েছে মণিপুরী নৃত্যের যাবতীয় চাল, মাত্রা, ছন্দ। যখন তার শিক্ষা সম্পূর্ণ হল তখন সে অন্য সাধন। এই সাধনের পায়ের ভঙ্গিমা, নৃত্য-কুশলতা সকলের থেকে পৃথক। এ তার একান্ত ব্যক্তিগত, নিজস্ব ছন্দ। একদিন নৃত্য অভ্যাসকালে তার সেই নৃত্যটি দেখল সকলেই : "ষোলো মাত্রার চাল অক্ষুণ্ণ রেখেই পায়ের তালে তালে জারির ছাঁদে ঘুরে ঘুরে এক নতুন ভঙ্গিমা সৃষ্টি করে নেচে চলল সে।"[৩]

অনিবার্যভাবেই যেন এই মুহূর্তে তার জীবনে এসে পড়েছে রাধা। শ্রীরাধিকার মতোই সে শান্ত-স্নিগ্ধ-কোমল। কঠোর তার অনুশীলন প্রচেষ্টা। কোনো কিছুরই শেষ না দেখে তার যেন শান্তি নেই। যতক্ষণ না কোনো একটি বোল তার আয়ত্তে আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে ক্ষান্ত হয় না। বিরামহীন অবিশ্রান্ত জীবনে আছে কেবল নাচ নাচ আর নাচ। নাচেতেই ডুবে আছে আকণ্ঠ। কিন্তু প্রেম যে দোঁহে পরিপূর্ণ, এ বোধ রাধার অজ্ঞাত ছিল। সেই পূর্ণতা তাকে দিয়েছে সাধন। সাধনের প্রেমে আকুল রাধা রাস উৎসবের দিন হয়েছে পরিপূর্ণা। তাই হয়তো আত্মবিস্মৃত হয়ে গেছে মঞ্চে। পরস্পর পরস্পরের চোখে হারিয়ে ফেলেছে নিজেদের। চরিত্রের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে শিল্পীসত্তা। তখন কে সাধন কে রাধা কেই বা নীলমণি ঠাকুর! তখন শুধুই দেহমন মাতাল করা ছন্দ আর নৃত্য : "রাধাকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকারে ঘুরে আসে

সাধন। প্রত্যেকটি চক্র সম্পূর্ণ হলে পরস্পরকে প্রণতি জানায়। সখীজন মহানন্দে মণ্ডলাকারে ঘিরে ঘিরে নাচে।"[৪] কিন্তু এত যে নাচের অদ্ভুত নেশা তা হঠাৎ অভিশাপে পরিণত হয়। রাধার আত্মসমর্পণের প্রবল আকুতিতেও সংযম হারায় না সাধন। সে যে ভয়ানক অতৃপ্ত, তাকে তৃপ্তি দেওয়ার ক্ষমতা সদ্যযৌবনা রাধার নেই। তার মধ্যে কিশোরীর ঘ্রাণ বিলুপ্ত হয়নি। তাই হয়তো একপ্রকার সরেই আসে সাধন। আশ্রম ছেড়ে দেয়। যশবন্তের হাত ধরে এসে ওঠে রাজস্থানের জয়পুরের উত্তরে সীতমপুর গ্রামে।

এখান থেকে তার জীবন অন্য খাতে বইতে আরম্ভ করে : "নৃত্যগীতকুশল, নিপুণ শিল্পী বাঞ্জারা, লম্বাডি, গাড়িয়া, সোনার লোহার, ছুতার, এমনই আরও কত জাতি"[৫]র সন্ধান পায়। তাদের সংস্কৃতিতে মুগ্ধ হয়ে বাঞ্জারা বস্তিতে বাঞ্জারাদের জীবন কাটায়। মদ খায়। তাদের তামাটে রঙ, রূপার গহনা মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখে। এ যেন অজানাকে জানার পিপাসা। এই পিপাসাই মানুষকে ঠেলে দেয় আকুলতার দিকে। তাদের নাচে অর্ধচন্দ্রাকারে মেয়েদের দাঁড়ানো, আবার তাদের সামনে দাঁড়ানো একসার ছেলে, সব মিলিয়ে একটা সম্পূর্ণ বৃত্ত। মনে মনে শিখে নেয় সে। দেখে কেমন করে গালার কাজ করা রঙিন লাঠির আগায় বাঁধা আছে জরির থোপনা : "গানের বোল ধরে মেয়েরা মাতাল হয়ে নাচে। নাচের তালে তালে গুণ্ঠন এসে পড়ে মুখে। কৌতুকে পুরুষরা খুলে ধরে গুণ্ঠন। বলে- দেখ চাঁদ ভালো করে দেখ।"[৬] নাচের ঘূর্ণি আর গানের তালে একসময় ক্লান্ত হয়ে তারা মদ খায়। এই জায়গায় সাধন অক্লান্ত। দেখার কি শেষ আছে! এভাবেই সাধন শেখে পুতুল নাচের কলাকৌশল।

এই সময়েই সাধনের জীবনের জটিল গ্রন্থি উন্মোচনে এল প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী বৃন্দা কৌশিক। শৈশবের ব্যর্থতা অদ্ভুত বিষাদ হয়ে নেমে এসেছিল বৃন্দার জীবনে। খানিকটা বাধ্য হয়েই ব্যবসায়িক প্রয়োজনে বিবাহ করেছিল নারায়ণ কৌশিককে। জাঁকজমক, আলো, মঞ্চ, উজ্জ্বল রঙিন পোশাক, টান টান ব্যক্তিত্ব, মেকি হাসি, উগ্র প্রসাধন, প্রেস মিট, হাজার হাজার ক্যামেরার ফ্ল্যাশেই সীমাবদ্ধ ছিল বৃন্দার জীবন। সেই জীবনে মিষ্টি একটা দমকা ঝোড়ো হাওয়া হয়ে এল সাধন। বড়লোকী চালের মাঝখান থেকে বৃন্দাকে টেনে বের করে সে বলল : "সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মধ্যে যে আশ্চর্য সম্পদ আমি দেখেছি, তাকে যদি ফোটাতে পারো তোমার নাচের মধ্যে সে-ই হবে আসল জিনিস।"[৭] এরপর 'কলাতীর্থমে'র জয়যাত্রা শুরু হল।

এতদিন যে শৈল্পিক মন আলাদা আলাদা করে বাসা বেঁধেছিল তারা একত্রে ভিড়ল। ভারতবর্ষের নানা প্রান্ত থেকে এল ছেলে-মেয়েরা। এল নতুন নতুন শিল্প-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হয়ে। নতুন ট্রুপ জড়তামুক্ত হল সাধনের নির্দেশনা ও উভয়ের সম্মিলিত অনুশীলনে। এ যেন চাঁদ-সমুদ্রের পরস্পর আকর্ষণে উথলে ওঠা ভরাকোটাল। অথচ সাধনের অবাধ কল্পনা বাঁধাধরা ঠাটের মধ্যে মুক্তি পায় না। আরও সুবিশাল পরিসর প্রয়োজন তার। ভরতনাট্যম, মণিপুরীর কিছু আঙ্গিকের সাথে সাধন নিজের মতো করে জুড়ে দেয় লোকনৃত্যের ধারা। ইচ্ছে মতো কাটা-ছেঁড়া করে, আবার

জুড়ে দেয়। তাতেও যেন রাজ্যের অতৃপ্তি তার। আসলে সে যে জাতশিল্পী। জাতস্রষ্টা। তার নাচে বারবার উঠে আসে মালাবার উপকূলের জেলেদের জীবন, ফসল কাটার নাচ, একপায়ে ঘুঙুর বেঁধে জারি নাচ, সেখানে কোথায় যেন হারিয়ে যায় 'মনোহরা বন্ধনম'। এ শুধু সৃষ্টি নয়, ইতিহাস। ভারতীয় আঙ্গিকগুলিকে নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন অনেকেই, কিন্তু সাধন তাদের সকলের থেকে পৃথক। কারণ নাচ গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে আজন্ম লালিত ঐশ্বর্য্য। যা বিশ্ব সংসারকেও আকুল করার ক্ষমতা রাখে। সেই নাচ শুধু মুগ্ধ করে না, তার রেশটাকেও ধরে রাখে বহুদিন।

এক শিল্পী আর এক শিল্পীর প্রেমে পড়ল। নৃত্যের উন্মাদনা প্রেম থেকে সঞ্চারিত হল শরীরে। এতদিন নামমাত্র বিবাহিত ছিল বৃন্দা। নারায়ণের সাথে তার অনেকখানি মানসিক ও শারীরিক দূরত্ব ছিল। সে সমস্ত ব্যবধান ঘুচে গেল সাধনের প্রেমময়তায়। তাই একসময় সাধন বলেছে : "দুজনেই আমরা যখন একেবারে আত্মসমর্পণ করে নাচছি, তখনই দুজনের আত্মায় মিল হল। রোজকার আমি কত অসম্পূর্ণ, কত খর্ব। কিন্তু মঞ্চে যখন দাঁড়াই, সেই আমি-ই সত্যিকারের আমি। নাচের তালে তালে আমি তোমার সঙ্গে আমার গভীর মিলনের আনন্দ পেলাম— যাকে কণ্ঠমণি বলতেন— ব্রহ্ম রসো বৈ সঃ— ব্রহ্ম রসের সদৃশ আনন্দ।"[৮] আঁধার সাক্ষী রইল এ প্রেমের। চাওয়া-পাওয়া ভাসিয়ে এল সৃজনের প্রেরণা। প্রেমের অসীম শক্তি ও সাধনের শিল্পীসত্তা মিলেমিশে জন্ম নিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী কিছু প্রোডাকশন। সেই নাচে 'পদ্মানদীর উপকথা', সামান্য মোরগ লড়াইটুকু পর্যন্ত প্রাণবন্ত হয়ে উঠল।

এরপরেই অনিবার্য পরিণতি হিসাবে এসেছে বিচ্ছেদ। ট্রুপ ভেঙে গেছে। নৃত্যশিল্পীদের জীবনে সুখ বড় ক্ষণস্থায়ী। সেই অমোঘ বাণীই যেন সত্যি হয়ে উঠেছে। ঈর্ষান্বিত নারায়ণ, ট্রুপের সমস্ত টাকা আত্মস্যাৎ করে বিরোধিতা করতে শুরু করেছে। দল ছেড়ে বেরিয়ে গেছে সাধন। প্রকৃত শিল্পী কখনও নিজের স্বার্থ দেখে না। ট্রুপের স্বার্থে সে সরে গেছে। নিজের সুখ, ভালোবাসা কোনো কিছুর কথাই একটিবারের জন্যেও ভাবেনি। তার স্মৃতিপটে কেবল জ্বলজ্বল করেছে চল্লিশটি অবিস্মরণীয় মুখ। এই সময়েই এসেছে অপ্রত্যাশিত এক আঘাত। ভূমিকা প্রস্তুতই ছিল। বাকি ছিল কেবল দৃশ্যপট উন্মোচনের। দীর্ঘদিনের অনিয়ম, অসহযোগিতায় দেহে বাসা বেঁধেছে ক্ষয়রোগ। তাই সেটা এখন দুর্দমনীয় হয়ে দেখা দিয়েছে অকস্মাৎ। এই দুর্দিনে পরম সুহৃদ হয়ে পাশে দাঁড়িয়েছে যশবন্ত। সৃষ্টির আদিকাল থেকে এভাবেই কেউ না কেউ কারুর না কারুর সহায় হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু সময় বড় খারাপ। বৃন্দাকে এসব ভাবতে হয়নি কোনোদিনই। সে নৃত্যশিল্পী। নাচ করা আর নাচ শেখানো এই দুয়ের মধ্যেই ডুবে থেকেছে সর্বক্ষণ। তাই নারায়ণের ভয়ঙ্কর বিশ্বাসঘাতকতায় টুকরো টুকরো হয়ে গেলেও সাধনের স্মৃতিকথা আঁকড়ে নিজেকে জুড়ে নিয়ে শক্ত হয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে বৃন্দা। ভালোবেসে কাঙালিনীর ঘর ভেঙেছে। এই সময় এসে বৃন্দা জেনেছে সে একা নয়, তার ছায়াসঙ্গী সাধনা। দেশ

ছেড়ে যাওয়ার প্রাক্‌মুহূর্তে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে রাধা। তিলে তিলে নিজেকে সাধনের উপযুক্ত করে গড়ে তুলে ফিরে এসেছে সে সাধনের খোঁজে। বৃন্দা দেখেছে রাধা আর সাধনের কথায় কত মিল, তারা উভয়েই যেন উভয়ের পরিপূরক। তাই নিঃসঙ্কোচে নিজের সবটুকু সঞ্চয় রাধার কাছে উজাড় করে দিয়েছে বৃন্দা। সে বুঝেছে নিজের স্বার্থের থেকেও বড় যে-স্বার্থ সেটাকেই খোলা চোখে দেখা জাতশিল্পীর কাজ।

রাধা এসেছে সাধনের কাছে অমৃতের ভাণ্ডার নিয়ে। সাধনকে নিয়ে যেতে। রাধার কথা বৃন্দার থেকে একেবারেই আলাদা। সে জানে নৃত্যময় এই জীবন ছাড়া তার মুক্তি নেই। সাধন না এলেও ট্রুপ সে গড়বেই। কিন্তু : "তবু আমি তোমাকে চাই। তুমি শুধু নির্দেশ দিও, আমি পায়ে নাচ তুলব। তুমি যা যা করতে চাইছ, অথচ দেহের জন্য পারছ না - তার সবই আমি করব সাধন।"[৯] এ কথা কোনো "প্রেমের কথা নয়। অঙ্গীকারের শপথ। একই ব্রত যুগলে উদযাপনের সংকল্প।"[১০] জন্ম হল 'নিউ ট্রুপ'-এর।

রাধা শক্তি দিল সাধনকে। প্রেমের যে উপেক্ষা একদিন রাধাকে পীড়া দিয়েছিল, আজ সেই উপেক্ষাই তাকে আগাগোড়া নৃত্যচিন্তায় মুড়ে দিয়েছে। প্রেমের ভাব অবগত হয়ে নির্নিমেষ দীপশিখাটির মতো সে হয়ে উঠেছে রিক্ত; দাবিহীন, শুদ্ধচিত্ত। সেই শক্তি সে সঞ্চারিত করতে পেরেছে সাধনের মধ্যে, তাই একসময় সাধনের মনে হয়েছে : "নিজে আমি নাচতে পারব না। তবু আঙ্গিক সৃজন করতে চাই। তৈরী করতে চাই এক নতুন ও নিজস্ব নৃত্যধারা।"[১১] নৃত্যশিল্পী নৃত্য পরিবেশন করে, নৃত্যশিক্ষায় অবগাহন করে সেই খাঁটি রূপটিকে নিজের মধ্যে অন্বেষণ করে। কিন্তু যিনি গুরু তিনি কেবল সৃষ্টি করেন।

প্রতিটি নৃত্যশিল্পীর জীবনেরই বোধহয় এটি একটি শ্রেষ্ঠ পরিণতি। কখনও মণিপুরী নাচের চতুর্থ চাল, আবার কখনও বা মুদ্রায় দুঃখ বা অনুশোচনাকে প্রকাশ করতে নির্দেশ দেয় সাধন। কখনো বলে চাষী বৌদের মতো করে মাথায় বোঝা নিয়ে ঝুঁকে আসার অভিনয় করতে। মণিপুরী, কথাকলি, ভরতনাট্যমের মতো মোটাদাগের নৃত্যগুলির সাথে সাথে অজস্র জাতি, উপজাতিদের ধর্ম-সংস্কৃতি ও ভাবরীতি অনুযায়ী নাচের আঙ্গিক আহরণ করেছিল সাধন, সে সবটুকুকে মিশিয়ে ফেলে অনায়াসে। সাধনের সূক্ষ্মতম কথাটিকেও নাচের ছন্দে ফুটিয়ে তোলার ইচ্ছেয় এতটুকু খামতি দেখা যায় না রাধার মধ্যেও। গভীর অনুসন্ধান, সাধনা, চিন্তার জালকে ছিন্ন ভিন্ন করে একসময় সাধন দেখতে পায় : "সেই জারি সারি নাচের মানুষগুলো, মণিপুরি নাচের মেয়েরা, জিপসি ছেলেমেয়েরা সবাই পাগল হয়ে উঠল। কাঠপুতুলের সঙ্গে তারাও কাঠকাঠ ভঙ্গিতে নাচতে শুরু করল। বহু কাঠপুতুল, আবার মানুষরাও নাচছে কাঠপুতুলের ঢঙে। নাচছে আর হাত তুলে সাধনকে ইশারা জানাচ্ছে।"[১২] সাধনের জন্য এটুকুই যথেষ্ট ছিল। সে খুঁজে পেল তার বহু অভিপ্রেত নৃত্য আঙ্গিকটি। বৃন্দাবনলীলার নয়নাভিরাম পটটির সাথে যুক্ত হল কাঠপুতলীর সজ্জা।

একজন নৃত্যশিল্পী কখনোই এককভাবে শ্রেষ্ঠ হতে পারেন না। তার জন্যে প্রয়োজন উপযুক্ত সহযোগী। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই একটা নির্দেশনাকে দিতে পারে সফলতার সোপান। ফলে এই কৃষ্ণলীলাকে তারা ঢেলে সাজায়। মহারাষ্ট্রের 'রুসালী মাধব', রাজস্থানের 'কাঁহি চরাবত গাবইয়া', যুক্ত প্রদেশের কৃষ্ণলীলা, বাল্যপর্বে যুক্ত হয় বাংলার 'যাবনা গো আর যাবনা' —সে এক বিরাট সংযোজন। এতটুকু কৃষ্ণলীলায় সারা দেশ এসে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। যে free style dance form-এর কথা আলোচনার সূচনাতেই বলা হয়েছিল এতক্ষণে যেন তার চরমতম বিকাশ ঘটেছে। ট্রুপের নতুন production আত্মপ্রকাশের আগে শেষবারের মতো একবার রিহার্শাল করিয়ে নেয় সাধন : "না হয় নিজে নাচতে পারছে না সাধন। প্রথম থেকে শেষ অবধি সমস্ত নৃত্যনাট্যটি যে তার মনে সে ধরে রেখেছে। প্রত্যেকটি চরিত্র কে কখন কেমন করে নাচবে, সবই সে জানে।"[১৩] তার পরিচালনায় নৃত্য ভাবসম্মিলনে সমাপ্ত না হয়ে সমাপ্ত হয় রাসনৃত্যে। আনন্দ প্লাবনে মিলনানন্দকে নন্দিত করে।

এতদিনের কাজ থেকে হঠাৎই যেন মুক্তি পায় সাধন। জীবনে কিছু দিয়ে যেতে পারার আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তার মন। আর কোনো ক্লান্তি নেই। খেদ নেই। একটা তৃপ্তিবোধ তাকে ঘিরে ধরে। আর এই শান্তিতেই ক্লান্তিবোধ করে সাধন। শ্বাসরোধের যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে তার ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে ওঠে। সে দেখতে পায় তার জীবনের মঞ্চপট। প্রতিটা চরিত্রই সেখানে উপস্থিত। সবাই নাচছে বিভোর হয়ে। দেখতে দেখতে আশ্চর্য হয়ে সাধন অনুভব করে : "নাচ-ও আর নাচ নেই। একটা আশ্চর্য গতি, অদ্ভুত দ্রুত তার লয়। মাটিতে যেন পা-গুলো আর পড়ছে না। ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে মাত্র! ...... খোল বোল করতাল মৃদঙ্গের বাজনায় বিভোর হয়ে কী যে সুন্দর নাচছে। ঈষৎ সুখে হাসিতে নয়ন নিমীলিত-প্রায়।"[১৪] সাধনের চোখে ধন্দ লাগে। কে নেই সেখানে! একটি গানের সুরে, নাচের ছন্দে বহু মানুষ উঠছে বসছে হাসছে নাচছে।

সাধন যেন পৌঁছে গেছে অনাস্বাদিত মুক্তির দোরগোড়ায়। সে দেখছে নৃত্যের তাল সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, নীহারিকালোককে কেমন করে ছন্দে ছন্দে মাতিয়ে তুলছে, এই তো মুক্তি, এই তো আনন্দ। এইখানেই একজন নৃত্যশিল্পীর পরমপ্রাপ্তি। নৃত্যনির্মাতার জীবনে এই হল শ্রেষ্ঠতম দিন। তিল তিল করে গড়ে তোলা শৈলীর পূর্ণতায় আছে মাতৃত্বের স্বাদ। এ সেই নৃত্য যা জীবনের অণু-পরমাণুতে কেন্দ্রীভূত, নটরাজের প্রলয় তাণ্ডবে যে নৃত্যের সৃষ্টি। সে নৃত্য কোনো অমরলোকের সঞ্চিত ধন নয়। এই অনুভবটুকুই একজন শিল্পীকে পৌঁছে দিয়েছে অনন্ত অমৃতলোকে। একজন যথার্থ গুরুই তো বলতে পারেন : "যা করেছ। তোমরাই করেছ। ত্রুটিগুলোর জন্যে আমিই দায়ী"[১৫]। এ কেবলই এক দূরতর আলোকবর্তিকার পথে যাত্রার পূর্ব প্রস্তুতি মাত্র। কণ্ঠমণি ঠাকুরের কথা আবার নতুন করে অনুভব করেছে সাধন। সে বুঝেছে এই আনন্দস্রোত অনন্ত। তার আদি নেই, অন্ত নেই। পদাবলির মণিমুক্তো কণ্ঠে ধারণ করে উত্তাল নৃত্যপর মানুষের জীবন্ত সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সাধন :

"কত চতুরানন মরি মরি জাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।

তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগর লহরী সমানা।।"[১৬]

তথ্যসূত্র (References) :

১। মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র-মহাশ্বেতা দেবী, দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদনা অজয় গুপ্ত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০১ খ্রি, পৃ. ২২।
২। তদেব, পৃ. ২৬।
৩। তদেব, পৃ. ২৭।
৪। তদেব, পৃ. ৩৩।
৫। তদেব, পৃ. ৩৯।
৬। তদেব, পৃ. ৪২।
৭। তদেব, পৃ. ৫৫।
৮। তদেব, পৃ. ৬৪।
৯। তদেব, পৃ. ৯৮-৯৯।
১০। তদেব, পৃ. ৯৯।
১১। তদেব, পৃ. ১০৫।
১২। তদেব, পৃ. ১০৯-১১০।
১৩। তদেব, পৃ. ১১৯।
১৪। তদেব, পৃ. ১২৮।
১৫। তদেব, পৃ. ১২৩।
১৬। তদেব, পৃ. ১৩১।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক হিংসা, সন্ত্রাস ও দুর্বৃত্তায়নের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ : একটি ধারাবাহিক পর্যালোচনা

জয়ন্ত কুমার বর্মন
সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
টুরকু হাঁসদা লপসা হেমরম মহাবিদ্যালয়
মল্লারপুর, বীরভূম

"What Bengal thinks today India thinks tomorrow"
- G.K. Gokhale

সারসংক্ষেপ: স্বাধীনতা পূর্ববর্তী অবিভক্ত বাংলা ও পরবর্তীকালে ১৯৬০ দশক পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা, শিল্প-কলকারখানা, অর্থনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের প্রথম সারির রাজ্য ছিল। অবিভক্ত বাংলার প্রাকৃতিক সম্পদ ও সমৃদ্ধির খবর ছিল গোটা পৃথিবীর কাছে, তাইতো পর্তুগিজ,ডাচ, ফ্রান্স, ব্রিটিশ প্রমুখ ইউরোপিয়ান জাতি ভাগ্য অন্বেষণে বাংলায় আসে। ব্রিটিশরা তাদের রাজধানী স্থাপন করে কলকাতায় যা বাংলা তথা পশ্চিমবঙ্গের অতীত গৌরবকেই প্রমাণিত করে। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষে যে সমস্ত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হয় তার পীঠস্থান ছিল এই বাংলা। বাংলার নবজাগরণের অগ্রদূত রামমোহন, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলন, বেদান্ত আন্দোলন ও দেশাত্মবোধক গান, কবিতা, প্রবন্ধ ও বিশ্ব নাগরিকতার ধারণা বাংলা তথা বাঙালিকে সর্বভারতীয় স্তরে বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তাইতো দুরদৃষ্টি সম্পন্ন গান্ধীর রাজনৈতিক গুরু গোপালকৃষ্ণ গোখলে এই মন্তব্য করেছেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে ১৯৬০ দশকের পর থেকে বাংলার অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতি, ট্রেড ইউনিয়নের লাগামছাড়া জঙ্গি আন্দোলন, খুন-সন্ত্রাস রাজনৈতিক পরম্পরায় পরিণত হয়। "Have & Haven't," "পুঁজিবাদী, সর্বহারা" প্রভৃতি রাজনৈতিক মতাদর্শের মাধ্যমে জমিদার ও শিল্পপতিদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে খেপিয়ে তোলা হয়, রাজ্য থেকে পুঁজি ও মেধার পলায়ন সেই শুরু যা আজও বর্তমান।

শিল্প-কলকারখানা ও শিক্ষায় চরম অবনমন, নিম্ন মেধার মানুষদের রাজনীতিতে অবাধ প্রবেশাধিকার, রাজনীতিকে হিংসা, সন্ত্রাস ও দুর্বৃত্তায়নের বধ্যভূমিতে পরিণত করেছে। এই গবেষণাধর্মী প্রবন্ধে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক হিংসা, সন্ত্রাস ও দুর্বৃত্তায়নের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে যা

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। সমগ্র গবেষণা কর্মটি বিভিন্ন গৌণ উপাত্ত (Secondary Data) যেমন বই, গবেষণা পত্রের সাহায্যে সম্পন্ন করা হয়েছে, যা থেকে স্পষ্ট অনুমান করা যায় পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক হিংসা, হানাহানি ও দুর্বৃত্তায়ন অদূর ভবিষ্যতেও বহাল থাকবে।

সূচক শব্দ : রাজনৈতিক হিংসা, দুর্বৃত্তায়ন, বোমা বন্দুকের (Gun culture) সংস্কৃতি, গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং, তেভাগা আন্দোলন।

মূল আলোচনা:

অবিভক্ত বাংলা ও তার পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গ নানান রাজনৈতিক ঘটনা পরম্পরার সূতিকাগার কিন্তু বর্তমান সময়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিমণ্ডল যে বিষয়টির সবচেয়ে বেশি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আছে তা হল রাজনৈতিক হিংসা, সন্ত্রাস ও দুর্বৃত্তায়ন । উত্তরপূর্বক ভারতের প্রবেশদ্বার ১০.৪২ কোটি জনসংখ্যা বিশিষ্ট পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক হিংসার একটা লম্বা ইতিহাস আছে যা রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে চলেছে। স্বাধীনতার সময় থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল প্রথমে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দুই দশকের বেশি সময় তারপর সিপিআইএম তিন দশকের বেশি সময় ও বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেস দশ বছরের বেশি সময় ধরে রাজ্য শাসন করে চলেছে, ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলগুলির শাসনকালে পশ্চিমবঙ্গে একটি বিষয়ে অভিন্ন আছে তা হল রাজনৈতিক হিংসা, সন্ত্রাস ও দুর্বৃত্তায়ন এবং বর্তমানে তা একটি রোজকার ঘটনা। এই আলোচনায় পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক হিংসার ইতিহাস বিভিন্ন শাসন পর্বে রাজনৈতিক হিংসার বিভিন্ন বিবরণ ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

রাজনৈতিক হিংসার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: পশ্চিমবঙ্গ রাজনৈতিক হিংসার উত্তরাধিকার বহন করেছে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে, বিশেষত ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন থেকে। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন জড়ালো হয় পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে, কলকাতায় অনুশীলন সমিতির যুগান্তর দল গঠনের মাধ্যমে উপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলন তীব্রতর করার চেষ্টা হয়েছিল [১]। এছাড়াও, এছাড়াও ১৯৪৬ সালে হিংসাত্মক গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং, ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৭ সালে দুই-তৃতীয়াংশ ফসলের দাবিতে তেভাগা আন্দোলন ও স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ১৯৬৭ হিংসাত্মক নকশালবাড়ি বিদ্রোহ যা রক্তাক্ত রাজনৈতিক হিংসার বীজ বপন করেছিল তা আজ মহীরুহ[২] ।

কংগ্রেস-যুক্তফ্রন্ট-কংগ্রেস আমলে বাংলায় রাজনৈতিক হিংসা (১৯৪৭- ১৯৭৭): স্বাধীনতার পর ১৯৫০ এর দশকে কংগ্রেস আমলের হিংসা ছিল কাঠামোগত ও সংস্থানিক। সেই হিংসা কাণ্ডে প্রকাশ্য গণহত্যা সংগঠিত হতো না। জমিদার তথা

জমিদারির সংশ্লিষ্ট কর আদায়, শস্য কেড়ে কেড়ে নেওয়া, জমি থেকে উচ্ছেদ, কারখানার মালিকের গুন্ডাদের আক্রমণ এইসব ঘটনা ছিলনা। সেই জন্য একে কাঠামোগত তথা সংস্থানিক হিংসা বলে চিহ্নিত করা যায়। ওই আমলে সমষ্টিগতভাবে হত্যা, ধান লুঠ, গ্রাম বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ার ঘটনা শোনা যেত না।

যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতাসীন হওয়ার পর গণহত্যা, গণসন্ত্রাস ব্যাপক আকার নেয় এবং নকশালবাড়ি বিদ্রোহ(১৯৬৭) তারই ফসল। আজও মানুষের স্মৃতিতে ১৯৭০ সালের ১৭ ই মার্চ জঘন্যতম সাঁইবাড়ি গণহত্যার কথা মানুষের স্মৃতিতে টাটকা এবং ২৭ শে ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ সারা ভারত forward ব্লকের চেয়ারম্যান হেমন্ত বসুকে হত্যা[৩] -এই দুটি ঘটনা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বোমা বন্দুকের (gun culture) সংস্কৃতির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে । ১৯৭২ সালে কংগ্রেস আবার ক্ষমতায় ফিরে আসে যুক্তফ্রন্টের জোট সরকারের স্বল্পকালীন দু দফা শাসনকালের পর, তবে ১৯৭২ সালের এই নির্বাচনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিরোধীদল গুলির রাজনৈতিক হিংসা ও সন্ত্রাস নিয়ে নানান অভিযোগ ছিল,[৪] Congress has since been widely accused of winning that election through sheer muscle power, ousting thousands of opposition party workers from the areas in which they worked, creating a reign of terror using both the police and mercenaries and, finally, by widespread rigging of the elections. Between 1972 and 1977, the state remained free of political violence but under the complete domination of congress, which did not allow any political opposition to function freely.[৫]

কংগ্রেস-যুক্তফ্রন্ট-কংগ্রেস আমলে (১৯৪৭-১৯৭৭) বাংলায় রাজনৈতিক হিংসার বিবরণ

সময়কাল	ঘটনা (মৃত্যু)	অভিযুক্ত
১৯৬৭-৬৮	ঘেরাও ১৩৫৮, পাল্টা ইউনিয়ন গঠন	যুক্তফ্রন্টের শরিক পার্টি, মুখ্যত
	রেজিস্ট্রি ৮৯৭, ৮১৮,৩৫৮ স্কুল ম্যানেজিং কমিটি বাতিল	সিপিএম বনাম অন্যান্য নকশাল পার্টি অন্যান্য
১৯৬৭-৭২	রাজনৈতিক হত্যা ১৭৫১	সিপিএম, নকশাল পার্টি অন্যান্য বামপার্টি
১৯৭০-৭১	খুন সিপিএম ১০৫, নকশাল ৯৪ ৩৩১ স্কুল আক্রমণ	মুখ্যত নকসালপন্থী

সময়কাল	ঘটনা মৃত্যু	অভিযুক্ত
১৯৬৯-৭০	পুলিশ খুন ৪১৫ পুলিশ খুন ১৯৯	নকশাল পন্থী
১৯৭০ -৭১	রাজনৈতিক সংঘর্ষ ২৪৬৯ রাজনৈতিক হত্যা ১৬০৫ সিপিএম কর্মী খুন ১৬০০	রাজনৈতিক পার্টি, পুলিশ
১৯৭১	কাশিপুর -বরানগর হত্যাকাণ্ড, নিহত ১০০ আনুমানিক	পুলিশ -সিপিএম -কংগ্রেস
১৯৭০ মার্চ-	৯৬৩ নিহত সিপিএম কর্মীর তালিকা প্রকাশ	কংগ্রেস ও পুলিশ
এপ্রিল ১৯৭১	সিপিএম কর্মী খুন	কংগ্রেস
১৯৭১-৭২	গ্রেপ্তার ১৫০০ বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া ৩০১	

সূত্র: রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তর, রাজ্য পুলিশ বিভাগ ও ডিটেকটিভ ডিপো ,সজল বসু ওয়েস্ট বেঙ্গল দ্য ভায়োলেন্ট ইয়ার্স, ১৯৭৪, জ্যোতি বসু ক্রাই হল টু দা রেইন অফ টেরর ১৯৭১,কংগ্রেসী হিংসা খুন ও সন্ত্রাসের নগ্নচিত্র, সিপিএম, ১৯৭২। গণহত্যা (সঃ) শুকদেব চট্টোপাধ্যায়,২০১২।

বামেদের রাজনৈতিক উত্থান ও রাজনৈতিক হিংসা (১৯৭৭-২০১১): ১৯৭৭ সালে সিপিএম পরিচারিত বাম জোট বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসকে পরাজিত করে পশ্চিমবঙ্গের শাসন ক্ষমতায় আসে এবং দীর্ঘ ৩৪ বছর রাজত্ব করে। তিন দশকের বেশি এই সময়কালে সিপিএম পরিচালিত বাম সরকার পূর্ববর্তী কংগ্রেস ও যুক্তফ্রন্ট সরকারের হিংসা ও সন্ত্রাসের রাজনীতি বহাল রাখে, বলা ভালো রাজনৈতিক হিংসা ও সন্ত্রাস এই পর্বে আরো বেশি সংগঠিত, প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেয়। জনজীবনে রাজনৈতিক সন্ত্রাস ও হিংসা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাড়ায়। শাসক দল তার রাজনৈতিক বিরোধী পক্ষকে দমন করার জন্য হিংসা ও সন্ত্রাসকে tool of instrument হিসাবে ব্যবহার করে। In fact, alongside notable ‘emancipatory’ reform measures in the rural areas, it was more organised than congress was in its repression of the opposition.[৬] Soon the panchayats emerged as a key area of competition among the principal parties, panchayats administrative and economic power making them a source of political influence. The CPI(M), whole party machinery was well-structured and organised, used this machinery to capture panchayats. It entrenched its hold over the rural electorate.[৭]

বাম জামানায় সিপিএমের হার্মাদ ও পুলিশের গণহত্যা

সাল	স্থান	ঘটনা
১৯৭৮	মরিচঝাঁপি	দণ্ডকারণ্য থেকে আগত উদ্বাস্তুদের ওপর পুলিশ ও হার্মাদ বাহিনী আক্রমণ, হতাহত ১০০
১৯৭৯	কলকাতা বন্দর	আন্দোলনরত বন্দর শ্রমিকদের উপর পুলিশের গুলি,নিহত ৬
১৯৮২	কলকাতা বিজন সেতু	১৮ জন আনন্দমার্গীকে দিন দুপুরে পুড়িয়ে হত্যা ।
১৯৮৬	কৃষ্ণনগর, নদীয়া	বিদ্যুতের দাবিতে আন্দোলনরত কৃষকদের উপর নির্বিচারে পুলিশের গুলি নিহত ২
১৯৯০	বানতলা, কলকাতা	ডাক্তার মহিলার শ্লীলতাহানি এবং দুজনকেই হত্যা
১৯৯৩	কলকাতা রানী রাসমণি রোড	পুলিশের গুলিতে ১৩ জন যুব কংগ্রেস কর্মী নিহত
১৯৯৮	পশ্চিম মেদিনীপুর	কেশপুর, গড়বেতা, পিংলার গ্রামে তৃণমূল সমর্থকদের হত্যা,হামলা, মৃত ১৩
২০০০	সুজাপুর বীরভূম	তৃণমূল সমর্থক ১১ জন ভূমিহীন কৃষককে পুড়িয়ে হত্যা ।
২০০১	ছোট আঙ্গারিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর	১১ জন তৃণমূল সমর্থক কে পুড়িয়ে হত্যা
২০০৬	সিঙ্গুর, হুগলি	কৃষিজমি রক্ষা কমিটির সিপিএমের হামলা, তাপসী মালিক সমর্থকদের ওপর পুলিশ ও সিপিএমের হামলা,তাপসী মালিক কে ধর্ষণের পর পুড়িয়ে হত্যা
২০০৭	নন্দীগ্রাম পূর্ব মেদিনীপুর	পুলিশ ও হার্মাদদের যৌথ হামলা গুলিতে ১৪ হত শতাধিক আহত মহিলাদের ধর্ষণ ও শ্লীলতাহানি
২০০৮	দিনহাটা, কোচবিহার	পুলিশের গুলিতে ৬ ফরওয়ার্ড ব্লক সমর্থক নিহত।

২০০৬-১০	জঙ্গলমহল	২৩৮৭ নিরীহ মানুষ হত্যা
২০১০	জঙ্গলমহল	রাজনৈতিক কর্মী নিহতঃ সিপিএম ৬৮, তৃণমূল ৯৯, কংগ্রেস ৬৮ আহতঃ সিপিএম ৭৬৮, তৃণমূল ১২৯৮, কং ২২২ অন্যান্য ২৮৩
২০১১	নেতাই গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর	সিপিএম নেতা রথীন দন্ডপাটের হার্মাদ কেন্দ্র বাড়ি থেকে গ্রামবাসীদের উপর গুলি বর্ষন। নিহত ৮ আহত ১৯, একজন মহিলার মাথা ফেটে ঘিলু ছড়িয়ে পড়ে।

সুত্রঃ বর্তমান ১১ নভেম্বর, ২০১০

তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনকাল ও রাজনৈতিক হিংসার ধারাবাহিকতা: টিএমসি সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে ২০১১ সালে ৩৪ বছর ক্ষমতাসীন জগদ্দল বামফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করা সম্ভব হয়। বদলা নয় বদল চাই স্লোগানে ভর করে সুশাসনের প্রতিশ্রুতি মানুষকে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ করতে সাহায্য করে। কিন্তু খুব অল্প সময়ের ব্যবধানেই মানুষের মোহভঙ্গ হয় মানুষ দেখতে পায় পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারের হিংসার রাজনীতির পুনরাবৃত্তি । In just nine months after the 2011 assembly polls, 56 CPI(M) Members were killed, allegedly in attacks committed by TMC workers.[৮]

২০১৮ সালে গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নজিরবিহীন হিংসা ও সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটে, ভোটের দিনেই হিংসার কবলে বলি হয় ১০ জন মানুষ, স্থানীয় বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী বিভিন্ন বুথে ছাপ্পা ভোট, ব্যালট পেপার জ্বালিয়ে দেওয়া, বুথ দখল সাধারণ মানুষকে ভোট দিতে বাধা দেওয়া প্রভৃতি অপকর্মে স্থানীয় পার্টি ক্যাডার ও পুলিশ প্রশাসন সম্মিলিতভাবে কাজ করে। বিরোধীদলের প্রার্থীদের মনোনয়নে বাধা, বাড়িঘর ভাঙচুর,হত্যা, এবং ৩৪ শতাংশ আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় লাভ। Even after the elections, the BJP has charged, a number of its workers have been killed by TMC activists[৯]

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বামফ্রন্ট ক্রমশ অপ্রাসঙ্গিক হতে শুরু করে, উত্থান ঘটে বিজেপির, যার ফলশ্রুতিতে ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে মোট ৪২ টি আসনের মধ্যে ১৮ টি আসনে বিজেপি জয়লাভ করে এবং লোকমানসে প্রধান বিরোধী দলের তকমা পায়। যা রাজনৈতিক হিংসা ও সন্ত্রাসকে আরো বেশি ত্বরান্বিত করে,

২০১৯ সালেই তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষে ১২ জন প্রাণ হারায়। In February 2021, union home minister Amit shah claimed that 130 people associated with BJP had been killed in TMC attacks.[১০]

২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি তৃণমূল জোরদার লড়াই হয়, যা পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রথম। দক্ষিণপন্থী বিজেপি আরএসএস মদত পুষ্ট হিন্দু ঘেষা অপরদিকে তুলনামূলকভাবে বাম মনোভাবাপন্ন তৃণমূল কংগ্রেস মুসলিমদের প্রতি বেশি সহানুভূতিশীল বলে একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। যার ফলশ্রুতিতে সেই নির্বাচন শুধু বিজেপি -তৃণমূলের মতাদর্শগত লড়াইয়ে সীমাবদ্ধ থাকেনি, অনেক সময় তা হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িক লড়াইয়ের চেহারা নেয়। নির্বাচনের আগে ও নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক হিংসায় দুই দলের ১৭ জন কর্মী প্রাণ হারায়। Since then the state has become even more politically polarised, with communication between the TMC and the BJP -which is in power at the centre -collapsing almost completely. The BJP has filed a criminal case against the TMC in the Calcutta high court following the post-poll attacks.[১১]

বগটুই গণহত্যাঃ ২১ শে মার্চ, ২০২২ বীরভূম জেলার রামপুরহাট সংলগ্ন বগটুই মোড়ে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে উপপ্রধান ভাদু শেখ কে বোম মেরে হত্যা করার বদলা হিসাবে ওই গ্রামের চারটি বাড়িতে অগ্নি সংযোগ করা হয়, তাতে একজন শিশুসহ ১০ জন লোক অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায়[১২]।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক হিংসা -দুর্বৃত্তায়ন ক্রমশ প্রাতিষ্ঠানিক, সংগঠিত ও সঙ্ঘবদ্ধ রূপ নিচ্ছে। ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন তা প্রমাণ করে। এই নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিপক্ষ হিসেবে ভারতীয় জনতা পার্টি, বাম কংগ্রেস জোট ও আইএসএফ রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ করে। মনোনয়ন জমা দেওয়া থেকে শুরু করে, ভোটের দিন ও ভোট পরবর্তী সময়ে প্রচুর হানাহানি মারামারি, বুথ দখল, ব্যালট বাক্স জ্বালিয়ে দেওয়া, ব্যালট বাক্সে জল ঢেলে দেওয়া, কোথাও ভোট কর্মীদের হুমকি দেওয়া নানান অপ্রীতিকর ঘটনার অভিযোগ শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে করা হয়। সরকারি হিসেবে এই নির্বাচনে ভোটের দিনই ১৯ জন মানুষ খুন হয়, সবমিলিয়ে এই পঞ্চায়েতে মৃতের সংখ্যা ৫০। তৃণমূলের অত্যাচার থেকে বাঁচতে বিজেপির অনেক সমর্থক পার্শ্ববর্তী আসাম রাজ্যে আশ্রয় নেয়। Assam chief minister Himanta Biswa Sharma said 133 people, who feared for their lives, sought refuge in Assam's Dhubri district amid violence in west Bengal during panchayat poll.[১৩]

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা: ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ব্যাপক সন্ত্রাস হিংসা বিরোধীদের মনোনয়নে বাধা দেওয়া মনোনয়নে বাধা দেওয়ার ফলস্বরূপ ৩৩ শতাংশ আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ ও অপরদিকে সিপিএম তথা বামফ্রন্ট জোটের শক্তি ক্ষয় অব্যাহত থাকায় নিচু স্তরের বাম কর্মীরা তৃণমূলের হিংসা অত্যাচার জবাব দেওয়ার জন্য ২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে সমর্থন করে, এবং বিজেপি ১৮ টি আসনে জয়লাভ করে। পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে বিজেপির এই বিপুল জয় একটি পৃথক রাজনৈতিক ভাবধারার জন্ম দেয়। অতীতে যা জমিদার ও ভাগচাষি, Have & Haven't মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল আজ তা, হিন্দু সমর্থিত বিজেপি এবং মুসলিম সমর্থিত তৃণমূল কংগ্রেস এই দুই ভাগে বিভক্ত। রাজনৈতিক হিংসা অনেক সময় ধর্মীয় হিংসা তথা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রূপ নিচ্ছে। শিল্প কর্মসংস্থানহীন এই পশ্চিমবঙ্গে বেকার যুবক-যুবতীদের সামনে কোন দিশা ও ভবিষ্যতের

আশা নেই। ১৯৭৭ এর পর থেকে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে শিক্ষিত, মননশীল, মানুষের যোগদান আস্তে আস্তে কমতে শুরু করে এবং বলতে গেলে বর্তমানে প্রায় শূন্য, আর এই শূন্যস্থান পূরণ করেছে নিম্ন মেধার, অপরিনামদর্শী, স্বার্থপর, রাজনৈতিক দুর্বৃত্ত। যাদের কাছে রাজনীতি হলো পেশা। রাজনৈতিক হিংসা, সন্ত্রাস, দুর্বৃত্তায়ন হলো হাতিয়ার। দান-খয়রাতি ভাতা, ভোট ব্যাংকের জনপ্রিয় রাজনীতি (Populist Politics) সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবঙ্গ কে আরও পিছনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, সেখানে অদূর ভবিষ্যতে রাজনৈতিক হিংসা কমবে বৈকি বাড়বে।

তথ্যসুত্র :

১। Shukla Sanyal, 'How the revolutionary nationalist movement gained popularity in Bengal', *The Wire*, September 30, 2018. https://thewire.in/history/ revolutionary-nationalist-movement-bengal

২। See Dipankar Basu, 'Political Economy of 'Middleness': Behind Violence in Rural West Bengal', *Economic and Political Weekly*, Vol. 36, No. 16 (Apr. 21-27, 2001), pp. 1333-1344

৩। Tanmay Chatterji, "Political violence that rocks Bengal manifested itself 50 years ago", *Hindustan Times*, September 10, 2019, https://www.hindustantimes.com/ india-news/political-violence-that-rocks-bengal-manifested-itself-50-years-ago-opinion/story-a2dbyQYWbc6ccRIDj82T4H.html

৪। Shikha Mukherjee, "In Bengal Politics, Violence Begets Violence. But Does it Always Deliver the Goods?", *The Wire*, July 15, 2020.https://thewire.in/politics/ bengal-polls-bjp-mla-killed-violence

৫। Partha Sarathi Banerjee, "Party, Power and Political Violence in West Bengal Author", *Economic and Political Weekly*, February 5-11, 2011, Vol. 46, No. 6 (February 5-11, 2011), pp. 16-18

৬। Partha Sarathi Banerjee, "Party, Power and Political Violence in West Bengal Author",

৭। Dipankar Basu, "Political Economy of 'Middleness': Behind Violence in Rural West Bengal", *Economic and Political Weekly*, Vol. 36, No. 16 (Apr. 21-27, 2001), pp. 1333-1344

৮। Tanmay Chatterjee, "Political Violence that rocks Bengal manifested itself 50 years ago".

৯। Shoiab Daniyal, "West Bengal: Will anger at rigging in last year's panchayat polls singe Trinamool – and help BJP?", *Scroll.in*, April 26, 2019, https://scroll in/article/921179/west-bengal-will-anger-at-rigging-in-last-years-panchayat-polls-singe-trinamool-and-help-bjp

১০। Soumya Das, "TMC goons who killed BJP workers will be in jail after party comes to power in Bengal, says Amit Shah", *Deccan Herald* , February 18, 2021,https://www.deccanherald.com/national/tmc-goons-who-killed-bjp-workers-will-be-in-jail-after-party-comes-to-power-in-bengal-says-amit-shah-952631.html

১১। "Calcutta high court severely indicts West Bengal govt in post-poll violence case", *Times of India*, August 19, 2021, https://timesofindia.indiatimes.com/india/ calcutta-high-court-severely-indicts-west-bengal-govt-in-post-poll-violence-case/ articleshow/85454050.cms

১২। https://www.telegraphindia.com/west-bengal/birbhum-eight-charred-to-death-in-
suspected-retaliation-to-tmc-leaders-murder/cid/1857148

১৩। https://www.hindustantimes.com/india-news/west-bengal-rural-polls-around-150
bengal-people-take-refuge-in-assam-amid-poll-violence-cm-himanta-sarma-101689106371875.html

সহায়ক গ্রন্থ :

১। সজল বসু, বাংলার রাজনীতির পদাবলি দাঙ্গা -দেশভাগ থেকে দলতন্ত্র-দুর্বৃত্তায়ন ১৯৪৭-২০২২, বুকপোস্ট পাবলিকেশন, কলকাতা।

২। মমতা ব্যানার্জি গণতন্ত্রের লজ্জা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৩। কনাথ দাশগুপ্ত, দেবাশীষ পাঠক, হিংসার উৎসব, দীপ প্রকাশন

৪। স্বপনকান্তি ঘোষ, (সঃ) রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, পদাতিক, ২০১১

৫। ভারতজ্যোতি রায়চৌধুরী, সাতচল্লিশ থেকে ৭০ এবং আগে পরে, পুনশ্চ, ২০১৮

সুকুমারী ভট্টাচার্যের প্রবন্ধে বৈদিক প্রসঙ্গ

সুস্মিতা ঘোষ
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার প্রধানতম সাহিত্যিক নিদর্শন ঋগ্বেদ সংহিতা। জন্মলগ্ন থেকেই বৈদিক সাহিত্য যুগে যুগে চর্চিত হয়েছে। সেই চর্চা এখনও চলমান আধুনিক যুগে প্রাবন্ধিক সুকুমারী ভট্টাচার্য বৈদিক সাহিত্য নিয়ে বেশ কিছু প্রবন্ধগ্রন্থ রচনা করেছেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে বৈদিক সাহিত্যের সূচনা লগ্নে ভারতবর্ষ কেমন ছিল,কারা ছিলেন তার বাসিন্দা,কেমন ছিল তাদের জীবন যাপন,পারিবারিক সম্পর্ক এ সমস্ত তাঁর আলোচনায় বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। বহুকাল ধরে মানুষ বিশ্বাস করে এসেছে বেদের যুগে ক্ষুধার অনুপাতে খাদ্য পর্যাপ্ত ছিল। এ ধারণা যে কতটা ভ্রান্ত সুকুমারী ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ পাঠ করে জানা যায়। বেদের যুগে খাদ্যের সুরক্ষা ছিল অনিশ্চিত। খাদ্যের জন্য মানুষ দেবতার কাছে মিনতি করেছে,যজ্ঞ করেছে। উপযুক্ত ফল না পেয়ে দেবতাদের ওপর বিশ্বাস হারাচ্ছিল। একটা সংশয় সব সময় তাদের মনকে আচ্ছন্ন করে রাখত। এর পাশাপাশি চার বেদের বিভাগ,উপবিভাগ সূক্ত প্রভৃতি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে। তাঁর প্রবন্ধগুলির বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার মাধ্যমে তাঁর বিষয় ভাবনার এক সংক্ষিপ্ত রূপায়ণই এই নিবন্ধ রচনার একমাত্র অভিপ্রায়।

সূচকশব্দ : ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ, সামবেদ, সংহিতা, উপনিষদ।

মূল প্রবন্ধ :

বেদের অপর নাম শ্রুতি। গুরুগৃহে গুরুর মুখ থেকে শুনে শুনে মুখস্থ রাখতে হত অর্থাৎ যা কোন একদিন পাঠ্য ছিল তা কোন এক সময় লেখনীর বিষয়বস্তু হয়ে উঠল। বেদ নিয়ে বিভিন্ন ভাষায়,বিবিধ বিষয়ে,একাধিক সাহিত্যিক বিভিন্ন সময় সাহিত্য রচনা করেছেন। আমাদের আলোচ্য সুকুমারী ভট্টাচার্য (১৯২১- ২০১৪) অন্যতম। তিনি বৈদিক যুগ ও বেদকে বিষয়বস্তু করে একাধিক প্রবন্ধগ্রন্থ লিখেছেন। তাঁর প্রবন্ধ পাঠ করে একদিকে আমরা যেমন বেদের চারটি ভাগ ও তাদের উপবিভাগ সম্পর্কে জানতে পারি,ঠিক তেমনি বৈদিক যুগের ভারতবর্ষকে জানতে পারি। বৈদিক যুগে ভারতবর্ষ কেমন ছিল? কেমন ছিল তখনকার মানুষের জীবনযাত্রা,খাদ্যাভ্যাস আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদি নিয়ে আলোচিত হয়েছে প্রবন্ধগুলিতে। বৈদিক প্রসঙ্গ নিয়ে রচিত তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থগুলি হল ‘বেদে ক্ষুধা প্রসঙ্গ’,‘বেদে সংশয় ও নাস্তিক্য’,‘বৈদিক সাহিত্যের রূপরেখা’।

উপরিউক্ত গ্রন্থের প্রবন্ধগুলির বিশ্লেষণ মূলক আলোচনার মাধ্যমে নিবন্ধের মূল পর্যায়ে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে।

আমরা যেহেতু আমাদের নিবন্ধের আলোচনা বিশ্লেষনাত্মক পদ্ধতির মাধ্যমে করব তাই প্রবন্ধগুলি বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রবন্ধের মূল অভিপ্রায়ের দিকে এগিয়ে যাব। 'বেদে ক্ষুধা প্রসঙ্গ' গ্রন্থটিতে মোট সাতটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। 'খাদ্যের প্রার্থনা', 'খাদ্যাভাব ও যাগযজ্ঞ','ক্ষুধার দার্শনিক উচ্চারণ', 'অন্নব্রহ্ম','খাদ্যের আখ্যান', 'শ্রেণীবিভাজন ও বহমান ক্ষুধা'। এই গ্রন্থটি গবেষণা মূলক প্রবন্ধগ্রন্থ। গ্রন্থটি তিনি ঋগ্বেদ সংহিতা, অথর্ববেদ সংহিতা, উপনিষদ এর ওপর ভিত্তি করে রচনা করেছেন। 'খাদ্যের প্রার্থনা' প্রবন্ধে বৈদিক সাহিত্য রচনার সময়কাল মোটামুটি খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চদশ শতক থেকে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতক এই দুই হাজার বছর সময়ের কথা বলা হয়েছে। বেদের প্রধান দুটি ভাগের প্রথম ভাগ কর্মকাণ্ড অর্থাৎ সংহিতা ব্রাহ্মণের পর্বকেই আলোচ্য বিষয়ের সময়সীমা বেঁধে নিয়েছেন প্রাবন্ধিক। আর্যরা এদেশে একেবারে আসেনি দলে দলে বারে বারে এসেছে। তাদের মধ্যে শেষ বৃহৎ দলটি বেদকে নিয়ে এসেছিল। ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে দক্ষিণ রাশিয়ার উড়াল পর্বতের পাদদেশে এদের আদি বাসস্থান ছিল। প্রথম যে দলটি খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চদশ শতক থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে ভারতবর্ষে আসে তাদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে ঋগ্বেদ থেকে ভারতে আশা শেষতম দলটি সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। অনুমান করা হয় এরা যাযাবর পশুচারী ছিল। এদের মূল খাদ্য ছিল গরু-ছাগলের দুধ,ঘি,দই,ক্ষীর আর আগুনে ঝলসানো পশু-পাখির মাংস। চাষ এরা জানত না। বিপদাপন্ন হলে দেবতার শরণাপন্ন হত। দলবদ্ধ জীবনে দলের নেতাই সর্বেসর্বা। যেহেতু এরা যাযাবর ছিল তাই এদের কোন দেবমূর্তি ছিল না। যেখানে যেত বেদি স্থাপন করে দেবতাদের উদ্দেশ্যে নিজেদের খাদ্যবস্তু দুধ,ঘি,মাংস নিবেদন করত। দেবতাকে তুষ্ট করে যা তাদের প্রয়োজন তাই প্রার্থনা করত। প্রার্থনাগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল খাদ্যবস্তু। আর্যদের খাদ্যাভাব শুরু হয় প্রাগার্যদের সংঘাতের সূচনা পর্বে। আর্যরা পশুপালনের পাশাপাশি খাদ্য লুট করে বনে ফলমূল সংগ্রহ করে খাদ্য সংগ্রহ করত,তাতে তাদের প্রয়োজন মিটত না। পর্যাপ্ত শিকারের অভাব,পশুপালনে বিপন্নতা,অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি নানা সমস্যা (মড়ক,খাদ্যাভাব) দেখা যেত,ফলে খাদ্যের সংকট ছিল নিত্য সঙ্গী। খাবারের জোগানে এইরকম অনিশ্চয়তাতে আর্যরা অভ্যস্ত ছিল। কাজেই দেবতাদের কাছে খাদ্যের প্রার্থনা তাদের নিত্যকার প্রার্থনার একটি হয়ে দাঁড়ায়। খাদ্যের জন্য এরা ইন্দ্রদেবের কাছে প্রার্থনা করত। এছাড়া অপর গৌণ দেবতাগণের কাছে খাদ্য প্রার্থনা করতেন- বৈশ্বানর, দ্রবিণোদা, পূষা,রুদ্র, সরস্বতী, অপাং, নপাৎ, নদী, অরন্যাণী, দধিক্রাবা, ঋষভ, শুদ্ধগ্নি, ত্বষ্টা, এমনকি ইন্দ্রের দুটি ঘোড়া ও বাদ যায়নি ছিল –"(অগ্নি) আজ তুমি সুমনা হয়ে খাদ্য বিষয়ে দানশীল রক্ষক হয়ো- ইবং পৃণ্বতাং সুকৃতে সুদানব তা বহিঃ সীদডং

নবাঃ... "[১]। এই প্রবন্ধে এই মন্ত্রের একটাই উদ্দেশ্য ছিল অন্নে অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। আসলে অধিকার থাকলে প্রভুত্ব থাকে। প্রয়োজন মত অন্ন প্রতিদিনই পাওয়া যায়। পশুচারী আর্যদের জীবনযাত্রা ছিল কঠোর। তারা যেমন শারীরিক পরিশ্রম করতে অভ্যস্ত ছিল তেমনি ক্ষুধা ও পুষ্টির প্রয়োজনও বেশি ছিল। ভারতবর্ষে এসে তারা অপুষ্টির শিকার হয়েছিল। তাদের অপুষ্টির কথা অথর্ববেদেও পাওয়া যায়। তাই অন্নের প্রাচুর্যর জন্য এই প্রার্থনা তাদের মধ্যে বারংবার ধ্বনিত হত। আর্য সমাজের বাইরের অস্পৃশ্য গোষ্ঠী ছিল চণ্ডালরা তারা কুকুরের মাংস পাক করে খেত। কুকুরের মাংস খেত কতকটা পেট ভরে খাবার জন্য কতকটা পুষ্টির জন্য। যাই হোক এবার প্রাসঙ্গিকতাই আসা যাক খাদ্যের এতটা অভাব ছিল যে উঁচু শ্রেণির মানুষ ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য কুকুরের মাংস খেত। ঋগ্বেদে ব্রাহ্মণ বামদেব ঋষি বলেছেন--"অভাবের জন্য আমি কুকুরের নারী ভুঁড়ি রান্না করে খেয়েছি দেবতাদের মধ্যে কোন সাহায্যকারী পাইনি নিজের স্ত্রীকে অপমানিত হতে দেখেছি পরে এক শ্যেন আমার জন্য মধু আহরণ করে।”[২] ব্রাহ্মণ ক্ষুধার তাড়নায় চন্ডাল যা ফেলে দেয় কুকুরের নাড়ি ভুঁড়ি তাও রান্না করে খায়।

খাদ্যাভাব মেটানোর জন্য আর্যদের যুগে যাগযজ্ঞের আয়োজনের কথা জানা যায়। কি রকম সেই যাগযজ্ঞ? জানবার আগে আমাদের জানা প্রয়োজন যজ্ঞ কি? যজ্ঞ হচ্ছে এক ধরনের পূজা পদ্ধতি যা কোন কিছু প্রাপ্তির জন্য বা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য করা হয়ে থাকে। বেদে খাদ্যের জন্য যজ্ঞ করতেন দেবতারা। আবার যজ্ঞে পশুবলির জন্য খাদ্য সংকটও তৈরি হত। এই বৈপরীত্যের ছবি আছে ‘খাদ্যাভাব ও যাগযজ্ঞ’ প্রবন্ধে। বৈদিক যুগে যজ্ঞ হত তিন প্রকার– পশু,ইষ্টি ও সোম। এর মধ্যে পশু ও সোম উভয় প্রকার যজ্ঞে পশু বধ হত। গৃহপালিত পশু শিকার করা পশু দুরকম পশুই যজ্ঞে বলি প্রদত্ত। গ্রামের,অরণ্যের উভয় পশুর মাংসকে হব্য হিসেবে দেওয়া হত-যজ্ঞে। যা দেওয়া হবে দেবতারা তাতে প্রসন্ন হয়ে মানুষের মনের ইচ্ছা পূর্ণ করবেন,এই আশা মানুষের মধ্যে বিশ্বাস হিসেবে কাজ করত। এইভাবে যজ্ঞে পশু হত্যা চলতে থাকলে চাষের কাজে পশুর অভাব দেখা যায়। ফলে উৎপাদন ব্যাহত হয়। ফলত খাদ্যের সংকট দেখা যায়। অন্নাভাব সাধারণ মানুষের মধ্যে তো ছিল তখন তারা অন্নের জন্য দেবতার কাছে যজ্ঞ নিবেদন করতেন। দেবতারও তুষ্টি হয়ে তাদের অন্ন দান করতেন। এর ফলে মানুষের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা হত। এবং জীবনের প্রতিটি উন্নততর ধাপে অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ দেখে প্রচুর অন্ন সম্ভাবনা। ফলে অন্নাভাবে মারা যাবার ভয় কিছু সময়ের জন্য হলেও স্তিমিত হয় ফলে জন্মহার বৃদ্ধি পায়। প্রজা সংখ্যা বেড়ে যায়। তারপর উৎপাদিত ফসলের সঙ্গে উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার সামঞ্জস্য থাকে না অর্থাৎ সেই ক্ষুধা,সেই অনাহারে মৃত্যুর আশঙ্কা,চাহিদা অনুযায়ী জোগান কমে যাওয়া। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে উন্নততর কৃষি থেকে যে বাড়তি খাদ্য উৎপাদিত হল তা দিয়ে বর্ধিত জনসংখ্যার অন্ন সংকুলান হল না কেন? এর উত্তর প্রাবন্ধিক দিয়েছেন 'ক্ষুধার

দার্শনিক উচ্চারণ' প্রবন্ধে। এর জন্য দুটি সম্ভাবনার কথা বলেছেন প্রাবন্ধিক -এক,যে পরিমাণে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে সেই পরিমাণে খাদ্য জোগান ছিলনা অর্থাৎ উৎপাদিত খাদ্যের পরিমাণ বেড়েছে বলে মানুষের মধ্যে প্রজা বৃদ্ধির যে আশা জন্মেছিল তার পরিণতি ভিন্ন ছিল। ফলত ভ্রান্ত বিশ্বাসে প্রজাবৃদ্ধি ঘটল কিন্তু সমাজের খাদ্য ভাণ্ডারের খাদ্য তুলনামূলকভাবে কম মজুত ছিল। দুই,খাদ্যবস্তু যতটা বেশি উৎপাদিত হয়েছিল উন্নততর উৎপাদন ব্যবস্থায় তার সবটা ক্ষুধিত মানুষের নাগালে আসেনি। তার অনেকাংশ ধনী শ্রেণীর ভোগবিলাসে ব্যয়িত হয়েছে,কিছুটা বাণিজ্য লাভে ব্যয় হয়েছে,কিছু অন্ন বিদেশে রপ্তানি হয়েছে অথচ বিনিময়ে প্রাপ্ত অর্থ চলে গেছে ধনীর হাতে ফলে অন্নের আবেগ নিরন্ন মানুষকে সেই অন্ধকারেই রেখেছে।

'অন্নব্রহ্ম' প্রবন্ধে মানব জীবনে অন্নের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে পরম সত্যের ব্যাখ্যা আছে। বেদে বলা হয় 'অন্নদীর্যম' অর্থাৎ অন্ন থেকে বীর্য সৃষ্টি হয়। ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে এই একই কথার পুনরাবৃত্তি আছে। আবার অন্যত্র শোনা যায় মহ হল অন্ন। অর্থাৎ অন্নের দ্বারাই সকল প্রাণ মহিমান্বিত হয়। যত দিন গেছে ততই মানুষ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর ভাবে বুঝতে পেরেছে উচ্চকোটির দার্শিনি চিন্তা গৌরবের বস্তু হলেও সে চিন্তার আধার যে শরীরটা তাকে বাঁচিয়ে রাখে অন্নই। কাজেই চিন্তার মহিমাও অন্নের ওপর নির্ভরশীল সুতরাং অন্ন জোগান যদি মানব শরীরে বিপন্ন হয় তাহলে উচ্চচিন্তা নিরবলম্ব হয়ে পড়ে। সমাজে দুটি শ্রেণীর কথা প্রবন্ধে বলা হয়েছে এক উচ্চতর শ্রেণী অন্যটি নিচুতর বা উৎপাদক শ্রেণী। উচ্চতর শ্রেণী হল হাতে পায়ে না খেটে মাথা দিয়ে পরিশ্রম করে সমাজে সে অপেক্ষাকৃত বিত্তবান ও সম্ভ্রান্ত। কারণ দার্শনিক প্রসাদপুষ্ট এরা উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে সরাসরি যুক্ত নয়,এরা বুদ্ধি দিয়ে কাজ করে। দিনপাতের প্রয়োজনীয় অন্ন যারা জোগান দেয় তারা উৎপাদক শ্রেণী,দ্বিতীয় শ্রেণী। অন্ন মহৎ সেই জন্য অন্নের ওপর নির্ভর করতে হয়। কারণ অন্ন ছাড়া প্রাণ রক্ষা করা যায় না তাই জীবন সত্য,এই সত্য অন্নর ওপর নির্ভর করে তাই অন্নই ব্রহ্ম। 'শ্রেণীবিভাজন ও বহমান ক্ষুধা' প্রবন্ধে উপরিক্ত যে উচ্চতর ও উৎপাদক শ্রেণীর আলোচনা করা হল যুগান্তরে অন্ন ক্ষুধার বহমানতার যে রূপ দেখা দিয়েছে তা ব্যাখ্যা করেছেন। কর্মকাণ্ড সংহিতা ব্রাহ্মণে সকল দেবতার কাছে অন্নের প্রার্থনা দেখা যায়। অন্য কোন বস্তুর জন্য প্রার্থনা নেই। আসলে খাদ্যাভাব একটি স্থায়ী ও ব্যাপক অবস্থা। জ্ঞানকাণ্ডে আরণ্যক উপনিষদের যুগেও অসংখ্য বার একইভাবে একই প্রার্থনা কখনও সরাসরি কখনও কাহিনি আকারে কখনও তত্ত্ব কথার মাধ্যমে আছে। এর থেকে প্রমাণিত দেশে খাদ্যাভাব ছিল। অন্ন কথাটির অর্থ যা খাওয়া যায় অর্থাৎ খাদ্য। কিন্তু শব্দার্থ সংকোচনে এর অর্থ দাঁড়িয়েছে ভাত। এখন অন্ন অর্থের মাধ্যমে ভাতকেই বোঝাই। বৈদিক যুগের উৎপাদন ব্যবস্থা ধীর গতিতে ছিল। কারণ তখন কাঠের ফলা যুক্ত লাঙ্গল ব্যবহৃত হত। কাজও ছিল পরিশ্রমসাধ্য তুলনামূলক ভাবে ফসলও ফলত কম। তাছাড়া

খরা,বন্যা,অতিবৃষ্টি,কীট প্রভৃতি নানা কারনে বোনা ফসল নষ্ট হত। এছাড়া ফসল সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল না। সিন্ধু সভ্যতার যুগে ফসল সংরক্ষণের নিদর্শন শস্য সংরক্ষণ ভান্ডারের চিহ্ন পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে এই শস্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রথম হয়। আর্যরা এদেশে আসার পর যাযাবর জীবন ছেড়ে স্থিতিশীল কৃষিজীবী হয়ে যখন আর্যাবর্তে বসবাস করল তখন রাস্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় সিন্ধু সভ্যতার সার্বিক সুশৃঙ্খল পরিকাঠামো গড়ে উঠল। লোহার ফলাতে বেশি ফসল ফলত,মাংস,দুধ,দুধের তৈরি খাবার এরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করত,স্থিতিশীল সমাজ ব্যবস্থায় অর্থাৎ কৌম গোষ্টী ভেঙে বৃহৎ কূল অর্থাৎ এক বাড়িতে কয়েক প্রজন্ম একত্র বাস করত। এই একান্নবর্তী পরিবার একক হিসাবে গ্রাহ্য হয়েছে। তখন রাষ্ট্র ব্যবস্থার মূল কাঠামোই ছিল একান্নবর্তী পরিবার। প্রাকৃতিক দুর্যোগে পড়লে সমাজ ব্যবস্থায় লোকেরা দূর্বিপাকে পড়ত। কারণ খাদ্য মজুত রাখার কোন ব্যবস্থা সিন্ধু সভ্যতার পরে আর ছিল না। আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতক থেকে সমাজে শ্রেণীবিভাগ অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল। সংখ্যা গরিষ্ঠ গরিব শ্রেণীর জন্য খাদ্য বরাদ্দ ছিল সামান্য। লোহার ফলার ব্যবহারে যে বাড়তি ফসল উৎপন্ন হত তা দরিদ্র সাধারণের মধ্যে এসে পৌঁছত না,সমস্তটাই ধনী শ্রেণী ভোগ করত। তাই খাদ্যাভাব ব্যাপকভাবে সমাজে থেকে গেল। রাষ্ট্র ব্যবস্থাতেও এমন কোন বিধান ছিল না যে উৎপন্ন ফসলের একটা অংশ মজুত রেখে গরিবদের দুঃসময়ে বিতরণ করা হবে। ফলে এদেশে বেদের সময় থেকেই খাদ্যাভাব ব্যাপকভাবে বর্তমান ছিল অর্থাৎ সুজলাং সুফলাং মলজ শীতলাং ইত্যাদি ইচ্ছাপূরক স্বপ্নের প্রকাশ মাত্র।

'বেদের সংশয় ও নাস্তিক্য' প্রবন্ধগ্রন্থটিতে নয়টি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে প্রবন্ধগুলি যথাক্রমে 'বেদ রচনার গোড়ার দিক','সংশয়ের বীজ','মৃত্যু ও সংশয়','অবৈদিক সংশয়','শ্রেণী ও সংশয়','জিজ্ঞাসা ও সংশয়','অজানা উত্তর','নচিকেতার প্রশ্ন', 'সংশয় ও নাস্তিকদের ধারা'। 'বেদ রচনার গোড়ার দিক' প্রবন্ধটিতে বেদ রচনার গোড়ার কথা আছে। ঐতিহাসিকদের মতে খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ শতক থেকে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতক পর্যন্ত বৈদিক সাহিত্যের রচনাকালের ব্যাপ্তি ধরা হয় প্রায় ছশো বছর মুখ্যত বেদ রচনা কাল-বৈদিক যুগ। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস বেদের যুগে মানুষ বেদে বিশ্বাসী ছিলেন। বৈদিক আর্যরা যখন ভারতবর্ষে আসে তখন তারা সঙ্গে নিয়ে আসে পশুচারিতা,যেখানে তারা কিছুদিন বসবাস করেছে সেখানে পেয়েছিল কৃষিকাজের অভিজ্ঞতা। এদেশে এসে সুস্থিতি পেতে তাদের কিছুটা সময় লেগেছিল। সেই সময় প্রাগার্যদের থেকে গোষ্টী কলহে লিপ্ত থেকে সমস্ত কিছু লুটপাট করত। অকাল মৃত্যু জরা এগুলো জীবন যাত্রার অঙ্গ ছিল। সচ্ছলতা, স্বাচ্ছন্দ্য, নিরাপত্তা, দীর্ঘপরমায়ু এ সব সুনিশ্চিত করার কোন উপায় ছিলনা, তাই তারা যজ্ঞ করত এখান থেকেই আসে বিশ্বাসের যুগ। যজ্ঞে তো ফল মেলে না তথাপি আশ্বাস জন্মাত দেবতার

দারস্থ হওয়ার মাধ্যমে। ঋগ্বেদ থেকে জানা যায় জনসাধারণ বিশ্বাস করতেন দেবতারা আছেন তারা মানুষের কষ্টের প্রতিকার করতে চান। তারা শক্তিমান যজ্ঞে স্তোত্র হব্য পেলে তারা প্রীত হন ও ভক্তের প্রার্থনা পূরণ করেন। তাদের এই বিশ্বাস কতটা নির্ভরযোগ্য ছিল আলোচ্য প্রবন্ধে সেই আলোচনায় আছে।

পরবর্তী প্রবন্ধ সংশয়ের বীজ খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চদশ শতক থেকে একাদশ দশম শতক পর্যন্ত সময়কালে ঋগ্বেদ রচনা সম্পূর্ণ হয়েছিল বলে মনে করা হয়। আর্যদের বিশ্বাস কী ছিল তা ঋগ্বেদ ছাড়া জানার উপায় ছিল না। এর প্রমাণ স্বরূপ কোন দলিল দস্তাবেজও পাওয়া যায় না সুতরাং ঋগ্বেদে যা পাওয়া যাচ্ছে বৈদিক আর্যদের কালপর্ব বলে মেনে নিতে হবে। ঋগ্বেদ সংহিতায় দেবতাদের সাথে মানুষের আদান-প্রদানের কথা জানা যায়- "হে দেব তোমাকে আমরা এই স্তোত্র,এই হব্য নিবেদন করছি,এটা গ্রহণ করে তুমি আমাদের প্রার্থিত বস্তু দান করো।"[৩] এই ধরনের প্রার্থনার আড়ালে দেবতার প্রতি বিশ্বাস লুক্কায়িত। সর্বশক্তিমান মানব হিতৈষী দেবতারা আছেন তাঁরা যজ্ঞকারীর নিবেদন শুনে তাকে তৃপ্ত করবেন এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক সূক্ত দাঁড়িয়ে আছে। কাজেই যজ্ঞে প্রার্থিত বস্তু না পাওয়া গেলেও যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হত। স্তব ও প্রার্থনা সূক্ত রচিত হত যজ্ঞে সেগুলি আবৃত্তি ও গান করা হত। এর নেপথ্যে কিছু মানুষের মনে সংশয় জন্মেছিল কিছু সূক্তে তা প্রকাশিত হয়েছিল আলোচ্য প্রবন্ধে এ বিষয়ে আলোচনা আছে।

'মৃত্যু ও সংশয়' প্রবন্ধে মৃত্যু পরবর্তী কালের সংশয় নিয়ে আলোচিত হয়েছে। যজুর্বেদের কিছুটা অংশ ঋগ্বেদের সমসাময়িক কিছুটা পরবর্তীকালে রচিত। ঋগ্বেদের শেষ মন্ডলটির বেশ কয়েকটি সূক্তে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কথা আছে। আবার অথর্ববেদেও মৃত মানুষের পরলোক অর্থাৎ যম লোকে যাবার কথা বর্ণিত আছে। যজুর্বেদে আছে ইহলোক থেকে পরলোকে যাওয়ার যে অন্তরীক্ষ পথ তা প্রেত,যক্ষ রক্ষদের দ্বারা চালিত তার বর্ণনা। তারা মানুষের ক্ষতি করে এমনটাই প্রচলিত কিন্তু প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ নেই। তাই জগৎটার অস্তিত্ব নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। মৃত্যুর পরে মানুষ ভালো থাকে একথা নিছক কল্পনা মাত্র। মৃত্যুর পর পরলোকে কি আছে জীবিত কেউ তা তো প্রত্যক্ষ করেনি। আসল কথা মৃত্যুই অন্তিম পরিনাম,ইহলোকই হল কি একমাত্র লোক মৃত্যুর পর পরলোক বলে কিছু নেই। এই মারাত্মক সংশয়ের প্রথম উচ্চারণ তৈত্তিরীয় সংহিতায় আছে। প্রাবন্ধিক শেষে বলেছেন 'জীবনটাই প্রত্যক্ষ মৃত্যুর পর সবটাই অনুমান নির্ভর'। 'অবৈদিক সংশয়' ভারতবর্ষের সমাজে যজ্ঞের অনুষ্ঠান নিয়ে প্রায় দুহাজার বছর ধরে প্রচলিত সংশয়ের বর্ণনা দিয়েছেন। আর্যরা যখন ভারতবর্ষে এল তখন তারা প্রধানত ছিল পশুচারী একথা আমরা পূর্বেই জেনেছি,প্রসঙ্গক্রমে আরও একবার আসল। সেই যাযাবর জীবনে যজ্ঞ ছিল সংক্ষিপ্ত সরল। তারা যখন আর্যাবর্ত দখল করে পাকাপাকি বসবাস শুরু করল এবং কৃষিকাজ শুরু করল তখন যজ্ঞের

রূপের পরিবর্তন এল। এদের সংখ্যাটা ক্রমশ বাড়ছিল। ব্রাহ্মণ্য সমাজে প্রথমে ছিল ব্রহ্মচর্য ও গার্হস্থ্য,পরে দুটি আশ্রম যোগ দিল বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। এই শ্রেণী ভেদের পাশাপাশি অপর একটি শ্রেণীভেদ যুক্ত হয়েছিল ধনী ও দরিদ্রের শ্রেণীভেদ। এক শ্রেণী কায়িক শ্রমে অন্ন বস্ত্রের ব্যবস্থা করে-দরিদ্র শ্রেণী আর এক শ্রেণী দরিদ্র শ্রেণীর উপার্জিত অর্থের লভ্যাংশ নিয়ে জীবন নির্বাহ করত -- এই শ্রেণী ধনী শ্রেণী। এই যে দ্বিবিধ শ্রেণী সংশয় দেখা গেল এটাই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। আমরা পূর্বোক্ত প্রবন্ধ থেকে জেনেছি পৃথিবীতে দীর্ঘকাল সুখে স্বাস্থ্যে সমৃদ্ধিতে বেঁচে থাকার পথে যা বিঘ্ন তা মোচন করার জন্য উদ্ভাবিত হয়েছিল কর্মকাণ্ড বা যজ্ঞ। ঋগ্বেদে ও যজুর্বেদ এটাই ছিল জীবনের মূল লক্ষ্য যজ্ঞ বিবিধ প্রক্রিয়া দেবতাদের অস্তিত্ব ইত্যাদি নিয়ে বহু সংশয় সৃষ্টি হয় এই থেকে সৃষ্ট জিজ্ঞাসাই আলোচিত হয়েছে 'জিজ্ঞাসা ও সংশয়' প্রবন্ধে। যজ্ঞের নিষ্ফলতা নিয়ে মানুষের মনে যে প্রশ্ন স্পষ্ট হচ্ছিল তার বড় প্রমাণ পাওয়া যায় মুন্ডক উপনিষদে। আসল কথা যজ্ঞে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাচ্ছিল না। এর ফলে বেদ বিরোধী বেশ কিছু প্রস্থানের উদ্ভব হল,তেমনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যে বেশ কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। এই প্রেক্ষাপটে বেড়ে চলা সংশয় সমাজের একটা বড় অংশে যজ্ঞ সম্বন্ধে দোলাচলতা দেখা যায়। এমত অবস্থায় যজুর্বেদে যজ্ঞ অনুষ্ঠান সম্বন্ধে নির্দেশ দেয় অধর্বযুকে যিনি হাতে কলমে যজ্ঞ করেন। এই সমস্তই কৃষ্ণ যজুর্বেদে তৈত্তিরীয় শাখার অন্তর্গত কঠোপনিষদ এর অংশ। বাজশ্রবার ছেলের নাম নচিকেতা। কুমার নচিকেতার যজ্ঞ সম্পর্কিত প্রশ্নাবলী নিয়ে রচিত প্রবন্ধ নচিকেতার প্রশ্ন। বাজশ্রবা যজ্ঞে গরুগুলো দান করে সে বিষয়ক প্রশ্ন ছাড়াও যজ্ঞ সম্পর্কিত নানা প্রশ্ন আছে প্রবন্ধ জুড়ে। সব থেকে আকর্ষণীয় বিষয় নচিকেতার প্রশ্নের উত্তর দেন স্বয়ং যম।

সুকুমারী ভট্টাচার্যের অপর একটি প্রবন্ধগ্রন্থের নাম 'বৈদিক সাহিত্যের রূপরেখা' গ্রন্থটিতে মোট আটটি প্রবন্ধ আছে প্রবন্ধগুলি হল ঋগ্বেদ সংহিতার প্রসঙ্গে,সামবেদ সংহিতার কথা,যজুর্বেদ সংহিতার কথা,অথর্ববেদ সংহিতার কথা,ব্রাহ্মণ সাহিত্য,আরণ্যক সাহিত্য,উপনিষদ কথা,বেদাঙ্গ সূত্র প্রসঙ্গ। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার সাহিত্যিক নিদর্শন ঋগ্বেদ সংহিতা সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত বেদ নানাভাবে চর্চিত হয়েছে। ঋগ্বেদ সংহিতার পর আছে সামবেদ,অথর্ববেদ,যজুর্বেদ। বেদের শ্রেণীবিভাগ সূক্ত প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা আছে গ্রন্থটিতে। চারটি বেদের প্রত্যেকটি চারটি অংশে বিন্যস্ত সংহিতা,ব্রাহ্মণ,আরণ্যক ও উপনিষদ। যদিও সংহিতা ভিন্ন ভিন্ন বেদে আলাদা রূপে ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদের ক্ষেত্রে আবৃত্তির যোগ্য,সামবেদ গেয়,এবং যজুর্বেদ জপনীয় মন্ত্র সমূহের সংকলন। বেদের সংহিতা পাঠ প্রচলন আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে বিন্যস্ত হয়েছিল। এই পাঠ আবার শাখা বা চরণে বিভক্ত। সংহিতার বিভিন্ন বিভাগের একটি ছক দেওয়া যেতে পারে –

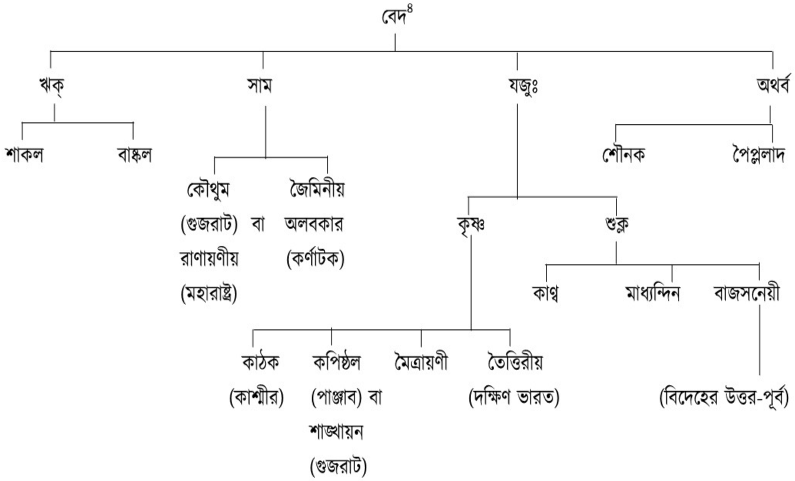

গ্রন্থটিতে ঋগ্বেদ,যজুর্বেদ,অথর্ববেদের রচনাকাল,ভাষ্যকার সূক্ত প্রকৃতি ও গঠন স্তোত্রগীতি বিষয়ে দৃষ্টিকোণ সূক্তের বিন্যাস সংলাপ সূক্ত বিবিধ সূক্ত ভাষা প্রভৃতি সম্পর্কে লেখিকার সুসংহত মতামত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আছে।

সর্বোপরি বলা যায়,বেদের যুগের জীবনযাপন,যজ্ঞ,দেবদেবীর আরাধনা,চারটি বেদ তাদের অধ্যায় সূক্তিগুলি সম্পর্কে প্রাবন্ধিক যে সমস্ত তথ্য উপস্থাপন করেছেন,তা পাঠ করে মনে হয় দীর্ঘ গবেষণালব্ধ ফসল। এই গ্রন্থপাঠ ও আলোচনার মাধ্যমে আমরা বেদের সমসাময়িক কালের সমাজনৈতিক,রাষ্ট্রনৈতিক জীবনযাত্রা সম্পর্কে অনেকটাই অবগত হতে পারি। আলোচ্য প্রবন্ধের মাধ্যমে প্রাবন্ধিকের সেই বৃহত্তর প্রচেষ্টাকে সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র। সবশেষে বলা যায় শব্দচয়ন,বাক্যগঠন রীতি সমস্ত মিলিয়ে তাঁর প্রবন্ধগুলি এক ভিন্ন মাত্রা বহন করেছে।

উল্লেখপঞ্জী

তথ্যসূত্র :

১) সুকুমারী ভট্টাচার্য, প্রবন্ধ সংগ্রহ ২, গাঙচিল, প্রথমপ্রকাশ ২০১২, ৪ এফ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ.২০।

২) তদেব পৃ. ২৫।

৩) তদেব পৃ. ১৪১।

৪) সুকুমারী ভট্টাচার্য, প্রবন্ধসংগ্রহ ৪, গাঙচিল,প্রথম প্রকাশ ২০১৪, ৪এফ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ৩০।

সহায়ক গ্রন্থসমূহ :

১) সুকুমারী ভট্টাচার্য, প্রবন্ধসংগ্রহ ২, গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ ২০১২, ৪এফ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৯।

২) সুকুমারী ভট্টাচার্য, প্রবন্ধসংগ্রহ ৪, গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ ২০১৪, ৪এফ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৯।

৩) দে অধীর, ‘বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা’, প্রথমখণ্ড, উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, কলকাতা ০৭, চতুর্থ সংস্করণ ২০১২।

৪) দে অধীর, ‘বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা’, দ্বিতীয়খণ্ড, উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, কলকাতা ০৭, চতুর্থ সংস্করণ ২০১২।

৫) রায় অলোক, বিশ শতক, প্রমা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ বইমেলা, জানুয়ারি ২০১০।

৬) রায় অলোক, পবিত্র সরকার অভ্র ঘোষ, সম্পাদনা, দুশ বছরের বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য, দ্বিতীয় খন্ড,সাহিত্য একাডেমি প্রথম প্রকাশ ২০০৭।

৭) ভট্টাচার্য অমিত্রসূদন, প্রবন্ধ পঞ্চাশৎ সংস্কৃতি ও সাহিত্য, পারুল বই, প্রথম প্রকাশ ১৪২৪।

পত্র পত্রিকা

১) এবং মুশায়েরা, গদ্যকার সংখ্যা ১৪২৬।

২) বিচিত্রপত্র, প্রবন্ধ বার্ষিকী ১৪২৯।

কান্তারা; একটি পরিবেশ চেতনা ও আদিবাসী চৈতন্যের গল্প

প্রকাশ বিশুই
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
মহিষাদল রাজ কলেজ

সারসংক্ষেপ- কান্তারা সিনেমা আদিবাসী পরিবেশ চেতনা ও চৈতন্যের যে ইতিহাস তাকে খানিক চিত্রিত করে। গত শতকের শেষের দিক থেকে পরিবেশ-চেতনা, *পরিবেশ*-জাতীয়তাবাদ, *পরিবেশ*-ইতিহাস, *পরিবেশ*-সংগ্রাম, ও *পরিবেশ*-সাহিত্য বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, অবশেষে সিনেমাতেও সেটি জনপ্রিয়তা লাভ করে। মাধব গ্যাডগিল বা রামচন্দ্র গুহরা অরন্য, পরিবেশ ও জমির উপর স্থানীয় মানুষের অধিকার রক্ষার চিরকালীন যে সংগ্রামকে দেখিয়েছেন, তা সিনেমাতে কিভাবে ফুটে ওঠেছে তা এই আলোচনার বিষয়। পরিবেশের উপর অধিকার কেবল রাষ্ট্র বা অথরিটি এবং স্থানীয় আদিবাসীদের নয়, এর উপর অধিকার আছে পরাবাস্তব এক শক্তির, সেই শক্তির অধিকারকে পরিবেশ, জমি ও অরণ্যের উপর না মানলে তা কেবল একটি সম্পদ মাত্র। কিন্তু আদিবাসী চৈতন্য পরিবেশের উপর *এই* ঐশ্বরিক অধিকারকে স্বীকার করে আসছে, যা আসলে অরণ্য ও জমির উপর তাদের অধিকারের চেতনারই প্রতিফলন। আদিবাসী ধর্ম-সংস্কৃতি আসলে তার অধিকার, সংগ্রাম ও *চেতনারই* গল্প। -

শব্দসূচক- আদিবাসী-ধর্ম- সংস্কৃতি- চৈতন্য- পরিবেশ- চেতনা-অধিকার-সংগ্রাম-অস্তিত্ত্ব-ইতিহাস-সিনেমা।

সাম্প্রতিক সাড়া ফেলে দেওয়া দক্ষিণী সিনেমা নতুন প্রজন্মের কাছে সিনেমার গল্প বলার যে ইতিহাস তাতে একটি অনন্য মাত্রা যোগ করেছে। অত্যন্ত মেধাবী, বুদ্ধিদীপ্ত ও একাডেমিকেলি সমৃদ্ধ একটি সিনেমা বানিজ্যিক ভাবেও সফল, সিনেমাটির মূল ভাষা কন্নড়।[i] কলকাতার সিনেমার ইতিহাস দীর্ঘ, সেখানে এখানকার সাম্প্রতিক সিনেমাগুলি যখন দক্ষিণের নকল সিনেমা, অথবা ব্যক্তিগত সম্পর্কের টানাপোড়েন, শহুরে জীবনের ক্লান্তিকর হতাশা, অথবা খুব জোর বিশ্বায়িত সমাজে বদলে যাওয়া কিছু মূল্যবোধের গল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তখন ঋষভ শেট্টি সাড়া ফেলে দিয়েছে সাম্প্রতিক মানবিক বিদ্যাক্ষেত্রে চর্চিত সবচেয়ে গুরুত্ত্বপূর্ণ বিষয় পরিবেশ চেতনা ও তার ইতিহাস, বা পরিবেশকে কেন্দ্র করে স্থানীয় ও আদিবাসীদের সংগ্রামের যে ইতিহাস তাকে সেলুলায়েডিত করে। শুধু তাই নয় বক্স অফিসেও তুমুল ঝড় তুলেছে সিনেমাটি। আমি সিনেমা সমালোচক নই, তাই সিনেমার চিত্র গ্রহণ, আবহ, সিনেমাটোগ্রাফি এসব বুঝিনা, শুধু সিনেমার উপর ইতিহাস ও সামাজিক চলনের যে প্রভাব, বা একই রকম ভাবে সিনেমা, সামাজিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রগুলিতে কতটা প্রভাব ফেলে তা খানিক

বোঝার চেষ্টা করি, সেই বিষয়েই এই লেখাটি। কান্তারা কথার অর্থ একটি রহস্যময় অরন্য।[ii] সিনেমাটির গল্পের শুরুতেই দেখা যায় দক্ষিণ কর্ণাটকের আধা অরণ্য ও আধা কৃষি নির্ভর দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠীর 'তুলু'[iii]নামক আদিবাসীদের একটি ছট্টো গ্রাম, যেখানে বর্ণনা করা হচ্ছে কোনো কালে এক রাজা তার সুখ সমৃদ্ধির জন্য আদিবাসীদের গ্রামের দেবতা পানজুরলিকে নিয়ে যায় এবং বিনিময়ে আদিবাসীদের প্রদান করেন বিশাল এক অরন্য ও জমি খন্ড, যে অরণ্য ও জমিকে কেন্দ্র করে তাদের জীবন ও জীবিকা অতিবাহিত হয়ে আসছে। পানজুরলি হল একটি পাথর, যাকে দেবতা হিসাবে পূজা করে তুলু আদিবাসীরা, জঙ্গলের কোনো এক রহস্যময় জায়গায়।[iv] স্থানীয় মাইথলজি বা মৌখিক পুরান অনুযায়ী দেবী পার্বতী একটি শুয়োরকে লালন পালন করেন সন্তান স্নেহে, একদিন সে বড় হতে থাকে এবং ভয়ানক আকার নেয় ও তার বিশাল দাঁত গজায় এবং মহাদেবের বাগান নষ্ট করতে থাকে। ফলে শেষ পর্যন্ত মহাদেব তাকে হত্যা করতে চায়। কিন্তু পার্বতীর অনুকম্পায় তাকে হত্যা থেকে বিরত হয়ে নির্বাসন দেন শিব এবং নির্দেশ দেন মর্তে গিয়ে মানুষের জীবন ও ফসল রক্ষা করতে। সেই বিশ্বাস অনুযায়ী স্থানীয় কৃষি সংস্কৃতির তুলু আদিবাসীদের কাছে পানজুরলি মহাদেব ও পার্বতীর (এই দুইকেই প্রজনন ও কৃষি সংস্কৃতির অন্যতম দেবতা ধরে ভারতীয় কৃষি সংস্কৃতির লোকেরা) সাথে সম্পৃক্ত এক শক্তি যাকে তারা দেবতা জ্ঞানে পূজা করে আসছে। এই পাজুরলি শিবের মতোই একদিকে ধ্বংসাত্মক ও রক্ষাকর্তা, সে ফসল নষ্টও করে, আবার বহিঃশত্রুর ও অন্যান্য অশুভ শক্তি থেকে রক্ষাও করে। ফলত এই পানজুরলি'র সাথে জড়িয়ে আছে অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় সংস্কৃতির কৃষি সংক্রান্ত ধর্মীয় বিশ্বাস গুলি।[v] এরকম গ্রামীন ও কৃষি দেবতার মাহাত্ম সারা ভারতের প্রান্তিক গ্রাম গুলিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নানা লোক বিশ্বাসের মধ্যে। এই লোকগাথা ও লোক বিশ্বাস গুলিতে বর্ণিত গ্রামীন দেবতারা শিব ও পার্বতীর সাথেই জড়িত বিষয়। তুলু লোকোগাথায় যেমন শিব ও পার্বতী সংসারী ও কৃষিজীবী, তেমন বাংলার আনাচে কানাচে ছড়িয়ে থাকা এমন অনেক মৌখিক পুরাণ বা বিবরণেও এরকম পাই, রাঢ় বাংলার শিবায়ন গীত তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যেখানে শিব একজন চাষা ও পার্বতী সেই চাষার মাতৃ রূপী স্ত্রী।[vi] তুলু লোকগাথায় শিব তার ফসল বাঁচাতে শুয়োরকে মারতে চায়, পার্বতী তাকে বাঁচাতে চায় মাতৃ রূপে। উল্টোটাও দেখা যায় কোন কোন লোক বিশ্বাসে, সেখানে পার্বতী মহিষ বধ করছে ফসল নষ্ট করছে বলে, শিবকে আবার আমরা দেখি পশুপতি বা সেই পশুদের রক্ষা কর্তা হিসাবে। এই যে একটা রক্ষা ও ধবংসের সংমিশ্রণ এই দুই দেব দেবীকে কেন্দ্র করে জড়িয়ে আছে তা আসলে প্রকৃতিরই একটি রূপ ভাবনা। মানুষের মনে চিত্রায়িত হয়। সেরকমই অরণ্য ও অরণ্য জাত প্রানীরা আদিবাসীদের কাছে ভালো খারাপ এর মাঝে এক মূর্ত ও বিমূর্ত ধারণার সংমিশ্রন। তাই অরণ্যের প্রতি অধিকার ও অরণ্যজাত প্রাণীদের প্রতি তাদের এক মূর্ত ও বিমূর্ত ধারণা আছে। অরন্য তাঁদের কাছে তেমনই এক বিষয় যা রহস্যময়, তাকে

চেনা যায় আবার পুরোটা চেনা যায়না, তার উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায় কিন্তু পুরোটা না, তার থেকে বেঁচে থাকার রসদ আসে, আবার তা মৃত্যুকেও হাতছানি দিয়ে ডাকে। অরণ্য আদিবাসীদের কাছে সেই এক জায়গা যা গ্রামীণ মূর্ত জীবন আর বিমূর্ত ঐশ্বরিক শক্তির মধ্যবর্তী এক অবস্থান। মায়াবন বা কান্তারা সিনেমাতে অরণ্য সংক্রান্ত আদিবাসীদের এই ধারণাকে দারুণ ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। সিনেমাটির হিরো শিবা যেখানে এই বুনো শুয়োর মারছে সেখানে তার মা কমলা মাতৃ রূপে তাকে রক্ষা করার কথা বলছে। একদিকে এই শুয়োর তাদের জমি ও অরণ্যকে রক্ষা করে বলে তাদের বিশ্বাস, আবার সে তাদের ফসলও নষ্ট করে।

তুলুদের আরেক অন্যতম দেবতা গুলিগা যাকে এই সিনেমাতে দেখানো হয়েছে, স্থানীয় মাইথলজি অনুযায়ী একটি পাথরের টুকরো যা কিনা পার্বতী একটি ছাইয়ের স্তুপ থেকে পায়, শিব তাকে ফু দিয়ে বিষ্ণুর কাছে পাঠায়, সেই পাথর ছিল খুব ধবংসাত্মক তাই বিষ্ণু তাকে নির্বাসন দেন, এবং নির্দেশ দেন মর্তে মানুষের জমির রক্ষা করতে।[vii] তুলু আদিবাসীরা তাদের জমির সীমানায় এই পাথরের দেবতা গুলিগাকে রেখে পূজা করত, এই দেবতাও ছিল শিব ও পার্বতীর সাথে সম্পর্কিত বিষয়। পাথরকে গ্রামের প্রান্তে রেখে পূজা করার রীতি আমরা সারা ভারতের আদিবাসী ও প্রান্ত নিবাসী গ্রাম গুলিতে দেখে থাকি। লোক বিশ্বাস অনুযায়ী এই পাথর গুলি ভয়ানক, ধ্বংসাত্মক আবার রক্ষাকারীও। এই পূজা বা প্রথা আসলে তাদের জমির সীমানা নির্ধারনের একটা পন্থাও বটে। এই পাথর বসানো থাকে এক রহস্যময় জঙ্গলে, যেখানে আদিবাসীরা ও স্থানীয় গ্রামবাসীরা পূজা দিয়ে থাকে বিশেষত ফসল কাটা আর রোপনের সময়। অন্যান্য আদিবাসী বা প্রান্তিক গ্রাম গুলির মতোই এরকম বহু লৌকিক দেবতা তুলু গ্রামীণ সমাজ ও সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, শুধু তাই নয় এই দেবদেবী ও তাকে কেন্দ্র করে নানা আচার ও প্রথা ছিল তাদের অধিকার, সম্পত্তি রক্ষা আইন, পরিবেশ চেতনা ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু।

তুলু প্রথা অনুযায়ী দেবতা পানজুরলি, গুলিগা বা অন্যান্য দেবতারা কোলা অর্থাৎ বাৎসরিক উৎসবের সময় যে বিশেষ নৃত্য হয়, তখন বিশেষ রূপে সজ্জিত কোন নর্তককে ভর করে, বা তার উপর সেই দেবতা অবস্থান করে কিছু মহুর্তের জন্য, এবং গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে কিছু নির্দেশ দেন।[viii] দেবতা গুলিগা কোলার সময় নর্তকের মাধ্যমে যে চিৎকার দেন তার আওয়াজ যতদুর যায় তার মাধ্যমে তাদের জমির সীমানা নির্ধারণ করা হয় মৌখিক ভাবে এবং প্রতি বছর এই প্রথার মাধ্যমে তাকে পুর্ননবিকরণ করা হয়। তাই দেবতা গুলিগা একদিকে জমির রক্ষক ও অন্যদিকে তাঁর চরিত্র ধংসাত্মক। এই দেবতার ধবংসাত্মক হওয়ার অন্যতম কারণ বোধহয় অরণ্য ও জমির অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে আদিবাসী ও প্রান্তিক কৃষকদের আপোষহীনতার চেতনাকেই বোঝায়। স্থানীয় মৌখিক বিবরণ ও প্রথার মাধ্যমে এই দেবতা গুলির যে চরিত্র অঙ্কিত হয় তা স্থানীয় আদিবাসীদের অরণ্য, কৃষি, জমি, সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনারই

প্রতিচ্ছবি। সেই কারণে প্রতি বছর স্থানীয় গ্রামীন তুলুরা বুটা কোলার আয়োজন করে,[ix] লোকবিশ্বাস অনুযায়ী সেই অনুষ্ঠানে যে নাচ হয়, তাতে নর্তক নাচ করতে করতে ঈশ্বরের সাথে সংযোগ স্থাপন করবেন বা ঈশ্বর তার সাথে সংযোগ স্থাপন করবেন, এবং সেই মহূর্তে নর্তক গ্রামসমাজ, স্থানীয় রাজা অথবা সামন্তপ্রভুকে বা অথরিটিকে অরণ্য, জমি ও অন্যান্য বিষয়ে নির্দেশ দেবেন।[x] মনে রাখতে হবে কোলা, অর্থাৎ খেলা বা নাচ যিনি উপস্থাপন করেন তিনি ওই আদিবাসী গোষ্ঠী ভুক্ত হবেন, এবং তাকে বিশাল এক দৈবিক পোষাকে সুসজ্জিত করে মহিমান্বিত করা হবে, এবং নানা বাদ্য যন্ত্র সহযোগে তিনি নৃত্য করবেন, নৃত্য করতে করতে বাস্তব চেতনার যে স্তর ও দৈবিক চৈতন্যের যে স্তর এই দুয়ের মধ্যবর্তী এক রহস্য ও ধোঁয়াশাময় স্তরে অবস্থান করবেন। নির্মিত হবে চেতনা ও চৈতন্যের একটি ত্রিমুখি সম্পর্ক, যার তিনটি কোনে অবস্থান করবে দৈবিক চেতনা, বাস্তব চেতনা ও অর্ধ বাস্তব বা অর্ধ দৈবিক চেতনার এক রহস্যময় স্তর। সেই চেতনা থেকেই তিনি আগামী বছরের জন্য জমি ও অরণ্যের অধিকারের উপর আদিবাসী, সামন্ত রাজা ও ঈশ্বরের ত্রিমুখী যে সম্পর্ক তার সামঞ্জস্য বিধান করবেন। যেমন এখানে অরণ্য এক রহস্যময় প্রকৃতি যার মূল অধিকর্তা স্বয়ং ঈশ্বর। আদিবাসী বা স্থানীয় বাসিন্দা, যারা এই অরণ্যের দ্বারা লালিত তাদের অধিকার চিরন্তন, আর সামন্ত রাজা বা অথরিটির অধিকার এর উপর আরোপিত হয়েছে। এই যে ত্রিমুখী সম্পর্ক ও সংঘাত তাকে কোলার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রন করা হয়। প্রথাগত ভাবে এই সম্পর্কের টানাপোড়েনের সমাধান হয়ে আসছে কোলার দৈবিক নির্দেশের মাধমে। আর এই কোলা যেহেতু আদিবাসিদেরই কোন এক প্রতিনিধি উপস্থাপন করেন ফলত ঈশ্বরের নির্দেশ কখনোই আদিবাসীদের বিরুদ্ধে যায়নি। কান্তারা সিনেমাতে দেখানো হচ্ছে এই অধিকার নিয়ে গোল বাঁধল ১৯৫২ এর অরণ্যনীতির পর যখন অরণ্যের উপর ঈশ্বরের অধিকারকে অস্বীকার করতে শুরু করল অথরিটি।[xi] অথরিটি অরণ্যকে কেবল একটি সম্পদ হিসাবে দেখতে শুরু করল এবং অথরিটি হিসাবে এখানে দুজন দাবিদার উপস্থিত হল এক সরকার ও তার বন দপ্তর ও অন্যদিকে ভূস্বামীর উত্তরাধিকাররা। এই দাবিদাররা অরণ্য ও জমির উপর কেবল ঈশ্বরের দাবী নয় চিরন্তন চলে আসা আদিবাসীদের দাবীকেও অস্বীকার করছে।[xii] সিনেমার শেষে অবশ্য জমিদারের অস্তিত্ত্ব হারিয়ে যাচ্ছে এবং অথরিটি হিসাবেএকমাত্র সরকার ও তার বন দপ্তর থেকে যাচ্ছে, এবং সরকার ঈশ্বরের অস্তিত্ত্বটি নিয়ে নীরব থাকছে ও আদিবাসীদের অরন্যের উপর অধিকারকে খানিক মেনে নিচ্ছে। সিনেমাটির গল্পের যেমন আমরা নানা স্তরভেদ দেখি তেমনি অনেক অস্পষ্ট জায়গাও থেকে যায়, সেগুলি আরো স্পষ্ট হলে সাধারনের বিনোদনের সাথে অরণ্য নিয়ে লড়াইয়ের ইতিহাসটি বুঝতে সুবিধা হত।

আমরা জানি গত শতকের চিন্তার জগত নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই চিন্তার জগতে উগ্রজাতীয়তাবাদ বনাম মার্ক্সীয় চেতনার সংঘাত ক্রমশ ক্ষীণ হচ্ছিল, আর উদারবাদের সাথে মার্ক্সীয় চেতনার সংঘাত বাড়ছিল।

শতকটির শেষের দিকে সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের পর চিন্তার জগতে সেই সংঘাতেও খানিক ভাটা পড়ে।চিন্তার জগতে মার্ক্সবাদের অস্তিত্ব নিয়ে খানিকটা ধোঁয়াশা দেখা গেল,যার থেকে উঠে এল সাবল্টার্ণ বা নিম্নবর্গীয়চর্চা যা ধীরে ধীরে মোড় নিল পরিবেশবাদী চর্চার দিকে। পরিবেশ ও বাস্তুতান্ত্রিক সামঞ্জস্যতায় টিকে থাকা জনজাতি ও আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির অত্বিত্ব রক্ষার,লড়াই ও তার সামাজিক চলন বোঝার চেষ্টা শুরু হল বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে।[xiii] চিন্তার জগতের এই ছাপ সিনেমার মতো একটি চিন্তাশীল গনমাধ্যমে পড়বে এটাই ছিল স্বাভাবিক। ভারতে পরিবেশ চেতনার ইতিহাস নির্মানে যুগোত্তীর্ণ গবেষণা করলেন মাধব গ্যাডগিল ও রামচন্দ্র গুহরা। তারা নিম্নবর্গ ও আদিবাসীদের নানা ধর্মীয় আচার আচরণ, প্রথা নিয়ম, ও অভিজ্ঞতার নিরিখে চিত্রায়িত করলেন তাদের জীবন ও পরিবেশ চেতনাকে।[xiv] অসংখ্য উদাহরন দিয়ে দেখিয়েছেন আদিবাসী ও নিম্নবর্গিয় মানুষদের ধর্মীয় চৈতন্যের সাথে পরিবেশ চেতনার সম্পর্কটিকে। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যেমন মহারাষ্ট্রের পশ্চিমঘাট পর্বতে বসবাসকারি গাভলিস ও কুনবিরা তাদের জাতিধর্মের নিরিখে জাতিগত পেশাকে ভাগ করেছে যাতে পরিবেশের উপর বাড়তি চাপ না পড়ে, পাহাড়ের উঁচু অঞ্চলে বসবাসকারী নিরামিষাসী গাভলিসরা পশুপালন নিয়ে থাকে এবং অরণ্যকে রক্ষা করে, পাহাড়ের নিচের অংশে বসবাসকারী আমিষভোজী কুনবিরা কৃষিকাজ করে জঙ্গল পরিস্কার করে।[xv] গ্যাডগিল, গুহরা নির্মান করলেন আদিবাসী, অরণ্য ও তার ধর্ম চৈতন্যের মধ্যে এক ত্রিমুখী সম্পর্ক।

আমরা যদি পরিবেশ চেতনা ও আন্দোলনের একটু সংক্ষিপ্ত ধারা বিবরণ দেখি বুঝতে পারবো কান্তারা সিনেমার ফাঁকফোকোর গুলি। সিনেমাতে তুলুদের একটি মিথে দেখানো হচ্ছে একজন রাজা আদিবাসীদের জমি দান করছে। বিষয়টি বাস্তবে তেমন না, আসলে আদিবাসীরা এই জমির চিরন্তন অধিকারী, কারণ তারা অনন্তকাল থেকে এখানে বাস করছে। বরং সামন্ততান্ত্রিক যুগে সামন্ত রাজারা তাদের অথরিটিকে এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে এই মিথগুলি আদিবাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়, এবং এগুলি ছড়াতে তারা আদিবাসীদের ধর্মীয় প্রথা ও মিথগুলিকেও নিজেদের মিথ গুলির সাথে মিশিয়ে নেয়। নৃতত্ত্ববিদরা বলছেন আদিবাসী ও প্রান্তিক গ্রাম গুলিতে রাষ্ট্রীয় অথরিটির তেমন কোন গুরুত্ত্ব ছিল না সামন্ততান্ত্রিক যুগের আগে, গ্রাম সমাজ ছিল একমাত্র অথরিটি, যারা অরণ্যের ব্যবহার ও তা রক্ষার উপর নিয়ন্ত্রন ও নির্দেশ দিতেন ধর্মীয় আচারের মাধ্যমে, যার মাধ্যমে প্রথাগত আইনগুলি ও তার সাথে স্থানীয় বাস্তুতন্ত্র রক্ষা পেত, এবং এই আইনগুলি ছিল ধর্মের নিগড়ে বাঁধা। সামন্ততান্ত্রিক যুগ শুরু হওয়ার সাথে সাথে এই অঞ্চলে একটা আধা সামন্ততান্ত্রিক রীতিনীতির অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে। মুঘল যুগে তা স্পস্ট হয়ে উঠে উত্তর ভারতে, দক্ষিণ ভারতে মোটামুটি একই সময় এই আধা সামন্ততান্ত্রিক রীতিনীতির প্রবেশ ঘটে আদিবাসী অঞ্চল গুলিতে[xvi] এবং এই সামন্ত রাজারা আদিবাসী মাইথলজির সাথে দারুণ ভাবে খাপ

খাইয়ে নেয়। আদিবাসী গ্রামীন সমাজ ব্যবস্থার সাথে আপোষ করে তাদের সামন্ততন্ত্র চালিয়ে নিয়ে যায়।[xvii] সুরজিত সিন্‌হা মধ্যভারতে আদিবাসী অঞ্চলে রাজপুত সামন্তদের সামন্ত প্রথা নির্মানে এই মিশ্র মিথ গুলির উপর জোর দিয়েছেন।[xviii] আদিবাসীদের উপর সামন্ততন্ত্র চাপাতে আদিবাসীদেরই মৌখিক পুরাণকে ব্যবহার করেছে এই নতুন সামন্ত রাজারা তাদের স্বপ্নাদিষ্ট দৈবিক আদেশের সাথে। তবে দক্ষিণ ভারতেও এরকম ঘটনা ঘটতে থাকে অষ্টমশতক থেকেই যখন সামন্ত প্রথা স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে আদিবাসী অঞ্চল গুলিতে। কেরালার চেরমন পেরুমলদের আধাসামন্ততান্ত্রিক প্রভাব পড়ে তুলুনাড়ু নামক দক্ষিন কর্ণাটক ও উত্তর কেরালার এই আদিবাসী অঞ্চলটিতে।[xix] তুলুদের মৌখিকপুরাণের সাথে এই সামন্ত রাজারা নিজেদের দৈবিক স্বপ্নগুলিকে মিলিয়ে দেয়। সামন্ত রাজার দৈবিক স্বপ্ন ও আদিবাসীদের মৌখিক পুরাণের যে সম্পর্ক তা সিনেমাটিতে তুলেধরা হয়েছে। যদিও সিনেমার ঘটনাটি উনিশ শতকের মধ্যবর্তী কোন এক উপনিবেশিক যুগের সামন্ত রাজার, এবং সেখানে দেখানো হয় আদিবাসীদের জমি সামন্ত রাজার দান। সিনেমাতে এটা ক্ল্যারিফাই করার দরকার ছিল আদিবাসীরাই এই অরণ্যের আদি বাসিন্দা, আদিবাসীদের অরণ্যের অধিকার কোন সামন্ততান্ত্রিক রাজার দান নয়, এটা একটা মিথ মাত্র। উত্তর ভারত থেকে দক্ষিন ভারতের এই সামন্ত রাজারা আদিবাসী ও অরণ্য অঞ্চল গুলিতে অধিকার পেতে একদিকে আদিবাসীদের সংস্কৃতিকে যেমন একাত্মকরণ করতে বাধ্য হয়েছে, তেমনি আবার আদিবাসীদেরও তাদের দেবতাদের অরণ্যের উপর দৈবিক অধিকারকেও খানিক মেনে নিয়েছ। সিনেমাটিতেও তা চিত্রিত হয়েছে। সামন্ত রাজার শান্তির কামনায় আদিবাসী দেবতা নিয়ে গিয়ে পূজা করার বাসনা ও প্রতি বছর কোলার সময় আদিবাসীদের উৎসবে রাজ পরিবারের উপস্থিতির মাধ্যমে সেই মিথগুলির এবং অরণ্য ও জমিকে কেন্দ্র করে যে সম্পর্ক তার চরিত্র বোঝা যায়।

সিনেমাটিতে অথরিটি হিসাবে আরেকটি দাবীদার দেখা যায় তা হল সরকার ও তার ফরেস্ট ডিপার্ট্মেন্ট যারা আদিবাসীদের অরন্যের অধিকারের এই প্রথাগত আইনকে উপেক্ষা করছে এবং অরন্যের উপর অধিকার পেতে চাইছে। ফরেস্ট ডিপার্ট্মেন্ট অরণ্যটিকে রিজার্ভ ফরেস্ট ঘোষনা করতে চায়, তার ফলে গ্রামবাসীদের সাথে ফরেস্ট ডিপার্ট্মেন্ট ও সামন্ত রাজার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে এক ত্রিমুখী সংঘাতের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়। যে ঘটনাটি সিনেমাতে দেখানো হচ্ছে সেটি ১৯৭০ এর দশকের পরের একটি ঘটনা হিসাবে। কিন্তু এই সংঘাতের সূত্রপাত ঔপনিবেশিক যুগে, যখন অরণ্যের উপর পাখির চোখ পড়ে ঔপনিবেশিক সরকারের। এই সময় অরণ্য আর কোনো পরাবাস্তব শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রহস্যময় এক অস্তিত্ব নয়, যা জীবনকে রক্ষা করে, আবার জীবনকে ভয়ার্ত করে তোলে। বরং অরন্য ঔপনিবেশিক দৃষ্টিতে হয়ে ওঠে কেবলই এক ভোগ্য সম্পদ।[xx] ১৮৬৪ তে প্রতিষ্ঠা হল ইন্ডিয়ান ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট, আর ১৮৭৮ এ গড়ে উঠল ইন্ডিয়ান ফরেস্ট এক্ট। যার মাধ্যমে অরন্যের

উপর ঐশ্বরিক শক্তির নিয়ন্ত্রন, আদিবাসীদের অধিকার, আধাসামন্ততান্ত্রিক প্রভাব এই সবটুকুকে একেবারে গোগ্রাসে গিলে নিতে চাইল উপনিবেশিক শাসন তন্ত্রের অধীনে থাকা রাষ্ট্র ব্যবস্থাটি।[xxi] রেল লাইন পাততে, কাগজ ও টিম্বার শিল্পে, আর রয়েল নেভির পাটাতন বানাতে প্রয়োজন ছিল প্রচুর কাঠের। অরণ্যকে রিজার্ভ করে, আদিবাসীদেরকে প্রবেশ সেখানে নিষিদ্ধ করে, কাঠ কুটো পাতা সংগ্রহে নিষেধাজ্ঞা জারী করলে আদিবাসীদের সাথে এক দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস রচিত হয় ঔপনিবেশিক সরকারের। স্বাধীন ভারতেও এই ধারাটি অব্যাহত থাকে।[xxii] ১৯৫২ এর জাতীয় ফরেস্ট নীতি অরণ্যের উপর রাষ্ট্রীয় আধিপত্য ঔপনিবেশিক যুগের থেকে এক চুলও সরেনি বলে বিশ্লেষকদের মত। ফলে স্বাধীন ভারত সরকারের সাথেও আদিবাসীদের অরণ্যের উপর অধিকার ও অস্তিত্বরক্ষার লড়াইয়ে সংঘাত চলতেই থাকে। ১৯৭০ এর দশকে বৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্প গুলির কারণে সেই সংঘাত চরমে ওঠে, অরন্য হয়ে ওঠে অশান্ত। চিপকো আন্দোলন সারা ভারতের অরন্য সংক্রান্ত চিন্তা জগৎকে নাড়িয়ে দেয়। আদিবাসী ও অরন্য নির্ভর জাতিগুলির আন্দোলনগুলোকে আর শ্রেনী চেতনার বা কেবল নিম্নবর্গীয় চেতনার নিরিখে নয় পরিবেশ চেতনার নিরিখে দেখা শুরু হয়।[xxiii] যার প্রভাব সিনেমার মতো আধুনিক মাধ্যমে গল্প বলিয়েদের দেরিতে হলেও প্রভাবিত করবে সেটাই স্বাভাবিক ছিল। সিনেমার শেষে কেবল ভূস্বামীকেই ভিলেন দেখানো হয় এবং অন্তিম কোলাটিতে আদিবাসীদের সাথে রাষ্ট্রের একটা মিত্রতার সম্পর্ক দেখানো হয়। কিন্তু রাষ্ট্রের সাথে আদিবাসীদের অরন্যের উপর অধিকার নিয়ে এই মিত্রতা সহজে আসেনি। রাষ্ট্রের সাথে আদিবাসীদের অরন্য নিয়ে সম্পর্কটি খুব একটা মসৃণ ছিল না, তার এক দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস বর্তমান। পরে অবশ্য ১৯৮০ এর দশক (১৯৮৮ অরণ্য নীতি) থেকে সরকারের অরণ্য নীতিতে ঔপনিবেশিক ধারনার কিছুটা পরিবর্তন ঘটতে থাকে। অরণ্যের উপর কেবল রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব নয় স্থানীয় আদিবাসী ও মানুষের অস্তিত্বকেও স্বীকার করে নেওয়া হতে থাকে, এবং ২০০৬ এর ইন্ডিয়ান ফরেস্ট এক্ট সেই যৌথ অধিকারকে মেনে নেয় এবং আইনি স্বীকৃতি দেয়।[xxiv] ফলে রাষ্ট্র, আদিবাসী ও অরণ্যের সম্পর্কটাও ত্রিমুখী ও জটিল যেটাকে পুরোপুরি মহিমান্বিত করা যায় না।

সিনেমার গল্প বলিয়েদের নিজস্ব কিছু দাবী, ঘরানা ও বাধ্যবাধকতা থাকে, যার সাথে সম্পূর্ণ একাডেমিক চর্চাকে এক করে না দেখলেও এরা কিন্তু কেউ কারো থেকে সম্পূর্ণ আলাদা নয়, একাডেমিক বিষয়গুলি সেলুলায়েডিত হলে তা বহু সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছায়।[xxv]গল্প নির্মানে কিছু ত্রুটি থাকলেও সিনেমাটি দারুন এক সাহসী পদক্ষেপ ও খুব সুগভীর চিন্তা প্রসূত। পরিবেশ চেতনা নিয়ে আগে সিনেমা হয়নি এমন না, তবে এই সিনেমাটি অনেক গভীরে আঘাত করেছে, কিন্তু তার বানিজ্যিক চাহিদাটিকেও ভুলে যায়নি। সিনেমাটির গল্পে অনেক স্তর আছে, সিনেমাটি যদি দুটো পার্টে হত ভালো হত, প্রথম পার্টে সামন্ততন্ত্রের সাথে আদিবাসীদের লড়াইয়ে শেষে করে, যদি পরের পার্টে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের সাথে আদিবাসীদের অস্তিত্ত্বের লড়ায়ের

দিকটি দেখানো হত আমার মনে হয় গল্পটা আরো পরিস্কার হত। তবে তুলু আদিবাসীদের মাধ্যমে বিভিন্ন আদিবাসীদের অরন্য সম্পর্কে যে চেতনা ও চৈতন্য তাকে যে ভাবে চিত্রায়িত করা হয়েছে সিনেমাটিক রূপকের মাধ্যমে তা সত্যি এক সাহসী পদক্ষেপ। সমাজ পরিবর্তনের নানা ছাপ সাহিত্যে ও সিনেমায় থেকে যায়, কিন্তু তা উপর তলার মানুষের ইতিহাসকেই বেশী বেশী চিত্রায়িত করে, সেখানে নিচু তলার মানুষের সংগ্রাম, চেতনা, অস্তিত্ত্ব নিয়ে সিনেমা বেশ দুর্দান্ত একটি বিষয়। বহুধা বিভক্ত ভারতীয় সমাজের পরিবেশ নির্ভরতার চেতনাকে বুঝতে গেলে তার ধর্মীয়চৈতন্যের এই স্তর গুলিকে ছুঁতে হবে বা বুঝতে হবে, মাধব গ্যাডগিল থেকে রিষভ শেট্টী হয়তো সেটিই বোঝাতে চেয়েছেন।

তথ্যসূত্র :

---

[i] *Rishab Setty and Saptami Gowda StarrerKarnataka Film Shoot Begins Tomorrow,*The Times of India, 2nd Oct, 2022.

[ii] *Do You Know The Meaning of Rishab Shetty's Record Breaking Film Kantara*?, News 18, 22May, 2023.

[iii] ***Shetty, Malavika,*** (ed), *Telling Stories: lanhuage, Narratives and Social Life, identity BuildingThrough Narratives on a Tulu Call-in-Show*, Georgetown University Press, 2010, P 95-108.

[iv] ***Jayashanker, S,****Temples of Kasaragod Dristrict,* Controller of Publication, 2001, P 30.

[v] ***Claus, Peter J***, *Heroes and Heroines in the Conceptual Fremework of Journal of Indian Folkloristics,* 1(2), 1978, P 28-42.

[vi] *বন্দোপাধ্যায়, অভিজিৎ,মধ্যযুগেরবাংলাকাব্যেশিবওশিবায়ন।*

[vii] ***Gogwekar, Pranav,****The Divine Deities from Kantara,* Peepul Tree, 8 Nov, 2022.

[viii] ***Upadhyaya, U. Padmanabha***, *Bhuta worship, Regional Resources centre for Folk Performing arts,* M.G.M. College, 1984, P-60.

[ix] ***Claus, Petter J.,****Possession, Protection, and Punishment as Attributes of the Deties in a South Indian Village,* Man in India, 53 (3), 1973, P 231-242.

[x] ***Suzuki, Masataka***, *Bhuta and Daiva: Changing Cosmology of Rituals and Narratives in Kartaka,* Senri Ethnological studies, 71, 2008, P- 51-85.

[xi] ***Kulkarni, Sarad,****Forest Legislation and Tribal Comments on Forest Policy Resolution,* Economic and Political Weekly, 12 December, 1987, P2143.

[xii] ***Kurian, Aju,****Tribal Way of Living: A Solution to Current Ecological Crisis (Eco-Spirituality from Oran Perspective),* International Journal of Creative Research Thoughts(IJCRT), Vol-9, 8 August, 2021.

[xiii] ***Guha, Ramchandra,*** *Introduction Themes and Issues in the Environmental History of South Asia*, in **Arnold, Devid, Guha, Ramchandra,** (Ed), *Nature*

Culture Imperialism : Essays on the Environmental History of South Asia, Oxford University Press, Delhi, 1995, P17

[xiv]***Gadgil, Madhab***, &***Guha, Ramchandra,*** *Ecology and Equity: The Use and Abuse of Nature in Contemporary India,* Penguin Books, Gurugram, 1995,P-98-114.

[xv]***Gadgil. Madhab,***&***Guha, Ramchandra***, *This Fissured Land: A Ecological History of India, Oxford University Press,* New Delhi, 1992, P-89-95.

[xvi]***Ganesh, K.N***., *Historical Geography of Natu in South India with Special Reference to Kerala, Sage Journals,* Vol-36, 1st June, 2009.

[xvii]***Veluthat, Kesavan,****The Early Medieval in South India, Oxford University Press*, New Delhi, 2009.

[xviii]***Sinha, Surojit,****State Formation and Rajput Myth in Tribal Central India, Cambridge University Press, London*, 1962, P-71-71.

[xix]***Sturrock, J***, *Madras District Manuals South Canara,* Madras Superinintendent Government Press, Madras, 1894, P -134-200.

[xx]***Guha, Ramchandra***, *Forestry and Social Protest in British Kumaun: 1893-1921,****Guha, Ranajit, (Ed),****Subaltern Studies: Writings on South Asian History and Society,* Vol-4, Oxford University Press, Delhi, 1994, P-8.

[xxi]***Bandyopadhyay, Sekhar***, *A History of Modern India, Orient Longman, Delhi,* 2004, P-200-204.

[xxii]***Bhattacharya, Neeladri,****Colonial State and Agrarian Society: In the Making of Agrarian Policy in British India: 1770-1900*, Oxford University Press, Delhi, 1992, P-127-128.

[xxiii]***Guha, Ramchandra,****The Unquiet Woods, Ecological Change and Peasant Resistance in the Himalya*, Permanent Black, Ranikhet, (FP-1090), 2017, P-105-107.

[xxiv]***Bhullar, Loveen***, *The Indian Forest Rights Act 2006: A Critical Appraisal*, Law, Environment and DevelopmentJournal, 4/1, June, 2008, P-20.

[xxv]***Guha, Ramchandra,****India After Gandhi: The History of the World's Largest Democracy, Macmillan Ltd.,* Delhi, 2007, P-709-710.

আধুনিকতা, উত্তর-আধুনিকতা এবং জীবনানন্দ দাশের পঁচিশ বছর পরে কবিতাটির একটি ভিন্ন পাঠ

মনস্বিতা মণ্ডল
স্নাতকোত্তর, বাংলা বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: রবীন্দ্র-উত্তর যুগের আধুনিক বাংলা কবিতার এক গুরত্বপুর্ণ স্রষ্টা জীবনানন্দ দাশ। তাঁর কবিতায় বাংলা প্রকৃতি রচিত হয়েছে এক অনন্য গভীরতায়। কিন্তু, তিনি শুধুই প্রকৃতির কবি নন। এই আলোচনায় আমরা তাঁর 'পঁচিশ বছর পরে' কবিতাটির মাধ্যমে দেখাতে চেষ্টা করব, কীভাবে জীবনানন্দ দাশ 'প্রকৃতির কবি' হয়েও তাঁর কবিতায় দৃশ্যপ্রপঞ্চের মতো লুকিয়ে থাকে এক অতি গভীর ব্যঞ্জনা, যা পাঠককে স্তম্ভিত করে দেয়; এনে দাঁড় করায় এক নতুন দিগন্তে। কবিতার দুই স্তবকের মাঝের পট পরিবর্তনের মধ্যে আসলে থেকে যায় কবির অন্তহীন অপেক্ষা। এই আলোচনা সম্ভবত আমাদের জীবনানন্দের কবিতাকে নতুনভাবে চিনতে সাহায্য করবে।
সুচক শব্দ: উত্তর-আধুনিকতা, মৃত্যু চেতনা, পট পরিবর্তন, সম্ভাবনা, অনিশ্চয়তা।

মূল আলোচনা:

> "মানবিক সত্তার ক্ষয় সম্পূর্ণ হলে জীবকোষের বুদ্ধে উত্তরণ হয়। তখন রোমান্টিক স্বপ্নময়তার বদলে এক অতিলৌকিক সূর্যালোক এসে পড়ে অস্তিত্বের অন্ধকার কুঠুরিগুলিতে – সেই আলোয় পরম দেখাই জ্ঞান।"(১)

রবীন্দ্র-উত্তর যুগের গুরুত্বপূর্ণ স্রষ্টা জীবনানন্দ এই নবচেতনার জ্ঞান দিয়ে গেছেন আমাদের। এই নবচেতনার দুয়ার দিয়েই ঢুকতে হবে তাঁর জাগতে।

তাঁর যে কবিতাটি আমাদের আলোচ্য, 'পঁচিশ বছর পরে' সেই কবিতাটির প্রথম পাঠেই সর্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে কবিতাটির দু'টি স্তবকের পরিবর্তন, যার মধ্য দিয়ে কবিমানসের পট পরিবর্তনও লক্ষ্যণীয়। প্রথম স্তবকে একেবারে প্রথমেই আমরা দেখি বক্তা এক বিশেষ মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, যেখানে তিনি বলছেন –

> " 'একদিন এমন সময়
> আবার আসিয়ো তুমি - আসিবার ইচ্ছা যদি হয়–
> পঁচিশ বছর পরে!' "(২)

এই মুহূর্তের পর থেকেই শুরু হয় বক্তার অন্তহীন প্রতীক্ষা। বক্তা ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করেছেন এই বিস্তৃত সময় কেটে যাওয়ার এবং তিনি চাইছেন তাঁর বহু আকাঙ্ক্ষিত প্রিয় মূহূর্তের অন্তত একবার immitation হোক; সেই মুহূর্তকে পুনরায় অনুভব করতে, আরও একবার ছুঁয়ে দেখতে। আমাদের ভাবনায় আলোচ্য কবিতাটি অনেকার্থ

দ্যোতনা বহন করে, প্রত্যেক অংশ এখানে যেন সাক্ষ্য দেয়। যদিও এই আকুল অপেক্ষায় বক্তা এই আশায় বাঁচেন যে সময় অতি দ্রুত কেটে যাবে –

"নক্ষত্র যে-বেগে
ছুটিছে আকাশে,
তার চেয়ে আগে চ'লে আসে
যদিও সময়," (৩)

কিন্তু এই প্রতীক্ষাকালীন সময়ে তাঁর মন হয়ে দাঁড়ায় সম্ভাবনার জগত। কারণ তাঁর কাছে তাঁর প্রতীক্ষার সফলতার বিষয়ে কোনো নিশ্চয়তাই নেই - তিনি তো নিজেই বলেছেন,

"আবার আসিয়ো তুমি - আসিবার ইচ্ছা যদি হয় –"(৪)

এই 'যদি' কবিকে দোলাচলে রাখে, অবসাদগ্রস্ত করে। জীবনানন্দ যদি সম্পূর্ণত উত্তরাধুনিক হতেন, তাহলে এই সম্ভাবনার জগতকে তিনি যাপন করতেন - এই সম্ভাবনা, দোলাচল, অনিশ্চয়তা হয়ে দাঁড়াত জীবনানন্দের বক্তার সাম্রাজ্য। কিন্তু, আলোচ্য কবিতার বক্তা আধুনিকতা এবং উত্তরাধুনিকতার এক আশ্চর্য বাঁকে পাঠককে দাঁড় করাতে চান, যেন পাঠককে দাঁড় করাতে চান এক আশ্চর্য মোড়ে যখন তিনি পাঠককে ডেকে বলবেন যে এই খোলা রইলো দুই রাস্তা, পাঠক যে দিকে চায়, সেই দিকেই যেতে পারে। আবার এও মনে হয়, বক্তার পক্ষপাত যেন ঐ সম্ভাবনার যাপনের দিকে হেলে নেই; সেইজন্যই পিছ পিছু আসে, এই সম্ভাবনার রাজ্যের অনুসারী হয়ে – অবসাদ। শঙ্খ ঘোষ 'বাবরের প্রার্থনা'-য় লিখেছিলেন,

"এই তো জানু পেতে বসেছি, পশ্চিম
আজ বসন্তের শূন্য হাত –
ধ্বংস করে দাও আমাকে যদি চাও
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।"(৫)

জীবনানন্দের এই কবিতায় বক্তার সন্ততি হল অবসাদ। সম্ভাবনার রাজ্যের ফলাফল হিসাবে দেখতে পান বলেই তিনি দিনের শেষে আধুনিক।

"প্রকৃতিকে নিবিড়ভাবে অনুভব না করেন এমন কোনো কবি নেই; কিন্তু সমগ্র জীবনকে প্রকৃতির ভিতর দিয়েই গ্রহণ ও প্রকাশ করেন এমন কবির সংখ্যা অল্প। তাঁরাই বিশেষভাবে প্রকৃতির কবি। আমার মনে হয়, আমাদের আধুনিক কবিদের মধ্যে একজনকে এই বিশেষ অর্থে প্রকৃতির কবি বলা যায়; তিনি জীবনানন্দ দাশ।"(৬)

জীবনানন্দের কবিতায় বাংলার প্রকৃতি রচিত হয়েছে গভীরভাবে। তাঁর স্বকীয় দৃষ্টি ও সৃষ্টি শক্তিতে গ্রামবাংলার একান্ত নিজস্ব অতি পরিচিত সাধারণ চিত্রাবলীও অপরূপ হয়ে ওঠে। তুচ্ছ ও ক্ষুদ্রকে ঘিরে গড়ে ওঠে মহিমামণ্ডল। Wordsworth, Byron প্রমুখ রোমান্টিক যুগের কবিদের কবিতায় প্রকৃতির অনুষঙ্গের সঙ্গে জীবনানন্দের প্রকৃতির বিবরণের অনেক মিল পাওয়া যায়, যার ফলে আমরা অনেক

সময়ই জীবনানন্দকে শুধুই প্রকৃতির কবি বলে ভুল করি, বিভ্রান্ত হই। জীবনানন্দের অন্যান্য সৃষ্টির মতো এই কবিতাতেও প্রতীক ব্যবহারের অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃতির নিবিড় অবলোকন ক্ষমতা তিনি পেয়েছিলেন তাঁর অন্তর্গত বিষাদ থেকে। অনেক গভীরে খুঁড়ে খুঁড়ে সংগ্রহ করেছিলেন কবিতার আকড়, মণিমুক্তো।

"মাঠে-মাঠে মরে গেল, ইঁদুর-পেঁচারা
জ্যোৎস্নায় ধানখেত খুঁজে
এলো গেল;"(৭)

বা,

"পাখির ডিমের খোলা, ঠাণ্ডা- কড়্কড়্;
শসাফুল- দু-একটা নষ্ট শাদা শসা,
মাকড়ের ছেঁড়া জাল, শুক্‌নো মাকড়সা
লতায়- পাতায়;
ফুটফুটে জ্যোৎস্নারাতে পথ চেনা যায়;
দেখা যায় কয়েকটা তারা
হিম আকাশের গায়- ইঁদুর-পেঁচারা
ঘুরে যায় মাঠে-মাঠে,"(৮)

এইসব দৃশ্য আমাদের অত্যন্ত চেনা ও জানা এবং একেবারেই দেশজ। এইসব চিত্রকল্পে বাংলার চিরন্তন প্রকৃতি দৃশ্যই ভেসে ওঠে স্বাভাবিক প্রত্যয়ে। গ্রাম বাংলার যে সব দৃশ্য প্রতিদিন আমাদের চোখে ভাসে সেই অন্তর্ভেদী জীবন ঘনিষ্ঠ পথ-ঘাট, বিজন প্রান্তর, শ্যামল শাশ্বত গ্রামীণ নিসর্গের বিস্তার দেখা যায় তাঁর কবিতায়। জীবনানন্দের প্রকৃতির অনুষঙ্গগুলির পিছনের রাস্তাগুলি আসলে নির্মিত হয় এমন এক বড় রাস্তার মোড়ে যেখান থেকে রাস্তাগুলি যাত্রা করেছে অচেতন এবং নিশ্চেতনের পানে। তাঁর কবিতায় সমস্ত দৃশ্যপ্রপঞ্চের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে অতি গভীর অন্তনিহিত অর্থ, যা অনেকক্ষেত্রেই বহুমাত্রিক। এই কবিতাটিতেও প্রকৃতির রূপকল্পগুলি আসলে বাঙ্কারের উপর চাপা দেওয়া ঘাস। তিনি চর্যাপদ থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এবং বাঙালির দীর্ঘ সময়ের লালিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ইতিহাসকে আত্মস্থ করেছিলেন নিমগ্ন সাহসে এবং পাশ্চাত্য শিল্প-সাহিত্য-দর্শন-নন্দনতত্ত্বের নানাবিধ অনুষঙ্গের অন্তর্গত নির্যাসও তিনি পান করেছেন সৃজনতেষ্টায় এবং তার সবটুকুই তিনি ঢেলে দিয়েছিলেন তাঁর কবিতাপাত্রে। ইউরোপীয় কবিতার নির্যাস ও শ্যামল মাটির কণ্ঠ মিশিয়ে তিনি এক কবিতা সংসারের গোড়াপত্তন করেছিলেন। সেই কবিতা সংসারের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র আমাদের আলোচ্য 'পাঁচিশ বছর পরে' কবিতাটির দু'টো স্তবকেই মানুষ ছাড়া কীট্-পতঙ্গ ও অন্যান্য minor জিনিসের উপস্থিতি লক্ষ্য করি। সমগ্র কবিতাতেই অসংখ্য

উত্তরাধুনিক উপাদান ছড়িয়ে দিয়েছেন কবি – 'চড়ুয়ের ভাঙা বাসা', 'পাখির ডিমের খোলা' কিংবা 'মাকড়ের ছেঁড়া জাল' প্রভৃতি আরও অনেক।

কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে এক অদ্ভুত পট পরিবর্তনের সামনে এসে দাঁড়ায় পাঠক। এতদিন পঁচিশ বছর পরে এক বিশেষ মুহূর্ত ফিরে পাওয়ার আশায় কথক দিন গুনেছেন। কিন্তু আজ তার প্রতীক্ষার অবসান হয়েছে। এই প্রতীক্ষা তার কাছে ছিল অমাবস্যার দিনে অন্ধকার ঘরে প্রজ্জ্বলিত একমাত্র প্রদীপের মতো – "আমারে যে জাগতে হবে, কী জানি সে আসবে কবে"(৯), পঁচিশ বছর কেটে যাওয়ার প্রত্যাশায় তিনি এতদিন জেগে আছেন একা –

> "পড়িল ঘুমায়ে
> কতো কেউ; রহিলাম জেগে
> আমি একা;"(১০)

জেগে ওঠা কষ্টকর, জেগে থাকা আরও কষ্টকর। চরম বিষাদ ও হতাশার মধ্যেও একধরণের আশাবাদ ও স্বপ্নের আলো ওকে জাগিয়ে রেখেছিল। কিন্তু পঁচিশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর তার একমাত্র প্রজ্জ্বলিত শিখাটিও নিভে যায়। ঝড়ের দম্‌কা হাওয়ায় একমাত্র প্রদীপটি নিভে গেলে যে রকম চাপ চাপ অন্ধকার নেমে আসে ঘরের ভিতরে, সেভাবেই আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরে ছিন্ন ধরে হতাশা, অবসাদ ও নৈরাশ্য। আর এই সর্বগ্রাসী ভীতিপ্রদ নৈরাশ্যই কবির মৃত্যুচেতনাকে প্রবলতর করে তোলে। জীবন ক্ষয়শীল ও পরিবর্তনশীল, মৃত্যুতে সবকিছুরই সমাপ্তি। এই আদিম বেদনা জীবনানন্দের কাব্যে আবর্তিত হয়েছে চিত্ররূপময়তার আড়ালে। মৃত্যু খুব প্রিয় বিষয় ছিল কবির। সেই কারণে মৃত্যুর মতো বিশাল বিলোপকারী চিন্তাকে ঘাস-লতাপাতা-জ্যোৎস্না-পাখির বাসা-পথ এমন অসংখ্য উপাদানের মাঝে টুকরো টুকরো করে মিশিয়ে দিলেন এই কবিতায় এমনভাবে যেন সরসরে ময়াল সাপের মতো মৃত্যুর ছায়া ঘুরে বেড়াচ্ছে পংক্তিতে পংক্তিতে যা পাঠককে স্তম্ভিত করে দেয়। মৃত্যুজনিত চিত্রণে আকর্ষণীয় প্রকৃতির ছবি এখানে –

> "হলদে তৃণ
> ভ'রে আছে মাঠে,
> পাতায়, শুকনো ডাঁটে
> ভাসিছে কুয়াশা
> দিকে-দিকে, চড়ুয়ের ভাঙা বাসা
> শিশিরে গিয়েছে ভিজে- পথের উপর
> পাখির ডিমের খোলা, ঠাণ্ডা– কড়্‌কড়্;"(১১)

-এর মতো শীতল শিহরণ জাগানো ক্যানভাসে আঁকা। আবার এই পরিবেশে ইঁদুর জ্যোৎস্নারাতে খুদ খেতে মাঠে মাঠে ঘোরে, পেঁচা ইঁদুর শিকার করতে মাঠের উপর

জ্যোৎস্নাস্নাত আকাশে ওড়ে, মনে হয় প্রকৃতি যেন এখানে আশ্চর্য পৈশাচিক হাসি হাসছে।

আসলে প্রকৃতি এখানে সবচেয়ে রহস্যময়ী অংশে বিধৃত। সেই রহস্যের চাবিকাঠি কেবল মৃত্যু যাপনে নয়, বরং প্রকৃতিতেই আছে জীবনের প্রকাশ। প্রকৃতি একাধারে এখানে নিষ্ঠুরতার, অপরপারে পেলবতার অনুষঙ্গে ঘোরাফেরা করে।

“হিম আকাশের গায়- ইঁদুর-পেঁচারা
ঘুরে যায় মাঠে মাঠে, খুদ খেয়ে ওদের পিপাসা আজো মেটে,”[১২]

“একদিন শুনেছ যে সুর–
ফুরায়েছে- পুরোনো তা- কোনো এক নতুন কিছুর
আছে প্রয়োজন,
তাই আমি আসিয়াছি, – আমার মতন
আর নাই কেউ।”[১৩]

মৃত্যুর(২২ অক্টোবর, ১৯৫৪) এত বছর পরে তিনি আজও এতটাই প্রাসঙ্গিক যে, তাঁর কবিতা আমাদের সময় ও প্রজন্মকে নতুন করে নাড়া দেয়। তাঁর কবিতা সেই টেক্সট, যা আজকের নতুন নতুন সাহিত্য-থিওরিতে আলোচনা করা সম্ভব এবং এভাবেই তাঁর কবিতার নতুন নতুন পাঠ তাঁকে আরও নতুনভাবে বৃহত্তর পাঠকের কাছাকাছি নিয়ে আসবে বলে আমাদের বিশ্বাস। তাঁর অনেক কবিতাই জটিল ও বিস্ময়কর। কবিতা বা যে-কোনো লেখনশিল্পই যখন টেক্সট, তখন তাঁর ভিতর বিশেষ কোনো অর্থ খোঁজার প্রচেষ্টা আজ বাতুলতা মাত্র। তিনি তাঁর কবিতাকে টেক্সট করে তুলতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর কবিকৃতি তাঁর সময়ের অন্য কবিদের মতো ম্রিয়মাণ হয়ে যয়নি বরং তাঁর কবিতার দ্বন্দ্ব-সংঘাত-বৈপরীত্য-জটিলতা পাঠককে আরও উৎসক করে তুলছে ক্রমাগত। জীবনানন্দের কবিতা communicate করে “before it is understood”,[১৪] তাই তাঁর অনেক কবিতারই কাব্যরস আস্বাদনের পরও তা আমাদের কাছে দুর্বোধ্য, রহস্যাবৃত থেকে যায়। “A poem should not mean but be”,[১৫] যা জীবনানন্দের কবিতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সত্য হয়ে দাঁড়ায়। কবিতা যে separate language এবং different subjects, সে-কথা বিবেচনায় রেখে নির্বিঘ্নে বলা যায়, তিনি একজন বড় মাপের কবি, আর সেসব গুণের অভাবেই “সকলেই কবি নয়; কেউ কেউ কবি;”।[১৬]

তাঁর কবিতার ভিন্ন ভিন্ন পাঠ ও আবিষ্কার আমাদের কাব্যপিপাসু মনকে নানাভাবেই তৃপ্ত করে – আর এই কারণেই আজকের আধুনিক-উত্তর সময়ের যে চাহিদা শিল্পের কাছে, কবিতার কাছে, তা জীবনানন্দে খুঁজে পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্র:

১. ঘোষ, শৈলেশ্বর। ২০১৭। 'জীবনানন্দ ও উত্তরকাল'। *এই সময় ও জীবনানন্দ*। সম্পাদক: শঙ্খ ঘোষ। কলকাতা। সাহিত্য অকাদেমি। পৃষ্ঠা: ২৮

২. দাশ, জীবনানন্দ। শ্রাবণ, ১৩২৩। *জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা। ভারবি। পৃষ্ঠা: ৩২

৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৩২-৩৩

৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৩২

৫. ঘোষ, শঙ্খ। আষাঢ়, ১৪০১। *কবিতা সংগ্রহ ১*। কলকাতা। দে'জ পাবলিশিং। পৃষ্ঠা: ২১৫

৬. বসু, বুদ্ধদেব। বৈশাখ, ১৪০৪। *কালের পুতুল*। কলকাতা। নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। পৃষ্ঠা: ২৮

৭. দাশ, জীবনানন্দ। শ্রাবণ, ১৩২৩। *জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা। ভারবি। পৃষ্ঠা: ৩২

৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৩৩

৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। কার্তিক, ১৪১২। *গীতবিতান*। কলকাতা। বিশ্বভারতী। পৃষ্ঠা: ৬৮

১০. দাশ, জীবনানন্দ। শ্রাবণ, ১৩২৩। *জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা। ভারবি। পৃষ্ঠা: ৩২

১১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৩৩

১২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৩৩

১৩. দাশ, জীবনানন্দ। ফাল্গুন, ১৩৬৩। *ধূসর পাণ্ডুলিপি*। কলকাতা। সিগনেট প্রেস। পৃষ্ঠা: ২২

১৪. https://codexterous.home.blog/2021/12/20/poetry-communicates-before-it is -understood.

১৫. https://www.poemhunter.com/poem/a-poem-should-not-mean-but-be/

১৬. দাশ, জীবনানন্দ। মে, ২০১৮। *কবিতার কথা*। কলকাতা। সিগনেট প্রেস। পৃষ্ঠা: ৯

জন সেবাব্রতী সুরেশচন্দ্র মিত্র (১৮৭২-১৯৪৩)

কৃষ্ণ কুমার সরকার
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
রাজা নরেন্দ্র লাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয় (স্বশাসিত)
গোপ প্রাঙ্গণ, পশ্চিম মেদিনীপুর

অনুচিন্তন: উনিশ শতক বাঙালি মনীষার জননকাল হিসেবে স্বীকৃত। এই পর্বেই বাঙালি মনীষার বিচ্ছুরণ সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করে বাংলার চিন্তা চেতনার জগতে এক নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল। বাংলাতে গোড়াপত্তন হয়েছিল নবজাগরণের। উনিশ শতকের নবজাগৃতির বিকাশে বাঙালি মনীষার অন্যতম কৃতি সন্তান হলেন সুরেশচন্দ্র মিত্র (১৮৭২-১৯৪৩)। তিনি অবিভক্ত বাংলার ঢাকাতে জন্মগ্রহণ (১৮৭২) করেছিলেন। এরপর শৈশব থেকে আমৃত্যু (১৯৪৩) পর্যন্ত তিনি পৈতৃক বাসস্থান গোবরডাঙাতে কাটিয়েছিলেন। তিনি চিকিৎসাবিদ্যায় বুৎপত্তি লাভ করে সারাজীবন দীন মানুষের সেবা করে গেছেন। ঔপনিবেশিক বাংলার প্রথম পর্বে গঠিত গোবরডাঙা পৌরসভার চেয়ারম্যান হিসবে জনপ্রতিনিধির দায়িত্বও তিনি সযত্নে পালন করেছিলেন। যমুনা নদী সংস্কারের সাথেও তিনি নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন। এককথায় গোবরডাঙা জনপদের বিবিধ উন্নয়ন কার্যের পুরোধা ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনিই। অথচ উপযুক্ত চর্চা ও চর্যার অভাবে বাঙালি জনমানস থেকে আজ তিনি বিস্মৃতপ্রায়। আলোচ্য প্রবন্ধে বিভিন্ন তথ্য ও উপাদানের সাহায্যে সুরেশচন্দ্র মিত্রের সেই বহুমুখী কর্মকাণ্ডের বিবরণ তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।
সূচক শব্দ: উনিশ শতক, বাঙালি মনীষা, গোবরডাঙা, সুরেশচন্দ্র মিত্র, ইত্যাদি।

বাংলা তথা পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রাচীন জনপদ গোবরডাঙা। উনিশ শতকের নবজাগৃতির দ্যুতি এখানেও প্রসারিত হয়েছিল কালের নিয়মেই। শিক্ষা, সংস্কৃতি, দেশপ্রেম, সমাজসেবা, সমাজসংস্কার ইত্যাদি সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রেই গোবরডাঙার রয়েছে বিশেষ খ্যাতি এবং ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্যবাহী গোবরডাঙার বহু বিশিষ্ট এবং কৃতী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছেন, যারা গোবরডাঙাকে গৌরবান্বিত করার সাথে সাথে বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি, ঐতিহ্যে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলেন। উনিশ শতকে এমনই একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন ডাক্তার সুরেশচন্দ্র মিত্র। তিনি ছিলেন একজন দরদি চিকিৎসক, দাতা, সমাজহিতৈষী, রাজনীতিক ও সুলেখক। গোবরডাঙার মানুষের কল্যাণ এবং গোবরডাঙার উন্নয়নের জন্য যাঁরা সদা সচেষ্ট ছিলেন সেই স্বল্প সংখ্যক প্রণম্য ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন তিনি।

গোবরডাঙার উন্নয়নে অগ্রগন্য ভূমিকা পালন করেছিলেন গৈপুরের বিখ্যাত মিত্র বংশ। এই বংশের সুসন্তান ছিলেন সুরেশচন্দ্র মিত্র। তাঁর পিতা রামচন্দ্র মিত্র ছিলেন ডাক বিভাগের সুপারিনটেণ্ডেন্ট। তিনি বিখ্যাত নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩), শালিগ্রাম সিংহ প্রমুখের সঙ্গে পূর্ববঙ্গ এবং আসাম ডাক বিভাগের প্রতিষ্ঠা এবং প্রচলনের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। এরকম সময় সুরেশচন্দ্র মিত্র ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন ৮ই আগস্ট, ১৮৭২ সালে।[১] জন্মের কিছুকাল পরে তিনি পিতা-মাতার সাথে গোবরডাঙার গৈপুর পৈতৃক বাড়িতে আসেন। স্বগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর ১৮৯০ সালে সুরেশচন্দ্র গোবরডাঙা হাই ইংলিশ স্কুল থেকে সাফল্যের সঙ্গে এন্ট্রাশ পাশ করেন। এরপর কলাকাতার সিটি কলেজ থেকে এফ.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়ার জন্য ভর্তি হন। ১৮৯৭ সালে ডাক্তারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এল. এম.এস. ডিগ্রি লাভ করে ঐ মেডিক্যাল কলেজেই 'প্লেগ ওয়ার্ডের হাউস ফিজিসিয়ান' হন।[২] এই সময় কলাকাতা প্লেগ রোগ মহামারির আকারে দেখা যায়। বহু লোক মারা যায়। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তার ক্যাপ্টেন ইভান্স এবং অ্যাসিট্যান্ট সার্জন ডাক্তার আনন্দমোহন সেন প্লেগ রোগে মারা যান। তবুও সুরেশচন্দ্র সেই সময় চাকরি না ছেড়ে সেখানে দক্ষতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে চিকিৎসাকার্যে রত থাকেন। এইভাবে বেশ কিছুকাল চাকরি করার পর পিতার আদেশে গ্রামের মানুষের সুচিকিৎসার স্বার্থে গোবরডাঙায় ফিরে এসে চিকিৎসক হিসবে নিজেকে যুক্ত করেন।

সুরেশচন্দ্র মূলত চিকিৎসার মাধ্যমে তাঁর এলাকায় সেবাব্রতে যুক্ত হন। সেইসময় গোবরডাঙা এবং ইছাপুর (গাইঘাটা থানা) ছাড়া বারাসাত-বসিরহাট-বনগাঁর মধ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে শিক্ষিত পাশ করা ডাক্তারের বেশ অভাব ছিল। গোবরডাঙায় তখন কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, খাঁটুয়ার অম্বিকাচরণ রক্ষিত, ইচ্ছাপুরের বেনীমাধব ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট চিকিৎসকগণ ছিলেন। এইসব প্রবীণ চিকিৎসকগণ নবীন চিকিৎসক সুরেশচন্দ্র মিত্রকে পরম সাদরে বরণ করে নেন। সুরেশচন্দ্রও প্রবীণ চিকিৎসকগণের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিনয় প্রকাশ করে চিকিৎসা কার্যে রত হন।

গোবরডাঙায় আসার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সুরেশচন্দ্র গোবরডাঙা জমিদারবাবুদের দ্বারা পরিচালিত 'সারদাপ্রসন্ন দাতব্য চিকিৎসালয়'-এ চিকিৎসক হিসেবে নির্বাচিত হন। দাতব্য চিকিৎসালয়ের চিকিৎসক হলেও তিনি প্রতিটা রোগীকে যত্ন ও নিষ্ঠার সহিত পরীক্ষা করে তবেই তাদের ঔষধ-পথ্য দিতেন। নির্দিষ্ট দিনে কোনো রোগীর চিকিৎসাকেন্দ্রে আসার কথা থাকলেও সেই রোগী না এলে তিনি সেই রোগীর অনুপস্থিততার কারণ সন্ধান করতেন। এর ফলে ডাক্তার হিসাবে তিনি জনপ্রিয়তার নিরিখে শিখরে অবস্থান করেছিলেন। গোবরডাঙার মুখোপাধ্যায় জমিদারবাবুরা তাকে গৃহ-চিকিৎসক নির্বাচন করেন। খাঁটুয়া-হায়দাদপুর অঞ্চলের

তাম্বুলিগণ তখন আর্থিক দিক থেকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ। এই তাম্বুলিরাও তাঁর চিকিৎসাগুণে ও ব্যবহারে তাঁকে আপন করে নেন।[৩]

গোবরডাঙার পাশাপাশি গ্রামগুলিতে সুরেশচন্দ্রের চিকিৎসার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। গয়েশপুর, মির্জাপুর, চারঘাট, চাঁদপুর, তেপুল, বিষ্ণুপুর, গাজনা, ইছাপুর, কেমিয়া, বায়সা, মল্লিকপুর, নাইগাছি, বেলেনি, নকপুল, মছলন্দপুর ইত্যাদি গ্রামে রোগী দেখার জন্য যেতেন এবং রোগীরাও প্রয়োজনে গোবরডাঙা আসতেন। ধীরে ধীরে এইসমস্ত এলাকায় তাঁর মাহাত্ম্য ছড়িয়ে পড়ে। এই সমস্ত অঞ্চলে মুসলমান সম্প্রদায়ের বড়ো অংশ সেইসময় অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা গ্রহণ করতেন না। কিন্তু সুরেশচন্দ্রের ব্যবহার এবং চিকিৎসার খ্যাতির কারণে তাঁরাও অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার দিকে আকৃষ্ট হন।

সাধারণ চিকিৎসার সাথে সাথে সুরেশচন্দ্র শল্য চিকিৎসা এবং ধাত্রীবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বহু জটিল রোগের কঠিন অস্ত্রোপচার তিনি খুব সহজে সফলভাবে রোগীর বাড়িতেই করতেন। এরকম বহু দৃষ্টান্ত গোবরডাঙা এলাকাতে ছড়িয়ে আছে। এখানে একটি দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে। গোবরডাঙার নিকট চাঁদপাড়ায় এক মুসলমান দম্পতির সদ্যোজাত শিশুকন্যার মলত্যাগের দ্বার সেভাবে না থাকায় শিশুকন্যার জীবন সংকট দেখা যায়। খবর পেয়েই তিনি সেই বাড়িতে গিয়ে শিশুকন্যাকে দেখেই রোগের স্বরূপ বুঝে কাল বিলম্ব না করে অতি শীঘ্রই অস্ত্রোপাচার করে শিশুকন্যাকে সুস্থ করে তোলেন। তিনি চিকিৎসার ফি বাবদ বেশি পারিশ্রমিক নিতেন না। অনেকসময় বিনাপারিশ্রমিকে জনহিতে কাজ করতেন।

চিকিৎসা বিদ্যা ছাড়াও সুরেশচন্দ্র পল্লিগ্রামে সংঘবদ্ধভাবে জনহিতকর কাজের সূচনা করেন। পল্লির উন্নতির জন্য ১৯০৬ সালে 'বান্ধব সমিতি' এবং 'পল্লি উন্নয়ন সমিতি' নামে দুটি সংস্থা গঠন করেন। বরিশালের খাদ্য সংকটে তিনি নগদ অর্থ এবং চাল ভিক্ষার দ্বারা সংগ্রহ করেন। এছাড়াও নাটক অভিনয়ের দ্বারাও অর্থ সংগ্রহ করে সেইসব অর্থ এবং চাল বরিশালে পাঠিয়েছিলেন।

'কুশদহ সমিতি'র তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন।[৪] বিশিষ্ট সমাজসেবী কুমুদবিহারী রায়ের সহযোগিতায় তিনি দুইবার কৃষি-শিল্প-স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর দ্বারা---কৃষি, শিল্প এবং স্বাস্থ্যের উন্নতির চেষ্টা করেন। সুরেশচন্দ্র মিত্র দীর্ঘদিন গোবরডাঙা পৌরসভার কমিশনার এবং ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন। ভাইস চেয়ারম্যান থাকাকালীন তিনি পৌরসভার অর্থ বাঁচিয়ে নাগরিকদের জলকষ্ট দূর করতে পৌরসভার নিজস্ব সংরক্ষিত দুটি পুকুর খনন করেছিলেন। তারমধ্যে একটি 'গড়পাড়া বিধান স্মৃতি সংঘ' ক্লাবের সংলগ্ন, যা আজও বিদ্যমান।[৫] তিনি 'অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট'র পদ লাভ করেও বহু জনহিতকর কাজ করেছেন। পৌরসভার দায়িত্ব পাওয়ার পর লক্ষ্য করেন গোবরডাঙা পৌর এলাকার জনসংখ্যা কমে যাচ্ছে। যেমন ১৮৯১ সালের জনগণনা অনুসারে গোবরডাঙার জনসংখ্যা ছিল ৬,৭৫৪ জন[৬], ১৯০১ সালে জনসংখ্যা ছিল

৫,৮৩১ জন[৭] এবং ১৯১১ সালে জনসংখ্যা ছিল ৫,০৭০ জন।[৮] অর্থাৎ ২০ বছরে গোবরডাঙার জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিবর্তে জনসংখ্যা কমেছে। এইভাবে জনসংখ্যা কমে যাওয়ার কারণ অনুসন্ধানে তিনি জানতে পারেন, বিভিন্ন রকম রোগ-ব্যাধির কারণে বহু মানুষ মারা গেছেন। আবার রোগ-ব্যধির ভয়ে অনেক পরিবার গোবরডাঙা ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাওয়ার কারণেও গোবরডাঙার জনসংখ্যা কমে গেছে। এবার রোগ-ব্যধির কারণ অনুসন্ধানে তিনি জানতে পারেন পার্শ্বস্থ যমুনা নদী মজে যাওয়ার জন্য এইসব রোগ-ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হয়েছে। এর প্রতিকারে যমুনা নদী সংস্কারের জন্য তিনি 'যমুনা নদী সংস্কার কমিটি' নামে একটি সংস্থা গড়ে তোলেন।[৯] তিনি নিজে ছিলেন ঐ কমিটির সম্পাদক এবং গিরিজাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ছিলেন সভাপতি।

১৯১২ সালের ২৮ এপ্রিল সুরেশচন্দ্র মিত্রের আহ্বানে গিরিজাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের জমিদারবাড়িতে যমুনা নদী সংস্কার বিষয়ক একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় সাপ্তাহিক বসুমতী পত্রিকার সম্পাদক শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়, 'কুশদহ' পত্রিকার সম্পাদক যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু, ডা. কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে যমুনা নদী সংস্কারের উপর গুরুত্ব দিয়ে বক্তব্য রাখেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন গিরিজাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন,

> "কাঁচড়াপাড়া স্টেশনের নিকট বাঘের খাল হইতে চারঘাটের নীচে টিপির মুখ পর্যন্ত এই যমুনা নদী বিস্তৃত ও ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৬মাইল। বাঘের খালটি একেবারে ভরাট হইয়া গিয়াছে এবং যমুনা নদীর স্থানে স্থানে মজিয়া গিয়াছে। কাজে কাজেই নদী ক্রমে স্রোতহীন ও শৈবালে পরিপূর্ণ হইতেছে। এই নদীই এক সময়ে আমাদের দেশের প্রধান জলাশয় ও পয়ঃপ্রণালী ছিল। এই স্বাভাবিক পয়ঃপ্রণালীর অবরোধে দেশ উৎসন্ন যাইতেছে। দূষিত ও মলিন জল ব্যবহারের নদীকূলবর্তী জনগণ কলেরা, রক্ত আমাশয় ও জ্বর প্রভৃতি রোগে অকালে উভয় তীরস্থ গ্রাম সমূহের জনসংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। যাহাতে নদী সংস্কার হয় ও সঙ্গে সঙ্গে দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি হয় তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া এ সময়ে আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য! এই নদী গঙ্গা হইতে বাহির হইয়া, নদীয়া, যশোহর ও ২৪ পরগণা জেলার ভিতর দিয়া ইচ্ছামতীতে পড়িতেছে। সুতরাং এই তিনটি জেলা বোর্ডের সহায়তা লইয়া এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে।"[১০]

এখানেই শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় যমুনা নদীর দুর্দশায় দেশের কি শোচনীয় অবস্থা হচ্ছে এবং নদী সংস্কার হলে দেশের কত সুখ সৌভাগ্য ফিরে আসবে তার বিশদ বর্ণনা দেন। তিনি লিখেছেন,

> "যমুনার শোচনীয় দশা দেখিয়া চক্ষু ফাটিয়া জল আইসে। নদী তো গিয়াছে, আর তার সঙ্গে সঙ্গের নদী তীরবাসীগণও যাইতে বসিয়াছে, নদী মজিয়াছে মানুষ মজিতেছে। কিন্তু মানুষ তো মেষ নহে। গড্ডালিকা প্রবাহে অঙ্গ ঢালিয়া চলা মানুষের সাজে না। প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া মানুষ চিরকালই আত্মসত্তা রক্ষা করিয়া আসিতেছে, ...। যাহাতে এই নদীর সংস্কার হয়, তাহার জন্য সকলেরই প্রাণপণে চেষ্টা করা কর্তব্য। এই প্রাবৃটে আমরা যে ঘরে ঘরে রোগশয্যা পাতিতেছি, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, রক্তামাশায়, আমাশয়, বিসূচিকা প্রভৃতি রোগে অকালে শমনসদনে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইতেছি, ইহাতেও যদি আমাদের চৈতন্য না হয়, তাহা হইলে আমাদের পিতৃপিতামহের আবাস-ভূমি এই জনপদগুলি মহাশ্মশানে পরিণত হইবে না কি?
>
> দেশের এইরূপ দুর্নিমিত্তের নিরাকরণ কল্পে সরকার বাহাদুর প্রজার হিতার্থেই 'স্যানিটারী ড্রেনেজ অ্যাক্ট' বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। এই আইন অনুসারে মৃতা নদীর সংস্কার সাধিত হইলে যে সমস্ত জনবাসীরা উপকৃত হইবেন, তাঁহাদিগকে বিঘা করা বার্ষিক অর্ধয়ানা বা এক আনা হারে কর দিতে হইবে—কিন্তু চিরকাল দিতে হইবে না, ত্রিশ বছর কাল দিলেই সমস্ত খরচা আদায় হইবে, সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে নদীটিও সংস্কৃত হইবে। নদীর সংস্কার হইলে জনপদবাসীর নষ্ট সুখসমৃদ্ধি পুনরাবির্ভুত হইবে।"[১১]

অতঃপর ইছাপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুশদহ সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু 'Sanitary Drainage Act' এর উপকারিতা সম্পর্কে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন।[১২] এরপর সুরেশচন্দ্র বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে যমুনা নদী সংস্কারের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে পত্র দেন। সুরেশচন্দ্রের পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ২৪ পরগনার ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড যমুনা নদী সমীক্ষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এজন্য ৬ লাখ টাকা খরচ হবে। এই খরচ তিনটি জেলা বোর্ড বহন করতে রাজি হয়। ১৯১৩ সালের মার্চ মাসে এই নদীর উভয় তীরের গ্রামবাসীরা সমবেত হয়ে তৎকালীন গভর্নর লর্ড কারমাইকেল বাহাদুরের নিকট 'স্যানিটারী ড্রেনেজ অ্যাক্ট' অনুসারে নদী সংস্কারের প্রার্থনা জানিয়ে আবেদনপত্র পাঠান। তবে এইসময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ায় যমুনা নদী সংস্কারের এই প্রচেষ্টা সফল হয় নি। এরপর ১৯১৮ সালের ১৮ই জানুয়ারী স্বয়ং গভর্ণর বাহাদুর তার প্রাইভেট সেক্রেটারী, চিপ ইঞ্জিনিয়ার ও স্যানিটারি ইঞ্জিনিয়ারকে সঙ্গে নিয়ে নদী পরিদর্শনে আসেন। ২৯শে জানুয়ারী গভর্ণর রোনাল্ডসে মহোদয় এক প্রকাশ্য সভায়[১৩] যমুনা নদী সংস্কারের কথা ব্যক্ত করে বলেন, "যমুনা

নদীর সংস্কার হইলে ঐ প্রদেশে ম্যালেরিয়ার দৌরাত্ম্য নিশ্চয়ই হ্রাস হইবে এই আশায় নদী সংস্কার করা হউক।”[১৪]

এই অনুযায়ী যমুনা নদী সংস্কারের কাজ বাংলার সেনিটারি কমিশনার বেন্টলি সাহেব ও সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার এডামস্ উইলিয়াম সাহেবের উপর ন্যস্ত হয়। তাঁরা দুজনে বিশেষ পরিশ্রম ও যত্ন সহকারের প্ল্যান ও এস্টিমেট প্রস্তুত করে সরকার বাহাদুরের নিকট পাঠান। সরকার সেটা মঞ্জুর করায় যমুনা নদী সংস্কারের কার্যারম্ভ হয়। সুরেশচন্দ্র মিত্র ‘যমুনা নদী সংস্কার’ প্রবন্ধে এবিষয়ে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করে লিখেছেন,

> “এই নদীর পঙ্কোদ্ধার হইলে নদীর নিকটবর্তী ৩২২.৫ বর্গমাইল পরিমিত ভূমির জল নিকাশ হইবে এবং সঙ্গে ঐ সকল স্থানের স্বাস্থ্যোন্নতিও হইবে। ম্যালেরিয়ার জীবানুবাহক অ্যানোফিলিস মশকের জন্মস্থান ও আবাসভূমি নষ্ট হইয়া ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কাটবে। তাই এই শুভয়ানুষ্টানের নাম ‘যমুনা অ্যান্টি ম্যালিরিয়াল স্কীম’ (Jaboona Anti Malarial Scheme) রাখা হইয়াছে।”[১৫]

সরকার যমুনা সংস্কারের জন্য ১লাখ ৫০ হাজার টাকা মঞ্জুর করেছিলেন। কিন্তু পরিকল্পনা মাফিক এর খরচের বাজেট ছিল ৯ লাখ ২৭ হাজার ৭১৫ টাকা। সরকারী ও স্থানীয় পৌর সভা ও জমিদারগণের অর্থানুকুল্যে শেষপর্যন্ত যমুনা নদী সংস্কারকার্য্য সফল হয়। যমুনার নদীর সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য সরকার দুজন ওভারসিয়ারকে নিযুক্ত করেন। তাঁদের গৃহ নির্মাণের জন্যও সরকার ৩৭০০টাকা মঞ্জুর করেছিলেন। এপ্রসঙ্গে ১৯১৮ সালের ১২ই ডিসেম্বর সুরেশচন্দ্র লিখছেন,

> “এতদিনে আমাদের প্রজারঞ্জক সদাশয় গভর্ণর লর্ড রোনাল্ডসে বাহাদুরের কৃপায় এদেশের একটি বিশেষ অভাব দূর হইল। এই অক্ষয় কীর্তির জন্য ঐ মহাপুরুষের পবিত্র নাম এ দেশবাসীর চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।”[১৬]

এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি তিনি দুঃস্থ মানুষের সেবার জন্য গোবরডাঙা এলাকায় একটি হাসপাতাল গড়ে তোলার প্রয়োজন অনুভব করেন। এই অনুযায়ী তিনি গৈপুর গ্রামে চিকিৎসাকেন্দ্র গড়ে তোলেন। নাম দেন The Lancet Pharmacy।[১৭] এই চিকিৎসাকেন্দ্র ছিল সাধারণ মানুষের ডাক্তারখান। নামমাত্র পারিশ্রমিক নিয়ে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিনা পারিশ্রমিকে তিনি মানুষের চিকিৎসায় নিজেকে ব্রতী রেখেছিলেন। এই সময়েই তিনি কোন কোন এলাকার মানুষ বেশি অসুস্থ হচ্ছে বা রোগের প্রকোপ বেশি ইত্যাদি বোঝার জন্য গোবরডাঙা পৌর এলাকার মানচিত্র অঙ্কনের ব্যবস্থা করেন।

জনহিতকর কাজের পাশাপাশি তিনি শিক্ষাক্ষেত্রেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। গোবরডাঙার জমিদার সারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এলাকার ছাত্রদের ইংরেজি

শিক্ষায় শিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে ১৮৫৬ সালের জানুয়ারী মাসে ‘গোবরডাঙা হাই ইংলিশ স্কুল’ নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি পেয়েও স্কুলটি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। অন্যদিকে পার্শ্ববর্তী খাঁটুরা মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়টিও ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়ে। এলাকার শিক্ষার স্বার্থে দুটি বিদ্যালয় একীকরণ করা প্রয়োজন হয়। এই কাজ সম্পন্ন করার জন্য ‘গোবরডাঙা-খাঁটুরা স্কুল অ্যামলগেমেশন কমিটি’ নামে একটি কমিটি গঠন করা হয়।[১৮] এই কমিটির সম্পাদক হিসেবে সুরেশচন্দ্র মিত্র এই কাজে সফল হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনক্রমে ১৯৩৫ সালে বিদ্যালয় দুটি একীকরণের সিদ্ধান্ত হয়। ১৯৩৬ সালের ১লা জানুয়ারী বিদ্যালয় দুটির একীকরণ সাধিত হয়। একীকরণের পর বিদ্যালয়টির নতুন নাম হয় ‘গোবরডাঙা খাঁটুরা উচ্চ বিদ্যালয়।’ প্রান্তিক এলাকায় শিক্ষার প্রসারে এই বিদ্যালয়ের অবদান অনস্বীকার্য। আজও এই বিদ্যালয় তার মহিমা বজায় রেখে চলেছে।

সৃজণাত্মক রচনা ও সৃষ্টিশীল কাজেও সুরেশচন্দ্র তৎকালীন সময়ে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সময় তাঁর সম্পাদনায় হাতে লেখা মাসিক পত্রিকা THE SCALP প্রকাশিত হয়।[১৯] এটি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে প্রকাশিত প্রথম হাতে লেখা পত্রিকা। সেইসময় পত্রিকাটি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ভারতবিখ্যাত চিকিৎসক তথা বাংলার রূপকার ডা. বিধানচন্দ্র রায় (১৮৮২-১৯৬২)ও ছাত্রাবস্থায় এই পত্রিকায় লেখা প্রকাশ করতেন। সুরেশচন্দ্র খুব সহজ ভাষায় এবং অল্প কথায় বক্তব্য প্রকাশ করতেন। কার্ত্তিক বসু সম্পাদিত *‘স্বাস্থ্য সমাচার* এবং *‘চিকিৎসা প্রকাশ* নামে আর একটি পত্রিকায় তাঁর বহু লেখা প্রকাশিত হয়েছে। পাশাপাশি *‘উদ্বোধন’*, *‘ব্রহ্মবিদ্যা* পত্রিকাতেও তাঁর রচনা প্রকাশিত হত। *‘স্বাস্থ্য সমাচার* পত্রিকার ভাদ্র, ১৩২১ (৩য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা) সংখ্যায় তাঁর একটি নিবন্ধের হদিস পাওয়া যায়। নিবন্ধটির নাম ‘বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়া জ্বর’। লেখাটি থেকে জানা যায় প্রাচীন গ্রিস দেশ এই রোগের উৎসভূমি। বঙ্গদেশে এই রোগের প্রকোপের সময়কাল নির্দিষ্ট করে বলা না গেলেও তিনি ১৮৩৮ সালের একটি ঘটনার কথা উল্লেখে করে লিখেছেন যে, উক্ত বছরে ৭০০ জন জেল কয়েদীকে ঢাকা থেকে যশোহরে স্থানান্তরিত করার পর একে একে সকলেই জ্বরে আক্রান্ত হয় এবং তার মধ্যে ১৫০ জনের মৃত্যু হয়। এই জ্বর ১৮২৫ সালে যশোহরে, ১৮৩৩ সাল থেকে ১৮৪০ এর মধ্যে গদখালি এবং ১৮৪৫ সালে বনগ্রাম, চাকদহ সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রতিকার প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন,

> “পয়ঃপ্রবাহগুলি সুসংস্কৃত অর্থাৎ অর্দ্ধমৃত নদনদীগুলিকে অপেক্ষাকৃত সুপ্রশস্ত ও স্রোতস্বিনী করা, ঘন জঙ্গল, মশাদের আবাসভূমি পরিষ্কৃত রাখা, তৎপক্ষে সকলেরই সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক।”[২০]

'কুশদহ' মাসিক পত্রিকাতেও তিনি অতিপ্রাঞ্জল পরিভাষায় অনেকগুলি প্রবন্ধ রচনা করেছেন।[২১] বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় রচিত প্রবন্ধ ছাড়াও তাঁর লেখনী সঞ্জাত একটি গ্রন্থ সেকালের পণ্ডিত সমাজে সমাদৃত হয়েছিল। গ্রন্থটির নাম 'তত্ত্ব কথা'। গ্রন্থটি তাঁর সুযোগ্য পুত্র প্রবোধ চন্দ্র মিত্রের (১৮৯৫-১৯৮২) 'বিষাণ' কার্যালয় থেকে ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।[২২] এই গ্রন্থে তিনি হিন্দু ধর্মের নানা জটিল দার্শনিক তত্ত্বগুলিকে সহজবোধ্য ভাষায় প্রকাশ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। গ্রন্থটির মুখবন্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় গুরুপ্রসন্ন শর্মা (ভট্টাচার্য) বেদান্তশাস্ত্রী মহোদয় লিখেছিলেন,

> "লেখক একজন অতি প্রাচীন ডাক্তার। সুতরাং ষট্ চক্র নির্ণয় প্রসঙ্গে আধুনিক দেহ বিজ্ঞানের ভাষায় তন্ত্রোক্ত দেহতত্ত্বের জটিল অংশগুলি অতি সরল ভাষায় বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।"[২৩]

কেবল দেহতত্ত্ব নয়, পৌরাণিক কাহিনীর মাধ্যমে সৃষ্টিতত্ত্ব ও অবতারবাদের বিভিন্ন ব্যখ্যা তিনি এখানে প্রদান করেছেন। গ্রন্থটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আজও পাঠকের কাছে বিদ্যমান।

জাতীয় আন্দোলনের প্রবাহ থেকেও তিনি নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেন নি। তিনি ছিলেন প্রকৃত দেশভক্ত। দেশ স্বাধীন হোক এটাই ছিল তাঁর মনোগত অভিলাষ। জনপ্রতিনিধি হয়ে এক্ষেত্রে তিনি কিছু ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিলেন বিভিন্ন সমিতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। তিনি নিজে স্বয়ং 'কুশদহ সমিতি'র সদস্য হিসেবে নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন। কুশদহ তথা গোবরডাঙার সর্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন করাই ছিল তাঁর জীবনের মূল ব্রত। সেই কাজেই তিনি আজীবন নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছিলেন। ১৯৪৩ সালের প্রথমদিকে তাঁর পরিবারে বিপর্যয় নেমে আসে। অল্প কয়েকদিনের ব্যবধানে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র, পুত্রবধু ও পৌত্রী মারা যায়। এই ঘটনায় তিনি প্রচণ্ড শোকাহত হন এবং অসুস্থ হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত ১৯৪৩ সালের ২৬ শে নভেম্বর গোবরডাঙার সেবাব্রতে নিযুক্ত এই কর্মবীর প্রয়াত হন।

সুরেশচন্দ্র মিত্রের জীবন ও কর্ম পর্যালোচনা করে কয়েকটি কথা বলা যেতে পারে। আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তিনি সমাজসেবায় নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি আজীবন দরিদ্র, দীন মানুষের উন্নতিকল্পে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। সুচিকিৎসার মাধ্যমে তিনি প্রান্তিক এলাকার জনগণের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। নিজ এলাকা তথা সমাজ সেবার জন্য তিনি সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অন্যত্র গমন করেননি। তাঁর চিন্তা চেতনার কেন্দ্র বিন্দুতে ছিল মানুষের স্বাস্থ্য। 'স্বাস্থ্যই সম্পদ' এই আপ্তবাক্যকে মান্যতা দিয়েই তিনি সমাজসেবায় নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন। সেই কারনে তিনি যমুনা নদী সংস্কারকাজেও যুক্ত হন এবং সফলতা অর্জন করেন। শিক্ষাপ্রসারেও তিনি সফল হয়েছিলেন। এসমস্ত কর্ম তিনি করেছিলেন ধর্মীয় ও জাত পাতের উর্ধে উঠেই। সার্বিক বিচারে তাই বলা যায় সুরেশচন্দ্র মিত্র ছিলেন উনিশ

শতকেরই একজন কৃতি সন্তান, যিনি তাঁর জীবদ্দশায় কখনও আদর্শ্যচ্যুত হননি। প্রকৃত অর্থে তিনি ছিলেন একজন আদর্শ 'সেবাব্রতী'।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ :

১. পবিত্রকুমার মুখোপাধ্যায়, 'আদর্শবাদী চিকিৎসক সমাজসেবী ডা.সুরেশচন্দ্র মিত্র' সুনীল বিশ্বাস ও দীপক কুমার দাঁ, *গোবরডাঙার তিন খ্যাতনাম সমাজ ব্যক্তিত্ব,* গোবরডাঙা: গোবরডাঙা গবেষণা পরিষৎ, ২০২২, পৃ. ১১।

২ . *তদেব,* পৃ. ১২।

৩. *তদেব।*

৪ . কুশদহ সমিতির প্রস্তাবনা। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন সুখেন্দু দাশ (সংকলিত ও সম্পাদিত), *কুশদহ: নির্বাচিত রচনা সংকলন,* গোবরডাঙা: গোবরডাঙা গবেষণা পরিষৎ, ২০১৮।

৫. গোবরডাঙা পৌরসভার প্রতিবেদন।

৬. *১৮৯১ সালের জনগণনা।*

৭. *১৯০১ সালের জনগণনা।*

৮. *১৯১১ সালের জনগণনা।*

৯. *কুশদহ পত্রিকা, ১৯১২।*

১০. *কুশদহ পত্রিকা, ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জৈষ্ঠ ১৩১৯।*

১১ . *কুশদহ পত্রিকা, ৪র্থ বর্ষ, .৫ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩১৯।*

১২. *কুশদহ পত্রিকা, ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জৈষ্ঠ ১৩১৯।*

১৩. এই সভায় ২৪ পরগনা, যশোহর ও নদীয়া জেলার বিশিষ্ট জমিদারগণ, জেলা বোর্ড সমূহের ও গোবরডাঙা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান সকলেই আমন্ত্রিত ও উপস্থিত ছিলেন।

১৪. সুরেশ চন্দ্র মিত্র, যমুনা নদী সংস্কার, *কুশদহ পত্রিকা, ১০ম বর্ষ, ৮-৯ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩২৫।*

১৫. *তদেব*।

১৬. *তদেব*।

১৭. *কুশদহ পত্রিকা, ৩ আষাঢ়, ১৩১৯।*

১৮. সুরেশচন্দ্র মিত্র ছাড়াও এই কমিটির মধ্যে ছিলেন কুমুদবিহারী রায়, কালিকাচরণ রক্ষিত, মধুসূদন রক্ষিত, কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী, চারুচন্দ্র পাল, রবীন্দ্রনাথ পাল, অমিয়নাথ বসু, কালিদাস রক্ষিত, দেবেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রবোধচন্দ্র মিত্র প্রমুখরা।

১৯ . সুখেন্দু দাশ, *ডা.সুরেশচন্দ্র মিত্রের লিখন চর্চা,* গোবরডাঙা: গোবরডাঙা গবেষণা পরিষৎ, ২০২২, পৃ.৩১।

২০. *'স্বাস্থ্য সমাচার' ৩য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩২১।*

২১. কুশদহ পত্রিকাতে ১৯১৪ সালে তিনি লেখেন গৈপুরের বিখ্যাত জমিদার সূর্য্যকুমারল গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৮৩৯-১৯০৭) জীবনী। এরপর ১৯১৫ সালে লেখেন 'সূর্য ঘড়ি' ও 'দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের পুনরভ্যুদয়', ১৯১৮ সালে লেখেন 'যমুনা নদী সংস্কার'নামক প্রবন্ধ।

২২. বিষাণ ছিল একটি সাময়িকপত্র। এটি প্রকাশ করতেন প্রবোধচন্দ্র মিত্র। তাঁরই প্রতিষ্ঠিত ভিনাস প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৫২/৭ বহুবাজার স্ট্রিট থেকে গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়েছিল, তখনই মূল্য ছিল আট আনা।

২৩. সুরেশচন্দ্র মিত্র, *তত্ত্ব কথা,* কলকাতা: ভিনাস প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৯৩৯।

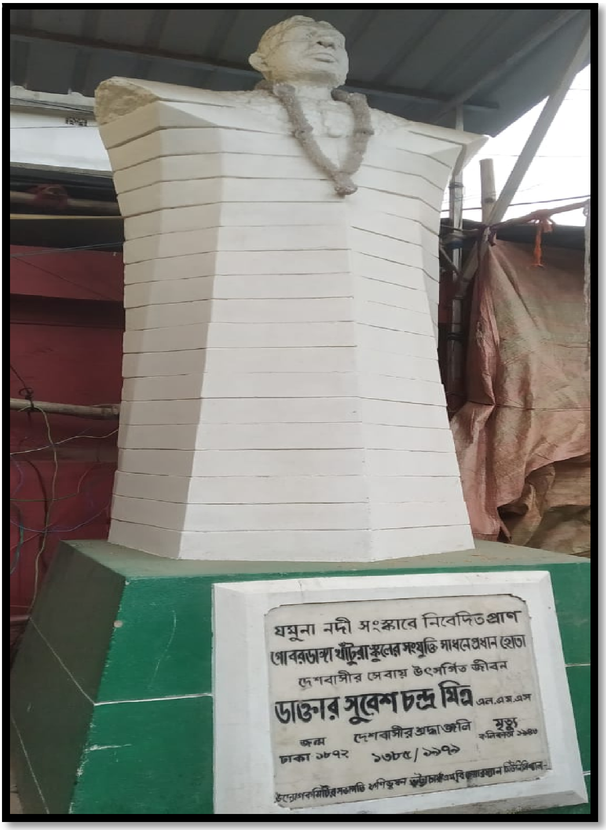

সূত্র: গোবরডাঙা বাজার থেকে লেখকের নিজস্ব সংগ্রহ (১৩. ০৮. ২০২২)।

প্রসঙ্গ বাংলা মঙ্গলকাব্যে শৈশব : কৃষ্ণ কেন্দ্রিক শৈশবের সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টি

আবুল হোসেন আনসারী
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া

সারসংক্ষেপ : মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বিশেষত মঙ্গলকাব্য ধারায় শিশুদের ‘শৈশব’ একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়। এই ধারার অধিকাংশ কবিই তাঁদের কাব্যে শিশুদের ‘শৈশব’ তুলে ধরতে গিয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত কৃষ্ণের বাল্যলীলার অনুসরণ করেছেন। মঙ্গলকাব্য, চৈতন্যজীবনী সাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য, পদাবলী সাহিত্য – প্রত্যেকটি সাহিত্য শাখাতেই ‘শৈশব’ বিষয়টি আলোকপাত করতে গিয়ে ভাগবতের অনুসঙ্গ গ্রহণ করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে ‘মঙ্গলকাব্য’ ক্ষেত্রটি বেছে নেওয়া হয়েছে। মঙ্গলকাব্য গুলিতে শিশুদের শৈশব কী ভাবে উঠে এসেছে, একই সঙ্গে শিশুদের আচরণ, তাদের গুণাবলী, খেলা, চারিত্রিক অবয়ব এবং তাদের দৈহিক গঠনের পশ্চাতে কীভাবে কৃষ্ণের বাল্যলীলার মহিমা জায়গা করে নিয়েছে, সেদিক গুলি এখানে তুলে ধরা হবে। তাছাড়া ভাগবতীয় কাহিনির সুরমূর্চ্ছনা মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত শিশুদের শৈশব আবেষ্টনটিকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে, সেদিক গুলিও এখানে আলোকপাত করা হবে। ‘চন্ডীমঙ্গল’ কাব্যে কালকেতুর দৈহিক অবয়বে কৃষ্ণের প্রভাব রয়েছে, অন্যদিকে ‘বণিক খন্ডে’ শ্রীমন্তের শৈশব ক্রীড়াতে মূলত কৃষ্ণের শৈশব ক্রীড়ার প্রভাব রয়েছে। তাছাড়া ধর্মমঙ্গল কাব্যে লাউসেনের শৈশব লীলা, কৃষ্ণলীলার আঙ্গিকে গঠিত – ইত্যাদি বিষয়গুলি আলোচ্য প্রবন্ধে তুলে ধরা হবে।

মূল আলোচনা :

প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল মঙ্গলকাব্যের ধারা। এই সাহিত্য শাখায় শিশুদের ‘শৈশব’ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মধ্যযুগীয় বাংলার একটি বিশিষ্ট শাখা চৈতন্যজীবনী সাহিত্যের হাত ধরে শিশুদের ‘শৈশব’ প্রসারতা লাভ করলেও তার ভীত নিহিত ছিল বহু পূর্বে অর্থাৎ প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে। বিশেষত গুপ্ত আমলের পরবর্তী অনুশাসন গুলিতে - ধর্মপালের ‘খালিমপুর শাসন’, বারাকপুরে পাওয়া বিজয়সেনের অনুশাসনে গণেশ-কার্তিকের শৈশব লীলার ছায়াপাত লক্ষ করা যায়। তাছাড়া বাংলা সাহিত্যের প্রথম লিখিত নিদর্শন চর্যাপদের মধ্যেও শবর বালিকার চিত্রটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষন করে। ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ থেকে শুরু করে পরবর্তী সময়ে রচিত ‘মঙ্গলকাব্য’, ‘জীবনী সাহিত্য’, ‘অনুবাদ সাহিত্য’, ‘পদাবলী সাহিত্যে’ শৈশবের বিস্তার আলাদা মাত্রা দান করেছে। তবে অধিকাংশ কবিরা তাঁদের কাব্যে

শিশুদের 'শৈশব' তুলে ধরতে গিয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত কৃষ্ণের বাল্যলীলার অনুসরণ করেছেন। পৌরাণিকরণের চেষ্টায় হোক বা সমকাল চেতনার পাশাপাশি মানুষের মনে ভক্তিভাবকে সজাগ রাখার অভিপ্রায়ে হোক 'কৃষ্ণ' প্রসঙ্গ বারবার উঠে এসেছে। আলোচ্য প্রবন্ধে 'মঙ্গলকাব্য' ক্ষেত্রটি বেছে নেওয়া হয়েছে।

'মনসামঙ্গল' থেকে শুরু করে 'ধর্ম্মমঙ্গল' প্রায় সর্বত্রই দেখা গিয়েছে শিশু চরিত্র গুলোর মধ্যে পৌরাণিকতার ছাপ স্পষ্ট এবং তা নানা ভাবে উঠে এসেছে। একটু লক্ষ করলেই আমরা স্পষ্ট ভাবে অনুধাবন করতে পারি সেখানে প্রথম থেকেই একটা পৌরাণিক অনুসঙ্গকে নিয়ে শিশু চরিত্র গুলোকে বড় করে তোলা হয়েছে অথচ সেটা করার কথা নয়। আসলে মঙ্গলকাব্য হচ্ছে লোকায়ত জীবনের কাহিনি, এখানে কেন পৌরাণিকতার ছাপ পড়বে ? আমরা জানি যে লোকায়ত জীবনের উপর লোকাতীত প্রভাব অর্থাৎ নিম্নবর্গের মানুষের আধিপত্য বিস্তারকে রুখে দেওয়ার জন্য সমাজের উচ্চশ্রেণির ব্রাক্ষ্মণ্য সমাজ পুরাণের সঙ্গে লোক জীবনের সংযোগ সেতুকে নিবিড় করার প্রয়াসে উঠে পড়ে লেগেছে, শুধু তাই নয় এই সংযোগ করতে গিয়ে অনেক সময় স্বাভাবিকতাও বিনষ্ট হয়েছে। অর্থাৎ চরিত্র গুলোর যে বেড়ে ওঠা বা গড়ে তোলা জীবন তাতে শৈশব থেকেই তাঁদের একেবারে অসাধারণ করে তোলা হয়েছে এবং তা বিচিত্র ভাবে উঠে এসেছে। কখনো রাম, কখনো কৃষ্ণ বা গোপালের ভূমিকায় তাঁদের আত্মপ্রকাশ। মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত শৈশবের বৈচিত্র্যে কীভাবে কৃষ্ণের বাল্যলীলার প্রবেশ ঘটেছে, মূলত কৃষ্ণের আচরণ, গুনাবলী, বিশেষ ক্রিয়া, দুঃসাহসিক/অতিসাহসিক ক্রিয়া, চারিত্রিক গঠন, দৈহিক অবয়ব – ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য গুলি কীভাবে মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত শিশুদের শৈশবের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে, তা নিম্নে আলোচনা করা হল।

১. আচরণ কেন্দ্রিক

শৈশব বেলায় শিশুদের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল 'আচরণ'। বাংলা মঙ্গলকাব্যে বিশেষত 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যে কালকেতু ও শ্রীমন্ত; 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে লাউসেন ও কর্পূর – এঁদের শৈশব কেন্দ্রিক বহু আচরণ শ্রীমদ্ভাগবতের কৃষ্ণের ছাঁচে ঢালা। চন্ডীমঙ্গল কাব্যের 'আখেটিক খণ্ডে' সেভাবে আলোচিত না হলেও বণিক খণ্ডে শ্রীমন্তের শিশু সুলভ আচরণে কৃষ্ণভাব প্রস্ফুটিত হয়েছে। যেমন ৩৮২ সংখ্যক পদে দেখা যায়, স্বামীর নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তনের কামনায় লহনা প্রতিদিন ভাগবত শ্রবণ করেন। সেই মুহূর্তে লহনার কোলে থাকা শ্রীমন্তের কর্ণগোচরেও কৃষ্ণকথার প্রবেশ ঘটেছে। এখান থেকেই শ্রীমন্তের মধ্যে কৃষ্ণপ্রেমের সঞ্চার প্রত্যক্ষ করা যায়। খেলার সঙ্গে সঙ্গে তার আচরণেও কৃষ্ণভাবের স্ফুরণ হয়েছে। কবির ভাষায় –

"বাছুর বালক তথা জিয়াইল শ্রীপতি
সব শিশু মেলিআ ভোজনে কৈল মতি।
এমন কৃষ্ণের লীলা করি অনুসার
শ্রীমন্ত খেলায় নিত্য মনে নাহি আর।"[১]

এ প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন – "বণিক-সভায় 'হরিবংশ কথা' পাঠ হয়, 'রামায়ণ-কথা'র বর্ণনা হয়,স্বামী শীঘ্র গৃহে ফিরুন এই কামনা করিয়া খুল্লনা প্রতিদিন ভাগবত শুনেন। শিশু শ্রীমন্ত এই জন্যই কৃষ্ণলীলার অনুরূপ লীলা প্রকাশ করিয়া থাকে।"[২] কৃষ্ণ যেরূপ দলবদ্ধভাবে ক্রীড়া করতেন এবং দল পরিচালনা বা দলে প্রতিনিধিত্ব করতেন। চন্ডীমঙ্গলকার শ্রীমন্তের আচরণে সেই ভাবমূর্তির ছবিকেই তুলে ধরেছেন -

"স্বাদে খায় দধিভাণ্ড উভারএ লয় ভান্ড
হাসি হাসি করএ ভোজন।
নগর্য্যা ছাওয়াল মেলে খায় নানা কুতুহলে
মধ্যদেশে বসিল শ্রীপতি।"[৩]

ভাগবতে বর্ণিত কৃষ্ণের শৈশব কেন্দ্রিক আচরণের বহিঃপ্রকাশ শ্রীমন্তের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। বলা যেতে পারে শ্রীমন্তের আচরণে যে দুরন্তপনার ছবি উঠে এসেছে তা পৌরাণিক কৃষ্ণের আঙ্গিকে রূপায়িত। কবি নিজেও ৩৮৬ সংখ্যক পদে বলেছেন - 'শ্রীমন্ত বড় দূরন্ত'। সাধারণত শৈশবে শিশুদের প্রকৃতি দূরন্তপনায় ভরপুর। কিন্তু শ্রীমন্তের দূরন্তপনা ঠিক কৃষ্ণেরই রূপান্তর।

ঘনরাম চক্রবর্তী তাঁর 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যেও লাউসেনের 'শৈশব' পৌরাণিক কৃষ্ণের আদলে নির্মাণ করেছেন। যদিও লাউসেনের জীবনে রামচন্দ্রের প্রভাবও বর্তমান। ধর্মমঙ্গলের কাহিনিতে দেখা যায় মহামদ প্রেরিত ইন্দা চোর এবং তার সহচরেরা যখন শিশু লাউসেনকে ময়না নগরে চুরি করতে প্রেরণ করেন সেখানে শিশুর আচরণ দেখে চোরেদের যা মনে হয়েছে সেখানেও কৃষ্ণের প্রভাব লক্ষ করা যায়। কবির ভাষায় -

"ঘর আলো করি শিশু খেলে কুতূহলে
কৃষ্ণের নন্দন যেন রুক্মিনীর কোলে।"[৪]

২. বিশেষ ক্রিয়া

মঙ্গলকাব্যে উল্লেখিত, শিশুদের শৈশবে যে সমস্ত ক্রিয়া বা কাজের কথা বলা হয়েছে সেখানেও কৃষ্ণের প্রভাব প্রকাশমুখর। যেমন - চন্ডীমঙ্গল কাব্যের 'বণিক খণ্ডে' দেখা যায়, শ্রীমন্তের বয়স যখন তিন বছর তখনি সে ভাগবত খেলায় অঙ্গীকারবদ্ধ। শৈশব থেকেই তার মনস্তত্ত্বে কৃষ্ণের মহিমা বিরাজিত যা তার বিভিন্ন ক্রিয়ার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। শ্রীমন্তের ক্রিয়া বিশেষ করে ভাগবতীয় অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে উঠে এসেছে। শ্রীমন্ত দলপতি, তাই তার দায়িত্ববোধ স্বাভাবিক ভাবেই বেশি। যেমন অভিনয়ের পর যে ভোজনের প্রয়োজন, এই বাস্তব জ্ঞান শুধুমাত্র শ্রীমন্তের মধ্যেই বর্তমান। কবির ভাষায় –

"বাছুর বালক তথা জিয়াইল বিনাশ
সব শিশু মেলিআ ভোজনে কৈল মতি।"[৫]

৩. বিশেষ দৈহিক অবয়ব

মঙ্গলকাব্যের কবিরা শিশুদের দৈহিক অবয়বের বর্ণনাতেও কৃষ্ণের শারীরিক গঠনের বহুল উপাদান পরিগ্রহণ করেছেন। কবিকঙ্কন কালকেতুর কথা প্রসঙ্গে যুক্ত করেছেন ভাগবতের কৃষ্ণরূপের অনুসঙ্গ – 'জিনি শ্যাম চামর কুন্তল।' এমনকি কৃষ্ণ যে রকম কানে কুন্ডল পরতেন ঠিক একই রকম কালকেতুও – 'কানে শোভে ফটিক কুন্ডল'। কৃষ্ণের শৈশবলীলায় দেখা যায় তিনি যেরূপ শক্তিধর ছিলেন, বণিক খন্ডে শ্রীমন্ত সম্পর্কে কবি বলেছেন – 'অভিনব জেন শক্তিধর'।

৪. শৈশব ক্রীড়া

চন্ডীমঙ্গল কাব্যের 'আখেটিক খন্ডে' কালকেতুর ক্রীড়া প্রসঙ্গে ভাগবতের কৃষ্ণলীলার প্রতিচ্ছবিটিকেই কবিকঙ্কন তুলে ধরেছেন। কবির ভাষায় –

"পরিধান বীরধড়ি মাথায় জালের দড়ি
শিশু মাঝে যেমন মন্ডল।"[৬]

অর্থাৎ আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না প্রথমত, কালকেতু ব্যাধ সন্তান তাই বীরত্ব তার স্বভাবজাত; এখানে কবির স্বকীয়তার পরিচয় ফুটে উঠেছে ঠিকই কিন্তু-- 'শিশু মাঝে যেমন মন্ডল' এই সংলাপে কৃষ্ণের শৈশবলীলার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। কৃষ্ণের ন্যায় কালকেতুও এখানে সমস্ত শিশুদের প্রধান হিসেবে বিবেচিত।

'বণিক খন্ডে' শ্রীমন্তের শৈশবক্রীড়া পুরোপুরি ভাগবত অনুসারী। আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন – শ্রীমন্তের শৈশব লীলা শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা এবং শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত-এর চৈতন্যদেবের বাল্যলীলার অনুযায়ী করিয়া রচিত হইয়াছে। বৈষ্ণব প্রভাববশত শ্রীমন্ত চরিত্রের এই অংশ রচনায় মুকুন্দরাম মৌলিকতা বিসর্জন দিয়া সম্পূর্ণ ভাবে ভাগবতকেই অনুসরণ করিয়াছেন।"৭ অন্যদিকে ঠিক একই কথা বলেছেন সমালোচক ক্ষেত্র গুপ্ত তাঁর 'কবি মুকুন্দরাম' গ্রন্থে বলেছেন – "ধনপতি-শ্রীপতির বাণিজ্য-কথায় শ্রীপতির বাল্যলীলার বর্ণনায় কৃষ্ণের কাহিণী আসেনি, শ্রীপতি স্বয়ং কৃষ্ণের সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছে। ভাগবতে কথিত কৃষ্ণের বাল্যক্রীড়া ও অসুর-সংহারের কথা এখানেও বলা হয়েছে, তবে নায়ক কৃষ্ণ নয়, শ্রীপতি।"[৮]

শ্রীমন্তের শৈশব ক্রীড়ার পরিচয় দিতে গিয়ে কবি সরাসরি কৃষ্ণের জায়গাতেই তাঁকে বসিয়ে দিয়েছেন। চন্ডীমঙ্গলকার বলেছেন -

"শিশুগণ করিমেলা করে ভাগবত খেলা
কৌতুকে শ্রীমন্ত সদাগর।"[৯]

ভাগবতে বর্ণিত কৃষ্ণলীলার সার্বিক পরিচয় শ্রীমন্তের খেলার মধ্যে উদ্ভাসিত হয়েছে। এখান থেকে আমরা সহজেই অনুধাবন করতে পারি, মুকুন্দ চক্রবর্তী একজন ভাগবতের দক্ষ পাঠক ছিলেন এবং সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর বিচরণ ছিল অবাধ। ভাগবতের কৃষ্ণলীলা এবং শ্রীমন্তের ভাগবত অনুসারী ক্রীড়ায় কবি যে ধারাবাহিকতা

রেখেছেন, বলা যেতে পারে সেখানে কৃষ্ণের মহিমাকে পুনরায় জনমানসে প্রচার করেছেন। পুতনা বধ, যশোদার বিশ্বরূপ দর্শন, উদখল, যমল অর্জুন প্রসঙ্গ, বৎসক অসুর বধ, বকাসুর, অঘাসুর বধ – প্রভৃতি ভাগবতীয় ঘটনা শ্রীমন্ত তার বন্ধুদের সঙ্গে অভিনয় করেণ। কবি তার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন -

"এমন কৃষ্ণের লীলা করি অনুসার
শ্রীমন্ত খেলায় নিত্য মনে নাহি আর।"[১০]

৫. দুঃসাহসিক, অতিসাহসিক ক্রিয়া

মঙ্গলকাব্যের কবিরা শিশুদের দুঃসাহসিক ও অতিসাহসিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত কৃষ্ণের দুঃসাহসিক কাজের পটভূমি গুলিকে কাজে লাগিয়েছেন। ভাগবতে বর্ণিত কৃষ্ণের দুঃসাহসিক কর্ম বলতে শৈশবে তার দ্বারা বিভিন্ন রাক্ষসের নিধন চিত্রগুলিই আমাদের স্মরণে আসে। কিন্তু, শৈশব বেলায় বিভিন্ন লীলা থেকে শুরু করে কালীয়দমনের মতো বিচিত্র ঘটনায় কৃষ্ণের অতিসাহসিকতার পরিচয়টি যেমন আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে ওঠে অনুরূপ ভাবে কালকেতু, শ্রীমন্ত ও লাউসেনের শৈশবেও এই ধরনের দুঃসাহসিকতার পরিচয় মেলে। এক্ষেত্রে মঙ্গলকাব্য গুলিতে শৈশব আরো বেশি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। শৈশবে শিশুদের এই দুঃসাহসিক/ অতিসাহসিক প্রবণতাগুলি জানান দেয় কৃষ্ণের বাল্যস্বরূপ কীভাবে চরিত্র গুলির মধ্যে উঠে এসেছে।

চন্ডীমঙ্গলের 'আখেটিক খন্ডে' কালকেতুর শৈশবে দুঃসাহসিক ক্রিয়া বলতে সাধারণত যে বিশয়গুলি উঠে আসে সেগুলি হল, সে বন্ধুদের নিয়ে হরিণ শিকারে যায়, এমনকি তার নিজের ছুটে চলা ঠিক হরিণের মতো। সে তাড়া করে সসারু ধরে। শৈশবে একটি শিশুর এ ধরণের ক্রিয়া তার দুঃসাহসিকতারই পরিচয় বহন করে। এই দুঃসাহসিকতার মাঝেই সে আবার কখনো অতিসাহসিক হয়ে ওঠে। কবির ভাষায় –

"লইয়া পাবড়া চেলা জার সনে করে খেলা
তার হয় জীবন সংশয়।"[১১]

একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে কৃষ্ণের শৈশব কালে তাঁর মধ্যে যে অতিলৌকিক বলের প্রাধান্য দেখা যায়, কালকেতুর মধ্যে তাঁর কিয়দংশ ছাপ পড়েছে।

বণিক খন্ডে শ্রীমন্তের মধ্যেও দুঃসাহসিকতার প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। বিশেষত কৃষ্ণের অনুরূপ ক্রীড়া করতে গিয়ে সে সমস্ত ঘটেছে। যেমন ভুবণ্যা ও কিরণ্যা দু'জন শ্রীমন্তের কারণে কানা হয়েছে, যাদব ও মাধব, বাসু, বান্যা খোড়া হয়েছে, গুণাকর দাস প্রাণে মারা গেছে। কবির ভাষায় –

"যাদব মাধব দুহার কি কব
বাসু বান্যা হইল খোড়া।
গুনাকর দাস তার প্রাণ শেষ
দু-চীর হইল মাথা।"[১২]

এ সমস্ত ক্রিয়া শিশুদের শৈশবে থাকা অনুচিত। বলা যেতে পারে ভাগবতে বর্ণিত কৃষ্ণলীলাক তুলে ধরার প্রয়াসে কবির এরূপ মনোভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে। তাছাড়া গুরুর সঙ্গে তর্কবিতর্কে শ্রীমন্তের মধ্যে কৃষ্ণবলের আধিক্য প্রধান রূপে দেখা দিয়েছে। সে বলেছে –

> "কৃষ্ণ-ইচ্ছা বিনা নাঞিঃ সমাধান
> হাসিয়া বলিল দ্বিজ সভা বিদ্যমান।"[১৩]

অর্থাৎ এই দুঃসাহসিক সিদ্ধান্তের পশ্চাতে পৌরাণিক কৃষ্ণের ভক্তিভাবকে কবি শ্রীমন্তের মেধার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন অন্যদিকে কৃষ্ণ নামের মহিমাকে জনসমাজে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলা মঙ্গলকাব্যের কবিরা কালকেতু, শ্রীমন্ত, লাউসেনের শৈশব বর্ণনা করতে গিয়ে একদিকে যেমন নিজস্ব প্রতিভাকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন, অন্যদিকে সেই শৈশবের নির্মাণকল্পে ভাগবতে বর্ণিত কৃষ্ণের বাল্যলীলাকে পরিগ্রহণ করেছেন। বিশেষ করে কৃষ্ণের আচরণ, বিভিন্ন ক্রিয়া, দৈহিক অবয়ব সমেত কৃষ্ণ স্বরূপের যাবতীয় গুণ চরিত্র গুলির মধ্যে তুলে ধরেছেন।

তথ্যসূত্র :

১. সুকুমার সেন, চন্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৫, ষষ্ট মুদ্রণ ২০১৩, পৃ. ২২০ (সম্পাদনা)

২. আশুতোষ ভট্রাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, সপ্তর্ষি, প্রথম প্রকাশ, মে ২০১৫, পৃ. ৪৩৬

৩. সুকুমার সেন, চন্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৫, ষষ্ট মুদ্রণ ২০১৩, পৃ. ২২০ (সম্পাদনা)

৪. পীযুষকান্তি মহাপাত্র, শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম সংস্করণ ১৯৬২, পুনর্মুদ্রণ ২০১২, পৃ. ১২৭

৫. সুকুমার সেন, চন্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৫, ষষ্ট মুদ্রণ ২০১৩, পৃ. ২২০ (সম্পাদনা)

৬. তদেব পৃ. ৪১

৭. আশুতোষ ভট্রাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, সপ্তর্ষি, প্রথম প্রকাশ, মে ২০১৫, পৃ. ৪৩৬

৮. সুখময় মুখোপাধ্যায়, চন্ডীমঙ্গল পরিক্রমা, প্রজ্ঞাবিকাশ, প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৪০৫, পৃষ্টা ৯০, (সম্পাদনা)

৯. সুকুমার সেন, চন্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৫, ষষ্ট মুদ্রণ ২০১৩, পৃ. ২২০ (সম্পাদনা)

১০. তদেব পৃ. ২২০

১১. তদেব পৃ. ৪১
১২. তদেব পৃ. ২২১
১৩. তদেব পৃ. ২২৩

সহায়ক গ্রন্থ

১. সচ্চিদানন্দ দাস, বাংলা সাহিত্যে পুরাণ ও পৌরাণিক কথাসাহিত্য, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা পুস্তক বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৫
২. উত্তম পুরকাইত, মঙ্গলকাব্য বাঙ্গালির পুরাণ ইতিহাস, ছোঁয়া, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০১৮
৩. অমলেন্দু মিত্র, রাঢের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর, ফর্মা কে এল মুখোপাধ্যায়, প্রথম সংস্করণ, ১৯৫৭
৪. বাসুদেব মোসেল, বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য, বিগ বুকস, প্রথম বিগ বুকস সংস্করণ, ২০১৯

রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় সমবায় ও গ্রামোন্নয়ন

জয়দীপ ঘোষাল
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
শিলিগুড়ি কলেজ

রবীন্দ্রনাথ পল্লী উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন ১৮৯৪ সালে। তখন তাঁর বয়স তেত্রিশ। আঠাশ বৎসর বয়সে জমিদারির দায়িত্ব গ্রহণ করবার পর তিনি শিলাইদহে সপরিবারে দিন কাটানো শুরু করেন। উড়িষ্যায় জমিদারি সফর ও শিলাইদহে জমিদারির কাজের সঙ্গে কুষ্টিয়ায় পাটের ব্যবসার কাজ শুরু হয়। পল্লী উন্নয়নের কাজে তাঁর ভাবনা ও কর্মকাণ্ড ছিল রোমান্টিক এবং গঠনমূলক। কোনো বিশেষ আইডিয়া বা ইন্সটিটিউশনের শিকলে তা বাঁধা পড়েনি, 'বিচিত্রের দূত' হয়েই অগ্রসর হয়েছেন এসব কাজে। জমিদার বিশেষত কবি মানুষ বলে নিন্দিত হয়েও তিনি জমিদারি বা পল্লী উন্নয়নের কাজ শুরু করেন।

গ্রামোন্নয়ন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার প্রথম সম্পূর্ণ প্রকাশ তাঁর 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধটি তিনি পাঠ করেছিলেন ১৯০৪-এ— অর্থাৎ ঐতিহাসিক স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হবার প্রায় এক বছর আগে।

এই প্রবন্ধটি রচনার তাৎক্ষণিক কারণ ছিল প্রদেশব্যাপী অনাবৃষ্টি ও জলকষ্ট, কিন্তু এর বিষয়বস্তু ছিল ব্যাপক এবং একটি স্বয়ংক্রিয় কার্যসূচির প্রস্তাবও এতে ছিল। জলকষ্ট নিবারণে সরকার কী কী পন্থা অবলম্বন করেছিলেন সে বিষয়ে একটি প্রচারপত্র প্রকাশ করা হয়েছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন স্বাবলম্বন। প্রবন্ধের সূচনাতেই তিনি লিখেছিলেন— "সুজলা সুফলা বঙ্গভূমি তৃষিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সে চাতক-পক্ষীর মতো ঊর্ধ্বের দিকে তাকাইয়া আছে— কর্তৃপক্ষীয়েরা জলবর্ষণের ব্যবস্থা না করিলে তাহার আর গতি নাই। গুরু গুরু মেঘগর্জন শুরু হইয়াছে— গভর্নমেন্ট সাড়া দিয়াছেন— তৃষ্ণা নিবারণের যা হয় একটা উপায় হয়তো হইবে—অতএব আমরা সেজন্য উদ্বেগ প্রকাশ করিতে বসি না। আমাদের চিন্তার বিষয় এই যে, পূর্বে আমাদের যে একটি ব্যবস্থা ছিল, যাহাতে সমাজ অত্যন্ত সহজ নিয়মে আপনার সমস্ত অভাব আপনিই মিটাইয়া লইত— দেশে তাহার কি লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে না।"[১]

এই প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল মহাত্মা গান্ধীর 'হিন্দ স্বরাজ' বইটি প্রকাশের চার বছর আগে। গান্ধী-অর্থনীতি তখনো ভারতে প্রচারিত হয়নি। অন্যদিকে মহাত্মা গান্ধীর পক্ষেও তখন রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজ' পড়া সম্ভব হত না। অথচ, এই ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর মূল আদর্শ প্রায় একরকম।

পল্লীর অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য কবির ভাবনা প্রধানত ছিল— মণ্ডলী প্রথা, সমবায় প্রথার প্রবর্তন, কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, উন্নত বিজ্ঞানের প্রয়োগ, কৃষি ও

কুটির শিল্পের উন্নতি সাধন। একদিকে স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলা অন্যদিকে পরনির্ভরশীলতার মতো মানসিক দৈন্য যা প্রাচীনকাল থেকে আমাদের সমাজে চালু আছে তাকে উৎপাটিত করে আত্মশক্তির বিকাশ ঘটানো— এই ছিল রবীন্দ্রনাথের আইডিয়া। ত্যাগ, সাধনা, প্রকৃতি প্রেম এবং মানব প্রেমের দ্বারা মানুষের শুভ কল্যাণ বোধকে জাগ্রত করতে পারলে এবং কয়েকটি বৈজ্ঞানিক কৌশলের প্রয়োগে কৃষির উন্নতি ঘটাতে পারলে আদর্শ গ্রাম তৈরি হবে এবং কয়েকটি আদর্শ গ্রাম আগামী ভারতবর্ষকে নতুন পথ দেখাবে— রবীন্দ্র পরিকল্পনার এই হল অন্তর্বস্তু।

সমবায়ের মাধ্যমে উৎপাদনের প্রতি তাঁর আগ্রহ অনেকখানি বেড়ে গেল ১৯৩০-এ রাশিয়া ভ্রমণে গিয়ে। সোভিয়েত রাষ্ট্রীয় চিন্তা, মার্কস-দর্শন ইত্যাদি নিয়ে তাঁর মনে অনেক প্রশ্ন ছিল, কিন্তু তিনি দেখেছিলেন যৌথ উদ্যোগে উৎপাদন করলে উৎপাদন পদ্ধতিকে আধুনিক করা যায়, উৎপাদন বাড়ানো যায় এবং আর্থিক অসাম্য কমানো যায়। আর্থিক সাম্য প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে লিখেছিলেন— "এখানে (রাশিয়ায়) এসে যেটা সবচেয়ে আমার চোখে ভালো লেগেছে, সে হচ্ছে ধন-গরিমায় ইতরতার সম্পূর্ণ তিরোভাব" এবং অন্যত্র, "যাদের হাতে ধন, যাদের হাতে ক্ষমতা, তাদের হাত থেকে নির্ধন ও অক্ষমেরা এই রাশিয়াতেই অসহ্য যন্ত্রণা বহন করেছে। দুই পক্ষের মধ্যে একান্ত অসাম্য অবশেষে প্রলয়ের মধ্যে দিয়ে এই রাশিয়াতেই তার প্রতিকার সাধনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত।"[২]

তিনি বুঝেছিলেন যে, রুশ সরকারের কর্মপন্থায় 'জবরদস্তির সীমা নেই'। এর রাজনৈতিক দিকটার আলোচনার স্থান এটা নয়, এখানে শুধু লক্ষ করা যায় যে, কৃষি উন্নতির বিষয়ে তাঁর নিজের ধারণা আর রাশিয়ার ঐকর্তৃক কৃষি-ব্যবস্থা তাঁর কাছে তুলনীয় মনে হয়েছিল। এবং রাশিয়া যাবার অনেক আগেই তিনি লিখেছিলেন— "যেখানে মূলধন ও মজুরির মধ্যে অত্যন্ত ভেদ আছে সেখানে ডিমক্র্যাসি পদে পদে প্রতিহত হতে বাধ্য। কেন না, সেখানে রাজপ্রতাপ সকল প্রজার মধ্যে সমানভাবে প্রবাহিত হতেই পারে না।"[৩] অর্থ অর্জনে এই ভেদ আছে লাভ আর মজুরির মধ্যে, ভেদ আছে শহরবাসী আর পল্লীবাসীর আয়ের মধ্যে।

পল্লীসমাজ ও তার অর্থনীতিকে ভেতর থেকে গড়ে তোলবার সাধনায় রত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, অন্যদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের লক্ষ ছিল গ্রামসমাজে স্বয়ম্বর অর্থনীতি যেন গড়ে না ওঠে সেদিকে সুতীক্ষ্ণ নজর রাখা। গ্রামের মানুষের সাথে জীবনযাপন ও মেলামেশার মাধ্যমে কবি পল্লীমানুষের মনস্তত্ত্ব আত্মস্থ করেছিলেন। পল্লীর শ্রীবৃদ্ধিতেই নগর সমৃদ্ধ হবে তাই পল্লীর অর্থনীতিকে স্বয়ম্বর করে তোলা দরকার। সমাজের চালিকাশক্তি সৃজনশীল মানুষের সম্মিলিত শক্তির মধ্যে নিহিত, তাই গড়ে তুলতে হবে এমন সমাজ ব্যবস্থা যা রাজনীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। মানুষের শুভ মঙ্গলবোধ হবে সেই শক্তি। ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা যে পল্লীসমাজ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছে এ নিয়ে কবির কোনো সংশয় ছিল না। রবীন্দ্রনাথ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেছেন যে,

পল্লীবাসীরা একত্রে মিললে অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন সম্ভব। জোট বাঁধা, অর্গানাইজেশন প্রভৃতির জন্য আহ্বান করেছেন পল্লীবাসীকে।

দারিদ্র্য মানুষের অসম্মিলনে, ধন তার সম্মিলনে। তাই সমবায়তত্ত্ব কবির কাছে একটা আইডিয়া— আচার নয়। বহু কর্মধারা এর থেকে সৃষ্ট হয়ে স্বয়ং অন্নপূর্ণা এ পথে ধরা দেবেন এই হল কবির অভিমত। দারিদ্র্য সম্পর্কে আমরা যে concept রবীন্দ্রনাথের কাছে পাই, তার ভাষা রাজনৈতিক নয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের রাজনৈতিক মতাদর্শ থেকে যে বৃহৎ ধারণা আমরা পাই তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দারিদ্র্য দূরীকরণ ভাবনার সাদৃশ্য চোখে পড়ে।

সুদখোর মহাজনদের কবল থেকে দরিদ্র কৃষকদের রক্ষার জন্য তিনি কৃষি ব্যাংক স্থাপন করেন প্রথমে কালীগ্রামে ও পরে শিলাইদহে। আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে প্রচুর টাকা আমানত হিসাবে সংগ্রহ করে তৈরি হয়েছিল কৃষি ব্যাংক। নোবেল প্রাইজের টাকাও তিনি সেখানে গচ্ছিত রেখেছিলেন। কৃষকরা ঋণ পেয়ে সাময়িক ভাবে উপকৃত হয়েছিল। কিন্তু সুপরিচালনার অভাবে ব্যাংক রক্ষা করা যায়নি।

কৃষিকাজে, কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্রশিল্প গড়ে তোলার কাজে নানাভাবে চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের পল্লী পুনর্গঠনের ধ্যান-ধারণায় যে দিকগুলি প্রাধান্য পেয়েছে তা হল— স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তুলতে হবে অথচ রাজনৈতিক ক্ষমতার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে না। স্নিগ্ধ সমাজ স্থিতির কথাও তিনি বলেছেন। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার থাকবে কিন্তু তা বেঁধে দিতে হবে। সম্মিলিত জনচেতনার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠবে আদর্শ সমাজব্যবস্থা। যার ভিত্তিমূল হবে সকল শ্রেণির মানুষের সহযোগিতা। শাশ্বত মানবিক মূল্যবোধই নিয়ন্ত্রণ করবে সমাজকে— অপর কোনো শক্তি নয়। কবি রবীন্দ্রনাথের সমাজভাবনার কেন্দ্রবিন্দু মানুষ— তিনি যথার্থভাবেই মানবদরদী।

সবশেষে শ্রীনিকেতন পরিকল্পনার কথা বলা যাক। ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থায় সমাজ কাঠামো নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। মার্কিন পুঁজির সাহায্য এসেছে বন্ধু এলমহার্স্টের বদান্যতায় ভারতীয় দর্শন ও সমাজভাবনাকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ এগোতে চাইছেন। সমস্ত পরিকল্পনায় এক ধরনের মিথ্যা আশার কুহক জড়িয়ে আছে। ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে দেশজ পল্লী উন্নয়নের কাঠামো গড়ে উঠবে এমন প্রত্যয় কি কখনো সিদ্ধ হয়? প্রচুর অর্থ জোগান দিতে পারে দেশের মানুষ যদি তারা পরিকল্পনায় বিশ্বাসী হয় এবং ন্যূনতম অর্থনৈতিক মান তাদের থাকে। এরকম উৎসাহ বা অর্থবল কোনোটাই এক্ষেত্রে দেখা যায়নি। এলমহার্স্টের মতো কৃষি বিশেষজ্ঞ বা অকৃত্রিম বন্ধু কিছু সময়ের জন্য কোনো পরিকল্পনাকে খানিকটা সফল করে তুলতে পারেন কিন্তু তার স্থায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। তাছাড়া রাজনীতি-অর্থনীতির মিশ্রণে সমাজ সংস্কারের যে মৌল বলয় গড়ে ওঠে তা ভেঙে অগ্রসর হওয়া যায় না। সুনির্দিষ্ট কয়েকটি গ্রামের সমাজশক্তিকে জাগ্রত করে স্বনির্ভর অর্থনীতির আদর্শ মডেল গড়ে

তোলা এবং তার দ্বারা সমগ্র দেশকে প্রভাবিত করা সম্ভব— এরকম ভাবপ্রবণ সমাজতত্ত্বকে এখানে স্থান দেওয়া হয়েছে রাজনীতির প্রশ্নটিকে এড়িয়ে গিয়ে।

রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক মতাদর্শের ওপর দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করেননি। পল্লী পুনর্গঠনের কাজে তাই সফল হননি। কিন্তু এক্ষেত্রে সাফল্যের চেয়ে প্রচেষ্টা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

পল্লীর চরিত্র আজ বদলাচ্ছে। পল্লী শহরের পোশাকে সজ্জিত হতে চাইছে এবং হচ্ছে। এই তো পল্লী উন্নয়ন নয়, পল্লীর উদ্ভট নগরায়ন। ফলে অনিবার্য হয়ে দেখা দিচ্ছে পল্লী ও প্রকৃতির নিঃশব্দ মৃত্যু। রবীন্দ্রনাথের আজকের এই বিপদ সম্পর্কেই আমাদের সচেতন করেছিলেন।

তথ্যসূত্র :

১. রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৬২, পৃ. ৬৮৩
২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাশিয়ার চিঠি, ১৯৩০, পৃ. ২৩, ১১৭
৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সমবায় নীতি, বিশ্বভারতী, ১৯২৮, পৃ. ১৭-১৮

সহায়ক গ্রন্থ :

১. চক্রবর্তী, নরেশচন্দ্র; শাহজাদপুরে রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশার্স।
২. সেনগুপ্ত, নন্দগোপাল; রবীন্দ্রনাথ ও সমাজ চিন্তা, কলকাতা, সাহিত্য প্রকাশ।
৩. মল্লিক, সুকুমার; রবীন্দ্রনাথের পল্লীচিন্তা, কলকাতা, নবপত্র।
৪. চৌধুরী, অমিতাভ; জমিদার রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী, ১৯৭৬।
৫. বসু, অরুণ কুমার (সম্পাদিত); রবীন্দ্র প্রসঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জানুয়ারি, ১৯৯৭।

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের গৈরিক পতাকা : দেশপ্রেম

সৈয়দ রাফিকা সুলতানা
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সংক্ষিপ্তসার: বাংলা নাট্যসাহিত্যের স্বতন্ত্র স্রোতেরঅভিমুখী নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সাংবাদিকতার পাশাপাশি নাট্যসাহিত্যে কলম ধরেছিলেন মূলত স্বদেশ ভাবনার প্রতিঅনুপ্রাণিত হয়ে। তার অজস্র ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে স্বদেশী ভাবনামূলক একটি উল্লেখযোগ্য নাটক হল 'গৈরিক পতাকা'। এই 'গৈরিক পতাকা' নাটকের মধ্যদিয়ে একদিকে তিনি যেমন হিন্দুবীর শিবাজীকেদক্ষ সংগঠক এবং বীরনায়ক হিসেবে তুলে ধরেছেন, অন্যদিকে ইতিহাসখ্যাত এই বীরের কাহিনি ব্যাখ্যা করে তৎকালীন স্বদেশী ভাবনায় অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছেন দেশের আপামর পরাধীন জনগণকে। মোঘল শাসনকালে (১৬৫৭—১৭০৭) শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠাদের যে শক্তিশালী সংঘর্ষ হয়তার ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে স্বীকার করেই তিনি ভাবনার দিক থেকে ইতিহাসকে অতিক্রম করে গেছেনআলোচ্য 'গৈরিক পতাকা' নাটকে। তিনি দেখাতে চেয়েছেন ভারতসম্রাট ঔরঙ্গজেবও কিভাবেশিবাজীর বীরত্তকে স্বীকার করেছেন। কিভাবে একটি জাতি শিবাজীর নেতৃত্বে সমগ্র ভারতবর্ষেজাতীয়তাবাদের বীজ বপন করেছিল তা এখানে তুলে ধরেছেন নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। আরএই ঐতিহাসিক কাহিনী কিভাবে তৎকালীন পরাধীন দেশবাসীর মনে বিশ্বাস জাগাতে সক্ষম হয়েছিল যে, ইংরেজদের পক্ষে লড়াই করে স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব, আলোচ্য প্রবন্ধে সেই বিষয়টি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

সূচকশব্দ: স্বদেশীভাবনা,সাংবাদিকতা, বীরনায়কশিবাজী, ভারতসম্রাটঔরঙ্গজেব, মারাঠা, রাজপুত, মহারাস্ট্র।

মূল বক্তব্য:

বাংলা নাট্যসাহিত্যের একজন স্বতন্ত্র ধারার নাট্যকার ছিলেন শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। মূলত বিংশ শতাব্দীর একজন উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক নাট্যকার হিসেবেই তিনি সর্বাধিক পরিচিত। তিনি নাট্য সাহিত্যে কলম ধরেছিলেন মূলত স্বদেশী ভাবনাই অনুপ্রাণিত হয়ে। সাংবাদিকতা তার পেশা হলেও স্বদেশী ভাবনাই উদ্বোধিত হয়ে তিনি নাটককে নেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সমাজের প্রতি নৈতিক দায়বদ্ধতা থেকেই নাটক রচনা করেছিলেন এবং সেই নাটকের মধ্যদিয়ে দেশের আপামর জনগণকে স্বদেশী ভাবনায় সক্রিয় করতে চেয়েছিলেন। তাই পূর্ববর্তী নাট্যকার

গিরিশচন্দ্র বা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাট্যভাবনা দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও তার নাটকের অভিমুখ ছিল ভিন্নতর।
ঐতিহাসিক নাটক রচনা করার ক্ষেত্রে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তার পূর্ববর্তী নাট্যকারদের থেকে অনেকটাই ভিন্নপথ অবলম্বন করেছেন। তিনি ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তারিখ ভাবনার ছায়াপথ ঘটেছে তার লিখিত ঐতিহাসিক নাটকেও। তার সমসাময়িক যে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ যা মূলত গতানুগতিক ধারায় চলছিল, সেখানে তিনি গতি সঞ্চার করেন। তার লিখিত প্রথম ঐতিহাসিক নাটক 'গৈরিক পতাকা'। 'গৈরিক পতাকা' নাটকের নিবেদন অংশে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত জানান–

> "মহারাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ছত্রপতি শিবাজীর স্মৃতি আজ তরুণ বাঙালীর প্রাণে যে প্রেরণা এনে দেয়, তাই অবলম্বন করে আমি গৈরিক পতাকা রচনা করলুম। ইতিহাস থেকে এর উপাদান নিয়ে ঐতিহাসিক ঘটনাও সংস্থাপন করেছি- কিন্তু বাধ্য হয়ে ঐতিহাসিক পাত্র পাত্রীদের সকল নাম গ্রহণ করতে পারিনি,-কল্পিত চরিত্রের অবতারণাও করেছি।"[১]

'গৈরিক পতাকা' শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের লিখিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক। মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাসের মুঘল সম্রাটঔরঙ্গজেব এবং মারাঠা সেনা নায়ক শিবাজীর দ্বন্দ্বের ঘটনাই এই নাটকের কাহিনিবৃত্ত জুড়ে অবস্থান করেআছে। এই কাহিনীর উপর ভিত্তি করে ২০ শে আষাঢ় ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে (১৯৩০) 'গৈরিক পতাকা' নাটকটি লিখিত হয়। তিনি অতীতের বীরদের চরিত্র অঙ্কন করে তাদের মধ্যদিয়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে গতি আনতে চেয়েছিলেন। ভারতবর্ষের পরাধীনতা মোচনের সংকল্পে ঐতিহাসিক নাটককে তিনি হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। দেশ ও জাতির প্রয়োজনে তিনি বাংলা নাটকে আধুনিক ধারার পাশাপাশি এই ট্র্যাডিশনকে বজায় রেখেছিলেন। তাঁর প্রথম ঐতিহাসিক নাটক 'গৈরিক পতাকা'তেও তিনি এই ট্র্যাডিশনকে বজায় রেখেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি রচনা করেছিলেন ঐতিহাসিক নাটক।

ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে (১৬৫৭-১৭০৭) মারাঠারা আবার শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই ঔরঙ্গজেব ও মারাঠাদের সংঘর্ষের কাহিনি এই নাটকের কেন্দ্রবিন্দু। মারাঠা জাতির অভূত্থান ঘটে শিবাজীর নেতৃত্বে। পুনের নিকটে শিবনেরি পার্বত্য দুর্গে ১৬২৭ খ্রী: ১০ই এপ্রিল শিবাজীর জন্ম হয়। শিবাজীর পিতা ছিলেন শাহজী ভোঁসলে, মাতা ছিলেন জিজাবাঈ। শিবাজীর পিতা শাহজী প্রথমে আহমদনগরের অধীনে ও পরে বিজাপুরের অধীনে ক্ষমতাশালী জায়গীরদার ছিলেন। শিবাজী তার জীবনে মায়ের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। জিজাবাঈ তার পুত্রকে মহাভারত, রামায়ণের কাহিনি ও ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে মুখে মুখে শিক্ষাদেন। মায়ের প্রেরণা শিবাজীকে আজীবন অনুপ্রাণিত করে। দাদাজী কোণ্ডদেবও শিবাজীকে অস্ত্রচালনা, অশ্বারোহন প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেন। ১৬৪৭ থেকে

১৬৫২ এই ছয় বছর তিনি সেনা সংগঠন ও মারাঠা সর্দারদের উপর আধিপত্য স্থাপন করেন। এইভাবে তিনি তার রাজনৈতিক ক্ষমতার ভিত্তি তৈরি করেন। ১৬৫৩ থেকে ১৬৬২ খ্রিস্টাব্দ এই দশ বছর কাল তিনি মারাঠা জাতীয়তাবাদকে দৃঢ় করেন এবং প্রতিবেশী বিজাপুরের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হন। এই সময় তার রাজ্যসীমা বাড়তে থাকে। শিবাজী যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন তারা হলেন মুঘলশক্তি। শিবাজীকে তাঁর রাজ্যস্থাপন করার জন্যে স্থানীয় হিন্দু অধিবাসীদের সমর্থন জোগাড় করতে হয়। তাকে হিন্দুধর্মের স্বপক্ষে দাঁড়াতে হয়। শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার ও হিন্দুধর্মের রক্ষা তার রাজ্যবিস্তার নীতির মুদ্রার দুই পিঠে পরিণত হয়। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি সম্পন্ন করা যায় না, এ কথা তিনি বুঝতে পারেন। শিবাজী সর্বপ্রথম বিজাপুর সুলতানের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালান। এই সময় বিজাপুরের সুলতানি শাসন দুর্বল হয়ে পড়েছিল। শিবাজী সেই সুযোগে (১৬৪৭ খ্রী) তোরনা দুর্গ অধিকার করেন। তোরনার নিকটে তিনি রাজগড় নামে একটা দুর্গ তৈরি করেন। তিনি বিজাপুরের কোডলা দুর্গটিও অধিকার করেন। বিজাপুরের সুলতান শিবাজীকে দমনের জন্য শিবাজীর পিতা শাহজীকে জিঙ্গি দুর্গে বন্দী করেন। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তার 'গৈরিক পতাকা' নাটকে এই সময়ে সংলাপ নির্মাণ করেছেন এভাবে –

> "আদিল শাহ। শাহজী, আমাদের বাধ্য হয়ে আপনাকে বন্দী করতে হয়েছে। আপনার পুত্র আমাদের রাজ্য আক্রমণ করে আমাদের একাধিক দূর্গ অধিকার করেছে। আমাদের বিশ্বাস আপনি আপনার পুত্রকে এই রাজদ্রোহিতা থেকে নিরস্ত করবার কোন চেষ্টাই করেননি।
>
> ....
>
> শাহজী । জাহাঁপনা! পিতার কোন কর্তব্য কখনো আমি পালন করিনি। বিগত দ্বাদশ বর্ষকাল পরিবারের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই আমি রাখিনি। নিজের চেষ্টায় পুত্র আমার কৃতিত্ব অর্জন করেছে। সমগ্র মারাঠার গৌরবের পাত্র হয়ে উঠেছে। আর এখন কোন অধিকারে আমি তাকে বলব তার আদর্শ ত্যাগ করতে?"[২]

ইতিহাসের ঘটনা অনুযায়ী শিবাজী তারপর পুরন্দর দুর্গ আধিকার করেন। চন্দ্ররাও মোরে নামে বিজাপুরের এক সামন্তকে নিহত করে তিনি জাবলি বা সাঁতরা জেলা ও কোঙ্কনের কিছু অংশ অধিকার করেন। জাবলী বা সাঁতরা অধিকারের পর শিবাজী এই স্থানে প্রতাপগড় দুর্গ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৬৫৬ খ্রী: রায়গড় দুর্গ অধিকার করেন। এই দুর্গে শিবাজীর রাজধানী স্থাপিত হয়। ১৬৫৬ খ্রী: বিজাপুরের সুলতান মহাম্মদ আদিল শাহের মৃত্যু হয়। এরপর বিজাপুর শাসনে দুর্বলতা দেখা দেয়। বিজাপুর অধিকার করেন ঔরঙ্গজেব। বিজাপুরের সঙ্গে তার সন্ধি স্থাপিত হয়। সম্রাটেরএই অনুপস্থিতির সুযোগে শিবাজী উত্তরে কোঙ্কন জয় করেন। শিবাজীকে দমনের জন্য বিজাপুরের সুলতানের নির্দেশে বিখ্যাত সেনাপতি আফজল খাঁ দশ হাজার

সেনা কামান সহ শিবাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। আফজল খাঁ শিবাজীর রাজ্যের কিছু অংশ লুট করে শিবাজীকে কোনঠাসা করেন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারেন যে, শিবাজী ভিন্ন কায়দায় লড়াই করছেন। সহজে তাকে দমানো যাবে না। এজন্য আফজল খাঁ, আপোষ মীমাংসার ছল করে শিবাজিকে শিবিরে ডেকে এনে হত্যা করার চক্রান্ত করেন। তিনি কৃষ্ণাজী ভাস্কর নামে এক ব্রাহ্মণকে দূত হিসেবে শিবাজীর কাছে পাঠান। এই দূতের কাছে শিবাজী আফজল খাঁর গোপন অভিসন্ধির কথা জানতে পারেন। শিবাজী তারপর নিজের দেহকে লোহার জালে আচ্ছাদন করেন। বাম হাতের আঙুলে ধারালো বাঘনখ নামে অস্ত্র ও ডান হাতে আস্তিনে বিছুয়া নিয়ে আফজল খাঁ-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। আফজল খাঁ শিবাজীকে আক্রমণ করলে শিবাজীর প্রতি আক্রমণে আফজাল খাঁ মারা যায়। বিজাপুর এরপর শিবাজীর প্রভুত্ব মানতে বাধ্য হয়। শিবাজীর এই সামরিক শক্তি বৃদ্ধির কথা ঔরঙ্গজেবের কানে পৌঁছায়। ঔরঙ্গজেব শিবাজীকে দমনের জন্য শায়েস্তা খাঁকে নিয়োগ করেন। শায়েস্তা খাঁ বিভিন্ন স্থান থেকে মারাঠাদের বিতাড়িত করেন এবং পুনায় তার প্রধান শিবির বানান। রাজপুত রাজা যশবন্ত সিংহ দশ হাজার সৈন্যবাহিনী নিয়ে শায়েস্তার সঙ্গে যোগদান করেন। উভয়ের শক্তির কাছে শিবাজী কিছুটা পরাহত হয়ে পড়েন। সুসজ্জিত মুঘল বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে জয়লাভ করা অসম্ভব ভেবে শিবাজী সেনার মনোবল ধ্বংসের পরিকল্পনা করেন। রাতের অন্ধকারে অতর্কিতে হানা দেন শায়েস্তা খাঁর শিবিরে। তার এই অতর্কিত আক্রমণে শায়েস্তাখাঁ-র একটি আঙ্গুল কাটা যায় এবং তার পুত্র মারা যায়। এরপর ঔরঙ্গজেব তার সেনাপতি জয় সিংহকে দক্ষিণের সুবাদার রূপে নিযুক্ত করেন। জয়সিংহ পরিকল্পনা করেন শিবাজীকে আত্মসমর্পণ করানোর। নাটকের জয়সিংহ ও দিলীর খাঁ-এর কথোপকথনে এটি স্পষ্ট –

> "জয়সিংহ । দাক্ষিণাত্যের শক্তিমান সকল সরদারের কাছেই আমি দূত পাঠিয়েছিলাম তারা ফিরে এসে আমায় জানিয়েছে যে শিবাজীর বিরুদ্ধে যারই কোন অভিযোগ আছে, সেই-ই আমাদের সহায়তা করবে। আফজাল খাঁর পুত্র ফাজল খাঁ পিতৃ-হত্যার প্রতিশোধ নেবে বলে আমাদের পতাকা তলে এসে সমবেত হয়েছে। ....
>
> দিলীর । মহারাজ !একটি কথা কিন্তু আমার মনে হচ্ছে।
>
> জয়সিংহ । কি দিলীর?
>
> দিলীর । মহারাজ জয়সিংহ যদি না এই অভিযানের নেতৃত্ব করতেন, তাহলে এমন ষড়যন্ত্র এত চাতুরি করে কেউ শিবাজীকে পরাজিত করতে পারত না –
>
> অথচ আশ্চর্য এই যে মহারাজের বিশ্বাস হিন্দুর মাটির প্রতি তার অন্তরের টান রয়েছে!

জয়সিংহ । তাও দিলীর, ও আলোচনার আর অবসর নেই। পুরন্দরের আক্রমণের আয়োজন কর।

জয় সিংহ চলিয়া গেলেন

দিলীর । হিন্দু হয়ে হিন্দুর যে ক্ষতি তুমি করলে জয় সিংহ, পাঠান হয়েও দাসত্বের প্রতি অবিচারিত নিষ্ঠা নিয়েও আমি তা পারতাম না। হিন্দুরবংশে এমনই কুলাঙ্গার জন্মেছিল বলেই শ্রেষ্ঠ সভ্যতার উত্তরাধিকারী হয়েও সে আজ ক্রীতদাসেরই জীবন যাপন করছে। একটা প্রতাপ, একটা শিবাজী কত স্বজাতিদ্রোহীর সঙ্গে সংগ্রাম করবে?"[৩]

নাট্যকার ইতিহাসের তথ্যের সঙ্গে সংগতি রেখেই নাটক রচনা করেছেন। ইতিহাসের তথ্য অনুসরণ করলে আমরা জানতে পারি যে, শিবাজীকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে ঔরঙ্গজেব তার বিখ্যাত রাজপুত সেনাপতি জয়সিংহকে দক্ষিণে সহ সুবেদার নিয়োগ করেন। ঔরঙ্গজেবের এই সেনাপতি ছিলেন অত্যন্ত চতুর, সাহসী ও রণদক্ষ সেনাপতি। জয়সিংহকে সাহায্য করবার জন্য ঔরঙ্গজেব আরেক বিখ্যাত সেনাপতি দিলীর খাঁ-কে পাঠান। ফলে তার শক্তি বৃদ্ধি পায়। জয়সিংহ পরিকল্পনা করেন শিবাজীকে পরাজিত করার। তিনি কূটনীতির মাধ্যমে বিজাপুরকে শিবাজীর পক্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করেন। তিনি জায়গীর দেওয়ার লোভ দেখিয়ে কোন কোন মারাঠা সর্দারকে নিজের পক্ষে নিয়ে আসেন। জাঞ্জিবার সিদ্ধি ও ইউরোপীয় বণিকদের তিনি মুঘলের পক্ষ ভুক্ত করে শিবাজীর পালাবার পথ বন্ধ করে দেন। তিনি আফজাল খাঁ-র পুত্র ফজল খাঁ-কেও মুঘলের পক্ষোভুক্ত করেন। তিনি বর্ষা সমাগমের আগেই শিবাজীকে পরাজিত করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। জয়সিংহের রণ পরিকল্পনা ছিল মহারাষ্ট্রের পুনায় শিবাজীকে ঘিরে ফেলে তাকে পরাজিত করা। এজন্য তিনি বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের কাছ থেকে সেনা পরিকল্পনা ও রণপরিকল্পনার সমস্ত ক্ষমতা ব্যবহারের সম্মতি নেন। অন্য সমস্ত সেনাপতিদের তার আদেশ মানতে বাধ্য করেন। তারপর জয়সিংহ শিবাজীকে পুরন্দর দুর্গে অবরোধ করে ফেলেন এবং বাইরে থেকে এই দুর্গে আসার সমস্ত পথ বন্ধ করে দেন । মুঘল কামান দুর্গের উপর অবিরাম তোপ দেগে দুর্গের দেওয়াল ভেঙে ফেললে শিবাজী বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পণ করেন। এই সময় পুরন্দরের সন্ধির মাধ্যমে মুঘল ও শিবাজীর মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। এই সন্ধির মাধ্যমে –

১) শিবাজীমুঘল সম্রাটকে ২৩ টি দুর্গ ও বার্ষিক কুড়ি লক্ষ টাকা রাজস্বের জায়গা ছেড়ে দেন। ২) শিবাজীর হাতে থাকে ১২ টি দুর্গ ও ৫ লক্ষ টাকা আয়ের ভূমিখন্ড।৩)শিবাজী বাদশাহের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করেন। তার পুত্র সম্ভুজি মুঘল দরবারে পাঁচ হাজারী মনসবদারের পদে নিযুক্ত হবেন বলা হয়। ৪) বিজাপুরের বিরুদ্ধে মোঘলের আসন্ন যুদ্ধে শিবাজী ও মুঘলকে সাহায্য করতে অস্বীকার করেন।

তারপর জয়সিংহের পরামর্শে শিবাজী মুঘল রাজধানী আগ্রায় যান এবং ঔরঙ্গজেবের দরবারেপুত্র শম্ভুজি-র সাথে উপস্থিত হন। জয়সিংহ শিবাজীকে

সম্মানজনক শর্তের মাধ্যমে তার সঙ্গে আপোষ করার পরামর্শ দেন। ঔরঙ্গজেব জয়সিংহের এই পরামর্শ অগ্রাহ্য করেন। দরবারে ঔরঙ্গজেব তাকে ৫ হাজারী মনসবদারের সারিতে দাঁড়াতে আদেশ দিলে শিবাজী অপমানিত বোধ করে প্রতিবাদ করেন-

> “শিবাজী। এ নরকে খনকালও অপেক্ষা করবার ইচ্ছা আমার নেই । মোগলের এই দরবারে দাঁড়িয়েই আমি বলে যাচ্ছি কুমার, মহারাষ্ট্রে গিয়ে যে আগুন আমি জ্বেলে তুলব, তার লেলিহান শিখা দাক্ষিণাত্য থেকে দিল্লি অব্দি এক মহাপ্রলয়ের কালানল নিয়ে ছুটে এসে শাঠ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত মোগোলের এ বিশাল সাম্রাজ্য, মোঘলের আকাশস্পর্শী ঔদ্ধত্য, মোগোলের উদার্যবিহীন প্রভুত্ব, মোগলের ক্ষমতা দৃপ্ত কর্তৃত্ব- সর্বস্ব পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে দেবে! আপনারদের সম্রাট কে বলুন, তারই জন্য প্রস্তুত হতে।”[৪]

এই প্রতিক্রিয়ায় শিবাজী বন্দী হয় মোঘলদের হাতে।সম্রাটের আদেশে জয়পুর ভবনে শিবাজী ও তার পুত্র শম্ভুজিকে নজর বন্দী করা হয়। মীর বক্সি আমিন খান প্রচুর উপঢৌকন পেয়ে শিবাজীর পাহারা শিথিল করেন। জয় সিংহের পুত্র রাম সিংহ শিবাজীকে পালাতে সাহায্য করেন। শিবাজী কৌশলে রক্ষীদের নজির এড়িয়ে আগ্রা থেকে পুত্রসহ সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে দক্ষিণে পালিয়ে আসেন। ঔরঙ্গজেব তার প্রাথমিক ক্রোধ ত্যাগ করে শিবাজীর বিরুদ্ধে অভিযান না পাঠিয়ে নিরস্ত্র থাকেন। তিন বছর শিবাজী মোঘলের সাথে গঠিত সন্ধি রক্ষা করেন। তারপর তিনি পুনরায় মোঘলদের সাম্রাজ্য আক্রমণ ও লুটপাট আরম্ভ করেন। তিনি একে একে পুরন্দর, কল্যান, সিংহগড় প্রভৃতি দুর্গ গুলি মোগলের হাত থেকে উদ্ধার করেন। জিঞ্জি, ভেলোর, কর্ণাটকের কিছু অংশ তিনি অধিকার করেন ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দে শিবাজীর রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হয়। রায়গড়ে তিনি ‘ছত্রপতি’ উপাধি নিয়ে সিংহাসন আরোহন করেন।

‘গৈরিক পতাকা’ একটি সার্থক ঐতিহাসিক নাটক। মধ্যযুগের মোঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব ও শিবাজীর দ্বন্দ্বের ঘটনাকে অবলম্বন করে এই নাটকটি রচনা করেন। নাট্যকার এই নাটকটি তিনি নেতাজিকে উৎসর্গ করেছিলেন, কারণ এই নাটকের মধ্য দিয়ে তিনি নেতাজির মধ্যে দিয়ে সমগ্র জাতির প্রতি চেতনার বাণী বহন করে আনতে চেয়েছিলেন। পরাধীন ভারতবর্ষে শিবাজীকে তিনি দেশপ্রেমের প্রতীক রূপে গড়ে তুলেছিলেন-

> “শিবাজী । নবীন মারাঠা । তোমরা যদি না পারো মানুষ হতে, তাহলে মহারাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার জন্য এই এই যে অকাতরে প্রাণ বলি এ সবই ব্যর্থ হয়ে যাবে রনরাও। মহারাষ্ট্রের জন্য মরে মরে আমরা দেশকে শ্মশান করে রেখে যাব আর সেই শ্মশানের উপর নন্দন-কানন রচনা করবে তোমরা। তোমাদের কাজ সৃষ্টি, আত্ম বলিদান নয়।

তানাজী। আত্মবলি নায়, মহারাজ?
শিবাজী । কে তানাজি? হ্যাঁ বন্ধু, তোমার কাজ আত্মবলি। আমারও তাই- কিন্তু নবীন মারাঠীর কাজ তার চেয়ে কঠোর, তার চেয়ে মহৎ তানাজি। তাই তাদের আমি বাঁচিয়ে রাখতে চাই।
রওনারাও। কিন্তু দেশ যে বলি চাইছে মহারাজ!
শিবাজী । জননী রাক্ষসী নন রনরাও- তিনি যে কেবল রক্ত চান, এ কথা কখনো সত্য নয়। প্রয়োজন উপস্থিত হয় তাই মানুষ রক্তপাত করে। তাই করতে করতে যে মানুষ রক্ত লোলুপ হয়ে ওঠে, মানুষের সুর থেকে সে অনেক নিচেই নেমে পড়ে রণরাও।”[৫]

দেশ ও জাতির কল্যাণে নিবেদিত প্রাণ শিবাজীর এই কর্মময় জীবনী নাটকটির প্রধান কাহিনি। শিবাজীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসুর কর্মজীবনকে কোথাও কোথাও মিলিয়ে দিয়েছেন নাট্যকার। ইতিহাসের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে ও নাট্যকার ইতিহাসের তথ্যকে এককভাবে পরিবেশন করেননি। ঐতিহাসিক নাটক ইতিহাস ও নাটকের যে সহাবস্থান থাকে তাকেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন এই নাটকে। নিবেদন অংশে সে কথাই জানিয়েছেন পাঠককে –

> “মহারাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ছাত্রপতি শিবাজীর স্মৃতি আজ তরুণ বাঙালির প্রানে যে প্রেরণা এনে দেয়, তাই অবলম্বন করে আমি গৈরিক পতাকা রচনা করলুম। ইতিহাস থেকে এর উপাদান নিয়েছি, ঐতিহাসিক ঘটনাও সংস্থাপন করেছি, কিন্তু বাধ্য হয়ে ঐতিহাসিক পাত্র-পাত্রীদের সকল নাম গ্রহণ করতে পারেনি- কল্পিত চরিত্রের অবতারণাও করেছি।”[৬]

মোটকথা তিনি ইতিহাসের নীরস কাহিনিকেই মূলত নাটকে রূপদান করেছেন। কেবল কল্পিত চরিত্রের অবতারণা করেছেন, কিন্তু নাটকটি গভীরভাবে পাঠ করলে দেখতে পাই ঐতিহাসিক চরিত্রের পাশাপাশি অনৈতিহাসিক চরিত্র মূলত ইতিহাসেরই অনুগামীতা করেছে বলেই ইতিহাসই হয়ে উঠেছে এই নাটকের মূল উপাদান । যে নাটকে ইতিহাস ও মানব রস তুলনামূলক সহাবস্থান করে এবং মানবধর্মের বিজয়বার্তা ঘোষিত হয় তাকেই সাধারণভাবে ঐতিহাসিক নাটক বলা যেতে পারে। কল্পনা ও ইতিহাসের তুলনামূলক প্রয়োগ করে নাট্যকার এই নাটককে ঐতিহাসিক নাটকের সমস্ত শর্তই রক্ষা করেছেন সফলভাবে। নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ‘গৈরিক পতাকা’ নাটকে দেশপ্রেম সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করেছেন। পরাধীন ভারতবর্ষের দর্শকহৃদয়ে নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এক ভিন্ন স্থান অর্জন করেছিলেন এই ঐতিহাসিক নাটক রচনার মধ্যে দিয়ে।

তথ্যসূত্র:

১) শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, গৈরিক পতাকা, প্রবাসী প্রেস, ১২০/২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, নিবেদন অংশ

২) শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, গৈরিক পতাকা, প্রবাসী প্রেস, ১২০/২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা পৃষ্ঠা-২৬

৩) শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, গৈরিক পতাকা, প্রবাসী প্রেস, ১২০/২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা পৃষ্ঠা- ১৪২

৪) শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, গৈরিক পতাকা, প্রবাসী প্রেস, ১২০/২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা পৃষ্ঠা- ১৯৪

৫) শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, গৈরিক পতাকা, প্রবাসী প্রেস, ১২০/২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা পৃষ্ঠা- ১৪৯

৬) শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, গৈরিক পতাকা, প্রবাসী প্রেস, ১২০/২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, নিবেদন অংশ

সেকালের কাশিমবাজার বন্দর ও বাংলার অর্থনৈতিক-সংস্কৃতি : একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা

অরিন্দম মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
কৃষ্ণনাথ কলেজ, বহরমপুর

সারসংক্ষেপ : ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় বৃহৎ কিছু বন্দরের কথা উঠে এলেও ছোট, মাঝারি মানের অনেক বন্দরকাহিনী ও তার আর্থ-সাংস্কৃতিক ইতিহাস আজও অনালোকিত। অথচ ভারতবর্ষের নৌ-বাণিজ্যের ইতিহাসে এই বন্দরগুলি সঠিকভাবে উঠে এলে ভারতীয় সংস্কৃতিকে আরও বিশাল ব্যাপ্ত পটভূমিকায় দেখা সম্ভব হবে। বাংলার নৌবাণিজ্যের ইতিহাস সুপ্রাচীন। সুপ্রাচীন কাল থেকেই বাংলা জুড়ে ছিল ছোট-বড় মাঝারি ধরণের বিভিন্ন বন্দর। মোঘল সম্রাট শাহাজাহানের আমল থেকে বাংলার কাশিমবাজার বন্দর অর্থনৈতিক মানচিত্রে দৃঢ় জায়গা পায়। বাংলাদেশের ঢাকা থেকে রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর, দেশ-বিদেশের বণিকগোষ্ঠীর কাশিমবাজারে আগমন ও স্থায়ী বসবাস শুরু, পর্তুগীজ, ডাচ, ফরাসী ও ইংরেজ বণিকদের পদার্পণে কাশিমবাজার বন্দর ও এই অঞ্চলের অর্থনীতি সংস্কৃতি দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে মাত্র ৩ মাইল দূরে হওয়ায় এই বন্দরের মধ্য দিয়ে বাংলার নবাবের বাণিজ্য ও অর্থনীতি এবং বেসরকারি অর্থনীতি ও বাণিজ্যের চলাচল অত্যন্ত গতিশীল হয়ে পড়ে। ফলতঃ কাশিমবাজার তথা মুর্শিদাবাদের অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন হতে থাকে। তবে ২০০ বছরের মধ্যে ভাগীরথীর গতিপথ পরিবর্তন বন্দরকে মজিয়ে দিলে বাণিজ্য নগরীর রুগ্নতা বেরিয়ে আসে।
সূচক শব্দ : কাশিমবাজার, বন্দর, বাণিজ্য, দেশীয়, ইউরোপীয়, কুঠি, ব্যবসায়ী, নদী ।

মূল আলোচনা :

কাশিমবাজার বন্দরের উত্থান পতনের কাহিনী মাত্র ২০০ বছরের (১৬৩০-১৮১৩) সীমাবদ্ধ ইতিহাস হলেও বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার গণ্ডিকে টপকে দিল্লীর বাজারদরবারে অর্থনীতির পাশাপাশি ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের বাণিজ্যিক অর্থনীতি ও সংস্কৃতির একটি অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে পদ্মা থেকে জলঙ্গি পর্যন্ত ভাগীরথীর অংশ কাশিমবাজার নদী নামে পরিচিত ছিল।[১] মুকসুদাবাদ বা পরবর্তীকালে মুর্শিদাবাদ শহর পার হয়েই গঙ্গা নদী অশ্বক্ষুরাকৃতিতে প্রবাহিত হত। কাশিমবাজার নদীর এই অশ্বক্ষুরাকৃতি রূপ কাশিমবাজার বন্দর পত্তনের একমাত্র কারণ। অশ্বক্ষুরাকৃতি নদীর নিম্নভাগে কাশিমবাজার শহর নৌকাগুলিকে বন্দরের সুবিধা দিত। আর পদ্মা, ভাগীরথী ও জলঙ্গির মাঝে ত্রিকোণ ভূমিভাগ কাশিমবাজার দ্বীপ নামে

পরিচিত। বর্তমানে মুর্শিদাবাদের লোকেরা যাকে কাটিগঙ্গা বলে চেনেন সেটাই ভাগীরথীর প্রাচীন প্রবাহ।[২] আর উত্তরবাহিনী গঙ্গার উপকূলে কাশিমবাজার অবস্থিত। সপ্তদশ শতক থেকেই ব্যবসায়ী বাঙ্গালী, জৈন, বিহারি, গুজরাটি, মারোয়ারি, স্রফ, পার্শিগণ দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে কাশিমবাজারে সমবেত হয়েছিলেন। ফলে বিদেশি ইউরোপীয় বণিকগণও এখানে বসতি, কুঠি গড়তে দেরি করেন নি। নদীর পারে শ্রেষ্ঠ জায়গাটি দখল করেছিল ফরাসি বণিকগণ। কিছুদিনের মধ্যেই অঞ্চলটি ফরাসডাঙা রূপে পরিচিত হয়ে উঠল।[৩] মেজর রেনেল সাহেব কাশিমবাজার দ্বীপ নাম দিয়ে একটি মানচিত্র অঙ্কন করেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে উক্ত মানচিত্রে তিনি সৈদাবাদ-ফরাসডাঙ্গা থেকে কাশিমবাজারের নিম্ন দিয়ে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত ভাগীরথীর বক্রগতিই নদীর প্রবাহরূপে দেখিয়েছেন। তবে মুর্শিদাবাদ কাহিনীতে বলা হয়েছে সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে টাভারনিয়ে, বার্ণিয়ে কিন্তু কাশিমবাজারে আসতে পারে নি, কারণ কাশিমবাজার নদীর নাব্যতা তখনই ভীষণ কমে গিয়েছিল। ১৮৯২ খ্রিঃ এপ্রিল মাসে ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকাও কিন্তু বলছে ১৬৮৬ খ্রিঃ নদীয়া হতে মহুলা হয়ে হেজেস সাহেব কাশিমবাজার পৌঁছে যান জলপথ নয় স্থলপথ ধরে। [৪] প্রকৃত অর্থে সপ্তদশ শতকের শেষভাগে কাশিমবাজার নদী-বন্দরের অবস্থা খুব সঙ্গীন হয়েছিল, নাকি চঞ্চল ছিল – তা ঐতিহাসিক আলোচনার মধ্য দিয়ে আলোকিত হতে পারে।

ষোড়শ শতক জুড়ে কাশিমবাজার নদীকেন্দ্রিক বসতি যা ক্রমে একটি বড় জনপদে পরিণত হয়েছিল। এর পশ্চাতে ভাগীরথীর পশ্চাদভূমি যেমন কাজ করেছে, তেমনি কাশিমবাজার নদীর অবস্থান ও বন্দর নির্মাণের প্রাকৃতিক ভূমিরূপ জনপদকে আর্থিক-সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধি করেছে। উপরুন্তু মুর্শিদ কুলি খাঁর হাত ধরে দিল্লীর বাদশাহ অনুমতি ও সম্মতিতে বাংলাদেশের ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হয়েছিল। এই রাজনৈতিক, স্থানিক বিন্দুর জন্য সাধারণ মানুষ থেকে স্বচ্ছল, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মানুষের দলও মুর্শিদাবাদে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে।

কাশিমবাজারকে কেন্দ্র করে বাণিজ্য ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধির ফলে ফরাসীরা এসে কাশিমবাজারে শ্রেষ্ঠ স্থানটিকে নির্বাচন করে কুঠি নির্মাণ করে। ১৭৩৪ খ্রিঃ ফরাসী কুঠির সংস্কার করে ডুপ্লে সাহেব ফরাসী বাণিজ্যে নতুন জোয়ার আনেন। প্রতি বছর ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ৬০ হাজার পেটি সেরা রেশমি সুতো কিনতে শুরু করে এবং রপ্তানি করতে থাকে। এছাড়াও রেশম ও সুতো কাটার কাপড়, মোটা সুতি কাপড়ের থান প্রভৃতি বস্ত্রসামগ্রীও তারা কিনে রপ্তানি শুরু করেছিল। এই ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বিদেশ থেকে যে দ্রব্য সামগ্রীসহ আমদানি বাণিজ্য করত তা কাশিমবাজার বন্দরেই খালাস করা হত। ফরাসীরা চীন থেকে ফিটকারী, কর্পূর, দস্তার তৈরী জিনিসপত্র, পারদ, চিনামাটির সামগ্রী সিন্দুর আর কিছু মুক্তা বাংলাদেশের বাজারে নিয়ে এসে ব্যপক বাণিজ্য চালাতে শুরু করেছিল।[৫] ফরাসীদের অত্যাধিক আনাগোনা ও

বাণিজ্যের প্রসারে ফরাসীবসত অঞ্চলটি অচিরেই ফরাসডাঙ্গা নামে পরিচিত হতে শুরু করল। ডুপ্লে ফরাসডাঙ্গায় বাংলার সেরা তাঁতিদের নিয়ে সমাবেশ করলেন। ফলতঃ ফরাসডাঙ্গার তাঁতের জিনিস বিখ্যাত হতে শুরু করল। তবে আজ আর ফরাসডাঙ্গায় কুঠির অস্তিত্ব না মিললেও সেখানে আজও অতীতের কিছু বসত উল্লেখযোগ্যভাবে লক্ষণীয়। প্রতিবছর কুঠি ডুবে যেত বলে ডুপ্লে কুঠি রক্ষার জন্য পণ্ডিচেরি থেকে ইঞ্জিনিয়ার নিয়ে এসেছিলেন এবং কুঠির চারিদিকে প্রাকার নির্মাণ করেছিলেন।[৬] ফলে কুঠি দুর্গে পরিণত হয়েছিল। ফরাসী লা ওরিয়েন্ট বন্দরে বাংলা থেকে যে জিনিসপত্র পাঠানো হয়েছিল তার মধ্যে কাশিমবাজারের সুতি কাটা কাপড়ের থান ছিল ৩,৮৭৮২০ খানি, ৭১টি সিল্কের রুমাল এবং ৩৯টি ছাপানো সিল্কের রুমাল। ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই-এর দরবারেও কাশিমবাজারে তৈরী সিল্কের বন্ধনী ভাষণ জনপ্রিয়তা লাভ করে। তবে ডুপ্লে বাংলা (চন্দননগর) ছেড়ে দক্ষিণ ভারতে চলে গেলে ফরাসি বাণিজ্যে কিছুটা ঘাটতি দেখা দেয়।

বলতে গেলে ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ইউরোপীয়দের মধ্যে সবার থেকে শেষে কাশিমবাজারে প্রবেশ করে। লন্ডনের পরিচালকমণ্ডলী ১৬৫৭ খ্রিঃ হুগলীর প্রতিনিধিকে কাশিমবাজারে কুঠি স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছিলেন। ১৬৮০ খ্রিঃ ১৪ লক্ষ পাউণ্ড শুধুমাত্র কাশিমবাজারে লগ্নী করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। সোরা ও রেশমের জন্য এই বিশাল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা হয়েছিল।[৭] পরবর্তীতে বাংলায় বা**ণিজ্যের** তাঁরা নিয়মিত পুঁজি বিনিয়োগ করে। ফলে অষ্টাদশ শতক শুরু হতেই কাশিমবাজার বাংলায় বন্দরের রানী বলে পরিচিতি পেতে থাকে। দ্রুত এই কাশিমবাজার বাংলার শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য কেন্দ্র রূপে স্বীকৃতি পায়। মূলত, রেশম ও মসলিন শিল্পের খ্যাতির জন্য। ১৬৭৬ খ্রিঃ ট্যাভারনিয়ে যখন কাশিমবাজার ভ্রমণে এসেছিলেন তিনি দেখেছিলেন কমপক্ষে ২০ হাজার পেটি রেশম প্রতি বছর এখান থেকে ইউরোপ ও অন্যান্য দেশে পাঠানো হয় আর প্রতি পেটি রেশম প্রতি বছর এখান থেকে ইউরোপীয় ও অন্যান্য দেশে পাঠানো হয়, আর প্রতি পেটির ওজন এক মন দশ সেরের কিছু বেশি।[৮] ফরাসী, ইংরেজদের মতো সপ্তদশ শতকে ওলন্দাজরাও কাশিমবাজারে এসেছিলেন এবং কুঠি নির্মাণ করেছিলেন। নিকালো মানুচির বৃত্তান্ত থেকে জানা যায় যে, ঐ সময় ওলন্দাজ কুঠিতে ৭০০ তাঁতি সিল্ক বোনার কাজ করত। কাশিমবাজারে তখন প্রতি বছর ২২হাজার গাইট রেশমের কাটা সুতো তৈরির ক্ষমতা ছিল। এই রেশমের গাইটের বেশিরভাগটা দেশের ভিতরে ওলন্দাজ বণিকগণ বাণিজ্য করত। কাশিমবাজার থেকে সুরাট, গোয়া, আহমেদাবাদ, ঢাকা, পাটনা, প্রভৃতি জায়গায় কাটা সুতোর গাইট গেলে উক্ত জায়গাতে পোষাক ও বস্ত্রশিল্পের ব্যপক উন্নতি ঘটেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যে ওলন্দাজদের ব্যবসা-বাণিজ্য দারুণ প্রসার লাভ করে এবং তারা পাটনা, ছাপড়া, হাজিপুর ও দৌলতাগঞ্জে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করে। এদেশের অভ্যন্তরে

বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আরও পরে কাশিমবাজারে ওলন্দাজরা বড় একটি প্রাসাদ তৈরী করেছিল।

প্রকৃত অর্থে কাশিমবাজার পূর্ব ভারতে সেকেলে বাণিজ্য বসতে লক্ষ্মী। কলমচি ব্রুটনের রচনায় জানা যায় মোঘল শাসনে বাংলায় গড়ে ওঠা কাশিমবাজার বন্দর, নবাবী ও ইংরেজি আমলে শ্রীবৃদ্ধির চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে যায়। ধীরে ধীরে কাশিমবাজার হয়ে ওঠে বন্দর নগরী। সুশোভিত অট্টালিকা, দালান, বাড়িঘরে ছেয়ে যায় কাশিমবাজার ও মুকসুদাবাদ। মুর্শিদাবাদ এবং রাজশাহী সিল্ক, জিয়াগঞ্জের বালুচরি, ঢাকার মসলিন এবং এবং ঢাকাই জামদানি নদী বন্দরের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন নগর শহর ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশ নিয়েছিল। ফরাসী, ইংরেজ ও ওলন্দাজ, দিনেমার, আর্মেনীয়, আরবীয় ও পার্সি বাণিজ্য জাহাজ অষ্টাদশ শতক জুড়ে নোঙর করত কাশিমবাজার বন্দরে। আর ভারত থেকে কাশিমবাজার বন্দরের মাধ্যমে রেশম, তাঁতবস্ত্র,মোম, লাক্ষা, সোরা, নীল, ঘি, লঙ্কা প্রভৃতি দ্রব্যসামগ্রী বিদেশে রপ্তানি করা হত। কাশিমবাজারে হাতে তৈরি কাগজও রপ্তানি করা হত। যা বিশ্বের বাজারে বেশ জনপ্রিয় ছিল।

এই সময়ে দৈনিক প্রায় ৫০-৬০ টা রেশম বোঝাই জাহাজ-কাশিমবাজার বন্দরে গড়ে নোঙ্গর গড়ত। তবে অনেকে মনে করেন কাশিমবাজার বন্দরের উন্নতির পেছনে মোঘল সম্রাট শাহাজাহানের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা তথা বাংলার সুবাদার কাশিম খাঁর ভূমিকা অনবদ্য। তাঁর প্রত্যক্ষ মদতেই কাশিমবাজার পাদপ্রদীপের আলোয় আসে। কথিত, কাশিম খাঁর নাম অনুসারেই কাশিমবাজার নামকরণ হয়েছে। সপ্তগ্রাম বন্দর পতনের সাথে সাথেই কাশিমবাজার বন্দরের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের কারণেই হুগলীর বন্দর বাদশাহি বন্দরে পরিণত হয়েছিল। ব্যবসার স্বার্থেই কাশিমবাজার বন্দরে ভিড় জমালেন ছোট-বড় ব্যবসায়ীরা। বাংলা তখন রপ্তানি বাণিজ্যের প্রায় শীর্ষে। চাল, সোরা, রেশমিবস্ত্র, তাঁতবস্ত্র, ঘাসের তৈরি থান, চাটাই, চিনি, নীল, ঘি, লঙ্কা, মোম, লাক্ষা, মাটির পুতুল, প্রভৃতি দ্রব্য সামগ্রী, ভারতের বিভিন্ন জায়গায় তথা রেঙ্গুনে, পেগু, অচিন, পেনাং, বাটাভিয়া ও মালাক্কাতে রপ্তানি হত।[১০]

শুধু বিদেশী বণিক নয়, কাশিমবাজার বন্দর নগরীর প্রাচুর্যে ও মধু ভাণ্ডারের আকর্ষণে গুজরাট, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ ও আসাম থেকে বহু দেশীয় ব্যবসায়ী এখানে এসে স্থায়ীভাবে বসতি করেছিল। বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন দ্রব্যের বণিক কাশিমবাজারে ইউরোপীয়দের সাথে পাল্লা দিয়ে বাণিজ্য করেছিল। এঁদের মধ্যে হিরানন্দ শাহ, উদয়চরণ ও গোরাচাঁদ শাহ নামে গুজরাটি ব্যবসায়ী ব্রজপাণ্ডা নামে উড়িয়া বণিক, দুলাল শর্মা, কেবল রাম শর্মা নামে মাড়োয়ারি বণিক, বিষ্ণুদাস শেঠ, কালিচরণ কাঠমা, বাবুল কাঠমা, হরি বল্লভ দাস প্রমুখ অবাঙালি ব্যবসায়ীরা, কাশিমবাজারকে অর্থনীতির শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছিলেন।[১১] শুধুমাত্র ইতিবাচক বাণিজ্য নয়, কাশিমবাজার ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছিল নানারকম রাজনৈতিক ফন্দিবাজ, ষড়যন্ত ও

পরামর্শের কেন্দ্রস্থল। নানা ব্যবসায়িক কাজের ছুতোয় কাশিমবাজার হয়ে উঠেছিল গোপন আলোচনার এক দারুণ জায়গা। জগৎশেঠগণ কাশিমবাজারের মহাজনটুলিতে একটি বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন। যা আর্থিক ও রাজনৈতিক কাজকর্মের মূল ভবনে পরিণত হয়েছিল। মধুগড়ের পাড়ের জৈন তীর্থঙ্কর নেমিনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হলে আশ্চর্যজনকভাবে সেখানে শ্বেতম্বর ও দিগাম্বর দুই সম্প্রদায়ের জৈনরাই সেখানে যেত। পাশাপাশি বণিক গুজরাটিরা অনেক শিব মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। আবার স্থানীয় শাক্তরা দুর্গা ও কালী মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। বৈষ্ণবগণ তেমন কোনো মন্দির না বানালেও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষায় ঘরে ঘরে কৃষ্ণনাম, হরিনাম, ভবগবতপাঠ ও সংকীর্তনের কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠে। কালিকাপুরের কাছে সুন্দর একটি মসজিদও নির্মাণ হয়েছিল। ফলে স্বাভাবিকভাবে মুর্শিদাবাদের কোলে কাশিমবাজার নদীবন্দরকে কেন্দ্র করে স্বদেশী ও বিদেশী বণিকদের উদ্দেশ্য ছিল কাশিমবাজার তথা মুর্শিদাবাদের বাণিজ্যিক সম্পদ আহরণের মাধ্যমে দেশীয় সম্পদকে লুঠ করা। এত ঐশ্বর্য থাকা সত্ত্বেয় কাশিমবাজার সমৃদ্ধি নগর হিসেবে কেন আত্মপ্রকাশ করতে ব্যর্থ হল তা ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় স্থান পাওয়া উচিত। আলোচ্য সময়ে কাশিমবাজারে টোল, মাদ্রাসা, মক্তব, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে বা সামরিক প্রশিক্ষণশালা কোনটাই নির্মিত হয়নি। অথচ হাজার হাজার বণিকের অর্থনীতি একটি দৃঢ় বাণিজ্যিক ও আর্থিক সংস্কৃতি তৈরি করেছিল।

এই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের ইতিহাস অনুসন্ধান করতে হলে মুর্শিদাবাদের সমাজে ও শ্রেণীবিন্যাসে অভিজাত শ্রেণীর পরই ছিল ব্যবসায়ী-ব্যাঙ্কার ও বাণ্যিজিক শ্রেণীর স্থান। এরা সকলেই স্থানীয় নয়, দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মুর্শিদাবাদের সমাজব্যবস্থায় স্থান পেয়েছিল। ১৭৩০ খ্রিঃ নবাব সুজাউদ্দিনের সময় জৈন কবি নিহাল সিং তাঁর 'বাংগাল দেশ কি গজল' কবিতায় গঙ্গা তীরবর্তী রাজধানীর ব্যবসাকেন্দ্রের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে মুর্শিদাবাদের বাণিজ্যিক শ্রেণীর পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেনঃ [১২]

বসতি কাসমবাজার, সৈয়দাবাদ খাগড়া সার।
রহতে লোক গুজরাতীক, টেপীবালা জেতী জাতীক।
আরব আরমানী আংগরেজ, হবসী হুরমজী উলাংদেশ।
সীদী ফরাসীস আলমান সৌদাগর মুর্গল পাঠান।।
শেঠী কুংপনী কী জোর দমকে লাগে লাখ কিরোর।

অর্থাৎ নিহাল সিং কাশিমবাজার, সৈয়দাবাদ ও খাগড়ায় বিভিন্ন বণিক গোষ্ঠীর উপস্থিতিকে লক্ষ্য করেছেন। রাজস্থান, গুজরাট ও উত্তর ভারত থেকে কাশিমবাজার মুর্শিদাবাদে এসেছিল। মাড়ওয়ারের নাগর থেকে জগৎ শেঠরা যেমন এসেছিল, তেমনি সন্ন্যাসীরা ও মুরচা, উজিনিয়া ব্রাহ্মণরাও এসেছিল, তেমনি দিনমজুর ও অন্য খেটে খাওয়া মানুষও মুর্শিদাবাদ ও কাশিমবাজারে ছিল।

কাশিমবাজারকে কেন্দ্র করে ক্রমে জনজীবনের গতিশীলতা ও অর্থনৈতিক প্রগতির ধারা বইতে শুরু করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কাশিমবাজারে জনসংখ্যা প্রায় এক লক্ষ হয়েছিল।[১৩] বাণিজ্যিক কেন্দ্র ও নদী বন্দরের কারণে বণিক, মহাজন, স্রফ, গদীয়ালা স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। বাবুন কাঠমা, রঘুনাথ বিশ্বাস, দুলাল শর্মা, কেবলরাম শর্মা ও হরিবল্লভ দাস প্রমুখ বিখ্যাত ব্যবসায়ীদের বসতি স্থাপনের কথা জানা যায়। যাঁরা কেউ কেউ বাবু ও শর্মা উপাধি পেয়েছিল। [১৪]মুর্শিদাবাদের রেশম, সুতো, তাঁত নির্মিত বস্ত্র, বাহারি দ্রব্য, মসলিন, ডিমিসি, ডুরিয়া, মলমল, শীরশাফার, শিরবন্ধ ও তাঞ্জীর-এর মত বহু মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে ব্যবসাবানিজ্য চলত। মুর্শিদাবাদের রেশমশিল্প ছিল মূলত পীত বর্ণের। সেকেলের চাষীরা ও অধিবাসীরা ক্ষার মিশিয়ে সুন্দরভাবে পীত বর্ণের রেশমকে প্যালেস্টাইন সিল্কের মত শ্বেত বর্ণের রেশমে পরিণত করতে পারত বলেই দেশ-বিদেশের মানুষ, বণিক, শ্রমিক, কারিগর সকলেই এখানে এসে বাণিজ্য করেছেন ও জীবন কাটিয়ে দিয়েছে। কাশিমবাজারের গুজরাটি ব্যবসায়ীগণ প্রতিবছর মির্জাপুর ও বেনারসে ২০০-৩০০ মণ রেশমের থানের বাণিজ্য করত। মির্জাপুর থেকে এই থান নাগপুরে গিয়ে জামাকাপড়ে রূপান্তরিত হত। কাশিমবাজারের সিল্ক থেকেই নাগপুর, মধ্যপ্রদেশের ছত্তরপুরে এবং পুনায় কি খাপ, গুলবাহার বা ব্রোকেড তৈরী হত।[১৫] মির্জাপুরের কাঁচা রেশম ও প্রায় সমগ্র মুর্শিদাবাদের কাঁচা রেশম বিক্রি বাটা হত এই বন্দরের মাধ্যমেই। লাহোর, মুলতান, ঢাকা হয়ে মধ্যপ্রাচ্যে যেত। কাশিমবাজার থেকে গুজরাটি বণিকরা যত রেশম রপ্তানি করত তার প্রায় ৭ আনা সমুদ্র পথে যেত সুরাটে। ৪ আনা যেত মির্জাপুর ও নাগপুরে আর এক আনা যেত বারাণসীতে।[১৬]

কাশিমবাজারের বাণিজ্য অর্থনীতির আলোচনায় আবশ্যিকভাবে কান্তবাবু, তাঁর ভাই নৃসিংহবাবু, ভাইপো বৈষ্ণবচরণবাবু ও পুত্র লোকনাথবাবুর কথা চলে আসে। মুর্শিদাবাদ তথা সেকেলে বাংলার অর্থনীতির অনেকটাই তাঁরা নিয়ন্ত্রণ করতেন। ১৭৭৪-৭৫ খ্রিঃ লোকনাথ কাঁচা রেশম যোগান দেওয়ার চুক্তি ইংরেজ কোম্পানির সাথে করেছিলেন। যার মূল্য ৮৬৬০০০ টাকা। অর্ধেক অংশীদারির জন্য ধরা হয় ২৫২৮১৮ টাকা। ঐ বছর লোকবাসের মোট সরবরাহের পরিমাণ ছিল ১১,১৮,৮১৮ টাকা।[১৭]

তবে কাশিমবাজার ও তার সংলগ্নে বেশিরভাগ মানুষই ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বৈষ্ণব। ফলে এই অঞ্চলের হিন্দু জনগণের উপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাব ছিল খুব বেশি। কেনাবেচার ফাঁকে ফাঁকে প্রায়ই করতাল মৃদঙ্গ সহযোগে তাঁরা কীর্তন করতেন।[১৮] সন্ধ্যা নামার আগেই ভাগবতপাঠ বা চৈতন্য চরিতামৃত শোনবার জন্য মন্দিরে, মণ্ডপে বহুলোক জমায়েত হতেন। অর্থাৎ একদিকে ব্যবসাবাণিজ্য, বণিকের সমাগম, বড় বড় অর্থনীতির আগমন, অন্যদিকে শ্রীচৈতন্যের নাম ও সংকীর্তনের আসরে কাশিমবাজার জমে উঠেছিল। এভাবেই কাশিমবাজার বাদশাহী আমলে সমৃদ্ধ, সংস্কৃতিসম্পন্ন বাণিজ্যিক জনপদে পরিণত হয়েছিল। তবে মাত্র

২০০ বছরের মধ্যেই কাশিমবাজার তার গৌরব হারাতে থাকে। যেকোনো বন্দর বেঁচে থাকে তার পশ্চাদভূমির ওপর। কারণ বন্দররের পণ্য আনা নেওয়া করতে হলে বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্গে যোগাযোগের পথ চাই।[১৯]১৮১৩ খ্রিঃ ভাগীরথীর গতিপথ পরিবর্তন করে।[২০] নদী তার আঁকাবাঁকা পথ পরিত্যাগ করে আমানিগঞ্জ থেকে সোজা ফরাসডাঙ্গার দিকে প্রবাহিত হয়। সেই কারণে কাটিগঙ্গা ভাগীরথী নদীর মূল স্রোত থেকে আলাদা হয়ে যায়। মূল উৎস ভাগীরথী থেকে কেটে যাওয়ায় এই অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদের নামই কাটিগঙ্গা। তাছাড়া পলাশী যুদ্ধের পর থেকেই বহরমপুরে ইংরেজরা সেনাবাহিনীর ক্যান্টনমেণ্ট স্থাপনের পরিকল্পনা করলে অনেকেই কাশিমবাজার ছেড়ে বহরমপুর চলে আসে এবং কাশিমবাজারের মৃত্যু ঘণ্টা বেজে যায়। নদী অববাহিকা জুড়ে কৃষি ব্যবস্থার প্রসার ঘটার ফলে বিঘ্নিত হয়েছে নদীর গতিশীল ভারসাম্য। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে শুরু হয়েছিল বন্যা প্লাবন এলাকায় পাড়বাধ বা এমব্যাঙ্কমেণ্ট নির্মাণের কাজ.[২১] ১৭৯৩ খ্রিঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন চালু হওয়ার পরে বন্যাকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের এক অন্ধমোহে যেখানে সেখানে পাড়বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল। অশ্বক্ষুরাকৃতি নদীতে জল কমে যাচ্ছিল প্রবল খরার দাপটে। নদীর যে বাঁক বন্দর তৈরীতে সাহায্য করেছিল সেই বাঁক সরে গেলে নদী মজে গিয়ে স্থবির হয়ে যায়। তাছাড়া রাশি রাশি পলিমাটি বাঁকের মুখে জমে গিয়ে বন্দর কাশিমবাজারকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। উপরুন্তু পলাশী যুদ্ধের পর রাজধানী ও টাঁকশালের পরিবর্তন ও কোলকাতা বন্দরকে কেন্দ্র করে ইংরেজ কোম্পানি তাঁদের সামরিক ও প্রশাসনিক কাজ শুরু করলে কাশিমবাজার অবহেলিত হতে থাকে। তবে বাংলার আর্থ-সাংস্কৃতিক মানচিত্রে কাশিমবাজার যে ধারাকে প্রবাহিত করেছিল তার রেশ আজও কাশিমবাজার জনপদকে দেখলে অনুভব করা যায়। বর্তমানে বৃহত্তর বহরমপুর পৌর অঞ্চলে যুক্ত হয়ে কাশিমবাজার তার অতীত গৌরবকে মৃতপ্রায় ভাবে বয়ে নিয়ে চলেছে। আলোক উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় কাশিমবাজার বন্দর যেভাবে তৎকালীন বাংলা, বিহার, উড়িষ্যাতে বাণিজ্যিক ও অর্থনীতির সূত্রধরের কাজ করেছিল বাংলার নবাবের পতনের পর থেকে তার আকস্মিক পতন ঘটে। বাংলার মনোজগৎ ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে এক ব্যপক ক্ষত সৃষ্টি হয় যা আজও রাঢ় বাংলা তথা মধ্য বাংলার বাণিজ্যিক অর্থনীতিতে প্রতীয়মান।

সূত্র নির্দেশ :

১. শ্রী নিখিলনাথ রায়, মুর্শিদাবাদ কাহিনী, পুঁথিপত্র প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা- ১৯৮৮, পৃ-৬

২. তদেব,পৃ-৬

৩. শ্রী সোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী, বন্দর কাশিমবাজার, বঙ্গীয় নাট্যসংসদ প্রকাশনী, কোলকাতা, ১৯৭৮, পৃ-১৩

৪. ক্যালকাটা রিভিউ, এপ্রিল, ১৮৯২

৫. যদুনাথ সরকার, ওল্ড মুর্শিদাবাদ, কৃষ্ণনাথ কলেজ সেন্টেনারি ভলিউম, ১৮৫৩-১৯৫৩
৬. শ্রী সোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী, বন্দর কাশিমবাজার, বঙ্গীয় নাট্যসংসদ প্রকাশনী, কোলকাতা, ১৯৭৮, পৃ- ১১
৭. নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিনহা, দি ইকনামিক হিস্টোরি অব বেঙ্গল
৮. প্রাগুপ্ত,পৃ- ১৩
৯. জাহির রায়হান, মুর্শিদাবাদ, বিস্তার মিডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা, ২০২০, পৃ- ৫৬
১০. প্রাগুপ্ত- ৫৭
১১. অরূপ চন্দ্র (সম্পা), মুর্শিদাবাদ ইতিবৃত্ত (তৃতীয় খণ্ড), বাসভূমি প্রকাশন, বহরমপুর, ২০১৭, পৃ-২৩৮
১২. সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, মর্ডান বুক এজেন্সি, কোলকাতা, ১৯৪০, পৃ- ৩০৬-৩১০
১৩. শ্রী সোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী,প্রাগুপ্ত, পৃ-৪৩
১৪. তদেব, পৃ-৫৩
১৫. তদেব, পৃ- ৯৪
১৬. এ কে সিনহা, ইকনামিক হিষ্টোরি অব বেঙ্গল, ভলিউম, ১, পৃ-১০০-১০২
১৭. শ্রী সোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী, প্রাগুপ্ত, পৃ- ১১৭
১৮. কিশোরীচাঁদ মিত্র, টেরিটোরিয়াল অ্যারিস্টোক্র্যাসি অফ বেঙ্গল, কাশিমবাজার রাজ, ক্যালকাটা রিভিউ, ভলিউম ৫৭
১৯. মিহির দাস, বন্দর কথা, আনন্দ পাবলিশার্স, কোলকাতা, ২০০৮, পৃ- ১৯
২০. জয়চাঁদ দাস, মুর্শিদাবাদ থেকে বলছি, সহযাত্রী প্রকাশক, কোলকাতা, ২০১৭, পৃ- ৩১
২১. কল্যাণ চন্দ্র, বাংলার নদীকথা, সাহিত্য সংসদ, কোলকাতা, ২০১০,পৃ-৪

রবীন্দ্র-কাব্যে প্রণয়ের স্বরূপ

সুনন্দা মিত্র
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
সিকম স্কিলস ইউনিভার্সিটি

সারসংক্ষেপ : আমরা জানি, সার্বভৌম প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথ। সাহিত্যের সকল শাখাতেই তাঁর স্বচ্ছন্দ পদচারণা। এবং বিষয়গত দিক থেকেও সেইসব সাহিত্য বৈচিত্রপূর্ণ।সেই বৈচিত্রের পথ ধরেই তিনি প্রেমকে স্বতন্ত্ররূপে সাহিত্যের বিষয়ীভূত করে তুলেছেন। তাঁর সাহিত্যের সব শাখাতেই প্রেমের অনুপ্রবেশ ঘটেছে নব নব রূপে।কাব্যও তার ব্যতিক্রম নয়। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রেমের স্বরূপ উদ্ঘাটনই আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের মূল উপজীব্য।

সূচক শব্দ : বহুমাত্রিক প্রেম, নরনারীর প্রেম, বিচ্ছেদ প্রেম, পূরবী, মহুয়া, গদ্য কবিতায় প্রেম।

মূল বিয়য় :

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য পরিক্রমায় লক্ষ করা যায় নর-নারীর প্রেম একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। প্রেমের মাধ্যম তো কেবলমাত্র নর-নারীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বহুমাত্রিকরূপেই তার সন্ধান। সন্তানের সঙ্গে মায়ের বাৎসল্য প্রেম, ভগবানের সঙ্গে ভক্তের প্রেম, গোপী প্রেম, মানুষের সঙ্গে পশুদের প্রেম নিয়ে নানান কথা ও কাহিনি সম্পর্কে অবহিত আছি আমরা। রবীন্দ্র সাহিত্যে নর-নারী সম্পর্কিত প্রেম আমাদের চমৎকৃত করে। রবীন্দ্রনাথের কবি মানসে যে প্রেমের সঞ্চার তা তাঁর রচিত সাহিত্যের নানা শাখায় বিস্তারিত। বিশেষ করে তাঁর কবিতায় নরনারীর প্রেম ও সৌন্দর্যানুরাগ লক্ষ করার মতো বিষয়। প্রেম তো মানব হৃদয়ের এক চিরন্তন ও অনন্য সম্পদ বিশেষ। প্রেমকে আত্মস্থ করে নরনারীর প্রেমকে বিষয়করেননি পৃথিবীর এমন একজন কবিকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। রবীন্দ্রনাথও ব্যতিক্রম নন। সেজন্য অবাঙালি সমালোচক ও লেখক রাধাশ্যাম আগরওয়ালাও রবীন্দ্রকাব্যে প্রেম সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—

“রবীন্দ্র কাব্য পরিক্রমাকালে বরং এই কথাই মনে হয় যে, প্রেমানন্দ লোকে এক পরমরমণীয় চিরসুন্দর ভুবনে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষাই তাঁর কাব্য-ভাবনার প্রধান কথা। তবে এ প্রেমের স্বাদ পৃথক। রবীন্দ্র-প্রেমের জন্ম রূপালোকে, এর যাত্রা অরূপের জগতে। ইন্দ্রিয় হতে ইন্দ্রিয়াতীত, বিষয় হতে বিষয়াতীত, বিশেষ হ’তে নির্বিশেষের, বাহির হ’তে অন্ত, মূর্ত হ’তে অমূর্ত বা জানা থেকে অজানা ও সীমা থেকে সীমাতীত—এভাবে এক মিষ্টিক রাএজই এ পএমে অভিষেক। এ প্রেমে রিক্ততা বক্ষ ভেদ করে

পূর্ণের উন্মোচন ঘটে। নাম না-জানা কোনও এক দূর দেশে কবি প্রিয়ার বাস, আর অচিন দেশের সেই প্রিয়ার উদ্দেশে যাত্রা আর তাকে পাওয়ার আর্তিই- রবীন্দ্রনাথের মর্মকথা।''[১]

রবীন্দ্র সাহিত্যে তথা কাব্যে প্রেমের যে তাত্ত্বিকতারই প্রকাশ থাক না কেন, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে নর-নারীর বাস্তবিক-প্রেমকেও অস্বীকার করা যায় না— তা বৈধ হোক বা অবৈধ হোক— নরনারীর যুগল প্রেমের কথাও অস্বীকার করেননি। নর-নারীর প্রেমের ফলশ্রুতিরই তো প্রকাশ ঘটেছে—

'তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি
শতরূপে শতবার—
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।
চিরকাল ধ'রে মুগ্ধ হৃদয়,
কতরূপ ধ'রে পরেছ গলায়
নিয়েছ সে উপহার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।'

কিংবা—

'আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি
যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদিকালের হৃদয়-উৎস হতে।
আমরা দুজনে করিয়াছি খেলা
কোটি প্রেমিকের মাঝে
বিরহবিধুর নয়নসলিলে,
মিলনমধুর লাজে—
পুরাতন প্রেম নিত্যনূতন সাজে।'

(অনন্ত প্রেম)

প্রেমের এই যে ভাবনা বা ভাবলোক কোনো সময়ই দু'টি পৃথক সত্তা নয়, বরং একজনকে বাদ দিয়ে দ্বিতীয় কোনো সত্তার মধ্যে কোনো প্রেমের পরিণতি বা প্রেমের পাওয়া না-পাওয়ার বেদনা মূর্ছনাসার্থক হয় না। একজন আর একজনের পরিপূরক— বিরহে বা মিলনে, সুখে বা দুঃখে, আলোতে বা অন্ধকারে, অন্তরে বা বাইরে— সর্বত্রই যুগল প্রেমের ছায়াই তো রবীন্দ্র প্রেমকাব্যের গভীর-গহন বিষয় হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে নরনারীর প্রেম একটি বড়ো বিষয়। কালের বিচারেঅর্বাচীন নরনারীর সম্পর্ক রচনায় সে প্রেম পর্ব আজও কেউ অগ্রাহ্য করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ একটি নিয়মতান্ত্রিক প্রেমে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর কাব্যে বহু-মাত্রিক দর্শন লক্ষ করা গেছে। কবির যে প্রেমের ধারা তা নানারূপে প্রকাশিত ও বিকশিত। ''রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের রচনায় দাম্পত্য প্রেমেরই একটা অবস্থান লক্ষ

করা গেছে‘কড়ি ও কোমল’ থেকে ‘ক্ষণিকা’ পর্যন্ত কাব্য গ্রন্থে। আত্মগত প্রেমের কথা ব্যক্ত করেছেন ‘মানসী’ কাব্যে। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতার আর একটি পর্যায় ‘পূরবী’ কাব্য থেকে শুরু হয়েছে। ‘পূরবী’ বিচ্ছেদবিধুর এক প্রেমকাব্য, যেখানে বিচ্ছেদের আগে চূড়ান্ত কোনো মিলন ছিল না—ছিল না প্রেমের যুগ্ম যাপনও। চিরন্তন নয়—‘পূরবী’র প্রেম কবির বক্তিগত অভিজ্ঞতায় জারিত প্রেম, যে প্রেম মুক্ত স্বাধীন। যেখানে গৃহ নয়, গৃহের বাইরে, আকাশের মুক্তিতেই যে প্রেমের মুক্তি ও স্ফূর্তি। ভালোবাসাকে বেঁধে রাখতে চাইলে, তা পুরনো হয়ে যায়। তাই প্রেমের বাসনা প্রেমের ফাঁদে নয়—

‘জানে যারা চলার ধারা
নিত্য থাকে নূতন তারা।’

প্রেমের স্বরূপ ধর্ম মিলনে নয়, বিচ্ছেদের মধ্যে মূর্তমান। প্রেম জীবন থেকে উবে যায় না, বরং প্রেমের স্মৃতিই প্রেমকে সজীব করে রাখে এবং প্রেমের স্মৃতিকাতরতাকেই প্রেমের সত্য ও সুন্দরের সাধনায় বাঁচিয়ে রাখে মানুষকে।’’[২]

সমালোচকের আরো উপলব্ধি—

‘‘প্রেম’ যে একটা চঞ্চল ক্ষণকালীন মুহূর্তেরও বাহক—তা যে ধরে রাখা যায় না, চিরকালীন সখ্যতার বন্ধনেও চিরস্থায়ী রূপ দেওয়া যায় না। আর তা না হলে ‘বিচিত্রিতা’র শেষ কবিতা ‘বিদায়’-এর মধ্যে চিরবিচ্ছেদের বেদনা চিরন্তন হয়ে ওঠে কোন প্রেরণায়। এই বিচ্ছেদে প্রেমে অবসান হয় না, বরং তা ‘কাছের মূর্তির চেয়ে দূরের মূর্তিতে তুমি বড়ো’। প্রেম বড়ো হয়ে ওঠার সাধনাতেই সিদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে বলেছেন—

‘যারা কাছে আছে তারা কাছে থাক
তারা তো পারে না জানিতে।
তাহাদের চেয়ে তুমি কাছে আছো
আমার হৃদয় খানিতে।’

হৃদয়ে প্রেম থাকাই বড় কথা, মহৎ কথা। প্রেমে যার যত ধ্যান বেশি, তার প্রেম তত বেশি ও বড়ো। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ভালোলাগা আর ভালোবাসা এক নয়। তাঁর মতে- ‘ভালোলাগায় ভোগের তৃপ্তি, ভালোবাসায় ত্যাগের সাধন।’ সুতরাং প্রেমের গৌরব ত্যাগেই।’’[৩]

রবীন্দ্রনাথের নরনারীর প্রেম সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণা তাঁর কাব্য পরিক্রমায় ব্যক্ত হয়েছে, কখনো তা ব্যক্তিগত স্তর থেকে প্রকাশিত, আবার তা কখনো গৃহবন্দী প্রেমের আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত প্রেম নয়। তাঁর প্রেমের সেই উপলব্ধির প্রকাশ বেশি ঘটেছে বোধ হয় ‘পূরবী’ কাব্যে। যে কাব্যে নরনারীর দেহজ প্রেমেরই স্ফূরণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অনেকেই যাকে সর্বাপেক্ষা তীব্র ব্যক্তিগত প্রেমের কবিতা বলেই মনে করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের নরনারীর প্রেম সম্পর্কিত কবিতার বাঙ্ময় প্রকাশ তো ধরা পড়েছে এভাবেই—

'প্রহর শেষে আলোয় রাঙা
সেদিন চৈত্র মাস
তোমার চোখে দেখেছিলাম
আমার সর্বনাশ।'— প্রেমের প্রকাশ এমন রমণীয় হতে পারে, তা বোধ করি রবীন্দ্র সাহিত্যেই শুধু মেলা সম্ভব। পূরবী কাব্যের প্রায় চার বছর পরে প্রকাশিত 'মহুয়া' কাব্যে প্রেমকে, প্রেমিক-প্রেমিকাকে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয়েছে—

"প্রেমকে এখানে জীবনের চলমানতার সঙ্গে এক করে দেখা হয়েছে। রোমান্টিক প্রেমের কবিতা রচনায় যিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত, সেই রবীন্দ্রনাথের হাতেই জন্ম নিয়েছে আধুনিক বাস্তবনিষ্ঠ প্রেমের কবিতা।"[৪]

'মহুয়া'র 'উজ্জীবন' নামীয় কবিতা প্রেম ভাবনার সার্থক কবিতা। 'মহুয়া'র কবি রবীন্দ্রনাথ যে প্রেমের 'কবিতা-কল্পনা-লতা' রচনা করেছেন, সেখানে প্রেমের অন্তরালে রয়েছে একটি বলিষ্ঠ জীবনবাদী দৃষ্টি। যে প্রেম প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়েও স্থির-অচঞ্চল, অটল-অনড় গতিশীলও বটে। এই প্রেমের আহ্বান কর্তব্যের দ্বারা প্রাণিত, উদ্দীপ্ত, বীর্যবান ও মহৎ পৌরুষত্ব দীপ্তমান। এই বীরত্ব ব্যঞ্জক পৌরুষের হৃদয়েরই আহ্বান প্রিয়তমার উদ্দেশে—

'আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা গড়িব না ধরণীতে
মুগ্ধ ললিত অশ্রুগলিত গীতে।
পঞ্চশরের বেদনামাধুরী দিয়ে
বাসররাত্রি রচিব না মোরা প্রিয়—
ভাগ্যের পায়ে দুর্বল প্রাণে ভিক্ষা না যেন যাচি।
কিছু নাই ভয়, জানি নিশ্চয় তুমি আছ আমি আছি।'

কেবল প্রেমিক পুরুষ নয়, অপূর্ব প্রেমের শক্তিতে বলীয়ান নারীও বলে উঠেন—

'যাব না বাসর কক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণি
আমারে প্রেমের বীর্যে করো অশঙ্কিনী।'

বলতে গেলে 'মহুয়া'য় অমিত বীর্যশালী বলিষ্ঠ প্রেমকেই কবি আহ্বান জানিয়েছেন। যে প্রেম নীড়ে আশ্রয়ের জন্যে কাঙ্ক্ষিত, সে প্রেম মহুয়ার প্রেম নয়।যে প্রেম প্রিয়ার সঙ্গ লাভ, পথচলার অগ্রগতির দোসর এবং কোনো বিরোধ নেই, সেই প্রেমই 'মহুয়া'র প্রেম। 'শেষের কবিতা'য় এই প্রেমকে জীবনের চলমানতার সঙ্গে বিলাসিতা মুক্ত প্রেমকে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন। সেজন্য জনৈক সমালোচক বলছেন—

"প্রণয়ের সাধনবেগ ও উপলব্ধির নিবিড়তা যে কবিতায় মুখ্য ধর্ম। একটু লক্ষ্য করলে তার মধ্যে আর একটি বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ে। প্রেমের লীলায় নারীর যে মূর্তি কবির ভাব কল্পনায় রূপ পরিগ্রহ করেছে, সে নারী অবলা নয় সবলা, নর নির্ভরা নয়

আত্মনির্ভশীলা, কামনা-কোমল কিংবা প্রেমাবালুণ্ঠিত নয়, বলিষ্ঠ সংগ্রাম তৎপরতা ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত।"[৫]

রবীন্দ্রনাথ জীবন পরিক্রমার সঙ্গে কাব্যের ভাষাশৈলীর পরিবর্তন করেছন তা আমরা জানি। গদ্যকে ধারণ করে এক শ্রেণির কাব্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন তিনি। সে কবিতা গদ্যের অবসরে কবিতার রসসৃষ্টি নয়, গল্পরসের পাকে কবিতার আবেদনকে সুস্বাদু করার চেষ্টা করেন।'পুনশ্চ' কাব্যেই যার প্রতিফলন ঘটে। 'পুনশ্চ' রচনাকালে কবির বয়স ছিল সত্তর। এ কাব্যের বিশেষত্বের দিকে লক্ষ করলে বোঝা যায় রচনাভঙ্গি ও বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব। তিনি এক সময় বলেছিলেন যে, আমার শেষ বয়সের কাব্য রচনার ক্ষেত্রে আমি বাঙলায় চলতি ভাষার সুরটাকে ব্যবহারের চেষ্টা করেছি। তাঁর এই প্রচেষ্টার বিস্তৃতি 'পুনশ্চ', 'শেষ সপ্তক', 'পত্রপুট' ও 'শ্যামলী'তে ধারাবাহিক ব্যবহার করেছেন এবং তিনি যে ছন্দে কাব্যগুলি রচনা করেনতার নাম দিয়েছিলেন গদ্যছন্দ।"রবীন্দ্র প্রতিভা সৃষ্ট রবীন্দ্র কবি মানসের আত্মপ্রকাশের বহু বাহনের অন্যতমবাহন—রবীন্দ্রনাথেই এর সূচনা রবীন্দ্রনাথেই এর পরিসমাপ্তি।"[৬]

ছোটগল্পে কিংবা কবিতার বিষয় নির্বাচনে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের কথা বললেও কিছু গদ্য কবিতায় নরনারীর প্রণয় সম্পর্কেও আলোকপাত করেন। কবিতাকেও যে গল্পের আধারে পরিবেষণ করা যায়, রবীন্দ্রনাথই তার পথ প্রদর্শক। যেমন ধরা যায় 'সাধারণ মেয়ে'র কথা। নরেশ নামের এক যুবকের সঙ্গে মালতী নামের একটি সাধারণ মেয়ের প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়।নরেশ বিলাতে গিয়ে অসামান্য রূপসী ও বিত্তশালিনী মহিলাদের আবিষ্কার করে, সে খবর নরেশের মাধ্যমেই পায় মালতী। মালতী তখন বুঝতে পারে যে তার কপাল পুড়েছে। সে বুঝে নেয় নিজের পরাজয়ের কথা। সে যে নরশের প্রেম থেকে বঞ্চিত, জীবনে তার নিজে যুদ্ধ করে প্রেমে জয়ী হওয়া সম্ভব নয়, তাই সে সাধারণ একটি নারী থেকে বিদ্যাবুদ্ধিতে বিদুষী নারীতে পৌঁছোনোর আকুল আবেদন শরৎবাবুর কাছে—'পায়ে পড়ি তোমার, একটা গল্প লেখো তুমি শরৎবাবু,/নিতান্ত সাধারণ মেয়ের গল্প—' এই আবেদন কেবল গল্প নয়, সত্য হয়ে উঠুক—

'কিন্তু তুমি যার কথা লিখবে
তাকে জিতিয়ে দিয়ো আমার হয়ে,
পড়তে পড়তে বুক যেন ওঠে ফুলে।
ফুল চন্দন পড়ুক তোমার কলমের মুখে।'
(সাধারণ মেয়ে)

নরেশের সঙ্গে মালতীর প্রেমের বন্ধন দৃঢ় হবে না জেনেও সে তার বিদ্যাবুদ্ধিকে সম্বল করে জগত সভায় বিদুষীরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে, নরেশকে সে যোগ্য জবাব দিতে সক্ষম হয়। তার আরো ইচ্ছা নরেশ যেন সাত বছর অকৃতকার্য হয়ে থাকে। আর মালতী এই ফাঁকে পড়াশুনা করে বিদুষী রূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে। এখানে শেষ নয়, মালতীর

সম্মানে যেন একটি সভা আহ্বান করা হয়, সেখানে যেন নরেশও উপস্থিত থাকে। আর তাহলে মালতীর স্বপ্নও সার্থক হবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এরূপেই কবিতার সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন। অর্থাৎ মালতীর সাধারণ থেকে অসাধারণত্ব প্রকাশ করেছেন কেবল প্রেমের পরাজয়ে ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে। এখানে প্রেমের গাঢ়তার প্রকাশ নেই অথচ প্রেমই যেন এ গদ্যলেখা কবিতার মূলাধার হয়ে উঠেছে।

'শ্যামলী', 'পুনশ্চ' ও 'শেষ সপ্তক'-এর ন্যায় গদ্য ছন্দে লেখা এবং প্রায় একই ভাবনার আবিষ্ট কবিতা হল— 'দ্বৈত', 'শেষ পহরে', 'সম্ভাষণ', বাঁশিওয়ালা', 'মিলভাঙা', 'হঠাৎ দেখা', 'অমৃত', 'দুর্বোধ', 'বঞ্চিত', এবং 'অপরপক্ষ'-এগুলি সবই হল প্রেমের কবিতা। এই বারোটি কবিতাই প্রেমজ কথা ও কাহিনির আকারেই রচিত। যেমন ধরা যাক—'বাঁশীওয়ালা' কবিতার কথা। এখানেও প্রেমের কথা আছে, যে প্রেমের মূর্ছনা বাঁশীওয়ালার বাঁশীর সুরেই উদ্‌বোধিত হয়েছে। বৈষ্ণব পদাবলীর রাধার বংশীপ্রেমে মাতোয়াবার ন্যায়, কৃষ্ণের বাঁশীর শব্দ, রাধার মন-প্রাণ আকুল করে তোলে। বড়ু চণ্ডীদাস-এর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা চিত্তের বহিঃপ্রকাশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—

"কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কুলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন॥

(বড়ুচণ্ডীদাস — কৃষ্ণকীর্তন)

আর রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতা'বাঁশিওয়ালা'য় একটি বাংলাদেশের মেয়ের প্রেমার্তি ধরা পড়েছে এভাবেই-

'বেলা তো কাটে না,
বসে থাকি জোয়ার-জলের দিকে চেয়ে—
ভেসে যায় মুক্তিপারের খেয়া,
ভেসে যায় ধনপতির ডিঙা,
ভেসে যায় চলতি বেলার আলোছায়া।
এমন সময় বাজে তোমার বাঁশি
ভরা জীবনের সুরে,
মরা দিনের নাড়ীর মধ্য
দব্‌দবিয়ে ফিরে আসে প্রাণের বেগ।
কী বাজাও তুমি,
জানি নে সে সুর কার মনে জাগায় কী ব্যথা।
বুঝি বাজাও পঞ্চম রাগে
দক্ষিন হাওয়ার নব যৌবনের ভাটিয়ারি।
শুনতে শুনতে নিজেকে মনে হয়

যে ছিল পাহাড়তলির ঝির্‌ঝিরে নদি
তার বুকে হঠাৎ উঠেছে ঘনিয়ে
শ্রাবণের বাদল-রাত্রি।'

এ কাব্যে নর-নারীর প্রেম চেতনার সঙ্গে প্রকৃতি মিলে মিশে যেন একাকার হয়ে গেছে। বাঁশিওয়ালা' কবিতায় সেই বাণীমূর্তি ধরা পড়েছে রবীন্দ্রনাথের সীমার মাঝে অসীমের তত্ত্বটি। প্রেমের মর্ত্যলোক থেকে অমর্ত্যলোকে যাত্রার কথাই প্রকাশ পেয়েছে। সেই কারণে রবীন্দ্র-সমালোচকের দৃষ্টিতে—

"বাঁশিওয়ালা কবিতাটিকে একদিক থেকে রূপক কবিতা বলা চলে।... নারীর মধ্যে যদি প্রেমের সঞ্চার ঘটে, যদি সে তার অন্তরের প্রেমকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে তার সেই প্রেমের গৌরব সে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে অক্ষয় অমৃতধারে বাস করতে পারে। সত্যিকারের প্রেম নারীকে কল্যাণী মূর্তিতে উজ্জ্বল করে তুলতে পারে। পারে তাকে শক্তিময়ী করতে বিদ্রোহিনী করতে। বাঁশিওয়ালা কবিতাটিতে রূপকের আড়ালে কবি এই তত্ত্ব কথাটুকুই বলতে চেয়েছেন।"[৭]

রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা গল্পের অবসরে গড়া এবং যা গদ্য ছন্দে লেখা তা আমরা উল্লেখ করেছি। সে কাব্যাকারে লেখাগল্পগুলি ভালোবাসার গল্প, ব্যর্থ নায়ক-নায়িকার অন্তর্বেদনার গল্প এবং যার গভীরে রয়েছে নর-নারীর প্রেম সম্পর্কের বিস্ময়কর অন্তরাত্মার গল্প। রবীন্দ্রনাথের কাব্য প্রেম মনস্তত্ত্বের জটিল আলো-অন্ধকারের রহস্যময়তার প্রকাশই যেন উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছে। প্রেমের রোমান্টিকতাই তো রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে তথা কাব্যে এক অসাধারণ বিস্ময়কর মায়ার সৃষ্টি করেছে। এখানেই রবীন্দ্রকাব্যে প্রেমের সৌন্দর্য ও সার্থকতা।

পাদটীকা

১। রাধাশ্যাম আগরওয়ালা, রবীন্দ্রকাব্য প্রেম ও ফারসী সাহিত্য,কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা সাহিত্য পত্রিকা, নবম সংখ্যা ১৯৮৮ সম্পাদক- অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃঃ-৪৯
২। মনোজ মণ্ডল(সম্পাদিত), প্রেমের কবিতা, মরালী প্রকাশনী, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ভূমিকা পৃঃ-IV
৩। ঐ
৪। সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়, নির্বাচিত রবীন্দ্র কবিতা পাঠ, রত্নাবলী, ১৪১০ বঙ্গাব্দ, পৃঃ-১৬২
৫। ঐ
৬। প্রমথনাথ বিশী, রবীন্দ্র সারণী, মিত্র ও ঘোষ ১৯৯৩, পৃঃ-৩১
৭। শুদ্ধসত্ত্ব বসু, রবীন্দ্রকাব্যের গোধূলি পর্যায়, মণ্ডল বুক হাউজ-১৯৮২, পৃঃ-১০১

ভিন্ন স্বাদে বাংলা সাহিত্যের সহবস্থানে সমগোত্রীয় দুই সম্রাট

রিয়া মন্ডল
স্নাতকোত্তর, বাংলা বিভাগ,
বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, বাঁকুড়া

সারসংক্ষেপ : বাংলা সাহিত্যে ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ বিদ্যমান। কখনো রাজনৈতিক খুনাখুনি,দ্বন্দ্ব,জটিলতার স্বাদ; কখনো অর্থনৈতিক শ্রেণির মধ্যেকার দুর্বলতার স্বাদ; কখনো পারিবারিক মধুর,তিক্ততা,বিষের স্বাদ। বাংলা সাহিত্যে আপন পরিবারের সদস্যের হাতেই পরিবেশিত হয়েছে বিষের তরোয়াল। সেই বিষের তরোয়ালেই রক্তাক্ত হয়েছে পরিবারের তারুণ্যের সদ্য স্পর্শলব্ধ সন্তানরা। মাইকেল মধুসূদন দত্তের **"মেঘনাদবধ"** কাব্যে রাবনের পুত্রহারা করুণ হাহাকারে মিশেছে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের **"সাজাহান"** নাটকে সাজাহানের পুত্রহারা সন্তানের মর্মভেদী যন্ত্রণা। মৃত্যুর এই করাল গ্রাসের পরেই দুই সম্রাটের মধ্যে শুরু হয়েছে রাজধর্ম ও পিতৃধর্মের মধ্যেকার দ্বন্দ্বচেতনা। কিন্তু পরে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে তাঁদের হৃদয়ের পথ ভিন্ন গতিপ্রাপ্ত হয়। তাই দুই সমগোত্রীয় সম্রাটের হৃদয়ে একদিকে জয়লাভ করে রাবনের রাজধর্ম ও অন্যদিকে জয়লাভ করে সাজাহানের পিতৃধর্ম।
সূচক শব্দ : পরিবার, তরোয়াল, রক্তাক্ত, দ্বন্দ্বচেতনা, জয়লাভ।

মূল আলোচনা : কালতিক্রম্য রণযুদ্ধতে পারদর্শী দুই দিগ্বিজয়ী সম্রাটের বাহ্যিক রণসজ্জায় সজ্জিত সুকোঠর বলবান প্রকোষ্ঠের মধ্যে বাঁধা না পড়ে প্রবেশ করব অন্তরের মণিকোঠায়। মনের স্তরায়ণে একদিকে পিতৃহৃদয়ে যাঁর বিম্ব; অন্যদিকে রাজসিংহাসনে তাঁরই প্রতিবিম্ব। সাহস,বীরত্ব ও প্রজাদরদী চেতনা যাঁদের অঙ্গের ভূষণ। দুই সম্রাটের জীবনালেখ্যে বীররসের সঙ্গে মিশে গেছে করুণ রসের রক্তস্রোতধারা। কিন্তু তবুও এই দুই সম্রাটের রক্তস্নাত করুণ কথায় আছে একদিকে পুত্রহারা রাবনের পুত্রহত্যাকারী কুচক্রী শত্রুর প্রতি ক্রুদ্ধতা; অন্যদিকে পুত্রহারা সাজাহানের পুত্রহত্যাকারী অপর সন্তানের প্রতি মমত্ববোধ।

দুই সম্রাটের আপন রক্তই ছলনার দ্বারা রক্তাক্ত করে কেড়ে নিয়েছিল বীরপুত্রদের। বিভীষণ ও ঔরঙ্গজীবের বিশ্বাসঘাতকতায় মুখ থুবড়ে পড়েন ইতিহাসের পদচিহ্ন স্থাপনকারী রাজারা। ভেঙে পড়ে তাঁদের সুকঠিন ব্যক্তিত্ব; বেড়িয়ে আসে পাথরভেদী অশ্রুধারা। ক্ষণিক পড়েই সেই স্রোতধারায় বাঁধ হয়ে দাঁড়ায় সম্রাটদ্বয়ের রাজধর্মের প্রতি কর্তব্যপরায়ণতা; মূর্ছিত হয়ে পড়ে পিতৃত্বের সুদীর্ঘ কোমল বন্ধন।

পুত্রহারানোর প্রতিশোধের আগুন অন্তর্গাত্রে জ্বেলে বীরত্বের বিদ্যুৎ ঝলকে ওঠে সম্রাট রাবনের বলিষ্ঠ কণ্ঠে-

"দেখিব কি গুণ ধরে রঘুকুলমণি!

অরাবণ, অরাম বা হবে ভব আজি!"

এমনই দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ী স্বর শোনা যায় বলশালী, প্রাক্তন, প্রবীণ পুত্রহারা সাজাহানের কণ্ঠেও -

"...আমি বৃদ্ধ সাজাহান বটে; কিন্তু আমি সাজাহান।"

এই দুই সমগোত্রীয় সম্রাটই বহিঃশত্রুর দ্বারা নয়; ঘরশত্রুদের দ্বারা সর্বসুখ বর্জিত হয়ে অন্তর্লীন যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হন।

রাবন এবং সাজাহানের হৃদয়ে পাশাপাশি বাসা বেঁধেছিল রাজধর্ম ও পিতৃধর্মের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী রূপ। তাঁরা উভয়ই আদর্শ কর্তব্যপরায়ণশীল রাজার সাথে আদর্শ স্বামী ও আদর্শ পিতা। স্ত্রী দুঃখের অর্ধেক ভাগ গ্রহণে এগিয়ে এসেছেন সম্রাটদ্বয়। পুত্রহারা স্ত্রীর দুঃখের সহব্রতী যেন তাঁরা। রাবন স্ত্রীর দুঃখে সহমর্মী হয়ে বলেছেন -

"বিলাপের কাল, দেবী চিরকাল পাব।

– – – – – – – –

– – – – – – – –

বিরলে বসিয়া দোঁহে স্মরিব তাহারে / অহরহঃ।"

স্ত্রীর সুখ, দুঃখ ভাগ করার দৃঢ় সংকল্পচ্যুত নন দুই সম্রাটই। তাই নিহত পুত্রদের যন্ত্রণার কথা যেন সাজাহান মৃত স্ত্রীর সাথে ভাগ করে নিতে চেয়ে বলেছেন -

"মমতাজ! বড় ভাগ্যবতী তুমি, যে এ মর্মন্তুদ দৃশ্য তোমায় দেখতে হচ্ছে না। বড় পুণ্যবতী তুমি, তাই আগেই মরে গিয়েছো -"

মূল মেরুদন্ড আপনজনের দ্বারা ভেঙে পড়লেও তাঁরা তীব্রভাবে শাসন ব্যবস্থার কাজে সজাগ। প্রজাদরদী দুই রাজা জানেন ও বিশ্বাস করেন তাঁরা দুর্বল হলেও, তাঁদের শক্তিক্ষয় হলেও প্রজারা তাঁদের বিরোধিতা করবে না বরং প্রজারা সর্বদা তাদের জন্য আত্মোৎসর্গকারী রাজার সঙ্গে থাকবে।

উভয় বীর প্রতাপ সম্রাট বেঁচে থাকার শেষ আস্তানা হারিয়েছেন। বৃদ্ধাবস্থার সকল কর্ম সহায়ক লাঠিসম পুত্রদের হারিয়েছেন। একজন নয় একাধিক সুস্থ,সবল পুত্রদের নিহত হতে দেখেছেন দুই সম্রাট। নিজের পরিবারের মানুষদের শঠতা ও প্রতারণার দ্বারা অকালে ঝড়ে পড়েন রাবনের পুত্র বীরবাহু ও মেঘনাদ এবং সাজাহানের তিন পুত্র দারা, সুজা, মোরাদ। এমন আকাল রাবনের ভাই বিভীষণ এবং সাজাহানের কনিষ্ঠ সন্তান ঔরঙ্গজীব কর্তৃক সৃষ্ট।

দুই কালজয়ী লেখকদের কলমে ভিন্ন ভিন্ন স্রোত বারবার মিশে একসাথে চলেছে পথ। দুই সম্রাটের জেষ্ঠ্য পুত্ররা ছিল পিতার বাধ্য,অনুমতির আজ্ঞাকারী সন্তান-

দুই ক্ষেত্রেই এই পুত্রদের মৃত্যুতে হোঁচট খায় সম্রাট দ্বয়ের রাজধর্ম; বেড়িয়ে আসে পিতৃধর্মের রূপ। সম্রাটের হৃদয়ে চলতে থাকে রাজধর্ম ও পিতৃধর্মের দোলাচলতা। এই দ্বয়ের কারণেই টান পড়ে তাঁদের ব্যক্তিত্বে। জীবনে নিত্য অতিথি হয়ে আসে দুঃখ। **"Character is destiny"**- অর্থাৎ চরিত্রই নিয়তি। গ্রিক এই রীতির ছকেই নির্মিত রাবন ও সাজাহান চরিত্রের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ কাঠামো। চরিত্রদের নিজস্ব ভুলের কারণেই তাঁদের জীবনে নেমে এসেছিল ট্র্যাজেডিপূর্ণ করুণা ও ভীতি।

আত্মাভিমান ও কর্তব্যবোধের তীব্র দ্বন্দ্বের এবং করুণ সমাধানের একটা বিভক্ত আত্মার আত্মক্ষয়ের তীব্র যন্ত্রণা ও বেদনার করুণ আলেখ্য লক্ষিত হলেও তাঁদের দ্বন্দ্বচেতনা সম্পূর্ণ ভিন্ন গতি প্রাপ্ত হয়েছে। রাবনের চিন্তা-চেতনায় জয়লাভ করে রাজধর্ম। তিনি রাজধর্মের পালনকারী হয়ে পুত্রের মৃত্যুতে গৌরবাশ্রু ফেলে বলেছেন -

"যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ, কুমার
প্রিয়তম, বীর-কুল-সাধ এ শয়নে / সদা!"

এমন রাজধর্মের প্রতি মৃত্যুর বিজয় গর্ব সাজাহানের মধ্যে নেই। সাজাহানের চিন্তা-চেতনায় জয়লাভ করেছে পুত্র বাৎসল্য প্রেম। তাই ঔরঙ্গজীব তাঁর জেষ্ঠ্য ভ্রাতাদের হত্যা করলেও সাজাহান তাঁকে রাজকীয় আজ্ঞায় দন্ড দিতে পারেন নি; বরং তিনি বলেছেন -

"হা রে বাপের মন!এতদিন ধরে 'তোর হৃদয়ের নিভৃতে বসে'এইটুকুর জন্য আরাধনা কর্ছিলি... ঔরঙ্গজীব! তোমার সব অপরাধ ক্ষমা করলাম।"

এখানেই দুই রাজার হৃদয়ের প্রবাহ দুই দিকে বাহিত হয়ে চলেছিল। সকল নদী মোহনায় এসে মিলিত হয়। কিন্তু রাবন ও সাজাহানের হৃদয়ের ফল্গুধারা যেন রচনার শেষলগ্নে এসে দুই ভিন্ন গতি লাভ করে।

আধুনিক যুগের সঙ্গে সঙ্গেই ঘটেছে চরিত্রের ভাবনার দিক্ বদল। তাই রাবনের রাজধর্ম জয়লাভ করলেও আধুনিকতার কলমে জয় হয়েছে সাজাহানের পিতৃধর্মের। বর্তমান যুগের সঙ্গে সঙ্গে সাজাহানের এই জয় হবে অনন্ত ও শ্বাশত। পিতৃ হৃদয়ের মধ্যে মাতৃ স্নেহের স্পর্শ আধুনিকতার ফসল। সুতরাং দুই সম্রাটের হৃদয়ের মিল ও অমিল ভাবনায় কখনো এসেছে সমাজবাস্তবতা, কখনো লেখকের কল্পনাপ্রসূত ভাবনার চিন্তণ - যা সমকালীন দলিল স্বরূপ।

গ্রন্থপঞ্জি :

১. Bywater Ingram, "ARISTOTLE ON THE ART OF POETRY", 2000, OXFORD.

২. দাশ শিশিরকুমার, "কাব্যতত্ত্ব অ্যারিস্টটল", জুন ২০১৯, কলকাতা ।

ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যে ‘হাস্যরস’-এর সন্ধ্যান

বিউটি খাতুন
গবেষক, বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : অষ্টাদশ শতকের কবি ভারতচন্দ্র যে প্রেক্ষাপটে কাব্য রচনা করেছেন তার মধ্যে বেশির ভাগেই প্রকাশ পেয়েছে কৌতুক ও ব্যঙ্গের মিশ্রণের চিত্র। ভারতচন্দ্রের তৎকালীন সময়ে মুঘল সাম্রাজ্যের সূর্য অস্তগামী, বিদেশী বণিকদের আগমণ, বর্গীয় হাঙ্গামায় দেশব্যাপী অত্যাচার-উৎপীড়ন এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে বাংলায় হাহাকার, শোষণ, অন্নাভাব, সবমিলিয়ে বিশৃঙখল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ভারতচন্দ্র ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যে দেব-দেবী চরিত্রে হাস্যকৌতুকের মাধ্যমে কলম ধরেন যা তরবারির কার্যে রূপ লাভ করেছে। আমরা জানি মধ্যযুগের সমস্ত কাব্যেই কম বেশি হাস্যকৌতুকের বর্ণনা পাওয়া গেলেও ভারতচন্দ্রের কাব্যের হাস্যরস সম্পূর্ণ আলাদা ভাবে মোড় নিয়েছে। কাব্যে দেখি দেবচরিত্র যখন সাধারণ মানুষের ন্যায় ভুল, ভ্রান্তি, কোন্দল, সন্দেহ, কষ্টাভাব, বিবাদ এই সব আচরণ করে তখন আমদের মনে সত্যিই হাসির উদ্রেক হয়। ভারতচন্দ্রের বিদ্রূপের হাসিতে সমাজ ও রাজসভাকে ব্যঙ্গ করাই ছিল একমাত্র লক্ষ। আমরা এই নিবন্ধে ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্য অবলম্বনে হাস্যরসের চিত্র বর্ণনা করার চেষ্টা করব।

শব্দসূচক : ভারতচন্দ্র, অন্নদামঙ্গল, হাস্যরস, সমাজ, বিদ্রূপ, বাংলার সমকালীন চিত্রপট।

মূলপ্রবন্ধ :

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘পঞ্চভূত’ প্রবন্ধ গ্রন্থের ‘কৌতুকহাস্য’ ও ‘কৌতুকহাস্যের যাত্রা’ গ্রন্থদুটিতে হাসির স্বরূপ সম্পর্কে বলা হয়েছে। ঘটনা বা চরিত্রের অসঙ্গতিই হাসির মূল উৎস। কৌতুকরস বা হাস্যরস যাই বলিনা কেন আমাদের পূর্বাচার্যদের ধারণা খুব একটা উন্নত মানের ছিল না। মঙ্গলকাব্য ধারার শেষ কবি ভারতচন্দ্র একই সঙ্গে যুগসন্ধির ও রাজসভার কবি। আমরা জানি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের হাস্যরসের সর্বাপ্রেক্ষা প্রধান কবি ভারতচন্দ্র। কবি ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম ঘটিয়েছেন হাস্যরস ও আদিরসের মাধ্যমে। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের কবিগণের মধ্যে যে নিস্তেজ ও একঘেয়ে ভাব ধারাবাহিকভাবে চলে এসেছে তা অতিক্রম করার চেষ্টা করেছেন ভারতচন্দ্র, আর তাঁর কাব্যের রঙ্গব্যঙ্গ থেকে দেবতা ও মানব কেউ-ই বঞ্চিত হয়নি। এই প্রসঙ্গে—

> "খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যের সর্বসংস্কারমুক্ত যে যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, ভারতচন্দ্রের ব্যঙ্গপ্রধান রচনার ভিতর দিয়াই তাহার প্রথম সোপান রচিত হইয়াছিল। মধ্যযুগের সমাজের বুকে যে ভক্তিভাব তাহার অচল আসন স্থাপন করিয়াছিল।... ভারতচন্দ্রের ব্যঙ্গের কষাঘাত হইতে দেবতারাও রক্ষা পান নাই।"[১]

কবি ভারতচন্দ্র জীবনের ব্যথা-বেদনা, অশ্রুকে বাঁকা হাসির ভাষায় রূপান্তরিত করেছেন। এই বিদ্রূপের হাসি সমাজের, জীবনের এমনকি নিজের প্রতি ও অনেক সময়েই তিনি বক্রকুটিল হাসির মুখোশে নিজেকে ঢেকে রেখে পরের মনোরঞ্জন করে বাহবা পেতে চেয়েছেন। ফলত, বুদ্ধিবৃত্তির সেই হাসির সঙ্গে হৃদয়বৃত্তির সংস্পর্শে সাধিত হয়নি। কাব্যের ঘটনা সংস্থাপন, সংলাপ ও চরিত্র—এই তিন বিন্দুতেই কবি হাসিকে অঞ্জলিত করেছেন, সে হাসি মূলত তাঁর বাক্ চাতুর্যের ওপরই নির্ভরশীল।

আমরা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, শ্রীকৃষ্ণবিজয়, থেকে শুরু করে মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, শিবায়ণ, এসব কাব্যের হাস্যরসের থেকে ভারতচন্দ্রের কাব্যের হাস্যরস পুরোপুরি আলাদা, এ ঠিক মনের হাসি নয়, তিরস্কারের মিশ্রণজনিত মুখের হাসি। প্রমথ চৌধুরী ভারতচন্দ্র সম্পর্কে বলেছেন–

> "সাহিত্যের হাসি শুধু মুখের হাসি নয়, মনেরও হাসি। এ হাসি হচ্ছে সামাজিক জড়তার প্রতি প্রাণের বক্রোক্তি, সামাজিক মিথ্যার প্রতি সত্যের বক্রদৃষ্টি।"[২]

কবি ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের উদাহরণ সহযোগে নিম্নে হাস্যরসের বর্ণনা করা হল–

কাব্যে লক্ষ করা যায়, দক্ষ যজ্ঞ কালে শিব অনুচরদের 'যুদ্ধং দেহি' মূর্তি বর্ণনায় পরে কবি তাদের ক্রিয়াকলাপের যে ছবি এঁকেছেন, বিশেষ করে ওই তাণ্ডবের মধ্যে ও ব্রাহ্মণের ভোজ গ্রহণ—তাতে কৌতুকের উদ্রেক হয়—

"রুদ্র দূত ধায় ভূত নন্দী ভৃঙ্গী সাঙ্গিয়া।
ঘোরবেশ মুক্তিকেশ যুদ্ধরঙ্গরঙ্গিয়া।।
ভার্গরের সৌষ্ঠবের দাড়ি গোঁপ ছিণ্ডিল।
পৃষণের ভূষণের দন্তপাঁতি পাড়িল।।
বিপ্র সর্ব্ব দেখি পর্ব্ব ভোজ্য বস্তু সারিছে।
ভূতভাগ পায় লাগ নাথি কীল মারিছে।।"[৩]

আর পরবর্তী সময় শিবের ধ্যানভঙ্গের পর কামও শিবের ভয়ে পালিয়ে যাওয়ার পর অপ্সরা কিন্নরদের পশ্চাদ্ধাবন সবিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। এই পরিবেশে নারদের মুখে বিবাহ প্রস্তাব শুনে—

"শুনি শিব কন ওরে বাছাধন
ঘটক হও তাহার।।
মুনি কহে দ্রুত সকলি প্রস্তুত
বর হয়ে কবে যাবা।।
কহেন শঙ্কর বিলম্ব না কর
আজি চল মোর বাবা।।"[৪]

এ থেকে বোঝা যায় বিয়ে পাগল মহাদেবের এমন চিত্তচাঞ্চল্য আমাদের হাসিকে অনর্গলিত করে দেয়।

আমরা দেখি কাব্যে 'রতি বিলাপ' এ শোকের গভীরতা নেই, আর 'শিব বিবাহ যাত্রা'য় শিবকে নারদের খুরা সম্বোধন। বরযাত্রী ভূতগণের হুলহুলি-কৌতুকপ্রদ। 'শিববিবাহ' ঘটনাও হাসির উদ্রেক করে। ভারতচন্দ্রের শিব যে কাণ্ড কারখানা করেছেন তা অনেকটা চমকপ্রদ হয়েছে কবির হাতে। আমরা লক্ষ করি, শিবের বিবাহ অংশে গরুরের ভয়ে সাপেরা শিবের শরীর থেকে পলায়ন করে আর বাঘছাল খসে পড়লে শিব বিবাহ সভায় উলঙ্গ হয়। এতে উমার মাতা মেনকা ও এয়োগণ লজ্জা পায় বরের দিগম্বর অবস্থা দেখে—

"বাগছাল খসিল উলঙ্গ হৈলা হর।
এয়োগণ বলে উমা ও মা এ কেমন বর।।
মেনকা দেখিলা চেয়ে জামাই লেঙ্গটা।
নিবায়ে প্রদীপ দেয় টানিয়া ঘোমটা
নাকে হাত এয়োগণ বলে আই আই।
মেদিনী বিদরে যদি তাহাতে সামাই।।
দেখিয়া সকল লোক মশাল নিবায়।
শিবভালে চাঁদ অগ্নি আলো করে তায়।।"[৫]

এখানে শ্বাশুড়ির সামনে জামাইয়ের বস্ত্রহীন হওয়ার দৃশ্যটি সত্যি অসংগতি বহন করে, আর একই সঙ্গে উলঙ্গ শিব অশ্লীতার পরিচয় দেয়। তাই এখানে অসংগতি আর অশ্লীলতা যুক্ত হয়ে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে। এই বর্ণনায় রুচির বিকৃতি আছে ঠিকই, তবে কবি কৌতুক জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চেয়েছেন এবং তাতে তিনি সার্থকও হয়েছেন।

আমরা জানি সমগ্র মঙ্গলকাব্যে হরগৌরির কোন্দলের বিষয় রসনিয় ঘটনা। ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে সেই কোন্দলকে যেন গ্রাম-বাংলার গৃহস্থ পরিবারের স্বামী-স্ত্রীর নিত্য নৈমিত্তিক কলহ রূপে বর্ণনা করেছেন। কবি হরগৌরির প্রতীকী জীবন নিয়ে বাঙালি পরিবারের দাম্পত্যকলহের ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তবে কাব্যে লক্ষণীয় যে হরগৌরির বিবাহের পরে তাদের সংসারে প্রতিনিয়ত অভাব। আর

এই 'অভাবের ফলেই স্বভাব নষ্ট' প্রবাদে প্রচলিত আছে। তাই শিব পার্বতীর সংসারে দেখা দিয়েছে কলহের। পার্বতীর প্রতি শিবের অভিযোগ নিম্নে বর্ণিত হল–

"নিত্য নিত্য ভিক্ষা মাগি আনিয়া যোগাই।
সাদ করে এক দিন পেট ভরে খাই।।
সকলের ঘরে ঘরে নিত্য ফিরি মেগে।
সরম ভরম গেল উদরের লেগে।।
ভিক্ষা মাগি ভিক্ষা মাগি কাটিলাম কাল।
তবু ঘুচাইতে নারিলাম বাঘছাল।।
আর সবে ভোগ করে কত মত সুখ।
কপালে আগুন মোর না ঘুচিল দুখ।।

....
বিধাতার লিখন কাহার সাধ্য খণ্ডি।
গৃহিণী ভাগ্যের মত পাইয়াছি চণ্ডী।।
সর্ব্বদা কন্দল বাজে কথায় কথায়।
রসকথা কহিতে বিরস হয়ে যায়।।"[৬]

সংসারের অভাব জর্জরিত অবস্থার কথা শিবের অজানা নয়। আর সংসারে গণ্ডগোলের ভয়ে শিব কিছু বলতে চায়না। কিন্তু সংসারে পুরুষ বলবে আর নারী চুপটি করে থাকবে এই দৃশ্য বিরল, আর কলহে পুরুষ অপেক্ষা নারীর বাক্‌পটুতা অনেক। তাই শিবের সামান্যতম প্রতিক্রিয়াতেই পার্বতী যেন বাঘিনীর রূপ ধারণ করে—

"হায় হায় কি কহিব বিধাতা পাষণ্ডী।
চণ্ডের কপালে পড়ে নাম হৈল চণ্ডী।।
গুনের নাহিক সীমা রূপ ততোধিক।
বয়সে না দেখি গাছ পাথর বল্মীক।।

....
অলক্ষণা সুলক্ষণা যে হই সে হই।
মোর আসিবার পূর্ব্বকালি ধন কই।।
গিয়াছিলে বুড়াটি যখন বর হয়ে।
গিয়াছিলে মোর তরে কত ধন লয়ে"[৭]

স্বাভাবিকভাবে দেবী পার্বতীর অভিযোগ উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছিল ফলত কৌতুকরসের সৃষ্টি করেছে –

"করেতে হইল কড়া সিদ্ধি বেটে বেটে।
তৈল বিনা চুলে জটা অঙ্গ গেল ফেটে।।
শাঁখা শাড়ী সিন্দুর চন্দন পান গুয়া ।
নাহি দেখি আয়তি কেবল আচাভূয়স।।"[৮]

পার্বতীর খ্যাংরামারা ব্যবহারে শিব লজ্জাবশত গৃহত্যাগ করে বৃষবরের সাহায্যে ভিক্ষা যাত্রায় গমন করেন। শিব ভালো করেই জানেন বৃদ্ধ বয়সে তার পক্ষে কৃষিকাজ বা বাণিজ্য করা একেবারেই সম্ভবপর নয়। শিব মনে মনে ভাবেন, সংসারে নারী যে পুরুষের স্বতন্ত্রতা, সে পুরুষ জীবিত অবস্থাতেই মরা। তার পক্ষে গৃহে থাকা একেবারেই অনুচিত। সংসারে অনেক আনার পরেও যে ঘরে অভাব ঘোচে না, সে ঘরে থাকা তখন সত্যিই অপ্রয়োজন। কবি ভারতচন্দ্র এখানে কৌতুকের সৃষ্টি করলেও গ্রাম-বাংলার দুর্ভিক্ষপীড়িত অশান্তিময় সংসার জীবনের ছাঁয়া ফুটে উঠেছে।

কবি ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল কাব্যের 'হর-গৌরির কথোপকথন', 'হরগৌরির বিবাদ' 'শিবের ভিক্ষাযাত্রা' প্রভৃতি অংশে কৌতুক মুখর কবির মুখটি আমাদের হৃদয়ে উঁকি দেয়। আমরা লক্ষকরি, অশান্তিময় সংসার ত্যাগ করে শিব ভিক্ষার উদ্দেশ্যে গমন করলে, তার পেছনে রঙ্গরসিকতাময় বালকের দল। বালকদের দাবি ছিল শিবের কাছে যা হাস্যকর পরিবেশের সৃজন করে,

"কেহ বলে ঐ এলো শিব বুড়ো কাপ।
কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ।।
কেহ বলে জটা হৈতে বার কর জল।
কেহ বলে কপালে জাল দেখি অনল।।"[৯]

এখানে শিবের দুর্গতিতে করুণা হলেও বালকদের ব্যবহারে হাসির উদ্রেক করে। শিব ভয়ানক পরিস্থিতিতে বাইরে বের হলে বালকেরা না জেনে শিবকে সাপ খেলা দেখাতে, গীত গাইতে, ডমরু বাজাতে, নাচ দেখাতে আদেশ করে, বিনিময়ে শিবকে ধুতুরার ফল, ফুল, ভাঙ্গ, পোস্ত-আফিঙ্গ দেয়, এই হাস্যময় পরিবেশ সৃষ্টিতে ভারতচন্দ্র অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

এছাড়া ব্যাসের ভিক্ষাকালে দুর্গতি, গঙ্গাকে তিরস্কার, ব্যাসকে গঙ্গার তিরস্কার—প্রভৃতি অংশে কবির প্রকৃতির স্বভাব চাপল্য ফুটে উঠেছে। ব্যাসদেবের দুর্জয় আত্মাভিমান, বিড়ম্বনার ঘটনা সত্যিই কৌতুকরঙ্গে, বিষাদে, বেদনায় ও বিদ্রূপের আঘাতে নতুন রূপের আশ্রয় নিয়েছে। ব্যাস বৈষ্ণব ছিলেন আর হরিভক্তি ব্যথিত অন্য কিছু জানেন না, তাই শিষ্যদের নিয়ে কাশীতে নানা রঙ্গে হরিসংকীর্তণেরর অংশ নিয়েছেন। তার তা হাস্যরসের উদ্রেক করেছে,

"কীর্ত্তনে ঢালিয়া দেহ গড়াগড়ি দেয় কেহ
কেহ তারে ধরে দেয় কোল।
উর্দ্ধ ভুজে উর্দ্ধ পদে কেহ নাচে প্রেমমদে
কেহ বলে হরি হরি বোল।।"[১০]

ব্যাসের গদগদ হরিভক্তিতে কারো কিছু বলার নেই। তবে ব্যাসের মধ্যে প্রকাশ্যে শিবনিন্দায় নন্দীর মধ্যে ক্রোধের সূচনা হয়, আর রাগান্বিত নন্দী ক্রোধদৃষ্টিতে তাকালে ব্যাসের ভুজস্তম্ভ, কণ্ঠরোধ হয় আর চিত্তের পুতুলির মতো তার অবস্থা দেখে

নানা ভাবে উপহাস করে শৈবসম্প্রদায়। ব্যাসের মধ্যে যে গোঁড়ামিকতার রূপ দেখা দিয়েছে তা কবি নিপুণ কৌশলে ব্যঙ্গ করেছেন কাব্যের মাধ্যমে। আর পণ্ডিৎ ও জ্ঞানী ব্যাসের বদলে অহংকারী ব্যাসের দুর্দশায় আমাদের মনে এক হাস্যময় চাপা হাসির উদ্রেক হয়। শুধু তাই নয় ব্যাস দুর্দশাগ্রস্ত জীবন থেকে রেহাইয়ের জন্য অন্নদার তপস্যা করেন, এতে সন্তুষ্ট হয়ে ব্যাসকে মুক্তির জন্য দেবী অন্নদার চাঞ্চল্য এবং ব্যাস সন্নিধানে গমনোদ্যোম হলে এই প্রসঙ্গে শিবের বক্তব্য—

"হাসিয়া কহেন হর বুঝি তাচর দিবা বর
মোরে মেনে দয়া না ছাড়িও।
আমি বৃদ্ধ তাই কই জানি নাই তোমা বই
একমুটা অন্ন মেনে দিও।।"[১১]

এখানে শিবের উক্তিতে অসাধারণময়, সংসারজীবনে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে রঙ্গরসিকতার পরিচয় বহন করেই উক্তিতে, এটা সত্যিই হাস্যকরের তা কবি দেব-দেবীদের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। 'অন্নদার জরতী বেশে ছলনা' কৌতুক সিদ্ধির চমৎকার দৃষ্টান্ত। এখানে গোপাল হালদারের মতামত—"চতুর মানুষের রঙ্গ-রসিকতার দৃষ্টিতে ভারতচন্দ্র সমস্ত দেবদেবীকে দেখেছেন—দেবদেবীর প্রতি তাঁর ভয়-ভক্তি বিশেষ নেই; কলা-কুশল কবির মতো তিনি কাব্যবিন্যাস করেছেন সিদ্ধ হস্তে; বিশেষ করে রঙ্গ ও ব্যঙ্গ মজা করেছেন ব্যাসদেবকে নিয়ে।...নারদ, ব্যাসদেব প্রভৃতি ঋষিরা ইতিপূর্বেই হয়ে উঠেছিলেন সঙ্ এর মতো হাস্যকর বূড়ো।"[১২]

আমরা দেখি কাব্যে হরগৌরি বা ব্যাসকে নিয়েই হাস্যকৌতুকময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়নি আরো লক্ষণীয় যে শাপগ্রস্ত বসুন্ধরের দেবী অন্নদাকে বিনয়-বাক্যে দুঃখ লাগে না। আমরা দেখি 'বসুন্ধর জন্ম' অধ্যায়ে অন্নদার কাছে বসুন্ধরার প্রতিশোক বর্ণনায়ও দুঃখের লেশমাত্র হৃদয় স্পর্শ করে না বরং হাস্যের উদ্রেক করে।

আমরা ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে লক্ষ করি, দেবাদিদেব মহাদেবের কৌতুক ও করুণমূর্তি বাংলা সাহিত্যে দুর্লব। তৎকালীন সমাজের নোংরামো অবস্থা শিবের মাধ্যমে ব্যঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে। দেবতার দুর্গতিতে আমাদের হাসি দেখা দিয়েছে আর এটাই চেয়েছিলেন ভারতচন্দ্র। শুধু তাই নয়, ভারতচন্দ্রের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে বাঙালি স্ত্রী সমাজের কৌতুহল, ঈর্ষাপরায়ণতা, চিত্তচাঞ্চল্য ও দ্বন্দ্বতার চিত্রটি। আমরা জানি বাঙালি ঘরের মেয়ের লজ্জার শেষ নেই তাই বাঙালি ঘরের মেয়ের বিবাহের নামে কি রকম লজ্জাশীলতা ও কৌতুহলতা হিমালয়ের কন্যা উমার মধ্যদিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। উমার বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে নারদের আগমণ হলে আমরা দেখি—

"বিবাহের নামে দেবী ছলে লজ্জা পেয়ে।
কহি গিয়া মায়ে বলি ঘরে গেলা ধেয়ে।।
আল্যা করি কোলে বসি ছেঁদে ধরি গলে।
ও মা ও মা বলি উমা কথা কন ছলে।।"[১৩]

লক্ষণীয় বিষয় যে হরগৌরির বিবাহের সময় বরযাত্রীদের মধ্যে একে অপরের সঙ্গে কোন্দলের সূচনা হয়, আর সব কোন্দলের মূলে একটাই হাত নারদমুনির। নারদ কোন্দলের মন্ত্র পাঠ করেন এই ভাবে—"আয় রে কন্দল তোরে ডাকে সদাশিব। মেয়েগুলা মাথা কোড়ে তোরে রক্ত দিব।।"[১৪]

এতে অসাধারণ হাস্যরসের পরিচয় বহন করেছে। নারদমুনি কোন্দল প্রিয় তাই হরগৌরির দাম্পত্যময় জীবনে প্রবেশ করেও কোন্দলের সৃষ্টি করেন, আমরা তৎকালীন ও বর্তমান সময়েও যদি দৃষ্টি গোচর করি তাহলে নারদের মতো চরিত্রের অভাব হবে না। বাংলায় প্রচলিত একটি বাক্য আছে যে মাসির কাছে পিসির নামে ও পিসির কাছে মাসির নামে বলে কান ভারী করা যা নারদ চরিত্রের প্রতিরূপ। আসলে এই চরিত্রের মানুষগুলো নীরব ও শান্তিময় আবহাওয়া সহ্য করতে নারাজ।

পরিশেষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে ভারতচন্দ্র সম্পূর্ণ অন্নদামঙ্গলকেই কৌতুকের সুরে বর্ণনা করেছেন। জীবনের গভীরতর দিকের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে হাস্যকর দিকের প্রতি তাঁর সদাজাগ্রত কৌতুকহল- সংলাপ, চরিত্র ও পরিস্থিতি বর্ণনার মধ্যে দিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। তাঁর কাব্যে শুরু, লঘু, চপল ঊর্মির নিক্কণ শোনা যায়। সমাজ সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ধারণা থাকা একান্ত জরুরি হাস্যরসিকের, এর ঘাটতি থাকলে হাস্যময় পরিবেশ সৃজন করা অসম্ভব। কবি ভারতচন্দ্র এরকম সমাজ অভিজ্ঞতায় পারদর্শী ছিলেন বলেই সংসার জীবনের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যতা হাস্যরসের প্রকাশ করতে পেরেছেন। একথা স্বীকার্য যে, বুদ্ধির দীপ্তিই হাস্যরসের মূল ভিত্তি ভারতচন্দ্রের আর তাই সামাজিক অসঙ্গতি, অন্যায়, অত্যাচার, শোষণের বিরুদ্ধে ধারালো তরবারির মতো ঝলসে উঠেছে। অন্নদামঙ্গলের হাস্যরস সমাজের সাধু ব্যক্তিদের বিরক্তির কারণ হয়েছে। প্রমথ চৌধুরীর মতে—

> "হাস্যরস সে অনেক ক্ষেত্রে শ্লীলতার সীমা লঙ্ঘন করে, তার পরিচয় আরিস্টফেনিস থেকে আরম্ভ করে আনাতোল ফ্রাঁস পর্যন্ত সকল হাস্যরসিকের লেখায় পাবেন। এর কারণ হাসি জিনিসটাই অশিষ্ট, কারণ তা সামাজিক শিষ্টাচারের বহির্ভূত।"[১৫]

ভারতচন্দ্রের সৃষ্ট হাস্যরস প্রচেষ্টায় অনেক সময় স্থূল রুচির পরিচয় পাওয়া যায়; একথা সত্যি। কিন্তু যুগ-পরিবেশ এবং যে কারণে এই কাব্য রচিত হয়েছিল, সে কথা মনে রাখলে ভারতচন্দ্র ক্ষমার যোগ্য। তাছাড়া আদি, বীর বা করুণরসকে নয়, হাস্যরসকে অঙ্গীরস হিসেবে মন-এ নিয়ে কাব্যসৃজনের প্রচেষ্টায় ভারতচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে নান্দীকার। ফাঁপা সভ্যতার আলোর জৌলুসকে নিভিয়ে দিতে চেয়েছেন ফুৎকারে।

তথ্যসূত্র :

১। ভট্টাচার্য, আশুতোষ : *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস,* প্রথম যৌথ প্রকাশ : মে, ২০১৫, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ এবং সপ্তর্ষি প্রকাশক -এর যৌথ উদ্যোগে, কলকাতা, পৃ: ৬৫৬।

২। চক্রবর্তী, সুমিতা : *প্রমথ চৌধুরী প্রবন্ধসংগ্রহ,* প্রথম প্রকাশ : ৭-ই অগাস্ট, ১৯৫২, কলকাতা, পৃ : ২৫৩।

৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ও দাস, সজনীকান্ত (সম্পা) : *ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী,* প্রথম সংস্করণ : ভাদ্র ১৩৫০, পুনমুদ্রণ : আশ্বিন ১৪২১, প্রকাশক : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা পৃ : ৩৬।

৪। প্রাগুক্ত , পৃ : ৫১।

৫। প্রাগুক্ত, পৃ : ৬১।

৬। প্রাগুক্ত, পৃ : ৮০।

৭। প্রাগুক্ত, পৃ : ৮২।

৮। প্রাগুক্ত, পৃ : ৮৩।

৯। প্রাগুক্ত, পৃ : ৯০।

১০। প্রাগুক্ত, পৃ : ১২৯।

১১। প্রাগুক্ত, পৃ : ১৬৫।

১২। হালদার, গোপাল : *বাঙলা সাহিত্যে রূপ-রেখা (প্রথম খণ্ড : প্রাচীন ও মধ্যযুগ),* প্রথম অরুনা সংস্করণ ১ লা বৈশাখ ১৪০০, ষষ্ঠ মুদ্রণ : মাঘ ১৪১৯, অরুণা প্রকাশণী, কলকাতা, পৃ: ২০৯।

১৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ও দাস, সজনীকান্ত (সম্পা) : *ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী,* প্রথম সংস্করণ : ভাদ্র ১৩৫০, পুনমুর্দ্রণ : আশ্বিন ১৪২১, প্রকাশক : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, পৃ: ৪৭।

১৪। প্রাগুক্ত, পৃ : ৬৪।

১৫। চক্রবর্তী, সুমিতা : *প্রমথ চৌধুরী প্রবন্ধ সংগ্রহ,* প্রথম প্রকাশ ৭-ই, অগাস্ট ১৯৫২, প্রকাশক : কলকাতা, পৃ : ২৫৩।

সমাজ-রাজনীতি ও লীলা রায়

বিদ্যুৎ সরকার
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
মহারাজা শ্রীশচন্দ্র কলেজ

সারসংক্ষেপ : লীলা নাগ (বিবাহের পরে নাম হয় লীলা রায়) ছিলেন একজন বাঙালী সাংবাদিক। জনহিতৈষী এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের সক্রিয় ব্যক্তি। লীলা নাগ (১৯০০-১৯৭০) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী, পূর্ব বাংলার নারী শিক্ষা ও নারী আন্দোলনের পথিকৃৎ। আসামের গোয়ালপাড়ায় ১৯০০ সালের ২১ অক্টোবর জন্মগ্রহণকারী লীলা নাগ ছিলেন একজন বেসামরিক কর্মকর্তার কন্যা এবং তাঁর পরিবারবর্গ ছিলেন সিলেটের এক সংস্কৃতিমনা ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্য। কলকাতার বেথুন কলেজ থেকে তিনি ইংরেজিতে অনার্সসহ স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন এবং তাঁর শিক্ষাগত সাফল্যের জন্য তাঁকে 'পদ্মাবতী' স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়। তাঁর বাবাকে ঢাকায় বদলি করা হলে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং ১৯২৩ সালে ইংরেজিতে এম.এ ডিগ্রি অর্জন করেন। লীলা নাগ একজন সক্রিয় বিপ্লবী ও আন্দোলনকারী। তিনি শিক্ষা-সংক্রান্ত সংস্কারক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। ছাত্রাবস্থায়ই তিনি এসকল সংগঠনের কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়েন। নারীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের ব্যাপারে জনমত গড়ে তুলতে নিখিল বঙ্গ নারী ভোটাধিকার সমিতি'র যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে লীলা নাগ বিভিন্ন জনসভার আয়োজন করেন। ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে নারীশিক্ষা প্রসারের মূল উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি দীপালি সঙ্ঘ নামে নারীদের একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। দীপালি সঙ্ঘের সাহায্য নিয়ে তিনি দীপালি স্কুল নামে একটি স্কুল ও অন্য বারোটি ফ্রি প্রাইমারি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নারীশিক্ষা মন্দির ও শিক্ষাভবন নামে পরিচিত অন্য দুটি স্কুলও প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলমান নারীদের শিক্ষায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ঢাকায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত একটি স্কুল পরবর্তীকালে কামরুন্নেসা গার্লস স্কুল হিসেবে পরিচিত হয়। ১৯২৫ সালে শ্রীসঙ্ঘ নামে অভিহিত একটি বিপ্লবী দলের তিনি সদস্য হন। ছাত্রীদের জন্য তিনি ঢাকাভিত্তিক একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন এবং আসাম ও বাংলার অনেক স্থানে এর শাখা প্রসারিত করেন। ছাত্রীদের সুবিধার জন্য তিনি কলকাতায় একটি মহিলা হোস্টেল প্রতিষ্ঠা করেন। ঢাকায় গোপন বিপ্লবী দলের সদস্য হিসেবে লীলা তাদের সাহায্য করতেন এবং এ দলসমূহ ও বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের, বিশেষত নারী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সংযোগকারী হিসেবে কাজ করতেন। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারএর মতো সুপরিচিত নারী বিপ্লবীদের প্রেরণার উৎস হিসেবে তিনি প্রভাব রেখেছেন। ১৯২৭-২৮ সালের বিক্ষুব্ধ বছরগুলিতে, যখন নারীরা শারীরিক আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত হয়, তখন লীলা নাগ

মহিলা আত্মরক্ষা ফান্ড নামে একটি ফান্ড গঠন করেন, যা ছিল এ অঞ্চলে প্রথম মার্শাল পদ্ধতিতে আত্মরক্ষামূলক দলের একটি। সাধারণ জনতার পর্যায়ে নারী শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি গণ শিক্ষা পরিষদ নামে পরিচিত একটি প্রতিষ্ঠানও গঠন করেন। লীলা অন্য যে কারণে বিখ্যাত তা হলো নারীদের বিচার্য বিষয়াবলিতে নিবেদিত প্রভাবশালী সাময়িক পত্রিকা জয়শ্রী এর সম্পাদক হিসেবে তাঁর সাহিত্যিক কার্যক্রম। নারীদের দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে পরিচালিত এ সাময়িক পত্রিকাটি নারী কর্তৃক লিখিত নিবন্ধাবলি প্রকাশ করত। লবণ সত্যাগ্রহের একজন সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসেবে লীলা ঢাকা মহিলা সত্যাগ্রহ কমিটি গঠন করেন। শ্রীসঙ্ঘের প্রধান অনিল রায়ের গ্রেফতারের পর এ সংগঠনটির পরিচালনার দায়িত্ব লীলার উপর ন্যস্ত হয়। ১৯৩১ সালের ২০ ডিসেম্বর তাঁকে গ্রেফতার করে বিনা বিচারে কারাগারে প্রেরণ করা হয়। ১৯৩৯ সালে লীলা নাগ অনিল রায়কে বিয়ে করেন। এই দম্পতি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর দলে যোগদান করে ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করেন। ১৯৪০ সালের জুলাই মাসে কলকাতার হলওয়েল মনুমেন্টের বাহ্যিক আকৃতি নষ্ট করার দায়ে লীলা নাগ ও অনিল রায়কে অভিযুক্ত করা হয় এবং পুনরায় তাঁদেরকে কারাদন্ড দেওয়া হয় এবং ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত আটক রাখা হয়। কারামুক্তির পর তাঁকে নেতাজীর দলের সাপ্তাহিক মুখপত্র ফরওয়ার্ড ব্লক-এর সম্পাদনার দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হয়। পরবর্তীকালে তিনি পশ্চিম বাংলায় চলে যান এবং ভারতীয় জাতীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৪৬ সালে তিনি বাংলা থেকে ভারতীয় গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং ভারতীয় শাসনতন্ত্রের খসড়া তৈরিতে অবদান রাখেন। ১৯৪৬ সালের কলকাতা দাঙ্গা ও নোয়াখালী দাঙ্গার পর তিনি নোয়াখালীতে দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনের ত্রাণকার্যে অংশগ্রহণ করেন। ‘ন্যাশনাল সার্ভিস ইনস্টিটিউট' নামক একটি জনকল্যাণমূলক সংগঠনও তিনি স্থাপন করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি পরিপূর্ণ, সক্রিয় জীবনযাপন করেন। ১৯৭০ সালের ২১ জুন ভারতে এই মহীয়সী নারীর জীবনাবসান ঘটে।

সূচক শব্দ : পথিকৃৎ, নারীশিক্ষা, শ্রীসংঘ, জয়শ্রী, জনকল্যাণ, দিপালী সংঘ, দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদ।

ভূমিকা : গত শতাব্দীতে মুক্তবুদ্ধিতে নারীজাতির রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তার কথা যাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন সেই সকল বিপ্লবী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন লীলা রায়। অসাড়, ঘুমন্ত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ নারীদের জাগানোর জন্য বহু মহিলা নূন্যতম সংখ্যকের চরমতম দুঃখবরণ করে নারীজাতিকে আত্মসম্মানবোধে উদ্বুদ্ধ ও জাগ্রত করার পথ অবলম্বন করেছিলেন। স্বাধীনতার পূর্বে উপনিবেশ শাসনকালে শিক্ষিত নারীর সংখ্যা ছিল স্বল্প। শিক্ষিত হলেই বুদ্ধির মুক্তি হয় না এবং সচেতন হলেই সেবার ইচ্ছা ও আত্মত্যাগের সংকল্প আসে না। দীর্ঘদিন ধরে অবরোধের অন্তরালে নারীদের জীবন ও ধর্ম ছিল একান্তভাবে বিশ্বাস, আচার ও

অনুষ্ঠানমাত্র। এইরকম পারিপার্শ্বিকতার ভিতর থেকেও বাঙালি নারীরা খুব অল্প সময়ের মধ্যে দেশ সেবা ও স্বাধীনতার কাজে এবং তৎপরবর্তীকালে দেশগঠনের অভিযানেও জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

১৯০০ সালে আসামে সম্ভ্রান্ত পরিবারে লীলা নাগের জন্ম হয়। তিনি ১৯২১ সালে বেথুন কলেজ থেকে ইংরাজি অনার্স নিয়ে বিএ পাশের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৩ সালে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। প্রসঙ্গত বলা যায় যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তখনও সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। তবুও তাঁর পড়াশুনার তীব্র আগ্রহ, দৃঢ়তা ও শিক্ষার আকাঙ্ক্ষার কারণেই কর্তৃপক্ষ তাঁকে ভর্তির অনুমতি অনেকটা বাধ্য হয়েই দিয়েছিলেন।[১] তাঁর অনমনীয় দৃঢ়তা ও সাহস পরবর্তীকালে ঢাকার মেয়েদের সম্মুখে শিক্ষার অবাধ পথ উন্মুক্ত ও প্রশস্ত করেছিল। ১৯৩৯ সালে তিনি সহকর্মী ও সহযোদ্ধা বিপ্লবী অনিল রায়কে বিবাহ করেন। ঢাকাই ছিল তখন তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্র । এছাড়াও তিনি ঢাকাকে নারী জাগরণ ও জনসেবার অন্যতম বৃহত্তর কেন্দ্র রূপে বেছে নিয়েছিলেন।

লীলা রায় যে বয়স থেকে রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মক্ষেত্রে যুক্ত হন, সেসময়টা ছিল স্বদেশি উত্তর বাংলায় বিপ্লববাদের কালপর্ব। কল্পনা দত্ত, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, শান্তি ও সুনীতি প্রমুখ কিশোরী ছাত্রীরা দেশের মুক্তির জন্য বিপ্লবী সংগ্রামে লিপ্ত। এইরকম সময় ১৯২৩ সালে লীলা দেবী ১২ জন সহকর্মীকে নিয়ে 'দিপালী সংঘ' গড়ে তুললেন। প্রথম ১২ জন সদস্যদের অন্যতম ছিলেন বীণা দত্ত, লতিকা রায়, মনোরমা বসু, কমলা বসু প্রমুখরা।[২] তখনও এটি বিপ্লবী সংঘ রূপে পরিচিত ছিল না। একদা এই সংঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বিপ্লবী নেত্রী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার।[৩] "দিপালী সংঘ' মূলত মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে উদ্যোগী হয় এবং কয়েকটি স্কুল (ইংরেজি ও বাংলা মাধ্যম) ও শিল্প-কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য গণশিক্ষা পরিষদ সংঘের নেতৃত্বে পরিচালিত হত। মেয়েদের তৈরি শিল্পদ্রব্যাদির প্রদর্শনী ও বিক্রয়ের ব্যবস্থাও করা হত। নারীশিক্ষার বিস্তার, সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা, আইনত নারীর অধিকাররক্ষার ব্যবস্থা, ভোটাধিকারের দাবি আদায়, নারীদের দেশপ্রেমে ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করার দিকে সামাজিক উন্নয়ন ও সেবামূলক কর্মে লীলাদেবী প্রথমদিকে মনোনিবেশ করেছিলেন। রক্ষণশীল মানসিকতা ও সামাজিক পরিবেশে ঢাকা কেন্দ্র করে বহির্জগতে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সহশিক্ষার প্রচলন এক যুগান্তকারী ঘটনা ছিল বঙ্গরমণীদের জীবনে। তাঁর পরিচালন দক্ষতা ও বহুমুখী প্রতিভার জন্য কবি গুরুও একসময় তাঁকে শান্তিনিকেতনের গুরুদায়িত্ব নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

১৯৩০-এর দশকে বাংলায় চূড়ান্ত সংগ্রামশীল, বিপ্লববাদের সক্রিয় অভ্যুত্থান ঘটেছিল। ইতিপূর্বে ১৯২৮ সালে সুভাষ বসুর সভাপতিত্বে কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে বিপ্লবীদের অভূতপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল। এই অধিবেশনে যোগদানের পর লীলাদেবী বিপ্লবের ভঙ্গুর পথে পা বাড়ালেন এবং একনিষ্ঠ নারী আন্দোলনের নেত্রী শ্রী

সংঘ'-এ যোগদান করে আত্মনিবেদিত ও ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে বিপ্লবের চরমপন্থাকে শ্রেষ্ঠ মনে করলেন।

১৯৩০ সাল থেকেই তার সম্পাদনায় মহিলাদের রচনাসমৃদ্ধ 'জয়শ্রী' পত্রিকা প্রকাশ পেতে শুরু করে। শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়, নারী জাতির সার্বিক বিকাশ ও শিক্ষার প্রসারও অনিল রায়ের 'শ্রী সংঘ' এবং 'দিপালী সংঘ' মিলে প্রতিষ্ঠিত 'দিপালী ছাত্রী সংঘ'-এর লক্ষ্য ও কর্মসূচি ছিল। এই সংঘের অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন রেনুকা সেন, শকুন্তলা রায়, প্রীতিলতা, বীণাপাণি রায় এবং ঊষারানি রায় প্রমুখ।[৪] বাংলার বিভিন্ন জেলাতে অল্পবিস্তর শাখাও বিস্তৃত ছিল। উক্ত অধিবেশনের পরেই 'ছাত্রী সংঘ' গড়ে ওঠে অনিল রায়ের পরিচালনায়। জনকল্যাণকামী সমাজসেবী সংগঠন রূপে পরিচালিত হলেও গোপনে বিপ্লবী নারীকর্মী রিক্রুটের কাজ চলত। মূলত শিক্ষিতা তরুণীরা গোপনে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা ও শরীরচর্চার শিক্ষা নিত। কলকাতায় মেয়েদের জন্য স্টেলও খোলা হয়। রবীন্দ্র স্নেহধন্য 'জয়শ্রী' পত্রিকা, উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েদের রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে সেই সময় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। বিপ্লববাদী নেত্রী লীলা রায় ও তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে রেনু সেন, বীণা রায়, শকুন্তলা চৌধুরি, সুশীলা দাশগুপ্ত, হেলেনা দত্ত, ঊষা রায়, লতিকা দাস (সেন), রেনুকণা দত্ত প্রমুখরা বিপ্লবী আন্দোলনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অগ্রণী ভূমিকা নেন। শিক্ষিত মেয়েরা বিপ্লবমন্ত্রে দিক্ষিত হয়ে পুরুষদের সঙ্গে গুপ্ত কাজে সমান দক্ষতা দেখালেও নেতৃত্বের ভূমিকা লাভ করেনি। নারী নেতৃত্ব সম্পর্কে সংশয় ও অবিশ্বাসের যথেষ্ট অবকাশ ছিল। প্রীতিলতা যে দায়িত্ব ও নেতৃত্ব পেয়েছিলেন, তা সম্ভবত অন্যকোনো মেয়ে পায়নি। ফলে নারীর ভূমিকা প্রত্যক্ষ হলেও গৌণই থেকে যায়। বিপ্লবী আন্দোলনে পুরুষ বিপ্লবী নেতৃত্ব নারীদের পার্শ্ব ভূমিকাতেই রাখতে বেশি পছন্দ করতেন; তাঁদের হাতে নেতৃত্ব তুলে দিতে অভ্যস্ত ছিলেন না; মেয়েরাও নেতৃত্বের নির্দেশ অমান্য করত না।

লীলা রায়ের রাজনৈতিক জীবনে দ্বিমুখী প্রবণতা প্রথমদিকে দেখা যায় । একদিকে তিনি শ্রীসংঘের সংস্পর্শে এসে গুপ্ত ও বিপ্লববাদী কাজে প্রত্যক্ষভাবে লিপ্ত থেকেছেন এবং অন্যদিকে ৩০-৪০-এর দশকে গান্ধীবাদী রাজনীতিতে জড়িত থেকে অহিংস সত্যাগ্রহে অংশ নিয়ে লবন আইনভঙ্গ করে আইনঅমান্য আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য তিনি ঢাকায় মহিলা সত্যাগ্রহ কমিটি গঠন করলেন। তাঁর এই দ্বিমুখী রাজনৈতিক অবস্থান অর্থাৎ হিংসা ও অহিংসা উভয় পন্থার রাজনীতিক কার্যকলাপে ভারসাম্য বজায় রাখতেন। এর পরিণতি স্বরূপ বিপ্লবী সংগ্রামকে স্তব্ধ করার জন্য ঔপনিবেশিক সরকারের অকথ্য অত্যাচার ও দমন-পীড়নের সূচনা হলে তিনি গ্রেপ্তার হন এবং লীলা রায় ছিলেন বিনাবিচারে আটক প্রথম মহিলা রাজবন্দি।[৫]

৩০-এর দশকে বাংলার কারাগারগুলিতে বন্দি বিপ্লবীদের মধ্যে রাজনৈতিক আদর্শের সংঘাত দেখা দেয়। একদিকে বিপ্লবের আদর্শ ও লক্ষ্যের মূল্যায়ন সংশয় এবং অন্যদিকে মার্ক্সীয় বস্তুবাদী দর্শনের প্রতি প্রবল টান। কারাগার থেকে সদ্য মুক্ত অধিকাবেশ বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি নয়তো কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন। লীলা রায় নির্বিবাদে মার্কসবাদী তত্ত্ব মেনে নিতে পারেননি; তাই কংগ্রেস না কমিউনিস্ট বা সোস্যালিস্ট পার্টিতে যোগদান না করে সমাজবাদী আদর্শকে অন্যভাবে স্বকীয়তা দান করতে আগ্রহী হলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্য হবে সমাজবাদে উত্তরণ; স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজবাদ—এই ত্রয়ীর আদর্শের সার্থক পরিপূরণ ঘটবে সমাজ বিপ্লবে। তাঁপ মতে এই লক্ষ্য পূরণ হবে কংগ্রেসে, তাই তিনি কংগ্রেসে যোগ দিলেন।

লীলা রায়ের বৃহত্তর কর্মক্ষেত্র ছিল রাজনীতি ও নারীমুক্তি সংগ্রাম। মেয়েদের সচেনতা ও জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধির জন্য 'মহিলা ক্লাব' গঠন জাতীয় জীবনে তাঁর অন্যতম কৃতিত্ব ছিল। তাঁর প্রচেষ্টাতেই জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে মেয়েদের যুক্ত করার জন্য গড়ে ওঠে 'কংগ্রেস মহিলা সংঘ'।[৬] কংগ্রেসের মহিলা সাব-কমিটিতে তিনি বাংলার প্রতিনিধিও মনোনীত হন।

উল্লেখ্য যে সুভাষচন্দ্র বসু ১৯৪০ সালে ফরওয়ার্ড ব্লক দল গঠন করলে, নেতাজীর বামপন্থা ও সমাজবাদের প্রতি ঝোঁকে উৎসাহিত হয়ে লীলা রায় এই দলে যোগ দিলেন । নারীর স্বাধীকার ও সম্পত্তির অধিকার সংক্রান্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে রাও কমিটি গঠিত হয় এবং এই কমিটিকে স্মারকলিপি দিয়ে তিনি জানান যে, "Uniformity of marriage code, provision for divorce, uniform standard of morality and uniform principles of inheritance between man and woman". স্বাধীনোত্তর ভারতে অবশেষে ১৯৫৫ সালে হিন্দু কোড বিলের বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারীর সম্পত্তির উপর ও বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার অর্জিত হয়েছিল।

'Forward Bloc' দলে যোগদানের পরে লীলা দেবীর সম্পাদনায় Party-র মুখপত্র 'Forward Bloc'-এ প্রকাশিত হয় এবং তাঁর সম্পাদকীয় ও The Arrest'; 'Follow Nagpur'; 'This Sanitly Fight' নামক তিনটি প্রবন্ধ রচনার জন্য বাংলা সরকার তাঁকে জরিমানা করে। সুভাষচন্দ্র বসু যখন তাঁর বৃহত্তর পরিকল্পনাকে বাস্তবায়নের জন্য গোপনে ভারত ত্যাগ করলেন, তখন পার্টির সাংগঠনিক ও অন্যান্য কার্যকলাপের জন্য বাংলায় দায়িত্ব নিলেন লীলা দেবী, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কমিউনিস্ট পার্টি যখন এই যুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' বলে ঘোষণা করল, তখন সুভাষ বসুও তাঁর অনুগামীদের ফ্যাসিস্ট বলে নিন্দা করা হয়েছিল। সেই সময় দৈনিক পত্রিকা The Statesman'-র সম্পাদকীয় রচনা 'Fascists in India'- তে লেখা হল, "...

Nevertheless we all know that Bengal was the home of a small but convinced pro-fascist party led by Mr. Subhas Chandra Bose.

"... It is the business of the Government to round up the enemies of the country forthwith and put them to death. No quarter whatever should be given to them... The penalty for traitors to India must be death." এর প্রতিবাদে লীলা রায় 'Hindustan Standard প্রবন্ধ লিখে জবাব দেন যে "We shall not stand it.

১৯৪৬ সালে ভারতের গণ পরিষদে (Constitutional Assembly) নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ফরওয়ার্ড ব্লকে তীব্র আভ্যন্তরীণ মতাদর্শগত সংঘর্ষ দেখা, দিলেও; বাংলা থেকে লীলা রায় গণপরিষদে নির্বাচিত হন। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় নির্বাচিত সদস্যদের তীব্র আক্রমণ করা হয়। ফলে ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পরে পার্টিও বিভক্ত হয়ে পড়ে। দলের কয়েকজন সদস্য সুভাষচন্দ্র বসুকে মার্কসবাদী রূপে প্রতিপন্ন করতে চাইলে ক্ষুব্ধ নেত্রী সুভাষচন্দ্রের আদর্শকে সুরক্ষিত করার জন্য অনুগামীদের নিয়ে তিনি 'সুভাষবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক' নামক নতুন পার্টি গঠন করলেন। জাতীয় নেতৃত্ব অবশেষে দেশবিভাগের সিদ্ধান্ত নিলে তিনি তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে গান্ধীজিকে দেশবিভাগ প্রতিহত করার জন্য সক্রিয় হস্তক্ষেপের অনুরোধ জানান। কিন্তু গান্ধীজি উত্তরে বলেছিলেন, 'My leaps are sealed.[৯]

স্বাধীনোত্তর দ্বিখণ্ডিত ভারতের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যা, বিশেষত নোয়াখালি ও কলকাতার বিভৎস দাঙ্গায় লীলাদেবীর অবদান ছিল। অবিস্মরণীয় । তিনি দাঙ্গা বিধ্বস্ত, লাঞ্ছিত ও অসহায় নারী এবং শিশুদের উদ্ধার করার কাজে এগিয়ে এসে, সরকারি উদ্যোগের ও কাজের তীব্র ধিক্কার ও নিন্দা করে দেশবাসীর কাছে সাহায্যের আবেদন জানান এই ভাষায়,[১০]

"The forces of re-action and disruption are out to sabotage progress and national solidarity. This challenge must be faced with total mobilisation of men and resources. I appeal to young men and women to come forward and forge an organisation which Iwould be able to take up this challenge immediately and effectively.

In the name of India's women, I demand that your Govt. which has long forfeited all claim to anyone's allegiance must immediately rescue these women from their present dignity and let unofficial organisations proceed unhampered to the affected areas for doing rescue work on their own as we cannot put any faith on the genuineness of Govt. efforts and the authenticity of their

assurance. If you can not do this, your Govt. must abdicate forthwith."

দেশ বিভাজনের পরেই তিনি পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করেননি, বরং ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত তিনি সেখানে থেকে সংখ্যালঘু হিন্দুদের বাস্তু তথা দেশ ত্যাগ করার কাজে বিরত রাখার চেষ্টা করলে তাঁর বিরুদ্ধে সরকার গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করায় তিনিও পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে বাধ্য হলেন। তিনি 'জাতীয় মহিলা সংহতি' নামক প্রতিষ্ঠান গঠনের মাধ্যমে দাঙ্গা বিধ্বস্ত, অনাথ ও অপমানিত নারীদের সাহায্য ও সেবার কাজে অগ্রসর হন। এই প্রতিষ্ঠান মেয়েদের আশ্রয়, ভরণপোষণ, শিক্ষাদান ও জীবনে স্বনির্ভর প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সমাজে সম্মানজনক পরিস্থিতি ও মূল স্রোতে মিশে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিল। এছাড়াও কর্মরতা মেয়েদের স্বল্প ব্যয়ে আশ্রয়ের জন্য কলকাতায় 'সংহতিশ্রী', বসিরহাটে বিজয়া' নামক আবাসিক গড়ে তোলা হয়।

৫০-এর দশকে পূর্ববঙ্গ থেকে লক্ষ লক্ষ সংখ্যালঘু হিন্দুরা পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরায়, বিশেষত সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে ছিন্নমূল অবস্থায় চলে আসতে থাকেন। এঁদের ক্রন্দন ও যন্ত্রণা ভারতের আকাশ বিদীর্ণ করলেও ভারত সরকার ছিল নির্বিকার ও নির্লিপ্ত। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট মধ্যরাতে নেহরু পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণে ঘোষণা করেন, ". they are of us and will remain of us whatever may happen and we shall be sharers in their good and ill fortune alike."[১১]

১৯৫০-এর দশক জুড়ে পূর্ববঙ্গে দাঙ্গা, ভারত ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে passport প্রথার প্রচলন প্রভৃতি কারণে সংখ্যালঘু হিন্দুরা জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কায় বৃহত্তর সংখ্যায় দলে দলে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে থাকে । ১৯৪৬ সালে আগত বাস্তুহারাদের সংখ্যা ছিল ৫৮ হাজার ৬০২ জন এবং ১৯৫০ সালে সেই সংখ্যা দাঁড়ায় ১১,৭২,৯২৮ জন।[১২] উদ্বাস্তুদের সংহতি ও কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে 'East Bengal Minority Welfare Central Committee' (পূর্ববঙ্গ সংখ্যালঘু কেন্দ্রীয় কল্যাণ সমিতি) গঠিত হলে লীলা রায় তার সম্পাদিকা নিযুক্ত হন। এই কমিটির নেতৃত্বে উদ্বাস্তুদের ঐক্যবদ্ধ করে তাঁদের পুনর্বাসন, নাগরিক অধিকার ও কর্মসংস্থাপনের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়। এই কমিটির সভাপতি ও সহ-সভাপতি ছিলেন যথাক্রমে ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং ড. মেঘনাদ সাহা। উদ্বাস্তুদের দাবি ও আন্দোলনের কণ্ঠরোধের উদ্দেশ্যে সরকার তাঁদের উপর নির্বিচারে লাঠি ও গুলি বর্ষণ করতে থাকেন।[১৩] কমিটির পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে উদ্বাস্তু সমস্যাকে জাতীয় সমস্যায় পরিণত করার দাবি জানানো হয়েছিল।

উদ্বাস্তুদের সঙ্গে একদিকে জমিদখলকে কেন্দ্র করে জমিদার এবং অন্যদিকে সরকারের সঙ্গে সংঘাত নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা ছিল। কেন্দ্র সরকার উদ্বাস্তুদের দায়িত্ব নিতেক অস্বীকার করলে ও পুনর্বাসনের দায় না নেওয়ায় ক্যাম্পগুলি বন্ধ হয়ে যেতে

থাকে। এই রকম পরিস্থিতিতে ওয়েলিন্টন স্কোয়ারের বামপন্থী সংগঠনগুলির সমাবেশে তিনি পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তুদের উপযুক্ত পুনর্বাসন এবং পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের নিরাপত্তার দাবি জানান। এই সমাবেশে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুধা রায়, গৌরী সেন প্রমুখরা সকলেই কেন্দ্র সরকারের উদ্বাস্তু নীতির তীব্র নিন্দা করে এই সমস্যার সমাধানের দাবি জানিয়ে ছিলেন।[১৪]

১৯৫২ সালে অনিল রায়ের মৃত্যুর পর তিনি সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না থেকে সমাজসেবামূলক কাজেই নিজেকে আবদ্ধ রেখেছিলেন। নিজের বাড়িতে বয়স্ক নারীশিক্ষা ও সহায়-সম্বলহীন নিরক্ষর মহিলাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তাঁর কর্তব্য ও কর্মের প্রতি নিষ্ঠা, নিয়মানুবর্তিতা, সেবার মানসিকতা, ধৈর্য্য-সহনশক্তি প্রভৃতি গুণাবলি সহকর্মীদের মধ্যে সমাজসেবার গঠনমূলক মানসিক বনিয়াদ রচনা করেছিল ।

১৯৫০-৬০-এর দশক জুড়ে পশ্চিমবঙ্গে বস্ত্র, খাদ্য ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সংকট রাজনীতিকে উত্তাল করেছিল এবং সরকারি নীতির ব্যর্থতাকে দায়ী করে বামপন্থী দলগুলি প্রতিরোধ সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে 'দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি' গঠন করা হয়। এই সংকটে লীলাদেবী পুনরায় সক্রিয় রাজনীতিতে অবতীর্ণ হয়ে কংগ্রেস বিরোধী জাতীয়তাবাদী বামপন্থী গোষ্ঠিগুলির মোর্চার সঙ্গে যুক্ত হলেন। ১৯৫৯ এবং ১৯৬৬ সালে কমিটির নেতৃত্বে ব্যাপক খাদ্য আন্দোলনের সূচনা হয়। ৩১ আগস্ট ১৯৫৯ সালে খাদ্যের দাবিতে প্রতিরোধ কমিটির আহ্বানে ময়দানের সমাবেশে লক্ষাধিক নিরীহ বুভুক্ষু মানুষ সমবেত হয়েছিল। এই সমাবেশ থেকে একটি মিছিল রাজভবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে সরকা রি পুলিশি তাঁদের উপর লাঠিচার্জ ও গুলি বর্ষণ করে। ফলে প্রায় ৮০ জন নিহত এবং ৪০০ জন আহত হন।[১৫] এর প্রতিবাদে মহিলা সংগঠনগুলি মৌনমিছিল করে রাজভবন অভিযান করেছিলেন। লীলাদেবী খাদ্যের দাবিতে মিছিল করে রাজভবন অভিযান করার জন্য, পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে।[১৬]

স্বাধীনোত্তর ভারতের নির্বাচনোত্তর রাজনীতিতে মূলত তিনটি ধারা পরিলক্ষিত হয়। যথা ১. স্থিতাবস্থার সমর্থক কংগ্রেস; ২. সমাজতন্ত্রের প্রতি অনুগত সম্পন্ন কমিউনিস্ট পার্টি; ৩. জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী শক্তিগুলি। ১৯৫২ সালে কৃষক-মজদুর-প্রজা পার্টি (KMPP) এবং সোসালিস্ট পার্টি (SP) সংযুক্ত হয়ে প্রজা সোসালিস্ট পার্টি (PSP) গঠন করেন। সুভাষবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক লীলা দেবীর নেতৃত্বে ১৯৫৩ সালে PSP-র সঙ্গে যুক্ত হয়। লীলা দেবী মনে করেন যে সুভাষবাদের পূর্ণায়ন ভারতীয় রাজনীতিতে সংহতি সাধমের মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত হতে পারে। এই সংযুক্তিকে অভিনন্দন জানিয়ে জয়প্রকাশ নারায়ণ বলেছিলেন, "By this merger the leadership of Netaji Subhas Chandra Bose has been brought into the very heart of the socialist movement in India.[১৭] ১৯৬০ সালে পশ্চিমবঙ্গে PSP-র সভাপতি নিযুক্ত হন এবং ১৯৬২ সালে অসুস্থতার কারণে পদত্যাগ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ১৯৫৯ সালে খাদ্য আন্দোলনে PSP রাজ্য সরকারকে সমর্থন

করেছিল, ফলে ১৯৬২ সালের নির্বাচনে বাংলার অধিকাংশ আসন তাদের হারাতে হয়। বাস্তবে তিনি সমাজবাদী শিবিরকে তিনটি উপাদানে সংযোজিত করেন। ব্যক্তিত্বের প্রভাব, ঐতিহ্যের দীপ্তি ও সংগ্রামের হাতিয়ার রূপে।

১৯৬০-এর দশকে আসামে বাঙালি বিতাড়ন ও নিধন শুরু হলে তিনি গভীর ভারাক্রান্ত ও হতাশ হৃদয় প্রতিকারের জন্য উদ্‌গ্রীব হন এবং পার্টির সর্বভারতীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আসাম সফর করে প্রকৃত ঘটনার সংস্পর্শে আসেন। তিনি জানিয়েছিলেন, "অসমীয়ারা মোটেই repentent নয়, বরং deep seated অসম্ভব ঘৃণা বাঙালীদের উপর। ভাষা নিয়ে আমি কোনো মতামত দিতে বা কিছু বলতে আসিনি, আসামে এ-কথা সর্বত্রই বলে দিয়েছি স্পষ্ট। কেবল inhuman atracities-এর উপরই বলেছি firmly ও strongly এবং সেই সঙ্গে বলেছি Indian Unity ও integrity সম্পর্কে। লোকেদের সাথে কথা বলে অনেক জায়গায় চোখের জল রাখাই সায় নাই । বড় কথা মানসিক distress সহ্য করা মুস্কিল হচ্ছিল।"[১৮]

সমসাময়িক পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি কংগ্রেসের 'Anti-thesis' রূপে CPI-কে মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। এমনকি তাঁর রচনা 'রাজনীতি কেন পথে?', জয়শ্রী পত্রিকায় প্রকাশ, প্রবন্ধে Forward Bloc কে বামপন্থীভূক্ত না করার জন্য অভিযোগ প্রকাশ পেয়েছে।[১৯] তিনি উপলব্ধি করেন অন্যান্য বামপন্থী দলগুলির মধ্যেও আদর্শের নৈকট্যের ভিত্তিতে মিলিত হবার অনুরূপ মনোভাব ও পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে বিপ্লব সম্ভব হবে যখন বাস্তব অবস্থানুসারে কর্মসূচি স্থির করে এগোনো যাবে এবং তাঁর বিশ্বাস ছিল বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির ঐক্যই রাজনৈতিক লক্ষ্য হওয়া উচিত।[২০] সেই মত ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টি ও বামপন্থী দলগুলি মিলিতভাবে লড়াই করেছিল এবং ১৯৫৯ সালে খাদ্য আন্দোলনে তারাই দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি গড়ে হলে সংগ্রাম চালিয়ে ছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে লীলাদেবী বামপন্থী ঐক্যের কথা বললেও প্রত্যক্ষভাবে তাঁর সঙ্গে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সংযোগ ছিল না। যদিও মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি শুধুমাত্র বামপন্থী মহিলাদের সংগঠন ছিল না। তাঁর আগের বহু সহকর্মী MARS-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন; যেমন, লতিকা সেন। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি নারী জাগরণ, চেতনার প্রসার ও সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে নিরলস সংগ্রাম চালান। তাই তিনি সুধা রায়, গৌরী সেন, সন্ধ্যা আচার্য, কনক মুখার্জি, মণিকুন্তলা সেন, রেণু চক্রবর্তী, গীতা মুখার্জি, ঊষা গুপ্ত প্রমুখ মহিলা আন্দোলনকারী নেত্রীবৃন্দের সঙ্গে বিভিন্ন সংগ্রামে সামিল হতে দ্বিধা করেননি।

"Under Patriarchy, every woman is a victim, past present and future" এই চেতনা ও মানসিক নিয়ন্ত্রণকে হয়তো তিনি উপলব্ধি করতে পারেনি। "Patriarchy requires violence or the subliminal threat of

violence in order to maintain itself ..." তাই তিনি নারীমুক্তি সংগ্রাম, অধিকার রক্ষা ও সম্মান প্রতিষ্ঠার নিরলস সংগ্রামের পক্ষপাতি ছিলেন।

কী সামাজিক কল্যাণসাধন, কী রাজনৈতিক আন্দোলন লীলা দেবীর বয়স ও অসুস্থতা কোনোকিছুই তাঁর গতিকে প্রতিহত করতে পারেনি। জনগণের বিশেষত মানুষের সাথে নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ সংযোগ তাঁর এই উদ্বেলতা, সহকর্মীদের জন্য আশঙ্কা, উদ্বেগ ও আদর্শের প্রতি loyalty-কে মর্যাদা দেবার মতো উদার্য—তাঁর সহকর্মীরা দেখাতে পারেনি। সহকর্মীদের ক্ষুদ্র স্বার্থ ও আচরণ তাঁকে ব্যথিত করলেও কর্তব্যভ্রষ্ট করতে পারেনি । ১৯৬৪ সালে SSP গঠিত হলে, আবার ১৯৬৫ সালে PSP-র পুনর্গঠন হল। "... বিভিন্ন দল উপদলের টানাপোড়েন—Status quo-কে রাখবার জন্য কত না চেষ্টা কিন্তু এত ভাঙন নয়, এসে ধ্বস।"[২১] ভাঙা-গড়ার পর লীলাদেবী আর আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো দলের সদস্যভূক্ত না হলেও সমাজবাদী আন্দোলনের প্রতি তাঁর আনুকূল্য ও সমর্থন অব্যাহত ছিল আজীবন।

উপসংহার : জীবনের শেষপ্রান্তে এসে লীলাদেবী ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা প্রসঙ্গে সহকর্মীকে লিখিত এক পত্রে জানান, "দেশবাসীর সেবা করার সুযোগ পাওয়া সৌভাগ্যের কথা। জীবনে স্বপ্ন দেখে অনেকেই তার জন্য চরম মূল্যও দেয় কিন্তু সে স্বপ্নকে রূপায়িত করবার মত সুযোগ সকলে পায় না - দুঃখের বিষয়, বেদনার বিষয়, আমাদের জাতীয় চরিত্র, আচরণ ও জাতীয় আশা- আকাঙ্ক্ষাকে সুস্পষ্ট রূপ দিয়ে আমাদের National Objectives এই ২০ বছরেও আমরা ঠিক করতে পারিনি। যার জন্য গত ২০ বছরে যাদের জন্ম হয়েছে এবং যারা এই সময়ের কিছু আগে জন্মে আজ যৌবনে এসে দাঁড়িয়েছে তাদের জীবনে এত নৈরাশ্য, Perspective ও লক্ষ্যের অভাব। আমরা তাদের যে দিতে পারিনি—বিদেশি শাসনের অবসানে – স্বাধীন ভারতকে আমরা রূপ ও আকার দিতে পারিনি, তার জন্যই জাতীয় জীবনে এত বড় Void।[২২] এর পরই দীর্ঘরোগ শয্যার পরে ১৯৭০ সালে এই রাজনৈতিক সংগ্রামী কর্মী এবং নারী মুক্তি সংগ্রামের অন্যতম পথিকৃতের মৃত্যু হয়। তাঁর নারী মুক্তি সংগ্রামের পথে আজও বামপন্থী নারী আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে। তৎসত্ত্বেও সমাজ ও পরিবারে ভারতীয় ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির ধারা অনুসারে নারীদের উচ্চ মর্যাদার স্থানে প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে ভারত ক্রমশ পিছিয়ে পড়তে বাধ্য। তাই নারী পুরুষ একত্রে ভারতীয় সভ্যতাকে আবার বিশ্বের দরবারে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সুসংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে।

সূত্রনির্দেশ

১. কমলা দাশগুপ্ত, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী; কলকাতা, ১৯৮৯; পৃ. ৮১-৮২।
২. জয়শ্রী, আষাড়, ১৩৭৭; পৃ. ২৩৭।
৩. উপরোক্ত, পৃ. ১৪২।

৪. ইতিহাস অনুসন্ধান ৪, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ৩৩১।
৫. জয়শ্রী, পৃ. ১৪২।
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০-১৫১।
৭. জয়শ্রী, ১৯৬৮; পৃ. ১৫ ।
৮. The Statesman; 13.03.82.
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭।
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮ ১৫৯।
১১. জয়শ্রী, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৫১-১৫২।
১২. হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়; উদ্বাস্তু, কলকাতা, ১৯৭০, পৃ. ১৩৯।
১৩. চেতনা, ৫বর্ষ, ১ সংখ্যা, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ১২৮-১২৯।
১৪. IB File No. 67/39, Home Political Deptt. WBSA, Kolkata.
১৫. ০১/০৯/৫৯, আনন্দবাজার পত্রিকা।
১৬. ০৫/০৯/৫৯, আনন্দবাজার পত্রিকা।
১৭. প্রাগুক্ত।
১৮. প্রাগুক্ত।
১৯. জয়শ্রী, ১৯৬৮, পৃ. ৩৬৩।
২০. উপরোক্ত।
২১. প্রাপক সমর গুহ (পত্র); ১৭/৪/৬৭, কলকাতা।
২২. প্রাপক সমর গুহ, ২২/৩/৬৭, কলকাতা।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে মহাভারত-চর্চা : প্রসঙ্গ দ্রৌপদী (নির্বাচিত গ্রন্থ অবলম্বনে)

সঞ্চারী হালদার
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : ছোটোগল্প এবং উপন্যাস প্রকরণ দুটি সম্পূর্ণরূপে আধুনিক যুগের ফসল। বাংলা কথাসাহিত্যের আঙ্গিকে কীভাবে মহাভারতের মতো ক্লাসিক মহাকাব্যের বিষয়বস্তু স্থান করে নিল, কীভাবে বাঙালি লেখকেরা মহাভারতের দ্রৌপদী চরিত্রটিকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে নতুন তাৎপর্য দান করলেন, কীভাবে আধুনিক প্রেক্ষাপট ও চরিত্র নিয়ে লিখিত গল্পে মহাভারতের দ্রৌপদীর উল্লেখ করে ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করলেন— এই সবই বর্তমান গবেষণা প্রবন্ধে আলোচনা সূত্রে উঠে এসেছে। সেই সূত্রেই আলোচনায় স্থান পেয়েছে বাঙালি জনমানসে মহাভারত কীভাবে আজও প্রাসঙ্গিক হয়ে আছে। একদিকে কথাসাহিত্যিকগণ মহাভারতের আলোয় সমকালকে চিনতে চান, মহাভারতীয় ঘটনার আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে অতীতকে পুনর্বার যাচাই করে নিতে চান এবং পাশাপাশি ধ্রুপদী সাহিত্যের ফাঁক পূরণ করে চরিত্রগুলির মর্মকথা উদঘাটনে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে, মহাশ্বেতা দেবীর ছোটোগল্প 'দ্রৌপদী' (প্রথম প্রকাশ: পরিচয় পত্রিকা, শারদীয়া সংখ্যা, ১৯৭৭), দীপক চন্দ্রের উপন্যাস 'দ্রৌপদী চিরন্তনী' (প্রথম প্রকাশ: ১৯৮২) এবং নবনীতা দেবসেনের ছোটোগল্প 'অথ গঙ্গা-সত্যবতী কথা: অথবা সতীন সংবাদ' (প্রথম প্রকাশ: পত্রপাঠ, বইমেলা সংখ্যা, ২০০১)। দ্রৌপদীর জীবনের তিনটি ঘটনাবহুল তথা দিক-নির্দেশক পর্ব (যজ্ঞাগ্নি থেকে জন্মগ্রহণ, পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে বিবাহ এবং কুরু রাজসভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ) আধুনিক কথাসাহিত্যকদের লেখনীতে নবরূপ পরিগ্রহ করেছে।দীপক চন্দ্র তাঁর উপন্যাসে মহাভারতে বর্ণিত বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনার লৌকিক, যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মূল মহাভারতকার যেখানে প্রাজ্ঞ মহাকবির অবস্থান থেকে শুধু ঘটনা পরম্পরার নিরপেক্ষ বর্ণনা করে ক্ষান্ত থেকেছেন; সেখানে আধুনিক কথাসাহিত্যিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগে দাঁড়িয়ে চরিত্রের মনের গহিনে আলো ফেলেছেন। নবনীতা দেবসেন নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন দ্রৌপদী ও কুন্তীর সম্পর্কের স্বরূপ। মহাশ্বেতা দেবী রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে নারীর একাকী রুখে দাঁড়ানোকে প্রতিকায়িত করতে মহাভারতের দ্রৌপদী চরিত্রের ব্যঞ্জনাধর্মী উল্লিখন করেছেন। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কথাসাহিত্য চর্চার ধারায় এই মহাভারতকেন্দ্রিক গল্প ও উপন্যাসগুলি বিশেষ স্থান দখল করে আছে।

সূচক শব্দ : মহাভারতের দ্রৌপদী, কথাসাহিত্যে পুনর্নির্মাণ, বিনির্মাণ, ব্যঞ্জনাধর্মী উল্লিখন, আধুনিক ব্যাখ্যা, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, প্রতিভা বসু, দীপক চন্দ্র, নবনীতা দেবসেন, মহাশ্বেতা দেবী।

মূল আলোচনা :

রামায়ণ-মহাভারত ভারতের জাতীয় জীবনের পরম সম্পদ। এই দুই ধ্রুপদী মহাকাব্য ধারণ করে আছে ভারতীয় জাতির সহস্রাধিক বছরের কর্মের ইতিহাস, মর্মের ইতিহাস। রামায়ণ-মহাভারত যুগে যুগে চিন্তাশীল মানুষকে প্রণোদিত করেছে নতুন করে ভাবতে। মধ্যযুগে কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, কাশীরাম দাস প্রমুখের প্রয়াসে বাংলা ভাষায় মহাভারতচর্চার যে ধারা সূচিত হয়েছিল; আধুনিক যুগেও সেই ধারা অব্যাহত আছে। যুগের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মহাভারতের কাহিনি ও চরিত্র বিশ্লেষণের প্রেক্ষিত বদলেছে। অনুবাদের পাশাপাশি মননশীল প্রবন্ধ ও সৃজনশীল সাহিত্যে মহাভারতীয় আখ্যান স্থান করে নিয়েছে। উপন্যাস এবং ছোটোগল্প প্রকরণ দুটি আধুনিক যুগের ফসল। কাব্য, নাটক, প্রবন্ধে আধুনিক বাঙালি মহাভারতচর্চা ঊনবিংশ শতাব্দীতে শুরু করলেও ছোটোগল্প বা উপন্যাসে মহাভারত চর্চা শুরু হয় বিংশ শতাব্দীতে এসে।

আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে যে সমাজব্যবস্থা বা মানসিকতা তথা রাজনৈতিক চেতনা, ধর্মীয় সংস্কার থেকে মহাভারতের মতো টেক্সট গড়ে উঠেছিল; বর্তমানে তার আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে তাতে সন্দেহ নেই। ধর্মগ্রন্থের বদলে সমাজ অভিজ্ঞতার আকরগ্রন্থ হিসেবে মহাভারতকে বিচার করতে চায় আধুনিক সমাজ। অলৌকিক নানা ঘটনার যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ করতে চায়। ঈশ্বরত্ব আরোপ করে নয়; মহাকাব্যের প্রতিটি চরিত্রকে দেখতে চায় মানুষ হিসেবে—তাই তার করা প্রতিটি কাজের ব্যাখ্যা করতে চায় মানবিকভাবেই। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে মহাভারতীয় আখ্যানের এই পুনর্নির্মাণ ও বিনির্মাণ পর্যালোচনা প্রসঙ্গে একটিমাত্র চরিত্রকে নির্বাচন করা হয়েছে।

যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদী— মহাভারতের অন্যতম কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র, পঞ্চপাণ্ডবের সহধর্মিণী। সৌন্দর্যে, বীর্যে, মেধায়, মননে অসামান্যা, অনন্যা ক্ষত্রিয় রমণীটি সেই মহাভারতের যুগ থেকে একুশ শতক পর্যন্ত আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চলেছেন। তাঁকে নিয়ে কলম ধরেছেন বাংলার বহু প্রতিথযশা কবি, ঔপন্যাসিক, ছোটোগল্পকার, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক। বর্তমান প্রবন্ধে সেই মহাভারতকেন্দ্রিক কথাসাহিত্যের সুবিশাল ভাণ্ডার থেকে কয়েকটি গল্প ও উপন্যাস আলোচনার সুবিধার্থে বেছে নেওয়া হল।

জন্মমুহূর্ত থেকে দ্রৌপদী চরিত্রের সঙ্গে অলৌকিকতা জুড়ে আছে। দ্রুপদ রাজার গৃহে যজ্ঞের আগুন থেকে উদ্ভূত হয়েছিলেন অগ্নিকন্যা দ্রৌপদী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন। যে নারী পরবর্তীকালে কুরুক্ষেত্রের সেই ভয়ংকর ভ্রাতৃঘাতী ধর্মযুদ্ধের অন্যতম প্রধান

কারণ হবেন এবং যে পুরুষ অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের মৃত্যুর কারণ হবেন; তাঁদের প্রথম আবির্ভাব দৃশ্যের আবেদন পাঠক মনে চিরস্থায়ী করার জন্যই কি মহাভারতকার এমন দৃশ্যের অবতারণা করেছিলেন? কথাসাহিত্যিক দীপক চন্দ্র (১৯৩৮-২০১৩) তাঁর 'দ্রৌপদী চিরন্তনী' (প্রথম প্রকাশ: ১৯৮২) উপন্যাসে এই কাহিনির একটি লৌকিক, যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কুরুরাজ ও দ্রোণাচার্যের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের বাসনা থেকে সন্তান কামনা করেছিলেন পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ। সেই সময়ে তাঁর রাজনৈতিক প্রতিপত্তির অবস্থান থেকে হস্তিনাপুরের বিরুদ্ধাচারণ করা ছিল নেহাতই কষ্টকল্পনা। সেই জন্যেই উপযাজকের পরামর্শে আগাম যুদ্ধ-কৌশল তথা প্রস্তুতি হিসেবে পুত্র-কন্যার জন্মলগ্নে মিথের বাতাবরণ তৈরি করা হয়েছিল—

> "যজ্ঞ আরম্ভ হওয়ার অল্পকাল মধ্যেই রানি সন্তান প্রসব করবেন। তারপর যজ্ঞাগ্নিতে কৃত্রিম উপায়ে এমন ধুম্রজাল সৃষ্টি করা হবে যে কিছুই দৃষ্টিগ্রাহ্য হবে না। সে সময় একজন ঋষি সদ্যজাত শিশুকে ক্রোড়ে করে ধূম্রজাল ভেদ করে বেরিয়ে আসবেন। তখন সাধারণ মানুষের ধারণা হবে যে, এই শিশু অগ্নি থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এই ঘটনাকে তারা অলৌকিক কাণ্ড ভাববে। এবং অচিরেই হাওয়ার বেগে খবরটা ছড়িয়ে পড়বে। শত্রুরা শুনে অবাক হবে। দেবতার বিরূপতা স্মরণ করে দ্রোণ ও ধৃতরাষ্ট্র প্রমাদ গুণবে। মনে মনে শঙ্কিত হবে। অগাধ আত্মবিশ্বাস এবং মনোবলের পাত্র শূন্য হবে তাদের। দৈবানুকুল্য স্মরণ করে প্রতিবেশী রাজন্যবর্গ মুক্ত মন নিয়ে পাঞ্চালের সঙ্গে মৈত্রী সম্বন্ধ স্থাপনে আগ্রহী হবে। পুত্রকন্যারা বড় হয়ে যখন এই অলৌকিক বৃত্তান্ত জানবে তখন তারাও নিজেদের দৈবপ্রেরিত মনে করে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অধিক সচেতন হবে। এবং আত্মবলে বলীয়ান হয়ে উঠবে।"[১]

যাজ্ঞসেনীর জন্মের এই অলৌকিক আখ্যানের পর তাঁর জীবনের দ্বিতীয় যে অধ্যায়টি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেটি দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী লাভের আখ্যান। একজন নারীর পঞ্চপতি বিষয়টি সে যুগে তো বটেই; এই একুশ শতকেও একেবারেই বিরল। এই ঘটনা থেকে আধুনিক যুগের কোনো যুক্তিবাদী মহাভারত-বিশ্লেষক সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের বীজ খুঁজে পান, আবার কোনো নারীবাদী লেখিকা দ্রৌপদীর স্বামী নির্বাচনের অধিকার এবং স্বাধীনতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, আবার কেউ ঘটনার মূল খুঁজতে ফিরে যান আদি ও প্রথম রিপুর অনাবিল আবেদনের কাছে। পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে পাঞ্চালীর বিবাহের কারণ যাই হোক না কেন; তার বহুকৌণিক ব্যাখ্যায় বাংলা সৃজনশীল সাহিত্য যে সমৃদ্ধ হয়েছে; তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

মহাভারতের মূল পাঠ থেকে জানা যায়,স্বয়ংবর সভায় দ্রৌপদীকে জয়ের পর ভীমার্জুন গৃহে ফিরে এসে বলেছিলেন, "মাতঃ! অদ্য এক রমণীয় পদার্থ ভিক্ষালব্ধ হইয়াছে।"[২] প্রত্যুত্তরে সবিশেষ পর্যবেক্ষণ না করেই কুন্তীর সেই অমোঘ উক্তি— "বৎস! যাহা প্রাপ্ত হইয়াছ, সকলে সমবেত হইয়া ভোগ কর।"[৩] অতঃপর মাতাকে

অনৃতভাষণের দায় থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যেই পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন। মহাভারতকার যত সহজে কাহিনি পরম্পরা সাজিয়েছেন; আধুনিক যুক্তিবাদী মনন তত সহজে মেনে নিতে নিতে পারে না এই ঘটনাক্রম। বিশেষত যখন এই বিবাহ ভবিষ্যৎ কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে উঠবে; তখন শুধুমাত্র মাতা কুন্তীর অনবধনতাবশত করা একটি উক্তির মর্যাদা রক্ষার্থেই এত আয়োজন—সে প্রশ্ন ওঠেই।

প্রতিভা বসু (১৯১৫-২০০৬) যখন বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এসে মহাভারত নিয়ে কলম ধরছেন; তখন এই বিষয়ে তাঁর নিজস্ব ব্যাখ্যা ও চমকপ্রদ স্বকীয় বিশ্লেষণ বিশেষ তাৎপর্য দাবি করে। 'মহাভারতের মহারণ্যে' (প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ১৯৯৭) শীর্ষক প্রবন্ধগ্রন্থে লেখিকা মহাভারতে বর্ণিত আলোচ্য কাহিনিসূত্রের পুরোটাই মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিয়েছেন—

> "এসব কথার সমস্তটাই কৃত্তিম, সমস্তটাই বানানো। তা ব্যতীত, মুখনিঃসৃত সমস্ত ভাষ্যই বাণী নয়। যাকে প্রকৃত অনৃতভাষণ বলে, কুন্তীর এই অন্যমনস্ক অনুমতি তার মধ্যে পড়ে না। তাছাড়া, কুন্তী কোনো মহর্ষি মহাযোগীও নন যে মুখের কথা ফেরৎ নিতে পারেন না।"[৪]

প্রাবন্ধিক পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিবাহকে এক বৃহত্তর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র হিসেবে বিচার করতে চেয়েছেন। পাঞ্চাল রাজকন্যাকে ধর্মপুত্র (প্রতিভা বসু তাঁর গ্রন্থে দাবি করছেন, বিদুরপুত্র) যুধিষ্ঠিরের পট্টমহিষী করতে না পারলে তাঁর রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি পাবে না। এবং পাঞ্চালের আত্মীয়তা এবং অন্যান্য রাজাদের সহযোগিতা ব্যতীত হস্তিনাপুরের সিংহাসনের ওপর জোরালো দাবি প্রতিষ্ঠা করা একা যুধিষ্ঠিরের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। ফলত তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন যাকে জয় করে এনেছেন; তাঁকে জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবের ঘরণী রূপে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যেই মাতা কুন্তীর এত ছলনা। এই বিবাহকে প্রতিভা বসু বিদুর এবং কুন্তীর সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের অংশ হিসেবে দেখেছেন।

লক্ষণীয় বিষয়, আদি মহাকাব্যে স্বয়ংবর সভায় কর্ণকে লক্ষ্যভেদ করতে উদ্যত দেখে "নাহং বরয়ামি সূতম্"[৫]—একমাত্র এই উক্তি ছাড়া সমগ্র ঘটনাক্রমে দ্রৌপদী আশ্চর্যজনকভাবে নীরব। তাঁকে যখন পরিস্থিতির শিকার হয়ে কাঙ্ক্ষিত পুরুষের অপর সহোদরদের স্বামী বলে মেনে নিতে হয়েছিল; তখন তাঁর মানসিক অবস্থা কেমন ছিল; সে বিষয়ে কিছুই জানা যায় না। কিন্তু আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগে কথাসাহিত্যিক চরিত্রের মনের গহিনে আলো ফেলে দেখতে চান।

দ্রৌপদীর বিবাহ প্রসঙ্গে প্রতিভা বসু যেমন রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রকেই মুখ্য করে দেখেছেন; ঔপন্যাসিক দীপক চন্দ্রআবার ঘটনার সঙ্গে যুক্ত কুশীলবদের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। দ্রৌপদীর রূপ দেখে পাঁচ ভাইয়ের কামমোহিত হওয়ার কথা মহাভারতেই ছিল। কিন্তু মহাকাব্যে যা ইঙ্গিতমাত্র ছিল; আধুনিক কথাকার তাকেই মূল ফোকাল পয়েন্টে নিয়ে এলেন। আদিপর্বের অশীত্যধিকশততম অধ্যায়ে

দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় পঞ্চপাণ্ডবকে দেখে শ্রীকৃষ্ণের মনে হয়েছিল “একটি পদ্মকে লক্ষ করিয়া অবস্থিত পাঁচটি হস্তি” [শ্লোকাঙ্ক ৯]।[৬]দ্রৌপদীর বিবাহের মুখ্য কারণ হিসেবে এই কামনাকেই তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক।

‘দ্রৌপদী চিরন্তনী’ উপন্যাসে দেখা যায়, ভীম-অর্জুন দ্রৌপদীকে নিয়ে ঘরে ফিরে আসার আগেই যুধিষ্ঠির এসে হাজির হয়েছিলেন মাতৃসমীপে। যুধিষ্ঠির কুন্তীকে জানিয়েছেন—“জৈব তাড়নায় আমার ভ্রাতাদের চিত্ত মোহাচ্ছন্ন। নিত্য দেখা শোনায় এ আকর্ষণ আরও তীব্র হবে। অপ্রাপ্তিজনিত ক্ষোভে মন বিরক্ত ও অশান্ত হবে। এই আত্মবিনষ্টি থেকে ত্রাণ করতে পার তুমি।”[৭]এই অদ্ভুত পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের উপায় অনুসন্ধান করতে গিয়েই কুন্তী অন্যমনস্ক মন্তব্য করার কৌশল নির্বাচন করেন। এই অদ্ভুত পরিস্থিতির শিকার হয়ে দ্রৌপদীর মনে যে দোলাচলতার সৃষ্টি হয়েছিল; তার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় দীপক চন্দ্রের উপন্যাসে।

দ্রৌপদীর সঙ্গে কুন্তীর সম্পর্কের বুনোট কেমন ছিল; সেই বিষয়ে কলম ধরেছেন আরেক ছোটোগল্পকার নবনীতা দেবসেন (১৯৩৮-২০১৯)। ‘অথ গঙ্গা-সত্যবতী কথা: অথবা সতীন সংবাদ’ (প্রথম প্রকাশ: পত্রপাঠ, বইমেলা সংখ্যা, ২০০১) শীর্ষক ছোটোগল্পে গঙ্গা আর সত্যবতী–দুই সতীনের কথোপকথনের ফাঁকে উঠে আসে গোপন সমীকরণের হিসেব। কুন্তীকে অনৃতভাষণের দায় থেকে মুক্ত করার জন্য যে বিবাহের আয়োজন তা সত্যবতীর দৃষ্টিকোণ থেকে নতুনভাবে বর্ণিত হয়।

একজন গবেষকের মন নিয়ে তিনি আলোচ্য ছোটোগল্পে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, মহাভারতে শুধুমাত্র পাঞ্চালীকে পঞ্চস্বামীর অধিকারিণী বলে মনে করা হলেও বস্তুত তাঁর শাশুড়ী কুন্তীও একই অপবাদের ভাগীদার। কুমারী অবস্থায় সূর্য, তারপর পাণ্ডুর সঙ্গে বিবাহ এবং পরবর্তীকালে ধর্ম, পবন এবং ইন্দ্র—একাদিক্রমে পাঁচজন পুরুষের সঙ্গলাভ করেছিলেন কুন্তী নিজেও। নিজে যে পথে যাত্রা করেছিলেন, পুত্রবধূকেও একই পথের শরিক করেন তিনি। তবে দুজনের মধ্যে অবস্থানগত এবং পরিস্থিতিগত একটা পার্থক্যও ছিল; অতি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য। কুন্তীর শয্যাসঙ্গী প্রত্যেক পুরুষ ছিল স্বনির্বাচিত। একইসঙ্গে বহুজনের জীবনসঙ্গিনী হতে হয়নি তাঁকে। প্রকৃতপক্ষে পাণ্ডু ছাড়া অপর কাউকে সামাজিকভাবে স্বামীর মর্যাদাও দিতে হয়নি। অন্যদিকে দ্রৌপদীকে স্বামী নির্বাচনের কোনো সুযোগ দেওয়া হয়নি। স্বয়ংবর সভায় স্বেচ্ছায় যাঁকে মাল্যদান করেছিলেন; আজীবন তাঁর সঙ্গে থাকার অধিকার দেওয়া হয়নি তাঁকে। জোর গলায় সেকালের নারীর হয়ে সওয়াল করেছেন একালের নারী গল্পকার—

> “দ্রৌপদীর ফ্রী উইল, কিম্বা পার্সোনাল চয়েসের প্রশ্নটা একবারও কি তুলেছিল কেউ? কোনো স্বাধীনতাই প্রকৃতপক্ষে ছিল না দ্রৌপদীর।... সত্যবতী বললেন, ‘কুন্তীকে আমি কোর্টে নিয়ে যাব। দ্রৌপদী ইজ বিইং হেভিলি অ্যাবিউজড় বাই হার ইনল’জ’।”[৮]

দ্রৌপদীর জীবনের তৃতীয় যে অধ্যায়টি সবচেয়ে বেশি চর্চিত; সেটি হল প্রকাশ্য রাজসভায় মহাবীর পঞ্চস্বামী, প্রজ্ঞাবান ভীষ্ম, বিদুরের মতো গুরুজনদের উপস্থিতি সত্ত্বেও দ্রৌপদীর চরম লাঞ্ছনা এবং অপমান। 'যা নেই ভারতে তা নেই ভারতে' এই আপ্তবাক্যের মর্যাদা রক্ষার্থেই যেন আজ এই একুশ শতকে দাঁড়িয়েও সমাজে নারীর অবস্থান খুব একটা বদলায়নি! পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী যত ভালো সামাজিক অবস্থানেই থাকুক, তাকে আজও ভোগ্যপণ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। রাষ্ট্রশক্তির হাতে, ক্ষমতাশীল পুরুষের হাতে নারী নিপীড়নের ছবি আঁকতে গেলে আধুনিক লেখকেরা বারংবার দ্রৌপদীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন।

কৌরব রাজসভায় দুঃশাসনের হাতে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ছিল আসলে রাজশক্তির হাতে নারীর লাঞ্ছনা এবং তারপর এক অত্যাচারিতা নারীর একক প্রতিবাদ সমগ্র পুরুষ জাতির প্রতি। দ্রৌপদী চরিত্রের প্রতিবাদী ভাবমূর্তিকে সামনে রেখে মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬) আধুনিক যুগের একজন প্রতিবাদে দৃপ্ত বলিষ্ঠ নারী চরিত্র অঙ্কন করেছেন তাঁর 'দ্রৌপদী' গল্পে। পরিচয় পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় ১৯৭৭ সালে 'দ্রৌপদী' গল্পটি প্রকাশিত হয়। নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা এই গল্পের মূল বিষয় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

'দ্রৌপদী' গল্পের মূল চরিত্র দোপদি মেঝেন অত্যাচারী জোতদার জমিদারদের বিরুদ্ধে এক সংগ্রামী শক্তি। সাঁওতাল সমাজে 'দ্রৌপদী' নামটি প্রথাগত নয়। তাই গল্পের সূচনাতেই তার ব্যাখ্যা দেবার প্রচেষ্টা রয়েছে—"দ্রৌপদী মেঝেন। অর মা যে বছর বাকুলির সূর্য সাহুর (নিহত) বাড়িতে ধানভানারী ছিল, সে বছর ওর জন্ম। সূর্য সাহুর বউ ওর নাম দিয়েছিল।"[৯]

এভাবে সাঁওতাল রমণী দ্রৌপদীর নামের এক বাস্তবসম্মত যুক্তি দেবার চেষ্টা করেছেন লেখক। প্রকৃতপক্ষে মহাভারতের দ্রৌপদীর মিথকে ব্যবহার করে বর্তমান সমাজের নগ্ন রূপকে তুলে ধরবার উদ্দেশ্যেই গল্পের মুখ্য চরিত্রের এ হেন নামকরণ। রাষ্ট্রের হাতে নারী নিপীড়নের প্রতীকরূপে মহাভারতের দ্রৌপদীকে গল্পকারের দরকার ছিল।

'দ্রৌপদী' গল্পের পূর্বসূত্র নিহিত আছে 'অপারেশন বসাই টুডু' (১৯৮০) গল্পে। বসাইয়ের বিশ্বস্ত সহযোগী ছিল দোপদী মেঝেন আর তার স্বামী দুলনা মাঝি। ১৯৭১ -এর অপারেশন বাকুলিতে জোতদার সূর্য সাউকে হত্যার অন্যতম মাথা ছিল এই নকশালপন্থী সাঁওতাল দম্পতি। দ্রৌপদীর চেতনাপ্রবাহের সঙ্গে ভাসতে ভাসতে পাঠক জানতে পারে সূর্য সাউয়ের নির্মম অত্যাচারের কথা। বীরভূমে যখন প্রবল খরা, তখন বিডিও-র বদান্যতায় সূর্য সাউয়ের বাড়িতে দুটো টিউবওয়েল, তিনটে কুয়ো। দুলনের "বাপের বাপ ধান বাড়ি নিয়েছিল"[১০] বলে সেই ধার শুধতে দুলনকে আজও তার বাড়ি বেগার খাটতে হয়। সূর্য সাহু দ্রৌপদীকে জন্মাতে দেখলেও সেই কন্যাসমার শরীরের দিকে লোভী দৃষ্টিপাত করে। পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হয়না যে সূর্য সাহুর মতো

অত্যাচারী, স্বার্থপর, কুচক্রী জমিদার জোতদারেরাই দ্রৌপদী, দুলনা মাঝির মতো ভূমিপুত্রদের আন্দোলনকারী করে তুলেছিল।

দ্রৌপদীকে শেষ পর্যন্ত ধরা পড়তে হয় সোমাই ও বুধনার বিশ্বাসঘাতকতায়। একঘণ্টা জেরায় ওর মুখ থেকে কোনো কথা বার করতে না পেরে সেনানায়কের কথায় দ্রৌপদীকে 'বানিয়ে নেওয়া'র প্রক্রিয়া শুরু হয়। মহাভারতের সভা পর্বে আমরা দেখি, পঞ্চস্বামী এবং সভাস্থ কুরুপ্রধানগণ নীরব থাকলেও শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারিত হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানের ঈশ্বরহীন পৃথিবীতে দ্রৌপদীর মতো নিম্নবর্গীয় নারীকে রক্ষা করার জন্য কেউ থাকে না। নগ্নতাই তার প্রতিবাদের অস্ত্র হয়ে ওঠে। দ্রৌপদী গল্পের শেষে কাপড় পরতে অস্বীকার করে। উন্মুক্ত শরীরে সে আহ্বান জানায় রাষ্ট্রশক্তিকে, রাষ্ট্রের লালসাসিক্ত গনগনে পৌরুষকে।

২০02 সালে মণিপুরে মনোরমা থাংজাম নামক এক মণিপুরী তরুণীকে বিশেষ ভারতীয় সেনাবাহিনীর সৈনিকেরা ধর্ষণ করে নির্মমভাবে যৌনাঙ্গে গুলি চালিয়ে হত্যা করে। এর প্রতিবাদে মণিপুরী মায়েরা ভারতীয় সেনাবাহিনীর কুখ্যাত দুর্গ কাংলা রাজবাড়িতে বস্ত্র ত্যাগ করে প্রতিবাদ জানায়। মায়েদের নগ্ন ধর্ষিত হতে চাওয়ায় বিব্রত হয় সমগ্র সমাজের পৌরুষ। মহাভারতে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ যেমন প্রশ্ন তুলেছিল কৌরবদের রুচি, শিক্ষা এবং মানবিকতা সম্পর্কে; ঠিক তেমনভাবেই দ্রৌপদী মেঝেনকে সেনাছাউনিতে নগ্ন ও ধর্ষণ করার মধ্য দিয়ে খসে যায় রাষ্ট্রের অবাঞ্ছিত মুখোস। পাঞ্চালীর অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য আধুনিক যুগে কোনো ভীমসেন নেই; তাই দ্রৌপদীকে নিজেকেই এগিয়ে আসতে হয়। 'দ্রৌপদী' গল্পে মহাশ্বেতা দেবী রচনা করেছেন এক অভিনব পুরাণ। মহাভারতে দ্রৌপদী সভার নীরব দর্শক কুরুপ্রধানদের প্রশ্ন করেছিলেন—

> "এই কুরুবীরগণের মধ্যে আমায় টেনে আনা হল কিন্তু কেউ তার নিন্দা করছেন না! ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর আর রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কি প্রাণ নেই? কুরুবৃদ্ধগণ এই দারুণ অধর্মাচার কি দেখতে পাচ্ছেন না? ধিক, ভারতবর্ষের ধর্ম আর চরিত্র নষ্ট হয়েছে।"[১১]

আর এযুগের দ্রৌপদী নগ্ন হয়েও শাসকের সামনে চোখে চোখ রেখে দাঁড়ায়। ঘৃণায় তার রক্তমাখা থুতু সেনানায়কের সাদা শার্টে ছিটিয়ে দিয়ে বলে – "হেথা কেউ পুরুষ নেই যে লাজ করব।"[১২]অত্যাচারিতা নারী যখন উদ্ধত মর্দিত বুকে সেনানায়ককে ঠেলতে থাকে, তখন "এই প্রথম সেনানায়ক নিরস্ত্র টার্গেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পান, ভীষণ ভয়।"[১৩] এই ভয়ের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে নতুন সম্ভাবনার বীজ। 'দ্রৌপদী' গল্পের সমাপ্তি সর্বাংশে প্রতীকী। সৎ প্রতিবাদের সামনে অশুভ আঁতাত যে পরাজিত হবেই - এই ভয় তাকেই প্রতীকায়িত করেছে। দ্রৌপদীর ওপর হওয়া অত্যাচারের বিধান করতেই মহাভারতে সংঘটিত হয়েছিল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যা নিশ্চিত করেছিল অধার্মিক

কৌরবদের পরাজয়। প্রাচীনকাল থেকে সেই অত্যাচারের ধারাই বহমান। নামের মধ্য দিয়ে মহাভারতীয় ঘটনার নবতর রূপায়ণ দেখালেন মহাশ্বেতা দেবী।

'মহাভারতের মহারণ্যে' গ্রন্থের প্রাককথন অংশে প্রতিভা বসু মহাভারতকে এক সহস্রকোণ বৈদূর্যমণির সঙ্গে তুলনা করে মন্তব্য করেছিলেন, 'তার বিচ্ছুরণ নানাদিকে প্রতিভাত। কোন অংশের দ্যুতিটি কার সৃষ্ট তা-ও যেমন আমরা জানি না, কোন দ্যুতি কাকে স্পৃষ্ট করবে, তাও তেমন অজানা।'[১৪] দ্রৌপদীর ঘটনাবহুল জীবনবৃত্তান্ত, তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা, প্রখর আত্মসম্মানবোধ, শাস্ত্রজ্ঞান এবং অপার্থিব সৌন্দর্যের দ্যুতি পাঠককে আজও মন্ত্রমুগ্ধ করে চলেছে। এই চরিত্রের বহুবর্ণচ্ছটায় চিন্তাশীল ব্যক্তি ভাবনার নতুন রসদ পাচ্ছেন। লিখিত হচ্ছে দ্রৌপদীকে কেন্দ্র করে মহাভারতের নব নব আখ্যান।

এইভাবেই এক যুগ থেকে আরেক যুগে মহাভারতের পুনর্নির্মাণ, বিনির্মাণ জারি থাকে। আদি মহাভারতের প্রত্যেক অধ্যায় শেষে 'বৈয়াসিক্যাম্' লেখা থাকার পরেও এটি কোনো সুনির্দিষ্ট সময়ে একক ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত হয়নি। বিস্তীর্ণ সময় ধরে বিস্তারিত প্রেক্ষাপটে মহাভারত ভারতবাসীর সামাজিক জ্ঞান-অভিজ্ঞতার মিশ্র ফসল। আসলে রামায়ণ, মহাভারত হল আদি মহাকাব্য তথা 'epic of growth', যেখানে দুই পংক্তির মাঝে থাকে অজস্র শূন্যস্থান; সেখানেই আধুনিক কথাসাহিত্যিক সুযোগ পেয়ে যান নিজের মতো করে সাজিয়ে নেওয়ার। লেখকদের রাজনৈতিক অবস্থান এবং সমাজ ও মানুষকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি এবং লিখনশৈলি বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে পুনর্নির্মাণ প্রক্রিয়াতেও বদল আসতে থাকে। মহাভারতে যা ইঙ্গিতমাত্র ছিল, বা যে সম্ভাবনা অস্ফূট ছিল, তাকেই নবজীবন দেন আধুনিক লেখক। এভাবেই মহাকাব্যিক চরিত্রের নতুন ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয়।

তথ্যসূত্র:

১. ড. দীপক চন্দ্র, "দ্রৌপদী চিরন্তনী", 'পাঁচটি রানি কাহিনি', ২য় সংস্করণ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জুন২০১৪, পৃ ৩৭৬

২. শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত,'মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত প্রথম খণ্ড–মহাভারত ' , রাজ সংস্করণ,কলকাতা,সাহিত্য তীর্থ ,২০১৬, পৃ ২৪৪

৩. তদেব, পৃ ২৪৪

৪. প্রতিভা বসু,'মহাভারতের মহারণ্যে' ,৮ম সংস্করণ,কলকাতা, বিকল্প প্রকাশনী , ২০১৬, পৃ ৯০

৫. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য অনূদিত, "মহাভারতে আদিপর্ব্বণি অশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ", 'মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস-প্রণীতম্ মহাভারতম্–আদিপর্ব্ব: ৪', বিশ্ববাণী সংস্করণ, ৪র্থ মুদ্রণ, কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, মাঘ ১৪২৬, পৃ ১৮১৪

৬. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য, পূর্বোক্ত, পৃ ১৮১১
৭. ড. দীপক চন্দ্র, "দ্রৌপদী চিরন্তনী", 'পাঁচটি রানি কাহিনি', ২য় সংস্করণ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জুন২০১৪, পৃ ৩৭৬
৮. নবনীতা দেবসেন, "অথ গঙ্গা-সত্যবতী কথা: অথবা সতীন সংবাদ", 'গল্পসমগ্র ৪', ২য় সংস্করণ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১১, পৃ ১১৯
৯. মহাশ্বেতা দেবী, "দ্রৌপদী", 'মহাশ্বেতা দেবীর ছোটোগল্প সংকলন', চতুর্থ মুদ্রণ, কলকাতা, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ২০০২, পৃ ২৯
১০. তদেব, পৃ ৩১
১১. রাজশেখর বসু, 'কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকৃত মহাভারত সারানুবাদ', পঞ্চদশ মুদ্রণ, কলকাতা, এম সে সরকার এণ্ডসন্স, ১৪২২, পৃ ১৩২
১২. মহাশ্বেতা দেবী, "দ্রৌপদী", 'মহাশ্বেতা দেবীর ছোটোগল্প সংকলন', চতুর্থ মুদ্রণ, কলকাতা, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ২০০২, পৃ ৩৯
১৩. তদেব, পৃ ৩৯
১৪. প্রতিভা বসু, "প্রাককথন", 'মহাভারতের মহারণ্যে', ৮ম সং, কলকাতা, বিকল্প প্রকাশনী, আগস্ট ২০১৬, পৃ ১১

ছিন্নপত্রে বর্ণিত পদ্মা-নদী ও প্রকৃতি

সুস্মিতা দত্ত
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়

সারাংশ : রবীন্দ্রনাথ ও প্রকৃতি অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কযুক্ত। প্রকৃতির প্রতি এই গভীর ভালোবাসা রবীন্দ্রনাথের আশৈশব। পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে হিমালয় যাত্রাকালীন প্রকৃতির অনন্ত প্রসারিত রূপ কবির শিশুমনের চেতনাকে নাড়া দিয়েছিল। প্রকৃতির নানা রূপের বর্ণনা তাঁর চিঠিপত্রের লেখনীতে বারে বারে ফুটে উঠেছে। জমিদারি পর্যবেক্ষণকালে তিনি পূর্ববাংলার শিলাইদহ, সাজাদপুর, পতিসরে বারংবার যাত্রা করেন এবং সেখানে দীর্ঘকাল অবস্থিতি করেন। এই সময়পর্বে ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে লেখা যে চিঠিপত্র, তাতে প্রকৃতির অপার বৈভবের চিত্র পরিস্ফুট। বিশেষ করে, পদ্মার বুকে বোটে অবস্থানকালীন পদ্মার নানা রূপ চিত্র। বিভিন্ন ঋতুতে পদ্মার রূপের যে বদল, সেটি কবি অবলোকন করে ক্ষান্ত হননি, তা অশ্লেষে পান করেছেন। ছিন্নপত্রে বর্ণিত হয়েছে বাংলাদেশের প্রকৃতির – আকাশ, মেঘমালা, শ্যামল সবুজ বিস্তৃর্ণ প্রান্তর, অরণ্যের নিষ্কলুষ রূপটিও। এই নদী ও প্রকৃতির সাথে কবি একাত্মতা অনুভব করেছেন। এদের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ খুঁজে পেয়েছেন জীবনের গতিময়তাকে।

সূচক শব্দ : ডালহৌসি পাহাড়, ছেলেবেলা, পদ্মা, শিলাইদহ, জলিবোট, সাজাদপুর, পতিসর, সোনার তরী, চিত্রা, মাধুরীলতা।

মূল প্রবন্ধ :

রবীন্দ্রনাথ ও প্রকৃতি অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কযুক্ত। প্রকৃতির নানা ক্রিয়া রবীন্দ্রনাথের মনোজগতে যে বিপুল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে, সেটি কবির লেখা নানা চিঠিতে প্রকাশিত। প্রকৃতির প্রতি এই গভীর ভালোবাসা রবীন্দ্রনাথের আশৈশব। ডালহৌসির পাহাড়ে মহর্ষির সঙ্গে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র দেখতে-দেখতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিচিত্র রূপ কাঁচা বয়সেই কবির চেতনাকে নাড়া দিয়েছিল। প্রকৃতির নানা রূপের বর্ণনা তাঁর চিঠিপত্রের লেখনীতে এমনভাবে ধরা দিয়েছে যে, মনে হয় পৃথিবীর সাথে তাঁর আদিকালের সম্পর্ক।

চিঠিপত্রের নানা জায়গায় মনে হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির কোলে, প্রকৃতির সঙ্গেই কেবল সময় কাটাতে আগ্রহী।

১৯১৫ সালের ১৮ জুলাই শিলাইদহ থেকে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লিখেছেন :

'রথী শিলাইদহে এসেচি।... অনেক দিনের পরে জলের ধারা ও সবুজ মাঠের সংস্রব ও নির্জ্জন পেয়ে আমি যেন নিজের সত্যকে আবার ফিরে পেয়েছি – এইখানেই সুদীর্ঘকাল পড়ে থাক্‌তে ইচ্ছা

> *করচে। নিভৃতে প্রকৃতির হাতের শুশ্রূষা আমার পক্ষে একান্ত দরকার – সেই জন্যই জীবনের ও সংসারের সমস্ত জঞ্জাল ছিন্ন করে ফেলে সুদূরে পালাবার জন্যে ক্রমাগতই আমার মন এত ছট্ফট্ করছিল।'* (পত্রসংখ্যা – ২২, চিঠিপত্র-২)

মর্ত্য পৃথিবীর প্রতি কবির এই অনুরাগ নিছক কবিকল্পনা নয়।

আসল কথা জীবনের সূচনা লগ্ন থেকেই প্রকৃতির জন্য, সৌন্দর্যের জন্য, ঈশ্বরের এমন অনাবিল সৃষ্টি রূপ-রস-গন্ধ সম্পন্ন পৃথিবীর মহত্তের জন্য কবির হৃদয় উজার করা ভালোবাসা লক্ষ্য করা যায়। কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলীতে মাত্র নয়, তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা 'ছেলেবেলা'তে প্রকৃতি প্রেমের চিত্তাকর্ষক নমুনা স্থানে স্থানে ব্যক্ত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য চিঠির বিষয় হিসাবে ধরা দিয়েছে প্রকৃতির অপার বৈভবের রূপচিত্র। প্রকৃতির এই যে নানা উপকরণ, তার পালাবদলের রূপ, বৈচিত্র্যের ব্যঞ্জনা – এইসব প্রতি মুহূর্তে কবিকে আলোড়িত করে তুলেছে। প্রকৃতির বিচিত্র রূপের প্রকাশ – আকাশ, রোদ্দুর, মেঘমালা, বৃষ্টি, শ্যামল সবুজ বিস্তৃর্ণ প্রান্তর, বন-বনানী – এই সব কিছুই রবীন্দ্রনাথের মনে যে ছন্দের ঝংকার তুলেছিল, তার ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন তাঁর লেখা চিঠিপত্রে। রবীন্দ্র স্মৃতিপটে বারবার ধরা পড়েছে নদীমাতৃক বাংলাদেশের পল্লীপ্রকৃতির সহজ-সরল-স্বচ্ছ, নিষ্কলুষ রূপটি। পদ্মাপারের প্রকৃতিকে তিনি শুধু অবলোকন করেই ক্ষান্ত হননি, তাকে অশ্লেষে পান করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা বা বেলার মধ্যেও প্রকৃতি চেতনাবোধ জাগিয়ে তোলার পিছনে তাঁর কবি-পিতা। পরবর্তীকালে কন্যা বেলাকে লিখেছিলেন : (শিলাইদা/নদীয়া চৈত্র ১৩১৮)

> *'পদ্মা আমাকে যেমন করে শুশ্রূষা করতে জানে এমন আর কেউ না। এতদিন চারদিকে নানা জায়গায় ঘোরাঘুরি না করে যদি এইখানে স্থির হয়ে পদ্মার কলধ্বনিতে কান পেতে চুপচাপ পড়ে থাকতে পারতুম তাহলে ভারি উপকার পেতুম...।'* (পত্রসংখ্যা – ১, চিঠিপত্র-৪)

বাংলাদেশের গোড়াই নদী, পদ্মা, কোপাই নদীর যে ক্ষণে ক্ষণে রূপের পরিবর্তন, তার বর্ণনা চিঠিতে দেবার সময় চিঠির প্রতিটি শব্দবন্ধ বাক্য সাহিত্য রচনা করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৮৯৩ সালের ১৬ই মে শিলাইদহ থেকে ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীর লেখা 'ছিন্নপত্রাবলী'র চিঠি :

> *'আমি প্রায়ই মনে করি, এই তারাময় আকাশের নীচে আবার কি কখনও জন্মগ্রহণ করব ? যদি করি, আর কি কখনও এমন প্রশান্ত সন্ধ্যাবেলায় এই নিস্তব্ধ গোড়াই নদীটির উপর বাংলাদেশের এই সুন্দর একটি কোণে এমন নিশ্চিন্ত মুগ্ধ মনে জলিবোটের উপর*

বিছানা পেতে থাকতে পাব ? হয়তো আর কোন জন্মে এমন একটি সন্ধ্যাবেলা আর কখনো ফিরে পাব না।'

(ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা – ৮৪)

রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী (মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর কন্যা) বিদূষী ইন্দিরা দেবী ছিলেন কবির অত্যন্ত স্নেহধন্যা। রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্রাবলী'র প্রাপিকা ছিলেন ইন্দিরা দেবী। রবীন্দ্রনাথ যখন শিলাইদহে অবস্থানরত, সেইসময় তিনি 'ছিন্নপত্রাবলী'র চিঠিগুলি লেখা আরম্ভ করেন। ছিন্নপত্রাবলীর বিষয় বৈচিত্র্য ছিল বিবিধ। প্রকৃতির এক একটি আশ্চর্য রূপের বর্ণনা এতে স্থান পেয়েছে। বর্ণনার ভাষারূপ এমন এক স্তরে উন্নীত হয়েছে যে, শব্দের পর শব্দ সজ্জিত হয়ে তা ছবির আকার পেয়েছে। 'ছিন্নপত্র' এর চিঠিগুলি প্রকৃতিকে চেনার ও ভালবাসার আকর।

রবীন্দ্রনাথ জমিদারির কাজকর্ম দেখাশোনার জন্য সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করতেন নদীপথ। তাঁর নদীযাত্রাপথে পথিমধ্যে পড়ত নাগর, পদ্মার মতো ছোট বড় নদী। যাত্রাপথে তিনি প্রকৃতির বিস্তীর্ণ রূপ সৌন্দর্য উপভোগ করে তাকে সযত্নে তুলে রাখতেন আপন সৃষ্টিকর্মে প্রকাশের জন্য।

রূপসী পল্লী বাংলার রূপে মোহিত রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলি তাই হয়ে উঠেছে বাংলার রূপসৌন্দর্যের এক আকরগ্রন্থ। কলকাতার বাইরে গিয়ে পল্লী প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে কবি যেভাবে প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও খুঁজে পেয়েছেন, কবির চিঠিপত্রে তার প্রমাণ অসংখ্যবার ধরা পড়েছে।

'পৃথিবী যে বাস্তবিক কী আশ্চর্য সুন্দরী তা কলকাতায় থাকলে ভুলে যেতে হয়। এই যে ছোটো নদীর ধারে শান্তিময় গাছপালার মধ্যে সূর্য প্রতিদিন অস্ত যাচ্ছে এবং এই অনন্ত ধূসর নির্জন নিঃশব্দ চরের উপরে প্রতি রাত্রে শত সহস্র নক্ষত্রের নিঃশব্দ অভ্যুদয় হচ্ছে, জগৎ-সংসারে এ-যে কী একটা আশ্চর্য মহৎ ঘটনা তা এখানে থাকলে তবে বোঝা যায়।'

(ছিন্নপত্র, ১০ সংখ্য চিঠি, শিলাইদহ, নভেম্বর ১৮৮৮)

একেই বোধহয় প্রথম দর্শনজাত প্রেম বলা যায়।

'ছিন্নপত্র'তে তিনি যেভাবে বাংলার পল্লী প্রকৃতির রূপকে তুলে ধরেছেন, তা সত্যই আশ্চর্যের। ছিন্নপত্রের চিঠিগুলিতে যে ভাব জগতের বার্তা আমরা পাই, সেই বার্তা মুখ্যত ভেসে এসেছে স্রোতস্বিনী পদ্মার বুকের ভেতর থেকে, রবীন্দ্রনাথ সেই বার্তাকে অন্তরে গভীরভাবে ধারণ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ যখন জমিদার হয়ে এসেছিলেন, তখন শিলাইদহ থেকে ১৮৯১ সালের ১ অক্টোবর বাংলার পল্লী প্রকৃতি ও পদ্মার রূপ বর্ণনার পুনরুক্তি যেন আবার দেখতে পাই :

> *‘পৃথিবীর যে কী আশ্চর্য সুন্দরী এবং কী প্রশস্ত প্রাণে এবং গভীরভাবে পরিপূর্ণ তা এইখানে না এলে মনে পড়ে না। যখন সন্ধ্যাবেলা বোটের উপর চুপ করে বসে থাকি, জল স্তব্ধ থাকে, তীর আবছায়া হয়ে আসে, এবং আকাশের প্রান্তে সূর্যাস্তের দীপ্তি ক্রমে ক্রমে ম্লান হয়ে যায়, তখন আমার সর্বাঙ্গে এবং সমস্ত মনের উপর নিস্তব্ধ নতনেত্র প্রকৃতির কী একটা বৃহৎ উদার বাক্যহীন স্পর্শ অনুভব করি। কী শান্তি, কী স্নেহ, কী মহত্ত্ব, কী অসীম করুণাপূর্ণ বিষাদ।’* (ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা-৩৫/১১দশ খণ্ড, রবীন্দ্র রচনাবলী)

পদ্মার প্রতি ভালোবাসার কথা নানাভাবে তিনি ব্যক্ত করেছেন। পদ্মা কবিকে বাণী দিয়েছেন এইকথা কবি নিজে স্বীকার করেছেন একাধিকবার। পদ্মানদীকে কবির মনে হয়েছে মানুষের মতো, তবে তার যে গতি, সেই গতিকেই কবি নিজের জীবনে ও রচনায় গ্রহণ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের এক সাহিত্যের সংরূপ আলোচনায় সাহিত্যের অপর সংরূপটির প্রসঙ্গ যে চলে আসবেই, এতো অবশ্যম্ভাবী। রবীন্দ্রনাথের নানা রচনায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পদ্মা প্রসঙ্গ এসেছে। পদ্মার মহাকাব্য ‘ছিন্নপত্রাবলী’। প্রমথনাথ বিশী ‘শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থের ‘কবির পদ্মা’ প্রবন্ধে বলেছেন যে,

> *‘... পদ্মা নদ হতে গিয়ে নদী, ছিন্নপত্রাবলী গদ্য হতে গিয়ে পদ্য। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গদ্যকবিতা ছিন্নপত্রাবলী, সে কাব্যও আবার পদ্মাশ্রয়ী।’*

রবীন্দ্রনাথের মতো মহাকবির দৃষ্টিতে পদ্মাকে আর কারো পক্ষে দেখা সম্ভব ছিল না। বছরের পর বছর, ঋতুর পর ঋতু পদ্মাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে তিনি পদ্মার বিশ্বরূপ দর্শন করতে সমর্থ হয়েছেন। চোখের দৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কল্পনার দৃষ্টি। ঋতুভেদে পদ্মার বেশ ও বসনের পরিবর্তন কবি লক্ষ্য করেছেন। প্রমথনাথ বিশীর ভাষায়,

> *‘নববর্ষায় নীল, ভরা বর্ষায় গৈরিক, শরতে আসমানি, শীতে সবুজ ঘেঁষা, শীতান্তে স্বচ্ছ ডুরে আর গ্রীষ্মে বালুচরী। বসনের কত রঙ, কত রঙের বসন। সেসব বসনে রাতের বেলায় তারার ফুলকাটা, দিনের বেলায় নানা রঙের মেঘের ছোপ, আর রৌদ্রের আভায় প্রত্যেক তরঙ্গশীর্ষে মণিমুক্তা হীরকের কাজ। ... কখনো তরঙ্গ ভীষণ, কখনো প্রভঞ্জনে উন্মাদ, কখনো বিলাসান্তে শ্রান্ত-ক্লান্ত শয্যা-শায়িতা, কখনো বা অসংখ্য তরণীর সাদা পালের চন্দনের পত্র-লেখায় অপরূপা, আর শীতান্তে ডুরে শাড়িখানি গায়ে জড়িয়ে নিয়ে তন্বী কিশোরীর মতো চঞ্চল চরণে গৃহকার্যনিরতা...’*
>
> (শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ/‘কবির পদ্মা’)

প্রকৃতির ঋতুরঙ্গশালায় পল্লী বাংলার বর্ষার রূপ, পদ্মার রূপ দেখে তিনি বারেবারে আপ্লুত হয়েছেন। পদ্মার বর্ণনা করতে গিয়ে ১৮৯২ সালের ২১ জুলাই শিলাইদহ থেকে তিনি ইন্দিরা দেবীকে লিখেছেন :

> *'... পদ্মায় গিয়ে পড়তে হবে, তার বোধ হয় আর কূল-কিনারা দেখবার জো নেই। সে মেয়ে বোধ হয় একেবারে উন্মাদ হয়ে খেপে নেচে বেরিয়ে চলেছে, সে আর কিছুর মধ্যেই থাকতে চায় না। তাকে মনে করলে আমার কালীর মূর্তি মনে হয় – নৃত্য করছে, ভাঙছে, এবং চুল এলিয়ে দিয়ে ছুটে চলেছে। মাঝিরা বলছিল, নতুন বর্ষায় পদ্মার খুব 'ধার' হয়েছে।'* (ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা-৬৩)

বর্ষার পদ্মার ভয়ংকর সৌন্দর্যের বর্ণনা কবি এখানে দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখা বিভিন্ন চিঠিপত্রে উল্লেখ করেছেন পূর্ববাংলার নানাস্থানে – শিলাইদহ, সাজাদপুর, পতিসর ইত্যাদি সেখানে জমিদারি কার্যকলাপ দেখার সুবাদে দীর্ঘকাল পদ্মার বুকে বোটে অবস্থান করেছেন। দিনরাত্রি পদ্মার বুকে থাকার সুবাদে পদ্মাকে বিভিন্ন কোণ থেকে দেখার সুযোগ এবং চেনার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। প্রতি দিন, প্রতি মুহূর্তে পদ্মার রূপের যে যৎসামান্য পরিবর্তন তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন, তার নানা বর্ণনা তিনি তাঁর চিঠিপত্রে উল্লেখ করেছেন।

বাংলাদেশের নদীর যে গতি, তার মধ্যেও কবি এগিয়ে চলার মন্ত্র পেয়েছেন। নদীবক্ষে ভাসমান অবস্থায় দুই পাড়ের কিছু না থাকাও তাঁর মনে একটি ভালো লাগার অনুভূতি তৈরি করেছে। ঐ একই চিঠিতে নদী রূপের ভিন্নতার পরিচয় দিয়ে তিনি লিখেছেন :

> *'ক্রমে নদীর সেই ছিপ্‌ছিপে আকারটুকু আর থাকে না – নানা দিকে নানারকমে ভাগ হয়ে ক্রমে চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ল। এই খানিকটা সবুজ ঘাস এই খানিকটা স্বচ্ছ জল, দেখে পৃথিবীর শিশুকাল মনে পড়ে।'* (ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা-১৯)

বাংলাদেশ নদী সর্বস্ব দেশ। সারা বছর তার নদীতে ফেনিল জলধারা। কিন্তু বর্ষা ঋতুতে পদ্মা সহ অন্যান্য নদী ভীষণা, ভয়ংকরী। সেই ভরা বর্ষায় রবীন্দ্রনাথ নদীর রূপকে এইভাবে বর্ণা করেছেন চিঠিপত্রে। ১৮৯২ সালের ২১ জুলাই শিলাইদহ থেকে তিনি লিখছেন :

> *'কাল বিকেলে শিলাইদহে পৌঁচেছিলুম আজ সকালে আবার পাবনায় চলেছি। নদীর যে রোখ। যেন লেজ-দোলানো কেশর ফোলানো তাজা বুনো ঘোড়ার মতো। গতিগর্বে ঢেউ তুলে ফুলে ফুলে চলেছে – এই খেপা নদীর উপর চড়ে আমরা দুলতে দুলতে চলেছি।... এই ভরা নদীর যে কলরব সে আর কী বলব। ছল্‌ছল্ খল্‌খল্ করে কিছুতে যেন আর ক্ষান্ত হতে পারছে না, ভারি একটা যৌবনের*

> *মত্ততার ভাব। এ তবু গড়ুই নদী, এখান থেকে আবার পদ্মায় গিয়ে পড়তে হবে, তার বোধ হয় আর কূল-কিনারা দেখবার জো নেই।'* (ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা-৬৩)

বিপুলা পদ্মার বিচিত্র রূপ কবি অবলোকন করেছেন। বর্ষায় সে প্রচণ্ডা, শীতে সে তুলনায় শান্ত। প্রতি ঋতুতে তার রূপের নানাবিধ পরিবর্তন। ১৮৯৪ সালের ১৪ ডিসেম্বর শিলাইদহ থেকে কবি লিখেছেন :

> *'পদ্মা তো একটা প্রকাণ্ড নাগিনীই বটে। সে এক সময় এই বৃহৎ চরের উপর বাস করত, এখন সেখানে কেবল তার একটা বৃহৎ খোলস সন্ধ্যার আলোয় পড়ে চিক্‌চিক্ করছে। বর্ষার সময় সে আপনার সহস্র ফণা তুলে ডাঙার উপর ছোবল মারতে মারতে, গর্জন করতে করতে, কেমন করে আপনার প্রকাণ্ড বাঁকা লেজ আছড়াতে আছড়াতে ফুলতে ফুলতে চলত, সেই দৃশ্যটাও মনে পড়ল। এখন সে শীতকালের সরীসৃপ, বিবরের মধ্যে অর্ধপ্রবিষ্ট হয়ে সুদীর্ঘ শীতনিদ্রায় প্রতিদিন ক্ষীণতর হয়ে যাচ্ছে।'* (ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা-১৩৩)

কবি যখন শিলাইদহে বসবাস করছিলেন এবং সাজাদপুর ও পতিসরে যাতায়াতের মধ্যে ছিলেন সেই সময় রচিত হয়েছিল 'সোনারতরী', 'চিত্রা', 'চৈতালি', 'কণিকা', 'ক্ষণিকা', 'কল্পনা', 'নৈবেদ্য' এবং গল্পগুচ্ছের অনেকগুলি গল্প এবং ছিন্নপত্রের পত্রগুচ্ছ। এইসব রচনার মধ্যে কোনো না কোনোভাবে চলে এসেছে নদী প্রসঙ্গ। ছিন্নপত্র তো প্রায় নদীরই আখ্যান।

রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে অধিকার করেছিল পদ্মা নদী। পদ্মা নদীর বিচিত্র চরিত্র ও বিচিত্র প্রবাহ তাঁর রচনায় বিভিন্নভাবে এসেছে। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্মে পদ্মাসহ অন্যান্য ছোট বড় নদীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব ছিল একথা বললে অত্যুক্তি হয় না। 'সোনার তরী' কাব্যরচনার নেপথ্যেই ছিল পদ্মার অপরিসীম ভূমিকা। কবি নিজেও স্বীকার করেছেন যে, পদ্মা নদীকে তিনি বাস্তবিক খুব ভালবাসেন। তিনি যখন শিলাইদহে বোটে অবস্থান করেন পদ্মা তাঁর কাছে 'সত্যিকারের স্বতন্ত্র মানুষের মতো।' 'পদ্মা' কবিতায় তাইতো তিনি লেখেন : 'হে পদ্মা আমার / তোমায় আমায় দেখা শত শত বার।'

গ্রন্থঋণ :

১. চিঠিপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী।

২. চিঠিপত্র, চতুর্থখণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী।

৩. ছিন্নপত্র, রবীন্দ্ররচনাবলী, একাদশ খণ্ড, পঃবঃ সরকার।

৪. শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ, প্রথমনাথ বিশী, মিত্র ও ঘোষ পাব।

মুসলিম বিবাহ - বর্তমান সমাজের নিরীখে এর প্রাসঙ্গিকতা ও পরিবর্তিত রূপ

পৌলমী সাহা
সহকারী অধ্যাপক, সমাজতত্ত্ব বিভাগ,
মুজাফফর আহমেদ মহাবিদ্যালয়,
সালার, মুর্শিদাবাদ

সারসংক্ষেপ : বিবাহ একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজেই এর গুরুত্ব অপরিসীম। মুসলমান বিবাহকে কথ্য ভাষায় নিকাহ বলা হয়। মুসলমান বিবাহকে চুক্তিভিত্তিক (Civil cntract) ধরা হয়। মুসলমান সমাজে মনে করা হয় আল্লাহ বা ঈশ্বর কতগুলি ফরজ-এর (Farj) কথা বলে গেছেন। বিবাহ একটি ফরজের মধ্যে পড়ে। ফরজ অর্থাৎ অবশ্যকর্তব্য। বাল্যবিবাহ ইসলাম ধর্মে অনুমোদিত নয়। মুসলমান বিবাহে অযথা অনুষ্ঠানের আড়ম্বর নেই। এই বিবাহের কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল - দেনমোহর, পাত্রীর অনুমতি নেওয়া ইত্যাদি। বহুবিবাহ ইসলাম ধর্মে আইনসিদ্ধ। তবে এক্ষেত্রে নিয়ম রয়েছে। বিবাহবিচ্ছেদও আইনসিদ্ধ। গবেষণাপত্রটিতে গবেষক একটি সমীক্ষার মাধ্যমে দেখতে চেয়েছেন যে, বর্তমান সমাজে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর প্রয়োজনীয়তা কতখানি, অন্য ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানগুলি এই ধর্মের বিবাহে কতটা প্রবেশ করেছে, বিবাহবিচ্ছিন্না মুসলিম নারীর স্বাধীন জীবনযাপন সম্ভব কিনা, বাল্যবিবাহের প্রবনতা কতখানি আছে, পুনর্বিবাহ, তিন তালাক প্রথার যুক্তিসঙ্গতা কতখানি। "তালাক-ই-বিদ্দাহ" বা তিন তালাক-এর একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে। সমীক্ষাতে একশ জন মুসলমান নারী-পুরুষের মতামত তুলে ধরা হয়েছে। গবেষণাপত্রটিতে মুসলমান বিবাহের ধর্মীয় ব্যাখ্যা, তার বিভিন্ন নিয়ম এবং বর্তমান সমাজে তার রূপ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।
মূল শব্দ- মুসলমান বিবাহ বা নিকাহ্, সাংস্কৃতিক আত্তিকরণ, তালাক, দেনমোহর, পুনর্বিবাহ।

মূল প্রবন্ধ :

মুসলিম বিবাহকে কথ্যভাষায় "নিকাহ" (nikah) বলা হয়। হিন্দু বিবাহ ও মুসলিম বিবাহের মধ্যে কিছু পার্থক আছে। হিন্দু বিবাহ সাধারণত ধর্মের বাঁধনে বাঁধা থাকে (Sacramental), কিন্তু মুসলিম বিবাহকে চুক্তিভিত্তিক (Civil contract) ধরা হয়। মুসলিম বিবাহের গুরুত্বপূণ উদ্দেশ্যগুলি হল যৌনজীবনের উপর নিযন্ত্রণ সাধন, গাহস্থ জীবন সম্পাদন, সন্তান লালন পালন ইত্যাদি।

বিবাহ একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সমাজেই এর গুরুত্ব অপরিসীম। মুসলিম বিবাহ সর্বদাই চুক্তিভিত্তিক একথা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। ধর্মীয় রীতিনীতি ও দায়িত্ব পালনও মুসলিম বিবাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এদিক থেকে দেখতে গেলে হিন্দু বিবাহ এবং মুসলিম বিবাহ উভয় ক্ষেত্রেই ধর্মীয় দিকটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। মুসলিম বিবাহের এই দিকটিকে 'ibadat' বা উপাসনা বলা হয়। মনে করা হয় যে, যে ব্যক্তি সঠিকভাবে এটি করতে পারবে মৃত্যুর পর জন্নত বা স্বর্গে যাবে। মুসলিম সমাজে মনে করা হয় যে আল্লাহ বা ঈশ্বর কতগুলি ফরজ্-(Farj) এর কথা বলে গেছেন। বিবাহ একটি ফরজ্- এর মধ্যে পড়ে। বিবাহ না করলে ফরজ্ অমান্য করা হয়। ফরজ্ অর্থাৎ অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি ফরজ্ করবে সে ব্যক্তি জন্নত (স্বর্গ) বাসী হবে।

নাজিবুল হুসাইন অনূদিত "মুসলিম ব্যক্তিগত আইন" গ্রন্থ অনুসারে বিবাহ হল নর-নারীর মধ্যে ইসলাম ধর্মের নিয়ম-নীতি অনুসারে কৃত চুক্তি, যার ফলে পারস্পরিক দৈহিক সম্পর্ক বৈধ হয়ে যায় এবং তজ্জনিত সন্তানাদি মাতা-পিতার বলে ইসলামী বিধানমতে স্বীকৃতি লাভ করে। ফলে পরস্পরের অধিকার ও দায়বদ্ধতা অর্পিত হয়। বিবাহের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হল মানবকুলের স্থায়িত্ব, সতীত্ব ও পবিত্রতা বজায় রাখা এবং পারস্পারিক প্রীতি, ভালোবাসা ও শান্তি অর্জন করা।

মুসলিম বিবাহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে ইসলাম ধর্মের উদ্ভব ও তার সম্পর্কে দুএকটি কথা জেনে নেওয়া প্রয়োজন। সপ্তম শতাব্দীতে মক্কা শহরে একটি নতুন ধর্মের উদ্ভব হয় হজরত মহম্মদের (৫৭০-৬৩২) হাত ধরে। তিনি ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা। এই ধর্মের প্রচার করা কালীন তিনি মক্কাতে বহু বাধার সন্মুখীন হন এবং মক্কা পরিত্যাগ করে মদিনা শহরে গমন করেন। পরবর্তীকালে মুহম্মদের এই ধর্মমত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং খ্রিস্ট ধর্মের পর এটি দ্বিতীয় বৃহওম ধর্ম হিসবে জায়গা করে নেয়। সমগ্র বিশ্বে মুসলমানদের সংখাগত অবস্থান হল ১.৮ বিলিয়ন (১৮০ কোটি)। খ্রিস্টানদের সংখ্যা হল ২.৩ বিলিয়ন।

৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে হজরত মুহম্মদের প্রয়ানের পর ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এরা হলেন শিয়া ও সুন্নী। মুহম্মদের উওরাধিকারী কে হবেন- এই বিষয়কে কেন্দ্র করে ভাগাভাগির সুত্রপাত হয়। সুন্নী সম্প্রদায়ের মতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে উত্তরাধিকারী বা খলিফা নির্বাচন করতে হবে। অপরদিকে শিয়ারা মনে করেন যে খলিফা হওয়ার অধিকারী হল হজরত কন্যা ফতেমার স্বামী আলি বিন আবি তালিব। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমগ্র বিশ্বে সুন্নীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং শিয়ারা সংখ্যালঘিষ্ট হয়ে পড়ে।

মুসলমান সমাজে বিবাহকে 'সুন্নত' বলে মনে করা হয়। সুন্নত অর্থাৎ হজরত মুহম্মদ যা করেছেন তাকে পালন করা। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে - ইসলাম ধর্ম নানা ধরনের মানবিক ক্রিয়াকর্মে বিভক্ত; যেমন-

১। ফরজ্ (অবশ্য পালনীয় – Absolutely obligatory)
২। সুন্নত (অর্থাৎ হজরত মুহম্মদ যা করেছেন)
৩। ওয়াজিব (Obligatory in the second degree)
৪। মুশ্ তাহাবা (recommended)
৫। হারাম (নিষেধ- absolutely prohibited)
৬। মক্ রুহ (এড়িয়ে যাওয়া ভাল)
৭। জায়েজ (বিশেষভাবে অনুমতি প্রাপ্ত)
৮। মুবাহ্ (বিশেষভাবে নিষেধ কিনা তা বলা নেই)

ফরজ্ বা অবশ্যই পালনীয় কর্তব্যগুলি হল-

ক। কলমা
খ। ৫ বার নামাজ পড়া
গ। জাকাত দেওয়া (ধর্মীয় কর)
ঘ। রোজা পালন (রমজান মাসে)
ঙ। হজ পালন

মুসলমান সমাজে বিবাহ একটি সামাজিক চুক্তি। অপর দিকে বিবাহকে একটি ধর্মীয় কাজ তথা কর্তব্য-(সুন্নত) বলে মনে করা হয়। আরবিতে বিবাহকে নিকাহ বলা হয়। বিবাহের দ্বারা স্বামী-স্ত্রী তাদের জৈবিক, মানবিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক শান্তি লাভ করতে পারে। সুতরাং ইসলাম ধর্মে বিবাহ করতে উৎসাহ প্রদান করা হয়। সন্তানদের বিবাহ দেওয়ার ক্ষেত্রেও অভিভাবকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিবাহ হল একটি প্রতিষ্ঠান (Institution), এই প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব মানব সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। বাল্যবিবাহ ইসলামে অনুমোদিত নয়; বরং শারীরিক ও মানসিকভাবে বয়স্ক যুবক-যুবতীদের বিবাহ করতে বলা হয়েছে। তবে বাল্যবিবাহের প্রচলন কেবল ইসলাম ধর্মে নয়, হিন্দু ধর্মে ও দেখা যায়। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ এগুলি পূর্বে প্রচলিত ছিল। এক্ষেত্রে ধর্মের থেকে বড় হল অশিক্ষা বা শিক্ষার প্রচলন না থাকা। বর্তমানে শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের বিবাহের বয়স বেড়ে গেছে। তবে গ্রামের দিকে এখনো কম বয়সে বিবাহের প্রচুর নিদর্শন রয়েছে।

মুসলিম বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নিয়মের উল্লেখ রয়েছে। নিকট সম্পর্কের আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যেমন- সহোদর ভাইবোন, বোনের কন্যা, মায়ের বোন, বাবার বোন, কন্যা, ভাইয়ের কন্যা ইত্যাদি সম্পর্কে বিবাহ সম্পূর্ণরূপে নিষদ্ধ। তবে বিবাহের এই নিয়মকানুনগুলি ইসলামিক যুগে হজরত মুহম্মদ দ্বারা কৃত। প্রাক ইসলামিক যুগে কোনো নিয়ম কানুন ছিল না। সেসময় মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা খুবই নিচু ছিল। এপ্রসঙ্গে মঈনুল হাসান তাঁর গ্রন্থ “ইসলামী আইন-বিবাহ, তালাক, উওরাধিকার”- এ বলেছেন যে “ প্রাক ইসলামী যুগে আরবে বিবাহের নিয়মকানুন ছিল না। কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার স্ত্রী বা স্ত্রীদের

সম্পত্তি লুট করা হত”। বর্তমান সময়ে ইসলামী সমাজে বিবাহের সময় ঘটক মারফৎ পাত্র- পাত্রী নির্বাচন হয়ে থাকে। এছাড়া প্রেমের বিবাহের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। মুসলমান বিবাহে অযথা অনুষ্ঠানের আড়ম্বর নেই। এক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান খুব বেশী নেই।

মুসলমান বিবাহে প্রথমে বর পক্ষ কন্যা পক্ষের বাড়িতে যান। এরপর দেনমোহর কত হবে তা ঠিক করা হয়। দেনমোহর অর্থাৎ স্বামী তার স্ত্রীকে দেওয়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থ ঠিক করেন তার স্ত্রীর ভবিষ্যত নিরাপত্তার কথা ভেবে। সুতরাং দেনমোহর হল পাত্রীর আর্থিক নিরাপত্তা। ইসলামীয় বিবাহে পাত্রীর অনুমতি নেওযা হয়। এছাড়া বিবাহে দুজন সাক্ষীর উপস্থিতি প্রয়োজন। পাত্রীর সম্মতির পর মৌলবি কোরান থেকে পাঠ করেন। দুই রাকাত নামাজ পড়া হবে এবং শেষে ওলিমা বিতরণ করা হবে। ইসলাম ধর্মে বিধবাবিবাহ ও পূর্ণবিবাহের প্রচলন আছে। এছাড়া বহুবিবাহ এক্ষেত্রে আইনসিদ্ধ, তবে বহুবিবাহের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম রয়েছে। একজন মুসলমান পুরুষ সর্ব্বোচ চারটি বিবাহ করতে পারে, তবে পরবর্তী বিবাহে প্রথম স্ত্রীর অনুমতি নেওয়া আবশ্যক।

উপরিউক্ত আলোচনাতে মুসলিম বিবাহের ধর্মীয় ব্যখ্যা বা তার বিভিন্ন নিয়ম এবং বর্তমান সমাজে তার রূপ সম্পর্কে আলোচনা করা হল। মুসলিম বিবাহ- তার প্রাসঙ্গিকতা, রীতি-নীতির পরিবর্তন, বিবাহবিচ্ছেদ, বাল্যবিবাহ, পুনর্বিবাহ, তালাক ইতাদি বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে একটি সমীক্ষা করা হয়েছে। সমীক্ষাটি মুর্শিদাবাদ জেলার সালার থানা অঞ্চলে করা হয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলা বেছে নেওয়ার কারন হল এই জেলাটিতে মুসলমান সংখ্যা গরিষ্ঠ। সমীক্ষাটি সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

পদ্ধতিবিদ্যা-

সমীক্ষাটি উদ্দেশ্যমূলক নমুনাচয়ন পদ্ধতির মাধ্যমে করা হয়েছে। নমুনা হল সমগ্রকের একটি বিশেষ অংশ যাতে সমগ্রকের সকল বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকে। নমুনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে দুটি পদ্ধতি রয়েছে। সম্ভাবনা নির্ভর নমুনাচয়ন পদ্ধতি (probability sampling) ও সম্ভাবনা অনির্ভর নমুনাচয়ন পদ্ধতি (Nom Probability sampling)। উদ্দেশ্যমূলক নমুনাচয়ন পদ্ধতিটি সম্ভাবনা অনির্ভর নমুনাচয়ন পদ্ধতিতে পড়ে থাকে। উদ্দেশ্যমূলক নমুনাচয়ন পদ্ধতি হল যেখানে গবেষক তাঁর নিজস্ব বিচার-বুদ্ধির মাধ্যমে নমুনা চয়ন করে থাকেন। যাতে গবেষণার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

এছাড়া একটি প্রশ্নমালা তৈরী করা হয়েছে। তাতে মুক্ত প্রশ্ন (open-end question) ও বদ্ধ প্রশ্ন (close-end questions) উভয়ই ব্যবহার করা হয়েছে। সমীক্ষাটি করা হয়েছে ১০০ জন নমুনার মধ্যে। সমীক্ষা স্থল মুর্শিদাবাদ জেলার সালার থানা অঞ্চল। সাক্ষাৎকার পদ্ধতির (Interview method) মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ হয়েছে। কাঠামোগত সাক্ষাৎকার (Structured Interview minod) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য -

সমীক্ষাটিকে কতগুলি উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলি হল-

১। একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবাহের প্রয়োজনীয়তা কতখানি, তা দেখা।

২। হিন্দু ধর্ম বা অন্য ধর্মের বিবাহের আচারগুলি মুসলিম বিবাহে কতখানি প্রবেশ করেছে তা সম্পর্কে মতামত নেওয়া।

৩। বিবাহবিচ্ছিন্না মুসলিম নারী স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করতে পারেন কিনা তা জানা।

৪। বাল্যবিবাহ এখনো হচ্ছে কিনা তা সমীক্ষা করা।

৫। মুসলিম বিধবা মহিলার পূর্নবিবাহ সম্পর্কে মতামত নেওয়া।

৬। তিন তালাক প্রথা কতটা যুক্তিসঙ্গত, তা দেখা।

উপরিউক্ত উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে সমীক্ষা করা হয় ১০০ জন মুসলিম পুরুষ ও নারীর মধ্যে, তথ্যগুলি সংগ্রহ করে শতকরা পদ্ধতি (percentile method) ব্যবহার করে কতগুলি সারণী প্রস্তুত করা হয়েছে।

সারনী- ১

সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবাহের প্রয়োজনীয়তা –

বয়স (বছর)	প্রয়োজনীয়	প্রয়োজনীয়তা কম	মোট	শতকরা
১৫ থেকে ২৫ বছর	১৮	---	১৮	১৮%
২৬ থেকে ৩৫ বছর	২২	---	২২	২২%
৩৬ থেকে ৪৫ বছর	২০	---	২০	২০%
৪৬ থেকে ৫৫ বছর	৩০	---	৩০	৩০%
৫৫ বছরের উর্ধ্বে	১০	---	১০	১০%
মোট	১০০	---	১০০	১০০%

সারণী - ১ থেকে জানা যাচ্ছে যে প্রত্যেকেই সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবাহ প্রয়োজনীয় জানিয়েছেন। উত্তরদাতাদের মধ্যে অধিকাংশ (৩০%) ৪৬-৫৫ বছর বয়সী।

সারণী-2

হিন্দু ধর্ম বা অন্য ধর্মের বিবাহের আচার অনুষ্ঠান মুসলিম বিবাহে প্রবেশ করেছে –

লিঙ্গ	প্রবেশ করেছে	প্রবেশ করেনি	মোট	শতকরা
পুরুষ	৩০	১৪	৪৪	৪৪%
মহিলা	৪০	১৬	৫৬	৫৬%
মোট	৭০	৩০	১০০	১০০%

সারণী-২ থেকে জানা যাছে যে অধিকাংশ উত্তরদাতা (৭0%) মত প্রকাশ করেছেন যে অন্য ধর্মের বিবাহের আচারগুলি মুসলিম ধর্মে প্রবেশ করেছে। ৩০% উত্তরদাতা বলেছেন প্রবেশ করেনি। ৭০% উত্তরদাতার মধ্যে ৪০% মহিলা উত্তরদাতা।

সারণী- ৩

বিবাহবিচ্ছিন্না নারীর স্বাধীন জীবননির্বাহ সম্পর্কিত মত –

লিঙ্গ	স্বাধীন জীবন নির্বাহ করে	স্বাধীন জীবন নির্বাহ করে না	মোট	শতকরা
পুরুষ	৩৪	১৬	৫০	৫০%
মহিলা	৩৮	১২	৫০	৫০%
মোট	৭২	২৮	১০০	১০০%

সারণী-৩ থেকে জানা যাচ্ছে যে ৭২%, উত্তরদাতা মনে করেন বিবাহবিচ্ছিন্না নারী স্বাধীনভাবে জীবনযাপণ করতে পারেন। কেবলমাত্র ২৮% উত্তরদাতা এর বিপক্ষে।

সারণী- ৪

উত্তরদাতার এলাকায় বাল্যবিবাহ হয়েছে কিনা সে সম্পর্কিত মতামত –

পারিবারিক আয় (টাকা)	হ্যাঁ	না	মোট	শতকরা
৫০০০- ১০,০০০	৮	২২	৩০	৩০%
১০,০০১-১৫,০০০	১০	২০	৩০	৩০%
১৫,০০১- ২০,০০০	৪	১২	১৬	১৬%
২০,০০১-২৫,০০০	৮	৬	১৪	১৪%
২৫,০০১- ৩০,০০০	৪	৬	১০	১০%
মোট	৩৪	৬৬	১০০	১০০%

উপরের সারনী থেকে দেখা যাচ্ছে যে অধিকাংশ উত্তরদাতা (৬৬%) বলেছেন যে তাদের অঞ্চলে বাল্যবিবাহ হয় না। ৩৪% জানিয়েছেন যে এখনো বাল্যবিবাহ তাদের এলাকায় দেখা যায়।

সারনী- ৫

মুসলিম বিধবা মহিলাদের পুনর্বিবাহ সম্পর্কিত মত-

বয়স (বছর)	ভালো	খারাপ	মোট	শতকরা
১৫ থেকে ২৫ বছর	২০	---	২০	২০%
২৬ থেকে ৩৫ বছর	৪০	---	৪০	৪০%
৩৬ থেকে ৪৫ বছর	১৬	---	১৬	১৬%
৪৬ থেকে ৫৫ বছর	৮	---	৮	৮%
৫৫ বছরের ঊর্ধ্বে	৪	---	৪	৪%
মোট	১০০	---	১০০	১০০ %

উপরের সারনী থেকে দেখা যছে যে সকল উত্তরদাতাই মুসলিম বিধবা মহিলাদের পুনর্বিবাহ সম্পর্কে পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন।

সারণী- ৬

তিন তালাক প্রথার গ্রহণযোগ্যতা সংক্রান্ত মতামত-

শিক্ষা	তিন তালাক দেওয়া যায়	তিন তালাক দেওয়া যায় না	মোট	শতকরা
নিরক্ষর	---	২০	২০	২০%
মাধ্যমিক	---	৩০	৩০	৩০%
উচ্চ-মাধ্যমিক	---	২৬	২৬	২৬%
গ্র্যাজুয়েট	৪	৮	১২	১২%
পোস্ট গ্র্যাজুয়েট	---	৮	৮	৮%
পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ঊর্ধ্বে	---	৪	৪	৪%
মোট	৪	৯৬	১০০	১০০%

উপরের সারনী থেকে দেখা যাচ্ছে যে অধিকাংশ উত্তরদাতা (৯৬%) তিন তালাক দেওয়া যায় না বলে মত পোষণ করেছেন। মাত্র ৪% উত্তরদাতার মতে তিন তালাক দেওয়া যায়। যে উত্তরদাতারা স্বল্পশিক্ষিত তাদের মতেও তিন তালাক গ্রহণযোগ্য নয়।

উপসংহার:
সুতরাং উপরের সারণীগুলি থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে সাধারণ মুসলমান পুরুষ ও মহিলার মধ্যে সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবাহ এখনো গুরুত্বপূর্ণ। তারা মনে করেন যে সমাজে নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য, মানবসমাজকে সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এর প্রয়োজন রয়েছে। বিবাহের সাথে সংস্কৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দীর্ঘসময় ধরে দুটি ধর্মের মানুষ পাশাপাশি বসবাস করার ফলে তাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান প্রদান হয়। একটি ধর্মের বিবাহের আচার অনুষ্ঠান অপর ধর্মের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। বিবাহ একটি আনন্দ অনুষ্ঠান। ফলে খুব সহজেই হিন্দু ধর্ম থেকে মালাবদল, অঙ্গুরী বিনিময়, আইবুড়ো ভাত, বর ও কনের সাজসজ্জার পরিবর্তন, যেমন মুকুট পরা ইত্যাদি আচারগুলি মুসলিম বিবাহে প্রবেশ করে। এগুলি যে খুব সচেতনভাবে দ্রুত ঘটে, তা নয়। বরং খুব ধীরে ধীরে এর প্রবেশ একটি সংস্কৃতি থেকে অপর সংস্কৃতিতে হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় “cultural assimilation” বা “সাংস্কৃতিক আত্তীকরণ”। কেবল হিন্দু থেকে ইসলাম ধর্মে নয়, ইসলাম ধর্ম থেকে হিন্দু ধর্মেও বহু সাংস্কৃতিক আচারের প্রবেশ হয়েছে। বাংলার অধিকাংশ (প্রায় ৭০%) মুসলিম যেহেতু হিন্দু বা অন্য ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত সেই কারণে পূর্বের হিন্দু ধর্মের বেশ কিছু রীতি তারা পরেও পালন করে গিয়েছে। এই কারণেও বলা যায় হিন্দু ধর্মের বিবাহের বেশ কিছু আচার মুসলিম ধর্মে এসেছে।

সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে যে বিবাহবিচ্ছিন্না নারীর স্বাধীন জীবনযাত্রা নির্বাহ সম্পর্কে একটি অধিকাংশ মানুষই মনে করছেন যে তারা সঠিকভাবে জীবন নির্বাহ করতে পারেন। সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী এনিয়ে বেশ কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে বলে মনে হয়। মুসলিম ধর্মে বিবাহবিচ্ছিন্না নারীর প্রতি সহানুভূতি দেখানো হয়েছে, এবং তার পূর্ণবিবাহের কথাও বলা হয়েছে। এছাড়া বাল্য-বিবাহ নিয়ে বলা যায় যে গ্রামাঞ্চলগুলিতে বাল্যবিবাহ হিন্দু ও মুসলিম উভয় ধর্মেই দেখতে পাওয়া যায়। যদিও বর্তমানে শিক্ষার হার বাড়ার ফলে বাল্যবিবাহের পরিমাণ আগের থেকে অনেকটাই কমে গেছে।

ইসলাম ধর্মে হজরত মোহম্মদ বলে গেছেন বিধবা মহিলার পূর্ণবিবাহের কথা। এমনকী নবী নিজেই বিধবা মহিলাকে বিবাহ করেছিলন। তিনি ২৫ বছর বয়সে খাদিজাকে বিবাহ করেন যিনি ছিলেন এক বিধবা নারী। এছড়া তাঁর অন্যান্য স্ত্রীদের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন বিধবা বা বিবাহবিছিন্না। সুতরাং পুনর্বিবাহ বিষয়ে সাধারন মুসলমান সমাজে কোন বিধিনিষেধ নেই। উল্লেখিত সমীক্ষাতেও দেখা গেছে সমস্ত উত্তরদাতারাই পূর্ণবিবাহের পক্ষে মত দিয়েছেন।

সবশেষে আসছে তিন তালাক প্রথা। কোরাণ ও হাদিসে তিন তালাকের কথা বলা হয়েছে। তবে এর নির্দিষ্ট একটি পদ্ধতি রয়েছে। তিন তালাককে বলা হয়

"তালাক-ই-বিদ্দাহ" । একই সঙ্গে তিনবার তালাক উচ্চারন করে তালাক দেওয়া বিধিসম্মত নয়। তালাক বিভিন্নভাবে দেওয়া যেতে পারে; যেমন-

১। স্বামীর দ্বারা তালাক।

২। স্ত্রীর দ্বারা তালাক।

৩। দুজন একসাথে যা সমসম্মতির দ্বারা তালাক।

৪। আদালত দ্বারা তালাক।

প্রত্যেক ক্ষেত্রেই একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে তালাক দিতে হয়। তাৎক্ষণিক তিন তালাক প্রথার কথা কোথাও উল্লেখিত নেই। সমীক্ষাতে দেখা গিয়েছে যে ৯৬% উত্তরদাতার মতে তাৎক্ষনিক তিন তালাক সমর্থনযোগ্য নয়। তালাক ইসলাম ধর্মে বৈধ, কিন্তু এমনটা নয় যে তালাক দিতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। তালাককে ইসলাম ধর্মে একটি ঘৃণ্য কাজ মনে করা হয়। তবুও এর স্বীকৃতি ইসলাম ধর্মে আছে কারন বিবাহের পর যদি স্বামী- স্ত্রীর মধ্যে মনের মিল না হয়; অবিশ্বাস ও পারস্পারিক হিংসার ঘটনা ঘটে, সেক্ষেত্রে তালাকের কথা বলা হয়েছে। তিন তালাকের কথা কোরান বা হাদিসে বলা নেই। তবে পূর্বে হজরত ওমরের সময় অৎক্ষণিক তালাকের কয়েকটি নিদর্শন দেখা গিয়েছিল, যদিও সেগুলি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ঘটনা। বলা হয়, খলিফা হজরত মুহম্মদ সেই তালাকগুলিকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এই ব্যতক্রমী কয়েকটি ঘটনাকে উদাহরণ হিসবে তুলে ধরা হছে যেটি একেবারেই ঠিক নয়।

তালাকের সঠিক নিয়ম হল যদি স্বামী স্ত্রী ঠিক করেন যে তারা তালাক নেবেন, তবে তিন মাস তাদের অপেক্ষা করতে হবে। যেটিকে উক্ত গবেষকের কৃত সমীক্ষায় উত্তরদাতারা বলেছেন যে তিন চাঁদ অপেক্ষা করতে হয়। তিন চাঁদ অর্থাৎ তিন মাস। তার পরও যদি তারা মত পরিবর্তন না করেন তবে তালাক হবে। কিন্তু তালাকের পর স্বামীকে দেনমোহর পরিশোধ করতে হবে। দেনমোহর শোধ না করলে তালাক সম্ভব নয়। স্ত্রীধনও ফেরত দিতে হবে। এটি হল স্বামীর দ্বারা তালাক।

স্ত্রীর দ্বারাও তালাক দেওয়া সম্ভব। একে বলা হয় খুলা। এক্ষেত্রে স্ত্রী কাজির কাছে গিয়ে তালাকের করণ জানবে। কাজি সম্মত হলে তালাক হবে। স্বামীর অনুমতি না থকলেও তালাক হবে। তবে সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট শাহবানু মামলায় তিন তালাককে বাতিল বলে ঘোষণা করে। বর্তমানে ভারতে তিন তালাক আইনত নিষিদ্ধ।

পরিশেষে বলা যায় যে মুসলিম বিবাহ একটি প্রতিষ্ঠান। এটি সার্বজনীন বা universal। পৃথিবীর প্রতিটি সমাজে, দেশে, ধর্মের গুরুত্ব অপরীসীম। মুসলমান ধর্ম অন্যান্য ধর্মের তুলনায় অনেক পরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই মুসলমান বিবাহের বিভিন্ন প্রথা, নিয়ম-কানুনগুলিও আধুনিক। আবার দেশকালভেদে মুসলিম বিবাহের রীতিনীতিগুলিও বদলে যায়। যেমন ভারতবর্ষে একসাথে অনেকগুলি ধর্মের সহাবস্থানের ফলে একটি ধর্মের বিবাহের রীতি অপর ধর্মের বিবাহে প্রবেশ করেছে।

মুসলিম বিবাহে বিবাহবিচ্ছেদ বা তালাক, বিধবাবিবাহ, পূর্ণবিবাহ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রথা রয়েছে, যা আধুনিক মননের পরিচয় দেয়। মহিলাদের বা পাত্রীর মত বিবাহের সময় পুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। তাই বলা যায় মুসলিম বিবাহ তার বৈশিষ্ট্য, রীতিনীতি, প্রাসঙ্গিকতা – সব মিলিয়ে স্বকীয়। বর্তমান সমাজে এর কিছু পরিবর্তন সাধিত হলেও এটির প্রাসঙ্গিকতা আজও বিদ্যমান।

গ্রন্থপঞ্জী-

- চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস। (২০০৮)। সামাজিক গবেষণাঃ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া, আরামবাগ বুক হাউস।
- দাসগুপ্ত, শুভেন্দু। (২০০৫) । আলাপচারি মুসলমান- হিন্দুঃ আড্ডা- তর্ক- প্রশ্ন। এবং আলাপ।
- সরকার, চন্ডীপ্রসাদ। (২০০৭) । বাঙালী মুসলমান ১৮৬৩-১৯৪৭। মিত্রম্।
- হাসান, মইনুল। (১৪১৭) । আধুনিকতা ও বাংলার মুসলমান সমাজ। দীপ প্রকাশন। কলকাতা।
- হাসান, মইনুল। (২০১৮) । ইসলামী আইন- বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার। উদার আকাশ।
- হুসেইন, নাজিবুল। (২০১৩) । মুসলিম ব্যক্তিগত আইন। তালীম প্রকাশনী।
- Ahuja, Ram. (2014). Indian Social System. Rawat Publication.
- Bryman, Alan. (2012). Social Research Methods. OUP.
- Danyal, Dr. Kahkashan. Y. (April, 2015). Muslim Law of Marriage, Dower, Divorce and Maintenance. Regal Publication.
- Diamant Jeff. (April, 2019). The Countries with 10 Largest Muslim Populations. Pew Research Centre.
- Malik, Vijay. (1998). Muslim Law of Marriage, Divorce and Maintenance. Eastern Book Company.
- Maqsood, Ruquaiyyah Waris. (1995). The Muslim Marriage Guide. Quichian Press Ltd.
- Rahaman, Dr Mahabuba. (2012). Women in the Light of Qura’n and Hadith. Islamic Foundation.

উড়িষ্যার নৃত্য – মাহারী থেকে গোটিপুঅ নৃত্য

গরিমা ভট্টাচার্য্য
স্নাতকোত্তর, নৃত্য বিভাগ,
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : ওডিসি নৃত্যের যাত্রাপথের আদিতে ছিল জগন্নাথ দেবের উদ্দেশ্যে দেবদাসীদের দ্বারা নৃত্য পরিবেশন। যা মাহারী নৃত্য নামে পরিচিত ছিল এবং নৃত্যশিল্পীদেরও বলা হত মাহারী। শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তর্দ্ধান রহস্যকে কেন্দ্র রূপক সাহা রচিত জনপ্রিয় উপন্যাস *'ক্ষমা কর, হে প্রভু'* চৈতন্যদেবের পাশাপাশি মাহারীদের নৃত্যের কথা আমাদের আবারও স্মরণ করিয়ে দেয়। এই মাহারী নৃত্য ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে জন্ম দেয় গোটিপুঅ নৃত্যের। এবং কেলুচরণ মাহাপাত্রের কাছে এসে তা নবরূপ লাভ করে সৃষ্টি হয় ওডিসি নৃত্যের।
মূলশব্দ : মাহারী, গোটিপুঅ, জগন্নাথদেব, নর্তকী, নৃত্যশৈলী।

মহাম্ভোধেস্তীরে কতক রুচিরে নীলশিখরে
বসন্ প্রাসাদান্ত সহজ বলভদ্রেণ বলিনা।
সুভদ্রা -মধ্যস্থঃ সকলসুর সেবা সরদো
জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী তবুত মে।
কৃপা পরিবারঃ সজল জলদ শ্রোনিরুচিরো,
রমা বানীরামঃ স্ফুরদমল পঙ্কেরূহ – মুখঃ
সুরেন্দ্ররারধ্যেঃ শ্রুতিগণ শিখা গীতাচরিতে
জগন্নাথস্বামী নয়ন পথগামী ভবতুমে।
(শ্রী শ্রী জগন্নাথ অষ্টকম)

যিনি মহাসমুদ্রের তীরে নীলাচল শিখরে প্রাসাদের ভিতরে শক্তিমান শ্রী বলদেব ও সুভদ্রার মাঝখানে অবস্থান করছেন এবং সমস্ত দেবতাকে যিনি নিজ সেবার সুযোগ দিয়েছেন সেই প্রভু জগন্নাথ আমার নয়ণ পথের পথিক নয়ণ, হন। যিনি দয়ার সাগর সজল মেঘের মত যাঁর অঙ্গের কান্তি যিনি লক্ষ্মী সরস্বতীর সাথে বিহার করেছেন, যার মুখমন্ডল অমল পথের মত শোভা পায়, যিনি সমস্ত দেবতার আরাধ্য ধন এবং বেদ, পুরান, তন্ত্রাদি সকল যাঁর চরিত্র গান করেছেন, সেই প্রভু জগন্নাথ আমার নয়ণ পথের পথিক হোন।

জগন্নাথ দেবের আরাধনার মধ্য দিয়ে উড়িষ্যার জননীবনে সাংস্কৃতিক অভাস তথা নৃত্য, গীত বাদ্য যাকে কেন্দ্র করে চর্চিত শ্রী শ্রী জগন্নাথদেবের চরণে পূজা

অর্পনের উদ্দেশ্যেই ওড়িষি নৃত্যের প্রচলন। তবে ভারতীয় নৃত্যের বিবর্তনের ইতিহাসে ওড়িশি নৃত্যের প্রাচীনত্ব আজ সর্বজনস্বীকৃত। ধ্রুপদী নৃতশৈলী হিসাবে ওড়িশি নৃত্য মূলত: ভরতের *নাট্যশাস্ত্র,* নান্দীকেশ্বরের *অভিনয়দর্পণ,* মহেশ্বর মহাপাত্রের *অভিনয় চন্দ্রিকার,* অনুসারী।

বহু প্রাচীনকাল থেকেই উড়িষ্যায় নৃত্যগীতের প্রচলন ছিল তার প্রাচীনতম প্রমান পাওয়া যায় ভুবনেশ্বরের নিকট খ্রিঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে জৈনরাজ্য খারবেল নির্মিত উদয়গিরি খন্ডগিরির গিরিগুহায় খোদিত ভাস্কর্য্য। হাতিগুম্ফা গুহাচিত্রে খোদিত শিলালিপি, গুহাচিত্রে খোদিত অসংখ্য নৃত্যগীতের চিত্র, রানীগুম্ফাতে চিত্রিত নৃত্যগীতের এক সমবেত দৃশ্য। যেখানে এক সুসজ্জিতা নর্তকীকে এবং তাকে ঘিরে রয়েছে তিনজন নারী বাদ্যযন্ত্রী প্রথমজন ড্রাম জাতীয় মুরজ, দ্বিতীয়জন হাপ ও তৃতীয়জনের হাতে বাঁশি এমন মূর্তি। রানীগুম্ফার অপর এক দৃশ্যে দুইজন নর্তকীর একজন শিল্পীকে - চৌক ভঙ্গিমায় নৃত্যরত দেখা যায়।

সমগ্র উড়িষ্যায় গঙ্গাবংশীয় রাজবংশ প্রতিষ্ঠা লাভ করার পর থেকে তারা বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারের উদ্দেশ্যে বিষ্ণু মন্দির স্থাপন করতে থাকেন। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গাদেব (১০৭৬ খ্রিঃ- ১১৪৭ খ্রিঃ) তিনি যে কেবল শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন তাই নয়, তিনি ছিলেন সঙ্গীত অনুরাগী। পরবর্তীকালে তিনি মধুকেশ্বর মন্দির ও জগন্নাথ দেবের মন্দির নির্মাণ করেন। এই পুরীর মন্দির নির্মাণের পর থেকেই জগন্নাথদেব উড়িষ্যার ধর্মীয় জগতের নিয়ন্তা হয়ে ওঠেন।

এই পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরের সাথে উড়িষ্যার নৃত্যের ইতিহাস অতপ্রোভাবে জড়িত। রাজা চোড়গঙ্গাদেব নিত্য দেব সেবার উদ্দেশ্যে নর্তকীদের নিযুক্ত করেন যাদের বলা হত মাহারী। মন্দিরের অভ্যন্তরে ভগবানের ধুপ বা ভোগের সময় একবার এবং সন্ধ্যায় ভোগ অর্পনের সময় থেকে শয্যাকাল পর্যন্ত এই মাহারীগণ নৃত্যে অংশ নিতেন। সেসময় গীতগোবিন্দের থেকে সংগৃহীত শ্লোক কেন্দ্র করে তারা নৃত্য প্রদর্শন করত।

একটি রাজকীয় ফরমান থেকে মাহারীদের রীতি পদ্ধতি সংক্রান্ত নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এর থেকে জানা যায় –

- মাহারীদের পুরুষদের সাথে মেলামেশা নিষিদ্ধ ছিল।
- কেবলমাত্র জগন্নাথদেবের জন্যই নৃত্যগীতে অংশ নিতে পারত।
- দীক্ষান্তে তিলক অঙ্কিত করতে হত।
- নিজগৃহে রন্ধন নিষিদ্ধ ছিল। অনুষ্ঠানের সময় নতুন শুচিবস্ত্র পরিধান করতে হত।
- নৃত্যকালে দর্শকের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ নিষিদ্ধ ছিল।
- নৃত্য সম্পূর্ণ শাস্ত্রীয় রীতি মেনে হত। পহপট, সারমিন, মালশ্রী, বচনিকা, পরমেশ্বর, শ্রী মঙ্গল ঝুঁকি – এই আটতালকে আশ্রয় করে নৃত্য প্রদর্শিত হত।

মাহারী নৃত্য

উপরিউক্ত কঠিন বিধিনিষেধ থেকে জানা যায় মাহারীগণ সম্মানীয় জীবন যাপন করতেন। কথিত আছে রাজা পুরুষোত্তম দেবের পত্নী রানী পদ্মাবতী জগন্নাথদেবের মন্দিরে মাহারী হয়েছিলেন।

প্রথানুযায়ী অতি অল্পবয়সে জগন্নাথদেবের সঙ্গে বিবাহ অনুষ্ঠান পালিত হওয়ার পর মাহারীর নৃত্য- গীত শিক্ষা শুরু হত – নৃত্যগুরুর নিকট। উপযুক্ত শিক্ষালাভের পর মাহারী তার জন্য নির্দিষ্ট বৃত্তি অনুসারে মন্দিরে নৃত্য শুরু করতে পারতেন। অনুষ্ঠানে রাজগুরু স্বর্ণদন্ড হাতে উপস্থিত থাকতেন। প্রথমে দেবতা ও পরে রাজগুরুকে প্রণাম করে নৃত্য শুরু হত।

এরপর পঞ্চদশ শতাব্দীতে গঙ্গাবংশীয় রাজত্বের অবসানে সূর্যবংশ গজপতি শাসকের সূচনা থেকে প্রায় একশতক ধরে মাহারী নৃত্যে চরম উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

তবে এই মাহারী সম্প্রদায়ের নৃত্যে ব্রাহ্মন ও রাজন্যবর্গ ছাড়া অন্য কেউ দেখবার অনুমতি পেতেন না। তাই এই নৃত্যের স্বাদ শিল্পলাভের পিপাসা জনতার মধ্যে পৌঁছাতে পারেনি। এরপর উড়িষ্যা ও তৎসহ জগন্নাথদেবের মন্দিরে বার বার মুসলমান আক্রমণ ঘটতে থাকে মন্দিরের নিত্য কর্ম ব্যহত হতে থাকে। সেসময় হিন্দু সেনাপতির সাহায্যে ভোই রাজা রামচন্দ্রদেব উড়িষ্যার সিংহাসনে বসলে রাজ্যের অবস্থা কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে আসে। উড়িষ্যার সাংস্কৃতিক জীবনের পুনর্জাগরণের জন্য তিনি চেষ্টা শুরু করে দেন। এবং সেসময় মন্দিরের রক্ষাকল্পে শরীর চর্চার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে থাকেন। এই উদ্দেশ্যে একাধিক ব্যায়ামাগার স্থাপন করা হয়। ভোই রাজা রামচন্দ্রদেব মন্দিরের সুরক্ষাকল্পে এক শক্তিশালী সমাজ গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেন।

অনেকের মতে, চৈতন্য মহাপ্রভু আসার পর মহিলাদের মাহারী নৃত্য দেখে বলেন- মহিলাদের ঋতুস্রাব চলাকালীন সময়ে তারা মন্দিরে প্রবেশ করতে পারতো না, তাই জগন্নাথের সম্মুখে সেসময় নৃত্য প্রদর্শণ বন্ধ থাকত। তাই এক পুরুষ যদি মহিলা রূপ ধারণ করে যথাযথ গীত ও বাদ্যে নারীদের মতনই যদি নৃত্য পরিবেশনে সক্ষম হয়, নারীদের পোশাক পরিধানের মাধ্যমে, এই থেকেই একজন পুরুষের জগন্নাথের সামনে অনুপ্রবেশ ও নৃত্য পরিবেশন থেকে এই নৃত্যের নামকরণ হয় গোটিপুঅ নৃত্য।

গোটি অর্থে একক এবং পুঅ অর্থে বালক। যে নৃত্য সম্পূর্ন মেয়েদের মতন সাজপোশাক করে করা হত। ভোই রাজা রামচন্দ্রদেবের চেষ্টায় মন্দিরের সুরক্ষা প্রকল্পে এক শক্তিশালী সমাজ গড়ে তোলার যে পরিকল্পনা নিয়েছিলেন যার জন্য পল্লীতে পল্লীতে একাধিক ব্যয়ামাগার বা আখড়া গড়ে তোলা হয়, শরীরচর্চার সাথে সাথে সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের প্রসারের জন্য গোটিপুঅদের শিক্ষন কেন্দ্র হিসাবে এই আখড়াগুলি গড়ে ওঠে। এগুলি গোটিপুঅগনরা বা আখরপিলা নামে পরিচিত।

গোটিপুঅ নৃত্য

এই গোটিপুঅ নৃত্যশিল্পীদের অতি অল্প বয়সে গুরুর নিকট নৃত্যের ব্যকরণ ভিত্তিক অনুশীলন আরম্ভ করতে হত। জগন্নাথদেবকে কেন্দ্র করে রাধা কৃষ্ণের নানান কাহিনি ও জয়দেবের গীতগোবিন্দের বিষয়কে আত্তস্থ করতে হত নৃত্যের সাথে। কেবল নৃত্য নয়, সাথে মাদল, গান বিভিন্ন পুরানের রাধা কৃষ্ণের প্রেম কাহিনী সম্পর্কে অবগত হত।

তবে মাহারী নৃত্যের সাথে এই নৃত্যের বহু পার্থক্য ছিল। তবে মাহারী নৃত্য যেহেতু জনসমক্ষে আনা সম্ভবপর ছিল না, তাই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই গতিপুও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। যেখানে ব্যায়াম কে কেন্দ্র করে, স্বল্প নৃত্য আঙ্গিক ব্যবহার- এর মাধ্যমে এক মল্লক্রীড়া ভিত্তিক নৃত্য অনুশীলন করা আরম্ভ হয়। ফলে জনসাধারণের সমক্ষে খুব সহজেই নৃত্য, গীত, বাদ্যের সংমিশ্রণে এক সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভবপর হল।

গুরুই এই নৃত্যশিল্পীদের পিতামাতার স্থান নিত। দৈনন্দিন জীবন কাটত এই গুরুগৃহে থেকে সেখানে নিত্যদিন কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে নানান গৃহকর্ম ও গীতবাদ্য নৃত্য রপ্ত করতে হত। এছাড়া শিশু অবস্থায় নানান এক্রোবেটিক movement yoga এর দ্বারা নিজেদের শরীরকে অভ্যস্থ করতে হত। গুরুগৃহে থেকে এই অভ্যস্থকরণের

পর তারা স্কুলে যেত বা গুরুগৃহেই আসত শিক্ষকরা শিক্ষাদানের জন্য। গিনি, হারমোনিয়াম, মাদল ব্যবহার শেখানো হত, বর্তমান যুগে ওড়িশি নৃত্যের উৎপত্তি এই গোটিপুজ্জ নৃত্য থেকেই।

পূর্বে মাহারী নৃত্যে সাজসজ্জার বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে সেই সাজসজ্জার কথা মাথায় রেখেই পুরুষদের এই গোতিপুঅ নৃত্যের পোশাক নির্ধারন করা হয়।

পূর্বে মহিলাদের নৃত্য প্রদর্শণ জনসমক্ষে নিয়ে আসা এক দূরই বিষয় ছিল তাই গোতিপুঅ নৃত্যশিল্পীরা সেই ধারাকেই বহন করে মেয়েদের পোষাক ও সাজসজ্জায় ভূষিত হয়ে এই মল্লক্রীড়া ভিত্তিক এক প্রকার যুদ্ধ নৃত্য পরিবেশন করতে আরম্ভ করে। পুরীর মন্দিরের নিকটস্থ সর্বত্র ষোড়শ শতক থেকে এই নৃত্যের সূচনা হতে থাকে।

গোটিপুঅ নৃত্য পরবর্তীকালে নানান উৎসবকে কেন্দ্র করে পরিবেশন হতে আরম্ভ হয়। পায়ে ঘুঙুর পরে, পরনে সিল্কের উজ্জ্বল শাড়ি ও মুক্ত-এর গহনা, এছাড়া মুখ কে উজ্জ্বল করতে কাজল, লিপস্টিক, চন্দনের ব্যবহার লক্ষনীয়।

জানা যায়, মহেশ্বর মহাপাত্র রচিত 'অভিনয় চন্দ্রিকা'য় বন্ধ নৃত্যের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। প্রধানত এই গোটিপুঅ গণ এই নৃত্যে পারদর্শী হতেন। মহিলা শিল্পীগণের মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন অল্প বয়সে বন্ধ নৃত্য প্রদর্শনে সক্ষম হতেন। ওড়িয়া ভাষায় বন্ধ শব্দের অর্থ- শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রতঙ্গের সাহায্যে রচিত কঠিন ভঙ্গিমা এর জন্য প্রয়োজন নিয়মিত শরীরচর্চা। তাই প্রধানত দেহের নমনীয়তার ওপর নির্ভরশীল বলে বয়সের সাথে সাথে বন্ধ নৃত্য প্রদর্শন কঠিন হয়ে পড়ে।

বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধান ও উপযুক্ত ব্যবস্থা ছাড়া বন্ধ নৃত্যের ভঙ্গিমা অনুশীলন অত্যন্ত বিপদজনক ছিল.সাত থেকে আট বছর বয়সের মধ্যেই এই বন্ধ নৃত্যের প্রশিক্ষণ হতে হত।

নৃত্যশিক্ষার আগে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নমনীয়তা আনার জন্য নানান কসরতের প্রয়োজন ছিল। এরপর বহু সাধনার পর কয়েকজন গোটিপুজ্জ শিল্পী এই বন্ধ নৃত্যে পারঙ্গম হওয়া সম্ভব ছিল। অভিনয় চন্দ্রিকায় দশ প্রকার বন্ধ নৃত্যের উল্লেখ আছে। গগন, দ্বিমুখ, তোরনা, সয়না, ক্ষুদ্রা, ত্রিশূল, ব্রুতঙ্গ, ডমরু, প্রদীপ ও মিথুনাশ্রয়, বর্তমানে এত পরিশ্রমসাধ্য নৃত্যের চর্চা অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে আসছে।

এই নৃত্যের অন্যতম বিষয় হয় কবি জয়দেব রচিত 'গীত গোবিন্দের কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত বিভিন্ন শ্লোক থাকে উৎসারিত গান। রাধা মাধবের পরমভক্ত কবি জয়দেব তাঁর হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি দিয়ে রচনা করেছিলেন গীতিগুলি যা ছিল উড়িষ্যার জনজাতির কাছে প্রধান ও প্রিয় চর্চার বিষয়। যা সম্পূর্ণ রাধা ও কৃষ্ণের প্রেম কাহিনী নির্ভর। এই গীতগোবিন্দই মূলত উড়িষ্যার শিল্পচর্চা তথা মাহারী ও গোটিপুঅ নৃত্যের মূল।

পরিশেষে বলা যায় এই মাহারী নৃত্য ও গোটিপুঅ নৃত্যই পরবর্তী ওড়িশি নৃত্যের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। জানা যায়, গোটিপুঅ শিল্পীরাই পরবর্তীতে ওড়িশি নৃত্য

শিল্পী হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ব্যায়াম ভিত্তিক সেই নৃত্যকে মার্জিত রুচিশীল পোষাক ও অঙ্গভঙ্গিমার ধারা এক নতুন রূপ দিয়েছেন। গোটিপুঅ শিল্পী হিসাবে যার নাম সবচেয়ে বেশি আলোচ্য তিনি হলেন গুরু কেলুচরণ মহাপাত্র। যার ঐশ্বরিক শিল্প বোধের ভিত্তিতে সৃষ্টি হয়েছে আজকের পরিমার্জিত নৃত্যধারা, যার নাম ওড়িশি" বর্তমানে সমগ্র ভারতে এই ওড়িশি নৃত্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। পরবর্তীতে তাঁর অসংখ্য নৃত্যরচনা এবং অগণিত শিষ্য শিষ্যার মধ্যে অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর তিনি রেখে গেছেন। বর্তমান জগতের বহু ওড়িশি নৃত্যগুরু ও তথা প্রথিতযশা শিল্পীগণ তাঁর শিষ্য, এদের মধ্যে রয়েছেন গুরু সংযুক্তা পানিগ্রাহী, গুরু কুমকুম মহান্তি, গুরু সোনাল মান সিং, গুরু মাধবী মুদগল, গুরু নন্দীতা পট্টনায়ক, গুরু শ্রীমতি সুজাতা মহাপাত্র (পুত্রবধূ), গুরু রতিকান্ত মহাপাত্র (পুত্র) প্রমুখ শিল্পীগণ। বর্তমান প্রজন্মের এই শেষ দুই গুরুর হাত ধরে তাদের শিখনের মধ্যদিয়ে ওড়িশি নৃত্য সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত হবে। এবিষয়ে সন্দেহ নেই।

তথ্যসূত্র :

১. মালা মৈত্র/ ভরতনাট্যম প্রবেশিকা/পি জি অফসেটস/প্রকাশ কাল - ১৯৮৯

২. গায়েত্রী চট্টোপাধ্যায়/ভারতের নৃত্যকলা/করুনা প্রকাশনী kolkata-৯ /বামাচরণ মুখোপাধ্যায়/প্রকাশ কাল- চতুর্থ সংস্করণ- জুন ২০১৬

৩. নূপুর মুখার্জী/তত্ত্ব কথায় ওড়িশি নৃত্য/প্রকাশক দেবাশীষ মুখোপাধ্যায়/প্রকাশ কাল - জানুয়ারি ২০০১

৪. https://youtu.be/NZOU72yXgaY

৫. https://youtu.be/PUS2QRxoYOA

৬. https://youtu.be/Aoy-mB7Ipnk

৭. https://youtu.be/PZDAeYhkdgk

সুবোধ ঘোষের ছোটগল্প : মধ্যবিত্ত জীবনের রূপরেখা

শ্রেয়সী দাস
স্বাধীন গবেষক ও প্রাবন্ধিক

সারসংক্ষেপ : সুবোধ ঘোষের জীবনের ওঠাপড়া, বাস্তবের জটিল আদর্শ, মূল্যবোধ— তাঁর লেখায় উঠে এসেছে বারবার। 'ফসিল' বা 'গোত্রান্তর' গল্পে মধ্যবিত্ত জীবনের আদর্শ কিভাবে ভূলুণ্ঠিত হয়েছে দেখিয়েছেন। ধনী দরিদ্রের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা একটা শ্রেণি আদর্শের পথে চলতে চলতে হঠাৎ দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মাঝে পড়ে নিজ চরিত্র বদল করে ফেলেছে অজান্তেই। আবার এই মধ্যবিত্ত মানুষগুলোই সমাজের তথাকথিত চিন্তা-ভাবনার মুখে সোচ্চারে প্রতিবাদ করেছে, ভালোবাসার হাত ধরে রেখেছে। প্রাপ্য সম্মান আদায় করে নিয়েছে 'তিন অধ্যায়' এ। আর্থিক সুখের চেয়ে মনের সুখ প্রাধান্য পেয়েছে 'স্বর্গ হতে বিদায়' গল্পে। মানুষের স্মৃতি মানুষের সত্তার সম্পত্তি যা মানুষকে সঠিক পথে চালনা করতে পারে এ কথাও তিনি জানিয়েছেন 'সম্পত্তি' গল্পের মধ্যে দিয়ে। মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনের নানা দিক বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে সুবোধ ঘোষের বিভিন্ন গল্পে।
সূচক শব্দ : মধ্যবিত্ত জীবন, গোত্রান্তর, আদর্শ, ভাবপ্রবণতা, মূল্যবোধ, মর্যাদাবোধ।

মূল আলোচনা :

বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে সুবোধ ঘোষ এক উল্লেখযোগ্য নাম। এলেন, লিখলেন, জয় করলেন— কোনো লেখকের কৃতিত্ব সম্পর্কে এই জাতীয় শব্দবন্ধের ব্যবহার বহুল ব্যবহারে জীর্ণ ঠিকই কিন্তু বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় সুবোধ ঘোষের আলোড়ন জাগানো আবির্ভাবের বর্ণনায় এই প্রবাদপ্রতিম বাক্যটিই হয়ে ওঠে যথার্থ।

সুবোধ ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন বিহারের হাজারিবাগে (অধুনা ঝাড়খণ্ডে) ১৯০৯ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর। তিনি বরাবরই কৃতী ছাত্র ছিলেন। বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর ছিল অপরিসীম কৌতূহল ও আগ্রহ। তাঁর মতো স্বনামধন্য এক গল্পকারের ব্যক্তিগত জীবন যে কত দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে দিয়ে কেটেছে তাও এক শিক্ষণীয় বিষয়। মাত্র পনেরো বছর বয়সে পড়াশোনা ছেড়ে তাকে জীবিকার জন্য পথে নামতে হয়। সর্বপ্রথম হাজারিবাগের কুলি বস্তিতে কলেরার টিকা দেবার কাজে যোগ দেন; এরপর বাসের কনডাক্টরি, গৃহশিক্ষকতা, ট্রাক ড্রাইভারের কাজ, সার্কাস দলের জোকারের কাজ থেকে বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটির ঝাড়ুদারের কাজ করতেও পিছপা হননি। আফ্রিকায় যান মহামারি প্রতিরোধের কাজ করতে। স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে জেলেও যান। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ছিলেন অভ্র খনির ওভারসিয়র। বিশ শতকের তিরিশের দশকে (১৯৩৫-৩৬) তিনি কলকাতায় আসেন। গৌরাঙ্গ প্রেসে লেখনী সংশোধনের কাজ পান। ১৯৪০-এ আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় বিভাগের

সম্পাদকীয় লেখক হিসাবে নির্বাচিত হন। এই আনন্দবাজার পত্রিকা থেকেই সুবোধ ঘোষের সাহিত্য জীবনের সূত্রপাত। এ বিষয়ে সুবোধ ঘোষের পুত্র উত্তম ঘোষ তাঁর পিতৃস্মৃতিকথায় সুন্দর লিখেছেন—

> বোধহয় চাকরি জীবনে কলম ব্যবহারের এই প্রথম সুযোগ। বইয়ের জগতের দ্বারোদঘাটন ছাপাখানার সঙ্গে বন্ধুত্ব। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে এই প্রাথমিক যোগাযোগ।[১]

সাহিত্যমনস্ক কতিপয় যুবকের প্রয়াসে এক পাক্ষিক সাহিত্য আলোচনাচক্র গড়ে উঠেছিল সেই সময়ে— যা 'অনামীচক্র' নামে পরিচিত। এই আলোচনাচক্রের সদস্যবৃন্দ মূলত আনন্দবাজার পত্রিকায় কর্মরত সাংবাদিক। অরুণ মিত্র, বিনয় ঘোষ, বিজন ভট্টাচার্য, মন্মথ সান্যাল প্রমুখ বন্ধুবর্গের অনুরোধেই দিনের পর দিন শ্রোতা হয়ে থাকা সুবোধ ঘোষ লিখলেন এবং পড়লেন। এ বিষয়ে লেখকের কথায়—

> পড়া শুরু করলাম। আধঘণ্টার কম। পাঠ শেষ। কয়েক মিনিট স্তব্ধতা। আমি রুদ্ধবাক, বিচারের রায়ে কি শাস্তি বিধান হবে জানিনা। কয়েক মুহূর্ত পরেই প্রশংসার জলোচ্ছ্বাস। আজও মনে পড়ে সেই গুঞ্জনধ্বনি। সেই গল্পের নাম অযান্ত্রিক।[২]

তাঁর সেই গল্প পেয়েছে অমরত্ব। বহুদিন ধরেই তার মধ্যে সাহিত্যিক সুপ্ত ছিল সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া গেল। বার্ষিক আনন্দবাজার পত্রিকায় (১৯৪০) 'অযান্ত্রিক' আর 'অগ্রনী' নামে মাসিক পত্রিকায় 'ফসিল'— এই দুটি গল্প প্রকাশিত হবার পরই সুবোধ ঘোষ রাতারাতি বাংলা সাহিত্যের জগতে প্রতিষ্ঠা পান। সমালোচকের বন্দনা, অনুজ লেখকের প্রেরণা হয়ে ওঠেন তিনি।

সুবোধ ঘোষ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আদর্শ, ভাবপ্রবণতা, ভণ্ডামি ও মেরুদণ্ডহীন মনোভাবের সার্থক রূপকার। জীবন ও জীবিকার বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার ঝুলিই তাঁর সাহিত্যকর্মকে স্বতন্ত্র করে তুলেছিল। তার ছোটোগল্পে যে তির্যক জিজ্ঞাসা, শানিত জীবনবোধের পরিচয় পাওয়া যায় তা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনভাষ্যের অন্যতম রূপ। 'ফসিল' গল্পের মুখার্জী কিংবা 'গোত্রান্তর' গল্পের সঞ্জয়ের মধ্যে চাটুকার বৃত্তি ও দ্বন্দ্বের দ্বৈতরূপ নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'পরশুরামের কুঠার', 'তিন অধ্যায়', 'সম্পত্তি', 'স্বর্গ হতে বিদায়', 'উচলে চড়িনু', 'স্নানযাত্রা' প্রভৃতি গল্পের মধ্যবিত্ত মানুষের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংশয়াতুর মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। লেখক জীবনের পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা এবং কল্পনার মিশেল তাঁর গল্পের চরিত্র ও ঘটনাপ্রবাহকে জীবন্ত করে তুলেছে। দারিদ্র্য, প্রতিকূলতা, ভীরুতা, নীতিভ্রষ্টতা, যৌনতা, মনোবীক্ষণ, হতাশা- মধ্যবিত্তের জীবন জটিল মূল্যবোধ ও মানসিকতা ফুটে উঠেছে গল্পের বিভিন্ন স্তরে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে নিয়ে লেখা সুবোধবাবুর অন্যতম গল্প 'গোত্রান্তর'। তাঁর লেখনীর শিল্পদক্ষতা বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে এই গল্পে— সামাজিক সমস্যা সংকট

আর মানব-মনের গূঢ় রহস্যকে অনেকাংশে তিনি তুলে ধরেছেন। এই গল্পে মধ্যবিত্ত শ্রেণির গোত্রান্তরিত হবার তীব্র প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। গল্পের মধ্যে তিনটি শ্রেণিচরিত্র বা সামাজিক বিভাজন দেখা যায়—১. শোষক শ্রেণি রূপে মিল মালিক বা মহাজন, ২. শোষিতশ্রেণি রূপে কৃষক বা শ্রমিকশ্রেণি আর ৩. উক্ত দুই শ্রেণির মধ্যে আছে মধ্যবিত্ত শ্রেণি। মধ্যবিত্ত মানুষ কীভাবে নিজের গোত্র দ্রুত বদলে ফেলে একাধারে ধনিক শ্রেণির চাটুকার ও অন্যদিকে নিম্নবিত্ত শ্রেণির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে স্বার্থলোভী হয়ে উঠতে পারে তারই পরিচয় পাই আমরা এই গল্পে।

গল্পের প্রধান চরিত্র মকতপুরের এম.এ পাশ সঞ্জয় মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি, নেমিয়া, রুক্মিণী নিম্নবিত্ত ও রতনলাল রায়বাহাদুর উচ্চবিত্ত শ্রেণির প্রতিভূ। গল্পের প্রথমাংশে সঞ্জয়ের মকতপুরের বাড়ির অবস্থার কথা রয়েছে। একপাল মানুষ আর জরাজীর্ণ মধ্যবিত্তের পলেস্তারা খসা বাড়ি আর এই বাড়ির অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষার মূল সঞ্জয়। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধকালীন কি তার পরবর্তী সময়ের অবক্ষয়িত সমাজের জাঁতাকলে পড়ে সঞ্জয় উচ্চশিক্ষিত হয়েও বেকার। এম.এ ডিগ্রী, সৎচরিত্র, স্বাস্থ্য আর খেলাধূলায় পাওয়া দশটা সার্টিফিকেট, অর্থনীতির প্রবন্ধ বা ভূমিকম্পের সময়ে সেবাব্রতের প্রশংসাপত্র— "সঞ্জয়ের বহু ও বিচিত্র প্রতিভার পরিচয় একটা মোটা বাণ্ডিল বাঁধা হয়ে বাক্সে পড়ে আছে।" স্বভাবতই চার বছর ধরে বেকার সঞ্জয়কে শুনতে হয় মা-বাবা-দাদার গঞ্জনাবাক্য, প্রেমিকা সুমিত্রাও তাকে ছেড়ে হয় অন্য কারো অর্ধাঙ্গিনী। বাস্তব জীবনের গৃহকূটের প্রধান রহস্য উন্মোচিত হয় সঞ্জয়ের সামনে---

"সঞ্জয় বুঝেছে তার সবচেয়ে বড় প্রয়োজন গোত্রান্তর।"[৩]

এমনই সময়ে সঞ্জয় চুরাশি পরগনার রতনলাল সুগার মিলে চাকরি পেয়ে মুক্তির প্রসাদ পায়। গোত্রান্তরের প্রথম ধাপে পা ফেলে। ক্যাশমুন্সী হিসাবে যোগ দেয় সে এই মিলে। পুরোনো সত্তাকে নতুনভাবে গুছিয়ে ফেলতে চায় সে।

> প্রসপেক্ট নয়, আরও বড় ও কঠোর এক সাধনার ভার নিয়ে সঞ্জয় এসেছেএখানে। নিঃশেষে লোপ করতে হবে তার পুরাতন সত্তাকে, ফেরারী আসামীর মতো।[৪]

এরপরই নেমিয়া আর তার বোন রুক্মিনীর সাথে সঞ্জয়ের পরিচয় হয়। নেমিয়ারা দরিদ্র শ্রমিক শ্রেণির প্রতিনিধি। দারিদ্র্য সহ্য করতে না পেরে তার স্ত্রী সন্তানসহ আত্মহত্যা করেছে। রুক্মিনী শয্যাসঙ্গিনী হয়েছে সঞ্জয়ের, জীবনের নতুন মানে খুঁজে পেয়েছে সে। এই মেয়ের কাছে সঞ্জয়ের গোত্রান্তর ঘটেছে,

"বিদ্রোহের প্রথম পরিচ্ছেদ পূর্ণ হয়েছে।"[৫]

ওলন্দাজদের জাভা চিনি কলকাতায় এসে পড়লে বাজারে দেখা দিল মন্দা। রতনলাল সুগার মিলও তার বাইরে নয়। নিম্নবিত্ত চাষি ও শ্রমিক মার খেল। সঞ্জয়ের নেতৃত্বে চাষিরা বিদ্রোহের অঙ্গীকার করল। সঞ্জয়ের কথায় সকলে আশ্বস্ত হল, নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করল তাকে।

"লড়াই শুরু করে দাও। বটপাতা ছুঁয়ে কসম খাও।"[৬]

'কসম' নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষগুলো রক্ষা করলেও, পারল না সঞ্জয়। রুক্মিনী যখন সঞ্জয়ের সন্তানের জন্ম দিচ্ছে, নেমিয়া এসে চাবি নিয়ে যায় ক্যাশের। প্রতিবাদ ও পিতৃত্বের মানসিক টানাপোড়েন সঞ্জয়ের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মন মেনে নিতে পারে না, পরিস্থিতি তার কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে। নিশ্চিত ভবিষ্যতের খোঁজে সে সব ঘটনা বলে রায়বাহাদুর রতনলাল ও মুনিবজীকে। নিম্নবিত্তের সাথে শঠতা করে সে উচ্চবিত্তের নেকনজরে থেকে বেশি বেতনের গোরখপুর মিলের কাজ নিশ্চিত করল। যে প্রতিবাদের আগুনে তার গোত্রান্তর ঘটেছিল মধ্যবিত্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, নির্ঝঞ্ঝাট জীবনের আশায় সে আবার মধ্যবিত্ত স্বার্থলোভী অর্থলোলুপ হয়ে গেল।

'তিন অধ্যায়' গল্পটিকে গোত্রান্তর গল্পের পরবর্তী ভাগ বলা চলে। এই গল্পে সুবোধ ঘোষ মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিচিত্র মানসিকতাকে তুলে ধরেছেন ইঙ্গিতময় ভাষায়। গল্পের পটভূমিটি ছোটো মফস্বল শহরকে কেন্দ্র করে। শ্রেণিবিভক্ত মানুষের জীবিকা কীভাবে তার অবস্থান নির্ণয় করে এবং সেখানেই তাদের অস্তিত্বের জয় কীভাবে ঘোষিত হয় তারই গল্প 'তিন অধ্যায়'। শ্রেষ্ঠ গল্পের ভূমিকায় জগদীশ ভট্টাচার্য যথার্থই মন্তব্য করেছেন—

> "সত্যকার গোত্রান্তর গ্রহণের কাহিনির মধ্যে দিয়ে সমাজের ভাঙা-গড়নের ইতিহাস রচিত হয়েছে।"[৭]

নিম্নমধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্তের মধ্যেকার টানাপোড়েন এই গল্পের বিষয়, গল্পটিতে রয়েছে তিনটি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে অহিভূষণের কথা, যে উচ্চমধ্যবিত্ত সহপাঠীদের লাভের জন্য অপছন্দ হওয়া সত্ত্বেও প্রতিদিন সন্ধ্যায় ক্লাবে আড্ডার আসরে যোগ দেয়। সমস্ত অপমান ও ভ্রুকুটি তুচ্ছ করে অহি বসে থাকত। সে ছিল মিউনিসিপ্যালিটির 'অ্যাসিস্ট্যান্ট কনজারভেন্সী সুপারভাইজার' কিন্তু এই ডেসিগনেশন বদলে হয় 'সর্দার স্ক্যাভেঞ্জার'। পূর্ববর্তী ডেসিগনেশন রাখতে সে যথেষ্ট চেষ্টা করেছে, বকুনিও খেয়েছে সকলের কাছে—

> সর্দার স্ক্যাভেঞ্জারের কাজটা করবি, অথচ বললে তোর একেবারে মাথা কাটা যাচ্ছে। তুই কি ভাবছিস নিজেকে, তুই একটা ভয়ানক রকমের অফিসার?[৮]

ধমক খেয়ে প্রতিবাদ করে না অহি। তার বিয়ের সম্বন্ধের কথা শুনে তারই সহপাঠীরা টেলিগ্রাম করে অহির ডেজিগনেশন বলে বিয়ে ভেঙে দেয়। অহি বুঝতে পারে এই কাজ বারীন, সতু, শশী, বা ভবানীর। কিন্তু তারা এই হীন কাজকে অন্যায় বলে ভাবে না। অপমানিত অহি ক্লাবে যাওয়া বন্ধ করে। সে নিজের সীমায় থাকতে চায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে পুলিনবাবু ও তার মেয়ে বন্দনার কথা। পুলিনবাবু ব্রাহ্মণ হয়েও জুতোর দোকান খোলায় চামারে পরিণত হন। তার মেয়ে বন্দনা হাসপাতালে নার্সদের সাহায্য করার কাজ নেয় কিন্তু সমাজে রটল সে লেডি জমাদার বা জমাদারনী।

বন্দনাকে নিয়ে আপাত ভদ্রলোক বারীনদের আলোচনা আরও বেড়ে গেল। ভবানীর কাকা বন্দনার সাথে পাটনার এক প্রফেসরের বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে দিলেন, শুধুমাত্র অর্থনৈতিক অবস্থা ও সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টায় নেওয়া পেশা তাদের সমাজচ্যুত হতে বাধ্য করল—

> পুলিন বাড়ুয্যে খুবই গরীব সন্দেহ নাই। তার গরীবত্বের জন্য অবশ্য আমাদের সবারই সমবেদনা আছে। কিন্তু গরীবত্ব ঘোচাবার যে পথ তিনি বেছে নিলেন, সেই পথটাকে কেউ সম্মান করবে না।[৯]

এখানেও তথাকথিত উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণির মনে অন্যায় বোধ জাগেনি। উল্টে নিজেদের জয়লাভের আনন্দ প্রকাশ পেয়েছে---

> বার বার দুবার আমরা জিতে গেলাম। দুবারই দুটো অন্যায় হতে চলেছিল। তাই সামান্য আঘাতে ভেঙে গেল। প্রথম অহি, দ্বিতীয় বন্দনা।[১০]

তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে অহি ও বন্দনার বিয়ের প্রসঙ্গ। তাদের বিয়েতে অহি তার সব সহপাঠী বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করে। সহপাঠীরা আবারও চেষ্টা করে তাদের বিয়ে ভাঙার কিন্তু বিফল হয় সেই চেষ্টা। কারণ--- "তারা নিজের পৃথিবীতে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে।" অহি ও বন্দনা নিজেদের পরিবর্তিত নিম্নবর্গীয় অবস্থানকে স্বীকার করে নিয়ে উত্তরণের পথে অগ্রসর হয়। এতে তাদের জীবিকায় না হলেও মানসিকতার গোত্রান্তর ঘটে, মানবিক উত্তরণ হয়। অহি-বন্দনার বিয়েতে ষড়যন্ত্রকারীদের উপস্থিতির মধ্যে দিয়েই গল্পের পরিসমাপ্তি ঘটলে শিথিলতা অনেক কম হতো। কিন্তু গল্পকার গল্পের পরিণতিকে আরও বিস্তারিত করে মধ্যবিত্তের শূন্যগর্ভ মর্যাদাবোধের ওপর কটাক্ষ করলেন।

আত্মপ্রবঞ্চক মধ্যবিত্ত কোনো নীতি আদর্শ মানে না, মনুষ্যত্বকে অবমাননা করে। পরনিন্দা-পরচর্চা তাদের আড্ডার বিষয়। অহিভূষণের মধ্যেও সেই বৈশিষ্ট্য ছিল। পুলিনবাবুও তার পেশা নিয়ে কুণ্ঠিত, মধ্যবিত্তের মতো দ্বিধা-দ্বন্দ্বে তিনি ভুগেছেন। শেষ পর্যন্ত তারাই গড়ে তুলেছে জীবনের একটি নতুন অধ্যায়। বিয়ে দিতে যাবার বাসনা থেকেই অহির বন্ধুদের পরাজয় হয়। কথকের মনে হয়— "আজ আবার অনেক বছর পরে অহির ঘুসি খেয়ে যেন রিং থেকে বাইরে ছিটকে পড়েছি।" পুরো বিয়ের অনুষ্ঠানে সহপাঠীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ অহি-বন্দনার জয়যাত্রার মূল অংশ আর শেষে বারীনের মুখে বন্দনাকে 'মিসেস চ্যাটার্জি' সম্বোধন এই মর্যাদাপূর্ণ জয়াযাত্রার স্বাভাবিক পরিণতি। যাদের হারাতে চেয়েছিল তাদেরই মানবিক গোত্রান্তরের কাছে হেরে যায় উচ্চমধ্যবিত্ত তথাকথিত ভদ্র, শিক্ষিত মানুষ। এ প্রসঙ্গে জগদীশ ভট্টাচার্য যথার্থ মূল্যায়ন করেছেন—

> মধ্যবিত্তের উন্নাসিকতা ও মিথ্যা মর্যাদাবোধের বিরুদ্ধে লেখকের বিদ্রূপবাণী যেমন তীব্র, সমাজ স্তরে অবনীয়মান মানুষের প্রতি তাঁর সহানুভূতিও তেমনি প্রীতিস্নিগ্ধ। 'তিন অধ্যায়' গল্পটি সমাজ সচেতন সাহিত্যের নতুন অধ্যায় রচনা করেছে।[১১]

সুবোধ ঘোষের প্রায় সমস্ত গল্পেই বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর সময়ের শোষিত মানুষ, সাধারণ মানুষ—সকলের মধ্যে শ্রেণিগত দ্বন্দ্ব প্রাধান্য পেয়েছে। 'স্বর্গ হতে বিদায়' গল্পে নিম্নমধ্যবিত্ত কেরানীবাবু হিতেশের ভাগ্যক্রমে উচ্চমধ্যবিত্ত জামাই প্রশান্তকে পায়, কন্যার সুনিশ্চিত স্বচ্ছল জীবনের স্বপ্নে স্কুল মাস্টার বিনয়ের হিতেশবাবুর কন্যা অরুণাকে বিয়ের আশা হেরে যায়। ধানবাদের হীরাপুরে সংসার পাতা অরুণা অর্থবান স্বামী পেলেও পায় না তার মন। কৃত্রিম চেষ্টায় স্বামীর মন পেতে চায়—প্রশান্ত যাদের সাথে মেলামেশা করে তাদের মতো সাজ করে। এতেও প্রশান্তর মন পায় না অরুণা। এই অবহেলা আর একাকিত্ব অরুণাকে চরম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে। অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যকে পায়ে ঠেলে সে পুরোনো বন্ধু বিনয়ের হাত ধরে চলে যায়। পড়ে থাকে প্রশান্তের বিস্মিত একাকী মূর্তি। বিয়ের পরই প্রতিবেশী লতিকাদেবীর এই ধরনের আচরণে ছিছিকার দিয়েছিল অরুণা, কিন্তু সেই মানসিকতার পরিবর্তন হয় তার মধ্যে। সে নিজেও লতিকাদেবীর মতো নিজের স্বামীকে ছেড়ে বিবাহবন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করে, সে বুঝতে পারে বৈবাহিক সম্পর্কে অর্থের প্রয়োজন থাকলেও ভালোবাসার প্রয়োজন অধিক।

'সম্পত্তি' গল্পে মধ্যবিত্ত নরেশ দত্তর অর্থনৈতিক অবস্থা, বাজারে ধার আর শেষ পর্যন্ত নিজের বাড়ি নিলামে তুলে দিয়ে পালিয়ে যাবার পরিকল্পনার কথা জানা যায়। তার স্ত্রী পুড়ে মারা গেছে বহুবছর আগে। বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে তার কষ্ট হবে না বলে সে জানিয়েছিল প্রতিবেশী বিনোদবাবুর কাছে। কিন্তু যাওয়ার আগে মৃত শিশুপুত্রের একটা ছোট্ট কালিমাখা হাতের ছাপ দেখে সে বিমূঢ় হয়। স্নেহান্ধের মতো তাকিয়ে থাকে। সে বুঝতে পারে পলেস্তারা খসা উই ধরা বাড়ির আসল সম্পত্তি কী। "যেন আজ পঁচিশ বছর পরে নিজেকেই হঠাৎ চিনতে পেরে ভয় পেয়েছে নরেশ দত্ত, আর ধপ করে বসে পড়েছে।" চতুরতা, লোক-ঠকানো মনোবৃত্তি থেকে ফিরে এসেছে, শেষ পর্যন্ত মানবিক উত্তরণ ঘটেছে তার মধ্যে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে নিহিত আছে জীবনের প্রকৃত প্রাণস্পন্দন; সমাজের 'Shock absorber' নামে পরিচিত এই শ্রেণির জীবনের নানা অভিঘাত, অবক্ষরিত মূল্যবোধ, সুযোগ-সুবিধার ভিত্তিতে মানসিকতার বিচিত্র প্রতিফলন ও পালাবদলের কাহিনিই বার বার সুবোধ ঘোষের গল্পের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। গল্পের কাহিনির সাথে সাথে চরিত্রের পরত খুলে গেছে, প্রকাশিত হয়েছে মধ্যবিত্তের আসল চেহারা। পাঠকের চোখের সামনে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে মধ্যবিত্তের মুখ ও মুখোশ।

তথ্যসূত্র :

- সুমিতা চক্রবর্তী, 'ছোটগল্পের বিষয় আশয়', পুস্তকবিপণি, জুন ২০০৪, পৃ. ২৪১
- তদেব, পৃ ২৪১

- সুবোধ ঘোষ, 'গল্পসমগ্র' ২. আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., সপ্তম মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০১৪, পৃ. ১১৫
- তদেব, পৃ. ১১৭
- তদেব, পৃ. ১১৯
- তদেব, পৃ. ১২০
- আদিত্যকুমার লালা (সম্পাদনা), 'ছোটগল্পের চিহ্নিত মানচিত্র সুবোধ ঘোষ', একুশ শতক, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃ. ১৫১
- সুবোধ ঘোষ, 'গল্পসমগ্র' ২. আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., সপ্তম মুদ্রন, ডিসেম্বর ২০১৪, পৃ. ১৪
- তদেব, পৃ. ১৫
- তদেব, পৃ. ১৮
- আদিত্যকুমার লালা (সম্পাদনা), 'ছোটগল্পের চিহ্নিত মানচিত্র সুবোধ ঘোষ', একুশ শতক, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃ. ১৫৪

গ্রন্থপঞ্জি:

- সুবোধ ঘোষ, 'গল্পসমগ্র' ২. আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., সপ্তম মুদ্রন, ডিসেম্বর ২০১৪
- সুমিতা চক্রবর্তী, 'ছোটগল্পের বিষয় আশয়', পুস্তকবিপণি, জুন ২০০৪
- আদিত্যকুমার লালা (সম্পাদনা), 'ছোটগল্পের চিহ্নিত মানচিত্র সুবোধ ঘোষ', একুশ শতক, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১১

অহনা বিশ্বাসের ছোটোগল্প : প্রসঙ্গ বিশ্বায়ন

সৈকত মিস্ত্রী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: লেখিকা অহনা বিশ্বাস বর্তমান সময়ের এক উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক। তিনি সার্থকভাবে তাঁর ছোটোগল্পে নরনারীর সম্পর্কের একাধিক পরিবর্তনকে যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনই সামগ্রিকভাবে মানুষের মূল্যবোধের সরণকে করে তুলেছেন তাঁর গল্পের বিষয়। কলেজ কিংবা হোস্টেল জীবন, দাম্পত্য সম্পর্ক, পরকীয়া প্রেম, আধুনিক সময়ের গতিময় জীবন, ব্যক্তিসম্পর্কের টানাপোড়েন, নারীবাদী ভাবনা কিংবা গ্রামীণ একান্নবর্তী পরিবারের অনুপুঙ্খ হয়ে উঠেছে তাঁর লেখা ছোটোগল্পের বিষয় আশয়। তাঁর গল্পে অন্যান্য বিষয়সমূহের পাশাপাশি যাপিত সময়ের অনুপুঙ্খসহ উঠে এসেছে কখনো নারীজীবনের বিভিন্ন দিক, কখনো বা অতিক্রান্ত বিশ্বায়নের বিবিধ প্রভাব। এই প্রবন্ধে তাঁর নির্বাচিত কিছু ছোটোগল্পের প্রেক্ষিতে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াটির প্রভাব অনুসন্ধান করতে চাওয়া হয়েছে।
সূচক শব্দ: অহনা বিশ্বাস, ছোটোগল্প, নারী, বিশ্বায়ন।

কবি ও কথাকার অহনা বিশ্বাস বর্তমান সময়ের এক গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যকর্মী। তাঁর জন্ম ১৬ই মার্চ, ১৯৭০ আসানসোলে। বিদ্যাচর্চা শান্তিনিকেতনে। বর্তমানে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপিকা। 'দেশ', 'সানন্দা', 'যুবমানস', 'সৃষ্টির একুশ শতক', 'অমৃতলোক', 'জিজ্ঞাসা' সহ অসংখ্য পত্রপত্রিকায় লিখেছেন গল্প, উপন্যাস, কবিতা ও প্রবন্ধ। বিদেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে তাঁর কবিতা ও গল্প। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'অষ্টাবক্ররমণীকথা', 'সবুজ শাড়িপরাদের দেশ' ইত্যাদি। উপন্যাস 'আরশিনগরে তাঁবু', 'আমাদের মায়াবী সময়', 'তিনপুরুষ এক লতা' ইত্যাদি।

তিনি লাভ করেছেন গজেন্দ্রকুমার মিত্র মেমোরিয়াল কমিটির পক্ষে 'প্রতিমা মিত্র স্মৃতি পুরস্কার', ২০০১। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের পক্ষে 'সুচারু দত্ত স্মৃতি পুরস্কার', ২০০৩, 'ভরতব্যাস পুরস্কার' ২০০৫ ইত্যাদি।[১]

উনিশশো নব্বইয়ের দশক থেকে লেখিকা অহনা বিশ্বাসের ছোটোগল্প রচনার সূত্রপাত। প্রথম ছোটোগল্প[২] 'খালি শিশি' প্রকাশিত হয় 'দেশ' পত্রিকার জানুয়ারি ১৯৯৩ সংখ্যায়। তাঁর 'অহনার গল্প' (২০০৬, একুশ শতক) গ্রন্থের চল্লিশটি ছোটোগল্প ১৯৯৩ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত মোটামুটি এক দশকে লিখিত। বিবিধ বিষয় উঠে এসেছে তাঁর ছোটোগল্পের জগতটিতে। কলেজ কিংবা হোস্টেল জীবন, দাম্পত্য সম্পর্ক, পরকীয়া প্রেম, আধুনিক সময়ের গতিময় জীবন, ব্যক্তিসম্পর্কের টানাপোড়েন, নারীবাদী

ভাবনা কিংবা গ্রামীণ একান্নবর্তী পরিবারের অনুপুঙ্খ হয়ে উঠেছে তাঁর লেখা ছোটোগল্পের বিষয় আশয়। আর এইধরনের কয়েকটি ছোটোগল্পের মধ্যে দিয়ে উঠে এসেছে বিশ্বায়নের ছাপ। তাঁর এইধরনের কয়েকটি ছোটোগল্প হল 'ঋতুকাল', 'কার্তিক নামানো', 'একদিন, কোনোদিন', 'অনন্যাকে যে পায়নি', 'হাস্যরসের ওপারে', 'কেবলই যাতনাময়', 'জিজীবিষা', 'বিবর্তন' ইত্যাদি।

'ঋতুকাল' ('মায়ামৃদঙ্গ', কলকাতা বইমেলা, জানুয়ারি ২০০১) নামক ছোটোগল্পটিতে উঠে এসেছে ট্রেনের নিত্যযাত্রী প্রণব ও শ্বেতার মধ্যেকার পরকীয়া প্রেমের সম্পর্ক। প্রণব একটি ছোটোখাটো কারখানায় কাজ করে, শ্বেতা চাকরি করে একটা নামী ইউনিসেক্স বিউটি অ্যান্ড হেলথক্লাবে। সেই চাকরির অঙ্গ হিসাবে কখনো কখনো তাকে রাত কাটাতে হয় কোনো ক্লায়েন্টের সঙ্গে। এইধরনের হেলথক্লাব ইত্যাদি প্রকৃতপক্ষে বিশ্বায়ন ব্যবস্থারই ফসল, যেখানে নারীর শ্রম কিংবা যৌনতাকে অত্যন্ত অল্পদামের পণ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। তাই শ্বেতার মতো এম.এ. পাশ মেয়েরাও এই কাজে ব্যবহৃত হতে থাকে সংসার নির্বাহের কোনো উপায় না পেয়ে। শ্বেতার স্বামী সুবাস স্ত্রীর এই কাজের কথা জানলেও আপত্তি করে না, বরং সে মেনে নেয়। কিন্তু সে শ্বেতাকে শারীরিকভাবে আঘাত করে তখনই, যখন শ্বেতা জানায়, সে বাইরে যাচ্ছে কোনো ক্লায়েন্টের সঙ্গে নয়, তার প্রেমিকের সঙ্গে। এ গল্পে লেখিকার কলমে উঠে আসে একরকমের ভিন্ন মূল্যবোধ, যে বোধে শ্বেতার স্বামী তার স্ত্রীর দেহের উপর অধিকার হারানোর ভয় পায়নি, পেয়েছে স্ত্রীর মনে অন্য পুরুষ এসে বাসা বাঁধার খবর পেয়ে। নির্দিষ্ট এক অর্থনৈতিক সময়ের দ্বারা চালিত হয়ে এক অংশের মানুষ ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য কোথাও কি অস্বীকার করতে চেয়েছিল শারীরিক শুচিতার ধারণাকে? বিশ্বায়নকালে লেখা এই গল্প হয়তো সেই কথাই বলতে চেয়েছে—

> স্নান করে সিঁদুর পরল শ্বেতা। সুবাস উঠে পড়েছে। তারজন্য চা চাপিয়েছে। টোস্ট করে ফেলেছে যতক্ষণ বাথরুমে ছিল তার মধ্যেই। এই প্রথম প্রেমিকের সঙ্গে সে যাচ্ছে। নইলে তিনবার সে গেছে অন্য অন্য লোকের সঙ্গে। এই হেলথক্লাবে কত সুযোগ পয়সা করার। খুব যে খারাপ লেগেছিল শ্বেতার তাও নয়। কাজের তুলনায় পয়সা বেশি। সামান্য অভিনয়ও করতে হয়। এটুকু। পরিশ্রমের বিনিময়ে অর্থ। তবু তার সহকর্মীদের তুলনায় সে কিছুই নয়। হয়ত প্রণবই তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। ওর প্রেমের টানে প্রতিদিন বাড়ি ফিরতে ইচ্ছা হয়। নইলে গতবছর ঠিক বিবাহবার্ষিকীর দিনে সুবাস খুব নিরুত্তাপ গলায় বলেছিল : এবার আমায় ছেড়ে যেতে পারো শ্বেতা। সতেরো বছর তো কাটালে। জবাব দেয়নি শ্বেতা। চল্লিশ বছর বয়সেই প্রায় বৃদ্ধ হয়ে যাওয়া মানুষটাকে দেখছিল। মাঝেমাঝে এত নুয়ে পড়া নির্জীব মানুষটার প্রতি বিরক্তিবোধ হয় বইকী।[৩]

মানুষের পুরানো মূল্যবোধ এইভাবেই বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে বিশ্বায়ন-পরবর্তী সময়ে। মর্যাদা হারিয়েছে বিবাহ নামক সামাজিক প্রতিষ্ঠান। পারস্পরিক সম্পর্কও উষ্ণতা হারিয়েছে এই নির্দিষ্ট সময়ে—

> সুবাস সহজ গলাতেই বলল—এই ক্লায়েন্ট তেমন মালদার নয় বুঝি? ম্যানেজমেন্টকে প্রভাবিত করে কোন ক্ষতিটতি করতে পারবে না তো?
>
> বাইরে যাবার পোষাক খুলতে খুলতে শ্বেতা সুবাসের কথা শুনছিল। সুবাসের আশঙ্কা মিথ্যে নয়। এমনই হয়। এসব তাদের চাকরির শর্ত নয় বটে। তবে তেমন খদ্দের হলে বাড়তি টিপসের জন্য, মোটা কিছু টাকার জন্য বাইরে অ্যারেঞ্জ করতে শ্বেতা পারে। শ্বেতা সব শিখে নিয়েছে। সুবাস আবার বলল, দ্যাখো ভুল কোরো না। ক্লায়েন্ট তেমন ইনফ্ল্যুয়েনশিয়াল নয় তো?
>
> —ক্লায়েন্টই নয়। শ্বেতা শাড়ি ভাঁজ করতে করতে নিস্পৃহ গলায় বলে। সুবাস ঘুরে দাঁড়ায়। তার চোখেমুখে মুহূর্তে রক্ত খেলে। —তবে কে?
>
> —প্রেমিক, আমার প্রেমিক। আমি প্রেমে পড়েছি।
>
> —মজা মারছ?
>
> —মজা মারার মত জীবন যেন আমার! শ্বেতা জবাব দেয়। কিন্তু কথাটা শেষ হয় না। নুয়ে পড়া লোকটার বিষম চড়ে সে আলনাটার ওপর আছড়ে পড়ে।[৪]

শুধুমাত্র অর্থের পশ্চাতে ধাবমান এই সময়ে মানুষ সত্যিই হয়তো ভয় পায় নিষ্প্রাণতা অতিক্রমকারী কোনও মানবিক সম্পর্ককে। এ গল্পে সেই দিকটিকেই তুলে ধরেছেন গল্পকার।

'একদিন, কোনোদিন' (দৈনিক 'বর্তমান', জুলাই ২০০০) গল্পে উঠে এসেছে কর্পোরেট সংস্থার জোনাল ম্যানেজার পৃথা নামক চরিত্রের কথা। সে পদোন্নতির জন্য অত্যন্ত পরিশ্রম করে চলে। নিজের কিংবা পরিবারের জন্য রাখে না কোনো সময়। এরফলে সাংঘাতিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে তার পারিবারিক জীবন। স্বামী অমিত পৃথার চাকরির উন্নতির জন্য অত্যন্ত সচেষ্ট হলেও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বাড়তে থাকা দূরত্বকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। এরইমধ্যে একদিন সে ছুটি নেয় বর্ধমানে তার ছোটোবেলার স্কুলটিকে দেখতে যাবে বলে। হাওড়া স্টেশনে তার সঙ্গে দেখা হয় বর্তমানে তুলনামূলকভাবে কম সচ্ছল একসময়ের দু'জন বন্ধু-বান্ধবীর সঙ্গে। তারা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ। জীবনে সফলতা কিংবা স্বাচ্ছন্দ্য তাদের সেইভাবে না থাকলেও তাদের মধ্যেকার প্রণয় কিংবা একত্রযাপন পৃথাকে নতুন করে ভাবায় নিজের অর্জিত সাফল্য সম্পর্কে। তার আর বর্ধমান যাওয়া হয় না। মাঝপথে অন্য স্টেশনে নেমে পড়ে সে—

> কদিন ধরেই মনটা বড় উৎফুল্ল ছিল পৃথার। সময় পেলেই ফোন করেছে, ফোন ধরেছে। এই সময়টায় কি ফোনও এসেছে কম নাকি। মাত্র দিন পনেরো আগেই পৃথার চাকরিতে উন্নতি হয়েছে। দিদি ফোনে তো প্রায় লাফাচ্ছিলই। সত্যি, তুই এই বয়সে জোনাল ম্যানেজার! তুই তো তোর

জামাইবাবুর মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিস। তার ওপর ষোলশ স্কোয়ার ফুটের ফ্ল্যাট দিয়েছে কোম্পানি। গাড়ি দিচ্ছে। অবশ্য কয়েক মাস আগে, তার বর অমিতও গাড়ি কিনেছে। সত্যি, গর্বে পৃথা নিজেই ফেটে পড়েছিল। বন্ধু-বান্ধব, কোলিগ, চাকরিপ্রার্থী কতজনেরই যে ফোন এ কদিনে পেয়েছে।...

অমিত চায়, খুব চায়, পৃথার উন্নতি হোক। অনেক উঁচু পোস্ট হোক পৃথার। পৃথাকে সে এ ব্যাপারে সাহায্য না করলে পৃথা দাঁড়াতই না। ও শর্মিলা মুনিয়াদের স্বামীদের মতো নয়। তবু পৃথা বুঝতে পারে কোথায় যেন টানটান সুতোটা আলগা হয়ে যাচ্ছে। অমিত সে অমিত নেই। কিন্তু পৃথাই কি সেই পৃথা আছে? প্রায় মফস্বল থেকে তাদের দুজনের প্রেসিডেন্সিতে পড়তে আসা। শহরের ব্যস্ততা, কুটিলতা, নৈর্ব্যক্তিকতা কিংবা অপমানকে ভাগ করে নিতে নিতে একসঙ্গে এগিয়ে যাওয়া দুজন আজ এক বিন্দুতে। একটা সংসারে, একটা ফ্ল্যাটে, একই পদবিতে। সরকারী চাকরি ছেড়ে অমিত ব্যবসা করছে, পৃথাও চাকরি নিয়েছে। হু হু করে এগিয়ে যাচ্ছে তারা। শহরের বন্ধুদের ছাড়িয়ে, আরও শহুরে হয়ে, পোশাকে আষাকে সচ্ছলতা ছড়িয়ে, ব্যাঙ্কে টাকা রেখে, শেয়ার কিনে বাতাস কেটে কেটে এগিয়ে যাবার আত্মতৃপ্তিই তো সুখ। পরম সুখ। পৃথার গাল লাল হয়ে যায়। পৃথা সুন্দরী, বন্ধুরা বলে দিন দিন তার গ্ল্যামার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে।

খুব সুখী পৃথা, খুব সুখী সে। অমিত আর তার একই লক্ষ্য, একই জীবন। তবু পৃথার মনে কোথাও একটা কিছু যেন চিনচিন করে। অমিতকে কাছে পায় না। কাছে থেকেও তার মন অন্যদিকে। পৃথার মনও। নিজেদের কাজ ছাড়া দুজনের মধ্যে কোনও কথাই হয়না। সফলতা পৃথাদের আবর্তন করে ঘুরছে। তার জন্য কিছু তো প্রতিদান দিতেই হয়। স্যাক্রিফাইস। কিছুটা আত্মহত্যা। জীবনকে ভোগ করার সময় কি কম পড়ে আছে ?[৫]

বিশ্বায়ন-চালিত এই ব্যস্ত সময় এভাবেই আপাত সাফল্যের আড়ালে ধীরে ধীরে হত্যা করে মানুষের অন্তর্গত মানুষটিকে। দূরবর্তী করে তোলে কাছের মানুষের থেকে। তখন সমস্ত উষ্ণতাই হারিয়ে যায়। বেঁচে থাকাটাই হয়ে ওঠে এক লড়াই—

পৃথা কেঁদে উঠল। কতদিন পর ডুকরে কেঁদে উঠল। নির্জন স্টেশনে জামগাছের তলায় বসে, চূড়ান্ত সফল মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির জোনাল ম্যানেজার হাউহাউ করে কাঁদছে। পৃথা নিজেই জানে না কেন সে এমন পাগলামো করছে। কিন্তু কেন যে পৃথা এমন হয়ে গেল তা কে বলতে পারবে? অমিত কি পারবে? সাত্যকি? শ্রীবাস্তব সাহেব কিংবা তার পরিচিত কেউ, কোনও একজনও।[৬]

এ গল্পে উঠে এসেছে বিশ্বায়ন পরবর্তী কর্পোরেট সংস্কৃতি, যেখানে অর্থের বিনিময়ে মানুষের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয় সময় কিংবা পারিবারিক-সামাজিক

জীবন। কেবলই সাফল্যের পিছনে ছুটতে থাকে মানুষ। একসময় দিশাহারা হয়ে সাফল্য আসলে কী, তা নিয়েই মনে প্রশ্ন জাগে। সেই প্রশ্নটিকেই এ গল্পে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছেন লেখিকা।

'হাস্যরসের ওপারে' ('মুক্তবাংলা', শরৎ ১৯৯৮) গল্পটিতে বিশ্বায়ন আর একরকম মাত্রায় উঠে এসেছে। এ গল্পে পড়াশোনায় মাঝারিমানের দীপা সংসার চালানোর জন্য সামান্য বেতনে একটি নার্সারি স্কুলে চাকরি করে। তার বন্ধু সুবীর আই আই টি-র ইঞ্জিনিয়ার। এ গল্পে দীপার সঙ্গে সুবীরের একটি প্রেম-সম্পর্কের সূত্রপাত হলেও সম্পর্কটিকে বেশিদূর এগিয়ে নিয়ে যায় না সে। দীপাকে প্রত্যাখ্যান করে। এরপর দীপা অর্থের আবর্তে সমাজের ঘূর্ণিস্রোতে পাক খেতে থাকে। সুবীরও কারোর সঙ্গে সম্পর্কে আবদ্ধ হতে পারে না। শেষপর্যন্ত আবার তারা একত্রিত হয়। দীপার ব্যবসা করার মূলধন যোগায় সুবীর। গল্পটিতে একদিকে দীপার অতি সাধারণ জীবন যেমন উঠে এসেছে, অন্যদিকে ধরা পড়েছে সুবীরের বিলাসবহুল জীবন। লেখিকা দেখিয়েছেন দুটি জীবনই কষ্টের। দীপার গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্ট, অন্যদিকে বিপুল প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও সুবীরের শ্রেণিচ্যুতি ঘটার কষ্ট। পুঁজিনির্ভর অর্থনীতির একজন ক্রীড়নক সে। সেই ব্যবস্থায় মানুষের মনের সন্ধান কেউ রাখে না—

> সুবীর বলে, আমাদের সোসাইটি বদলে গেছে দীপা। সে সোসাইটিতে তোদের মত পিওর, তোর মত পবিত্র বলে কিছু নেই। সেই বংশীকে বিয়ে করছে সুনু—আমি তো ভাবতেই পারছি না। সুনু তো দেখতে বেশ ভালোই। কত ভালো ওর বিয়ে হতে পারত। এই সমাজে এখনও ভালোবাসা আছে, স্নেহমায়া আছে বুঝলি। এখন এইখানে ফিরে আসতে খুব ইচ্ছা হয়। বাবার মত একটা সামান্য চাকরি করতে ইচ্ছা হয়। আতা গাছের তলায় চেয়ার পেতে বসে দাদুর মত বিকেলবেলায় ঝিমোতে ইচ্ছে হয়। আমি একেবারে সুখী হইনি রে দীপা। স্ট্যাটাস রক্ষা করতে গিয়ে সব চলে যাচ্ছে।[৭]

সামাজিক বদলের একাধিক দিক এই গল্পে উঠে এসেছে। তার সঙ্গে ধরা পড়েছে পূর্বেকার জীবনযাত্রার প্রশান্তির সঙ্গে বর্তমান প্রজন্মের জীবনের প্রশান্তিহীনতার একপ্রকার তুলনা। নির্দিষ্ট এই সময়ে সামাজিক সম্পর্ক কিংবা মূল্যবোধের বদলের সঙ্গে সব মানুষ যে মানিয়ে নিতে পারে নি, সেই দিকটি এ গল্পে ধরা পড়েছে। অন্যদিকে সম্পর্কের বিনিময়ে অর্থপ্রাপ্তির কথা উঠে এসেছে প্রাসঙ্গিকভাবে, যা এক নির্দিষ্ট সময়ের মূল্যবোধের অবক্ষয়কে তুলে ধরে—

> সুবীরের কথা ভুলতে পারে না দীপা। হাজার হোক দীপাকে সে সবচেয়ে বেশি রেটই দিয়েছিল। দরাদরি করেনি, কোনও অতিরিক্ত কথা বলেনি, বরঞ্চ বাঁচার পথটা দেখিয়ে দিয়েছিল। নার্সারি স্কুলের কীই বা মাইনে। দীপার আর কোনও যোগ্যতা না থাক, এটা আছে তা প্রমাণের জন্য হয়ত সুবীরের প্রয়োজন ছিল। না সুবীর খারাপ হতে যাবে কেন? আই আই টি ইঞ্জিনিয়ার,

> ডাক্তার টাক্তার ছাড়া কাকেই বা বিয়ে করবে। দীপার তো খুব ইচ্ছে করে ওর ফ্ল্যাটে যেতে। ওর বৌ তো দীপাকে চিনবে না, উল্টে দরজা খুলে ভাববে কাজ-টাজ চাইতে লোক এসেছে। হয়ত কত টাকা মাইনে চায় জিজ্ঞেস করবে।[৮]

বিশ্বায়ন-পরবর্তী সমাজে সামাজিক সম্পর্কনির্মাণের পথগুলিও অনেকাংশে রুদ্ধ হয়েছে। সেই জগতেও ক্রিয়াশীল হয়েছে উচ্চাকাঙ্ক্ষা। যোগ্যতমের সঙ্গে যোগ্যতমই সম্পর্কসূত্রে বাঁধা পড়তে পারে, অন্য কেউ নয়—এ হেন সমীকরণ নতুন অর্থনীতিতে আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। তবু মানুষের পক্ষ থেকে মানবিক মূল্যবোধে ফিরে আসার প্রচেষ্টা কখনও কখনও জারি থাকে—

> খুব খারাপ ছেলে হয়ে গেছিরে দীপা। নষ্ট ছেলে, স্যাডিস্টও কিছুক্ষেত্রে। আজ পর্যন্ত কত মেয়ে...। যখন দেখলাম তুই জড়িয়ে পড়ছিস তখন বিয়ের কথাটা বাজালাম। দীপা স্থির হয়ে বসেছিল। কিন্তু সুবীর বলেই যাচ্ছিল, তুই বিশ্বাস কর ঐ ঘটনার পর খুব আফশোস হয়েছে, খুব। তুই খারাপ হয়ে গেলি, অভাবে। আমি টাকার প্রাচুর্যে নষ্ট হলাম। স্বভাবটাই হয়ত খারাপ। তবু বিশ্বাস কর তোকে দেখলে আমার ছেলে বেলাকার কথা মনে হয়। কী পবিত্র তুই, কী পবিত্র আমি। তোকে ভালোবাসতাম—এতদিন পর এভাবে বললে তুই আবার সেইরকম নিশ্চয় হাসবি। কিন্তু শোন, তুই তো ভালো হতে পারিস। একটা সেলাই এর দোকান খুলতে পারিস। তোর জন্য একটা চেক রেখেছি। হাজার চল্লিশের। সেলামি হয়ে যাবে। নিবি ? ভাব না, সেই তিনদিনের জন্য দিচ্ছি। এক হাজার টাকাটা কিছু নয়। ওই টাকার কী মূল্য এই বাজারে।[৯]

কোনও কোনও সময়ে হয়তো বা বিশ্বায়নের প্রতিযোগিতাময় জীবন থেকে বেরিয়ে ফেলে আসা দিনের মূল্যবোধে আশ্রয় নিতে চায় ক্লান্ত মানুষ। এই গল্পে লেখিকা সেই দিকগুলিকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন।

'জিজীবিষা' ('উৎসব', নভেম্বর ২০০১) গল্পে নারীবাদী চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এ গল্পের চরিত্র প্রৌঢ়া পার্বতী পালিত একজন আইনজীবী। তার পাশাপাশি তিনি বিশিষ্ট 'ফেমিনিস্ট', 'মহিলাবন্ধু সমিতি'-র প্রেসিডেন্ট। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মহিলারা আসেন তাঁর কাছে, প্রতিকার প্রার্থনায়। তাঁর স্বামী অনিমেষ অত্যন্ত গুণী অধ্যাপক। দু'জনের এই আপাত সফল সংসারের অন্তরালে দেখা যায় অনিমেষ তাঁদের মেয়ের বয়সী কঙ্কার প্রতি আসক্ত। এ গল্পে পার্বতী, যিনি নারীবাদী, যিনি অন্যের সমস্যা সমাধান করেন, তিনি নিজেই অসহায় হয়ে পড়েন পুরুষতন্ত্রের কাছে। গল্পের শেষে দেখা যায় পুরুষনির্মিত সমাজনির্মাণ অনুযায়ী স্বামীর দাবি নিয়ে তিনি পতিব্রতা নারীর মতো ভূমিকা পালন করেন। তাতে তাঁর এতদিনের যুক্তিনির্ভর অবস্থানের চেয়ে প্রথানুগত্যই বেশি পরিমাণে উঠে আসে। অন্যদিকে এ গল্পে প্রযুক্তি কীভাবে মানুষের সম্পর্কের মধ্যে ভাঙন ধরিয়েছে, সেই দিকটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—

> অনিমেষ বিছানায় শুয়েই কর্ডলেসে ফিসফিস করে কঙ্কার সঙ্গে কথা বলে। পার্বতীর কান খাড়া হয়ে থাকে। সব কথা বিছানার ও-প্রান্ত থেকে শোনা যায় এমন নয়। তবু পঁয়ত্রিশ বছরের এই সঙ্গীর কাতরতা, সমর্পণ, অনুরোধের আর্তি সবই এত পরিচিত যে পার্বতীর অজানা কিছুই থাকে না। যদিও ফোনের ভলিউম কম থাকে, তবুও মাঝরাতে প্রেমালাপ শুনেই ঘুম ভেঙে যায় পার্বতীর। ঘুমের ওষুধ খেতে হয় মাঝে মাঝে।[১০]

প্রযুক্তি একদিকে যেমন মানুষের মধ্যেকার ভৌত দূরত্বকে কমিয়েছে, তেমনই বাড়িয়ে দিয়েছে মানসিক দূরত্বকে। এইরকম পরিস্থিতিতে অন্যকে ভরসা জোগানো মানুষও হয়ে পড়ে অনন্যোপায়—

> সেই প্রথম ক্লায়েন্টের দুঃখে কেঁদে ফেলেছিল পার্বতী। সে জানে সে বোঝে একই বিছানায় দ্বিতীয় নারীর উপস্থিতি। ফোন নামে যন্ত্রটা কেন যে পৃথিবীতে আবিষ্কার হয়েছে।[১১]

প্রযুক্তি এইভাবে মানুষের জীবনকে দুর্বিষহও করে তুলেছে।

'বিবর্তন' ('অমৃতলোক', জানুয়ারি ২০০১) নামক ছোটোগল্পটিতে লেখিকা তুলে ধরেছেন বিশ্বায়নের একপ্রকার বিপক্ষতাকে। এ গল্পে অখিল এক প্রাক্তন নকশাল। সেইসময়ে বোমা তৈরি করতে গিয়ে তার ডান হাতের দুটি আঙুল নেই, ডান চোখের ভিতরে পাথর, একটি পা ক্ষতিগ্রস্ত। সে একটি সরকারি অফিসের ক্লার্ক। যে বিপ্লবের স্বপ্ন সে দেখত, তা থেকে সরে বর্তমানে সে প্রচলিত পথের সাফল্যে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। তার স্বপ্নগুলি বদলে যায়। স্ত্রী মালা আর দুই সন্তান বিপ্লব এবং সংহতিকে নিয়ে তার সংসার। অখিলের স্কুলের বন্ধু শ্যামল একজন বিদেশফেরত সফল ডাক্তার, তার স্ত্রী হিমাচলপ্রদেশের মেয়ে মধুও বিদেশফেরত ডাক্তার। তাদের একমাত্র সন্তান অচিন পড়াশোনায় অত্যন্ত ভাল। দুটি পরিবারের মধ্যে সখ্য স্থাপিত হলেও অখিল আর শ্যামলের সন্তানদের স্বপ্ন কিংবা সাফল্যের ধারণা হয়ে ওঠে আলাদা। এককালের নকশাল অখিল চায় তার সন্তানরা বহুজাতিক কোম্পানির চাকরি নিয়ে বিদেশে চলে যাক, তার বর্তমান ধারণায় সেটাই সাফল্য। অন্যদিকে শ্যামল-মধু-র সন্তান অচিন সফলতার ভিন্ন সংজ্ঞায় বিশ্বাসী। সে পড়াশোনায় অত্যন্ত সফল হওয়া সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত বিদেশযাত্রা স্থগিত করে মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে আদিবাসীদের গ্রাম রক্ষার্থে যাত্রা করে। এইভাবে বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে মানুষের নীতি আদর্শের একপ্রকার বিবর্তন ধরা পড়েছে এ গল্পে। অন্যদিকে বিশ্বায়ন নামক পুঁজির সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে এসে দাঁড়িয়েছে অত্যন্ত সফল পরিবারের এক সফল ছাত্র অচিন—

> কয়েক বছর পর হায়ার সেকেন্ডারীতে সংহতি দারুণ রেজাল্ট করে। আমি কল্পনা করিনি বিপ্লবের থেকে ওর মাথা এতটা ভালো। ও ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিক্যাল দুটোতেই চান্স পায়। দুটোতেই ভালো র‍্যাঙ্ক। সংহতি সম্ভবত মধুকে দেখেই ডাক্তার হতে চায়। আমি চাই না। ওকে বোঝাই কত

> বেশিদিনের কোর্স। তারপরও তুমি প্রতিষ্ঠিত হবে কী হবে না তা নিয়ে সমস্যা। তার থেকে তুমি কম্প্যুটারে যাও। এ দিকেই এখন পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। বিল গেটস। ইনফরমেশন টেকনোলজি।[১২]

মানুষের পেশা নির্বাচনকেও প্রভাবিত করেছিল বিশ্বায়ন। মানবসেবার পরিবর্তে চটজলদি অর্থাগমের উপায় হিসাবে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াই শ্রেষ্ঠতর হয়ে উঠেছিল এই সময়ে। কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং আরও বেশি করে গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল তথ্য-প্রযুক্তির দ্রুত বিস্তারের কারণে। অভিভাবকরা দ্রুত উপার্জনের আশায় তাই একেই বিকল্প হিসাবে বেছে নিয়েছিল অন্য সুযোগসমূহকে সরিয়ে রেখে। তবে সমস্ত মেধাবী ছাত্রই সাফল্যের এই দ্রুত পথকে বেছে নেয়নি। কেউ কেউ এর বাইরে গিয়েও ভাবতে চেয়েছে ভিন্ন পথে—

> ও বলল, বিদেশে গিয়ে কী হবে? ওদের বাতিল করে দেওয়া প্ল্যান আমরা দেশের লোকের টাকায় বানাব কেন? বড় বড় কিছু শিখবই বা কেন—তা যদি আমার দেশে প্রয়োগ করা না যায়। বাবা, ও কত কথা বলছিল। সব আমি বুঝতেও পারছিলাম না। বলছিল, বিশ্বব্যাঙ্কের টাকায় বনজঙ্গল গ্রাম মানুষ লোপাট করে যা বানাব, তা আবার দুদিন পর ভাঙতে হবে। তখনও লোন। অচিনদা যদিও সব সরল করে বলছিল—তবু যেন সব বুঝছিলাম না।
>
> আমার মনে পড়ল মধু শ্যামলের সামনে আমি বক্তৃতা দিচ্ছি। সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতা, গ্যাট চুক্তি, ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক। আমার মাথা ঘুরছিল। তবু আমি কোনওমতে বললাম, অচিনের কথা তোর বোঝার দরকার নেই রে।
>
> —অচিনদা বলল, তুমি সব নাকি বোঝো। আমাকে একটু বুঝিয়ে বলবে বাবা।
>
> —কিচ্ছু বুঝি না বিপ্লব। অচিনের সঙ্গে বেশি মিশিস না। আমার বুকের যন্ত্রণা শুরু হল। আমার ছেলেমেয়েদের, আমার একমাত্র পুঁজিকে বোধহয় আর রক্ষা করতে পারলাম না।[১৩]

কেউ কেউ বিশ্বায়নের স্বরূপকে বুঝে নিয়ে এর বিপরীত পথে হাঁটতে চেয়েছে। আবার প্রাথমিকভাবে আদর্শবান কোনও কোনও চরিত্র বদলে ফেলেছে নিজেকে। বিশ্বায়নের পুঁজিব্যবস্থার অংশ করে তুলতে চেয়েছে সন্তানকে। এইভাবে সরাসরি এ গল্পে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াটিকে তুলে ধরেছেন লেখিকা অহনা বিশ্বাস। অন্যদিকে সামগ্রিকভাবে তাঁর গল্পের জগতে এভাবেই বিভিন্ন অনুপুঙ্খে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে বিশ্বায়ন নামক ব্যবস্থাটি।

উল্লেখপঞ্জি

১. বিশ্বাস, অহনা, ‘লেখক পরিচিতি’ (ব্লার্ব), *অহনার গল্প*, কলকাতা: একুশ শতক, জানুয়ারি ২০০৬

২. বিশ্বাস, অহনা, 'আমার কথা', *অহনার গল্প*, কলকাতা: একুশ শতক, জানুয়ারি ২০০৬
৩. 'ঋতুকাল', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫১-৫২
৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫৪
৫. 'একদিন, কোনোদিন', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৯৪-৯৫
৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১০০
৭. 'হাস্যরসের ওপারে', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১১৫
৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১১৭
৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১১৮
১০. 'জিজীবিষা', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৭৮
১১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৮২
১২. 'বিবর্তন', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৬০
১৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৬৩

বিমল করের নির্বাচিত ছোটগল্পে মৃত্যুচেতনা

শঙ্খ দত্ত
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : বিমল করের কথাসাহিত্যে মৃত্যুদর্শন একটি বিশেষ দিক। এই পর্বের গল্পগুলিতে বিভিন্নভাবে মৃত্যু প্লটনির্মাণে সহায়তা করেছে। কখনো মৃত্যু এসে চরিত্রের জীবনদর্শন বদলে দিয়েছে, কখনো বা মৃত্যু এসেছে নিয়তির ছদ্মবেশে, কখনো মৃত্যুভয় কোনো চরিত্রের মানসিক স্থিতি নষ্ট করেছে বা মৃত্যু স্বয়ং চিঠি পাঠিয়েছে আবার কোনো গল্পে মৃত্যু এসেছে স্বয়ং চরিত্র হিসাবে। লেখকের এই মৃত্যুচেতনা আসলে জীবন জিজ্ঞাসারই নামান্তর।

সূচক শব্দ : মৃত্যুচেতনা, নিয়তি, সৌন্দর্যচেতনা, অন্তিম যাত্রা, মৃত্যুভয়।

মূল আলোচনা :

বিমল করের প্রথমদিকের গল্পগুলি যেমন ‘আত্মজা’ কিংবা ‘আঙুরলতা’তেও মৃত্যু এসেছে ঠিকই কিন্তু তাঁর যে দার্শনিক চেতনা আমাদের প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য, তার সূত্রপাত হল 'সুধাময়' (১৯৫৭, শারদীয় দেশ) -এর মধ্যে দিয়ে।

> "প্রেম, মৃত্যু, ব্যাধি, অন্তর্দ্বন্দ্ব- যা কিছু এতকাল বিমল করের সৃষ্টির জগতে ছায়া ফেলে গেছে, 'সুধাময়ে' পৌঁছে তা যেন এক জৈব যৌগের রূপ নিল... লেখায় কেবলমাত্র রূপনির্মাণ নয়, শুরু হল এক আত্মআবিষ্কারের পালা। আর এই সময় থেকেই তাঁর রচনাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে এক দার্শনিক চেতনা- এই দর্শন, মৃত্যুদর্শন"।[১]

সুধাময়ের জন্ম হয়েছিল এক কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে। তার বাবা বিশ্বচরাচরকে ঈশ্বর বলে গ্রহণ করেছিলেন, তাই জ্যোৎস্নায় আদিগন্তব্যপী নৈসর্গিক সৌন্দর্যের সুধায় মুগ্ধ হয়ে তিনি পুত্রের নামকরণ করলেন সুধাময়। শৈশব থেকেই সুধাময়ের হৃদয়ে আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে সৌন্দর্যচেতনার অবিচ্ছেদ্যতার বোধটি গেঁথে দিয়েছিলেন তার বাবা। বাবা তাকে শিখিয়েছিলেন ভালোকে ভালোবাসতে পারলেই আনন্দ লাভ করা যায়। বাবার কাছ থেকে শেখা এক সুন্দর নিঃসঙ্গতা এবং মায়ের কাছ থেকে আত্মমগ্ন মাধুর্য- দুইই তার চেতনায় বিকশিত হচ্ছিল। তার বিভিন্ন শিক্ষকদের নামগুলি লক্ষ্যণীয়- হরি বাউল, অমৃত পন্ডিত, মধু মাস্টার, মায়ের নাম পূণ্যময়ী ইত্যাদির মাধ্যমে বিমল কর সুধাময়ের মনোজগতের নির্মাণের ব্যাপারে কৌশলী ইঙ্গিত দিয়েছেন। যুবক সুধাময় তার বাবার শেখানো ভালোকে ভালোবেসে আনন্দলাভের তত্ত্বকে পাথেয় করে আত্ম আবিষ্কারে মগ্ন হয়ে ওঠে। কিন্তু আনন্দ আর

আত্মসুখ যে এক নয় তা সে প্রথম উপলব্ধি করে মায়ের টিবি ধরা পড়ার পর। মায়ের প্রতি ভালোবাসার থেকেও তখন তার কাছে বড় হয়ে ওঠে নিজের মৃত্যু-আশঙ্কা । এখান থেকেই সুধাময়ের আপন চেতনায় মৃত্যু সম্পর্কিত নানা জিজ্ঞাসার শুরু। সে রীতিমত আতঙ্কিত দিনযাপন শুরু করে। নিজের স্বার্থপরতায় সুধাময় ক্রুদ্ধ হয়, লজ্জিত হয়। প্রায় সাত আট মাস এই মৃত্যুভয় ভোগ করে সে। অবশেষে সংক্রামিত হবার ভয়কে উপেক্ষা করে যখন সে মাকে কলকাতা নিয়ে যাবার সংকল্প করে তখনই পূণ্যময়ীর মৃত্যু হয়।

এযাবৎ সুধাময়ের আনন্দ সম্পর্কে যে দার্শনিক অভিমত, তা ছিল তার বাবার দ্বারা প্রভাবিত। এতদিনে সে তার বাবার চিন্তার প্রভাব কাটিয়ে নিজের উপলব্ধির পথে আনন্দান্বেষণের মাধ্যমে পূর্ণতার সন্ধানে ব্রতী হল। কলকাতায় থাকাকালীন রাজেশ্বরী নাম্নী এক তরুণীর সঙ্গে তার পরিচয় হয়। রাজেশ্বরীর সৌন্দর্য ও আভিজাত্য আনখশির ত্রুটিহীন ও সম্পূর্ণ। কিন্তু তবু সুধাময় তাকে ভালোবাসতে পারল না। সে তার সঙ্গে মিশেছে, বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ করেছে, বেড়াতে গেছে, তার অলৌকিক সৌন্দর্যের রহস্য আবিষ্কার করার চেষ্টাও করেছে, কিন্তু পরিশেষে উপলব্ধি করেছে যে রাজেশ্বরীর বিভিন্ন রমণীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গই তার প্রতি সুধাময়কে কামনার্ত করে তুলছে। সুধাময় পরিমলকে বলেছিল

> "প্রেম আনন্দ। যা আমার আনন্দ, যাতে আমি আনন্দিত, অন্তত যার আবির্ভাবে আমার আনন্দ জেগে ওঠে আমি তাকেই ভালোবাসা বলি।"[২]

রাজেশ্বরীর দৈহিক সৌন্দর্য কখনই তার সামগ্রিক অস্তিত্বের সমতুল্য নয়, সুতরাং দেহভোগের আনন্দ কখনো পরিপূর্ণ আনন্দের সন্ধান দেবে না - এই বিবেচনায় সুধাময় তাকে ত্যাগ করে।

প্লুরিসি হবার পরে সুধাময় মিহিরপুর টিবি স্যানেটোরিয়ামের রোগীদের সেবায় আত্মনিয়োগ করে। লক্ষ্যণীয় যে সে কিন্তু শারীরিক সেবা নয় বরং "ওদের হতাশ ক্লান্ত মনের সেবায়" নিজেকে সমর্পণ করে। ছ'বছর অতিক্রান্ত হবার পর হৈমন্তী নামক এক বছর কুড়ির রোগীকে সুধাময় ভালোবেসে ফেলল। হৈমন্তী সর্ব অর্থেই রাজেশ্বরীর বিপরীত। রাজেশ্বরীর চোখ যেন অন্ধকারে দুটি বিন্দুর মত জ্বলত। হৈমন্তীর চোখ ক্লান্ত, বিষণ্ণ। রাজেশ্বরী আগুনের শিখার মত হয়েও সুধাময়ের জীবন দর্শনে সামান্য আঁচও ফেলেনি, কিন্তু হৈমন্তী নিতান্ত সাধারণ হয়েও সুধাময়ের মনে প্রেমের শিখায় অগ্নিসংযোগ করল। সুধাময় অনুভব করল হৈমন্তীকে সে ভালোবাসে এই চিন্তাটুকুই তার মনে আকাঙ্ক্ষিত আনন্দের জন্ম দিচ্ছে। পরিমলকে চিঠিতে সে জানাল তার সব সংশয় ঘুচেছে- অবশেষে দেহনিরপেক্ষ, অস্তিত্ব নির্ভর প্রেম খুঁজে পেয়ে তার সব অন্বেষণ শেষ হয়েছে। কিন্তু হৈমন্তীর রোগ জটিল হয়ে মৃত্যুর সম্ভাবনা তৈরি হলে সুধাময় আবার উপলব্ধি করল যে, যে প্রেম সে দেহনিরপেক্ষ ভেবেছিল, হৈমন্তীর সেই

অতি সাধারণ দেহটি মৃত্যুর পরে পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যাবে কল্পনা করেও সে কাতর হচ্ছে। বাবার শেখানো ভালোকে ভালোবেসে আনন্দ লাভের দর্শনকে সামনে রেখে সুধাময়ের পথচলা শুরু হয়েছিল, মায়ের মারণ রোগে এসে সে উপলব্ধি করল আনন্দ ও আত্মসুখ-এর প্রভেদ। অবশেষে মৃত্যুভয়কে জয় করে যদি বা সে এক মৃত্যুপথযাত্রীকে ভালোবাসল, আবার আসন্ন মৃত্যু তার মনে বিরহবেদনা জাগিয়ে তুলে তার তত্ত্বের অসম্পূর্ণতা চিহ্নিত করে দিল। সুধাময় উপলব্ধি করেছিল আনন্দের পথেই মানুষ পূর্ণতার দিকে যায়। প্রেম হল সেই পূর্ণতাকে উপলব্ধি করা, আর আনন্দ সেই পথকে চিনিয়ে দেয়। কিন্তু সুধাময় বুঝতে পারল হৈমন্তীর মৃত্যুর পর তার দেহের বিনাশে সে কেবল শূন্যতাই কল্পনা করছে, আনন্দ নয়। অ-শরীরী, কল্পনানির্ভর আনন্দতত্ত্বের অসারতা এখানেই প্রমাণ হয়ে যায়। এভাবে আমরা দেখি গল্পে যখনই সুধাময় তার অবিরাম জিজ্ঞাসার মাঝে কিছু আপাত স্থিতি খুঁজে পেয়েছে, তখনই মৃত্যু এসে তার সকল হিসেব নিকেশ ওলোট পালট করে স্থিতি বিনষ্ট করেছে। ফলে সুধাময়ের অন্বেষণ আবার শুরু হল।

'নিষাদ' (১৯৫৮, দেশ) গল্পে আমাদের জীবন-মৃত্যুর নির্ধারকরূপে এসেছে নিয়তি। রেললাইনের কাছে একটি বাড়িতে ভাড়া থাকেন কথক ও জলকুর পরিবার। জলকুর বাবা পঙ্গু, মা রুগ্ন ও সংসারের যাঁতাকলে ব্যস্ত। অবিবাহিতা তরুণী পিসি তরুলতাই প্রধানত দেখাশোনা করত বছর বারোর জলকুর। আর করতেন লেখক। জলকু সুযোগ পেলেই সবার নজর এড়িয়ে চলে যেত রেললাইনে এবং লাইন থেকে পাথর তুলে ক্রমাগত সেই পাথরগুলি লাইনে ছুঁড়ে মারত। এই খেলায় তার কোনো ক্লান্তি ছিল না। কথক তাকে বারবার লাইন থেকে ধরে আনতেন। কিন্তু সত্যিই কি এটা জলকুর কাছে খেলা ছিল? গল্প এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে আমরা বুঝতে পারি এটা ছিল জলকুর প্রতিশোধ। তার প্রিয় ছাগলছানা মানিক ওখানেই কাটা পড়ে মারা গেছিলো তাই জলকু নিজের বিপদ অগ্রাহ্য করে রোজ ব্যর্থ আক্রোশে ঢিল ছুঁড়ে যেন শাস্তি দিত লাইন দুটিকে।

"ছেলেটা মরবে; লাইনে কাটা পড়েই মরবে একদিন। হয়ত আজ... কিংবা কাল...।"- গল্পে এই পংক্তিটি বারবার ধ্রুবপদের মত পুনরাবৃত্তি করেছেন লেখক। আমরা অনুমান করতে পারি এই সংলাপ আসলে নিয়তির। জলকু জানত না কথক অর্থাৎ তারই প্রতিবেশীর ছোঁড়া গ্রামাফোনের হ্যান্ডেলের আঘাতেই মৃত্যু হয়েছিল মানিকের, রেলে কাটা পড়ে নয়। রেললাইনে অপঘাতে মৃত্যু লেখা ছিল তার নিজের নিয়তিতে। মানিকের মৃত্যুতে প্রত্যক্ষভাবে এবং জলকুর মৃত্যুতে পরোক্ষভাবে কথককেই দায়ী মনে হলেও এই গল্পের প্রকৃত নিষাদ আসলে নিয়তি। কথক কেবল নিমিত্ত, নিয়তি নির্ধারিত ক্রিয়ার সংঘটন করেছেন মাত্র।

মৃত্যু সম্পর্কে মানুষের কৌতুহল সুপ্রাচীন। মৃত্যু পরবর্তী জীবন নিয়ে বিভিন্ন ধর্মেই বিভিন্ন প্রকার দার্শনিক তত্ত্ব, কল্পনা, অনুমান দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণ হিন্দু

বিশ্বাসমতে দৈহিক বিনষ্টির পর পবিত্র আত্মার একমাত্র গন্তব্য স্বর্গ। কিন্তু স্বর্গে পৌঁছনোর পূর্বে যে দীর্ঘ পথ আত্মাকে অতিক্রম করতে হয় সেই পথের আইডিয়া বিমল কর পেয়েছিলেন নৃতাত্ত্বিক ভেরিয়ার এলুইনের বইতে।[৩]

এই থিমটিকেই ব্যবহার করে বিমল কর পরবর্তী কালে লিখলেন 'জননী' (১৯৬২, শারদীয় দেশ) গল্পটি।

মায়ের মৃত্যুর পর পারলৌকিক ক্রিয়া মিটে গেলে মাসের শেষে এক পূর্ণিমার রাতে মায়ের স্মৃতিতে বানানো সাদা বেদীতে বসেছিল পাঁচ ভাইবোন। মেজভাই, অন্ধ দীনেন্দ্রই প্রথম মর্ত্য থেকে স্বর্গযাত্রার পথের প্রসঙ্গ তোলে। তার অভিজ্ঞতায় সে দেখেছে রাঁচির কাছে মুণ্ডা বা মুণ্ডরীদের গ্রামের একটি বাড়ির দেওয়ালচিত্র- ঘোড়ার পিঠে আদিবাসীদের একটি বাচ্চা ছেলে চলেছে তার অন্তিম গন্তব্যের উদ্দেশে, সঙ্গে পাথেয় এক ঘটি জল, খাবারের পুঁটলি ও একটি লাঠি। দীনেন্দ্রর কথায় যেন এক নতুন দর্শনের হদিশ পেল তারা। বড় মেয়ে অনুপমাই প্রথম এই প্রশ্নটি তুললো যে যদি তাদের মায়ের অন্তিম যাত্রায় তাকে কিছু দিতে হয় তবে সে কী দেবে?

একে একে সকলকেই ছুঁয়ে যায় প্রশ্নটি এবং তারা তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে মায়ের ব্যক্তিগত সম্পর্ক, স্মৃতি বা কোনো ঘটনার উল্লেখ করে মায়ের চরিত্রের বিভিন্ন গুণের অভাবপূরণ করে তাঁকে সম্পূর্ণতা দিতে থাকে।

জ্যেষ্ঠ সন্তান মাকে তার ভালোবাসার মন দিতে চায়, জ্যেষ্ঠ কন্যা অনুপমা দেয় মানুষের উচিত সাহস, দীনেন্দ্র দিতে চায় তার হৃদয়ের দৃষ্টি, কনিষ্ঠা নিরুপমা দেয় মনের ভরসা এবং কথক মাকে দিতে চান স্বার্থত্যাগের ক্ষমতা।

পাঁচ ভাইবোন মৃত্যু পরবর্তী জীবনে বিশ্বাস না করেও তারা এই দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং কল্পনা করে তাদের দান মায়ের চরিত্রের সকল অসম্পূর্ণতা পূরণ করে তাঁর অন্তিম যাত্রা নির্বিঘ্ন করবে।

সুধাময় একসময় তার মৃত্যুভয়কে জয় করতে পেরেছিল। কিন্তু ১৯৬৩তে আনন্দবাজার বার্ষিকীতে প্রকাশিত 'উদ্বেগ' গল্পে এই মৃত্যুভয় শিশিরকে দিবারাত্র তাড়া করে চলে। সুধাময়ের এই ভয়ের কারণ ছিল যক্ষা, এখানে তা কোনো দুরারোগ্য জ্বর যার পরিণতিতে ঘটে মহামারী ও মৃত্যুমিছিল। শিশির প্রতিদিন শবযাত্রা দেখে ও আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। তার শহরে প্রায় প্রতিবছরই মড়ক লাগার ইতিহাস আছে, তবু গল্পে আমরা কেবল শিশিরকেই বিচলিত হতে দেখি প্রাথমিক ভাবে। তার দুশ্চিন্তা তাকে প্রতি মুহূর্তে কুঁড়ে কুঁড়ে খায়। ডাঃ পাঠকের রিকশা গলির মধ্যে দেখেও সে কেবল সন্দেহের বশে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে এই ভেবে যে মড়ক বুঝি তার পাড়াতেও পৌঁছে গেছে। শহরের মেয়েরা বিয়ে করে এই মড়ক কবলিত শহর ছেড়ে স্থানান্তরিত হচ্ছে দেখে সে আশ্বস্ত হয়। শিশির কিন্তু সুধাময়ের মত আত্মকেন্দ্রিক নয়। সুধাময়ের আনন্দ, বিরহবেদনা কিংবা মৃত্যুভয়ের উপলব্ধি সবটাই ছিল তার আত্ম আবিষ্কারের একেকটি ধাপ। কিন্তু শিশিরের প্রধান চিন্তা শহরের মানুষের সুরক্ষা। চিঠিতে

আসানসোলের বোর্ডিং স্কুলে পাঠরত, মা মরা একমাত্র সন্তানের সর্দিকাশির খবর পেয়েও কিন্তু তাকে দেখতে যাবার কথা ভাবে না সে, এমনকি স্ত্রী মীরা যখন তাকে আশ্বাস দিয়ে বলে তার বাড়িতে কোথাও নোংরা নেই যে মহামারী প্রবেশ করবে তখনও শিশির ক্ষুব্ধ হয় এই ভেবে যে গোটা শহরের মানুষের বদলে মীরা কেবল নিজেদের নিরাপত্তার কথাই ভাবছে। অবশেষে যে উদ্বেগ এতদিন শিশিরকে তিষ্ঠতে দেয়নি, তা সঞ্চারিত হয় পৌরসভার কর্তাব্যক্তিদের মধ্যেও। এতদিনে প্রশাসনও সুরক্ষাবিধি প্রচার করতে শুরু করে। গল্পের শুরুতে শিশিরের এই মৃত্যুভয়কে অহেতুক ও তার মানসিক সংকট বলে মনে হলেও এই মৃত্যুভয় আদতে শিশিরের দায়িত্ববোধেরই পরিচয়। গল্প এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে মহামারীতে মৃত্যুর সংখ্যা যত বাড়ে ততই তার উদ্বেগের যথার্থতা প্রমাণ হয়। ক্ষমতাবানদের নির্লিপ্ত দেখে সে কেবল নিজেদের সুরক্ষার স্বার্থে শহর ত্যাগ করে না, বরং গোটা শহরবাসীর মঙ্গলচিন্তায় উপযাচক হয়ে প্রশাসনকে মড়ক প্রতিরোধ ও প্রতিকারের পরামর্শ দিয়ে চিঠি লিখলে পরিবর্তে সে অনধিকারীর তকমা ও অপমান পায়।

একই বছরে প্রকাশিত 'অপেক্ষা' গল্পটি বিষয়ের দিক থেকে পূর্বের গল্পের বিপ্রতীপ অবস্থানে দাঁড়িয়ে। এতক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু ছিল বিমূর্ত ও চেতনস্তরেই সীমিত, কিন্তু আলোচ্য গল্পে মৃত্যু কাঠামোগত ভাবে কিছুটা আকারবিশিষ্ট।

'উদ্বেগ' ও 'অপেক্ষা' উভয় গল্পই শুরু হয় পাঠককে মৃত্যুর সংবাদ জানিয়ে। প্রথম গল্পে শিশির দেখেছিল চারটে শব, পরিচিতদের মধ্যে মারা গেছিল নিশীথ হালদার, কিন্তু বর্তমান গল্পে মৃত্যু যেন প্রধান চরিত্র শিবতোষের আরো নিকটে এল। বছর বত্রিশের প্রাণবন্ত ছেলে ভুবন শিবতোষের সহকর্মী। এই সেদিন বিয়ে করেছিল সে, স্বপ্ন দেখেছিল ভালোবাসার মানুষকে সঙ্গে নিয়ে দীর্ঘজীবি হবার, হঠাৎই ব্রঙ্কোনিমোনিয়া হয়ে মারা গেল। ভুবনের মৃত্যু শিবতোষকে কেবল বিষণ্ণই করে না, জীবনের অনিত্যতা যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। ভুবনের বিধবা স্ত্রীকে সহানুভূতি জানিয়ে চিঠি লেখার সূত্রেই শিবতোষের মনে পড়ে একটি রহস্যময় চিঠির কথা যার প্রেরক কিংবা বক্তব্যের ব্যাপারে তার কিছুই মনে পড়ে না।

এই চিঠিটি খোঁজাকে কেন্দ্র করে স্ত্রী কমলার সঙ্গে শিবতোষের একাধিকবার বচসা হয় যা শিশির ও মীরার অনুরূপ। তার মনে হল সে প্রেম ও মৃত্যুর ব্যাপারে বরাবরই অবহেলা করেছে এবং অন্যমনস্ক থেকেছে। মুমূর্ষু বাবার প্রেসক্রিপশন হারিয়ে ফেলায় ওষুধ কিনতে দেরি হলে তার বাবার মৃত্যু হয়। সুরমাকে ভালোবেসেও চাকরির গরজ না দেখানোয় সুরমাও তার হাতছাড়া হয়ে যায়। কিন্তু এই চিঠিটিকে শিবতোষ কিছুতেই ভুলতে পারে না। বাড়ি ও অফিস তন্নতন্ন করে খোঁজার পরও যখন সে চিঠিটি খুঁজে পায়নি তখনই মনে পড়ে চিঠিতে উল্লিখিত তারিখ ও বারের কথা যেদিন পত্রপ্রেরক তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। কিন্তু পরপর দুদিন নির্দিষ্ট স্থানে গিয়েও দীর্ঘ অপেক্ষার পরেও তার পত্রলেখকের সঙ্গে দেখা হয় না। তার অনুপস্থিতিতে এক

অপরিচিত ব্যক্তি বাড়িতে তার খোঁজে এসেছিল শোনার পর থেকেই তার অপেক্ষা, উদ্বেগ যেন দ্বিগুণ বেড়ে যায়। এই অপেক্ষা ক্রমে যেন এক মানসিক ব্যাধি হয়ে শিবতোষের চেতনাকে অধিকার করে ফেলে। অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত শিবতোষের এক সময় মনে হয়,

> "অলৌকিক কাহিনী অশরীরী মানুষের মতন ওই মানুষটি আসে যায়, দেখা যায় না, বলা যায় না। মনের ভুল দিয়ে সে আসে কি? হয়ত আসে না।"[৪]

অবশেষে এক অন্ধকার রাতে ঘুম ভেঙে সে এই উপলব্ধিতে পৌঁছোয় যে, সে যে রহস্যময় ব্যক্তির জন্য অপেক্ষা করছে তার দেখা ততদিন সে পাবে না যতদিন না তিনি নিজে দেখা করতে চাইছেন। তিনি স্বয়ং মৃত্যু। তার চিঠি ভুবনও হয়ত পেয়েছিল। শিবতোষ পেয়েছে। সবাই পাবে। চিঠি পাঠিয়ে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন প্রত্যেকে তার নাগালের মধ্যেই আছে।

> "শিবতোষ অনুভব করতে পারল, কোনোদিন সে আসবে, অতি অবশ্যই সে আসবে। কিন্তু সে কেমন, কতদিন অপেক্ষা করতে হবে, শিবতোষ বুঝতে পারল না। শুধু শিবতোষ আজ এই মধ্যনিশীথে পরিপূর্ণ নীরবতার মধ্যে সেই অবধারিতকে অনুভব করতে পারছে।"[৫]

'নদীর জলে ধরা-ছোঁয়ার খেলা' প্রকাশিত হয়েছিল **১৯৯১** এর দেশ পত্রিকায়। এখানে মৃত্যু গল্পেরই একটি চরিত্র। এক পূর্ণিমার সন্ধ্যায় বরাকর নদীর ধারে আয়েস করে বসেছিলেন সফল ব্যবসায়ী নন্দকিশোর চৌধুরী। দীর্ঘ অসুস্থতার পরে প্রায় মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন তিনি, তাই তার নামে লাটুবাবার মন্দিরে পুজো দিতে এসেছিলেন স্ত্রী মণিমালা। জ্যোৎস্নার আলোয় জলের স্রোতের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নন্দকিশোর তন্দ্রার ঘোরে প্রবেশ করেন তার মনের অবচেতন সুড়ঙ্গে এবং স্বয়ং মৃত্যুর সঙ্গে কাল্পনিক কথোপকথনের মাধ্যমে উদ্ভাসিত হতে থাকে তার জীবনের পূর্বকথা।

লোকটি তাকে বাবা, মা কিংবা চুয়ার মৃত্যুর অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিলেও নন্দকিশোর তখনও কিন্তু তাকে চিনতে পারেননি। তার প্রশ্নের উত্তরে সে জানায়-

> "নাম একটা আছে। তা জেনে কী করবে! বললাম তো, আমি তোমাদের পাশাপাশি আছি। আমাকে তুমি দেখেছ। অনেকবার।..."[৬]

স্পষ্টতই এই ইঙ্গিত নন্দকিশোর বোঝেননি। মৃত্যুর জন্য পূর্ববর্তী গল্পদুটির প্রধান চরিত্রদের মত উদ্বেগ বা অপেক্ষা কোনোটিই নন্দকিশোরের ছিল না। মাত্র কিছুদিন আগেই মৃত্যুকে ছুঁয়ে তিনি ফিরে এসেছেন। কাজেই স্বয়ং মৃত্যুর আবির্ভাবকেও তিনি অপেক্ষকৃত সহজভাবেই নিলেন। জীবনের অনিত্যতা যেদিন শিবতোষের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছিল, সেদিন থেকেই শয়নে জাগরণে সে মৃত্যুর প্রচ্ছন্ন পদধ্বনি শুনেছে।

প্রতি মুহূর্তে অনুমান করার চেষ্টা করেছে মৃত্যু তার থেকে কতটা দূরে, ব্যর্থ হয়ে একটা চোরা আতঙ্কে সে দিন কাটিয়েছে। শিবতোষকে কতদিন অপেক্ষা করতে হবে লেখক জানাননি, তবে নন্দকিশোরের ক্ষেত্রে সেই অপেক্ষার অবসান হয়েছে চুয়ান্ন বছর বয়সে। নন্দকিশোর তাকে মহারাজ সম্বোধন করতে শুরু করে কারণ এখন থেকে তার আয়ু মৃত্যুর ইচ্ছাধীন মাত্র। তবু শেষমুহূর্তেও পাকা ব্যবসায়ীর মত সে নিজের জীবন নিয়ে সওদা করে মৃত্যুর সঙ্গে। সে বাজি ধরে যে যতক্ষণ সে সাঁতার কাটতে পারবে ততক্ষণ মৃত্যুকে অপেক্ষা করতে হবে তার জন্য। আর যদি সে মৃত্যুর চোখ এড়িয়ে ডাঙায় উঠতে পারে তবে আজ মৃত্যু শূন্য হাতে ফিরে যাবে। জলে ভেসে ভেসেই নন্দকিশোর তার ছোটবেলার প্রতিটা শোক, আঘাতের হিসেব কষতে থাকে। প্রবল দারিদ্র, টাইফয়েডে পিসির মৃত্যু, কারখানার গন্ডোগোলে কাকার মৃত্যু, দিদির আত্মহত্যা, প্রকাশ্য রাস্তায় গুন্ডাদের হাতে বাবার লাঞ্ছনা ও হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু, তারপর মায়ের উন্মাদ দশা ও মৃত্যু, চুয়ার অপঘাতে মৃত্যু- আঘাতে আঘাতে জর্জরিত নন্দকিশোর স্বেচ্ছায় সিদ্ধান্ত নেয় বাবার মত সৎ, পরিশ্রমী চরিত্র নিয়ে দরিদ্র হবার বদলে স্বার্থপর, নীতিবোধহীন, ধনী ও ক্ষমতাবান হবার। আজ তিনি তেমনই। স্বয়ং মৃত্যুকেও ঘুষ দিয়ে তাঁর আয়ু বাড়াতে চান। কিন্ত নন্দকিশোর প্রতিশোধস্পৃহার কাছে জীবনটা উৎসর্গ করে দিলেও মৃত্যুর কাছে কিন্ত অজানা থাকে না তার বুকে জমে থাকা প্রতিটা যন্ত্রণার হিসাব। সব কথা বলতে পেরে যেন ভার লাঘব হয় তাঁর। অবশেষে নন্দকিশোর বুঝতে পারলেন আর তিনি পালাতে পারবেন না, হয়ত আর তার প্রয়োজনও নেই। তাই এবার তিনি ধীরে ধীরে সাঁতার কাটতে থাকেন মৃত্যুরই পাশে, চিরকালের মত চেতনালুপ্তির অপেক্ষায়।

তথ্যসূত্র:

১। সুমনা দাস সুর, বিমল করের কথাসাহিত্য সম্পর্কের শিল্পবিন্যাস, এবং মুশায়েরা, জানুয়ারি, ২০০৯, পৃ: ৩১

২। বিমল কর, পঞ্চাশটি গল্প, আনন্দ পাবলিশার্স, অক্টোবর, ২০১৭, পৃ: ২৬২

৩। সুমনা দাস সুর, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ: ৩৭৯

৪। বিমল কর, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ: ৩৩৬

৫। ঐ পৃ: ৩৩৭

৬। ঐ পৃ: ৭১২

বৈষ্ণব দর্শনে মুক্তি

বাসুদেব হালদার
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ,
সুরেন্দ্রনাথ কলেজ ফর উইমেন

সারংক্ষেপঃ প্রাচীন যুগ থেকে ভারতীয় পটভূমিতে আধ্যাত্মিককে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং সেই প্রেক্ষাপটে ভারতীয় চিন্তাধারার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। আধ্যাত্মিকতার আদর্শে মানুষের নৈতিক চরিত্র যেমন গঠিত হয় তেমনি পার্থিব সুখলাভের আদর্শ থেকে পৃথক করে মানুষকে সুখ-দুঃখের পরাপারে পার্থিব সুখের পরিবর্তে পারলৌকিক সুখ কামনা করে, যাকে কেন্দ্র করে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র গড়ে উঠেছে। আর এই কারণে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রকে মোক্ষবাদী শাস্ত্র নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। যদিও মোক্ষবাদী দর্শনশাস্ত্র হিসাবে বৈদিক ও অবৈদিক দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়; তথাপি তাঁরা প্রত্যেকেই মোক্ষ বা মুক্তিকে মানব জীবনের চরম ও পরম পুরুষার্থ বলে মনে করেন, ভক্তিবাদী দার্শনিকগণও মুক্তিকেই পরম পুরুষার্থ বলে থাকে। বৈদিক ও অবৈদিক সকলেই মুক্তি বা মোক্ষকে মুক্তিকে সাধ্য বলেছেন, ভক্তি মুক্তির সাধন। ভক্তি উপায়, মুক্তি উপেয়। কিন্তু বৈদিক ও অবৈদিক সকল শাস্ত্রে প্রচলিত মতের সঙ্গে সহমত পোষণ না করে বৈষ্ণবাচার্য শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ভক্তি অর্থাৎ প্রেমভক্তিকে পরম পুরুষার্থ বলে উল্লেখ করেছেন। তাই গোড়ীয় বৈষ্ণব মতে ভক্তিপ্রেমই মানব জীবনের পরম লক্ষ্য হওয়া উচিত। অতএব আমার এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় হল – ভক্তিই পরম পুরুষার্থ - মুক্তির জন্য ভক্তি নয়, ভক্তির জন্যই মুক্তি।

সূচক শব্দঃ আধ্যাত্মিকতা, মুক্তি, ভক্তি, প্রেম।

প্রাচীন যুগ থেকে ভারতীয় চিন্তাধারার পটভূমিতে ধর্মীয়ভাবের গুরুত্ব অপরিসীম। ধর্মীয়ভাবের গুরুত্ব পর্যালোচনা করলে ভারতীয় চিন্তাধারার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। আধ্যাত্মিকরাকে সামনে রেখে দর্শনচর্চার পিছনে মানুষের জীবনকে উন্নত করার একটি নির্দিষ্ট প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। আধ্যাত্মিকতার আদর্শ মানুষের নৈতিক আদর্শবান করে তোলে এবং পার্থিব সুখলাভের আদর্শ থেকে পৃথক করে মানুষকে সুখ-দুঃখের পরাপারে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়। ভারতীয় দর্শন চর্চার নৈতিক আদর্শ মানুষকে শুধু যে সুন্দর নীতিক চরিত্র লাভের অধিকারী করতে চেয়েছে তাই নয়, তাকে যুক্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করার সাথে সাথে মানব জীবনের লক্ষ্যবস্তু অনুসন্ধান করতে সাহায্য করেছে।

ভারতীয় দর্শনে মানবজীবনের একাধিক লক্ষ্য বা উপায়ের কথা বলা হয় যাকে 'পুরুষার্থ' নামে অভিহিত করা হয়। পুরুষার্থ বলতে অভীষ্ট বা কাঙ্ক্ষিত বস্তুকে বোঝায়। পুরুষার্থের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে "যেন প্রযুক্তঃ প্রবর্ততে, স পুরুষার্থঃ।"[১] অর্থাৎ যার দ্বারা প্রযুক্ত, অর্থাৎ যত্নবান হয়ে পুরুষ সেটিকে সাধনে সচেষ্ট হয় তাই পুরুষার্থ। মহর্ষি জৈমিনি মীমাংসাসূত্র গ্রন্থে পুরুষার্থের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেছেন, "যস্মিন্ প্রীতিঃ পুরুষস্য তস্য লিপ্সার্থলক্ষণম্ অবিভক্তত্বাৎ।" (৪/১/২) অর্থাৎ যেখানে বা যে বিষয়ে মানুষের প্রীতি নিহিত থাকে সেটির কামনাই পুরুষার্থ।[২] পার্থিব মানুষের সুখই কামনার বিষয়। সুখ লাভের জন্য সে সদাই সচেষ্ট। তবে কেউ কেউ জগৎ সংসারকে অনিত্য পার্থিব সুখের পরিবর্তে পারলৌকিক সুখ কামনা করে। ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে মানুষ সুখের সন্ধান করে থাকে। প্রচলিত ধারণা অনুসারে প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ – এই চতুবর্গ পুরুষার্থকে সুখ প্রাপ্তির উপায় রূপে বর্ণনা করেছেন, যদিও পুরুষার্থের সংখ্যা নিয়ে বৈদিক ও অবৈদিক দার্শনিক সম্প্রদায়দের মধ্যে মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এমনকি পরম পুরুষার্থ মোক্ষ বা মুক্তির স্বরূপ নিয়েও দার্শনিকদের মধ্যে মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু, পুরুষার্থ নিয়ে মতপার্থক্য থাকলেও মোক্ষ বা মুক্তিই মানব জীবনের পরম বা চরম পুরুষার্থ, সে বিষয়ে কোন মতভেদ নেই; এমনকি ভক্তিবাদী দার্শনিকগনও এইরূপ মতপোষন করেন যাঁদের মতে ভক্তি মুক্তির সাধন। কিন্তু প্রচলিত মতের থেকে ভিন্ন মত পোষণ করে বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বলেন, ভক্তিই পরমপুরুষার্থ – মুক্তির জন্য ভক্তি নয়, ভক্তির জন্যই মুক্তি,[৩] যা এই প্রবন্ধের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। এই প্রবন্ধের আলোচনাকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে – ১) মুক্তি সম্পর্কে মোক্ষবাদীদের মত, ২) পঞ্চম পুরুষার্থ রূপে ভক্তির স্বরূপ।

১

ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ – এই চারটি হল পুরুষার্থ। জীবনের সম্পূর্ণতা লাভের জন্য এই চারটি পুরুষার্থের প্রত্যেকটির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে, তবে ধর্মকে বাদ দিয়ে কোন পুরুষার্থকে যথাযথ ভাবে পালন করা সম্ভব নয় এবং পরিশেষে মোক্ষলাভও অসম্ভব, যা ভারতীয় দর্শনের পরম প্রতিপাদ্য বিষয়। ধর্ম হল সকল পুরুষার্থের নিয়ন্ত্রক, বিশেষ করে অর্থ এবং কামের। কারণ অনিয়ন্ত্রিত অর্থ এবং কাম প্রাপ্তির ইচ্ছা পরম পুরুষার্থলাভের প্রতিবন্ধক। মোক্ষলাভের ইচ্ছা হেতু ধর্ম পালন অতি আবশ্যক। এখানে 'ধর্ম' শব্দটির অর্থ বিশেষ গুরুত্ব পূর্ণ। কারণ 'ধর্ম' শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 'ধর্ম' শব্দটি 'ধৃ' ধাতুর সঙ্গে 'মন্' প্রত্যয় যোগে উৎপন্ন হয়েছে, যার অর্থ ধরে রাখা বা ধারণ করা। মহাভারতের শান্তিপর্ব অনুসারে 'ধর্ম' শব্দের অর্থ হল "ধারণাদ্ ধর্মম্ ইত্যাহুর্ধর্মেণ বিধৃতাঃ প্রজাঃ। (১০৬.১৫) অর্থাৎ ধর্ম প্রজাকে ধারণ করে।[৪] ধর্মকে বলা হয়েছে 'সর্বস্য ধারকম্', অর্থাৎ ধর্ম সবকিছুকেই ধারণ করে। ধর্ম প্রতিটি মানুষকে যেমন ধারণ করে তেমনি সমগ্র মানব সমাজকে ধারণ করতে সমর্থ

হয়। ভারতীয় চিন্তাধারা অনুযায়ী ধর্ম প্রতিটি মানুষকে ধারণ করে এবং তার ফলে সমগ্র মানব সমাজকে ধারণ করতে সমর্থ হয়। ব্যক্তি ও সমাজের অস্তিত্ব ও ধারাবাহিকতার জন্য তাই ধর্মপালন করা কর্তব্য। কর্তব্য থেকে বিচ্যুতি মানুষ ও সমাজকে ধ্বংস করে। ধর্ম সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে 'ধর্ম এব হতো হন্তি, ধর্ম রক্ষিত রক্ষিতঃ' (মহাভারত : বনপর্ব, ৩১২.১২৮) অর্থাৎ ধর্ম বিনষ্ট হলে বিনাশকারীকে বিনাশ করে, আর ধর্ম রক্ষিত হলে রক্ষা করে। সুতরাং মোক্ষলাভের ইচ্ছা হেতু ধর্ম অবশ্যপালনীয় পুরুষার্থ।

শ্রুতির যুগ থেকে আরম্ভ করে পৌরাণিক যুগ পর্য্যন্ত সুদীর্ঘকাল ধরে ভারতীয় দার্শনিক চিন্তায় মোক্ষ বা দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি লক্ষ্যরূপে প্রতিভাত হয়ে থাকে। আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি বা সমস্ত প্রকার বন্ধন থেকে মুক্তিই হিন্দু-সভ্যতার চরম বা পরম লক্ষ্য। দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির উপায় রূপে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি – এই তিনটি সাধন বিষয়কে কেন্দ্র করে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র তিনটি ভিন্ন ধারার উৎপন্ন হয়েছে। যেমন কর্ম্মধারায় প্রভাবিত ভারতীয় দর্শন – পূর্বমীমাংসা দর্শন নামে পরিচিত হয়েছিল। জ্ঞানধারায় প্রভাবিত হয়ে ভারতীয় দর্শন – উত্তরমীমাংসা নামে পরিচিত হয়েছিল। ভক্তিধারায় প্রভাবিত হয়ে ভারতীয় দর্শন আধ্যাত্মশাস্ত্র বা ঐকান্তিক দর্শন নামে অভিহিত হয়ে থাকে। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি – এই তিনটি সাধন বিষয়কে কেন্দ্র করে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে তিনটি ভিন্ন ধারার উৎপন্ন হলেও যেহেতু প্রাচীন শাস্ত্র বেদ ও উপনিষদে কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের গুরুত্ব থাকায় তদানুসারে পূর্বমীমাংসা এবং উত্তরমীমাংসা উৎপন্ন হয়, এবং বেদ ও উপনিষদে ভক্তিযোগের উল্লেখ থাকায় পরবর্তিকালে সপ্তদশ শতকে দক্ষিণ ভারতে ভক্তিবাদী দর্শনের সূচনা হয়ে ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতে প্রসার লাভ করে, যার ফলশ্রুতি রূপে ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণববাদের সৃষ্টি হয়। কিন্তু বেদ ও উপনিষদে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের গুরুত্ব ব্যতিরাকে এমন অনেক ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র উৎপন্ন হয়েছে যাদের কাছে 'মোক্ষ'ই হল পরম পুরুষার্থ। বস্তুতঃ এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সমস্ত ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে (চার্বাক ছাড়া) মোক্ষ বা মুক্তিকে পরম পুরুষার্থ বলে স্বীকার করা হলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্রে মোক্ষ বা মুক্তিকে পরম পুরুষার্থ বলে স্বীকার না করে 'প্রেম বা ভক্তি'কে পঞ্চম পুরুষার্থ রূপে স্বীকার করা হয়েছে।

'মুক্তি' শব্দটি মুচ্ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। বৈয়াকরণ পাণিনি বলেছেন "মুচ্ লু মোক্ষণে" অর্থাৎ 'মুচ্' ধাতুর অর্থ 'মোক্ষণ'।[৫] 'মুক্তিকে' দুইভাগে বিভক্ত করা হয় – মুখ্য ও গৌণ মুক্তি। যদিও মুক্তির এইরূপ বিভাগ খুবই সাপেক্ষ। কারণ কোন্ মুক্তিকে মুখ্য এবং কোন্ মুক্তিকে গৌণ বলা হবে তা নির্ভর করে কোন সম্প্রদায় মুক্তির কোন্ পরিভাষাকে গুরুত্ব আরোপ করবেন তার উপর। তথাপি মুখ্য মুক্তিকে নির্ব্বাণ বা কৈবল্য বলা হয়।[৬] মুখ্যমুক্তি লাভ হলে জীবের সকল প্রকার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়। যদিও ভারতীয় বৈদিক ও অবৈদিক দর্শনে মুক্তির বিভিন্ন পর্যায়শব্দের দ্বারা

'মুক্তি'র স্বরূপ ব্যক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। 'অমরকোষে' মুক্তির বিভিন্ন পর্যায়শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন, কৈবল্য, নির্ব্বাণ, শ্রেয়, নীঃশ্রেয়স্, অমৃত, মোক্ষ ও অপবর্গ।[৭] অর্থাৎ বৈদিক ও অবৈদিক দর্শনে মুক্তির স্বরূপ নিয়ে মতপার্থক্য থাকলেও মুক্তি বা মোক্ষ সম্পর্কে তাদের সারকথা হল ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি, যাকে নির্ব্বাণ বা কৈবল্য বলা হয়। উপনিষদে কৈবল্যরূপ মুক্তিকে যথার্থ মুক্তি বলা হয়েছে, কারণ এই মুক্তি প্রাপ্তির পর আর পুনরায় জীবের জন্মাদি দুঃখ ভোগ করতে হয় না। সাংখ্য, পাতঞ্জল, নৈয়ায়িক, মীমাংসক, অদ্বৈত বেদান্তী, বৌদ্ধ ও জৈন প্রভৃতি দার্শনিকগণ নির্ব্বাণ-মুক্তিকেই পরম পুরুষার্থ বলে স্বীকার করেন।[৮]

গৌণমুক্তি বলতে সাযুজ্য, সারূপ্য, সালোক্য, সার্ষ্টি ও সামীপ্য – এই পাঁচ প্রকার মুক্তির কথা বলা হয়। সাযুজ্য মুক্তির কথা যাঁরা বলেন তাঁদের মতে 'সাযুজ্য' শব্দের অর্থ সংযুক্ত হওয়া বোঝায়, অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হওয়াকে বোঝায়। কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হওয়া বলতে ঈশ্বরের সঙ্গে বিলীন হওয়া অর্থে বোঝায় না। কারণ তাঁদের মতে জীব অনু বিশেষ, কিন্তু ঈশ্বর বিভু; তাই জীব ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হলেও ঈশ্বর হয় না, নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে। সারূপ্য মুক্তির কথা যাঁরা বলেন তাঁদের মতে 'সারূপ্য' শব্দের অর্থ সমানরূপতে প্রাপ্তি হওয়া বোঝায়। সমানরূপতা বলতে ভক্ত এবং ঈশ্বর সমরূপ লাভ করে থাকেন। সালোক্য মুক্তির কথা যাঁরা বলেন তাঁদের মতে 'সালোক্য' শব্দের অর্থ সমানলোক; অর্থৎ জীব এবং ঈশ্বর একই লোকে অবস্থান করেন। কিন্তু ঈশ্বরের বৈকুণ্ঠে জীব জীবস্বরূপেই বাস করেন। সার্ষ্টি মুক্তির কথা যাঁরা বলেন তাঁদের মতে 'সার্ষ্টি' শব্দের অর্থ ঈশ্বরের সমান শক্তি বা ঐশ্বর্য লাভ। সামীপ্য মুক্তির কথা যাঁরা বলেন তাঁদের মতে 'সামীপ্য' শব্দের অর্থ ঈশ্বরের নিকট বর্তমান থাকাকে বোঝায়।[৯] যে সকল দার্শনিক বা দার্শনিক সম্প্রদায় পরমেশ্বরকে সাকার ও নিয়ত লোকবিশেষে অবস্থিত বলে স্বীকার করেন, তাদের মতানুসারে উক্ত পাঁচ প্রকার গৌণমুক্তির বর্ণনা করা হয়ে থাকে। এই মতের সমর্থক হলেন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজাচার্য, দ্বৈতবাদী মাধ্বাচার্য, দৈতাদৈতবাদী নিম্বার্কচার্য্য, বিষ্ণুস্বামী, শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বল্লভাচার্য্য প্রমুখ ভক্তি সম্প্রদায়ের মহাপুরুষগণ ভক্তিকে মুক্তির উপায়রূপে গ্রহণ করেছিলেন, যাঁদের মতে পঞ্চবিধ মুক্তির মধ্যে কোন একটি জীবনে লাভ করতে পারলেই জীবের পরমপুরুষার্থ মুক্তি লাভ হয়।

২

শ্রুতি-স্মৃতিতে উল্লেখ আছে যে সাযুজ্য, সারূপ্য, সালোক্য, সার্ষ্টি ও সামীপ্য – এই পাঁচ প্রকার মুক্তির পারমার্থিকতা গৌরীয়মতে স্বীকৃত। এই পাঁচ প্রকার মুক্তির প্রত্যেকটিকে অনাবৃত্তি লক্ষণা বলেছেন। গৌরীয় বৈষ্ণবমতে যাই মুক্তি তাই একই রকম মায়ার বন্ধন থেকে সম্যকরূপে অব্যহতি; এর কোন প্রকার রকমভেদ থাকতে পারে না। মুক্ত অবস্থায় মুক্তজীবের অবস্থানভেদই পঞ্চবিধ মুক্তি। গৌরীয় বৈষ্ণবাচার্যগণের মতে

পঞ্চবিধ মুক্তির পারমার্থিকতা থাকলেও এগুলির কোনটিরই পারমার্থিকতা নেই, ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা প্রাপ্তিই হল পরমপুরুষার্থ।[১০]

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ব্যতিরেকে সকল ভক্তিবাদী মহাপুরুষগণ, এমনকি বৈদিক ও অবৈদিক সকলেই মুক্তি বা মোক্ষকে সাধ্য বলেছেন, ভক্তি মুক্তির সাধন। ভক্তি উপায়, মুক্তি উপেয়।[১১] সুতরাং এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, বৈদিক, আবৈদিক এবং ভক্তিবাদী বেদান্তী দার্শনিকগণ মুক্তিকে পরম পুরুষার্থ বলে মনে করেন। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সর্বপ্রথম মুক্তি বা মোক্ষকে পরম পুরুষার্থ বলে স্বীকার না করে ভক্তি বা ভগবৎ প্রেমকে পরম পুরুষার্থ বলে প্রচার করেন। প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌড়াঙ্গ সনাতন গোস্বামীকে বলেছিলেন ‘শুনো সোনাতন এবে প্রেম প্রয়োজন’। প্রেম প্রসঙ্গে ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ স্বামী বিবেকানন্দকে বলেছিলেন ‘কতদিনে হবে সেই প্রেমের সঞ্চার’। এই প্রেম হল এক অপার্থিব বস্তু যা দেবতা প্রিয় এবং প্রিয় দেবতা হয়ে যায়। বৈষ্ণব দর্শনে মুক্তিকে ‘কৈতব’ প্রধান বলা হয়েছে এবং মুক্তির স্থান ধর্মেরও নিচে বলা হয়েছে। কারণ এই মুক্তি কখনই গোবিন্দের পাদপদ্ম পাইয়ে দিতে পারে না। এই কারণেই আত্মমুক্তি বা মোক্ষের সাধনাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান না করে চতুর্বর্গের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট স্বীকার করে বৈষ্ণব সাহিত্য দর্শন চৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে –

তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান।। (১/১/৫১)

শুধু তাই নয় বৈষ্ণব দর্শনে ভোগ ও মুক্তির বাসনাকে পিশাচের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কারণ যে হৃদয়ে পিশাচীরূপ মুক্তি বাসনা থাকে সেই হৃদয়ে কখনো শুদ্ধ ভক্তিজাত কৃষ্ণপ্রেম থাকতে পারে না। এই প্রসঙ্গে শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বলেছেন –

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ।। (১/২/২২)

ধর্ম, অর্থ ও কাম – এই ত্রিবিধ পুরুষার্থের সাধনায় জীবের আত্মসুখের ইচ্ছা জাগ্রত হলেও ঈশ্বর সেবা তথা মুক্তি লাভের প্রবল ইচ্ছা হৃদেয়ে থেকে যায়, কেননা এই ত্রিবর্গের পালনের দ্বারা মুক্তি লাভ বা পুর্ণজন্মের সম্ভাবনা বিলুপ্ত হয়ে যায় না। কিন্তু মোক্ষ লাভের সাধনায় জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভিন্ন জ্ঞান হয় এবং পুর্ণজন্মের সম্ভাবনা লোপ পায়। ফলে মোক্ষপ্রাপ্তিদের কাছে ঈশ্বরের সেবার মাধ্যমে ভক্তি সাধনার সকল পথ রুদ্ধ হয়ে যায়, কেননা তার জন্য স্বতন্ত্র দেহ-আত্মার উপস্থিত থাকা বিশেষ প্রয়োজন। তাই বৈষ্ণব দর্শনে মোক্ষ লাভের বাসনাকে পিশাচী বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের অন্যত্র শুদ্ধ ভক্তির স্বরপ ব্যখ্যা হেতু বলেছেন –

অন্যাভিলষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মদ্যেনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।।

এইভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বৈদিক জ্ঞানকাণ্ডবাদী এবং কর্মকাণ্ডবাদী দর্শন সম্প্রদায়দের অভিপ্রেত মুক্তিকে অস্বীকার করে প্রেমের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন, অর্থাৎ কৃষ্ণ বিষয়ক প্রেমই হল গৌড়ীয় মতে পরমপুরুষার্থ; এই প্রেমে জীবের নিজসুখ বাসনার বা দুঃখ নিবৃত্তিরূপ বাসনার, এমনকি মোক্ষবাসনারও লেশমাত্র থাকে না। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে প্রেমের লক্ষণ হচ্ছে কেবলমাত্র কৃষ্ণপ্রীতি; তারা চতুর্বর্গরূপ পুরুষার্থকে চান না। কারণ তাতে রসাভাস ঘটে, যার দ্বারা রসনিষ্পত্তি হয় না। যেমন হনুমানকে যখন রামচন্দ্র মোক্ষ দান করার কথা বলেন তখন তার উত্তরে হনুমান বলেন তিনি মোক্ষ চান না। কারণ যে মোক্ষে প্রভু ও ভক্তের বিভেদ দূর করে তা তিনি চাননি। এই একই যুক্তিতে বৈষ্ণব দর্শনে মোক্ষকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করা হয়েছে।

বৈষ্ণব দর্শনে যে কৃষ্ণভক্তি রূপ প্রেমের কথা বলা হয়েছে তার দ্বারাই পারমার্থিক রসস্বাদন হতে পারে, ভোগস্পৃহা বা মোক্ষের স্পৃহার দ্বারা পারমার্থিক রসস্বাদন হতে পারে না, বরং তা পারমার্থিক রসস্বাদনের প্রতিকূল। মনুষ্যত্বের পূর্ণতা যেমন ভোগস্পৃহা ও ভোগসাধনের সামগ্রী সম্পাদনের উপর নির্ভর করে না, তেমনি মোক্ষস্পৃহা ও মোক্ষের সাধনস্বরূপ অদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞান-সম্পাদনের উপরও মনুষ্যত্বের পূর্ণতা বা সফলতা নির্ভর করে না। পারমার্থিক রসের নিরন্তর আস্বাদনই মানব জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করে থাকে। কারণ, এই পারমার্থিক রসের আস্বাদনেই সকল প্রকার বিশুদ্ধ মনোবৃত্তির পরিপূর্ণ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের পরিপূর্ণতা লাভ হয়, এবং সেই পারমার্থিক রসই হল ভগবদ্‌ভক্তি। এই ভক্তির প্রভাবে রসস্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে মমত্ববুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। কোন ব্যক্তির হৃদয়ে এই ভক্তির উদয় হলে তার জীবন থেকে দেহাত্মাভিমান দূরীভূত হয়ে, সকল প্রকার ক্লেশ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে এবং বিশ্বজনীন প্রেমের উদয় হয়, তখন তার জীবনে ভোগস্পৃহা বা মোক্ষের স্পৃহা থাকে না।[১২] এইস্থলেই জীব সম্যকরূপে 'রসং হ্যেবায়ং লব্ধা আনন্দী' লাভ করতে পারেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছার অপর নাম প্রেম। আর এই কৃষ্ণভক্তি – প্রেমরূপ সর্ব্বসাধ্যসার। 'তত্ত্ব-বস্তু – কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-ভক্তি প্রেমরূপ'। "ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি" – ভক্তিই সাধকের কাছে ভগবানকে প্রকাশ করায়। আর ভক্তি বা প্রীতি হলদিনীর সারভূত অংশ – সেজন্যই কৃষ্ণরতি আনন্দরূপা – 'রতিরানন্দরূপৈব'। নিত্যসিদ্ধ ভক্ত-চিত্তে এই কৃষ্ণরতি চিরন্তন ও স্বতঃস্ফূর্ত।[১৩] কৃষ্ণপ্রেম ভজনের জন্য সাধককে সংসার ত্যাগপূর্বক একান্তে গিয়ে সমস্ত প্রকার পারিপার্শ্বিক সুখে-দুঃখে সহানুভূতি-বিরহিত হয়ে কেবল নিজের জন্যই আনন্দ অনুভব করার সাধনা নয়। এই সাধনা সংসারের সকল জীবের মধ্যে থেকে বিশুদ্ধ চিত্তে কৃষ্ণ ভজনা, কৃষ্ণ নাম-কির্তন করাই সাধনা। এই প্রসঙ্গে গীতায় শ্রীভগবান্ বলেছেন –

মন্মানা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামৈবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে।। (৬৫/১৮)

অর্থাৎ আমাতে মন সমর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমাকে পূজা কর, আমাকে নমস্কার কর। তুমি আমার প্রিয়। তোমাকে সত্য বলি – তুমি আমাকে পাবে। তাই বৈষ্ণব দর্শনে সংসারের কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করে শুদ্ধভক্তি-চিত্তে ভগবান কৃষ্ণ সাধনার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সাধারণ জীবের ক্ষেত্রে সংসার ত্যাগ না করে সংসারের মধ্যে থেকে কীভাবে কৃষ্ণের সাধনা সম্ভব? এই প্রসঙ্গে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছেন, "সব কাজ করবে কিন্তু মন ঈশ্বরেতে থাকবে"।[১৪] অর্থাৎ সংসারে থেকে সংসারের সকল কর্তব্য পালন করলেও মন সদা-সর্বদা ঈশ্বর চিন্তায় ব্যাকুল থাকবে। এই প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামী বলেন –

শুদ্ধভক্তি হৈতেহয় প্রেমের উৎপন্ন।
অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে লক্ষণ।।
অন্যবাঞ্ছা অন্যপূজা ছাড়ি জ্ঞান কর্ম।
অনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয় কৃষ্ণানুশীলন।।

অর্থাৎ মনের সমস্ত বাসনা, জ্ঞান, কর্ম, ইচ্ছা ছেড়ে কেবল সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে শুদ্ধভক্তি চিত্তে কৃষ্ণানুশীলন সাধন করলে প্রেমের উদয় হয়। শুদ্ধভক্তির মধ্য দিয়ে উদিত প্রেমের দ্বারা পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করাই হল জীব জগতের চরম ও পরম কাম্য।

তথ্যসূত্র :

১। শ্রী পঞ্চানন শাস্ত্রী, চার্বাক দর্শনম্, পৃঃ ১৬।
২। শ্রী সুখময় ভট্টাচার্য, পূর্বমীমাংসা দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৩, পৃঃ-৯৪।
৩। মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ, বাংলার বৈষ্ণব দর্শন, শ্রীগুরু লাইব্রেরী, কলিকাতা-০৬, পৃঃ-১৬৫।
৪। পণ্ডিত দত্ত শাস্ত্রী, রামনারায়ণ (অনুবাদক), মহাভারত – গীতাপ্রেস সংস্করণ (৫ম খণ্ড)
৫। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী বিজয় ভূষণ, ভারতীয়দর্শনে মুক্তিবাদ, সাধনসমর কার্য্যালয়, ২০১ মুক্তারাম্বাবু স্ট্রীট, কলিকাতা -১২, পৃঃ-৫।
৬। তর্কভূষণ, প্রমথনাথ, বাংলার বৈষ্ণব দর্শন, শ্রীগুরু লাইব্রেরী, কলিকাতা-০৬, পৃঃ-১৮০।
৭। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী বিজয় ভূষণ, ভারতীয়দর্শনে মুক্তিবাদ, সাধনসমর কার্য্যালয়, ২০১ মুক্তারাম্বাবু স্ট্রীট, কলিকাতা -১২, পৃঃ-৯।
৮। মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ, বাংলার বৈষ্ণব দর্শন, শ্রীগুরু লাইব্রেরী, কলিকাতা-০৬, পৃঃ-১৬৫।
৯। চ্যাটার্জী, সুধীর রঞ্জন, ভারতীয় দর্শন প্রস্থানে বৈষ্ণব সাধনার ধারা,

১০। নাথ, শ্রীরাধাগোবিন্দ, গৌরীয় বৈষ্ণব্দর্শন, প্রথম খণ্ড, সাধনা প্রকাশনী, ১৯৮০, পৃঃ-১৩০।
১১। মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ, বাংলার বৈষ্ণব দর্শন, শ্রীগুরু লাইব্রেরী, কলিকাতা-০৬,, পৃঃ-১৭।
১২। মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ, বাংলার বৈষ্ণব দর্শন, শ্রীগুরু লাইব্রেরী, কলিকাতা-০৬, পৃঃ-৪১।
১৩। গোস্বামী, সনাতন, বৈষ্ণবপদাবলী পরিচয়, পৃঃ-৩৭।
১৪। শ্রীম কথিত শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (অখণ্ড), পূর্ণ প্রকাশন, কলিকাতা – ০৯, পৃঃ-১২।

‘সূর্য-দীঘল বাড়ী’ : বহুস্বরের সঙ্কট

মুঈদুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
সুন্দরবন মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: আবু ইসহাকের (১৯২৬-২০০৩) 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' (১৯৫৫) বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। স্বাধীনতা-পূর্ব দুর্ভিক্ষ ও সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত সময়-পর্বে মুসলমান নারি ও পুরুষের সংকট মনস্তাত্ত্বিক আলোকে উন্মোচিত হয়েছে। একদিকে ধর্ম-কুসংস্কার ও ইমামের ফতোয়া, অন্যদিকে ক্ষুধা ও সন্তানসন্ততির অসহায় মুখ- বহুরৈখিক টানাপোড়েনে লেখক নির্মাণ করেছেন চরিত্রগুলি। বিপর্যস্ত আর্থ-সামাজিক-মানসিক ঘাত-প্রতিঘাতের পরিসরে তাঁর চরিত্ররা দিশেহারা। ধর্মের চোখরাঙানি, সামাজিক মর্যাদা ও আর্থিক ক্ষুধা—কোনটাকে জয়গুন মান্যতা দেবে—এই সমূহ দ্বন্দ্ব উপন্যাসে ফুটে উঠেছে।

আমরা জানি, পূর্ব ও পশ্চিম সূর্য উদয়াস্তের দিক। তাই পূর্ব-পশ্চিম প্রসারী বাড়ির নাম হলো সূর্য-দীঘল বাড়ী। পরিত্যক্ত ভিটে 'সূর্য-দীঘল বাড়ী’তে কেউ বসবাস করলে, গ্রামের মানুষের অন্ধবিশ্বাস, বাতি জ্বালানোর মতো কেউ থাকে না। এরকম বাড়িতে জয়গুন থাকে কোন্ সাহসে? লেখক ধীরে ধীরে উন্মোচন করেছেন সেই আখ্যান। স্বামী-পরিত্যক্তা জয়গুন সন্তানের মুখে দুমুঠো অন্ন জোগাতে ঘরের বাইরে পা দেয়। ট্রেনে চেপে ময়মনসিংহ থেকে চাল কিনে আবার গ্রামে বিক্রি করা, বাড়ি বাড়ি ধান লেপা, ধান কোটা তার নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম। বিভিন্ন রকমের চাল কিনে একটা প্যাকেটে রেখে ‘ভিককার চাউল' প্রতিপন্ন করে ‘টিটি'র হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে দুঃসাহসিক কাজও করেছে। জয়গুনের হাতে পান খাওয়ার অজুহাতে জোবেদ আলী বর্ষণ-মুখর রাতে তার দিকে কামনার হাত বাড়িয়ে দেয়। এসব দেখতে দেখতে তার জীবন-সংগ্রাম আরও কঠোর হয়েছে। তার সম্পর্কে মসজিদের ইমামের ধারণা সে ‘বেপর্দা আওরতের চীজ'। জয়গুণ ইমাম সাহেবের হাসের ডিম পাঠালে ইমাম তা নিতে চায় না ‘বেপর্দা আওরতের চীজ' বলে। কিশোর সন্তান হাসু যখন বলে, 'তুমি আর বাইরে যাইও না, মা। মাইনষে কথা কয়, বেপর্দা...।' জয়গুনের অগ্নিমূর্তি গর্জে ওঠে, “খাইট্যা খাইমু। কেওরডা চুরি কইর্‌যাও খাই না; খ'রাত কইর্‌যাও খাই না। কউক না, যার মনে যা...। পরক্ষণে আবার ধর্মের অন্ধশাসন তার মস্তকে কুঠারাঘাত করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ‘ধর্মের অনুশাসন সে ভুলে যায় এক মুহূর্তে। জীবনধারণের কাছে ধর্মের বারণ তুচ্ছ হয়ে যায়, মিথ্যে হয়ে যায় তার কাছে’। আর এখানেই এই গ্রাম্য অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশে গড়ে ওঠা নারির আধুনিক মানস প্রতিষ্ঠা পায়।

বলাবাহুল্য, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিপর্যস্ত অবস্থা, পঞ্চাশের মন্বন্তর, ছেচল্লিশের দাঙ্গা, সাতচল্লিশের দেশভাগ ইত্যাদি ঘটনাবলী গ্রাম-বাংলার দরিদ্র মানুষের নিষ্ঠুর জীবন-সংগ্রাম, তাদের আশা-আকাঙ্খা, পাকিস্তান-সৃষ্টির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, স্বাধীনতার সুফল-কুফল– একাধিক উদ্বেগ জনমানসে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল তারই বয়ন 'সূর্য-দীঘল বাড়ী'।

সূচক শব্দ : দেশভাগ, স্বাধীনতা, দুর্ভিক্ষ, সঙ্কট, ধর্ম, কুসংস্কার।

ক্ষুধার রাজ্যে মানুষ বস্তুবাদীই হয়। ক্ষুধার কাছে কোনো জাতপাত, আইন, ধর্ম, ইমাম-মোড়োল-মাতব্বরের ফরমায়েশ খাটে না, যার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আবু ইসহাকের (১৯২৬-২০০৩) 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' (১৯৫৫)। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। স্বাধীনতা-পূর্ব দুর্ভিক্ষ ও সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত সময়-পর্বে মুসলমান নারি ও পুরুষের সংকট মনস্তাত্ত্বিক আলোকে উন্মোচিত হয়েছে। একদিকে ধর্ম-কুসংস্কার ও ইমামের ফতোয়া, অন্যদিকে ক্ষুধা ও সন্তানসন্ততির অসহায় মুখ- বহুরৈখিক টানাপোড়েনে লেখক নির্মাণ করেছেন চরিত্রগুলি। বিপর্যস্ত আর্থ-সামাজিক-মানসিক ঘাত-প্রতিঘাতের পরিসরে তাঁর চরিত্ররা দিশেহারা। ধর্মের চোখরাঙানি, সামাজিক মর্যাদা ও আর্থিক ক্ষুধা—কোনটাকে জয়গুন মান্যতা দেবে—এই সমূহ দ্বন্দ্ব উপন্যাসে ফুটে উঠেছে।

লেখকের স্মৃতিকথা থেকে জানতে পারি, চাকরিসূত্রে নারায়ণগঞ্জে থাকাকালীন ১৯৪৭ সালে উপন্যাস রচনায় হাত দেন। ১৯৪৮-এ বদলি হয়ে পাবনাতে আসেন এবং এখানেই শেষ করেন 'সূর্য-দীঘল বাড়ী', ৪৮-এর আগস্টে। ১৯৫১-৫২ সালে কবি গোলাম মোস্তাফা সম্পাদিত মাসিক 'নওবাহার' পত্রিকায় এটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। অতঃপর ১৯৫৫ সালে কলকাতার 'নবযুগ প্রকাশনী' থেকে প্রথম বই আকারে বের হয়।

আমরা জানি, পূর্ব ও পশ্চিম সূর্য উদয়াস্তের দিক। তাই পূর্ব-পশ্চিম প্রসারী বাড়ির নাম হলো সূর্য-দীঘল বাড়ী। পরিত্যক্ত ভিটে 'সূর্য-দীঘল বাড়ী'তে কেউ বসবাস করলে, গ্রামের মানুষের অন্ধবিশ্বাস, বাতি জ্বালানোর মতো কেউ থাকে না। এরকম বাড়িতে জয়গুন থাকে কোন্ সাহসে? লেখক ধীরে ধীরে উন্মোচন করেছেন সেই আখ্যান। স্বামী-পরিত্যক্তা জয়গুন সন্তানের মুখে দুমুঠো অন্ন জোগাতে ঘরের বাইরে পা দেয়। ট্রেনে চেপে ময়মনসিংহ থেকে চাল কিনে আবার গ্রামে বিক্রি করা, বাড়ি বাড়ি ধান লেপা, ধান কোটা তার নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম। বিভিন্ন রকমের চাল কিনে একটা প্যাকেটে রেখে 'ভিককার চাউল' প্রতিপন্ন করে 'টিটি'র হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে দুঃসাহসিক কাজও করেছে। জয়গুনের হাতে পান খাওয়ার অজুহাতে জোবেদ আলী বর্ষণ-মুখর রাতে তার দিকে কামনার হাত বাড়িয়ে দেয়। এসব দেখতে দেখতে তার জীবন-সংগ্রাম আরও কঠোর হয়েছে।

উপন্যাসের শুরুতে জয়গুন সম্পর্কে মসজিদের ইমামের ধারণা সে 'বেপর্দা আওরতের চীজ'। জয়গুণ ইমাম সাহেবের হাসের ডিম পাঠালে ইমাম তা নিতে চায় না 'বেপর্দা আওরতের চীজ' বলে। মসজিদে বসে থাকা মুছুল্লিরাও ইমামের কথা টেনে ব্যাখ্যাও দেয়- 'একলা সে মমিনসিং যায় টেরেনে কইর্যা। কী হিম্মত!'

একজন অশিক্ষিত গ্রাম্য মেয়েকে কে এই 'হিম্মৎ' জুগিয়েছে?—পরিস্থিতি। পরিস্থিতিই তাকে এমন সাহসী পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করিয়েছে। কিশোর সন্তান হাসু যখন বলে, 'তুমি আর বাইরে যাইও না, মা। মাইনষে কথা কয়, বেপর্দা...।' জয়গুনের অগ্নিমূর্তি গর্জে ওঠে, "খাইট্যা খাইমু। কেওরডা চুরি কইর্যাও খাই না; খ'রাত কইর্যাও খাই না। কউক না, যার মনে যা...।[১] পরক্ষণে আবার ধর্মের অন্ধশাসন তার মস্তকে কুঠারাঘাত করে। মনে পড়ে তার প্রথম স্বামী—হাসুর বাপ জব্বর মুনশীর পড়ে শোনানো দোজখের শাস্তির বিবরণ—

মুখের ছুরত যার পুরুষে দেখিবে
বিছা, বিচ্ছু, জোঁক তারে বেড়িয়া ধরিবে।
যে চুল দেখিবে তার পুরুষ অচিন,
সাপ হইয়া দংশিবে হাশরের দিন।
যে নারী দেখিবে পর-পুরুষের মুখ,
শকুনি গিরধিনী খাবে ঠোকরাইয়া চোখ।।(পৃ.22)

'সূর্য-দীঘল বাড়ী'র স্রষ্টা এভাবেই জয়গুনের মনে আততি সৃষ্টি করেছেন। একদিকে ধর্মের অনুশাসন, অন্যদিকে পেট পুরনের জ্বালা— দুইয়ের টানাপোড়েনে লেখক জয়গুনের মধ্যে সজীবতা দান করেছেন। তবে শেষপর্যন্ত জয়গুনের স্থির সিদ্ধান্ত—"দুটি কচি মুখ। এদের বাঁচাতেই হবে।" এবার লেখকের বর্ণনা - "ধর্মের অনুশাসন সে ভুলে যায় এক মুহূর্তে। জীবনধারণের কাছে ধর্মের বারণ তুচ্ছ হয়ে যায়, মিথ্যে হয়ে যায় তার কাছে।"[২] আর এখানেই এই গ্রাম্য অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশে গড়ে ওঠা নারির আধুনিক মুসলিম মানস প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিপর্যস্ত অবস্থা, পঞ্চাশের মন্বন্তর, ছেচল্লিশের দাঙ্গা, সাতচল্লিশের দেশভাগ ইত্যাদি ঘটনাবলী গ্রাম-বাংলার দরিদ্র মানুষের নিষ্ঠুর জীবন-সংগ্রাম, তাদের আশা-আকাঙ্খা, পাকিস্তান-সৃষ্টির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, স্বাধীনতার সুফল-কুফল– একাধিক উদ্বেগ জনমানসে প্রভাব বিস্তার করেছিল। ট্রেনযাত্রীদের কাছে জয়গুন শুনেছিল দেশ স্বাধীন হবে। চাল সস্তা হবে। এদের মধ্যে তর্কও চলে। কেউ বলে, 'জিন্নাসাবই রাজা অইব।' কেউ বলে, 'গান্ধী অইব এই দেশের রাজা'। কেউবা– 'সুভাষ বসু থাকলে সে-অই রাজা অইতেন'।—'আচ্ছা মামু, স্বাধীনতা অইলে খাজনা দিতে অইবনি? -না, না, খাজনা দিলে আবার স্বাধীন অইল কি?'—এরকম নানা প্রসঙ্গ নিয়ে গ্রামের সাধারণ মানুষদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক চলে। এমনকি রাজনৈতিক আন্দোলনে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ছাপও গ্রামে এসে পড়ে। ১৯৪৭-এর ১৫

আগস্ট রাস্তায় চেঁচামেচি-চিৎকার শুনে হাসুর উদ্বেগ — 'হিন্দু-মুসলমান কাটাকাটি শুরু হল না ত!' কারণ গত বছর এমন দিনে মারামারি বেধেছিল। পনেরো দিন সে ঘর থেকে বের হতে পারেনি। তিন দিন না খেয়ে কাটিয়েছিল। তার কাছে দেশ স্বাধীন হওয়া মানে খেতে পাওয়া না-পাওয়ার সম্পর্ক বোঝায়। নারায়ণগঞ্জ থেকে আসা রেলগাড়ির ইঞ্জিনের সামনে সে 'নিশান' দেখেছে—'সবুজ রঙের নিশান। মাঝে চাঁদ ও তারা। গাড়ির মধ্যে চিৎকারও শোনা যাচ্ছে—'আজাদ পাকিস্তান-জিন্দাবাদ।' 'হিন্দু-মুসলমান ছেলে বুড়ো—সবাই আছে মিছিলে।'

এরই মাঝে লেখক হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক ও দেশত্যাগের ছবি এক ঝলকে দেখিয়ে দেন। ভারত ও পাকিস্তানের সংখ্যালঘুর মনস্তত্ত্বকে আশ্চর্য কুশলতার সঙ্গে আবু ইসহাক তুলে ধরেছেন। রমেশ ডাক্তার ও তার স্ত্রীর কথোপকথনে এই চিত্র ফুটে উঠেছে। রমেশ ডাক্তার কিছুতেই দেশ ছেড়ে যাবে না। কিন্তু তার স্ত্রী পাকিস্তান ছাড়ার জন্য উদ্‌গ্রীব। মুসলমানদের হাতে কচুকাটা হওয়ার আশঙ্কা করে। প্রত্যুত্তরে রমেশ ডাক্তারের বক্তব্য—

"ওসব বাজে কথা রাখো। এখানে কে তোমাকে মারছে শুনি? কতকগুলো পশুর প্ররোচনায় যা হয়েছিল, তা আর হবে না দেখে নিও। ভায়ের বুকে ছুরি বসিয়ে আনন্দ পাওয়া যায় না— সবাই বুঝতে পেরেছে। ... এখানে আমাদের কিসের অভাব? কোন্ দুঃখে যাব আমরা ঘর-বাড়ী ছেড়ে? জানো না, এখানে আমরা মা-র কোলে আছি। ...এখন হুজুগে মেতে অনেকেই বাড়ী-ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। যাদের টাকা নেই তারাও যাচ্ছে। অনেকে বাড়ী-ঘর বিক্রি করে যাচ্ছে। আমি বুঝতে পারি না কিসের নেশায় যাচ্ছে এরা। কিন্তু দেখবে, আবার এরা ফিরে আসবে। রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে ক্ষুধা ও রোগে আধমরা হয়ে আবার এরা ফিরবে। কিন্তু তখন আর মাথা গুঁজবার ঠাঁই মিলবে না। আমাদের পূর্ব-পুরুষ হিন্দু-মুসলমান আপনজনের মতো কত যুগ ধরে কাটিয়েছে এ মাটিতে। একের ওপর নির্ভর করে বেঁচে উঠেছে আর একজন। একজন যুগিয়েছে ক্ষুধার অন্ন, আর একজন দেখিয়েছে আলো।"[৩]

১৯৪৭ সাল, ১৫ আগস্ট, শুক্রবার হাসু পতাকা ওড়ায়। হাসু, জয়গুনের ১৩ বছরের কিশোর শ্রমিক সন্তান। দুর্ভিক্ষের সময় যে কাপড়ের অর্ধাংশে মৃত কন্যাকে কাফন দিয়েছিল জয়গুন, সেই কাপড়ের অবশিষ্টাংশ দিয়ে হাসু তৈরি করে 'জাতীয় পতাকা, এবং ধ্বনি তোলে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ'। ছেঁড়া কাপড়ের পতাকা'র মাধ্যমে লেখক দেখিয়েছেন, ভারতবর্ষ যেমন ছিল, স্বাধীনতার পরেও তেমনই থাকবে। জয়গুনেরও তাই। ভারত স্বাধীন হলেও পূর্বের মতো তাকে খাটতে হয়, অভাব তার প্রতি পদে পদে। এদের কাছে 'দেশ স্বাধীন হলেই বা কি, আর না হলেই বা কি। 'চাইল্ড লেবারের' কোনো পরিবর্তন নেই। হাসুকে ভোর থেকে বিকেল পর্যন্ত ক্রমাগত ইট ভেঙে সুরকি করা, ইটের বোঝা টানা, পানি তোলা'—এই সব কাজ করতে হয়। কাফন দেওয়া কাপড়ের বাকি অংশে তৈরি 'জাতীয় পতাকা" বহু বিনষ্টি, বিচ্ছেদের

ইঙ্গিত দেয়। ভারত স্বাধীন হলো। আবার ভাগও হলো। জন্ম নিলো পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের। পাকিস্তান আবার দু'টুকরো হয়ে সৃষ্টি হল বাংলাদেশের। এখানে আবু ইসহাকের প্রখর দূরদৃষ্টির সন্ধান পাই। উপন্যাসটি লিখেছেন ১৯৫৫ সালে। অথচ তিনি বুঝেছিলেন আরও এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। সেজন্য তিনি কাফনের কাপড়ের 'জাতীয় পতাকা'র নিশান উড়িয়ে আওয়াজ তুলেছিলেন 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ'। অর্থাৎ ‘ছেঁড়া কাপড়ের’ জাতীয় পতাকায় আমরা পেলাম 'ছেঁড়া স্বাধীনতা', 'অর্ধ-স্বাধীনতা'। ফলশ্রুতি, ১৯৭১-এ ‘মুক্তিযুদ্ধ’।

মুসলিম হতদরিদ্র পরিবারের নিদারুণ জীবন-যন্ত্রণার ছবি লেখক সুন্দরভাবে বয়ন করেছেন। ইদের দিনেও নতুন কাপড় তারা পরতে পারে না। মায়ের কাছে চাইতে গেলে মা তার নিরুপায়তা ঢাকার জন্য মেয়ে মায়মুনকে ধমক দেয় ‘কাপড় দিয়া কবর দিমু তোরে শয়তান'। একটু শিন্নি খাবার বিলাসিতাও তারা দেখাতে পারে না। বাল্য-বিবাহের কবলে পড়ে মায়মুনের শীর্ণ শরীর ছিন্নভিন্ন হয়েছে। 'ও না পারব ওসমানের ঘর করতে, না পারব এক কলসী পানি আনতে'।[৪] তাই শ্বশুরবাড়ির লোকেরা এমন মেয়েকে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াতে নারাজ, তাকে উপযুক্ত হতে হবে শ্বশুরবাড়িতে কায়িক শ্রমদানের এবং পঁচিশ বছরের যুবক স্বামীর শয্যাসঙ্গী হওয়ার। তবেই মিলবে দুটো ভাত। স্বামীর কাছে যৌন-নিগৃহীতাও হতে হয়। সোলেমানের স্ত্রীর কথায়-

“হেদিন ঘরে দিছিলাম। সরমের কতা। রাহীত কি চিক্কর। আর এট্টু অহলে চৌদ্দ বাড়ীর মানু একখানে কইর্‌যা লইত? ছিঃ ছিঃ। অ-ঘিন অ-ঘিন। বোঝলাম, এইডা জুয়ান অইতে অইতে আমার ওসমান ঠুন্ডা অইয়া যাইব।”[৫]

পিছিয়ে পড়া মুসলিম গ্রাম-সমাজের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ‘সূর্য-দীঘল বাড়ী’। পুরুষের একাধিক বিবাহ করা, যখন-তখন স্ত্রীকে 'তালাক' দেওয়া, অল্পবয়সী নারিকে বিবাহ দেওয়া— অনগ্রসর গ্রামীণ সমাজ-ব্যবস্থারই পরিচয় বহন করে। মোটকথা, ধর্মীয় আবহাওয়াপূর্ণ গ্রামে অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মোল্লাদের দোর্দণ্ডপ্রতাপ, ভূত-পেত্নী, ওঝা, ঝাড়ফুঁকে গ্রামীণ মানুষের অগাধ বিশ্বাস, গ্রাম-প্রধানদের উৎপীড়ন, অসমবয়সী বিবাহের বীভৎস রূপ, শাশুড়ীর নির্যাতন, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, গ্রাম্য মানুষের অজ্ঞতা ইত্যাদি এ উপন্যাসে অত্যন্ত সাবলীলভাবে ফুটে উঠেছে।[৬]

মায়মুনের বিয়েকে কেন্দ্র করে আবু ইসহাক যে কাহিনি বুনোট করেছেন, তাতে গ্রামীণ মুসলিম সমাজের ‘তথাকথিত' ধার্মিকদের চরিত্র জলজ্যান্ত ফুটে উঠেছে। গদু প্রধান প্রতিহিংসার বশে জয়গুণকে ‘ধর্মীয় ফাঁদে' পা ফেলায়।—

“বিয়ার আগে বৌর মারে তোবা করাইতে অইব। পর্দার বরখেলাপ করে বুইল্যা এহনি তারে তোবা করাইতে অইব। তোবা না করাইলে মৌলবী সাব কলমা পড়াইব না।"[৭]

জয়গুণ চিন্তিত হয়ে পড়ে। একদিকে নিজের মেয়ের বিয়ে। অন্যদিকে ‘তওবার’ ফরমায়েশ। জয়গুন বুঝতেও পারছে যে, তাকে পঙ্গু করে দেওয়ার ব্যবস্থা নিচ্ছে গদু প্রধান মাতব্বররা। কিন্তু উপায় নেই। 'সে ভাবে- তওবা করলে ঘরবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে। ঘরে বদ্ধ হয়ে থাকার অর্থ—না খেয়ে তিলে তিলে শুকিয়ে মরা। আর তাছাড়া, 'তোবা আমি করতাম না। আমি কোন গোনা করি নাই। মৌলবী সা’ব বিয়া না পড়াইলে না পড়াউক। আমার মায়মুনের বিয়া দিমু না।' কিন্তু গ্রামের ভণ্ড মাতব্বররা তা শুনবে কেন। তাকে তওবা করাবে এবং মায়মুনকে বিয়েও দেবে। মৌলবী সাহেব এবার একটি গল্প ধরলেন—

“ওই লোকটা তার বেপর্দা স্ত্রীকে কিছুতেই তালাক দিল না। তখন একজনের উপর হুকুম অইল- ওরে কতল কর। লোকটাকে কাইট্যা ফেলা অইল। আর তার লহু থেইক্যা পয়দা অইল কি? না, একটা হারাম জানোয়ার- খিঞ্জির-শুয়োর। এইবার আপনারা দ্যাখেন, পর্দা কি চীজ। পর্দা না মানলে চল্লিশ বছরের এবাদতও কবুল হয় না খোদার দরগায়। সব বরবাদ অইয়া যায়। বেপর্দা স্ত্রী লোক আর রাস্তার কুত্তী সমান।”[৮]

জয়গুন চমকে ওঠে। কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সে কি করবে ভেবে পায় না। তার মনে আততির সৃষ্টি হয়। কারণ সে ধার্মিক। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, রোজা রাখে। হাঁস ডিম পাড়লে প্রথম ডিম মসজিদে পাঠায়। তসবীহ-তেলোয়াতও করে। কিন্তু বেপর্দার (এখানে বেপর্দা মানে নিজে খেটে রোজগার করা) কারণে যদি চল্লিশ বছরের এবাদত কবুল না হয়, যদি ‘সব বরবাদ অইয়া যায়'—জয়গুনের মনে প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব জাগে। একদিকে ধর্মের বন্ধন, অন্যদিকে জীবন রক্ষার দায়। এমতাবস্থায় ‘কুপির অস্পষ্ট আলোকে ছেলেমেয়েদের কচিমুখ জয়গুনকে তার পথের সন্ধান বাতলে দেয়, তওবার কথা সে ভুলে যায়।... ক্ষুধার অন্ন যার নেই, তার আবার কিসের পর্দা, কিসের কি? সে বুঝেছে জীবন রক্ষা করাই ধর্মের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ মূলমন্ত্র।' এভাবেই সে দ্বন্দ্বের উপশম করে। পরজগতের কথা পিছনে ফেলে ইহজগতে পা বাড়ায়।

আবু ইসহাকের বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনায় মুসলিম সমাজের কুসংস্কারের ছবি জীবন্ত হয়ে ওঠে। সূর্য-দীর্ঘল বাড়ির চারপাশে আম তেঁতুল, শিমূল, গাবগাছ ও বাঁশের ঝাড়ে ভূত-পেত্নীর আশ্রয়। সূর্য-দীঘল বাড়ির পাশের হালট দিয়ে যেতে যেতে গদু প্রধান শুনতে পায়—‘অই পরধাইন্যা, মাছ দিয়া যা। না দিলে ভালা অইব না।' এমন সময় তার পায়ের কাছে ঢিল পড়তে থাকে এবং তার হাত থেকে মাছ দুটো খসে পড়ে। 'সে 'আউজুবিল্লাহ' পড়তে পড়তে কোনোরকমে বাড়ি এসেই অজ্ঞান। রহমত কাজীও তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তে উঠে দেখেছে গাবগাছের টিকিটে একটা বউ দু-পা ছড়িয়ে বসে আছে। চোখের পলক ফেলতেই সে 'করম আলী হাজীর বাড়ির ওপর দিয়ে চলে গেল। পরের দিনই করম আলী হাজীর 'পুতের বউ' কলেরায় মারা যায়। দু'দিন পরে তার হালের তিনটা তরতাজা গরু কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে পড়ে খতম' (পৃ. ১১)।

পরিস্থিতির চাপে জয়গুন এরকম বাড়ীতে থাকতে বাধ্য হয়। ফকির জোবেদ আলী বাড়ী 'বন্ধ' করে দেয়—

"সূর্য-দীঘল বাড়ীর চারকোণে চারটা তাবিজ পুঁতে এসে সে জানিয়ে দেয়— এইবার চউখ বুইজ্যা গিয়া ওড বাড়ীতে। আর কোন ডর নাই। ধুলাপড়া দিয়া ভূতপেত্নীর আড্ডা ভাইঙ্গা দিছি। চাইর কোণায় চাইড্যা আলীশান আলীশান পাহারাদারও রাইখ্যা আছি। সব আপদ বিপদ ওরাই ঠেকাইব।বাড়ীর সীমানার মইদ্যে ভূত-পেত্নী; জিন-পরী ব্যারাম-আজার কিচ্ছু আইতে পারব না।"[৯]

বিনিময়ে জোবেদ আলী 'পিতলের কলসী' দাবি করে। বাঁশও। তার রোজগারের পথ ক্রমবর্ধমান করার জন্য নতুন ফন্দিও খাড়া করে-

"বছর-বছর কিন্তু পাহারা বদলাইতে অইব। যেই চারজন এইবার রাইখ্যা গেলাম, হেইগুলো কমজোর অইয়া যাইব সামনের বছর। বোঝতেই পার, দিনরাইত ভূত-পেত্নীর লগে যুদ্ধ করা কি সোজা কাণ্ড!"[১০]

-এখানে লেখক নিরীহ মানুষের এই বিশ্বাসের পাশাপাশি বিশ্বাসহীনতাকেও দেখিয়েছেন। ভণ্ড ফকির জোবেদ আলীর অর্থলোলুপতা ও কামলোলুপতাকে দেখিয়ে কুসংস্কারের অসারত্বকে ফুটিয়ে তুলেছেন। সূর্য-দীঘল বাড়িটা যে অপয়া নয়, ভৌতিক পরিমণ্ডলে আচ্ছাদিত নয়, তা গদু প্রধানের ঢিল ছোঁড়ার ঘটনায় পরিষ্কার হয়ে যায়। কিন্তু মুসলিম সমাজের অসহায় মানুষের মনে এই 'বিশ্বাস' যে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে আছে তার প্রমাণ, শেষপর্যন্ত জয়গুনের বাড়ী ছেড়ে 'অন্য কোথাও, অন্য কোনখানে' চলে যাওয়া।

নির্মাণের বাস্তবতায় আবু ইসহাক সিদ্ধহস্ত। বিশেষত, কাসুর ভূত তাড়ানোর দৃশ্যটি অসাধারণ। কাসুর যেভাবে ভূতে ধরেছে এবং যেভাবে ভূত ছাড়ানো হয়েছে, তৎকালীন মুসলিম সমাজের কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাস্তববোধের চরম দৃষ্টান্ত। শুধু তৎকালীন সমাজ নয়, বর্তমানে হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজেই 'ভূতে ভর করা' ব্যাপারাটি মজ্জাগত হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখনও বহু মানুষ রোজগারের উৎস করে নিয়েছে 'ভারানে' বসে। এই উপন্যাসে কাসুর ভূত তাড়াতে মোমবাতি-আগরবাতি জ্বালিয়ে লোকজন ও সাগরেদসহ দিদার বকশ ফকির 'ভারানে' বসে। কার উপরে ফকির 'ভর' চাপাবে? কেউ স্বীকার করে না। এমন একটা গা-ছমছমে পরিবেশ তৈরি করেছে যে, সবাই ভয়ে আঁটোসাটো। রুস্তম, সাদেক, হারুন কেউ সম্মতি জানাল না। শেষে ফকির তার এক শাগরেদকে ঠিক করে। তার ওপরেই 'ভর করবে ভূত।' 'দিদার বক্‌শ মোমবাতি নিবিয়ে দিয়ে সবাইকে সাবধান করে দেয়—খবরদার, কেউ চউখ উপর দিক কইর্‌য না! ভূতের চউখে চউখ পড়লে তোমাগ চউখ গইল্যা পানি অইয়া যাইব।' এমন কথা শোনার পর কার সাধ্য আছে চোখ তুলে তাকাবে? অগত্যা এক সময় ঘরের চালার ওপর ঢিল পড়তে শুরু করে। ফকির বলে – 'চাইঙ্গা মারস ক্যাঁ? পিড়পিড়াইয়া ঘরে আয়। ঘরে আইতে অইবই'। কিছুক্ষণ পরে ঘরের চালাটা কড়কড় করে ওঠে। ফকির গলার ভেতর

অদ্ভুত ফ্যাসফ্যাস শব্দ করে—'হ্যাঁরে— হাঁই-হুম'। 'সবাই বুঝতে পারে, ওর ওপরে ভূত 'ভর' করেছে। এবার ফকির বিভিন্ন 'বুলি' আওড়ায়। শেষ পর্যন্ত ভূত পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু যাওয়ার আগে সে বলে—'তুমি আমার মনিব। আমি তোমার নফর। যাওনের আগে একটা ভোগ দ্যাও।—কিয়ের ভোগ?'-

"আড়াই গন্ডা শবরীকেলা, মিহিন চাউলের ভাত
সেরেক পাঁচেক মাইপ্যা দিও কাইট্যা ফেলার পাত।
ঝাল ছাড়া নুন ছাড়া পোড়া গজার মাছ,
রাইখ্যা দিও এই গুলা যেথায় তেঁতুল গাছ।"[১১]

ফকির বলে 'আইচ্ছা, আইচ্ছা, দিমু। তুই অহন পালা।' অন্ধকারে ঘরের চালাটা আবার কড়কড় করে ওঠে। অর্থাৎ ভূত এবার পালায়। বাতি জ্বালাতেই দেখা গেল ফকিরের সাগরেদ বিছানায় বেহুশ অবস্থায় পড়ে আছে। ফকির পানি পড়া গায়ে দিতেই সে লাফিয়ে ওঠে। এবার ফকিরের কথা-

"হোন করিমবক্‌শ, কামডা খুব সহজে অইয়া গেল। ওরে ওই হগল খাইতে দিলেই ও চইল্যা যাইব। কাইলই বাজার তন গজার মাছ, কেলা আর চিনি গুড়া চাউল আইন্যা আমার কাছে দিও। তেঁতুল গাছের গোড়ায় আমিই রাইখ্যা আসমু ঠিক রাইত দুপুরের সুময়। তোমাগ যেই ডর। তোমার উপরে এই কাম ছাইড়্যা দিতে ভস্সা পাই না"।[১২]

এভাবেই কাহিনি বয়নে তিনি 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন-সমাজ-বাস্তবতার' চিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন। জয়গুনের মধ্যে তিনটে 'ফ্রন্ট' দেখেছেন সত্যেন্দ্রনাথ রায়। জয়গুনের বাঁচার লড়াইয়ের একটা ফ্রন্ট হল তার বাড়ি। অনেকেরই বিশ্বাস, বাড়িটাকে দখল করে, ভয় দেখিয়ে জয়গুনের বাড়ি থেকে হটিয়ে দেওয়া। তার বিরুদ্ধে আর একটা ফ্রন্ট হল, সে বাড়ির বাইরে বের হয়, ট্রেনে যাতায়াত করে, বেশরম বেপর্দা আওরত! খেতে না পেয়ে মরলেও মাতব্বরদের নির্দেশ অমান্য করা যাবে না। জয়গুনের তৃতীয় ফ্রন্ট অপেক্ষাকৃত জটিল। তার প্রাক্তন স্বামী করিমবশ জয়গুনের প্রয়োজন অনুভব করে। জয়গুনও কাসুকে কাছে পেতে চায়। মরণাপন্ন কাসুকে বাঁচাতে করিমবকশ জয়গুনের কাছে পাঠিয়ে দেয়। এমনকি তালাক বাতিল করে জয়গুনকে পুনরায় গ্রহণ করার প্রস্তাব পাঠায় শফীর মার মারফৎ

"কি করলা, ভাজ? পরস্তাবডা করছিলা?
-করছিলাম। কিন্তু রাজী হয় না।...
– আমি ভালার লেইগ্যা কইছিলাম।
... যদি সতীনের ঘর করতে রাজী না অয়, তয় আঞ্জমনরেও তালাক দিয়া দিতে পারি। এর
বেশি আর কি চায়?

-কিন্তুক ও যে কিচ্ছুই চায় না। আমার মোখের উপরে কইয়া দিছে,—'যেই থুক একবার মাডিতে ফালাইছি, তা মোখ দিয়া চাটতে পারতাম না।"[১৩]

একদিকে সন্তানদের জীবনরক্ষা, অন্যদিকে জয়গুনের দৃঢ় সংকল্প—এই আততির সমাপ্তি অভাবিতভাবে। প্রাক্তন স্ত্রী বশীকরণের জন্য জোবেদ আলী ফকিরের নির্দেশ মতো, এক অমাবস্যার রাতে সূর্য-দীঘল বাড়ির চারপাশে চারটে গজাল পুততে গিয়ে 'চেনা ভূতেদের হাতে' করিমবক্‌শের মৃত্যু হয়। কারণ গদু প্রধানের ঢিল ছোঁড়া সে দেখতে পেয়েছিল। আর তাতেই তার বিপত্তি। এরপর লেখকের মন্তব্য-

"যে হিম্মত বুকে বেঁধে জয়গুন এতদিন সূর্য-দীঘল বাড়ীতে ছিল, তা আজ খান খান হয়ে যায় এ ঘটনার পরে। আজ বারবার করিমবক্‌শের কথাই মনে পড়ে জয়গুনের। বেদনায় বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। দরদর ধারায় পানি ঝরে গাল বেয়ে। আহা বেচারা! জীবনে কাউকে ভালোবাসেনি। কারও ভালোবাসা পায়ওনি সে"।[১৪] শফীর মাকে সঙ্গে নিয়ে ছেলেমেয়ের হাত ধরে আবার জয়গুন বেরিয়ে পড়ে অজানা ভবিষ্যতের দিকে।

পরাজয় ঘটল কি জয়গুনের? যদি ঘটেও থাকে, এমন না ঘটলে উপন্যাসের সত্যহানি হতো বলে সমালোচক সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের অভিমত। আমরাও সহমত পোষণ করি।

তথ্যসূত্র :

১। আবু ইসহাক, সূর্য-দীঘল বাড়ী, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৫, প্রথম চিরায়ত সংস্করণ ১৯৯২, চিরায়ত প্রকাশনী, কলকাতা-৭৩, পৃ ২২
২। প্রাগুক্ত, পৃ ২৩
৩। প্রাগুক্ত, পৃ ১১৪-১১৫
৪। প্রাগুক্ত, পৃ ১০৩
৫। প্রাগুক্ত, পৃ ১০৪
৬। শিরীণ আখতার, বাংলাদেশের তিনজন ঔপন্যাসিক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ- আষাঢ় ১৪০০
৭। আবু ইসহাক, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৬
৮। প্রাগুক্ত, পৃ ৮৭
৯। প্রাগুক্ত, পৃ ১২
১০। প্রাগুক্ত, পৃ ১২
১১। প্রাগুক্ত, পৃ ১০২
১২। প্রাগুক্ত, পৃ ৪৯
১৩। প্রাগুক্ত, পৃ ১২২-১২৩
১৪। প্রাগুক্ত, পৃ ১৩২

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পে পতিতা জীবনের চিত্র

নিতাই পাল
স্নাতকোত্তর, বাংলা বিভাগ,
গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : বাংলা সাহিত্যের অন্যতম গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্র। তাঁর গল্প বিচিত্র পথসঞ্চারী ও সর্বত্রগামী। তাঁর গল্পে মানব জীবনের বিচিত্র অনুভবের ছায়া পড়েছে। রবীন্দ্রনাথের পরে যদি সার্থক কোনো গল্পকারের নাম করতে হয় তাহলে তিনি প্রেমেন্দ্র মিত্র। তাঁর এই অনন্য সাধারনতা বিষয়বস্তু নির্বাচনে এবং আঙ্গিক সচেতনতায়। প্রেমেন্দ্র মিত্র 'মহানগর','বিক্ষুব্ধ ক্ষুধার ফাঁদে', 'সংসার সীমান্তে', 'সাগর সংগমে' প্রভৃতি গল্পে পতিতা জীবনের কথা তুলে ধরেছেন। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে মধ্যযুগের নানা গ্রন্থেও আমারা পতিতা জীবনের নানা প্রসঙ্গ পেয়ে থাকি। পতিতা জীবনের কথা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের রচনাতেও ধরা পড়েছে। তবে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি পতিতা জীবনের কথা উঠে এসেছে শরৎচন্দ্রের রচনাতে। 'মহানগর' গল্পে উঠে এসেছে পতিতা চপলা ও তার ভাই রতনের কথা। চপলার বিয়ে হয়েছিল তারপর কারা যেন তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে মহানগরের এই অন্ধকার জীবনের দিকে ঠেলে দিয়েছে। কিন্তু তার ভাই তাকে সে অন্ধকার থেকে বের করে আনতে চায় কিন্তু সে সেই অন্ধকার থেকে বের হতে পারে না। 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' গল্পে আমরা দেখতে পাই বিগত যৌবনা এক পতিতা বেগুনের দুর্ভাগ্যময় জীবনের চিত্র। বেগুনের ঘরে বেশ কয়েক মাস হল কোনো অতিথির আগমন ঘটেনি। তার পেট চালানো মুশকিল হয়ে উঠেছে। এদিকে বাড়িওয়ালী তাকে শাসিয়ে গেছে টাকা না দিলে তাকে ঘর থেকে বের করে দেবে। এরপর বেগুন শিকারের খোঁজে পথে নামে। কিন্তু বারবার বিফল হতে হয়েছে তাকে। 'সংসার সীমান্তে' গল্পে পতিতা রজনী ও পাঁচবার জেলখাটা দাগী আসামী অঘোরের নীড় বাঁধার স্বপ্ন দেখা এবং তাদের সেই স্বপ্ন পূরণ না হবার এক বিষাদাত্মক চিত্র গল্পকার অঙ্কন করেছেন। 'সাগর সংগমে' গল্পে সেভাবে পতিতা জীবনের কথা নেই। তবে পতিতাদের প্রতি তথাকথিত ভদ্রসমাজের যে ঘৃণ্য মনোভাবতা গল্পকার ব্যক্ত করেছেন। গল্পটি বিধবা দাক্ষায়ণী ও পতিতা কন্যা বাতাসিকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। চপলা, বেগুন, রজনী এইসমস্ত চরিত্র গুলোর মাধ্যমে গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্র পতিতা জীবনের এক বাস্তব ও নির্মম চিত্র তুলে ধরেছেন।

সূচক শব্দ: পতিতা, অন্ধকার, আলো, নীড়, সংসার, সমাজ, যৌবন, ক্ষুধা।

মূল প্রবন্ধ:

বাংলা সাহিত্যে কল্লোল কালি-কলমকে কেন্দ্র করে যে নতুন আধুনিক যুগের সৃষ্টি হয়েছিল তার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। রবীন্দ্রনাথের পরে যদি সার্থক কোন ছোট গল্পকারের নাম করতে হয়, তবে প্রেমেন্দ্র মিত্রের নাম সর্বপ্রথম মাথায় আসে। তাঁর এই অনন্য সাধারণতা বিষয়বস্তু নির্বাচনে এবং আঙ্গিক সচেতনতায়। তাঁর গল্পে মানব জীবনের বিচিত্র অনুভবের ছায়া পড়েছে। জীবনের নানা অবস্থা, নানা বৈচিত্র, মনোভাবের বিভিন্ন বিচিত্র অভিব্যক্তি তাঁর গল্পে রূপ পরিগ্রহ করেছে। কল্লোলের যুগগত প্রভাব তাঁর গল্পকে করেছে কঠোর বাস্তবানুসারী। তাঁর রচিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প হল- ‘শুধু কেরানী’, ‘পুন্নাম’, ‘সাগরসংগম’, ‘মহানগর’, ‘সংসার সীমান্তে’, ‘তেলেনাপোতা আবিষ্কার’, বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে’ ইত্যাদি।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের বেশকিছু গল্পে উঠে এসেছে পতিতা জীবনের কথা। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পেই প্রথম পতিতা জীবনের কথা উঠে এসেছে এমন নয়, মধ্যযুগ থেকেই পতিতার প্রসঙ্গ ও পরিচয় সাহিত্যে পাওয়া যায়। ‘গোপিচন্দ্রের গান’, ঘনরাম চক্রবর্তীর ‘ধর্মমঙ্গল’, দোনা গাজীর‘ ‘সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল’, আব্দুল হাকিমের ‘লালমতি’ ও 'সয়ফুলমুলক' এইসব নানা গ্রন্থে পতিতা প্রসঙ্গে সরস বিবরণ খুঁজে পাওয়া যাবে। বাংলা কথা সাহিত্যে পতিতা প্রসঙ্গ আসার বেশ আগেই নকশা জাতীয় রচনাতে পতিতার কথা ও কাহিনি স্থান পেয়েছে। কালীপ্রসন্ন সিংহের ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’- তে উনিশ শতকের কলকাতার পতিতাবৃত্তি সম্পর্কে বিবরণ দিয়েছেন। ‘একেই কি বলে সভ্যতা’, ‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ’- তে আমরা বিক্ষিপ্তভাবে পতিতার পরিচয় পেয়ে থাকি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাতেও এই পতিতা জীবনের কথা এসেছে, যার একটি নিদর্শন ‘বিচারক’ গল্পটি। তবে বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বেশি যাঁর রচনাতে এই পতিতা জীবনের কথা উঠে এসেছে তিনি হলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি তাঁর গল্প উপন্যাসে এই পতিতা জীবনকে বারবার জীবন্ত করে তুলেছেন। এছাড়া বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, সুবোধ ঘোষ প্রমুখের রচনাতেও উঠে এসেছে এই পতিতা জীবনের কথা। আমরা যদি সেইসব রচনা গুলির দিকে লক্ষ্য রাখি তবে দেখতে পাবো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক চাপে ক্লিষ্ট হয়ে হতভাগ্য নারীরা নিতান্ত নিরুপায় হয়ে এই পতিতা জীবনে পা দিয়েছে । আবার অনেকক্ষেত্রে কোনো কালো হাত তাদের এই অন্ধকারময় জীবনে টেনে এনেছে। সমাজ তাদের বহিস্কার করেছে। এই পতিতারা কখনও ফিরে যেতে চেয়েছে সমাজের মূলস্রোতে, আবার কখনও বাঁধতে চেয়েছে ছোট্ট নীড়।

‘মহানগর’, ‘বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে’, ‘সংসার সীমান্তে’, ‘সাগর সংগম’ প্রভৃতি গল্পে প্রেমেন্দ্র মিত্র পতিতা জীবনের চিত্র এঁকেছেন।

'মহানগর' গল্পটি পতিতা চপলা ও তার ভাই রতনকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। গল্পে আমরা দেখতে পাই যে, রতন তার বাবার সঙ্গে মহানগরে এসেছে। তার বাবা তাকে কোনোমতে মহানগরে আনতে রাজি হচ্ছিল না, সে বহু বায়না করে এই মহানগরে এসেছে। রতনের মহানগরে আসার প্রধান উদ্দেশ্য হল তার দিদিকে খুঁজে বের করা। "দিদিকে যে তার খুঁজে বার করতেই হবে। দিদি না হলে যে কিছু ভালো লাগে না ছেলেবেলা থেকে সে তোমাকে দেখে নি জেনেছে শুধু দিদিকে দিদি তার মা। দিদি তার খেলার সাথী। বিয়ে হয়ে দিদি গেছল শশুরবাড়ী।"[১] তারপর সেখান থেকে কারা যেন তার দিদিকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছে। কিছুদিন পর তার দিদির খোঁজও মেলে, কিন্তু তার দিদিকে কেউ ফিরিয়ে আনেনি, এমনকি আনতেও চায়নি। রতন যখন তার বাবার কাছে কেঁদে কেঁদে আবদার করে বলে-"দিদিকে আনছ না কেন বাবা?"[২] তখন তার বাবা তাকে ধমক দিয়ে ওঠে। রতন কোনো একভাবে খবর পেয়েছে যে তার দিদি মহানগরের উল্টোডিঙিতে আছে। দিদিকে সে খুঁজে বের করবেই, তাইতো সে বাবার সঙ্গে মহানগরে এসেছে। তার বাবা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লে সে লুকিয়ে একলা উল্টোডিঙির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। উল্টোডিঙিতে পৌঁছনোর পর রতন তার দিদিকে বহু অনুসন্ধান করে, ভাগ্যক্রমে সে শেষপর্যন্ত দিদিকে খুঁজেও পায়। রতন তার দিদিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায় কিন্তু তার দিদি বলে ওঠে, "আমার যে যাবার উপায় নেই ভাই!"[৩] এমনকি রতন সেখানে থাকতে চাইলে তার দিদির মুখ ম্লান হয়ে আসে। শেষপর্যন্ত খালি হাতেই ফিরে আসতে হয় রতনকে। আসবার সময় রতন তার দিদিকে বলে- "বড়ো হয়ে আমি তোমায় নিয়ে যাব দিদি! কারুর কথা শুনবো না!"[৪]

প্রেমেন্দ্র মিত্র এই গল্পে মহানগরের বহু বিস্তৃত জীবনের একটা বিশেষ ক্ষতস্থান পতিতাপল্লীর কথা অঙ্কন করেছেন। রতনের দিদি চপলাকে মহানগরের এই ক্ষতস্থান দাগি করে দিয়েছে। পতিতাপল্লীর মেটে বাড়ির সামগ্রীর মাঝখানে সে নিজেও জীবন্ত পণ্যদ্রব্যে রূপান্তরিত হয়েছে। চপলার বিয়ে হয়েছিল। তারপর কারা যেন প্ররোচণা দিয়ে বা জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে এই অন্ধকারময় জীবনের দিকে ঠেলে দিয়েছে। পতিতা জীবন সম্পর্কে ছোট রতনের কোন ধারনা নেই। সে জানেনা কেন তার বাড়ির লোক চপলাকে ফিরিয়ে আনতে চায়না এমনকি চপলার কথা অবধি আলোচনা করতে চায়না, সে জানে কেন তার দিদি ফিরতে পারবে না, সে জানে না কেন তার দিদি তাকে থাকতে দিতে অপারগ। রতনের উক্তির মাধ্যমে গল্পকার বোঝাতে চেয়েছেন যে, এমনও অনেক মানুষ আছে যারা সমাজের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এই সমস্ত মানুষগুলোকে আবার সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়।

'বিক্ষুব্ধ ক্ষুধার ফাঁদে' গল্পে বিগত যৌবনা বেগুনের দুর্ভাগ্যময় জীবনের কথা গল্পকার তুলে ধরেছেন। বিগত যৌবনা বেগুনের সৌন্দর্যের সেই তেজ আর নেই, যার

আকর্ষণে প্রতিদিন অতিথিরা তার কাছে ছুটে আসতো। দুমাস ধরে তার ঘরে কোন অতিথির আগমন ঘটেনি। তার পেট চালানো দুষ্কর হয়ে উঠেছে।

বেগুন দুই মাস ধরে বাড়িওয়ালীর ঘর ভাড়া ও খোরাকির টাকা দিতে পারেনি। বাড়িওয়ালী বেগুনকে তাগা জোড়াটা বিক্রি করতে বললে বেগুন রাজি হয় না। সে বলে যে, সে নাকি ইতিপূর্বে পেটের দায়ে তার সমস্ত গহনা বিক্রি করে ফেলেছে, এটিই এখন তার একমাত্র সম্বল। তবে তাগা জোড়াটা বিক্রি করতে না চাওয়ার আসল কারণ হল তাগা জোড়াটা ছিল গিল্টির। তার তাগা জোড়াটা যে গিল্টির সেটা যদি কেউ জানে তাহলে তার আর মান-সম্মান থাকবে না। সবার কাছে হাসির খোরাক হতে সে রাজি নয়।

এদিকে বাড়িওয়ালী তাকে শাসিয়ে গেছে যে দু-মাসের ভাড়া ও খোরাকির টাকা দিতে না পারলে তাকে ঘর থেকে বের করে দেবে। বেগুন জানতো তার বাড়িওয়ালী তাকে ঘর থেকে বের করে দিতে একবারও ভাববে না। বেগুন টাকা রোজগারের জন্য সাহেবদের একজিবিশন মেলাতে যাবে। বেগুন ভেবেছিল সেখানে গেলে একটা না একটা শিকার ধরতে সে ঠিক পারবে। তবে শিকারকে আকর্ষিত করবার জন্য তো দরকার ভালো সাজপোশাকের, যা তার কাছে ছিলো না। একটা ভালো শেমিজ ছিল সেটাও ধোপার কাছে আটকা পড়ে আছে, টাকার অভাবে ছাড়াতে পারেনি। মুখে বার্ধক্যের কালো ছাপ লুকোবার পাউডারও নেই তার কাছে। মাটির খড়ি দিবে সেটাও সম্ভব নয়, কারণ ডিবের আলোতে মাটি খড়ি স্পষ্ট বোঝা না গেলেও লাইটের আলোয় তার স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বেগুন তার পুরনো এক নোংরা ময়লা শেমিজ পড়ে কোনোমতো মানানসই একটা সাজগোজ করে, কোন এক সৌখিন পুরুষের দেওয়া হিল তোলা জুতোটা পরে একজিবিশন মেলার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে।

পথে যাবার সময় চৌরঙ্গীর চৌমাথার একদল বখাটে ছেলে তাকে অভদ্র ইঙ্গিত করে। ভদ্র সমাজের নারী হলে এই অভদ্র ইঙ্গিতে রেগে যেত কিন্তু বেগুন এতে খুশি হয়ে উঠল। তার মধ্যে যে পুরুষকে আকর্ষণ করবার মতো ক্ষমতা এখনও বজায় আছে এটা ভেবে সে পুলকিত হয়ে উঠল।

এরপর বেগুন টিকিট কেটে মেলাতে প্রবেশ করল। মেলাতে প্রবেশ করে আলো ঝলসানো পথে না গিয়ে সে অন্ধকার পথ দিয়ে চলতে শুরু করল। কারণ বিদ্যুতের আলোয় যে মাটির খড়ির আড়ালে লুকিয়ে রাখা বার্ধক্যের কদর্য রূপটা সবাই দেখে ফেলবে। দীর্ঘক্ষণ ধরে হিল তোলা জুতা পরে হাঁটার কারণে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। অন্ধকার কোনে বেঞ্চিতে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নিতে বসলে সে তার প্রথম শিকারকে দেখতে পায়। লোকটি সেই বেঞ্চিরই এক পা্শে এসে বসে। বেগুন লোকটিকে যথাসামর্থ আকর্ষিত করবার চেষ্টা শুরু করল। পুরুষটিরও যে তার প্রতি আগ্রহ আছে সেটা সে বুঝতে পারলো। এরপর পুরুষটি যখন তার কোমরে হাত দেয় তখনই জ্বলে ওঠে বিদ্যুতের আলো। সে দেখতে পেল লোকটির বিকৃত অসুন্দর কদর্য রূপ। বেগুন

তার হাত কোমর থেকে ছিটকে ফেলে দিল। নিজের ক্ষুধা মেটানোর জন্য সে হয়তো অনেক পুরুষের সঙ্গেই মেলামেশা করেছে কিন্তু এমন কদর্য রূপ! তার গা গুলিয়ে ওঠে। সে সেখান থেকে চলে গেল। এরপর বেগুন কতকগুলি নিঃসঙ্গ পুরুষের চারিদিকে ঘোরাঘুরি শুরু করল, তাতে তার কোনো লাভ হলো না। উপরন্তু এক ব্যক্তির কাছে শুনতে হল তীব্র ভর্ৎসনা।

এক বৃদ্ধকেও সে শিকার করবার চেষ্টা করে। মনে রাখতে হবে বেগুন তার যৌবনের জ্বালা মেটাবার জন্য শিকার করতে পথে নামেনি, নেমেছে তার পেটের ক্ষুধা মেটানোর জন্য। সেই বৃদ্ধের কাছে অনেক টাকা ছিল। সেটা জানতে পেরেই বেগুন তাকে শিকার করতে চেয়েছে। কিন্তু তাকে সেক্ষেত্রেও বিফল হতে হয়েছে। গল্পের শেষে আমরা দেখতে পাই যে, শেষ পর্যন্ত বেগুনকে সেই বিকৃতদর্শন ভয়ংকর মানুষের কাছেই ফিরে আসতে হয়।

বেগুন চরিত্রের মাধ্যমে গল্পকার পতিতা জীবনের একটি দুর্বিষহ কালো দিকের কথা তুলে ধরেছেন। পতিতাদের ঘরে যে সমস্ত পুরুষেরা আসে তারা কেউ ভালোবাসার টানে আসে না, আসে পতিতাদের রূপের আকর্ষণে। টাকার বিনিময়ে তারা পতিতাদের ভোগ করে। সেক্ষেত্রে যে পতিতা যত আকর্ষণীয় তার কাছে তত অতিথির আগমন ঘটে। কিন্তু যখন পতিতাদের বয়স বেড়ে যাওয়ার কারণে তাদের সৌন্দর্য কমে যায়, কমে যায় শরীরের আকর্ষণীয় ক্ষমতা তখন তাদের অবস্থা হয়ে ওঠে ভয়ানক; যেমনটা হয়েছে এই গল্পে বেগুনের অবস্থা। তখন তাদের পেট চালানোও হয়ে ওঠে দুর্বিষহ ব্যাপার।

'সংসার সীমান্ত' গল্পটি বিগতযৌবনা পতিতা রজনী ও পাঁচবার জেল খাটা দাগি আসামী অঘোরকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। গল্পের প্রথমে আমরা দেখতে পাই যে, কেরোসিনের ডিবিয়া জ্বালিয়ে রজনী খরিদ্দরের অপেক্ষায় বসে আছে। গল্পকার রজনী প্রসঙ্গে বলেছেন- "কেরোসিনের ডিবিয়ার মৃদু আলোয় তাহাকে ভালো করিয়া দেখা যায় না। হাত দিয়া শিখাটিকে আড়াল করিবার দরুন তাহার মুখে ও দেহে গাঢ় ছায়া পড়িয়াছে। সত্য কথা বলিতে কি, দেখিবার আর সেখানে কিছু নাই। কোনোদিন তাহার দেহে ও মুখে প্রাণের শিখার দ্যুতি ছিল কিনা তাহাই সন্দেহ হয়। ধূম ও কালিই এখন তাহার সর্বস্ব। নারীত্ব ও যৌবনের সে একটা কুৎসিত বিকৃতি মাত্র।"[৫] রজনীর যৌবন যে আজ বিগত, সে কথা বোঝাতেই গল্পকার এমন মন্তব্য করেছেন।

এরপর আমরা দেখতে পাই, রজনী হঠাৎ চমকে ওঠে, কে যেন রজনীর দিকে আসছে। রজনীর একটু ভয়ও করছিল, তবে এক্ষেত্রে গল্পকার বলেছেন-"ভয় অবশ্য তাহার অমূলক, মানুষের কাজ হইতে আশঙ্কা করিবার তাহার আর কিছু নাই। জীবনের চরম ক্ষতি তাহার তো হইয়া গিয়াছে।"[৬] এখানে গল্পকার যে কিসের ইঙ্গিত করেছেন তা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। তারপর সেখানে অঘোর এসে উপস্থিত হয়। সে সদ্য সিঁধ কেটে পালিয়ে এসেছে, রজনীর ঘরে আশ্রয় নিতে চাইছে; এরজন্য সে রজনীকে

এক টাকা দিয়েছিল। আবার, ভোরবেলা ঘুমন্ত রজনীর আঁচল থেকে টাকাটা নিয়ে পালিয়ে যায় সে। লেখক বলেছেন-"বিশাল পৃথিবীর দুটি হতভাগ্য নরনারীর প্রথম মিলনের ইতিহাস এমনি কুৎসিত, এমন স্বার্থ ও লোভের কালিতে কলঙ্কিত।"[৭] এরপর, তাদের দ্বিতীয় মিলন হয় দুপুরবেলায়। অঘোর বাবু সেজে এসেছে। রজনী তখন মশলা বাঁটছিল। তাকে দেখে ঘৃণায় রাগে রজনী নোড়াটা তার মাথার দিকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারে, কিন্তু নোড়াটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে অঘোরের মাথায় না লেগে টিনের দেয়ালে লেগে প্রচন্ড একটা শব্দ করে। সেই শব্দ শুনতে পেয়ে সেখানে অনেক লোকজন জমা হয়। রজনী তাদের সামনে অঘোরকে চোর বলে সম্বোধন করলে সবাই মিলে অঘোরকে প্রচুর মারধর করে, রজনীকেও তাদের সঙ্গে হাত মেলাতে দেখা যায়। যদিও অঘোরকে সেবা শুশ্রূষার মাধ্যমে সারিয়ে তোলার ভার রজনীর উপরেই বর্তেছিল। তারপর বেশ কয়েকদিন কাটলো। ধীরে ধীরে অঘোরের প্রতি রজনীর খানিকটা মায়া ও ভালোবাসা জন্মাতে শুরু করে। রজনী অঘোরকে সারাদিন গালাগালি করলেও ". . .সকালবেলা কেমন করিয়া ঝাঁটা মারিয়া তাড়াইবার কথাটা বিস্মৃত হইয়া যায়।"[৮] এরপর একদিন রজনী অঘোরকে বলে যে, "তুই আর চুরি করতে পাবিনি।"[৯] অঘোরও রজনীকে ভালোবেসে ফেলে। তারা এক সময় ঘর বাঁধবার স্বপ্ন দেখে। এ প্রসঙ্গে গল্পকার বলেছেন, "গ্লানীর প্রগাঢ় অন্ধকারে যাহাদের অতীত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, বর্তমান যাহাদের ক্লেদ পঙ্কিল, তাহারাও ঘর বাঁধিতে চায়, পৃথিবীর ভাগ্যবান নরনারীদের জীবন লীলার অনুকরণ করিতে তাহাদেরও সাধ যায়!"[১০] অঘোর রজনীকে নিয়ে দূরে চলে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু রজনী যেতে রাজী হয় না, কারণ তার মাথায় প্রচুর দেনা, টাকা শোধ না করলে সে কোনো মতেই যেতে পারবেনা বলে অঘোরকে জানায়। রজনীর সেই দেনা শোধ করবার জন্য শেষ বারের মতো চুরি করতে গেলে অঘোর ধরা পড়ে। তার জেল হয়। গল্পের শেষে আমরা দেখতে পাই যে, "অঘোর দাস এখনো জেলে পচিতেছে। নিরবিচ্ছিন্ন বর্ষার রাতে এখনো নিশ্চয় কলিকাতার একটি কর্দমাক্ত নোংরা ও কুৎসিত পথের ধারে কেরোসিনের ডিবিয়ার ম্লান আলো দেখা যায়। ডিবিয়ার ধূমবহুল শীর্ণ হাতে সযত্নে বৃষ্টির ঝাপটা হইতে আড়াল করিয়া গভীর রাত্রি পর্যন্ত এখনো নিশ্চয় বিগতযৌবনা রূপহীনা রজনী একরাত্রের অতিথির জন্য হতাশ নয়নে পথের দিকে চাহিয়া প্রতীক্ষা করে।"[১১]

রজনী একজন পতিতা তার ঘরে নিত্যদিন নতুন নতুন পুরুষের আনাগোনা। তারা আসে নিজেদের কার্যসিদ্ধি করে আবার চলে যায়। তারা কেউ রজনীর মনকে স্পর্শ করবার চেষ্টা করে না। মনে রাখতে হবে জন্মসূত্রে কেউ পতিতা হয়ে জন্মগ্রহণ করে না, তারা কেউ পেটের দায়ে আবার কেউ অন্য কোনো কারণে এই পথে আসে। তাদেরও একটি কোমল মন আছে যে মন ভালোবাসতে চায়, চায় একটু সঙ্গ। গল্পে আমরা দেখতে পাই যে, অঘোর রজনীর মনকে নাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। অন্যদিকে অঘোর পাঁচবার জেল খাটা একজন দাগি আসামী। তার তিনকূলে কেউ নেই। প্রিয়জন

যে কি জিনিস তা তার জানা নেই। আহত হলে রজনী যখন তাকে শুশ্রূষা করে সারিয়ে তোলে তখন সে বুঝতে পারে যে প্রিয়জন কাকে বলে। সে রজনীকে ভালোবেসে ফেলে। তারা দুজন মিলে একটি সুখের নীড় বাঁধতে চেয়েছে, কিন্তু সমাজ তাদের সংসার বাঁধতে দেয়নি। তাদের ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে সংসারের সীমান্তে।

'সাগর সংগম' গল্পে আমরা দেখতে পাই যে, গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র দাক্ষায়ণী জলপথে নৌকাতে করে গঙ্গাসাগরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে। সেই নৌকাতে বাতাসি নামক এক বছর আষ্টেকের বালিকার সঙ্গে বচসা বাধে তার। পরে দাক্ষায়ণী জানতে পারে যে বাতাসি একজন পতিতার কন্যা। আসলে সে যে নৌকাতে করে গঙ্গাসাগরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে সেই নৌকাতেই একদল পতিতা উঠেছে। "নৌকা ছাড়িবার পর তাঁহাদের সঙ্গে বেশ্যার দলকে সহযাত্রী করা হইয়াছে জানিতে পারা অবধি দাক্ষায়ণী নৌকায় আর জলগ্রহণ করেন নাই। এখন আর উপায় নাই,নহিলে তিনি বোধহয় নৌকাও ত্যাগ করিয়া যাইতেন।"[১২] এমনকি "এই কয়দিনের ভিতর মাত্র দুইবার চড়ে নৌকা লাগানো হইলে তিনি ভালো করিয়া স্নান করিয়া সামান্য একটু আহার করিয়াছেন। অধিকাংশ সময়ই তাঁহার নৌকায় নিরম্বু উপবাস কাটিয়াছে।"[১৩] দাক্ষায়ণীর এই মানসিকতা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে পতিতাদের সমাজে কতটা ঘৃণ্য চোখে দেখা হয়। তথাকথিত যে ভদ্র সমাজে পতিতাদের ঘৃণার চোখে দেখে সেই সমাজের পুরুষ মানুষেরাই নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করবার জন্য পতিতাদের ঘরে ঢোকে। তখন আর তাদের জাত নষ্ট হয়না। এটা সমাজের দ্বিচারিতা ছাড়া আর কিছুই না।

এই গল্পে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পতিতারাও পুণ্যস্নানের মাধ্যমে পাপ বিমুক্ত হয়ে পবিত্র হওয়ার জন্য গঙ্গাসাগরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে। আসলে তাদেরও যে পুণ্যবতী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা আছে সেই বিষয়টি প্রেমেন্দ্র মিত্র গল্পে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

এর পর আমরা গল্পে দেখতে পাই পতিতা কন্যা বাতাসির ওপর দাক্ষায়ণীর ধীরে ধীরে মায়া জন্মাতে শুরু করে। একসময় তার মনে হয়েছে, "বাতাসির যে কলুষের মধ্যে জন্ম তাহারই বা প্রমাণ কি? গণিকারা নিজেদের স্বার্থসাধনের জন্য ভদ্র পরিবারের ছোট মেয়ে চুরি করিয়া লইয়া আসে, একথা তিনি শুনিয়াছে। বাতাসি যে তেমনি কোনো সদ্বংশের মেয়ে নয় - তাহাই বা কে বলিতে পারে? সদ্বংশে জন্ম না হইলে এত শীঘ্র তাহার এমন পরিবর্তন হইত না, এই কথাটাই বিশেষ করিয়া তাঁহার মনে হয়। যে অপরাধ তাহার নয়, ভাগ্যের দোষে তাহারই শাস্তি তাহাকে সারাজীবন বহন করিতে হইবে, এ কথায় এখন দাক্ষায়ণীর মন আর কিছুতেই সায় দিতে পারে না।"[১৪] গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্র দাক্ষায়ণীর এই ভাবনার মধ্যে দিয়ে পতিতা জীবনের একটি কালো দিককে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্র পতিতা চরিত্রের বা তাদের পারিপার্শ্বিকতার যে বর্ণনা দিয়েছেন তা আমাদের প্রাত্যহিক জগতের চেনা ছবি। 'মহানগর' গল্পের চপলা, 'সংসার সীমান্তে'

গল্পের রজনী, 'বিক্ষুব্ধ ক্ষুধার ফাঁদে' গল্পের বেগুন-এরা সবাই আর্থিক দৈন্যের শিকার। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রোমান্টিক মনন নিয়ে তাঁর পতিতা চরিত্রগুলিকে এঁকেছিলেন কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্র কল্লোলের কালে এসে পতিতা চরিত্রগুলির মধ্যে দিয়ে বাস্তব জীবনে রূপ পরিগ্রহ করেছেন। তাই শরৎচন্দ্রের তুলনায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের পতিতা চরিত্রগুলি অনেক বেশি বাস্তব ও কঠোর।

তথ্যসূত্র :

১. মিত্র, প্রেমেন্দ্র: ' প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প', দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট,কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ: ১৯৫২বৈশাখ ১৩৫৯, পৃষ্ঠা ৯৬
২. তদেব, পৃষ্ঠা ৯৭
৩. তদেব, পৃষ্ঠা ৯৮
৪. তদেব, পৃষ্ঠা ৯৯
৫. তদেব, পৃষ্ঠা ১২৪
৬. তদেব, পৃষ্ঠা ১২৫
৭. তদেব, পৃষ্ঠা ১২৮
৮. তদেব, পৃষ্ঠা ১৩১
৯. তদেব, পৃষ্ঠা ১৩৩
১০. তদেব, পৃষ্ঠা ১৩৪
১১. তদেব, পৃষ্ঠা ১৩৬
১২. তদেব, পৃষ্ঠা ৫৫
১৩. তদেব, পৃষ্ঠা ৫৫
১৪. তদেব, পৃষ্ঠা ৬৯

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :

১. চক্রবর্তী, সুমিতা: 'প্রেমেন্দ্র মিত্র', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাডেমি,১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র রোড, কলকাতা ৭০০০২০, প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৯৮
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিন্দিতা: 'প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প মননে ও সৃজনে', পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০০৫
৩. মিশ্র, অশোককুমার: 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস', সাহিত্য সঙ্গী, ৬ডি রমানাথ মজুমদার (স্ট্রিট দ্বিতল), কলকাতা ৭০০০৯, প্রথম প্রকাশ: ১৫ই আগস্ট ২০০৫

অন্তর্মুখী ও আধ্যাত্মিক মঙ্গলকাব্যে জাদুবাস্তবতার প্রভাব

রিম্পা হাটি
স্বাধীন গবেষক ও প্রাবন্ধিক

সারাংশ : মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যের ধারায় মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল কাব্য উদ্ভবের প্রেক্ষাপট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাদুবাস্তবতার বহু বিচ্ছিন্ন উপকরণ এই মঙ্গলকাব্যের বিস্তৃত পরিসরের মধ্যে এসে কালক্রমে আশ্রয় লাভ করেছে। আধুনিক সাহিত্যের মতো মঙ্গলকাব্যও জাদুবাস্তবতার লক্ষণবাহী।
সূচক শব্দ : জাদু ও বাস্তবতার সন্ধিরেখায় দোদুল্যমান, বাস্তবতার সাথে অধিবাস্তব উপাদানের সংমিশ্রণ, জাদুমিশ্রিত সমকালীন সমাজের দর্পণ।

বর্তমান বিশ্বসাহিত্যে জাদুবাস্তবতা ভীষণ জনপ্রিয়, বলতে গেলে তুমুল আলোচিত একটি বিষয়। বিশেষ করে ল্যাটিন আমেরিকার সাহিত্যে এর সফল প্রয়োগ ঘটেছে বিংশ শতকে। তবে তারও বহু পূর্বে যদি খেয়াল করি মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলোর দিকে অর্থাৎ পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মঙ্গল কাব্যের লেখকেরা তাঁদের সাহিত্যে জাদুবাস্তবতার সফল প্রয়োগ ঘটান। তাঁদের বিশেষত্ব এই যে, তাঁরা দেশজ পটভূমিতে এর প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। মনসামঙ্গল, চন্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল কাব্যের লেখকদের ভাষায় তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সাহিত্যের একটা নির্দিষ্ট ধরন বোঝাতে 'ম্যাজিক রিয়ালিজম্' এই আধুনিক শব্দটি ব্যবহার করা হয়। সমসাময়িক সাহিত্যে ম্যাজিক রিয়ালিজম্ বা জাদুবাস্তবতা বলতে বোঝায় যে কাহিনী বর্ণনার মধ্যে বাস্তবতার সাথে অধিবাস্তব উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটে। জাদু নিমেষে একটি অবস্থা থেকে আরেকটি অবস্থায় রূপ নেওয়ার মতো ঘটনা, যা চমকে দেয়, অবাক করে। জাদুবাস্তববাদী লেখকের লেখায় উপস্থাপিত ঘটনাটি ঘটবে জাদুর মতো, ঘটবে মুহূর্তের ভিতরে, কিন্তু সেটি যারা দেখবেন বা অনুভব করবেন, তারা এখানে থেকে এমন কিছু পেয়ে যাবেন যাতে বোঝা যাবে ঘটনা যে কারণে ঘটছে তার মূলে আছে কোন একটি গভীর সত্য, যা সম্পর্কে আর প্রশ্ন করা চলে না, বরং সেটি চরম বাস্তবতা।

বাংলার মঙ্গল কাব্যগুলি জাদুবাস্তবতার আধার। মঙ্গলকাব্যের কবিরা যে দেবতাদের উপলক্ষ করে সজীব মানুষের বাস্তব জীবনকথাকেই কাব্যের আধারে মূর্ত করে তুলেছেন, সে কথা আজকের দিনে বলাই বাহুল্য। সেই অর্থে পঞ্চদশ কিংবা ষোড়শ শতকে বাংলার লৌকিক পুরান হিসাবে যে মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হয়েছে, তা জাদুবাস্তবতারই রূপান্তর বলা যায়। মর্তে লৌকিক দেব-দেবীর পূজা প্রচলন এবং সেই পূজা প্রচলনকারীর আরাধ্য দেবতার কৃপালাভের আখ্যানই মঙ্গলকাব্যের বিষয়বস্তু।

বাস্তব ঘটনা বলে স্বপ্নের বিবরণ লেখা, শুধুমাত্র স্বপ্নের প্রাচুর্যকেই জাদুবাস্তবতার লক্ষণ বলা যায় না। কিন্তু মঙ্গলকাব্যে স্বপ্নের দাপট কিছু জায়গায় এত জোরালো যে স্বপ্ন আর বাস্তবের সীমানা সুস্থির থাকে না, আর এমন ঘটনা ঘটে যায়, যেগুলো সম্ভবের মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, যা জাদুবাস্তবতাসুলভ।

বাঙালির সংস্কার, আচার ও বিশ্বাসে যাদুবিদ্যার প্রভাব প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। প্রাকৃতিক নিয়মের কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় করতে না পেরে প্রাচীন যুগের মানব মন অলৌকিক উপায়ে তার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে — যাদুবিদ্যা সেই অতীন্দ্রিয় ক্রিয়াকলাপের বিষয়।

প্রাচীন যুগের বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন প্রকার যাদুমন্ত্র ও যাদুমন্ত্রের চর্চাকারী বিভিন্ন শ্রেণির লোকের কথা পাওয়া যায়। এদের মধ্যে যারা মন্ত্রাদির সাহায্যে সাপের বিষ নামায়, ঝাড়ফুঁক করে, তন্ত্রমন্ত্রাদির সাহায্যে ভূত তাড়ায়, তারা ওঝা বা গুনী। এইসব ওঝা বা গুনীর অস্তিত্ব আমরা প্রাক্-মঙ্গলকাব্যে খুঁজে পাই। ধাত্রী, বেদে অর্থাৎ সাপুড়ে, নটীরাও মন্ত্রগুনী হয়ে থাকেন। বৌদ্ধ ধর্ম তথা মহাযান ধর্মাবলম্বীদের শেষ শাখা ছিল সহজজান। এরপরই বৌদ্ধ ধর্ম অবলুপ্তির পথে চলে যায়। এই সময়েই গুহ্য তন্ত্র সাধনার ধারায় চর্যাপদের আবির্ভাব। চর্যাকারগণ তান্ত্রিক বৌদ্ধ নামে সমাজে পরিচিত ছিলেন। তাই তাঁদের পদে তন্ত্রোক্ত ভাবনার প্রতিফলনই ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। শাক্ততান্ত্রিকদের বিশ্বাস মানবদেহে শিব ও শক্তির একত্র অবস্থান বর্তমান। আর কুলকুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ ঘটিয়ে ষটচক্র ভেদে শিব ও শক্তির মিলন ঘটাতে পারলেই মোক্ষলাভে ব্রহ্মানন্দ লাভ করা সম্ভব। চর্যাপদে যাকে শূন্যতা করুণার মিলনে সহজানন্দ লাভ বা প্রাপ্তি বলা হচ্ছে। চর্যাপদ সেই গুহ্য তত্ত্বেরই প্রকাশ মাধ্যম; একইসঙ্গে যৌগিক ক্রিয়া সহ বৌদ্ধ তন্ত্রোক্ত ধ্যান ধারণার নানা কথা আমরা পাই চর্যাপদে।

লোকায়ত জীবনদর্শন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটির যথার্থ প্রেক্ষাপট। জাদুবাস্তবতার নানান ঘটনা আছে এই কাব্যে। বানখণ্ডে কৃষ্ণ বড়াই এর পরামর্শে রাধাকে মদনবানে বিদ্ধ করেছে। ঘটনাটি ম্যাজিক; মধ্যযুগের সাহিত্য ব্যতিক্রমবিহীনরূপে ম্যাজিকে ভারাক্রান্ত। কাব্যে ম্যাজিককে রাখা হয়েছে আমাদের বিশ্বাসের জগতের সীমার মধ্যেই। এই কাব্য জাদু ও বাস্তবতার সন্ধিরেখায় দোদুল্যমান। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের বানখণ্ডের ম্যাজিকের ঘটনাটিরও অবস্থান সেই একই বিন্দুতে। রাধাকে শরাঘাতে স্মরাতুরা করার কৃষ্ণ-কামনাটুকুও রূপক ছাড়া আর কিছু নয়। আসলে বড়ুচণ্ডীদাস মধ্যযুগের রুচির মুখ চেয়েই একটি অতিশয় সাধারণ সত্যকে জাদুবাস্তবতার আবরণ দান করেছেন।

মঙ্গলকাব্য মূলত দেবতাপ্রধান কাব্য। মঙ্গলকাব্যের সাহিত্যিক মতাদর্শ এমনই রাজনৈতিক আর বাস্তববাদী, অতিপ্রাকৃত কল্পনা তার নানা লেখায় অন্ধবিশ্বাস হলে চিহ্নিত করা হয়। টেরড্যাকটিল কাব্যে সশরীর ঢুকে পড়া মানে এই যে কাহিনীর সাধারণ বাস্তবতার পাশাপাশি আরেকরকম বিকল্প এবং বিরোধী বাস্তবতাও বর্তমান।

ম্যাজিক রিয়ালিজমের এই সকল উপকরণ দ্বারাই মঙ্গলকাব্য রচিত। কিছু প্রধান বিষয় ধর্মীয় সাহিত্য ছাড়া আর কিছু নয়, আবার কিছু বিষয় জাদুর পর্যায়ভুক্ত করা সমীচীন বলে মনে হয়। মঙ্গলকাব্য জনশ্রুতিমূলক বিষয়বস্তু অবলম্বন করে রচিত হয়েছে। এর একজন রচয়িতা থাকে সত্য, কিন্তু তিনি ইচ্ছামত এর বিষয়বস্তু নিজের মত পুনর্গঠন এমনকি পুনর্বিন্যাস পর্যন্ত করে নিতে পারেন না। নিতান্ত গতানুগতিক পথই তাকে অনুসরণ করতে হয়। এই কাব্যরচনার প্রেরণার মূলে কবি নিজে, তাও প্রকাশ্যে অস্বীকার করে এর মূলে যে দেবতার স্বপ্নাদেশের কথা উল্লেখ করে থাকেন, যাকে একপ্রকার ম্যাজিক বলেই মনে হয়।

লাতিন আমেরিকার আধুনিক সাহিত্যের মতো বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগে রচিত মঙ্গলকাব্যও জাদুবাস্তবতার লক্ষণবাহী। শব্দটির উল্লেখ এর পূর্বে অর্থাৎ পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে না থাকলেও মনসামঙ্গল কাব্যে এর তাত্ত্বিক চর্চা হয়েছিল। সাহিত্যসৃষ্টির পিছনে কবির কল্পনাবৃত্তিই মূল উৎস। কিন্তু কবির কল্পনা ভূমিভ্রষ্ট বস্তু নয়। সমাজজীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই কবিকল্পনার উদ্ভব। কবিরা স্বপ্নাদৃষ্ট হয়ে দেবতার মাহাত্ম্য বর্ণনায় লেখনী ধারণ করেন, যা জাদুবাস্তবকেই ইঙ্গিত করে। মঙ্গলকাব্যে পৌরাণিক ও লৌকিক ধর্মবিশ্বাসের মিলনপ্রচেষ্টার ইতিবিত্ত বিধৃত। তুর্কি আক্রমণে নিপীড়িত নিগৃহীত উপদ্রুত বাঙালিকে রক্ষা করার মতো কোনো রাজশক্তি ছিল না। তাই মঙ্গলকাব্যের কবিরা অনার্য দেবতাকে বরাভয়দাতা, নিরাপত্তা রক্ষাকারী, কল্যাণ বিধায়ক শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি জানালেন। শাস্ত্র ও পুরানের আদর্শকে কিছুটা মার্জিত করে, কিছুটা অলৌকিক শক্তির কল্পনা করে সমসাময়িক বাস্তব জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করা হয়েছিল।

ম্যাজিক রিয়ালিজম্ বা জাদুবাস্তবতা আসলে বাস্তবকে দেখবার এক বহুমাত্রিক এবং সামগ্রিক পদ্ধতি। মঙ্গলকাব্যের অন্যতম ধারা হিসেবে মনসামঙ্গল কাব্য এর ব্যতিক্রম নয়। এই কাব্যে সর্পদেবী মনসার পূজো প্রচলনের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। চাঁদসদাগর শিবভক্ত। তিনি নিম্নজাতির পূজিতা স্ত্রীদেবতার পূজা করতে নারাজ। চাঁদসদাগরের অনমনীয় ব্যক্তিত্বে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আধুনিকতা সূচিত হয়েছে। চাঁদ একনিষ্ঠ শিবভক্ত। শিবের বরে 'মহাজ্ঞান কবচ' লাভ করেছেন। এর সাহায্যে মৃত ব্যক্তি প্রাণ লাভ করে। চাঁদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু শংকর ওঝাকে মেরে ফেলে মনসা কৌশল করে এবং মোহিনী নারীর বেশে চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ করে, যা ম্যাজিকাল অনুভূতি তৈরি করে, একই সাথে পত্নীপ্রেম এবং পরনারী সংসর্গ সেযুগে ছিল একই চিত্তের দুই প্রকাশ, যা বাস্তবকে সূচিত করেছে। আবার মনসার প্রলোভনে বেহুলা-লখিন্দরের লোহার বাসরঘরে চুলপ্রমান ছিদ্রের মধ্যে সাপ প্রবেশ করে লখিন্দরকে দংশন করে, যা ম্যাজিক ছাড়া অন্য কিছু আবেদন সৃষ্টি করতে পারে না। সনকার বেহুলাকে তিরস্কার, বাস্তব অর্থাৎ বেহুলা চিরন্তন নারীর প্রতিনিধিরূপে রেখায়িত। সংকল্প ও আত্মপ্রত্যয়ের পরিচয়ে অদ্বিতীয়া বেহুলা। আবার মুচিনি রূপিনি মনসার কবিকে কাব্য রচনার আদেশ দেওয়া যা ম্যাজিকরূপে প্রস্ফুটিত। লখিন্দরের পুনর্জীবনলাভেও জাদুর চিত্র ফুটে

উঠেছে। মানবাত্মার প্রতি সহানুভূতিতে চাঁদ আজন্মপূজিত আদর্শের অটুট নিষ্ঠা ত্যাগ করে বেদনাবোধকে স্বীকার করে নিয়েছে। দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের মধ্য দিয়ে বাস্তববাদী শৈলীর বিষয়াবলী বেশ তাৎপর্যবাহী। মনসামঙ্গল কাব্যে জাদুবাস্তবের এইসব লক্ষণ দৃশ্যমান।

জাদুবাস্তবতার আভাস আমরা মধ্যযুগে রচিত চন্ডীমঙ্গল কাব্যেও পাই। চন্ডীদেবীর মাহাত্ম্য প্রচার মুখ্য বিষয় হলেও সমকালীন সমাজ ও পারিপার্শ্বিকতা তিনি উপেক্ষা করতে পারেননি। পৌরাণিক কাহিনীর মধ্য দিয়ে ধনী-দরিদ্র উভয় শ্রেণীর জীবন পদ্ধতি এবং একই সঙ্গে যৌথ পরিবারের সমস্যার বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা। চন্ডীমঙ্গলে উল্লেখিত কালকেতু উপাখ্যানে দেখতে পাই দেবী চণ্ডী একেক সময় একেক রূপ ধারণ করেছেন; তা বলা যায় জাদুবাস্তবতারই রূপান্তর। প্রখর বস্তুনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা এবং পর্যবেক্ষণ-নৈপুণ্য চন্ডীমঙ্গল কাব্যে লক্ষণীয় বিষয়বস্তু। এই বস্তুনিষ্ঠতার প্রতি অতি-আনুগত্যে বাস্তবের অবিকল অনুলিপি পাঠককে সচকিত করে, কিন্তু নন্দিত করে না। ব্যাধ - জীবনের প্রেক্ষিতে এ চিত্র কেবল বাস্তব নয়, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'অরুগ্ন বলিষ্ঠ হিংস্র নগ্ন বর্বরতায়' আঁকা। অনুরূপভাবে, কলিঙ্গরাজের কাছে ফুল্লরার আত্মসমর্পণের উপদেশে ক্রোধাক্ত কালকেতুর বর্ণনাও জীবনসঙ্গত। কালকেতুর পক্ষী শিকারের মধ্যে শিকারের একাগ্রতার দৃশ্য, পাখিটি ঘুরে ঘুরে পড়ার গতিময় চিত্র প্রত্যক্ষ বাস্তবতার উপভোগ্য। বনিকখণ্ডে সপ্তডিঙ্গা নিয়ে ধনপতি যখন সমুদ্রে তখন চন্ডী তার অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের মানসে সমুদ্রবক্ষে প্রবল ঝড় তুললেন। কোনক্রমে একটি ডিঙ্গা নিয়ে ধনপতি সিংহলের পথে কালিদহে পৌঁছলেন। সেখানে চন্ডী তাকে কমলেকামিনী রুপে এক অদ্ভুত দৃশ্যে দেখা দিলেন। সমুদ্রে ভাসমান এক শতদল পদ্মের উপর এক সুন্দরী নারী একটি বৃহৎ হস্তিকে একবার গিলছে আবার উদগীরণ করছে। এ তো ম্যাজিক ছাড়া সম্ভবপর নয়। দেবতার মহিমাকাহিনী লিখতে বসে চন্ডীমঙ্গল কাব্যের কবিরা আমাদের চিরপরিচিত এই লৌকিক সংসারের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না বিজড়িত মানব মানবীয় জীবনচিত্রকেই ফুটিয়ে তুলেছেন। চন্ডীমঙ্গলের কবিরা প্রত্যক্ষ বাস্তবের কবি এবং এক সুপ্রতিষ্ঠিত ধারার বাহন। জীবনের সুক্ষ, অপ্রত্যক্ষ ভাবব্যঞ্জনা তাদের স্পর্শ করেনি।

জাদুবাস্তবতা শব্দের মধ্যে জড়িয়ে থাকা 'বাস্তবতা' একটি বড় রকমের ভূমিকা পালন করে। কাহিনীটি বাস্তব পৃথিবীর বাস্তব কোন বিষয়বস্তুকে ঘিরে গড়ে উঠলেও এর ভেতর ফল্গুধরার মতো বয়ে চলে জাদু। বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগে রচিত ধর্মমঙ্গল কাব্য জাদুবাস্তবের অন্যতম এক বিখ্যাত প্রতিভূ। ধর্মমঙ্গল কাব্যে নায়ক লাউসেন ও ইছাই ঘোষ ছাড়া অন্যান্য নরনারী দেবতা-সম্পর্কহীন সাধারণ মানুষ। আত্মশক্তির উপর নির্ভর করেই তারা জীবনসমস্যার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কালু ডোম, লখাই ডোমনী প্রভৃতি তথাকথিত অন্তজশ্রেণীর নর-নারী ও কলিঙ্গা, কানাড়া প্রভৃতি অভিজাত বংশের নারীর সবাই প্রবল শৌর্য ও সাহসিকতার অধিকারী, যা একান্তই বাস্তব। অন্যদিকে রাজা হরিশচন্দ্র ও রানী মদনা নিঃসন্তান ছিলেন বলে সমাজ থেকে তাদের তিরস্কার ও

বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়।। তারা উভয়ে ধর্ম ঠাকুরের আরাধনা করে পুত্র লাভের বর পেলেন। শর্তানুযায়ী তাদের পুত্রকে প্রতিজ্ঞালব্ধ রাজা বেদনা সত্ত্বেও অবিচলিত চিত্তে লুইধরকে কেটে মাংস রান্না করলেন, ধর্মঠাকুর খুশি হয়ে লুইধরকে পুনর্জীবিত করলেন, যা পাঠক মনে ম্যাজিক্যাল অনুভূতির সৃষ্টি করে। ধর্মমঙ্গল আখ্যানটি যে পরিবেশে স্থাপিত তা কাল্পনিক হলেও সম্ভবপর। তার ঐতিহাসিক, ভৌগলিক আর রাজনৈতিক পটভূমি আমাদের চেনা লাগে। কখনো কখনো আখ্যানটি কিন্তু বাস্তবের নিয়ম ভেঙ্গে সম্ভাব্যতার রাজ্যের সীমা পার করে যায়।

জাদুবাস্তবতায় লেখক ন্যারেশনের মধ্যে সরল পর্যায়ক্রমিক বর্ণনার পরিবর্তে, অংশ ও পৌনপুনিক বর্ণনার ভেতর দিয়ে পূর্ণতায় পৌঁছান। এর বিশেষ লক্ষণ যন্ত্রণাময় বাস্তব থেকে মুক্তির নিমিত্তে স্বপ্নের বাস্তবে বিচরণ। ভারতচন্দ্রের লেখা অন্নদামঙ্গল কাব্যেও জাদুবাস্তবতার লক্ষণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতো এতে দৈবপ্রাধান্য কম, সে স্থান দখল করেছে মানুষ। এখানে দেবীর সন্তুষ্টিকামনা অপেক্ষা রাজার সন্তুষ্টিকামনা তীব্রতর। মূলত নদীয়ার রাজবংশের গৌরবময় ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে কবি সমকালীন ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে দৈর্ঘ্য ঘটনা মিশিয়ে নগরসংস্কৃতিসুলভ একটি আদিরসাত্মক প্রণয় উপাখ্যান রচনা করেছেন। ভারতচন্দ্রের কাছে যুগব্যাপী দেবতার ভন্ডামি ও স্বেচ্ছাচারিতা নির্দারুনভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে। মধ্যযুগের পৌরাণিক ও লৌকিক দেবতার অন্তঃসারশূন্যতা সামাজিক জড়ত্ব ও মিথ্যার প্রতি ভারতচন্দ্রের প্রাণের বক্র উক্তি   অন্নদামঙ্গলে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। শিবের প্রতি ছেলেদের ব্যঙ্গবিদ্রুপ ও কৌতুক পরিহাস ম্যাজিক্যাল, এর মধ্য দিয়ে দেবতার প্রতি অবিশ্বাস, তার ভন্ডামির মুখোশ খুলে দেওয়া, যা ভূত-প্রেতগন দক্ষযজ্ঞনাশে মেতে উঠেছে, যা আমাদের জাদুর বৈশিষ্ট্য দেখায়, এর পাশাপাশি তিনি বাঙালির স্বভাবসুলভ আবেগপ্রবণতা, রসবোধকে পরিস্ফুটিত করেছেন, যা বাস্তব এবং এতে জীবনদৃষ্টির গভীরতা ফুটে উঠেছে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যের ধারায় মনসামঙ্গল, চন্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল কাব্য উদ্ভবের প্রেক্ষাপট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সময় কবিরা সমাজের প্রয়োজনে কাব্য লিখতেন। সেই দিক থেকে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলি জাদুমিশ্রিত সমকালীন সমাজের দর্পণ। মানুষের সংস্কার-বিশ্বাস, আচার-বিচার, লোকাচার যুগ যুগ ধরে প্রচারিত ও প্রতিপালিত একটি সমাজ মানসের সমন্বিত রূপ। এর মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে সামগ্রিক জাতিসত্তা। ধাঁধার উত্তর দান, নায়িকার বারোমাসি ইত্যাদি প্রসঙ্গ প্রায় প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যেই বর্ণিত। বলা বাহুল্য এই সকল বিষয় জাদুবাস্তবতারই উপকরণ এবং জাদুবাস্তবতা থেকেই মঙ্গলকাব্যের মধ্যে এসে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। জাদুবাস্তবতার বহু বিচ্ছিন্ন উপকরণ মঙ্গলকাব্যের বিস্তৃত পরিসরের মধ্যে এসে কালক্রমে আশ্রয় লাভ করে। আধুনিক সাহিত্যের মতো মঙ্গলকাব্যও জাদুবাস্তবতার লক্ষণবাহী। শব্দটির উল্লেখ পূর্বে না থাকলেও মনসামঙ্গল কাব্যে এর তাত্ত্বিক চর্চা

হয়েছিল। মনসামঙ্গল কাব্যেও জাদুবাস্তবের লক্ষণ দৃশ্যমান। মনসামঙ্গল কাব্যের কবিদের সহজে জাদুবাস্তববাদী বলে শনাক্ত করা যায় না। অতিপ্রাকৃত কল্পনা বিভিন্ন লেখায় অন্ধবিশ্বাস বলে চিহ্নিত করা হয়। কাজেই এই কাব্যে স্বপ্নাদৃশ্য অর্থাৎ দেবীমাহাত্ম্য প্রচারের জন্য তা বাস্তববাদী শৈলীর নিয়মাবলী এমনভাবে ভাঙ্গা বেশ তাৎপর্যবাহী। কাহিনীর সাধারণ বাস্তবতার পাশাপাশি বিরোধী বাস্তবতাও বর্তমান। জাদুবাস্তব সাহিত্যের স্বভাবগত প্রক্রিয়া এই যে তার দুটি আলাদা আখ্যানের ধরনের মধ্যে কোন একটি স্তরভেদ স্থাপিত হয় না। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে পৌরাণিক ও লৌকিক সংস্কারগুলির একটি ইন্দ্রজালিক গুণ আছে বলে অনুভূত হয়। অর্থাৎ ইহার সুর চিত্র ও রসের ভিতর দিয়ে যেন একটি মধুর আবেশ পাওয়া যায়। চন্ডীমঙ্গলের নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে স্বপ্নরাজ্যটি সজীব হয়ে ওঠে। এই জগতের সঙ্গে বাস্তব জগতের কিছু সম্পর্ক থাকলেও তা বাঁধা নিয়মে সবসময় রচিত হয় না। দেবতার স্বপ্নাদেশের অর্থ সমাজের বাস্তবতারই নির্দেশমাত্র হয়ে দাঁড়ায়। সেইজন্য দেবতার স্বপ্নাদৃষ্ট রচনার মাধ্যমে কবিরা যা প্রচার করেন সমাজ তা নিঃসন্দেহে গ্রহন করতে পারে। অথর্ববেদে জানা যায়, বশীকরণের প্রতি মানুষের বিশ্বাস ছিল। মধ্যযুগের বণিকসমাজে যেহেতু নারীদের একাধিক সতীনের সাথে সংসার করতে হত, তাই স্বামীকে বশ করার জন্য লীলাবতীর কাছে পরামর্শ ও ঔষধ গ্রহণ করেছে। কবিকঙ্কনের সময় তৎকালীন লোকসমাজ অলৌকিকতায় বিশ্বাস করত। তার প্রমাণ বণিকখণ্ডের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। শ্রীমন্তের সিংহল যাত্রাকালে জলপথে বিভিন্ন জায়গায় পৌরাণিক উপাদানের প্রতি বিশ্বাস ও কমলেকামিনী দর্শন এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। যেমন —

“হেলায় কমলিনি উগারয়ে যুথনাথে।
পলাইতে চাহে গজ ধর বাম হাতে।।
পুনরপি রামা ধরি করয়ে গরাস।
দেখিয়া আমার হৃদে লাগয়ে তরাস।।
খদির তাম্বুল রাগ ওষ্ঠেতে না ছাড়ে।
গজ গিলে কামিনী চোয়াল নাহি নারে”।।

অন্যদিকে খুল্লনার ছাগ চড়ানোর সময় দেবী চণ্ডীর কৃপাদান অংশে ও অলৌকিকতায় বিশ্বাসের চিত্র পাওয়া যায়। যেমন —

“ভবানী বলিয়া রামা কাঁদিতে লাগিলা।
আচম্বিতে ব্রাহ্মণী সে চতুর্ভুজা হইলা”।।

কিংবা —

“অষ্ট বিদ্যাধরী সহ চাপিলেন রথে।
কনকের ঝারি দিয়া খুল্লনার হাতে”।।

মারণ-বশীকরণ-ঔষধিকরন ছাড়া জলপোড়া, তেলপোড়া, ধুলোপোড়া, হাত চালনা, বাটি চালনা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার করণ-প্রক্রিয়া প্রাচীনযুগীয় বাঙালি সমাজে আষ্টেপিষ্টে গেঁথে ছিল। লোকবিশ্বাসের ক্ষেত্রে দেখা যায় — কাঠুরিয়ার কাষ্ঠ ভার বহন দেখা, তেলির তেল বিক্রয়ের জন্য হাঁক শোনা, ভিক্ষা পাত্র হাতে যোগিনী দেখা অশুভ যাত্রাসূচক ছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দেখা যায় :

"কথো দূর পথে মো দেখিল সগুণী।
হাথে খাপর ভিখ মাঙ্গএ যোগিনী"।।

সুতরাং এইসব খন্ড খন্ড জীবনচিত্রের মাধ্যমে বাস্তবতার পরিচয় যেমন বিধৃত হয়েছে, তেমনই জাদুর স্বরূপটিও উদঘাটিত হয়েছে।

বস্তু বা বিষয়গুনের ধারা থেকে বিশ্বাসের জন্ম হয়। মঙ্গলকাব্যে ম্যাজিক রিয়ালিজম্ মানুষের আচার-আচরণ দ্বারা সমর্থিত হয়ে জীবনযাত্রার পথে স্থায়ী ও প্রথাগত স্বীকৃতি লাভ করে। ক্রমে এগুলি মনের গভীরে স্থান পায়।

- বিশ্বাস ও সংস্কারের কার্যকারন সম্পর্কে লোকের ধারণা অস্পষ্ট ও অব্যাখ্যাত হলেও সবকিছুই মূঢ়তাপ্রসূত নয়; অনেক সময় মানব জীবনের অভিজ্ঞতা ও প্রকৃতি নিয়মের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে।
- স্বপ্নদর্শনকে গুরুত্ব দেওয়া হত এবং সত্য বলে মনে করা হত। তাই দেখা যায় চাঁদকে দেবী চন্ডী স্বপ্নে যে নির্দেশ দেয় তা পালন করতে চাঁদ মনসার শত্রুতা শুরু হয়। চাঁদের ছয় পুত্রবধূ রাত্রে অমঙ্গলসূচক স্বপ্ন দেখে এক ভীষণ আকৃতি পুরুষ ছয় ভাইকে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে। এই স্বপ্ন সত্যি হয় ছয় পুত্রের মৃত্যুতে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বাঙালির জীবন নানা সংস্কার ও বিধিনিষেধ আবদ্ধ ছিল। অদৃষ্টবাদী ইহজীবন বিমুখ বাঙ্গালীর সাহিত্য তাই দেবাশ্রয়ী। ক্রমাগত বিপর্যয়ে সেদিন বাঙালি আত্মশক্তিহীন হয়ে পড়েছিল বলেই অদৃষ্টের বন্ধনকে অমোঘ বলে স্বীকার করে নিয়েছিল। চন্ডীমঙ্গলে বাঙালির এই জীবন সত্যটি স্বীকৃত হয়েছে। গ্রহ, নক্ষত্র, তিথি, বার, ব্রত, বিভিন্ন ধরনের অতিলৌকিক ক্ষমতা, মিথ, কর্মবাদ ইত্যাদির প্রতি বাঙালির একজাতীয় বিশ্বাস ছিল। তাই অনার্য ব্যাধ কালকেতুর শোনা যায় দৈববাদের কথা। ফুল্লরার মত রমণীর কণ্ঠে শুনি দৈব পরিহাসের কথা —

"দারুন দৈবের গতি কপালে দরিদ্র পতি।
পরিনু সম্বল-চিন্তা ফাঁদে"।। (মুকুন্দ ৪৮)

ব্যাধ সমাজেও এরকম অনেক অশুভ-শুভ নির্ণায়ক বিশ্বাস প্রচলিত ছিল, যেমন যাত্রাপথে গিরগিটি দেখে অশুভ বলে বিশ্বাস করা হত। কালকেতু বন যাত্রাকালে গিরগিটি দেখে অশুভ মনে করে এবং একারণে সারাদিনে সে একটি শিকারও পায়নি—

"গোধিকা দেখিয়া বলে তর্জন বচন।
তোমারে দেখিয়া আজু না পাইনু পশুগন"।।

(দ্বিজ মাধব /৪৮)

- মানুষ জীবশ্রেষ্ঠ কিন্তু প্রকৃতির সকল শক্তির চেয়ে বলিয়ান নয়। আত্মশক্তি ও দৈহিক শক্তির অভাব জীবন বিড়ম্বনার কারণ। মানুষ এর প্রতিকার কামনা করে। জীবনকে সে ভালোবাসে, জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব তারই। পীড়িত, বিঘ্নিত, লাঞ্ছিত জীবন দুঃখ ভোগ করে। যে জীবন পদ্ধতি এমন, যেখানে পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা ও ক্ষণে ক্ষণে বিপত্তির আশঙ্কা আছে, সেখানে তাকে পূর্বাহ্নে সচেতন হতে হয় এবং তার ফলাফল বিচারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। সংশয়সন্দিগ্ধ মনের এই দোলাচল অবস্থাতেই বিশ্বাস ও সংস্কারের প্রভাব পড়ে বেশি, যা জাদু ও বাস্তবতারই মিলিত রূপ।

সকল সংস্কারের মূলে আছে অমঙ্গল চিন্তা। অর্থহানি, স্বাস্থ্যহানি, শাস্তিভোগ, বিচ্ছেদ-বিড়ম্বনা ও বিপদ-আশঙ্কা থেকে অমঙ্গল চিন্তার উদ্ভব। অকল্যাণের মূলে আছে অপদেবতার কোপ, শয়তানের দুষ্কর্ম, ভূত-প্রেতের দৌরাত্ম প্রভৃতি। এদের প্রভাব থেকে মুক্তি প্রয়োজন। লৌকিক উপায়ে মুক্তির দুটো পথ মন্ত্র ও ক্রিয়া। কতকক্ষেত্রে শ্লোক, ছড়া, গান ও ঝাড়ফোঁকের সাহায্যে আত্মরক্ষার চেষ্টা হয়, কতকক্ষেত্রে লৌকিক আচরণ ও বাহ্যবস্তুর প্রয়োগ দ্বারা প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা হয়। মন্ত্র ও ক্রিয়ার দ্বারা কখন একত্রে, কখন স্বতন্ত্রভাবে প্রতিরোধের ব্যবস্থা হয়, এসব মন্ত্র, স্বপ্ন, অলৌকিক ক্রিয়ার পিছনে যে শক্তির প্রভাব আছে তা হল ম্যাজিক বা জাদুবিদ্যা।

জাদুবাস্তবতা প্রত্যক্ষ সমাজ মাত্র; সমাজ জীবনের ক্রমবিকাশের ধারার সঙ্গে এর ক্রমবিকাশের সূত্র গ্রথিত হয়ে থাকে।

সামগ্রিক আলোচনার নিরিখে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি — ম্যাজিক রিয়ালিজম সংজ্ঞায়িত হওয়ার বহু পূর্বে প্রাচ্য বাংলা সাহিত্যে বিশেষত মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে এর উপাদান রয়েছে। পূর্ববর্তী সকল অধ্যায়ে মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল কাব্য বিশ্লেষণ করে পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতক সময়কালে মধ্যযুগীয় জাদুবাস্তবতার বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। লোকবিশ্বাস, কুসংস্কার জাদু ও বাস্তবের মিলিত রূপ, যা কোন ব্যক্তিবিশেষের যেমন নয়, তেমনি একটি কালের বিষয়ও নয়। বহু মানুষের বহুযুগের চিন্তা চেতনার অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যেতে পারে এসবের মধ্যে। যুগ যুগ ধরে বহু মানুষের চিন্তা-চেতনা, কল্যাণ-অকল্যান, মঙ্গল-অমঙ্গলবোধ, দুঃখ-দারিদ্রপীড়িত জন-মানসের আশ্রয়, শান্তি ও সান্তনা লাভ ঘটেছে এর মধ্য দিয়ে। জাদুবাস্তবতার প্রভাব কত সুদূরপ্রসারী ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য সাহিত্যে।

মধ্যযুগীয় বাঙালি জীবন জাদুবাস্তবতার নিগড়ে আবদ্ধ ছিল। পূর্বালোচিত অধ্যায়গুলিতে তার প্রচুর দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে। যাত্রাপথের শুভাশুভ ও মঙ্গল-

অমঙ্গল সম্পর্কিত বিভিন্ন সংস্কার হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজেই পালিত হত। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত মনসামঙ্গল ও চন্ডীমঙ্গল কাব্যে হিন্দুসমাজের পাশাপাশি মুসলমান সমাজেও বিভিন্ন সংস্কার পালিত হতে দেখা যায়, যার মধ্যে জাদু ও বাস্তবতার চিত্র প্রতিফলিত।

জাদুবাস্তবতা আসলে অলৌকিক সম্পর্কে আস্থাশীল এক মুহূর্তের সচেতনতা, যা লেখককে পাঠকের কাছে বাস্তবের অবাস্তব দিকগুলি মেলে ধরতে সাহায্য করে। ফলে অবাস্তব উপাদান বাস্তবতাকে তার জায়গা থেকে সরিয়ে দেয়নি, বরং তাদের সংমিশ্রণ ঘটেছে।

মঙ্গলকাব্যের কবিসম্প্রদায় জাদুবাস্তবতার দৃষ্টিভঙ্গির তাত্ত্বিক অধিকারী ছিলেন না অবশ্যই। এই মতবাদ যদিও অপেক্ষাকৃত আধুনিক একটি মতবাদ, তবু এর একটি সর্বকালীন গ্রহণযোগ্যতার জায়গা আছে। মঙ্গলকাব্যে জাদুবাস্তবতা ব্যবস্থার প্রতিরূপে ও তার বিবর্তনের ছবিতে এর ভাবরূপের একটি আভাসকে অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যায়।

গ্রন্থপঞ্জি :

১) মনসামঙ্গল, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ (সম্পাদনা – অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রাদেব), লেখাপড়া, ১৩৪৮।

২) কবিকঙ্কন চন্ডী, মুকুন্দ চক্রবর্তী, (সম্পাদনা - ড. সুকুমার সেন), সাহিত্য একাডেমি, ১৩৮২ ।

৩) ধর্মমঙ্গল, ময়ূর ভট্ট, (সম্পাদনা – অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রাদেব), জি. ভরদ্বাজ অ্যান্ড কোং, ১৮৩১ ।

৪) অন্নদামঙ্গল, ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর, (সম্পাদনা – অধ্যাপক কার্তিক ভদ্র), এস ব্যানার্জি অ্যান্ড কোং, ১৯৮৩ ।

৫) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, শ্রী সুকুমার সেন, প্রথম খন্ড, আনন্দ সংস্করণ ১৯৪০ ।

৬) মধ্যযুগের কবি ও কাব্য (বৈষ্ণব কবি ও কাব্য), শঙ্করী প্রসাদ বসু, জেনারেল, ১৯৯৭ ।

৭) সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, রত্নাবলী, ২০০৩ ।

৮) বাংলার লোকসাহিত্য, শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৫৪ ।

৯) বাংলার লোক-সংস্কৃতি, ড. ওয়াকিল আহমেদ,বাংলা একাডেমি, ১৯৬৫ ।

১০) আন্তর্জাল সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য ।

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর নির্বাচিত ছোটগল্পে পরিবেশ ও মানুষের দ্বান্দ্বিক খতিয়ান

দীপা ঘোষ
স্নাতকোত্তর, বাংলা বিভাগ,
ড.বি.আর. আম্বেদকর শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবন ধারারও বদল ঘটেছে এবং বদল ঘটেছে পরিবেশেরও। আমরা যত আধুনিক উন্নত ভাবে আমাদের চারপাশকে গড়ে তুলছি, ততই ক্ষতি করে ফেলছি পরিবেশের। পরিবেশের নানাবিধ ক্ষতির জন্য বিশেষভাবে দায়ী মানুষ। তাই পরিবেশ তার রোষও ফিরিয়ে দিচ্ছে মানুষের ওপর। বর্তমানে যেভাবে পরিবেশ দূষণ ঘটছে এবং যে ক্ষতি হয়ে চলছে পরিবেশের তার প্রভাব ব্যক্তি মানুষের জীবনে নেমে এসেছে অন্ধকার, এই অন্ধকারের কিছু ছবি আমরা স্বপ্নময় চক্রবর্তীর লেখায় দেখতে পাই, বিশেষ করে তাঁর ছোটগল্পগুলিতে। তাঁর গল্পগুলির মধ্যে 'ক্যারাক্কাস', 'ফুল ছোঁয়ানো'-র মধ্যে তাঁর পরিবেশ সচেতনের মনোভাব বিশেষ উল্লেখযগ্যতার দাবী রাখে। 'ক্যারাক্কাস' গল্পে রয়েছে কারখানার দূষিত পদার্থ পুকুরে মিশে বিষময় হয়ে উঠেছে, তেমনি সেই পুকুরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত মানুষের জীবনও বিষময় হয়ে উঠেছে। পরিবেশের বুকে এই সকল পুকুর অভিশাপ। অন্যদিকে 'ফুল ছোঁয়ানো' গল্পটিতে আর্সেনিকের সমস্যা কীভাবে মানুষের জীবনকে বিধ্বস্ত করে দেয় তারই ছবি রয়েছে। আমি আলোচ্য প্রবন্ধটিতে এই গল্পদুটির পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশের এই অভিশাপ খেটে খাওয়া মানুষের জীবনকে কীভাবে অভিশপ্ত করে তোলে সেই ছবিই তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছি।
মূল শব্দ : পরিবেশ, দূষণ, স্বপ্নময়চক্রবর্তী, ক্যারাক্কাস, ফুলছোঁয়ানো।

আজকের দিনে সারা বিশ্বজুড়ে মানুষকে সবচেয়ে বেশি ভাবিয়ে তুলছে পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে। মানুষের আধুনিক হওয়ার পাশাপাশি তারা যত যন্ত্র আবিষ্কার করতে শিখছে আর ক্রমশ পরিবেশের ভারসাম্য হারিয়ে যাচ্ছে, যার ফল ভোগ করছে প্রতিটা মানুষ তথা প্রাণীজগৎ, উদ্ভিদজগৎ, জলবায়ু পরিবর্তন, ঋতু পরিবর্তন-এর মত প্রকৃতির প্রভাব আমাদের পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে বিশেষভাবে, আর এরজন্য দায়ী মানুষ। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে মানুষের দ্বারা পরিবেশ বেশি মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে। শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাবে পৃথিবী বিপন্ন। মানুষ নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য পরিবেশের উপর এহেন নির্মম, নির্বিচার আঘাত হানছে ফলত তাদের পরিবেশ, প্রকৃতিও সেই আঘাত ফিরিয়ে দিচ্ছে যার ফল আমরা সকলেই পাচ্ছি বৈকি। সরকার নানান কমিটি তৈরি করেছে এই দূষণকে আটকানোর জন্য, গাছ লাগানো হচ্ছে ৫ই

জুন, কিন্তু ঐ যে গোড়া কেটে আগায় জল ঢাললে যা হয় আর কি। যাইহোক, পরিবেশের সমস্যাকে কেন্দ্র করে অনেক মতবাদ গড়ে উঠেছে সেগুলিকে আমরা পরিবেশবাদ বলছি এবং পরিবেশ বিষয়ক চিন্তা-চেতনা যখন সাহিত্যের বিষয় হয়ে ওঠে বা সাহিত্য যখন পরিবেশের উন্নয়ন ও মানুষের সম্পর্কের দ্বান্দ্বিক খতিয়ানকে ধারণ করে তখন তাকে আমরা পরিবেশবাদী সাহিত্য বলতে পারি। অনেক কবি সাহিত্যিকরাই পরিবেশ সচেতন হয়ে কলম ধরেছেন তাদের মধ্যে ব্যতিক্রমী কথাসাহিত্যিক হলেন স্বপ্নময় চক্রবর্তী।

আমরা তাঁর ছোটগল্পের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতার মনোভাব খুঁজতে সচেষ্ট হব। স্বপ্নময় চক্রবর্তী তাঁর ছোটগল্প সম্পর্কে নিজেই জানাচ্ছেন –

"গল্প গড়া নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পছন্দ করি আমি। আর যা বিশ্বাস করি না, তা লিখি না।"[১]

পরিবেশের সমস্যাকে কেন্দ্র করে যে সকল কথাসাহিত্যিকরা কলম ধরেছেন আধুনিক কালে, তাদের মধ্যে স্বপ্নময় চক্রবর্তীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর 'ক্যারাক্কাস', 'ফুল ছোঁয়ানো' – গল্প দুটিতে এমনই পরিবেশের সমস্যাকে কেন্দ্র করে মানুষের জীবন কীভাবে জটিল আকার ধারন করে তারই উল্লেখযোগ্য দিক প্রকাশ পেয়েছে। স্বপ্নময় চক্রবর্তী তাঁর গল্প সম্পর্কে আমাদের জানাতে গিয়ে বলেছেন –

> "গল্প কোন ঘটনার ধারাবিবরণীও নয়। ঘটনাটি হ'ল সেই ধুলোর কণিকাটি, যাকে কেন্দ্র করেই বাষ্প ঘনীভূত হয়, বৃষ্টি-ফোঁটা তৈরি হয়। কিংবা বাস্তবের ঘটনাটি হ'ল সেই শূককীট, গুটিপোকার মতন থাকে। ভালবাসা ওকে প্রজাপ্রতি করে। অথবা ছোট্ট কুঁড়িটি, যা গল্পে ইচ্ছে-কুসুম ফোটানো।"[২]

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর গল্প যে কোন ধারাবিবরণী নয়, বাস্তবের মাটিতে ভর করেই যে তাঁর ভাবনা পরিলক্ষিত হয় সেকথা আমরা যারা তাঁর গল্প পাঠক সকলেই জানি। তেমনই মাটির গন্ধযুক্ত দুটি গল্প 'ক্যারাক্কাস' ও 'ফুল ছোঁয়ানো' গল্প দুটি পাঠ করলে আমরা বুঝতে পারব তিনি পরিবেশ তথা মানুষ নিয়ে কতটা সচেতন। আর সচেতন বলেই পরিবেশের এমন গুরুতর সমস্যা যা মানুষের জীবনকে প্রতিনিয়ত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে, এমন গুরুতর কথা বা সমস্যা নিয়ে তিনি কলম ধরেছেন।

কারখানার এক শ্রমিকের আত্মকথন দিয়ে শুরু হয়েছে 'ক্যারাক্কাস' গল্পটি। কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ বা রাসায়নিক পদার্থ দিনের পর দিন জলে মিশে গিয়ে জল দূষণ ঘটাচ্ছে এতে কারখানার মালিকের হয়তো লাভ হচ্ছে কিন্তু তার নিজের স্বার্থের জন্য পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে এবং সেই ক্ষতির প্রভাব মানুষ তথা উদ্ভিদ, প্রাণীকুলের উপর হানছে এক অভিশাপ যার ফলে হাজারো জীব প্রজাতি শেষ হয়ে যাচ্ছে। মানুষের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলছে এই বিষ। গল্পটিতে এমনই এক কারখানার অ্যাসিড যুক্ত জল যাতে রয়েছে অ্যাসিড, সোডা মিশ্রিত জল, আর্সেনিক ইত্যাদি রাসায়নিক পদার্থ একটি পুকুরে এসে পড়ছে এবং পুকুরের জলকে বিষে

পরিণত করছে। এই পুকুরের জল থেকে ধোঁয়া বের হয় অনেক রঙের ধোঁয়া, সবুজ, হলুদ, গোলাপ ইত্যাদি। কোথাও বা ধোঁয়া কুয়াশার মতো ঝাপশা এবং ঝাঁঝালো গন্ধ, যে গন্ধে কাশি আসে। - এমন জলের ক্ষমতাকে বোঝানোর জন্য গল্প কথক বলেছেন–

"কোত্থেকে উড়ে এল একটা ঝরাপাতা।
জলের ভিতরে পড়েই সাদা হয়ে গেল।"[৩]

- সাধারণ পুকুরের জলে পাতা পরলে সাদা হয় না আমরা সকলেই জানি। তার মানে লেখক এমন এক পুকুরের কথা বলেছেন সেটা সত্যি সত্যিই বিষ পুকুর, অ্যাসিডে সবুজ পাতা যদি বিবর্ণ হয়ে যায় তাহলে সেখানে প্রাণীকুল থাকবার কোন প্রশ্নই আসে না। গল্পকথক এই পুকুরের শোভা সম্পর্কে জানাতে গিয়ে লিখেছেন –

> "এই পুকুরের পাশে একটা গাছ আছে। গাছের মতন বহু আগে গাছ ছিল। মরে গেছে। পাতাগুলো সব সেই কবে ঝড়ে গেছে, আর ওঠেনি। কাঠ আছে। মরা কাঠ, কাঠের শরীর। শরীরটা তবু পড়ে যায় না। মাটিতে শিকড়। গাছের ঝুরি মিছিমিছি নেমেছে মাটিতে। এখানে মাটিতে কোন ঘাস নেই। পুকুরের কাদার রং ভারী অদ্ভুত। কোথাও সাদা, কোথাও কালো। কোথাও শেওলার মতো সবুজ। কোথাও হলুদ রেখা, কোথাও মাটির গায়ে রামধনুর ছাপ। পুকুরের জলে তেল ভাসে। তাতে রোদ্দুরে পড়ে রামধনু হয়।"[৪]

-এ বর্ণনা শুনলেই গা শিরশির করে ওঠে, আমাদের ভাবনায় পুকুরের যে চিত্র ফুটে ওঠে তার সম্পূর্ণ উল্টো এই বিষপুকুর। সত্যিই বিষপুকুর নামটা সার্থক বটে। কী বলেন আপনারা। আর যাই হোক এই পুকুরে কোন মাছ তো দূরে থাক বিষাক্ত প্রাণী বা কোন প্রাণ থাকতে পারে না, যখন আমরা ভাবছি তখন, কারখানার শ্রমিক অর্থাৎ গল্পকথক হঠাৎই পুকুরের জলে বুটবুটি দেখতে পেয়েছেন। সেই বুটবুটি সামনে আসছে, পিছনে যাচ্ছে, প্রাণের বুটবুট তিনি সাবধানে এগিয়ে যান এবং বুটবুটির তোলায় একজোড়া চোখ দেখতে পান, তিনি নিজেও বিশ্বাস করতে পারছেন না, কারণ–

> "এ তো বিষপুকুর। কারখানার জল নালা দিয়ে এসে এই পুকুরে পড়েছে। এই পুকুরের সামনে কঙ্কালের মুখ আকা বোর্ড আছে। সাবধান। জল ছুঁইবেন না।"[৫]

-লেখা থাকে, সেখানে কেমন করে প্রাণ থাকতে পারে। তার পর তিনি নিজে বিশ্বাস করে তার স্যারকে দেখান, স্যার বঁড়শিতে চিংড়ি গেথে সেই মাছ ধরতে বসলেন এবং স্যার মাছ ধরলেন মাছটি-

"হাত খানিক লম্বা। ড্যাবা-ড্যাবা চোখ। সারা গায়ে আঁশ নেই একটুও। খরখরে গা। গিরগিটির মতন।"[৬]

- মাছটি দেখে স্যার গম্ভীর হয়ে গেলেন এবং ইউরেকা, ইউরেকা বলতে লাগেন কারণ এটি নিউ স্পেসিস। নতুন প্রজাতি, এর নাম দিলেন ক্যারাক্কাস।

মাছ ধরার পর যখন শ্রমিকটি স্যারকে জানায় সেই প্রথম মাছটি দেখেছে তখন স্যার নিজের ক্রেডিট নেওয়ার জন্য তার অপিসের শ্রমিকটিকে সেই বিষপুকুরে ফেলে দিতে দ্বিধাবোধ করে না। যেমনটা আমরা আমাদের চারপাশে দেখে থাকি আর কি এবং সেই শ্রমিকটিও চাকরি যাবার ভয়ে চুপ করে থাকে। বিষপুকুর থেকে উঠে শ্রমিকটি জানায় –

> "আমার জামার কাপড় পুড়ে গেছে। ঝুরঝুর করে ঝরে যাচ্ছে। আমার গায়ের চামড়াটা কী রকম খড়খড়ে হয়ে গেছে গিরগিটির চামড়ার মতো।"[৭]

- এবং বাড়ি গেলে তার স্ত্রী তাকে চিনতে পারে না, সেই পাতার মতো বিষপুকুরে পড়ে শ্রমিকটির গায়ের রংও বিবর্ণ, পুড়ে গেছে চামড়া, কালো কুঁচকে গেছে চামড়া খড়খড় করছে, চুল সাদা, ভ্রু সাদা, চোখ বের হয়ে এসেছে তার। এমন শরীর দেখে তার স্ত্রী আলাদা শুয়ে পরে। এবং কারখানার সকলে দেখে তাকে টিটকিরে দেয়। কিছুদিন পর কাগজে স্যারের ছবি বেরোয় এবং কারখানার ছবি, বিষপুকুরের ছবি বেরোয় সেখানে বিষপুকুরের এই আজব মাছের কথা লেখা হয়। দেশ-বিদেশ থেকে নানান সাহেব-সুবো আসে পুকুরে বেড়া দেওয়া হয়। চৌকিদার পাহারা দেয়। এই প্রসঙ্গে শ্রমিকটি বলে –

> "আমি কিন্তু ঠিক বুঝেছি আর যেন আমার মতো কেউ না পড়ে যায় সে জন্য এরকম ব্যবস্থা নয়, আসলে ওই আজব মাছের জন্যই এই পাহারা।"[৮]

এই পুকুরের জল কিনতে চায় আমেরিকা, জার্মান কোম্পানি এবং এই পুকুরের সেই মাছের চামড়া দিয়ে তৈরি হয় গ্লাভস। গ্লাভসটি –

> "অ্যাসিড প্রুফ, অ্যালকালি প্রুফ, রেডিও অ্যাকটিভিটি প্রুফ।"[৯]

- গ্লাভস ছাড়াও বিষপুকুরের মাছের চামড়া দিয়ে এপ্রন, মুখোশ বানানো হবে এবং তার জন্য কোম্পানি এমন বিষপুকুর বানাবে এবং মাছের চাষ করে মাছের চামড়া বেচবে। তারজন্যে আরও কারখানা তৈরি হবে। বিষপুকুরের মাছ আবিষ্কার করে কোম্পানির লাভ হলেও ক্ষতি হয়ে গেছে গল্পকথকের অর্থাৎ শ্রমিকটির দাম্পত্য জীবনের। সে অসহায় হয়ে পরে। শ্রমিকটি জানায়-

> "হাসি মুখের ভিতরে আমার তেঁতুলবিচির মতো দুঃখ শক্ত হয়ে থাকে। বউকি আমার দুঃখ টের পায়?"[১০]

গল্পকথকের এহেন কথায় আমাদের আর বুঝতে বাকী থাকে না যে তিনি কতটা কষ্টে আছেন। শ্রমিকটি আবার জানায় –

> "একদিন রাত্তিবেলা আমার ঘুম ভেঙে গেলে নিচের মাদুরে শুয়ে থাকা বউ-এর কান্না শুনি। আমি খাট থেকে নেমে যাই। বউ-এর গা ধরে বলি, কেঁদো না। বউ আরও কেঁদে ওঠে। আমি ওর চোখের জল মুছিয়ে দি। ওর গায়ে আমার খড়খড়ে হাত বুলোই। চামড়ায় কষ্ট হলেও ও কিছু বলে না। ওর মুখের দিকে মুখ চলে যায়, ও ছিটকে গিয়ে আবার কেঁদে ওঠে।"[১১]

- মধ্যবিত্ত একটি সংসারে টাকা-কড়ি খুব বেশি না থাকলেও সেখানে ভালোবাসা থাকে, সুখ-শান্তি থাকে, কিন্তু পরিবেশের এমন অভিশাপে তার জীবনেও অভিশাপ বয়ে নিয়ে আসে, তার সংসারের সুখকেও বিষিয়ে দেয় ঐ বিষপুকুর। আর সেই বিষে গল্পকথক ও তার স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন বিবর্ণ ও অদ্ভুত হয়ে যায় ক্যারাক্কাসের মতন।
তাইতো শ্রমিকের অসহায় স্ত্রী নিজের সৌন্দর্য বিসর্জন দিয়ে তাদের দাম্পত্য জীবনের সুখ শান্তিকে ফিরিয়ে আনতে চায়। গল্পকথক বাধা দিলে ক্ষোভে সে জানায়, বলে –

> "বরং হই বিচ্ছিরি, সুখে থাকব।
> কাল দেখেছি গাছতলায় দুটো গিরগিটি কত সুখ করছে। আমিও বরং তোমার মতো হই, তাহলে আমারাও সুখী হব।"[১২]

একদিন কথকের স্ত্রী বিষপুকুরে স্নান করতে আসে মরণের ভয়কেও তুচ্ছ জ্ঞান করে কারণ তার স্বামী হঠাৎ করে কুৎসিত যাওয়ায় তার কাছে যেতে হয়তো তার ভয় এবং বাধা দু'ই আসতো, দুজনেই যদি কুৎসিত হয় তাহলে সে ভয়, বাধা কেটে যাবে সেজন্য সে পুকুরে স্নান করে আসে। কথক জানাচ্ছেন –

> "সাদাভ্রুর তলায় বেড়িয়ে আসা চোখে আনন্দ আলো ফোকাস মারছে। সারা গায়ে গুঁড়ি গুঁড়ি কাটা-কালচে, খরখরে। ঝোলা চামড়ার মুখে জুঁই ফুল হাসি। আমি কিছু বলবার আগেই আমাকে জড়িয়ে ধরল ও । অনেকদিন পর আমাদের সুখ এল।"[১৩]

-শ্রমিকের জীবনে সুখ ফিরে এলেও, কোম্পানির সাহেববাবুদের মনে সুখ নেই কারণ লোভের এবং অদূরদর্শিতার জন্য একটি নতুন প্রজাতি নিঃশেষ হয়ে যায়। এরই মধ্যে গল্পকথকের ছেলে হয়। ছেলে দেখতেও নাকি ভূতের মতন, ধাই জানায়। কথকের কথায় –

> "ছেলেটার চামড়া ঝোলা ঝোলা। সারা চামড়ায় গুঁড়ি গুঁড়ি কাটা। মাথা থেকে বেড়িয়ে এসেছে ড্যাবা ড্যাবা চোখ। আমার মুখে স্থির হাসি লেগেই থাকে। পাড়া প্রতিবেশীরা ভূত দেখতে আসছে । ভূতের জন্মকথা ছড়িয়ে গেছে দূর দূরান্তে।"[১৪]

-স্যার আসলেন ছেলের চামড়া টিপে আঙুল দিয়ে দেখে সেই আগের মতন বলে উঠলেন 'ক্যারাক্কাস ... নিউ ক্যারাক্কাস...।' কথাটি শুনে গল্পকথকের মনে পড়ে 'ক্যারাক্কাস' মাছের কথা, যেভাবে সেই প্রজাতি ধ্বংস হয়ে যায়। তার ছেলের বা ভবিষ্যৎ চিন্তা করে সে হয়তো স্থবির হয়ে পড়ে কিন্তু তার মুখে হাসির মুখোস থাকাতে কেউ সেই কষ্ট দেখতে পারে না, সকলে হাসি মুখ দেখে। এইভাবে মানুষের সৃষ্টি বিষপুকুর পরিবেশের ক্ষতি করে এবং সেই ক্ষতি গল্পকথকের মতো শ্রমিকের জীবনে ডেকে আনে অভিশাপ।

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর আর্সেনিকের সমস্যা নিয়ে গল্প 'ফুলছোঁয়ানো' এই গল্পে দেখা যায় গল্পের নায়ক হীরক সে সিরিয়ালের চিত্রকর এবং ব্যাঙ্কে চাকরি করে। তার

ডিরেক্টর জানিয়েছেন নতুন কাজ চাই, তাই সে এবার অ্যাম্বুলেন্সে মৃত্যু দেখাবে ভেবেছে। ভাবতে ভাবতে সে ট্রেনে করে শ্বশুর বাড়ি যাবার সময় তার ব্যাগ ট্রেনে ফেলে এসেছে। বউকে এ ঘটনা জানাবে না ঠিক করেছিল সে, কিন্তু বউ সোহাগীকে বলতে বাধ্য হয়। এরপর ট্রেনে হীরকের ব্যাগটা পেয়ে ফোন করে হীরককে বাঁশপোঁতা থেকে এক ভদ্রলোক। অগত্যা হীরককে তার ব্যাগটি আনতে বাঁশপোঁতা যেতে হয়। বাঁশপোঁতা গ্রামে গিয়ে জানতে পারে হীরক ভদ্রলোকটি নাম আসগর আলি। হীরক জানায় লোকটির সম্পর্কে –

> “ওর চুল দাঁড়ি সাদা। রোগা চেহারা। হাত জোড়া করেই আছে। ওর নখের রং কালো, হাতের চামড়া গিরগিটির মতো খরখরে।”[১৫]

-কারণ বাঁশপোঁতা গ্রামের জলেও আর্সেনিক। আর আর্সেনিক যুক্ত জল খেয়ে এখানকার নাকি বেশিরভাগ লোকেরই এমন অবস্থা। আমরা সকলেই জানি ভূগর্ভের জল দূষণের প্রধান উৎস আর্সেনিক আর এই আর্সেনিক যুক্ত জল পান করলে প্রতিনিয়ত – আক্রান্ত ব্যক্তির ত্বক খসখসে হয়ে যায়। ব্ল্যাকফুট ডিজিজ, এজমা, ব্রংকাইটিস ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে এবং এথেকে মৃত্যুও হতে পারে। আর এই গ্রামের লোক আর্সেনিক যুক্ত জল খেয়ে নিজেদের প্রতিনিয়ত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে, এমনকি সদ্যজাত শিশুদেরও। এগ্রামে আর্সেনিকের কথা শুনে হীরক কিছু খেতে চায় না, এই আসগর আলির ছবি কাগজে ছেপেছে কারণ তিনি গাইঘাটার বাঁশপোঁতা গ্রামের আর্সেনিকোসিসের রোগী বলে। আসগর আলীর স্ত্রী প্লেটে করে খেজুরিগুড়ের চাক আর কাঁসার গেলাসে জল নিয়ে আসলে হীরকের মনে পড়ে তার নখের কালচে ছোপের কথা। পশ্চিমবঙ্গে ৮টি জেলায় ৩২ লক্ষ মানুষ বিপদমাত্রার চেয়ে বেশি আর্সেনিকযুক্ত জল খেতে বাধ্য হচ্ছেন। এর মধ্যে দশ হাজার মানুষ এখন আর্সেনিকোসিস রোগে আক্রান্ত। এর মধ্যে তিন হাজার মানুষ মৃত্যুর প্রতীক্ষায় – এমন কথায় লিখেছে কাগজে এবং আসগর আলীর কবিতা ‘আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান’। কবিতাটি সে হীরককে পড়ে শোনায় –

“মরণ রয়েছে লেকা পানির ভিতরে
মরণ বেঁধেছে বাসা শরীর গভীরে।
নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে শুনি মরণের গান।
আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান।
মায়ের স্তনেতে রাখা দুধের মতন
রাখে পানি বসুন্ধরা করিয়া যতন
মানুষের লোভ নেয় সে পানি নিঙাড়ি
মাতা বসুন্ধরা কাঁদে, পড়ে অশ্রুবারি।
লোভই পরম রিপু বুঝিয়াছি সার
আমাকে ঝাঁঝরা করে, করে যে অসাড়
ঘুনের মতই ক্ষয় করে অহর্নিশ

তারপর তাহাতে ঢোকে যত পাপ বিষ।"[১৬]

সত্যি সত্যি আমরা বিপদ জেনেও কিছু কিছু কাজ করি বেঁচে থাকার তাগিদে। তেমনই এই আসগর আলির মতো বহু মানুষ বেঁচে থাকার জন্য মরবে নিশ্চিতে জেনেও এই আর্সেনিক যুক্ত জল খেতে বাধ্য হয়। সরকার থেকে কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয় না এইসব মানুষদের জন্যে। শুধু ভোট নেবার সময় প্রতিশ্রুতি দেয় এ হবে, তা হবে ইত্যাদি। এভাবেই চলছে দেশ তথা সমাজ। এরপর আসগর আলি হীরককে শ্রীকৃষ্ণের কালীয়নাগ দমনের গল্প শোনায় এবং করুণ মুখে অসহায়ের মতন বলতে থাকে –

"আমাদের তো কৃষ্ণ নাই, কে পিতিকার করবে?
মাটির তলার পানি বিষ হয়ি গেছে।"[১৭]

সে আরও বলে হীরককে –

"আপনার কোলেকাতার লোক পুন্যবলে কলের পানি পাচ্ছেন। আমরা পাব না। তবে ভোট দিয়েছি। গতবার রবারস্টাম্প ছিল, এবার বোতামে টিপে ভোট। আমি বললাম ভোট দেবনি। নেতারা বললেন কেন দেবে না? তোমার হাতের অবস্থা তো এখনও এমন হয়নি যে বোতামটাও টিপতে পারবে না।"[১৮]

গ্রামাঞ্চলের খেঁটে খাওয়া মানুষগুলি এমনি ভাবেই ভরসা করতে ভালোবাসে। বিশ্বাস করে ঠকে। আর নেতারা ঠকাতেই ভালোবাসে সবকালে সব জায়গায়। এরপর আবার আসগর আলি শোনায় তার আর্সেনিকের কাব্য –

"দুনিয়ার বুকে আসে যে পাক শিশুরা
দুনিয়াতে কোনও দোষ করেনি তাহারা
আমরাই তাহাদের দিতেছি যে বিষ
আমরাই শয়তান দৈত্য আমরা ইবলিশ।"[১৯]

আসলে আমরা সকলেই পরিস্থিতির শিকার। আমাদের ইচ্ছা থাকলেও উপায় থাকে না। তাইতো শিশুদেরকেও সেই বিষজল দিয়ে তাদেরকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিচ্ছে বাঁশপোঁতা গ্রামের মানুষের মতন বহু গ্রামের মানুষ।

আসগর আলির বাড়িতে একটি বাচ্চা মেয়ে থাকে তার নাম ফতিমা। তাকেও গ্রাস করেছে এই বিষ। আসলে আসগরের কোন সন্তান নেই তাই সে প্রতিবেশীর এই বাচ্চা শিশুটিকে খুব স্নেহ করে, তাই তার কাছেই থাকে সে। গল্প পাঠে জানা যায় –

"বাচ্চাটার পা দুটো লিকলিকে। ডান হাতও খুব অপুষ্ট। বাঁ হাতটা কিছুটা ভালো। মুখ দেখে মনে হয় সাত আট বছর বয়েস, কিন্তু শরীর দেখে বছর তিনেকের বেশি মনে হয় না। যদ্দুর মনে হয় রিকেট।"[২০]

হীরক এই গ্রামে আসার আগে লজেন্স কিনে আনে বাচ্চাদের জন্য কিন্তু বাচ্চা দেখতে পায় না শুধু ফতিমা ছাড়া। তাই সে জিজ্ঞাসা করে বাচ্চাদের কথা আসগরের কাছে। আসগর জানায় –

> “বাচ্চা কাচ্চা এখন পাবেন কোথায়? ওরা সব তো ফুল ছোঁয়াতে গেছে। আমার অবিশ্যি নিজের কোন বাচ্চা কাচ্চা নাই। সবাই আমার বাচ্চা।”[২১]

এসব অঞ্চলে জলে আর্সেনিকের পরিমাণ বেশি থাকায় সন্তান উৎপাদনের মাত্রাও কমে যায়, যেমন কমে যায় ফসলের ফলের পরিমাণ। তাইতো আসগর আলির সন্তান নেই এবং এখনকার ফসলের ফুলে কৃত্রিম ভাবে পরাগ সংযোগ করতে হয় সেই কাজেই বাচ্চারা সকলে যায়। হীরকের কাছে বোতলের জল দেখে আসগর বলে অসহায় ভাবে –

> “আপনা ব্যাগে কি ওটা বোতলের পানি? দশ টাকা দামের? নুইকে রেখেছিলেন? ... আমার এই ফতিমারে ক’ঢোক বোতলের পানি খাওয়ান না। পাক পানি। আর্সেনিক নাই। পিওর। পিওর।”[২২]

এবং সে তার স্ত্রীকেও সেই জল খাওয়াতে যায়। এবং বলে চাঁদপাড়া বাজারে পাওয়া যায় এই জল। দশটাকা দাম তার। টাকা না থাকায় হয়তো কিনে খেতে পারে না। ক্ষমতা থাকলে কি আর বিষজল খেয়ে রোগে ভুগে মরতে বসে, না ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়। তাই এরা অসহায়, এদের কথা কেউ ভাবে না, এরা এভাবেই বাঁচে-মরে । এদের টাকা না থাকলেও ভালো হৃদয় আছে আর তাইতো সে হীরককে এগিয়ে দিতে গিয়ে বলে –

> “আবার আসবেন বলতি পারছি কই। বাইরের লোক আসলি এক ঢোঁক পানি পর্যন্ত মুকি দিতি ভয় পায়। আমাদের এ দিকির গাঁয়ে ছেলেদের বে-সাদী হয় না। কেউ মেয়ে দিতি চায় না।”[২৩]

আসগরের থেকে হীরক জানতে পারে এ দিকের দশ-বারোটা গ্রামে কমসে কম একশো জনের অবস্থা তার মতো। আর বেশির ভাগ মানুষের নখে কালচে আভা। বাচ্চাদের লজেন্স দিতে আসগর মাঠে যায় ওরা ফুল ছোঁয়াচ্ছিল, হীরক ফুল ছোঁয়ানো কি জানতে চাইলে আসগর উত্তর দেয় –

> “এখানে ড্যাঙা জমিতে এখন পটল চাষ চলতিছে। পটলের ফুল এল। এখন তো আর অত প্রজাপতি টজাপতি ফড়িং টড়িং নেই, পোকা মারার বিষে সব শেষ। এ ফুলের রেণু ও ফুলি না লাগলে বীজ হবে কী করে? বাচ্চারা তাই কচি কচি আঙুলে ফুল ছোঁয়ায়। এ ফুল থেকে ও ফুলে। পয়সা পায়।”[২৪]

বড়োদের দিয়ে এ গ্রামে একাজ হয় না কারণ তাদের আঙুল রোগের জন্য মোটা এজন্য। আসগর ফতিমাকে পুষ্যি নিতে চেয়েছিল কারণ তার ছেলেমেয়ে নেই। সে বেশিদিন বাঁচবে না জানে, তাই তার স্ত্রী যাতে একা হয়ে না পড়ে সেজন্য ফতিমাকে কাছে রাখতে চেয়েছিল যাতে তার টাইমপাস হয়ে যায়। কিন্তু ফতিমার মা রাজি হয়নি। কারণ -

> “ওর তো রিকেট, ওই বাচ্চার হাত কখনও পুরুষ্ট হবে না, আঙুল কোনদিন মোটা হবে না। সরু সরু আঙুলে ফুল ছোঁয়াতে পারবে।”[২৫]

- অর্থাৎ ফতিমা সারাজীবন পয়সা রোজগার করতে পারবে ফুল ছুঁইয়ে এজন্য তার মা রাজি হয়নি। এ অঞ্চলে প্রজাপতি নেই কীটনাশক প্রয়োগের ফলে প্রজাপতির সংখ্যা কমে যাওয়ায় প্রজাপতিদের কাজ এখানকার বাচ্চারা করে থাকে তাই তাদের অনেক প্রয়োজন সমাজে। এরাই ফসলের বংশ টিকিয়ে রাখার কাজ করে চলেছে এবং পয়সাও রোজগার করে আনছে ফুল ছুঁইয়ে তাইতো আসগর যখন বাচ্চাদের নাম ধরে ডাকে মনে হয় প্রজাপতিরা ছুটে আসে। এজন্যই হীরকের বাড়ি ফিরে সোহাগীর স্ফীত গর্ভের উঠা নামা দেখে তার মনে হয় –

> "আগামি প্রজন্ম আসছে। ...... আয় প্রজাপতি,
> ফুল ছোঁয়াবি অ্যায়।"[২৬]

এ গল্পের মতন এভাবেই গ্রামাঞ্চলে, বা মফঃস্বলে আর্সেনিকের সমস্যা বিরাট আকার নেয়। শুধু আর্সেনিক নয় আলাদা আলাদা সমস্যাও। সেখানকার মানুষকে মৃত্যু জেনেও এগিয়ে যেতে হয় টিকে থাকার জন্য। পতঙ্গের মতো আলো দেখলেই ঝাঁপ দিয়ে মরে তারা, তাইতো আলোচ্য গল্পটিতে বিষ থাকা সত্বেও সেই জল পান করে বাচ্চা থেকে বুড়ো, কারণ জলের আরেক নাম জীবন। আর সেই জীবন বাঁচানোর জন্য বিষজল খেয়ে ধুকতে ধুকতে মরে বহু মানুষ। মানুষ কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে কর্মক্ষমতা হারিয়ে অথর্বের ন্যায় চেয়ে থাকে নেতাদের দিকে আর তাদের দেবতার দিকে। এভাবেই স্বপ্নময় চক্রবর্তীর গল্প 'ক্যারাক্কাস' ও 'ফুল ছোঁয়ানো' – গল্প দুটিতে পরিবেশের এই ক্ষতিকে মুখ্য করে তার কবলে পড়া সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকা কীভাবে দুর্বিষহ হয়ে ওঠে, কীভাবে স্বপ্ন ভেঙে যায় চোখের সামনে এসকল দিকই তুলে ধরেছেন, এবং তার ভাবনা যে কতটা সুদূর প্রসারী এবং গভীরতার পরিচয় দিয়ে গেছেন। তিনি যে কতটা পরিবেশ সচেতন তা তাঁর এই গল্প দুটি পড়লে বোঝা যায়। 'বাংলা গল্প ও গল্পকার' গ্রন্থে অরুণ কুমার ঘোষ তাই যথার্থই বলেছেন –

> "তাঁর গল্পের থীম হিসেবে প্রাধান্য পায় শোষণ, বঞ্চনা, গ্রাম-নগরের সমাজ-জীবন ও রাজনীতিতে ব্যাপক দুর্নীতি, সমাজ পরিবেশের অবক্ষয়ে ব্যক্তি চরিত্রের বিনষ্টি, মধ্যবিত্ত নিধার্যতা ও সুবিধাবাদ, মুনাফার সর্বগ্রাসী লোভ, পার্থিব সাফল্য লাভের নির্বিবেক লোলুপতা, স্বপ্নময় গ্রামীণ- পরিমণ্ডলের বাস্তবতাকে সজীব সানুপুঙ্খতায় উপস্থাপন করেছেন, অবিরত ব্যবহার করেছেন গ্রামীণ ভাষার সংলাপ।"[২৭]

তাইতো 'ক্যারাক্কাস' গল্পে বিষপুকুরে নতুন প্রজাতির মাছের সন্ধান দিয়েও কারখানার শ্রমিককে বিষপুকুরে পরে তার শরীরের সৌন্দর্যের সাথে সাথে তার জিন ও দাম্পত্য জীবনও নষ্ট হয়ে যায়। তার বিকৃত, কুৎসিত চামড়ার মতো তার জীবনও বিষপুকুরের মতো বিষময় হয়ে ওঠে এবং নতুন ক্যারাক্কাস জন্ম দেয় এবং তা নিয়েও শুরু হয় মুনাফা।

আবার 'ফুল ছোঁয়ানো' গল্পে আর্সেনিকের প্রভাবে গোটা এলাকার ক্ষতি হয়ে যায়। সেই এলাকার ছেলেদের বিয়ে হয় না, সন্তানহয় না। অল্পবয়সে কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে ঢুলে পড়ে। হারিয়ে যায় প্রজাপতি, কৃত্রিমভাবে পরাগ সংযোগ করে গ্রামের ক্ষুধে শিশুরা পয়সার লোভে। এভাবেই স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ছোটগল্পে বাস্তবতার শিশুরা সজীব সানুপুঙ্খতায় উপস্থাপন করে পরিবেশ ও মানুষের দ্বান্দ্বিক খতিয়ান আমাদের উপহার দিয়েছেন।

তথ্যনির্দেশ:

১. স্বপ্নময় চক্রবর্তী, শ্রেষ্ঠগল্প, দেজ পাবলিশিং।। কলকাতা ৭০০০৭৩, তৃতীয় সংস্করণ : জুন ২০১৯, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬, পৃ.৭

২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭

৩. পূর্বোক্ত, পৃ.১২৫

৪. পূর্বোক্ত, পৃ.১২৫

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫

৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭

৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭

৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৮

৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৮

১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৯

১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৯

১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৯

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৯

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩০

১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫১

১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫২-৫৩

১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৩

১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৪

১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৪

২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৪

২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৫

২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৫

২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৬

২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৬

২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৬-৫৭

২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৭

২৭. অরুণ কুমার ঘোষ, বাংলা গল্প ও গল্পকার

নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দ) সন্ন্যাস-পূর্ববর্তী জীবনে সংগীত : একটি তাত্ত্বিক আলোচনা

প্রীতম কাঠাম
সহকারী অধ্যাপক, সঙ্গীত বিভাগ,
মুগবেরিয়া গঙ্গাধর মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : বিবেকানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। রায়পুরে পিতার কাছে সংগীতের হাতেখড়ি এবং ফিরে আসার পর কলকাতায় বিভিন্ন ওস্তাদদের কাছে সংগীত এবং বাদ্যযন্ত্র শিক্ষা তথা সংগীতের তাত্ত্বিক বিষয়ে জ্ঞান লাভ। গায়ক রূপে কলেজ জীবনে বন্ধুমহল তথা কলকাতায় সুনাম অর্জন, ব্রাহ্মসমাজ তথা বিভিন্ন সভা-সমিতিতে যোগদান এবং গায়ক রূপে মধ্যমণি হয়ে ওঠা, সংগীতের গ্রন্থ প্রণয়ন, শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে সংগীত পরিবেশনের একাধিক মুহূর্ত এই আলোচনায় তুলে ধরা হয়েছে।

নরেন্দ্রনাথের জীবনকালকে মোটামুটি দুভাগে ভাগ করলে; একটি ভাগ গৃহস্থ জীবন ও আরেকটি সন্ন্যাস জীবন। তাঁর গৃহী জীবনে (২২ বছর পর্যন্ত) ঘাত-প্রতিঘাত ও দ্বন্দ্বের মাঝেও গৃহস্থ জীবনে সংগীতের যে অপরিসীম গুরুত্ব, তা এই আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু।

সূচক : সংগীত, নরেন্দ্রনাথ, শিক্ষা, পাখোয়াজ, কণ্ঠস্বর, শ্রীরামকৃষ্ণ।

মূল বিষয় :

উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সংগীত:- নরেন্দ্রনাথের সংগীত শিক্ষার সূচনা পিতা বিশ্বনাথ দত্তর হাত ধরেই। কৃতি আইনজীবী বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন একাধারে কাব্য, সাহিত্য ও সংগীত প্রেমী। তিনি সংগীতের শুধু পারদর্শী ছিলেন না, রীতিমতো ওস্তাদদের কাছে সংগীতশিক্ষা করেছিলেন। শ্রী বিশ্বনাথের পিতা দুর্গাপ্রসাদ মহাশয়ও সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়। মহেন্দ্রনাথ দত্ত অর্থাৎ নরেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ভ্রাতার লেখা থেকে আমরা জানতে পারি যে- "পিতামহ দুর্গাপ্রসাদ দত্তের কণ্ঠস্বর অতি সুমধুর ছিল এবং বেশ গাহিতে পারিতেন".[১] এখানে আমরা বুঝতে পারছি যে নরেন্দ্রনাথ বংশপরম্পরায় সঙ্গীতকে পেয়েছেন। এরপর মহেন্দ্রনাথ দত্ত, পিতার সংগীত চর্চা নিয়ে আরেক জায়গায় উল্লেখ করেছেন "পূজনীয় বিশ্বনাথ দত্ত জীবনের এক সময়ে ওস্তাদ রাখিয়া কিছু সংগীতও অভ্যাস করিয়াছিলেন। মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে অবস্থান কালে তিনি আপনার মনে মাঝে মাঝে বেশ সু-স্বরে গাহিতেন".[২] এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, তিনি কিছুকাল পশ্চিমাঞ্চলে অর্থাৎ রায়পুরে অবস্থানকালীন সংগীত চর্চা করেছেন বলে শুধুমাত্র অনুমান করা যায়; ওনার সংগীত শিক্ষা সম্পর্কে কোথাও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া

যায় না। এমনকি ওনার সঙ্গীত গুরু সম্পর্কেও তথ্য অজ্ঞাত। আরেকটি পুস্তকে ওনার টপ্পা, ঠুংরি ও গজল গানের সঙ্গে বিশেষ পরিচিতি ছিল বলে জানা যায়, যেখানে উল্লেখ আছে নরেন্দ্রনাথ পিতার কাছে এই সকল সংগীতশিক্ষা করেছিলেন যে-

“সংগীতেও হাতেখড়ি এইখানে হয়।
পিতৃপাশে টপ্পা ঠুংরি গজল আদায়”-[৩]

উল্লেখযোগ্য যে তিনি আইনি ব্যবসার কারণে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন সংগীত চর্চার বিখ্যাত স্থানগুলিতে যেমন লক্ষ্মৌ, দিল্লি, লাহোর, রাজপুতানা, ইন্দোর, রায়পুর, বিলাসপুর ইত্যাদি শহরে বসবাস করেছেন। সংগীত পীঠস্থানে বসবাস করেছেন এবং এই ধরনের সংগীত-শিক্ষা করেননি, সংগীতপ্রেমী বিশ্বনাথ এই সুযোগ ছেড়েছেন বলে মনে হয় না। বিশ্বনাথ দত্তের সংগীত বিষয়ে আরেকটি প্রামানিক গ্রন্থে পাওয়া যায় যে “বিশ্বনাথ অতিশয় সংগীত প্রিয় ছিলেন এবং তার কণ্ঠস্বর ছিল চমৎকার। তিনি সাগ্রহে স্থির করেন যে নরেনের সংগীতশিক্ষা করা উচিত; কারণ সংগীতকে তিনি অনাবিল আনন্দের উৎস মনে করতেন”।[৪] নরেন্দ্রনাথের গান প্রসঙ্গে ভ্রাতা ডক্টর বি. এন. দত্ত এক জায়গায় বলেছেন, “নরেন্দ্র শাস্ত্রীয় সংগীতে একজন সুদক্ষ গায়ক ছিলেন। এই রুচি তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেন তার পিতার কাছ থেকে। পিতাও যৌবনে কিছুকাল সংগীত চর্চা করেছিলেন”।[৫] উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া এই সংগীত সম্পর্কে আমরা যথেষ্ট তথ্যের দ্বারা নরেন্দ্রনাথের সংগীত জীবনে পদার্পণ সম্পর্কে সন্ধিহান হলাম। অন্তত তাঁর পিতামহের জীবনকাল থেকে দত্তবংশের সংগীত চর্চার ইতিহাস আমরা পাই।

সংগীত শিক্ষা:- রায়পুরে বসবাসকালীন পিতা বিশ্বনাথের কাছেই ১৩/১৪ বছর বয়সেই নরেন্দ্রনাথের সংগীতে হাতেখড়ি বলে আমরা জানতে পারি। সেই হিসেবে প্রথম গুরু পিতা বিশ্বনাথকেই স্বীকার করতে হয়। এ সম্পর্কে স্বামী শ্যামানন্দ তাঁর পুস্তকে স্পষ্ট বলেছেন-

“সংগীতেও হাতেখড়ি এই খানে হয়।
পিতৃপাশে টপ্পা ঠুংরী গজল আদায়”।[৬]

রায়পুরে সম্ভবত দেড় বছর বসবাস করেছিলেন সপরিবার বিশ্বনাথ দত্ত। যাইহোক এর থেকে আমরা নরেন্দ্রনাথের প্রাথমিক সংগীতশিক্ষার কথা জানতে পারি। এরপর পিতা বিশ্বনাথ দত্তের কলকাতা ফেরার পর ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে নরেন্দ্রনাথ যথাক্রমে মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এরপরেই প্রেসিডেন্সি কলেজে (১৮৮১খৃঃ) এবং এফ.এ.পরীক্ষা স্কটিশচার্চ থেকে দিয়েছিলেন।[৭] যতদূর জানা যায় প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার পর কিংবা কলেজ জীবনের প্রথম অবস্থায় নরেন্দ্রনাথের ওস্তাদদের কাছে সংগীত শিক্ষার সূচনা হয়। পিতা বিশ্বনাথ, নরেন্দ্রনাথের পদ্ধতিগত সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা করেন শ্রী বেণীগুপ্তের কাছে।[৮]

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী লেখক প্রমথনাথ বসু জানিয়েছেন "সুপ্রসিদ্ধ সংগীত বিশারদ আহম্মদ খাঁর শীষ্য বেণীগুপ্ত নামে একজন ওস্তাদের নিকট তিনি সংগীত-শিক্ষা করিয়াছিলেন"।[৯] প্রসঙ্গত বলে রাখি; আহম্মদ খাঁ নামে একাধিক খেয়াল গায়ক কলকাতায় এসেছিলেন, মনে করা হয় বেহালার বিখ্যাত বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগীতগুরু আহম্মদ খাঁর কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।[১০] তিনি এও জানান যে বেণীগুপ্তের কাছে নরেন্দ্রনাথ চার থেকে পাঁচ বৎসর সংগীত শিক্ষা করেছিলেন এবং আরো জানান যে, নরেন্দ্রনাথ "কলেজের পড়াশোনা অপেক্ষা উহাতেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন"।[১১] নরেন্দ্রনাথের প্রথম সঙ্গীতগুরু বেণীগুপ্ত বা বেনী ওস্তাদ সম্পর্কে গিরিশচন্দ্রের একটি নিবন্ধে আমরা পাই "স্টারে 'চৈতন্যলীলা'র সময় থেকে যতগুলি ধর্মসম্বন্ধীয় নাটক অভিনীত হয়, তাহার গীতগুলি সুরতালে সংযোজিত করিবার ভার সঙ্গীতাচার্য স্বর্গীয় বেণীমাধব অধিকারী গ্রহণ করেন। ইনি রামায়েৎ বৈষ্ণব; সুপ্রসিদ্ধ গায়ক আহম্মদ খাঁর প্রধান ছাত্র ও শহরে একজন উচ্চ শ্রেণীর গায়ক বলিয়া পরিচিত ছিলেন"।[১২] আরেকটি জায়গায় অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন "সুপ্রসিদ্ধ সংগীতাচার্য বেনীমাধব অধিকারী 'দক্ষযজ্ঞে'র গানগুলির সুমধুর সুর সংযোজনা করিয়াছিলেন"।[১৩] যেহেতু আমরা প্রথমেই জানতে পেরেছি এই বেণী ওস্তাদ বা বেনীগুপ্ত বা বেনী মাধব অধিকারী, আহম্মদ খাঁয়ের ছাত্র, এবং এই বেণী ওস্তাদের নামের বিষয়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের উক্তি সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করি। এর থেকে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে, নরেন্দ্রনাথের প্রধান সংগীতগুরু বেনীমাধব অধিকারী মহাশয়।

ভূপেন্দ্রনাথ তাঁর মাতার মুখে এও শুনেছিলেন যে, কাশী ঘোষালের কাছেও নরেন্দ্রনাথ সংগীত শিক্ষা (বাদ্যযন্ত্র) করেছিলেন। প্রচলিত আছে যে কাশী ঘোষাল আদি ব্রাহ্মসমাজের পাখোয়াজ বাদক ছিলেন, সম্ভবত নরেন্দ্রনাথ তাঁর কাছে ওই যন্ত্রটি তথা তবলার বাদনকৌশল আয়ত্ত করেছিলেন।[১৪] কাশী ঘোষালের পাখোয়াজ বাদন সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের উল্লেখে পাওয়া যায় যে এই কাশী ঘোষাল আদতে ছিলেন ব্রহ্মসংগীত রচয়িতা। তিনি ছিলেন সাধারণ ব্রহ্মসমাজ ভুক্ত। কলকাতায় আগমনের সময় হিসেবে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ১৮৯৩ খৃঃ উল্লেখ করায় উনার কাছে নরেন্দ্রনাথের পাখোয়াজ শিক্ষা অসম্ভব বলে মনে হয়। শাস্ত্রির মহাশয় আরো উল্লেখ করেছেন তিনি আদতে পাখোয়াজ বাদক রূপেও পরিচিত ছিলেন না।[১৫] মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম থেকে প্রকাশিত স্বামীজীর বৃহৎ জীবন কথায় উল্লেখ আছে,– "তিনি দুজন সুপরিচিত সঙ্গীতজ্ঞ আহম্মদ খাঁ ও বেণী গুপ্তের শিক্ষাধীনে চার-পাঁচ বছর কণ্ঠ ও যন্ত্র সংগীত শিক্ষা করেছিলেন এবং অনেকগুলি যন্ত্র বাজাতে পারতেন, যদিও গানেই তিনি বেশি পারদর্শিতা দেখান"।[১৬] স্বামী শ্যামানন্দ রচিত গ্রন্থ মতে একাধিক ওস্তাদের কাছে নরেন্দ্রনাথের সংগীত তথা বাদ্যযন্ত্র শিক্ষা হয়েছিল বলে জানা যায় যথা- বেণী গুপ্ত, আহম্মদ খাঁ, উজীর খাঁ, বড় ও ছোট দুন্নি খাঁ, কানাইলাল ঢেড়ি, জগন্নাথ মিশ্র, শংকর

প্রভৃতি। যাইহোক ডক্টর বি. এন দত্ত, প্রমথনাথ বসু, স্বামী শ্যামানন্দ প্রভৃতির বক্তব্য থেকে একটা কথা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে পিতার পরেই নরেন্দ্রনাথের প্রথম সঙ্গীত-শিক্ষা হয়েছিল বেণী গুপ্ত / বেণীওস্তাদের কাছেই। দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায় আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন- "বেণী ওস্তাদের কাছে যখন নরেন্দ্রনাথ নিয়মিত সংগীত শিক্ষা করতেন, সে সময় হয়তো কলকাতার নানা কলাবতদের কাছে নরেন্দ্রনাথ যাতায়াত করতেন"।[১৭] এর থেকে কিছুটা অনুমান করা যায় সংগীত শিক্ষার পাশাপাশি নরেন্দ্রনাথ তবলা, পাখোয়াজ, এসরাজ, শ্রীখোল প্রভৃতি যন্ত্রাদি অধ্যয়ন করেছিলেন। ডক্টর বি. এন. দত্ত, কাশীচন্দ্র ঘোষালকে নরেন্দ্রের সম্ভাব্য পাখোয়াজ শিক্ষক রূপেও জানিয়েছেন "শ্রী মহেন্দ্রনাথ বলেছেন যে, নরেন্দ্রনাথ বেণী ওস্তাদের বাড়িতে পাখোয়াজ শিখতেন। সেজন্যই তার কোন পাখোয়াজ আমরা আমাদের বাড়িতে দেখিনি"।[১৮] কিন্তু বেনী ওস্তাদ পাখোয়াজ বাদক ছিলেন কিনা সে সম্পর্কে কিছুটা সন্দেহ থেকে যায়। তিনি নিঃসন্দেহে একজন বড় সঙ্গীতজ্ঞ, এটা আমরা ইতিমধ্যেই জানতে পেরেছি। তবে অনেক সঙ্গীতজ্ঞগণ কিন্তু তবলা এবং পাখোয়াজ্ জাতীয় বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে থাকেন। সেদিক দিয়ে বিবেচনা করলে বিষয়টি গ্রহণীয় হতেও পারে।

নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর ও কলকাতার সংগীত জগতে খ্যাতি লাভ :- নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর সম্পর্কে বিশেষ করে গানের ক্ষেত্রে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায় না, কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর ভাষণের কণ্ঠস্বর যারা শুনেছেন তাঁদের লেখা পড়লে অনায়াসেই বোঝা যায় যে তিনি একজন সুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। 'তার গান যে শ্রোতাদের পরিতৃপ্ত করত তার কারণ, তিনি সংগীতে রসসঞ্চার করতে পারতেন। সংগীতের মূল কথা যে রস সৃষ্টি তা তিনি বিলক্ষণ অনুভব করতেন এবং সেজন্যই তার গান শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করত'।[১৯] নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর বিশেষ হৃদয়গ্রাহী ছিল। নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর সম্পর্কে স্বামীজীর একজন জীবনীকার প্রমথনাথ বসু জানান "বন্ধুবর্গের নিকট অবস্থানকালে নরেন্দ্র প্রায়ই সংগীত দ্বারা তাহাদের মনোরঞ্জন করিতেন। তাহারাও এনকোর এনকোর (চলুক চলুক) ধ্বনিতে তাহাকে এক মুহূর্ত বিশ্রামের অবকাশ দিতেন না। তিনি উৎসাহে অধীর হইয়া ক্রমশ গানে তন্ময় হইয়া পড়িতেন। ঘন্টার পর ঘন্টা কোথা দিয়া চলিয়া যাইতো কেহ টের পাইতেন না।[২০] তাঁর কণ্ঠস্বর কি প্রকৃতির ছিল সে বিষয়ে রোমাঁ রোলাঁর একটি মন্তব্যে তিনি জানান "বক্তৃতা আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গেই তার ঐশ্বর্যময়, গম্ভীর কণ্ঠস্বর অধিকার করে ফেললো বিপুল মার্কিন অ্যাংলো শ্রোতৃমন্ডলীকে, যারা বিবেকানন্দের বর্ণের জন্য প্রথমে তাকে হীনতার সঙ্গে দেখেছিলেন"। মিস জোসেফাইন ম্যাকলিয়ডের মতে "তার কণ্ঠস্বর ছিল ভায়োলেনসেলোর মতো চমৎকার, গম্ভীর হলেও তার মধ্যে প্রবল বিসদৃশ কিছু ছিল না; তা ছিল গভীর স্পন্দনে ভরা যা সভাস্থল এবং শ্রোতৃবৃন্দের অন্তঃস্থল পূর্ণ করে তুলত। শ্রোতাদের একবার শোনাবার সুযোগ পেলে তিনি কণ্ঠস্বরকে এমন গভীর খাদে নিমগ্ন করতে পারতেন যে তার শ্রোতৃবর্গের অন্তর পর্যন্ত বিদীর্ণ হত!"। এস্মা কালভে, যিনি

বিবেকানন্দের সুপরিচিত ছিলেন, তাঁর মতে, স্বামীজীর কণ্ঠ ছিল খাঁদ ও তীব্র স্বরের চমৎকার মধ্যবর্তী এবং চীনা কাঁসরের মতো কম্পনময়”।[২১] বিশেষ করে মাদাম কাল্ভের এই পুঙ্খানুপুঙ্খ স্বর পরিচিতি থেকে জানা যায় যে বিবেকানন্দের ছিল জোয়ারীদার কণ্ঠস্বর। মহেন্দ্রনাথ আরেক জায়গায় বলেছেন মাস্টারমশাই অর্থাৎ শ্রীম এবং নরেন্দ্রনাথের সংগীতের আসর সম্পর্কে “ নরেন্দ্রনাথের গলার স্বর মোটা ও খাদে্, মাস্টারমশাই এর গলার স্বর মৃদু ও ললিত অর্থাৎ একজনের হইল খাদসুর, অপরের হইল মেয়েলি সুর। দুইজনের কণ্ঠস্বর মিশ্রিত হইয়া এক মধুর শব্দ নিঃসৃত হইত এবং তক্তপোষ থাপড়াইয়া নরেন্দ্রনাথ তালদিত।[২২]

নরেন্দ্রনাথের বয়স তখন ১৮-১৯। পড়াশোনা, জ্ঞান চর্চার পাশাপাশি সংগীতের মতো বিষয়েও নরেন্দ্রনাথের প্রতিভা আত্মপ্রকাশ করেছিল। ১৮৮০-৮১ খ্রিস্টাব্দেই তিনি পরিচিত মহলে গায়ক রূপে সুপ্রসিদ্ধ হয়েছিলেন বিশেষ করে ধ্রুপদাঙ্গ গানে। সংগীতশিক্ষা কিন্তু সে সময়েও চলেছিল রীতিমতো। সু-কন্ঠ হওয়ার দরুন কলেজ জীবনে বন্ধুমহলে সংগীত শ্রবণের আবদার পুরন তো তিনি করতেনই, রীতিমতো বিভিন্ন সংগীতচক্র থেকে তাঁর ডাক আসতে শুরু করে। মোটামুটি দু-তিন বছর সংগীত শিক্ষা তিনি চালিয়ে গিয়েছিলেন এই সময়ে কিন্তু পারিবারিক পরিস্থিতি নরেন্দ্রনাথকে বেশিদিন সংগীতের সাথে যুক্ত থাকতে দেয়নি। পিতার মৃত্যু, সংসারে অভাব-অনটন, জ্ঞাতি-বিবাদ, সংসারের ভরন-পোষণের তাড়না প্রভৃতি নরেন্দ্রনাথকে আর সংগীতশিক্ষার সাথে বেশি দিন জুড়ে রাখতে পারেনি কিন্তু তাই বলে তিনি একদম সংগীত ছেড়ে দিয়েছেন; এটা বলা যাবে না, কারণ পরবর্তীকালে তিনি জীবনের বিভিন্ন সময়ে সংগীতে নিমগ্ন থেকেছেন। যাইহোক, সুকন্ঠ গায়ক রূপে নরেন্দ্রনাথের খ্যাতি সমগ্র কলকাতায় ছড়িয়ে পড়তে থাকে। শুধু বন্ধু ও পরিচিতি মহলের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে ব্রাহ্মসমাজের মত নানান স্থানে। সুদূর দক্ষিণেশ্বর থেকেও শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেব নরেনের কণ্ঠে সংগীত শোনার জন্য নরেনের বাড়িতে মাঝেমধ্যে আসতেন এবং গান শুনে মুহুর্মুহু ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়তেন। এই খবরও আমরা কথামৃত তথা বিভিন্ন গ্রন্থে পেয়ে থাকি। নরেন্দ্রনাথকে দেখাযায় ব্রাহ্মসমাজের তিনটি ভাগেই (আদি, নববিধান, সাধারণ) স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াত করতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেই ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়েছিলেন এবং সেখানকার উপাসনা প্রভৃতিতে নিয়মিত গান গাইতেন। “ব্রাহ্মসমাজে নরেন্দ্রনাথ রবিবাসরীয় উপাসনা কালে মধুর কন্ঠে ব্রহ্মসংগীত গাহিয়া সভ্যগনের চিত্ত বিনোদন করিতেন”।[২৩] গিরিজা শংকর রায় চৌধুরী বলেছেন- “স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম জীবনে ব্রাহ্মসমাজের একজন সুগায়ক ছিলেন। পরমহংসদেব তার গান শুনিয়া সমাধি লাভ করিতেন। বাস্তবিক তাহার গানের খ্যাতি অল্প নহে। তাহার স্বভাবের মধ্যেই এমন একটা মুক্ত সদাশিব ভাব বিরাজ করিত যাহাকে তাহার বন্ধু ড. ব্রজেন্দ্রনাথ শীল শিল্পরসবোধ সম্পন্ন সদাশিব ভাব বলিয়া নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন (artist nature and Bohemian

temperament)। যখন দার্শনিক সিদ্ধান্তের মধ্যে দিয়া তিনি সংশয়বাদে সমাচ্ছন্ন, তখন কেবল এক সঙ্গীতই তাহার নিকট অতীন্দ্রিয় রাজ্যের বার্তা বহন করিত"।[২৪]

শ্রীরামকৃষ্ণ সান্নিধ্যে সংগীত :- নরেন্দ্রনাথের সাথে শ্রীরামকৃষ্ণের যে প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল, সেটাও ছিল সংগীত উপলক্ষে। সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের কথা এখানে বলাটা আবশ্যক। তিনি ছিলেন নরেন্দ্রনাথের প্রতিবেশী তথা শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য। "১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে ঠাকুরের সহিত নরেন্দ্রনাথের এই প্রথম পরিচয়। উক্ত দিবসে তিনি নরেন্দ্রনাথের সংগীত শ্রবণে প্রীত হইয়াছিলেন ও পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে আগ্রহের সহিত তাঁহার পরিচয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বিদায় কালে নরেন্দ্রনাথকে এক দিবস দক্ষিণেশ্বরে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া যান"।[২৫] আরেক জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে "আমাদের প্রতিবেশী সুরেশ চন্দ্র মিত্র তার বাড়িতে রামকৃষ্ণের আগমন উপলক্ষে নরেন্দ্রকে গান গাইবার জন্য আমন্ত্রণ জানান এবং এইভাবে তাদের পরিচয়ের সূত্রপাত হয়"।[২৬] শ্রীরামকৃষ্ণের সাথে স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম সাক্ষাৎকার নিয়ে বাংলা জীবনী-গ্রন্থ তথা ইংরেজি জীবনী-গ্রন্থে সাল নিয়ে একটু মতানৈক্য দেখতে পাওয়া যায়। যেখানে দেখা যাচ্ছে বাংলা জীবনী গ্রন্থ গুলিতে স্বামী শ্যামানন্দ বলেছেন ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর,(শ্রী বিবেকানন্দ কাব্য গীতি পৃষ্ঠা ৬৪), সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারও একই কথা বলেছেন অথচ ইংরেজি জীবনীগ্রন্থে ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসের কথা বলা হয়েছে। আলোচনা সাপেক্ষে ইংরেজি সালটি গ্রহনীয়।

এরপরেও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাথে বিভিন্ন সাক্ষাতের প্রধান অঙ্গই ছিল সংগীত। আমরা শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতেও দেখতে পাই এরকম অসংখ্য উদাহরণ। নরেন্দ্রনাথ এবং শ্রীরামকৃষ্ণের যে ভাব-পূর্ণসম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল তার প্রধান অংশই ছিল সঙ্গীত কেন্দ্রিক। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়, শুধু কথামৃতে নরেন্দ্রের সংগীত সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে একটি পৃথক বই বা অধ্যায়ে তা বর্ণনা করতে হবে। তবুও কিছু বিশেষ বিশেষ কথা তুলে ধরবার চেষ্টা করছি মাত্র। এই সময় নরেন্দ্রনাথ, শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে ধ্রুপদাঙ্গের ব্রহ্মসংগীত, কীর্তন, ভক্তিমূলক সংগীত যেমন- শ্যামা সংগীত, কিছু কিছু ক্ষেত্রে হিন্দি ভজন, রাগাশ্রিত বাংলা গান ইত্যাদি পরিবেশন করতেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, নরেন্দ্রনাথ যতবারই গান পরিবেশন করতেন ততবারই তানপুরা ও তাল বাদ্য ব্যবহার করতেন। তিনি অনেকক্ষণ ধরে তানপুরায় তার বাঁধতেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্যান্য শ্রোতৃবর্গ অধৈর্য হয়ে উঠলেও তিনি তার বাঁধা সম্পন্ন না করে গান আরম্ভ করেননি। একটি উদাহরণ হিসেবে দেখা যায় "...এইবার আবার নরেন্দ্রের গান হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ মাস্টারকে তানপুরাটি পাড়িয়া দিতে বলিলেন। নরেন্দ্র তানপুরাটি অনেকক্ষণ ধরিয়া বাঁধিতেছেন। ঠাকুর ও সকলে অধীর হইয়াছেন। বিনোদ বলিতেছেন, বাঁধা আজ হবে, গান আর একদিন হবে" (সকলের হাস্য)। শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিতেছেন আর বলিতেছেন এমনি ইচ্ছে হচ্ছে যে তানপুরাটি ভেঙে ফেলি। কি টং টং আবার তানা না না নেরে নুম্

হবে"।......ভবনাথ-যাত্রায় অমনি বিরক্তি হয়। নরেন্দ্র (বাঁধিতে বাঁধিতে)- সে না বুঝলেই হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) – ঐ ! আমাদের সব উড়িয়ে দিলে।......ঠাকুর হঠাৎ মাস্টারকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, আহা নরেন্দ্রের কি গান"।[২৭] তিনি রীতিমতো কলাবান্তের অধীনে থেকেই যে সংগীত শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন তার আভাস আমরা এই ঘটনাগুলি থেকে পাই।

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাতের আগে থেকেই নরেন্দ্রনাথ গায়ক রূপে জনপ্রিয় ছিলেন। ফলস্বরূপ দেখাযাচ্ছে নরেন্দ্রনাথের বি.এ পরীক্ষা দেওয়ার আগে থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে নরেন্দ্রনাথের সংগীত শোনাবার অসংখ্যবার সুযোগ হয়। একসময় নরেন দীর্ঘদিন দক্ষিণেশ্বরে দেখা করতে না আসায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বয়ং তাকে দেখার জন্য রামলালের সঙ্গে কলকাতায় নরেনের বাসায় এসে হাজির হন। কুশল সংবাদ, সন্দেশ ইত্যাদি বিনিময়ের পরেই শ্রী রামকৃষ্ণদেব আবদার করে বললেন ..."ওরে তোর গান অনেকদিন শুনিনি, গান গা'। অমনি তানপুরা লইয়া তাহার কান মলিয়া সুর বাঁধিয়া নরেন্দ্রনাথ গান আরম্ভ করিলেন"।[২৮]

সেই দিন থেকে প্রায় প্রতি সাক্ষাতের মাধ্যম-স্বরূপ সঙ্গীত শ্রবণে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব অবস্থা হওয়ার কথাও আমরা 'কথামৃত' আদিতে পেয়ে থাকি। আবার এও দেখা যায় যে তাঁর একটি গানে শ্রীরামকৃষ্ণ কখনোই সন্তুষ্ট হচ্ছেন না , একই দিনে একাধিক গান তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে শুনিয়েছিলেন। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে গলায় ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে চিকিৎসার সুবিধার্থে দক্ষিণেশ্বর থেকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। যে বাড়িটিতে রামকৃষ্ণদেব কে রাখা হয়েছিল তাকে আমরা শ্যামপুকুর বাটী নামে চিনি। এই সময় নরেন্দ্রনাথ চার দিন শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে গান শোনায় যার কথা 'কথামৃতে' পাওয়া যায়। এই সময় সংগীতের কিছু অসাধারন ঘটনা আমরা কথামৃত থেকে জানতে পারি, তবে সেগুলো এখানে একত্রে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। সেই বাড়িতে তিন মাস থেকে সেবা-শুশ্রুষা করার পর তাঁকে কাশিপুরস্থ বাগানবাড়িতে ওই বৎসরই ১১ই ডিসেম্বর আনা হয়। এই সময়েও নরেন্দ্রনাথ চার দিন শ্রীরামকৃষ্ণকে সংগীত পরিবেশন করে শুনিয়েছিলেন। এখানেই শেষ হল শ্রীরামকৃষ্ণকে নরেন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ গান শোনাবার পর্ব। শ্রীরামকৃষ্ণের দিন দিন শরীরের অবনতি ঘটতে থাকে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ দেহ রক্ষা করেন ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে। নরেন্দ্রনাথের বয়স তখন ২৩ বছর। এ বছরেই নরেন্দ্রনাথ সংগীত কল্পতরু গ্রন্থের জন্য গীত-সংকলনের কাজ শেষ করেছিলেন।

এই সমগ্র আলোচনার মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে নরেন্দ্রনাথ সঙ্গীতের যে ঘরানাদারী তালিম, তা অতি দক্ষতার সাথেই গ্রহণ করেছেন এবং কলকাতার সংগীত জগতে বিখ্যাত হয়েছেন। ঔপপত্তিক দিক, বাংলা, হিন্দি বিভিন্ন ধরনের সংগীত সংগ্রহ তথা সংগীতে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রের বাদনকৌশল আয়ত্ত করেছিলেন যা তিনি পরবর্তীকালে 'সংগীত কল্পতরু' নামক গ্রন্থে বিষয়গুলি সুচিন্তিত ভাবে তুলে ধরেছেন। নরেন্দ্রনাথের

জীবনের এই পর্বে সংগীতের আলোচনা এখানেই শেষ করা হচ্ছে। পরবর্তী জীবনে অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণের পরে নরেন্দ্রনাথের সংগীতময় যে জীবন, সংগীত রচনা ইত্যাদি তুলে ধরা হবে।

সূত্র নির্দেশ-

১. দত্ত মহেন্দ্রনাথ,“স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবনী”,৮ই আষাঢ় ১৩৭০, পৃ. -৫৪।
২. তদেব।
৩. শ্যামানন্দ স্বামী , “শ্রীবিবেকানন্দ-কাব্যগীতি”, পৃ. ৫৪।
৪. ‘Life of Swami Vivekananda”, -by his eastern and western disciples, Advaita Ashram,1 Dec,1986, 6th edition’.p. 6
৫. Datta Dr. B.N. , ‘Swami Vivekananda- patriot prophet’, KK Publications, 2nd May 2016, p.153.
৬. শ্যামানন্দস্বামী , “শ্রীবিবেকানন্দ-কাব্যগীতি”, পৃ. ৫৪।
৭. Datta Dr. B.N. , ‘Swami Vivekananda- patriot prophet’, KK Publications, 2nd May 2016, p.153.
৮. বসু প্রমথ নাথ ,‘স্বামীবিবেকানন্দ’, প্রথম ভাগ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৫৬ (শারদীয়া সপ্তমী), কলকাতা,পৃ.৭৫।
৯. তদেব।
১০. মুখোপাধ্যায় দিলীপকুমার ,“সঙ্গীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সংগীত কল্পতরু”,অক্টোবর ১৯৬৩,পৃ. ১৮।
১১. বসু প্রমথ নাথ , ‘স্বামীবিবেকানন্দ’, প্রথম ভাগ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৫৬ (শারদীয়া সপ্তমী), কলকাতা, পৃ.৭৫।
১২. বন্দ্যোপাধ্যায় মনিলাল সম্পাদিত 'নাট্যমন্দির' পৃঃ৭-৮। ১৩২১, (গিরিশ চন্দ্র ঘোষ লিখিত"দেশি নাট্যশালায় নিত্য লীলা")।
১৩. গঙ্গোপাধ্যায় অবিনাশ চন্দ্র, 'গিরিশচন্দ্র' , দেজ্ পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১৬, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ.২৭৮।
১৪. Datta Dr. B.N., ‘Swami Vivekananda- patriot prophet’, KK Publications, 2nd May 2016, p.155.
১৫. শাস্ত্রী শিবনাথ,‘আত্মজীবনী’, তৃতীয়সংস্করণ, পৃ. ৪৪৮।
১৬. ‘Life of Swami Vivekananda”, -by his eastern and western disciples, Advaita Ashram,1 Dec,1986, 6th edition’.p. 25.
১৭. মুখোপাধ্যায় দিলীপকুমার ,“সঙ্গীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সংগীত কল্পতরু”, অক্টোবর ১৯৬৩, পৃ.২০।

১৮. DattaDr. B.N, ‘Swami Vivekananda- patriot prophet’, KK Publications, 2 may 2016, appendix,P-419.
১৯. মুখোপাধ্যায় দিলীপকুমার, ‘সঙ্গীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সংগীত কল্পতরু’, অক্টোবর ১৯৬৩,পৃ. ২৬।
২০. বসুপ্রমথনাথ, ‘স্বামী বিবেকানন্দ’, প্রথম ভাগ, পৃ. ৭৫-৭৬।
২১. মুখোপাধ্যায় দিলীপকুমার, ‘সঙ্গীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সংগীত কল্পতরু’, অক্টোবর ১৯৬৩,পৃ.২৭।
২২. দত্ত মহেন্দ্রনাথ, ‘মাস্টার মশাইয়ের অনুধ্যান’, পৃ.১০।
২৩. মজুমদার সত্যেন্দ্রনাথ ,‘বিবেকানন্দ-চরিত’, চতুর্থ সংস্করণ, পৃ.৮১।
২৪. রায় চৌধুরী গিরিজাশংকর ,‘স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলার উনবিংশ শতাব্দী’, নতুন সংস্করণ, পৃ.১৭২।
২৫. মজুমদার সত্যেন্দ্রনাথ , ‘বিবেকানন্দ চরিত’, চতুর্থ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৮৩।
২৬. DattaDr. B. N., “Life of Swami Vivekananda patriot prophet”, KK Publications, 2 may 2016, p.155
২৭. শ্রীম্, ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত’, পঞ্চম ভাগ, পৃ.পৃ. ১৮৬-৮৭।
২৮. সিংহ প্রিয়নাথ, ‘স্বামীজির স্মৃতি’, উদ্বোধন, ১৩১৭, ফাল্গুন সংখ্যা।

মাহমুদুল হকের ‘খেলাঘর’ : আত্মগ্লানির মর্মমেঘে স্বাধীনতার হাতছানি

আব্দুল সামাদ
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

সারসংক্ষেপ : যে কোনো দেশের সাহিত্য সেই দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থার দর্পণ। সাহিত্যের দর্পণে যে প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে তার মাধ্যমে দেশ, জাতি ও সমাজের অবস্থান-আবর্তন-বিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশের সাহিত্যও তার ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ এবং সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতাকে কেন্দ্র করে একটা সাহিত্য ধারা গড়ে উঠেছিল। বাংলাদেশের এই সাহিত্য শাখা ‘মুক্তিযুদ্ধের সাহিত্য’ নামে পরিচিত। এই সময় যে সমস্ত বরেণ্য শিল্পী-সাহিত্যিক দরদভরা হৃদয়ে বাংলাদেশের যন্ত্রণাদগ্ধ ইতিহাস রচনায় অভিনিবিষ্ট হয়েছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ঔপন্যাসিক মাহমুদুল হক। ‘খেলাঘর’ মুক্তিযুদ্ধ কেন্দ্রিক এক উপন্যাস। এই উপন্যাসে যুদ্ধের দুটি রূপ চিত্রিত হয়েছে—দেশ মাটির সঙ্গে বিদেশি-বিজাতির যুদ্ধ এবং জীবনের সঙ্গে জীবনের যুদ্ধ। যে কোনো যুদ্ধের ধ্বংসলীলা একসময় সমাপ্ত হয়। কিন্তু জীবনের সঙ্গে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তার পরিসমাপ্তি ঘটে না। রেহানা এই উপন্যাসের নির্যাতিত-ধর্ষিত এক নারী। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদারদের পাশবিকতায় তার দেহ কলুষিত হয়। ফলে তার মনের মৃত্যু ঘটে। তাই সে একটা জীবন্ত লাশ। বেঁচে থাকার ছদ্মবেশে জড়দেহ বহন করে বেড়ায়। আত্মগ্লানি ও অন্তর্দাহের প্রকোপে সে হৃদয়ে-হৃদয় মেলাতে পারে না। মুকুলচন্দ্র জানে পরাধীনতা মানেই দাসত্ব-দুঃখ-যন্ত্রণা। তাই দাসত্ব-দুঃখ-যন্ত্রণা ও আত্মগ্লানি থেকে মুক্তির জন্য স্বাধীনতা চায়। স্বাধীনতা ও জীবন—এই দুই সত্ত্বার দার্শনিক সত্যে ‘খেলাঘর’ অলংকৃত।

সূচক শব্দ : মুক্তিযুদ্ধ, অন্যায়-অত্যাচার, হত্যা, ধর্ষণ, প্রেম, আত্মগ্লানি, স্বাধীনতা।

মূল আলোচনা

যে কোনো দেশের সাহিত্য সেই দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থার দর্পণ। সাহিত্যের দর্পণে যে প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে তার মাধ্যমে দেশ, জাতি ও সমাজের অবস্থান-আবর্তন-বিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশের সাহিত্যও তার

ব্যতিক্রম নয়। তাই বাংলাদেশের সাহিত্যকে জানতে হলে প্রথমে সে দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাসকে জানা ভীষণ জরুরি।

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে ভারতবর্ষ বিভাজিত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। সৃষ্টি হয় ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি পৃথক ডোমিনিয়ন। আমাদের মনে হয় ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতায় স্বাতন্ত্র্যের কোনো মানসদৃষ্টি নিমজ্জিত ছিল না। আসলে ৪৭-এর স্বাধীনতা ছিল ধর্মীয় অহমিকা চরিতার্থের উদ্দেশ্যে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা কার্যকারী করা। আজ আমরা বুঝতে পারি এই পরিকল্পনার মূলউ দ্দেশ্য ছিল মানুষের মধ্যে বিভেদের বারুদকে প্রজ্বলিত করা। তাই এই পরিকল্পনা কার্যকারী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ মানুষ অসহায় হয়ে পড়ে; ভিটে-মাটি হারিয়ে উদ্‌বাস্তুতে পরিণত হয়; হাজার হাজার শিশু-আবাল-বৃদ্ধ খুন হয়; সহস্র সহস্র নারী ধর্ষিত হয়। তাই এই বিভীষিকা সম্পর্কে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বলেছেন—

> "When partition actually took place, rivers of the blood flowed in the large parts of the country. Innocent men, women and children were massacred. The Indian Army was divided and nothing effective was done to stop the murder of innocent Hindus and Mulims."[১]

এই সময় মানুষ ও সমাজের যে ক্ষতি হয়েছিল তা অপূরণীয়। এই সময় মানুষের উপর যে অন্যায়, অধর্ম ও জুলুম করা হয়েছিল তার দায়ভার কোন বিভেদকামী নেতৃত্ব গ্রহণ করেনি। এই সময় মানুষের হৃদয়ে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল তা আজও চিকিৎসাহীন; বলা যায় বিশেষজ্ঞের অভাবে ব্যাধি অনির্ণীত।

মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা অনুযায়ী মুসলিম প্রধান অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয় পাকিস্তান। সেই সূত্রে বঙ্গদেশও দ্বি-খণ্ডিত হয়। পশ্চিমাংশের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠদের নিয়ে গঠিত পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্বাংশের মানুষ 'পূর্ব-পাকিস্তান' নামে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। সেদিনের হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ হয়তো ভেবেছিল দেশভাগ হলে মুসলিমরা হিন্দুর অধীনতা এবং হিন্দুরা মুসলিমের অধীনতা থেকে মুক্ত হবে। তাদের সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নিরাপদ হবে। তাদের বেকারত্ব কমে যাবে, দারিদ্র্যের অবসান হবে; খাদ্যদ্রব্য, চাকরি সহজলভ্য হবে। সর্বোপরি মানুষ নিরাপদে জীবন-জীবিকা ও ধর্ম লালন-পালন করতে পারবে। কিন্তু তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমাদের সেই ধারণা পালটে যায়।

স্বাধীনতার তিন-চার বছরের মধ্যেই পূর্ব-পাকিস্তান–পশ্চিম-পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। শুরু হয় পশ্চিম-পাকিস্তান বিরোধী মুক্তিসংগ্রাম। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে মুসলিম বা মুসলমান কোন জাতি নয়—ইসলাম ধর্ম পালনকারী একটা

সম্প্রদায় মাত্র। তাই এক মুসলমান অন্য আরেক মুসলমানের দোসর-সুহৃদ নাও হতে পারে। তাই দেখা যায় পশ্চিম-পাকিস্তানের মুসলমান সম্প্রদায় পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলমানদের উপর নির্দ্বিধায় অন্যায়-অত্যাচার ও পাশবিক ব্যবহার করে। তবে পূর্ব-পাকিস্তান বিভাজিত দেশনাম। কিন্তু তার অধিবাসীগণ বাঙালি। বাংলা তাদের মাতৃভাষা। তাই তারা জাতিতে বাঙালি। ইসলামী তমদ্দুন থেকে একেবারে পৃথক তাদের সামাজিক রীতি-নীতি, ভাষা-সংস্কার, আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ। তারা ইসলামী তমদ্দুনের বাইরে সম্পূর্ণ আলাদা এক সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। তবে তারা ধর্মগত দিক থেকে ইসলামধর্ম অনুসরণকারী। শুধু ইসলামধর্ম পালন করে বলেই তাদের উপর ইসলামী ভাষা ও তমদ্দুন আরোপ করা যাবে—এই ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক এবং অনৈতিক। তাছাড়া মাতৃভাষা ও মাতৃসংস্কৃতি মাতৃদুগ্ধ সমান—একথা পাকিস্তানি বর্বরদের স্মরণে ছিল না। কিন্তু বাঙালি জানে বাংলা তার মাতৃভাষা, বাংলা তার জান-মান-প্রাণ। তাই সেই ভাষার উপর হস্তক্ষেপ মানেই সমগ্র জাতির উপর হস্তক্ষেপ। আর এই হস্তক্ষেপ বরদাস্ত না করতে পেরে 'কায়েদে আজমের' বিরুদ্ধে বাঙালি জাতি বিক্ষোভে শামিল হয়।

ভাষাকে বাঁচানোর জন্য বাঙালি জাতির যে আন্দোলন তা ক্রমশ ব্যাপক আকার ধারণ করে এবং এক সময় তা পূর্ব-পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ সৃষ্টি আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ বাঙালির ভাষা ও সাংস্কৃতিক চেতনার আন্দোলন বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ নেয়। তাই এই আন্দোলন সম্পর্কে 'একুশে ফেব্রুয়ারী' গ্রন্থের 'এ বাংলায় সে-একুশ কেন?' নামক ভূমিকাংশে জিয়াদ আলি বলেছেন—

> "একুশের সেই দাবি যদিও সাংস্কৃতিক চেতনার মূল প্রেরণা তবুও সামগ্রিক অর্থে পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিক স্বার্থ-চক্রান্তের বিকারগ্রস্ততায় বিক্ষুব্ধ মানুষের সে আন্দোলন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ছেড়ে বৃহত্তর রাজনীতিক চেতনাপ্রবাহের দ্যোতনা সৃষ্টি করলো।"[২]

বাঙালির এই ভাষা বাঁচাও আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন আরো সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং ১৪৪ ধারা জারি করে। এই আদেশ অমান্য করে ২১ ফেব্রুয়ারী ছাত্ররা মিছিল নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকলে পুলিশ নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে। তাতে নিরস্ত্র মিছিলের একাধিক দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ফলে বাঙালি জাতি আরো ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং পাক-বিরোধি সংগ্রাম শুরু করে।

১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন যখন বৃহত্তর রাজনৈতিক রূপ ধারণ করে তখন পশ্চিম-পাকিস্তানের বর্বরতা ক্রমশ হিংস্র থেকে পাশবিক পর্যায়ে পৌঁছায়। স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে বাংলাদেশের মুক্তির কাণ্ডারি শেখ মুজিবর রহমান আন্দোলন শুরু করলে ১৯৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় পাক-সরকার তাঁকে অভিযুক্ত করে কারারুদ্ধ করে। কিন্তু গণ-আন্দোলনের চাপে ১৯৬৯ সাল নাগাদ পাক-সরকার তাঁকে মুক্তি দিতে

বাধ্য হয়। তারপর ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করলে পূর্ব-পাকিস্তানে আওয়ামি লিগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে স্বায়ত্তশাসনের দোরগোড়ায় পৌঁছে যায়। এমত অবস্থায় ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখেন। পাক-সরকারের কূটনৈতিক অভিসন্ধি, শঠতা-খলতা-চতুরতা বুঝতে পেরে শেখ মুজিবর রহমান পুনরায় ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ পূর্ণস্বাধীনতার দাবি ঘোষণা করেন। ফলে পূর্ববঙ্গের সর্বত্র আন্দোলনের বহ্নিশিখা ছড়িয়ে পড়ে। এর পরিপ্রেক্ষিতে শুরু হয় পাক-সামরিক বাহিনীর নৃশংস গণহত্যা। তবে পাক বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয় পূর্ববঙ্গের আল-বদর, আল-সামস প্রভৃতি রাজাকার বাহিনী। তারা গ্রাম, শহর, লোকালয়; শিশু-বৃদ্ধ-নারী নির্বিশেষে ২৬৭ দিন ধরে হত্যালীলা ও ধর্ষণ চালায়। এই হত্যা ও নৃশংসতা প্রসঙ্গে 'একাত্তরের বধ্যভূমি ও গণকবর' গ্রন্থে বলা হয়েছে—

> "পাকিস্তান সেনাবাহিনী ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। তারা বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ নারী, পুরুষ, শিশুকে নির্মমভাবে হত্যা করে। দুই লক্ষের অধিক নারী পাকিস্তানিদের পাশবিক শিকারে পরিণত হয়। তারা পরিকল্পিতভাবে দেশের বরেণ্য শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষক, ছাত্র, কবি, বুদ্ধিজীবীকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করে।"[৩]

১৯৫২ থেকে ১৯৭১-র পর্যন্ত বাংলাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যে অচলাবস্থা, অস্থিরতা ও ধ্বংসযজ্ঞ দেখা যায় তা এক কথায় অসহনীয়। বাংলাদেশের এই হত্যালীলা এবং সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতাকে কেন্দ্র করে একটা সাহিত্য ধারা গড়ে উঠেছিল। বাংলাদেশের এই সাহিত্যশাখা 'মুক্তিযুদ্ধের সাহিত্য' নামে পরিচিত। এই সাহিত্যশাখায় অসংখ্য কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, সংগীত, চলচিত্রের জন্ম হয়। মুক্তিযুদ্ধের সাহিত্যের পাতায় পাতায় বাংলাদেশের সমাজ ও মানুষের যন্ত্রণাদগ্ধ ইতিহাস কথা স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হয়েছে। এই সময় যে সমস্ত বরেণ্য শিল্পী-সাহিত্যিক দরদভরা হৃদয়ে বাংলাদেশের যন্ত্রণাদগ্ধ ইতিহাস রচনায় অভিনিবিষ্ট হয়েছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম মাহমুদুল হক। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের অবিনাশী সুর-স্বর-শব্দতরঙ্গ-তাঁর উপন্যাসগুলিতে সজীবতার সঙ্গে নতুন মাত্রায় জীবন্ত হয়ে আছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে তিনি কলম ধরেছেন মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার জীবনেতিহাস রচনা করার জন্য। আসলে মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও পরবর্তী সময়ের ক্ষয়িষ্ণু সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তাঁর অন্তরধর্মকে ব্যথিত করেছিল। আর সেই ব্যাথা ও যন্ত্রণার টাটকা ফসল 'জীবন আমার বোন' (১৯৭৬), 'খেলাঘর' (১৯৮৮), 'অশরীরী' (২০০৪) ইত্যাদি উপন্যাসগুলি।

আমাদের আলোচ্য 'খেলাঘর' উপন্যাসটি মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত। এখানে যুদ্ধের দুটি রূপ চিত্রিত হয়েছে—দেশ-মাটির সঙ্গে বিদেশি-বিজাতির যুদ্ধ এবং জীবনের

সঙ্গে জীবনের যুদ্ধ। যে কোনো যুদ্ধের ধ্বংসলীলা একসময় সমাপ্ত হয়। প্রথম কিংবা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অগ্নিশিখাও চার-পাঁচ বছরের বেশি স্থায়ী হতে পারেনি। কিন্তু যে যুদ্ধ জীবনের সঙ্গে সংঘটিত তার পরিসমাপ্তি থাকে না এবং তার ফলে জীবনের যে ক্ষতি সূচিত হয় তা কোনো ভাবেই পূরণ হয় না। পাকিস্তানি শাসকের বর্বরতা ও পৈশাচিক ব্যবস্থার ফলে বাংলাদেশের সমাজ ও অর্থনীতি প্রভূত ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ পরিশ্রম করে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে সেই ক্ষতি পূরণে ঐক্যবদ্ধ। কিন্তু যে নারী পাকিস্তানি বর্বর পশুর নিষ্ঠুরতায় সম্মান হারিয়েছে কিংবা ব্যভিচারী মানুষের হাতে বলপূর্বক ধর্ষিত হয়েছে, তাদের জীবনযুদ্ধের কি পরিসমাপ্তি হয়েছে? তাদের জীবন থেকে অন্তর্দাহের শিখা কি নিভে গেছে? আত্মগ্লানির হাত থেকে তারা কি মুক্তি পেয়েছে? তাদের জীবনে কি নতুন করে প্রেমের অঙ্কুর—অঙ্কুরিত হয়েছে? তারা কি কলুষ মুক্ত হয়ে ঘর-সংসার গড়তে পেরেছে?—এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আমাদের জানা নেই। আমারা জানি প্রতিদিন তারা অন্তর্দাহে দগ্ধ হতে হতে মুমূর্ষু। সেই রকমই এক নারী 'খেলাঘর'-এর রেহানা। সে একটা জীবন্ত লাশ। বেঁচে থাকার ছদ্মবেশে জড়দেহ বহন করে বেড়ায়।

'খেলাঘর' উপন্যাসের কাহিনি পরিক্রমায় দেখা যায়—ইয়াকুব উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত এবং গ্রামের একটি কলেজে শিক্ষকতার চাকরি করে। থাকে ঢাকার এক হস্টেলে। তার কাছে হঠাৎ একদিন বন্ধু টুনুর চিঠি আসে, এবং তাতে টুনু আর্জি জানায় তার চাচাতো বোন রেহানাকে কয়েকদিনের আশ্রয় প্রদান করার জন্য। সেই মোতাবেক ইয়াকুব ভোলানাথ কবিরাজের বাড়িতে রেহানার থাকার বন্দোবস্ত করে দেয়। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে মুকুলচন্দ্র এসে জানায়—"মাসিমায় ডাক করাইছিলো আমারে, রেহানার কথা কইলো, হ্যারে অন্যখানে সরাইবার কয়। হ্যাগো অসুবিধা হইতাছে—"[৪] মুকুলচন্দ্র ইয়াকুবের বাল্যবন্ধু, স্কুল শিক্ষক, থাকে পিয়ার মোহাম্মদের অধিকৃত আদিনাথের চারশো বছরের পুরানো পরিত্যক্ত ভিটার এক জরাজীর্ণ ঘরে। অবশেষে ইয়াকুব রেহানাকে ভোলানাথ কবিরাজের বাড়ি থেকে আদিনাথের ভিটায় নিয়ে যায় এবং নিজেও থেকে যায়। অস্থিরতার জন্য স্কুল-কলেজ বন্ধ। তাই মুকুলচন্দ্র গোপনে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছে। কিন্তু ইয়াকুব দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে শুধু প্রকৃতি দেখে, শুয়ে-বসে ও রেহানার সঙ্গে গল্পগুজোব করে সময় অতিবাহিত করে। প্রথম দিকে রেহানার আচার-আচরণ দেখে মনে হয় সে বাবা-মায়ের আদুরে সন্তান। সে চঞ্চলা, উচ্ছ্বল, ভয়-ভীত-সংশয়হীন প্রাণোচ্ছ্বাসপূর্ণ নারী। জলে সাঁতার দেয়, ফুল-পাতা কুড়ায়, চুলা ধরায়, রান্না করে; শিশুর মতো বায়না ধরে, অভিযোগ করে। ইয়াকুবও তার সাধ্যমত রেহানার শখ-আহ্লাদ পূরণ করে। এভাবে চলতে চলতে ইয়াকুবের অন্তরে প্রেমোদয় হয় এবং হঠাৎ একদিন সংযম হারিয়ে ইয়াকুব রেহানার গালে চুম্বন করে। তারপর অন্যায় ও পাপাবোধে সে জড়সড় হয়ে যায়। একটা আত্মগ্লানিবোধে ইয়াকুব মর্মপীড়িত তা লক্ষ

করে রেহানা এগিয়ে আসে এবং বলে—"...তুমি অমানুষ, তুমি রাক্ষস, তুমি জ্যান্ত মানুষ খুন করতে পারো।"(৫) এবং অনবরত ইয়াকুবকে চুম্বন করতে থাকে। এভাবে আদিনাথের ভিটাতে তাদের একটা অস্থায়ী সংসার গড়ে ওঠে। এটাই ঔপন্যাসিক কথিত খেলাঘর। কিন্তু কয়েকদিন পর রেহানাকে নিতে এসে টুনু জানায়—"করাচি পুলিশরা ওকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। ও তো হোস্টেলে থাকতো, লাইব্রেরি থেকে ফিরছিল সেই সময়।"(৬) তারপর রেহানা বেশকিছুদিন ধরে নিখোঁজ। জানা যায় রেহানা পাকিস্তানি আর্মি কিংবা মিলিশিয়া'র নির্যাতনের শিকার। এই ঘটনা জানার পর ইয়াকুব অশ্রুপাত করে এবং রেহানা টুনুর সঙ্গে ফেরার জন্য নৌকায় চাপে। অন্যদিকে দেশমুক্ত করার জন্য মুকুলচন্দ্র এক গভীর উদ্দীপনা থেকে আদিনাথের ভিটাতে আস্তানা গাড়ে। ফলে দেখা যায় এক অসাধারণ শৈল্পিক গুণে ঔপন্যাসিক যুদ্ধ-প্রেম-আত্মগ্লানি ও স্বাধীনতাকে একসুর-একধ্বনি-একশব্দতরঙ্গে 'খেলাঘর'-এ বিধৃত করেছেন।

যখন কোনো দেশে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তখন সেই দেশের মানুষের অবস্থানকে মোটামুটি তিনটি অবস্থায় চিহ্নিত করা যায়, যেমন--- যুদ্ধাক্রান্ত মানুষ, যুদ্ধ প্রতিরোধকারী বা প্রতিবাদী মানুষ, এবং দ্বিধাগ্রস্ত বা সংশয়সংযুক্ত মানুষ। 'খেলাঘর' উপন্যাসে রেহানা যুদ্ধাক্রান্ত, মুকুলচন্দ্র প্রতিবাদ-প্রতিরোধকারী এবং ইয়াকুব দ্বিধাগ্রস্ত বা সংশয়সংযুক্ত মানুষ। আমরা বাংলাদেশের ইতিহাস অনুসন্ধানে দেখেছি পাকিস্তানি বর্বর শাসকের নৃশংস ও নক্কারজনক রূপ। আবার তাদের সঙ্গে যে রাজাকার ও মিলিশিয়া বাহিনী যোগ দিয়েছিল তাদেরও মূললক্ষ্য ছিল পাকিস্তানি বর্বরদের সাহায্যার্থে দেশ থেকে বিধর্মীদের নির্মূল করা। উপন্যাসে দেখা যায় গরিব তাঁতিদের গ্রাম যন্ত্রাইল পাকিস্তানি আর্মির নিষ্ঠুরতার শিকার। উপন্যাসে বলা হয়েছে—

> "ইছামতি পার হয়ে হুট করে ঝাঁপিয়ে পড়লো আর্মিরা। তাঁত আর তাঁতি—তাদের লক্ষ্য দুটোই। নদীর দিক থেকে বেড় দিয়ে বৃষ্টির মতো গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে তারা এগিয়ে এলো; আগুন ধোঁয়া আর চিৎকারের মাঝখানে যে যে-দিকে পারে ছুটে পালায়, যারা পারে না তাদের ধরে ধরে জ্বলন্ত তাঁতের ওপর ছুঁড়ে দিতে থাকে।"(৭)

দক্ষিণ চারিগাঁও-এর নমঃশূদ্রদের পাড়াতেও পাকিস্তানি আর্মির অত্যাচার ছিল আরো বীভৎস। তারা কলুদের জীবন জীবিকার উৎস ঘানিগাছগুলি ধূলিসাৎকরে দেয়, বাড়িতে বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। তাদের অত্যাচারের হাত থেকে দুধের শিশুও নিস্তার পায়নি। উপন্যাসে বলা হয়েছে—

> "এক একটা দুধের শিশুকে কোলে থেকে কেড়ে নেয়, তারপর শুরু হয় লোফালুফি খেলা; শেষে বেয়োনেট গেঁথে মাঝে মাঝে আগুনে ঝলসে কাবাব সেঁকা করে।"(৮)

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকার-মিলিশিয়ারা পরিকল্পিত ভাবে সারা বাংলাদেশে নক্কারজনক হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল। তাদের লক্ষ্য ছিল গরিব মানুষদের বাড়িঘর, দোকান-পাট, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান জ্বালিয়ে ধ্বংস করা; শিশু-বৃদ্ধদের হত্যা করা; যুবতী নারীদের ধর্ষণ করা এবং ধর্ষণের পর হত্যা করা। স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ও দেশের বরেণ্য ব্যক্তিদের উপর নির্মম অত্যাচার করা। ফলে দেখা যায় বাংলাদেশের যুদ্ধাক্রান্ত মানুষগুলির অবস্থা নরকযন্ত্রণার থেকেও বিভীষণ প্রকৃতির।

উপন্যাসে রেহানার যে আচার-আচরণ এবং কার্যপরম্পরা দেখা যায় তা স্বাভাবিক নয়—উপন্যাসের একেবারে শেষপ্রান্তে উপনীত হয়ে সেটা অনুধাবন করা যায়। যে কোনো যুদ্ধে নারী শক্তিশালী প্রতিপক্ষের পাশবিক শিকার। হানাদারদের লক্ষ্যস্থল নারীর শরীর। তাই যুদ্ধে নারী বোমা-গোলা-বারুদ বা অস্ত্রাঘাতের পরিবর্তে ধর্ষিত হয়। রেহানা সেই যুদ্ধাক্রান্ত ধর্ষিত নারী। তাই উপন্যাসে তার যে কার্যকলাপ ও আচারবিধি লক্ষ করা যায় তা একপ্রকার মনোবিকারের ভাষ্য। রেহানার মনোবিকারের মূলকারণ পাকিস্তানি হানাদারদের দ্বারা নারীত্বের মর্যাদাহানী। তবুও রেহানা জীবন সন্ধানী। মনস্তাপ নিরসনের জন্য সে আঁকড়ে ধরেছে শৈশবস্মৃতি। শৈশবের মধুমাখা দিনগুলি থেকে সে খুঁজে পেতে চেয়েছে জীবনের রসদ। তাই সে যুবতী রেহানার আত্মগ্লানি ভুলার জন্য বার বার হতে চেয়েছে শৈশবের ঝুমি-আন্না-গাব্বু-লতা।

মানুষের জীবনের সবচেয়ে মধুর সম্পর্ক প্রেম। শৃঙ্গার রসোদ্ভূত এই মধুর সম্পর্কটি মানুষের জীবন বদলে দেয়। দেহ-মনের সতেজতা বৃদ্ধি করে; অসম্ভবকে সম্ভবপর করে তোলে। মানুষের একাকীত্ব ভঙ্গ করে; নিঃসঙ্গকে সঙ্গ প্রদান করে। প্রেম মানুষকে স্বপ্ন দেখায়, দুটি হৃদয়কে এক সুতোর বন্ধনে বেঁধে সংসার গড়ে। কিন্তু ‘খেলাঘর’ উপন্যাসে প্রেম বড়োই নির্জীব। নির্জীব কেননা তা নিস্তেজ ও নিরুদ্বেগ প্রকৃতির। মিঠুসার গ্রামে আদিনাথের ভিটাতে আপৎকালীন সময়ে রেহানার আশ্রয়ের বন্দোবস্ত করা হয় এবং সঙ্গদানের জন্য ইয়াকুবও থেকে যায়। এই ভিটা বাড়িতে রেহানা যেন তার স্বপ্নের ঠিকানা খুঁজে পায়। নিজেই চুলা ধরায়, রান্না করে, ইয়াকুবের সঙ্গে পুকুরে স্নান করতে যায়, সাঁতার কাটে, বৃষ্টিতে ভিজে, গাছের ফুল-পাতা কুঁড়িয়ে বেড়ায়। ইয়াকুবের উপর মান-অভিমান করে। ইয়াকুবও ইচ্ছাতে-অনিচ্ছাতে রেহানার ফাইফরমাশ খাটে। এইভাবে তারা দুজনে আদিনাথের ভিটাতে শৈশবের খেলাঘর সাজিয়ে শৈশবের সংসার-সংসার খেলায় মত্ত হয়ে ওঠে। এখানেই ইয়াকুব হৃদয়াবেগের গভীর প্রত্যাশা থেকে রেহানাকে কামনা করে। প্রেম ও ভালোবাসার দ্বারা একান্ত আপন করে পেতে চায়। তাই একদিন সংযমের বাঁধন আলগা করে ইয়াকুব রেহানার গালে চুম্বন করে ফেলে। কিন্তু রেহানা তাতে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। রেহানার স্তব্ধতা

ইয়াকুবের লজ্জা ও গ্লানি বৃদ্ধি করে। ফলে একপ্রকার অন্যায় ও পাপ বোধে ইয়াকুব দিন-রাত্রি ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকে। প্রত্যাশাঘাতের বেদনায় ভাবে—

> "সামান্য একটু দুর্বল মুহূর্ত সবকিছুর ওপর এমনভাবে কালি ঢেলে দিতে পারে আগে এভাবে আমার তা জানা ছিল না। ঘুরেফিরে সেই একই কথায় যেতে হয়, জীবনে প্রত্যাশা থাকতে নেই, প্রত্যাশা থাকলেই মার খেতে হয়। যা অযাচিত, তাই আনন্দের, তাই ঐশ্বর্য; জীবনে প্রত্যাশা থাকতে নেই।"[৯]

ইয়াকুবের অন্তরবেদনা দেখে মনে হয়—হয়তো রেহানার কোনো উচ্চাশা বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, যার তাড়নায় সে ইয়াকুবকে গ্রহণ করতে পারেনি। কিন্তু আমাদের সে ধারণা অমূলক হয়ে পড়ে। ইয়াকুব অন্যায় বোধে কিংবা প্রত্যাশাঘাতে রেহানার সান্নিধ্য থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিলে রেহানাই প্রথম এগিয়ে আসে। বৃষ্টিস্নাত প্রাকৃতিক দুর্যোগের দিনে ইয়াকুবকে কাছে ডেকে কয়েকটি রাগ-অভিমানের কথা বলে রেহানা তাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন সুধা দান করতে করতে বলে—

> "তোমার যেমন খুশি ভালোবেসো, যা ইচ্ছা তাই নিও, যত খুশি। কেউ কোনো দিন আমাকে ভালোবাসে নি, বুঝতে পারছো বাবু, ও সব আমি চিনি না, আমাকে একটু বুঝতে দাও, দিনরাত আমি কত চেষ্টা করছি, নিজের সঙ্গে লড়াই করছি, বুঝতে পারো না? তোমাকে সব দেবো, তুমি সব নিও, শুধু একটু সময় আমাকে বুঝতে দাও—"[১০]

অর্থাৎ কোনো এক অদৃশ্য অন্তরজ্বালা থেকে রেহানা হৃদয়ে-হৃদয় মেলাতে পারে না। হৃদয়ে প্রেমের মন্থন জোয়ার সৃষ্টি হলেও সেই জোয়ারে রেহানা নিজেকে ভাসাতে পারে না। পারে না তার একটাই কারণ আত্মগ্লানি। আত্মগ্লানি রেহানার সমস্ত সজীবতা হরণ করে নিয়েছে এবং তাকে জীবন্ত লাশে পরিণত করেছে।

একপ্রকার আত্মজ্বালা ও আত্মযন্ত্রণা থেকে রেহানা ইয়াকুবের সঙ্গে হৃদয় মেলাতে ইতস্তত বোধ করেছে। আত্মজ্বালা এবং আত্মযন্ত্রণা রেহানার মনে আত্মগ্লানি সৃষ্টি করে। রেহানার যাবতীয় অন্তরজ্বালা-ঘৃণা-দুঃখ-যন্ত্রণা ও আত্মগ্লানির মূলকারণ যুদ্ধ। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ রেহানার জীবনে অভিশপ্তভাবে প্রবেশ করেছে। তাই তার জীবনযুদ্ধের বহ্নিশিখা স্তিমিত হয়নি বা নিভে যায়নি। প্রত্যেক নারীর জীবনে একটি নিষ্কলুষ ঘরের স্বপ্ন বদ্ধমূল থাকে। নারীর অন্তরস্বপ্ন লালিত সেই ঘর পবিত্রতায় দেবালয়ের সমতুল্য। সেই দেবালয়ের সতর্ক প্রহরী নারীর শরীর ও মন। তাই সেই দেবালয়ের পবিত্রতা রক্ষায় নারী আমৃত্যু দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। কিন্তু প্রচণ্ডতার রূপধারণ করে শয়তান যখন সেই শরীরকে আক্রমণ করে, মনে কালিমা লেপন করে তখন সেই দেবালয়ও অপবিত্র হয়ে ওঠে। শয়তানের প্রচণ্ড শক্তির কাছে নারী অসহায়। শরীর ও মনের পবিত্রতাহানীর জন্য অন্তর্ঘাতে নারী বিমর্ষ হয়ে ওঠে। প্রবল অন্তর্দাহে পুড়ে পুড়ে ভস্মীভূত হয় নারীর অন্তরস্বপ্ন লালিত সেই ঘর। পাকিস্তানি শয়তানের পদচারণে শরীর

ও মনের সঙ্গে সঙ্গে রেহানার অন্তরস্বপ্ন লালিত সেই ঘরও অশুচি-অপবিত্র। তাই একপ্রকার অন্তর্দাহ ও অন্তর্ঘাত, বিমর্ষতা ও কলুষতা, আত্মযন্ত্রণা ও আত্মগ্লানি থেকে রেহানার প্রেম কাঁচাখেলাঘর অতিক্রম করে পরিণয়ের পাকাঘর স্থাপন করতে পারেনি।

বহু ত্যাগ, তিতিক্ষা ও আত্মবলিদানের পর স্বাধীনতা আসে। দেশের স্বাধীনতার জন্য নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। যুদ্ধে কেউ শহীদের মৃত্যুবরণ করে, আবার কারোর অঙ্গহানী ঘটে। তবে যুদ্ধের সময় নারী অত্যান্ত পাশবিক ও পৈশাচিক অত্যাচারের শিকার হয়। ধর্ষিত হয় আবার হত্যা করাও হয়। তবে একথা অনস্বীকার্য যে খেলাঘর ভাঙতে ভাঙতেই একটি পাকাঘর গড়ে ওঠে। সেরকম অজস্র জীবন বলিদানের পর স্বাধীনতা আসে। আবার মানুষই ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে নতুন সূচনার ভিত্তিস্থাপন করে; শোক আড়াল করে শক্তির আরাধনায় হোমযজ্ঞের আয়োজন করে। তাই দেখা যায় রেহানার প্রস্থানের সময় ইয়াকুব শোকাকুল হয়ে পড়লে মুকুলচন্দ্র এক প্রবল শক্তির উন্মাদনা নিয়ে আদিনাথের ভিটাতে আস্তানা গাড়ে। স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্যতা ও সার্বোভৌমিকতার ভিত্তিস্থাপন উদ্দেশ্যে দ্বিধাগ্রস্ত-সংশয়চিত্ত ইয়াকুবের পিঠ চাপড়ে সে বলেছে—"...কাউলকা তালতলার ক্যাম্প এই পোলাপানগুলি ঝাঁঝরা করছিল,...কইনাই তরে মেজিক দেহামু, কই নাই? অহনে কি দেখতাছস ক, কি দেখতাছস?"(১১) তাই স্বাভাবিকভাবে আমাদের মনে পড়ে—

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়?"(১২)

পরাধীনতা মানেই দাসত্ব-দুঃখ-যন্ত্রণা। পরাধীনতা মানুষের আত্মবিকাশের পথে অন্তরায় স্বরূপ। তাই দাসত্ব, দুঃখ, আত্মগ্লানি থেকে মুক্তির জন্য স্বাধীনতা চায়। তবে মনে রাখা প্রয়োজন স্বাধীনতার পাকাঘর প্রতিষ্ঠার জন্য শৈশবের কাঁচাখেলাঘর ভাঙবেই—শত শত প্রাণ বলি হবে, শত শত পবিত্র প্রেম আত্মগ্লানির জ্বালায় ডুকরে কাঁদবে। আবার ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে শত শত নতুন প্রাণের উন্মেষ ঘটবে। স্বাধীনতা ও জীবন—এই দুই সত্ত্বার দার্শনিক সত্যে 'খেলাঘর' অলংকৃত। তাই বলা যায় 'খেলাঘর' যুদ্ধ, প্রেম ও আত্মগ্লানির মর্মমেঘে স্বাধীনতার হাতছানি।

তথ্যসূত্র

১. মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, 'India Wins Freedom', Reproduced by-Sani H. Panhwar, www.panhwar.com, 2017, পৃষ্ঠা-১৬৩

২. হাসান হাফিজুর রহমান, ‘একুশে ফেব্রুয়ারী’(সম্পাদিত), জিয়াদ আলি—‘এ বাংলায় সে-একুশ কেন?’, কলকাতা, নবজাতক প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ-১৯৪১, পৃষ্ঠা-৪

৩. সুকুমার বিশ্বাস, ‘একাত্তরের বধ্যভূমি ও গণকবর’, তৃতীয় মুদ্রণ, ঢাকা, অনুপম প্রকাশনী, ২০১০, পৃষ্ঠা-১৫

৪. মাহমুদুল হক, ‘খেলাঘর’, পঞ্চম মুদ্রণ, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৯, পৃষ্ঠা-৩৬

৫. ঐ, পৃষ্ঠা-৬৭

৬. ঐ, পৃষ্ঠা-৭৫

৭. ঐ, পৃষ্ঠা-৪০

৮. ঐ, পৃষ্ঠা-৬৩

৯. ঐ, পৃষ্ঠা-৬০

১০. ঐ, পৃষ্ঠা-৬৭

১১. ঐ, পৃষ্ঠা-৭৯-৮০

১২. রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘পদ্মিনী উপাখ্যান’, কলকাতা, ১১৫/২ নং, গ্রে-স্ট্রীট, নূতন কলিকাতা ইলেক্‌টিক্‌ মেসিন যন্ত্রে শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৩১২, পৃষ্ঠা-৭৪, পি.ডি.এফ

কমলকুমার মজুমদারের ‘অন্তর্জলী যাত্রা’ : ‘মায়া’ প্রসঙ্গের এক অনবদ্য রূপায়ণ

ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য্য
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : বাংলা উপন্যাস ও ছোটোগল্পের জগতে এক বিরলতম অধ্যায় হলেন লেখক কমলকুমার মজুমদার। তাঁর রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে এই ‘অন্তর্জলী যাত্রা’ নামক উপন্যাসটি নানা ভাবে পাঠকের মন জয় করেছে। এই উপন্যাসটি কাহিনি, ভাষাবিন্যাস, চরিত্রায়ণ ইত্যাদি সমস্ত দিক থেকেই বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে সাফল্যের শিখর ছুঁয়েছে। উপন্যাসটির কাহিনি পাঠকের অজানা, নতুনত্ব কোনো বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেনি। বরং এর মূল কাহিনি আবর্তিত হয়েছে আমাদের পরিচিত, ঘৃণিত সনাতন হিন্দু ধর্মের পুরাতন দুটি কু-প্রথাকে কেন্দ্র করে। অন্তর্জলী যাত্রা এবং সহমরণ, এই দুটি প্রথা ভয়ংকর সামাজিক অভিশাপ স্বরূপ এদেশের সমাজে নিজেদের শিকড় প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই শিকড়ের দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হয়েই কৌলীন্য প্রথার বলি হতে শ্মশানভূমিতে পড়ে থাকা মৃত্যুপথযাত্রী স্বামীর মৃত্যুকালীন দোসর হতে নববধূ বেশে সেখানে উপস্থিত হতে বাধ্য হয়েছে এই উপন্যাসের মূল নারী চরিত্র যশোবতী। শ্মশানক্ষেত্রে বিবাহ সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়েও মৃত্যুপথযাত্রী সীতারাম ও তার নববধূ যশোবতীর মনে অদ্ভুত এক মায়ার জন্ম হয়। এই মায়া দ্বারাই তারা নিজেদের জীবনকে মৃত্যুর কোল থেকে ফিরিয়ে এনে নতুন করে জীবনের স্বপ্ন দেখেছে। আর সমগ্র উপন্যাসে এই জাগতিক মায়ার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এক অসীম আধ্যাত্মিক মায়া। উপন্যাসের নিরিখে এই জাগতিক ও আধ্যাত্মিক মায়ার স্বরূপ সন্ধানই এই আলোচনার মূল বিচার্য বিষয়।

সূচক/মূল শব্দ : সতীদাহ বা সহমরণ বা মৃত্যুকালীন দোসর নেওয়া, অন্তর্জলী যাত্রা, জাগতিক মায়া, আধ্যাত্মিক মায়া।

মূল আলোচনা :

বাংলা উপন্যাসের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল কমলকুমার মজুমদার প্রণীত ‘অন্তর্জলী যাত্রা’ উপন্যাসটি। এই উপন্যাসের কাহিনি আমাদের বহু আলোচিত ভারতের ইতিহাসের কলঙ্কজনক অধ্যায় সতীদাহ প্রথাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। বহুদিন ধরে কৌলীন্য প্রথার বর্বরতার জাঁতাকলে পেষাই করে এদেশের বহু মেয়েকে আত্মবিসর্জন দিতে বাধ্য করা হয়েছে। কেবলমাত্র পুণ্যলাভের অজুহাত দিয়ে দিনের পর দিন এই সমাজের বুকে মেয়েদের নির্বিচারে অত্যাচার ও হত্যা করা হয়েছে। নিজেদের স্বার্থ

চরিতার্থ করতে সমাজপতিরা নিম্ন বর্ণের মানুষ এবং নারীদের নানা নিয়মের বেড়াজালে বদ্ধ করে রেখেছে। বিভিন্ন কু-প্রথাকে সমাজের বুকে টিকিয়ে রাখার জন্য তৎকালীন হিন্দু সমাজপতিদের এই সীমাহীন স্বার্থপরতার চিত্র ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে ‘অন্তর্জলী যাত্রা’ উপন্যাসে সুরম্য ভাষায় লেখক মায়াময় এক জগতের অবতারণা করেছেন।

অন্তর্জলী প্রথাটি একটি ভয়ানক সামাজিক ব্যাধি স্বরূপই বলা চলে। কোনো ব্যক্তির মৃত্যুক্ষণ উপস্থিত হলে অর্থাৎ চিকিৎসার শেষ পদ্ধতিতেও তার জীবনের গতি পুনরায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব না হলে তার অন্তর্জলীর ব্যবস্থা করা হতো। সেই সময় অর্ধমৃত ওই মানুষটিকে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে বিশাল শোভাযাত্রা করে গঙ্গাতীরে এনে তার পা পর্যন্ত বা কখনও নাভি পর্যন্ত গঙ্গার জলে ডুবিয়ে রাখা হতো। খাবার বলতে থাকতো কেবল গঙ্গার জল। অনাহারে, স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশে থাকতে গিয়ে খুব তাড়াতাড়িই রুগ্ন ব্যক্তিটির প্রাণপাখি তার জীবনের খাঁচা থেকে মুক্তি নিয়ে পরলোকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতো। গঙ্গা নদী হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষদের কাছে পবিত্রতার প্রতীক। তাই হিন্দু সনাতনপন্থীরা বিশ্বাস করতেন জীবনের শেষ ক্ষণটুকু এভাবেই গঙ্গাতীরে থাকলে সেই ব্যক্তির অক্ষয় স্বর্গলাভ হবে এবং সেই সঙ্গে তার পরিবারেরও পুণ্যলাভ হবে। এছাড়াও গোঁড়া হিন্দু ধর্মের সমাজপতিরা পুণ্যলাভের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আরো নানা কু-কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। তার মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য কুলরক্ষার উদ্দেশ্যে কুলীন ব্রাহ্মণ কন্যার যে কোনো বয়সী এমনকি মৃতপ্রায় কুলীন ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহ দেওয়া, সহমরণের মাধ্যমে সদ্য বিধবা নারীকে জীবন্ত অবস্থায় নিজের স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় নিক্ষেপ করা ইত্যাদি, যেগুলির নৃশংসতার পরিচয় আমরা এই ‘অন্তর্জলী যাত্রা’ উপন্যাসেও ফুটে উঠতে দেখি।

উপন্যাসটির কাহিনি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় মৃতপ্রায় বৃদ্ধ সীতারাম চট্টোপাধ্যায়কে অন্তর্জলীর উদ্দেশ্যে গঙ্গা সংলগ্ন একটি শ্মশানে নিয়ে আসা হয়েছে। এই পরিস্থিতির বর্ণনা করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক বলেছেন “সীতারাম অতীব প্রাচীন হইয়াছেন; অধুনা খড়ের বিছানায় শায়িত, তিনি, যেমত বা স্থিতপ্রজ্ঞ, সমাধিস্থ যোগীসদৃশ, কেবল মাত্র নিষ্পলক চক্ষুর্দ্বয় মহাকাশে নিবদ্ধ, স্থির, তিলেক চাঞ্চল্য নাই, প্রকৃতি নাই- ক্রমাগতই বাঙ্‌ময়ী গঙ্গার জলছলাৎ তাঁহার বিশীর্ণ পদদ্বয়ে লাগিতেছিল”[১]। সেখানেই জ্যোতিষীর গণনার প্রভাবে জানা যায় বৃদ্ধ সীতারাম মৃত্যুকালে দোসর নেবেন। অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করে একাকী তিনি স্বর্গে যাবেন না, সতী হিসাবে তার সঙ্গে কোনো নারী সহমরণে যাবেন। এই অবস্থায় কন্যাদায়গ্রস্থ পিতা লক্ষ্মীনারায়ণ তার অবিবাহিতা কন্যা যশোবতীকে অন্তর্জলীতে থাকা বৃদ্ধের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে নিজের কন্যার সহমরণের পথ প্রস্তুত করেন এবং এই কু-প্রথার দ্বারা নিজে পুণ্য অর্জন করতে চান। সনাতন এই কুসংস্কারের কাছে অসহায় অবস্থায় নিজেকে বলি দিতে প্রস্তুত হলেও যশোবতী ধীরে ধীরে তার মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধ স্বামীর কাছে হয়ে ওঠে নতুন জীবনের সঞ্জীবনী শক্তি। একদিকে যশোবতী সমাজের চোখে অস্পৃশ্য চণ্ডালের কাছে শোনে সমস্ত সংস্কার ছিন্ন

করে নিজের জীবন বাঁচিয়ে পালিয়ে যাওয়ার তীব্র আকুতি, অন্যদিকে সে দেখে তার মরণাপন্ন স্বামী তার মুখ চেয়ে জীবনমুখী। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এসে যশোবতী স্বামীর প্রতি এক মায়ার বশবর্তী হয়ে তার সতীত্বকেই বেছে নিতে চায়।

"জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন-নদে?"[২]

মাইকেল মধুসূদন দত্তের বলা এই কথাগুলি চিরন্তন সত্যের মতো প্রতিটি প্রাণীর জীবনে অবিরাম ঘটে চলেছে। আমাদের জীবন নদীর জল কখনোই স্থির নয়, নিজের খেয়ালে সে বয়ে চলে জীবনের শেষ ক্ষণের দিকে। কিন্তু এই জীবন এবং মৃত্যুর মাঝে একটি মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ থাকি আমরা। এই মায়াই হল জাগতিক মায়া। যে মায়ায় আমরা বাঁচতে চাই, জাগতিক সমস্ত জিনিসকে আঁকড়ে ধরতে চাই। এই জাগতিক মায়ার বশেই শ্মশানক্ষেত্রে শুয়ে নিজের জীবনের শেষ ক্ষণের জন্য অপেক্ষারত সীতারাম তার জমি, সম্পদ, স্ত্রী ইত্যাদি নিয়ে ভাবতে চেয়েছেন, নতুন করে জীবন কাটাতে চেয়েছেন। জীবন-মৃত্যুর মাঝে দাঁড়িয়েও জীবনের মায়া কাটিয়ে পরলোকের উদ্দেশ্যে গমন করার ইচ্ছা তার নেই।

'মায়া' শব্দটি এই উপন্যাসে বহু অর্থে বহু বার এসেছে। একটি হল স্নেহ-মায়া-মমতা অর্থাৎ মমত্ববোধ। অপরটি হল শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ অনুসারে জন্ম ও মৃত্যুর মাঝখানের মায়াবী জীবন। এই মায়া আছে বলেই ব্রহ্ম থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন। এই মায়ার কাজল আমাদের চোখ থেকে সরে গেলেই আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের সাথে জীবের কোনো তফাৎ নেই। অর্থাৎ এই উপন্যাসে মায়ার দুটি স্বরূপ লক্ষ্য করা যায়। একটি হল মমত্ববোধ এবং অপরটি হল আধ্যাত্মবোধ।

বৃদ্ধ সীতারামকে যখন অন্তর্জলীর উদ্দেশ্যে শ্মশান সংলগ্ন গঙ্গাতীরে নিয়ে আসা হয় তখন তিনি জীবন-মৃত্যুর মাঝের তটে অবস্থান করছেন। এই তট টাই হল মায়া। এই মায়ার বশবর্তী হয়ে ইহ ও পর জগতের মধ্যবর্তী স্থানে থেকেও সীতারাম তার নববিবাহিতা পত্নী যশোবতীর সঙ্গে ঘর বাঁধতে চাইছেন, যশোবতীর কোলে সন্তান দিতে চাইছেন। নববিবাহিতা স্ত্রীকে দেখে তিনি উৎফুল্ল ভাবে স্ত্রীর কাছে গান শুনতে চাইছেন, নিজেও সেই অসুস্থ শরীরে সাধ্যমতো গান গাইছেন। যেন এক অদ্ভুত বিবাহবাসরের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে শ্মশানের মধ্যে। আর যশোবতীও স্বামীর প্রতি মায়ায় আবদ্ধ হয়ে তার আসন্ন সহমরণের ভবিতব্যটি জেনেও প্রকৃতির মতো যত্ন করে নিজের মৃত্যুপথযাত্রী স্বামীকে সযত্নে লালন করতে চাইছে। এই প্রকৃতির মতো স্নেহই হল মায়া অর্থাৎ মমত্ববোধ। আর যিনি মায়া ত্যাগ করে জীবন তটের কিনারে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তিনিও আবার জড়িয়ে গেলেন সেই জাগতিক মায়ায়।

এই উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র বৈজুনাথ পেশায় চণ্ডাল বা ডোম। সীতারামকে যে শ্মশানে নিয়ে আসা হয়েছে সেই শ্মশানই তার অবাধ বিচরণভূমি। সমাজের চোখে অস্পৃশ্য বৈজুর মধ্যে মায়ার এক অপরূপ স্বরূপ চোখে পড়ে। তথাকথিত ভদ্র সমাজের মতে রুচিসম্মত সামাজিক সংস্কার, মার্জিত ভাষা কিছুই নেই চণ্ডাল বৈজুর মধ্যে। কিন্তু তার মধ্যে ঔপন্যাসিক নির্মাণ করেছেন অপূর্ব এক মায়া। যে মায়া বা মমত্ববোধ মুখোশধারী ভদ্র সমাজের নেই তা আছে ডোম বৈজুর মধ্যে। তাই মৃত্যুকালে সীতারাম দোসর নেবেন জেনে বারবার সে সমাজের দণ্ডমুণ্ডের কর্তাদের কাছে এই কাজের তীব্র প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু সে নিচু জাতির এক সামান্য ডোম, তাই তার কথার কোনো গুরুত্ব এই সমাজের উচ্চবংশজাতরা দিতে চায় না। কারণ তৎকালীন সমাজ কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে মায়া-মমত্বহীন নিষ্প্রাণ জড় পদার্থে পরিণত হয়েছে। বিশেষত মেয়েদের প্রতি কোনো মমত্ববোধ তৎকালীন সময়ের সমাজে অবশিষ্ট ছিল না। মেয়েদের মনে করা হতো পুরুষ দ্বারা চালিত একটি প্রানশক্তি মাত্র। এই মমত্বহীন জগতে বিচরণ করার কারণেই যশোবতীর বাবা পুণ্যলাভের লোভে নিজের মেয়েকে বলি দিতেও পিছুপা হলেন না। তিনি কেবল সান্তনার ছলে মেয়েকে বোঝালেন “মঙ্গল কাজের সময় চোখের জল ফেলতে নেই মা”[৩]। পিতার কাছে বারবার যশোবতীকে শুনতে হয় “.....তোমার পুণ্যে মাগো-আমাদের স্বগ্গ বাস হবে”[৪]। প্রিয়জনদের এই পুণ্যলাভের লোভেই তৎকালীন সময়ের কত মেয়ে যশোবতীর মতো নিজের জীবনকে বলি দিতে বাধ্য হতো।

সমাজের আর এক অমানবিকতার ছবি ধরা পড়ে যখন টাকার পরিমাণ কমানোর জন্য দুটি জীবিত মানুষের সামনেই তাদের চিতার মাপ ছোট করা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করে মায়াহীন এই সমাজ। অথচ বৈজু অশিক্ষিত এবং সমাজের চোখে ব্রাত্য হলেও এই ঘটনায় তার প্রাণ কাঁদে। যশোবতীর কাছে সে আকুল মিনতি করে সব সংস্কার ছেদ করে পালিয়ে গিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচানোর।

কিন্তু যশোবতীও এই জাগতিক মায়ায় আচ্ছন্ন। আজন্মকাল ধরে ভারতীয় সমাজের মেয়েদের স্বামীকেই নিজের ভবিতব্য ও নিজের ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করার কথা শেখানো হয়। সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েই যশোবতী এই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। তার প্রতি সমাজের করা এই অন্যায়কে সে মেনে নিয়েছে নিজের ভবিতব্য হিসাবে। তাই স্বামীকে ছেড়ে পালানোর কথা সে ভাবতেও চায়নি। তার এই মমত্ববোধ দিয়ে সীতারামকেও সে বাঁচার আশা দেখিয়েছে।

বৈজুকে আবার দৃশ্যমান মায়ার সঙ্গেও তুলনা করা হয়েছে। তাকে দেখলেই মায়া ও মমত্ববোধের চিহ্ন দেখা যায়। তার সারা শরীরে মায়ার এই আভাস বিরাজমান। যে মায়ার সামান্য চিহ্নও এই সমাজের সমাজপতিদের মধ্যে অবশিষ্ট নেই, এমনকি যশোবতীর বাবার মধ্যেও তার বিন্দুমাত্র নেই। পিতা সন্তানের জন্ম দেন, তাকে পালন করেন, তিনি কখনোই পুণ্য অর্জনের লোভে নিজের মেয়েকে সহমরণে যাওয়ার

প্ররোচনা জোগাতে পারেন না। কিন্তু যশোবতীর বাবা পেরেছিলেন। পিতৃঋণ শোধ করে যশোবতী চলে যাওয়ার সময় তার বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠলেও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতায় পুণ্যলাভের মোহ কাটিয়ে সন্তানকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনার কোনো চেষ্টাই তিনি করেননি। বরং যশোবতীকে সহমরণের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আরো বেশি প্ররোচিত করেছেন। পুণ্যলাভের লোভ এমন ভাবেই সমাজের বুকে জাঁকিয়ে বসে সমাজকে মায়াহীন করে তুলেছিল। কিন্তু সমগ্র উপন্যাসে মায়ার দৃশ্যমান রূপটি চণ্ডাল বৈজুর মধ্যে ফুটে উঠেছে। সে বারবার এই অমানবিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে।

এই উপন্যাসে বহিরঙ্গ জগতের বেশ কিছু মায়াময় চিত্রের অবতারণা করেছেন ঔপন্যাসিক। জগতের অন্তর্ভুক্ত যা কিছুর কারণে আমাদের মনে মমত্ববোধের জন্ম হয় সেটিই হল জাগতিক মায়া। কিন্তু যশোবতীর মানস চক্ষুতে, কল্পনায় তার সামনে যখন সতীদাহের অনুষ্ঠানটি ভেসে ওঠে তখন এক মোহিনী মায়ার জন্ম হয়। সেই সময় মানসচক্ষে সে দেখে সতী রূপে সাজিয়ে তাকে নিয়ে আসা হচ্ছে তার স্বামীর কাছে। একটি জীবন্ত মেয়েকে সহমরণের মাধ্যমে সতীতে পরিণত করার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই বিষয়ে অন্যান্য নারীদের মধ্যে প্রতিবাদের কোনো আভাস নেই, বরং যশোবতীর সতী হওয়া দেখার জন্য তারা বিশেষ ভাবে আহ্লাদিত। নারীরা নিজেদের প্রসাধন এনে তাকে সাজিয়ে দিচ্ছে, হাজার হাজার স্ত্রীলোক তার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ছে, কত নারীর শাঁখা তার পা স্পর্শ করছে, অনেকেই চুল দিয়ে তার পথ পরিষ্কার করে দিচ্ছে। এই অবস্থায় যশোবতীকে মোহিনী মায়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আর সেই মোহিনী মায়া ত্যাগ করে সে নিজের জীবনকে চিতায় বিসর্জন দিচ্ছে। তাই সাধারণ মানুষের কাছে সে হয়ে উঠেছে সতী।

কিন্তু যশোবতীর স্পর্শে বৃদ্ধ সীতারাম তার নবজীবনের সঞ্জীবনী শক্তি খুঁজে পান। শ্মশানঘাটে অবস্থানকালেই নতুন করে সংসার করার সাধ জেগে ওঠে তার মনে। আগেকার অবসন্নতা, জীবনের প্রতি বৈরাগ্য ভুলে নতুন জীবনকে বরণ করতে চান তিনি। যশোবতীও সেই শ্মশান প্রান্তরেই স্বামী সোহাগী হয়ে আবার সংসারের স্বপ্ন দেখে। এই স্থানের এক অন্যরকম মায়াময় পরিবেশ ঔপন্যাসিক পাঠককে উপহার দিয়েছেন। যে শ্মশানক্ষেত্র একটি দেহকে পঞ্চভূতে লীন করে সেই শ্মশানক্ষেত্রেই একটি রুগ্ন মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধের দেহ নতুন করে বল পাচ্ছে। কিছুটা দূরে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যাওয়া অজানা এক মৃতদেহের সৎকার করতে ব্যস্ত বৈজু ডোম মায়াকান্নায় জগৎ ভেসে যাওয়ার কথা বলে। সে বলে ওঠে “হারে, মায়াকান্নায় ড্যাঙা ভাসে, লাস ফেলে পালান............মরি কি মায়ার বাহার গো”[৫]। যে সময় কোনো এক শবকে তার পরিবার পরিত্যাগ করায় বৈজু উক্ত কথাগুলি বলে সেই অবস্থাতেই প্রজ্বলিত চিতার সামনে নতুন সম্পর্কের মায়ায় সোহাগী বন্ধনে আবদ্ধ হয় নববিবাহিত দম্পতি সীতারাম

ও যশোবতী। এই মায়ার বশেই যশোবতী উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলতে পারে “এ জীবন গেল, কি হয়েছে? আবার জন্মাব আবার ঘর পাতব”[৬]।

স্বামীর প্রতি এই মায়া যশোবতীর মনের গভীরে স্থান করে নিয়েছিল বলেই হঠাৎ আসা বান গঙ্গাতটে অন্তর্জলীরত রুগ্ন সীতারামকে নিয়ে গেলে বৈজুর সব নিষেধ নিমেষে অগ্রাহ্য করে সে জলে ঝাঁপ দিতে দুবার ভাবেনি। বৈজু চেয়েছিল যে ব্যক্তি জীবন-মৃত্যুর তটের কিনারায় অবস্থান করছে, নদীর বান তার দেহ ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে প্রাণটাও নিয়ে গেলে যাক, কিন্তু যশোবতীর নবীন প্রাণ অকালে ঝড়ে না পড়ুক। যশোবতী পালিয়ে যাক-সে বাঁচুক। কিন্তু যশোবতী মায়ার তাড়নায় পীড়িত হয়ে স্বামীকেই নিজের জীবনের সর্বস্ব রূপে গ্রহণ করেছে। তাই সে যখন বুঝল চণ্ডাল তার হাত ধরে আছে তখন তার মানসিক অবস্থা সম্পর্কে উপন্যাসে বলা হল “তিনি শিশুর মত আপনকার পা মৃত্তিকায় ঠুকিতে লাগিলেন, গগন শঙ্কিত হইল। আর যে, হঠাৎ তিনি চণ্ডালের হস্তে কামড় দিতেই বৈজুনাথ হাত ছাড়াইয়া লইল”[৭]। আর এই পাগলপ্রায় অবস্থায় সে যখন দেখল স্বামীর রুগ্ন দেহ বানের প্রবল স্রোতের ধাক্কায় আহত তখন জলে নেমে নানাভাবে সে স্বামীকে বাঁচানোর চেষ্টা চালাতে থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেবল গঙ্গার রক্তিম জলোচ্ছ্বাসটুকুই দেখা গেলো।

উপন্যাসের শেষ বর্ণনাটুকুও ঔপন্যাসিক দিলেন মায়ার প্রসঙ্গকে সামনে রেখেই। পাশেই অবস্থান করা ভাওলিয়ার গায়ে আঁকা যে চোখটি দেখা গেলো তা যেন “.......সিন্দুর অঙ্কিত এবং ক্রমাগত জলোচ্ছ্বাসে তাহা সিক্ত, অশ্রুপাতক্ষম, ফলে কোথাও এখনও মায়া রহিয়া গেল[৮]”। এভাবেই থেকে যায় জাগতিক মায়া। পৃথিবীর প্রতি এই মায়া উপেক্ষা করে আমরা কেউই যেতে চাই না। মৃত্যুর অনিবার্যতা জেনেও ভোগ-বিলাসের পৃথিবীতে মায়ায় আচ্ছন্ন থেকে আমরা জীবনকে উপভোগ করতে চাই। তাই বিবাহ করতে বাধ্য হওয়া যশোবতী বৃদ্ধ স্বামীকে বিপদের মধ্যে ফেলে রেখে পালিয়ে গিয়ে নিজে বাঁচার কোনো চেষ্টাই শেষ পর্যন্ত করেনি। স্বামীর প্রতি মায়ায় স্বামীর সঙ্গেই কালের অতলে অনির্দিষ্টের পথে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে।

আধ্যাত্মিক মায়াও এই উপন্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের কাহিনির সুচনালগ্ন থেকে ঔপন্যাসিক একটি আধ্যাত্মিক ভাব বজায় রাখতে চেয়েছিলেন বলেই তিনি উল্লেখ করেছিলেন এই গ্রন্থটির ভাব বিগ্রহ রামকৃষ্ণের এবং কাব্য বিগ্রহ রামপ্রসাদের। এছাড়া ঔপন্যাসিক নিজেই স্বীকার করেছিলেন এই গল্পটি আসলে ঈশ্বর দর্শন যাত্রার গল্প। দেখা যায় বৃদ্ধ সীতারাম যেন শব এর মতো গঙ্গাতীরে পড়ে ছিলেন। যশোবতী প্রথমবার বৃদ্ধকে দেখার জন্য তাকিয়েই দেখতে পায় গঙ্গাকে এবং সেই সঙ্গে দেখে গঙ্গার জলে একটি গলিত শবদেহ। যশোবতীর কাছে সীতারাম যেন সেই ভেসে যাওয়া শবদেহেরই পূর্বাবস্থা। কিন্তু যশোবতীর স্পর্শে তিনি শব থেকে ধীরে ধীরে শিব হয়ে উঠতে চাইছেন। দেহে বল পাচ্ছেন। সীতারামের কাছে যশোবতী ষড়ৈশ্বর্যময়ী দেবী রূপে কল্পিত হয়েছে। যশোবতী কেবল এখানে ত্রিগুনের মায়া দ্বারা

আর আটকে নেই। স্বামীকে দেখে তার বুক থেকে বেড়িয়ে আসা দীর্ঘশ্বাস যেন তার কামনা, বাসনা, সুখ ইত্যাদি সব টুকুকেই তার বুক থেকে বের করে দেয়। সে যেন হয়ে ওঠে এক দেবীমূর্তিস্বরূপা। কাহিনির মধ্যে বারবার তাকে নানা দেবীরূপে দেখানো হয়েছে। কখনও সে প্রকাশিত হয়েছে কালী রূপে, কখনও দুর্গা রূপে কখনও আবার ব্রহ্মাণী রূপে। আবার নানা প্রসঙ্গে সীতার পতিব্রতা রূপ ও সীতার দুঃখিনী রূপটিও যশোবতীর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। তাকে দেবী লক্ষ্মী ও পার্বতীর সঙ্গেও তুলনা করা হয়েছে। স্বামী সীতারামের কাছেও যশোবতী যেন মায়ার এক আধার হয়ে উঠেছে।

ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের একটি মৌলিক ধারণা হল মায়া। ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখার মধ্যে এই মায়াবাদ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের ধর্ম ও দর্শনের নিরিখে এই মায়া শব্দটিকে নানা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। মায়াবাদ নিয়ে বহুবিধ ব্যাখ্যা এদেশীয় ধর্ম ও দর্শনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তবে বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কোনো বিতর্কে না গিয়েও আলোচ্য 'অন্তর্জলী যাত্রা' উপন্যাসে ঔপন্যাসিক কমলকুমার মজুমদার জাগতিক মায়া ও আধ্যাত্মিক মায়া উভয়কেই যথার্থ ভাবে হাজির করেছেন, এবং সমগ্র উপন্যাসের কাহিনির মাধ্যমে এই দুই প্রকার মায়া সমান্তরাল ভাবে অগ্রসর হয়ে উপন্যাসটির কাহিনির প্রতি পাঠককে মোহিত করে তুলেছে।

তথ্যসূত্র :

১. কমলকুমার মজুমদার, অন্তর্জলী যাত্রা, সুবর্ণরেখা প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩৬৯, পঞ্চম মুদ্রণ ২০১৩, পৃ. ২

২. মাইকেল মধুসূদন দত্ত, শ্রেষ্ঠ কবিতা, সম্পাদনা- আবদুল মান্নান সৈয়দ, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ তৃতীয় মুদ্রণ অগ্রহায়ণ ১৪২১, ডিসেম্বর ২০১৪, পৃ. ২৩

৩. কমলকুমার মজুমদার, অন্তর্জলী যাত্রা, সুবর্ণরেখা প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩৬৯, পঞ্চম মুদ্রণ ২০১৩, পৃ. ৫৬

৪. কমলকুমার মজুমদার, অন্তর্জলী যাত্রা, সুবর্ণরেখা প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩৬৯, পঞ্চম মুদ্রণ ২০১৩, পৃ. ৭৬

৫. কমলকুমার মজুমদার, অন্তর্জলী যাত্রা, সুবর্ণরেখা প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩৬৯, পঞ্চম মুদ্রণ ২০১৩, পৃ. ৮৪

৬. কমলকুমার মজুমদার, অন্তর্জলী যাত্রা, সুবর্ণরেখা প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩৬৯, পঞ্চম মুদ্রণ ২০১৩, পৃ. ৯৫

৭. কমলকুমার মজুমদার, অন্তর্জলী যাত্রা, সুবর্ণরেখা প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩৬৯, পঞ্চম মুদ্রণ ২০১৩, পৃ. ১৬৬

৮. কমলকুমার মজুমদার, অন্তর্জলী যাত্রা, সুবর্ণরেখা প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩৬৯, পঞ্চম মুদ্রণ ২০১৩, পৃ. ১৬৭

সহায়ক গ্রন্থ :

১. সুব্রত রুদ্র(সম্পাদিত), কমলকুমার রচনা ও স্মৃতি, নাথ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ১৯৬০
২. গোরাচাঁদ মিত্র, সতীদাহ, শঙ্খ প্রকাশন, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৭১
৩. বিনয় ঘোষ, বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা(১৮০০-১৯০০), পাঠভবন, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ১৯৬০
৪. বিনয় ঘোষ, বাংলার নব জাগৃতি, ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ শ্রাবণ ১৩৫৫

উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর ক্ষমতায়ন ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটভিত্তিক একটি অনুসন্ধান

প্রসেনজিৎ সাউ
স্বাধীন গবেষক ও প্রাবন্ধিক
পঞ্চানন দেওয়াশী
গবেষক, বংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : সামরিক বাহিনীর রাজনৈতিক অরুঢ় বাস্তব চেহারায় হাজির হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত্তর পার ঔপনিবশিক শাসন মুক্ত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে। পশ্চমী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা আশা করেছিলেন স্বাধীনতাত্তোর তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি । উন্নত বিশ্বের রাজনৈতিক অনুসরণ করেই গড়ে উঠবে। উদার নৈতিক গণতন্ত্র এবং তার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাসমূহ আই চিহ্নিত হয়েছিল রাজনৈতিক উন্নয়নের মক্ষ্য হিসাব। প্রারম্ভিক পর্যায়ে গনতন্ত্রের পরীক্ষা-নীরিক্ষা ও হয়েছে তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি এবং সামরিক বাহিনীর সামরিক বাহিনীর চল এসেছে প্রতক্ষ রাজনীতি তে । কোথাও আবার সরকারী ক্ষমতা দখলের লড়াই চলছে। কোথাও আবার তা না করলেও রাজনৈতিক পালবদলের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে । তবে সাধারণ ভাবে রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ তৃতীয় বিশ্বের একটি পৌনঃপুনিক বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। ১৯৯০ এর World Development Report অনুযায়ী ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে থেকে প্রতি পাঁচ বছরে উন্নয়শীল দেশে প্রতি বছর অন্তত একটি সমরিক অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা দেখা গেছে। আশির দশকেও প্রতি তৃতীয় বিশ্বের কোন অংশে হস্তক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে । ইদানিং উন্নত দেশগুলি এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ মানবধিকার এবং গনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর গরুত্ব আরোপ করেছে ।

সূচকশব্দ : আমলাতান্ত্রিক, সামরিক বাহিনী, এলিট, রাজনৈতিক, জমিদারী প্রথা, গণতন্ত্রের, আন্তর্জাতিক, অভ্যুত্থান, হস্তক্ষেপ।

মূল আলোচনা:-

উন্নয়নশীল দেশের রাজনৈতিক সমরিক বাহিনীর ভূমিকা:-

প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অ্যালান বলতে চেয়েছেন যে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে থেকে শুরু করে ১৯৮৩ অবধি সংঘটিত সামরিক অভ্যুত্থানের সংখ্যাগত আধিক্য যেন এটাই প্রমান করে

যে এ ধরনের ক্ষমতা অধিকার করা আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি রীতিরুপে প্রতিষ্ঠত হয়েছে। এটি অবশ্যই পরিস্থিতির বাস্তবচিত মূল্যায়ন নয়।

তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্গত রাষ্টগুলির প্রতিরক্ষার ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের সূচনা ঔপনিবেশিক সরকারের দ্বারা হয়েছিল । কারণ নিজেদের শাসন ও শোষণ অব্যাহত রাখার জন্য এই উদ্যাগ নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। স্বভাবতই আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগে তাদের সামরিক বাহিনীকে সমৃদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় নানাবিধ পদক্ষেপ তৎকালীন সরকারগুলি নিয়েছিল। বস্তুতপক্ষে প্রথম থেকেই যে বিষয়টি সমাজবিঞ্জাণের গবেষক ও পর্যবেক্ষকদের চোখে পড়েছিল তা হল সদ্যজাত রাষ্টগুলি যেমন ভারত মালোশিয়া,ফিলিপাইনস সহ বহু দেশ এক দিকে যেমন তাদেব সামরিক বাহিনীর ও প্রশাসনের নানাবিধ দূর্বলতার খুঁজে বের করে সেই গুলিকে সমাধান করবার চেষ্টা করা হয়েছে ফলে অন্যদিক দিয়ে তখন সামরিক বাহিনীর সামরিক বাহিনী সাধারণ ভাবে যথেষ্ট উন্নত।

এশিয়া আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত কম উন্নত রাষ্ট্রে সামরিক অভ্যুত্থানের পটভূমিকা অথ্যাৎ কারণ গুলিকে চিহ্নিত করা সহজ হয়ে যায়। বহু রাষ্ট্রে দীর্ঘদিন ধরে বিশেষ ভাবে পাশ্চাত্যের ঔপনিবেশিক শক্তি গুলির বিদায় গ্রহণের পর থেকে সৈন্যবাহিনীকে জাতীয়তাবোধ, জাতীয় গরিমা ও ঐতিহ্যকে একত্ম করে দেখানো হয়। সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে। স্বাধীনতার উগ্র উন্মাদনার উপর নির্ভর করে বেশিদিন শাসনকাঠ চালনা করা যায়। তাই যখন কোনো রাষ্ট্র অসামরিক সরকারের মধ্যে ধারাবাহিক ভাব অন্তর্নিহিত ভাব দূর্বলতার প্রাকাশ ঘটে এবং তার পরিমাণ নানা প্রকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট আর্বতে সমাজ নিয়ন্ত্রিত হয়। তখন দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীর পক্ষে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা সহজ হয়ে যায়। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে জারুল আয়ুবখান ক্ষমতা অধিগ্রহণ ন্যায় একধরণের 'Controiled Politics' অর্থ্যাৎ নিয়ন্ত্রিত রাজনীতির পন্থা অবলম্বন করেন।

তৃতীয় বিশ্বে রাজনৈতিক সংস্কৃতি খুব একটা পরিণত নয়। কোনো রাষ্ট্রে একদিকে যদি গণতন্ত্রের পন্থা,পদ্ধিত ও প্রতিষ্ঠান এবং অন্যদিকে গনতান্ত্রিক ভাবধারণ ও মানুষের সাথে যদি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি আর্দশ আত্মিক সম্পর্ক গড়ে না ওঠে তবে সামরিক হস্তক্ষেপের সর্বদাই ক্রিয়াশীল থাকে।

পাকিস্তানের রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা:-

স্বাধীনতার লাভের পর মহম্মদ আলি জিন্না পাকিস্থানের প্রথম গভর্নর জেনারেল। তাঁর ঘনিষ্ট সহযোগী লিয়াকত আলি খান হলেন প্রথম প্রাধান মন্ত্রী। তবে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো এই দুই ব্যক্তি কিন্তু জন্মসুত্রে পাকিস্তান অঞ্চলের মানুষ নন । দুই জনেই পাকিস্তান সৃষ্টির জীবিত ছিলেন না । জিন্নার প্রায়ণের পর মহম্মদ পাকিস্তানের গর্ভণর জেনারেল পদে বসলেন । ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ভারত শাসন আইন অনুযায়ী বিচারালয় বা

আইনী ব্যবস্থা চালু থাকলো। কিন্তু পাকিস্তানের বিচার ব্যবস্থা এক বিশেষ রীতি মেনে চলতে শুরু করে। প্রয়োজনের জন্য নীতিগত ব্যবস্থা এই তত্ত্ব পাকিস্তানের বিচার ব্যবস্থা নীতিতে চুড়ান্ত ভাবে গৃহীত হয়ে যায়।কারণ প্রধান অরয়ুব ইয়াহিয়া এবং মুশরফ লিয়াকত আলির প্রায়াণের পর নির্বাচিত সরকার গুলিকে হাঁটিয়ে সামরিক শাসন জারি করলেও বিচারালয় থেকে বিরোধিতা আসেনি।

তবে লিয়াকত আলির প্রয়াণের পর ঐতিহাসিকদের মতে পাকসেনা কর্তারা রাজনীতিতে মাথা গোলানর চেষ্টা শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় সেনা কর্তাদের রাষ্ট্রশাসন উচ্চপদ দখলের আকাঙ্খা। সেনা বাহিনীতে উচ্চ উচ্চপদের নড়াচড়া দেখা যায়। তাদের সমর্থনে ক্ষমতায় আসন দখলে রাখার বাসনায় ২৮শে অক্টোবর ১৯৫৪খ্রিষ্টব্দে গভর্নর জেনারেল গোলাম মহম্মদ প্রধান মন্ত্রী আলি বগরার মন্ত্রী পরিষদ স্থান দখল করেন ।

পরে ইস্কান্দার মির্জা পদচ্যুত করে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে গভর্নর জেনারেল পদ দখল করে এবং সরকারী উচ্চপদের অধিকারী চৌধুরী মহম্মদ আলিকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন। মির্জার চেষ্টায় প্রথম সংবিধান প্রচলিত হল (২৩শে মার্চ ১৯৫৬)ইসলামীয় প্রজাতন্ত্রের সংবিধান । তবে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে মির্জার গদি জনারুল আয়ুব খান দখল করে নেন । এরপর ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে ফের নতুন সংবিধান তৈরি হয় চালু হয় প্রধানমন্ত্রীর পদকে গুরুত্ব দিয়ে ।

পাকিস্তানে চারটি আইনি প্রশাসন সামরিক দখলির ত্বত শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল,আয়ুব খান(১৯৫৮),আগা মহম্মদ ইয়াহিয়া খান(১৯৬৯),জিয়াউল হক(১৯৭৭), ও মুশারদ(১৯৯৯)।

পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের স্বৈরতান্ত্রিক আচরনের দখল স্বরুপ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২রা মার্চ মুজিবর রহমান জনসমাবেশ ঢাকায় স্বাধীন বাংলাদেশর পতকা উত্তোলন করেন । ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বরে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের যুদ্ধ শেষ হয়। পাকিস্তানী সেনারা পরাস্ত হল বাংলাদেশের স্বাধীনতা কে স্বীকার করা নয়। এর অব্যহতি পর রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়। আসলে পাকিস্তানের সেনা বাহিনীর সঙ্গে সাধারণ মানুষের যোগাযোগ অনেক বেশি। কারণ সেনা বাহিনীতে অনেক কৃষক শ্রেণীর মানুষ যোগ দেয়,তাছাড়া বিভিন্ন সময় সমাজের যে সুযোগ ও সুবিধা গুলি প্রশাসনের করার কথা তার সেনা বাহিনী করে । রাস্তাঘাট থেকে উন্নয়নয় যে কোনো পরিষেবা সেনাবাহিনী নিয়ে থাকে। আসলে প্রশাসন নিজের ক্ষমতায় এগুলি করে উঠতে পারে না বলে স্বাভাবিক ভাবে তা সেনাবাহিনী তা করে । ইসলাম ও সেনাবাহিনীর সম্পর্ক জিয়ারুল হকের সময় Islamization প্রক্রিয়া। আসলে ISI অপর একটি দিক সাহায্য করেছে । ফলে ইসলাম ধর্ম সেনা বাহিনীকে গৌরবময় করে তোলার বিষয়ে অনেকটা সফল হয়েছে। মিয়ারুল হকের সময় থেকে ISI দুটি কাজ করেছে -১)জিহাদী সংগঠন গুলির সঙ্গে স্ংযোগ রাখা, এবং তাদের স্বার্থে

কাজ কারা। অন্যদিকে সাধারণ ভাবে দেশের নেতাদের উপর নজরদারী করার কাজ করেছে। অন্যদিকে পাকিস্তানের Middle Class এর ভূমিকা ও অন্যরকম নয়।

I.T.Vpaul এর মতে পাকিস্তানের Middle Class এর গনতন্ত্রের আগ্রহ ও আছে । কিন্তু তারা গনতন্ত্রকে সমর্থন করতে পারেনি কারন ১)সামরিক বাহিনীর দেশের ভ্রাতা এই ধারনাটা তাদের মধ্যে সুন্দর প্রেক্ষিত তৈরী হয়েছিল । কারন ভারত হল সবচেয়ে বড়ো শত্রু এই ধরনের পাকিস্তান Middle Class এর একটা বড়ো অংশ মনে করে । তারা মনে করে সামরিক বাহিনী এই শত্রুকে ঠেকাবে । ২)তাদের মধ্যে ইসলামের একট প্রভাব রয়েছে । সেই কারনে কাশ্মীর জিহাদী গোষ্ঠীর যে সংগ্রাম চলছে তার প্রতি ও অনেকের সমর্থন আছে । যেটা সামরিক বাহিনীর প্রতি মনোবল বাড়ায় ।

আগেই বলা হয়েছে পাকিস্তানের সামরিক খাতে ব্যায়ের বোঝা বেড়েছে এর ফলস্বরূপ, আরবকে আরো শক্তিশালী করেছে । ফলে পাকিস্তানি ব্যবস্যায়ী এলিট সম্পদায় গুলি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবে অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েছে । তাদের অধিকাংশ অধিবাসী যারা ভারত ভাগের পর করাচিতে বসতি স্থাপন করেছিল । কারণ তাদের পাকিস্তানিরা ছোট ছোট অভাব অভিযোগ গুলি মেনে নিয়ে নিজেদের সাথে জোটবদ্ধ ভাবে থাকতে পরেনি। যার জন্য বিশেষ করে পশ্চিম পাকিস্তানে শক্তিশালী আমলাতান্ত্র কারিদের মধ্যস্থতা করতে পূর্ণ অভিজাত গোষ্ঠী এবং জনগণ, প্রতিনিধির দল গণ সংগঠন বা ছাত্র আন্দোলন, আমলাতান্ত্রিক জমিদারের সঙ্গে মিলিটারি এলিট দেশের জাতীয় কঠামোর সূচনা করেছে। সেই কারনে পাকিস্তানের রাজনীতিতে, সামাজিককতায় ও অর্থনীতে এক আমূল পরিবর্তন ঘটেছে । যা লক্ষ্যণীয় বিষয়-

১) আমলা ও সেনাবাহিনী সদস্যদের মধ্যে একটি ভার্চুয়াল আলোচনা করা হয় দেশের শাসন কার্য সুন্দর ভাবে চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্য ।

২) ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন পাকিস্তানের সেনা প্রধান আইয়ুব খান দেশের নতুন করে সামরিক শাসনের কথা আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন ।

৩) সেনাবাহিনী এবং আমলাতন্ত্রের সম্পর্ক,যা উপমাদেশ বিভাজনের পর থেকে বিদ্যমান ছিল।

৪) ক্ষমতার কোনো মৌলিক পুনর্বন্টন ছিল না যা নতুন স্লোগান সহ স্থিতাবস্থায় ফিরে আসা এবং নতুন আদর্শ ও আমূল সংস্কারের নামে ।

৫) জমিদারদের নিয়ে গঠিত একটি ক্ষুদ্র ও উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে বিভাজন তৈরী হয় কারণ সামরিক বাহিনীর কর্মচারী ও অভিজাত আমলাদের মধ্যে পারিবারিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে ।

৬) পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ভাষাগত,জাতিগত এবং আঞ্চলিকভাবেও উল্লম্ব ক্ষেত্রে লাল লাইন আছে । অবশ্য বাংলাদেশর ক্ষেত্রে তা এমন কিছু নেই ।

৭) পাকিস্তানে জনসংখ্যার দিক থেকে দেখতে গলে শিক্ষিত,মধ্যবিত্ত এবং গ্রামীন অভিজাতরা জনসাধারণ থেকে অনেক অংশে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে ।

৮) পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর ক্ষেত্রে ব্যায়ের বোঝা বেড়েছে ফলে সরকার পক্ষ জনসাধারণের উপর বেশি পিরিমানে রাজস্ব কর ধার্য করায় পাকিস্তানের জনসাধারণের মধ্যে অনেক সমস্যা দেখা দিয়েছে ।

৯) ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বরে বাংলাদেশ পাকিস্তানের অত্যাচারের রেহায় পেয়ে আলাদা রাষ্ট্র রুপে প্রতিষ্ঠিত হয় । সেই সঙ্গে ভারতীয় ও পাকিস্তানিদের মধ্যে ট্রাম তৈরী হয়েছিল । ফলে পাকিস্তানের সমরিক বাহিনীর হাত থেকে বাংলাদেশর শাসনের দ্বায়িত্ব হাত ছাড়া হয় ।

১০) ক্ষমতার কোনো মৌলিক পুনর্বন্টন ছিল না নতুন স্লোলগান সহ স্থিতিশীল অবস্থায় ফিরে এসে নতুন আদর্শ ও আমুল সংস্কার। প্রতিষ্ঠা করা ছিলো এক মাত্র লক্ষ্য ।

১১) বিভিন্ন ধরণের কাগজ পত্রের দোহায় দিয়ে বাংলাদেশকে নতি স্বীকার করানোয় হল পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর মূল উদ্দেশ্য ।

আমরা পরিশেষে এই কথা বলতে পারি যে এই ভাবেই একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা রুপ নেয় তার দ্বারা নির্ণয় করা যেতে পারে বিভিন্ন অভিজাতদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া পক্রিয়া সমন্বয় এবং দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে স্বরুপ লক্ষ্য যা তাদের উচ্চ আক্ষার প্রকাশ পায় । তার ফলে দেশের সম্পদ গুলি প্রতিটি গুরুপের কমান্ড সেগুলি ব্যবহার করেন । যা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য সমাজের অভিজাত সম্পর্কের বিশ্লেষণ বোঝানো জন্য একটি গুরুত্বপুর্ণ সূত্র হতে পারে একটা উন্নতশীল দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তনে ।

গ্রন্থপঞ্জী:-

১. চক্রবর্তী সত্যব্রত(সম্পাদনা)রাষ্ট্র সমাজ রাজনীতি, একুশ শতক প্রকাশিনী, কলকাতা ।

২. সেন বানীপ্রসাদ 'সমাজ তত্ত্ব ও রাজনীতি', প্রগতিশীল প্রকাশক,কলকাতা ।

৩. ঘোষ সুরারি 'পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে আমেরিকা ও ভারত' মিত্রম প্রকাশিনী, কলকাতা ।

৪. Alit, 1970: Pakistan: Military Rule or People's power. London: Jonathan Cape, 30 Bedford square.

৫. Callard Keith., 1957: Pakistan: A Political Study. New York: Macmillan Company.

৬. Myrdal G., 1968: Asian Drama: An Inquiry into the Proverty of Nations. Vol-I. New York: Pantheon.

বাংলা নাটকে জাতীয় সংহতি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

সেখ ইদ মহাম্মদ
গবেষক, বাংলা বিভাগ, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে আদিতে ছিল অনার্যের বাস। বৈদিক যুগে আর্যদের আগমনে ঘটে যায় আর্য-অনার্যের সংস্কৃতির সমন্বয়। অতঃপর কালের অমোঘ নিয়মে ত্রয়োদশ শতকের প্রথম হতে বঙ্গে মুসলমানের আধিপত্য শুরু হলে ক্রমে হিন্দু-মুসলমানের সমাজ-সংস্কৃতিতে, ধর্মে ও ভাষায় সংঘটিত হয় সূক্ষ্ম মেলবন্ধন। যেমন আধ্যাত্ম সাধনায় মুসলমান সমাজের ভাসান পর্ব হিন্দু সমাজে গৃহীত হয় বেহুলার ভাসানযাত্রা হিসেবে। এইভাবে উভয় জাতির মধ্যে যে সংস্কৃতির সমন্বয় সাধিত হয়েছে, আলোচ্য কালপর্বের নাটকে মুসলমান জীবন চিত্রণে কি গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছে তা তথ্য সহযোগে বিশ্লেষণ করা হবে এই প্রবন্ধে। সেই সাথে দেখার চেষ্টা করা হবে এই সমন্বয় সাধন কত সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছে সমাজ ও সাহিত্যে এবং মানুষের মনে।
সূচক শব্দ : নাটক, হিন্দু, মুসলমান, জাতীয় সংহতি, সম্প্রীতি।

মূল প্রবন্ধ :
পাশ্চাত্য শিক্ষার পরশ পাথর বাঙালির হৃদয়কে স্পর্শ করে তার অতীত ঐতিহ্যের ভান্ডারকে তার চোখের সামনে এনে দিল। বাঙালির সাহিত্যে এক পরাধীন জাতীর মর্মবেদনা, তার দেশাত্মবোধ প্রস্ফুটিত হতে লাগলো। সাহিত্যের সকল শাখার মধ্যে নাটক যেহেতু জনসাধারণের সর্বাপেক্ষা কাছের শিল্পমাধ্যম, তাই নাটকের মধ্যে ভারতবাসীর নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদ সর্বাপেক্ষা জীবন্তভাবে ধরা পড়েছিল এবং মানুষের কাছে তার আবেদনও সার্থক হয়েছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রথম অভিঘাতে ভারতীয় সমাজের যে সব সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তার প্রভাবে বাংলা মৌলিক নাটকগুলি প্রথমে সামাজিক বিষয়বস্তু নিয়েই রচিত হয়েছিল। সমাজ-সংস্কার-চেতনাই এই নাটকগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল। পরবর্তী পর্যায়ে জাতীয়তাবাদের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে নাটক রচিত হতে থাকে ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে। ভারতের অতীত ইতিহাস নিয়ে গৌরববোধ নাট্যকারদের অনুপ্রাণিত করলো প্রাচীন ইতিহাসের মধ্যে তাঁর নাটকের বিষয় বস্তুর সন্ধান করতে। ভারতবাসীর নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদই এই ঐতিহাসিক নাটক রচনা করতে প্রাণিত করেছিল বাঙালি নাট্যকারদের। আর এ পথে প্রথম পদক্ষেপ করেছিলেন মাইকেল মধুসদূদন দত্ত।

মধুসূদন দত্ত-এর ‘কৃষ্ণকুমারী’ (১৮৬১) বাংলার প্রথম ঐতিহাসিক নাটক। সমালোচকের পরিভাষায়, “টডের রাজস্থানের কাহিনীকে যদি ইতিহাস বলিয়া মনে করা যায়, তবে মধুসূদনই বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন, এই

কথা স্বীকার করিতে হয়। তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকই বাংলা সাহিত্যে এই শ্রেণির সর্বপ্রথম রচনা।"[১] তবে এ নাটকে চিত্রিত মুসলমান চরিত্রের মধ্যে জাতীয় সংহতি বোধ প্রতিফলিত হয়নি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটক' (১৮৭৫) নাটকখানি রাজপুত ইতিহাস অবম্বনে রচিত। টডের রাজস্থানের কাহিনী এই সময়ের লেখকদের বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। রাজপুত বীরত্বের এই উজ্জ্বল অতীতকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মানুষের মনে দেশানুরাগ জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করলেন। শুধু হিন্দু নয়, মুসলমান চরিত্র নির্মাণেও সেই দক্ষতা দেখাতে তিনি কার্পণ্য করেননি। এই নাটকে মুসলমান চরিত্রদের যে হিন্দুবিদ্বেষ বর্ণিত হয়েছে তা যে কতখানি সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি থেকে উদ্ভূত একটু দেখে নেওয়া যেতে পারে।

নাটকের অন্যতম মুসলমান চরিত্র ফতেউল্লার ধর্ম ও জাতিপ্রীতি বিপদে পড়েই সবেগে অন্তর্ধান করেছে। তিনজন রাজপুত রক্ষকের সামনে সে মুহূর্তের মধ্যে আপন অবস্থান পরিবর্তন করেছে - "আল্লার কিরে - মুই মুসলমান নই বাবা মুই হ্যাঁদু, মুই হ্যাঁদু তোমাদের জাতভাই-"[২] চির কালের অভ্যস্থ জীবন যাপনের ধরণ ছেড়ে যে যে বাস্তব অসুবিধা ভোগ করেছে, ভৈরবাচার্যের সঙ্গ তার মানসিকতায় যে পরিবর্তন এনেছে, তাই তার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের মূল কারণ, "এহান হতে বার হতি পাল্লিই মুই বাঁচি। ক্যান মত্তি এহানে তোমার সংগে আয়েছিলাম। চাল-কলা খাতি খাতি মোর জানটা গেল। ও আল্লা। সে দিন কবে হবে আল্লা।"[৩]

ভৈরবাচার্য আপন স্বার্থে এই দরিদ্র সরল কৃষকটিকে বাদশার দরবারে বড় চাকরির লোভ দেখিয়ে হিন্দু বিরোধী কাজ করিয়েছে। না হলে সাধারণ মানুষের কাছে ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বিভেদের যে আসলে তেমন কোনো মূল্য নেই, তার প্রমাণ ফতে উল্লার সংলাপ থেকে উঠে আসে, "..... স্যালামও যা, পেন্নামও তা; কথাডা অ্যাহি তবে কিনা এডা, হ্যাঁদুর কায়দা - ওড়া মুসলমানির কায়দা-"[৪] হিন্দু মুসলমানের কায়দা আলাদা আলাদা হলেও জীবন যাপনের বিষয়গুলি মূলে একই। এই সংলাপ যিনি নির্মাণ করেন, তিনি কখনই কোন সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি চালিত হতে পারে না।

সম্রাট আলাউদ্দিনের দরবারের লোকেদের হিন্দু বিদ্বেষ, মূলত সম্রাটের মন রেখে চলে আপন স্বার্থের কারণে যতটা, ততটা কোনো ধর্মীয় গোঁড়ামি জাত বলে মনে হয় না। অন্তত নাটকে তার কোনো চিহ্ন নেই। বরং সম্রাটের উজিরের কণ্ঠে শোনা গেছে রাজপুত বীরত্বের অতীত কাহিনীর স্মৃতি, যা হিন্দুদের বাহুবলের প্রতি তাঁর অন্তরের কোথাও একটু শ্রদ্ধারও ইঙ্গিত, "বিশেষত ওদের মধ্যে যে বিজয় সিংহ আর রণবীর সিংহ নামে দুইজন প্রধান সেনাপতি আছে, তাদের মধ্যে যদি সে কোন কৌশলে বিবাদ ঘটিয়ে দিতে পারে তাহলে আমরা অনায়াসে চিতোর জয় করে সমর্থ হব। হুজুরের বোধহয় স্মরণ থাকতে পারে যে আমাদের প্রথম বারের আক্রমণে কেবল এই দুই যোদ্ধার বাহুবলেই চিতোর রক্ষা পেয়েছিল।"[৫]

সম্রাট আলাউদ্দিনের হিন্দু বিদ্বেষের পশ্চাতে নাট্যকার দেখিয়েছেন অন্য কারণ, রাণী পদ্মিনীকে লাভ করার বাসনা। কোনো ধর্মীয় গোঁড়ামি থাকলে, তিনি কি কোনো হিন্দু রমণীকে অধিকারের বাসনায় অর্থক্ষয় সৈন্যক্ষয় করতেন? নাটকের শেষে রাজপুত রমণীদের অগ্নিপ্রবেশ দেখে তাঁর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন কোনো সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ নয়। বরং সম্প্রীতিরই প্রমাণ দেয়, "আশ্চর্য! আশ্চর্য! ধন্য হিন্দু মহিলাদের সতীত্ব! এত কষ্ট করে যে জয়লাভ করলেম তা সকলই নিষ্ফল হল। চলো, এখন আর এ শুন্য শ্মশানপুরীতে থেকে কি হবে?"[৬] বুঝতে বাকি থাকে না, কিসের কারণে কোন লোভে সম্রাট এদেশে এসেছিলেন। কোনো রাজ্যলোভে নয়, ধর্মীয় কারণে নয়, রমণীর রূপের আগুনে মুগ্ধ পতঙ্গের মত তাঁর আগমনকে কোন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের সীমায় বেঁধে রাখা উচিত নয়।

রওশেনারার হিন্দু বিদ্বেষের কারণ তো স্পষ্ট। বিজয় সিংহের প্রাণাধিকার নিয়ে সরোজিনীর সঙ্গেই তার সপত্নী সুলভ দ্বন্দ্ব। বিজয় সিংহকে সরোজিনীর প্রতি আকৃষ্ট জেনে, তার ঈর্ষা ক্রমে বিদ্বেষ এবং প্রতিশোধ পরায়নতার রূপ নিয়েছে। সরোজিনীর বলিদান যাতে হয়, সেজন্য তার সক্রিয়তা, সরোজিনী না থাকলে বিজয় সিংহকে পাওয়ার ক্ষীণ আশা থেকে যায়। যে দেশপ্রেম থেকে সম্প্রদায়গত ভেদবুদ্ধি, সঙ্কীর্ণতা, সেই দেশপ্রেম রোশেনারার অন্তত নেই। তার বক্তব্যেই সুস্পষ্ট, "রাজকুমার, এমন কি কেউ থাকতে পারে না যাকে দেশের চেয়েও অধিক......"[৭] বস্তুত রোশেনারার এই প্রেম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক চিত্র।

মোনিয়া যেমন বিধর্মী বিজয় সিংহের প্রতি রোশেনারার প্রেমের আকাঙ্ক্ষাকে মানতে পারেননি। তেমনি অস্বীকার করতে পারেননি হিন্দু কন্যা সরোজিনীর সৌহার্দপূর্ণ আচরণকে। রোশেনারাকে বোঝাতে গিয়ে সে তার অভিজ্ঞতার কথা বলে প্রকারান্তরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিরই দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন, "যে সময় কাঁদবার সময় সে সময় কাঁদলে না, আর এখন কি না সারা দিনই তোমাকে কাঁদতে দেখি; এখন তো বরং যাতে তুমি সুখে থাক, সকলে সেই চেষ্টা কচ্ছে। রাজকুমারী সরোজিনী তোমাকে মনের সঙ্গে ভালোবাসেন, তিনি আপনার বোনের মতন তোমাকে দেখেন, তোমার দুঃখে তিনি কত দুঃখ করেন তোমার থাকবার জন্যে আলাদা বাড়ি করে দিয়েছেন - আর দেখো সখি! রাজকুমারী আমাদের ভালোবাসেন বলে, কেউ আমাদের মুসলমান বলে ঘৃণা করেও সাহস পায় না বরং সকলি আমাদের আদর করে। এখন তো ভাই তোমার দুঃখের কারণই দেখতে পাই না।"[৮] এছাড়াও - ছদ্মবেশী যে ভৈরবাচার্যকে নাট্যকার রাজপুতদের সর্বনাশের মূল কারণ হিসেবে তুলে ধরেছেন, তাঁরও সমস্ত চক্রান্তের মূলে কোনো হিন্দু বিদ্বেষ নেই, আছে আপন কৃতকর্মের জন্য বাদশাহের মার্জনা লাভের বাসনা। স্ত্রী-কন্যা- স্বজন-বান্ধবদের কাছে ফিরে যাবার একান্ত মানবিক কামনা।

স্বদেশের অতীত গৌরব নিয়ে জাতীয় ভাবোদ্দীপক নাটক রচনার ধারায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম প্রথম উচ্চারিত হলেও এই ধারায় প্রথম নাটক রচনা

করেন নাট্যকার হরলাল রায়। তাঁর ‘বঙ্গের সুখাবসান’ (১৮৭৪) নাটকটি বক্তিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয়ের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। মহম্মদ বখতিয়ার খিলজির বঙ্গদেশের সেন রাজাদের রাজধানী নদিয়া বিজয়ের ঐতিহাসিক কাহিনী প্রথম পাওয়া যায় মিনহাজ-উদ-দীন রচিত "তবকাত-ই- নাসিরী’ নামন গ্রন্থ থেকে। মাত্র ১৮ জন অশ্বারোহী সৈন্যসহ বখতিয়ার খিলজির নদীয়া দখল এবং রাজা লক্ষ্মন সেনের কাপুরুষোচিত পলায়নের কাহিনী মধ্যযুগের এক বিতর্কিত বিষয়। মিনহাজ-উদ-দীন রাজা লক্ষ্মণ সেনের প্রচুর সুখ্যাতি করেছেন। তাঁকে আর্যাবর্তের রাজাদের মধ্যে সর্বপ্রধান বলে তাঁর দানশীলতা ও শাসনকার্যকে প্রশংসিত করেছেন। সুলতান কুতুবুদ্দিনের সঙ্গে তাঁকে তুলনা করেছেন। তা সত্ত্বেও লক্ষ্মণ সেন আজও জনমানসে রাজা হিসেবে অদক্ষ, ভীতু, কাপুরুষ রূপে প্রতিভাত। প্রতিরোধে স্বদেশকে বাঁচানোর পরিবর্তে প্রাণের তাগিদে তাঁর পলায়নকে অনেকে সহজ ভাবে মেনে নিতে পারেনি। তবে আলোচ্য নাটকে লক্ষন সেনের সেই কাপুরুষতাকে তুলে ধরা হয়নি। বস্তুত উনিশ শতকে জাতীয়তাবাদ জাগরণের কালে কবি সাহিত্যিকেরা সুপ্তচৈতন্য – দেশবাসীর মনে জাতীয় চেতনা সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন। এই নাটক সম্পর্কে সমালোচকের অভিমত, "বখতিয়ার খিলজি কর্তৃক বঙ্গবিজয় বাংলার ইতিহাসের এক চির কলঙ্কিত অধ্যায়। নাট্যকার সেই অধ্যায়টি অপরিমেয় অশ্রুজলে সিক্ত করিয়া দর্শকের সম্মুখে উদ্ঘাটন করিয়াছেন।..... বৃদ্ধ রাজা লাক্ষ্মণ্য সেন গুরু গোবিন্দ ভট্টাচার্যের আদেশে ও মন্ত্রী মহেন্দ্রের প্ররোচনায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করিয়া বাংলার সর্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহার এই আচরণ ক্ষমার অযোগ্য হইলেও নাট্যকার তাঁহার চিত্তে তীব্র আক্ষেপ ও আত্মগ্লানী সঞ্চার করিয়া তাঁহার প্রতি করুণা আকর্ষণ করিয়াছেন।”[৯] তবে দর্শকদের করুণা বা অশ্রুজল আকর্ষণ করা নাটকটি রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয় না। ‘বাংলার ইতিহাসের এক চির কলঙ্কিত অধ্যায়’-এর কলঙ্ক মোচনেই যেন কলম ধরেছিলেন নাট্যকার।

অবশ্য বঙ্গ বিজয়ের ক্ষেত্রে বখতিয়ার খিলজির দুর্ণাম যাই থাক, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চিত্রও নাট্যকার তাঁর মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করতে ভোলেননি। বখতিয়ার খিলজি স্বয়ং বাঙালি হিন্দু নারীর প্রতি তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধা ও সম্মান জ্ঞাপন করেছেন একাধিকবার। সৌদামিনী যবন সৈন্যের হাত থেকে আপন সতীত্ব আপন তেজে রক্ষার পর তিনি বলেছেন, “যে জাতীর স্ত্রীলোকের এত বীরত্ব তারা বিনা যুদ্ধে রাজত্ব ছেড়ে দিলে। এদের রাজার সেনাপতির কণামাত্র সাহস থাকলে, কে বঙ্গ রাজ্যে শত্রুভাবে প্রবেশ করতে পারতো?”[১০]

একথা সত্য, বঙ্গরাজ্য জয় করলেও কখনও তিনি কোনো স্ত্রীলোকের অসম্মান করেননি। বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি বিধানে নির্মম হলেও বিরাটের মত দেশ প্রেমিকের বীরত্ব ও দেশপ্রেমকে, শ্রদ্ধা ও সম্মান জানিয়ে তাঁর সঙ্গে মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হতে চেয়েছেন। দেশপ্রেমিক বিরাট পর্যন্ত তাঁর মহত্বকে কুর্ণিশ জানিয়েছেন। এসবই

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রমাণ। যতটুকু মুসলমান-বিদ্বেষ এ নাটকে চরিত্রদের সংলাপে প্রকাশ পেয়েছে তা মুসলমানদের বঙ্গবিজয়ের জন্য, পররাজ্য বা স্বাধীনতা হরণের জন্য। নাহলে কোন রকম সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এ নাটকে নেই, যা জাতীয় সংহতি নির্মাণের অন্যতম প্রধান অন্তরায়।

হয়তো হরলালের এই নাটকে তেমন শিল্পমূল্য নেই। দেশকালের সীমা অতিক্রমকারী উৎকৃষ্ট নাটক রচনার প্রতিভা হয়তো তাঁর ছিল না। কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে জেগেছিল নিজেদের অতীতকে জানার আগ্রহ। পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থেকে বিদেশী শাসক জাতির কাছে নিজেদের সভ্যতার গৌরব মহিমা তুলে ধরতে চান তাঁরা। একই সঙ্গে স্বজাতী তথা স্বদেশের মানুষের কাছে সেই অতীত গৌরব চিত্র পৌঁছে দিয়ে তাদের মধ্যে জাগাতে চান স্বজাতি ও স্বদেশের প্রতি মমতা ও ভালোবাসা। সেদিনের সেই সচেতন মানুষের মধ্যে হরলাল রায় একজন। যিনি তাঁর নাটকের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী ভাবধারাকে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে জাগাতে চেয়েছিলেন দেশপ্রেম। তবে ধর্মীয় সম্প্রীতি বোধে যে মুসলমান চরিত্ররা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁদেরকেও তিনি সমাদর করতে ভোলেননি। বখতিয়ার খিলজি তার অন্যতম দৃষ্টান্ত।

ইংরাজদের বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা বাঙালিদের না পেরেছিল বিভক্ত করতে, না দুর্বল করতে। বরং বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ জুড়ে যে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল, যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তার মাধ্যমে বাঙালিরা আরও বেশি ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। তবে এই ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ যুগের পটভূমিতেই রচিত হয় গিরিশ ঘোষের ঐতিহাসিক নাটক 'সিরাজদ্দৌলা' (১৯০৫)। বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়ায় দেশব্যাপী আন্দোলনে বাঙালির যে দেশপ্রীতি, জাতীয়তাবোধ, একতার ভাব, স্বাধীনতা স্পৃহা প্রকাশ পেয়েছিল, সাহিত্যে তার প্রতিফলন দেখা গেল বিশেষ করে ঐতিহাসিক নাটকে। 'সিরাজদ্দৌলা' তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, পুত্রহীন নবাব আলিবর্দি খানের তিন কন্যার সঙ্গে তাঁর তিন ভ্রাতুষ্পুত্র ঢাকা, পুর্ণিয়া আর পাটনার শাসকদের বিবাহ হয়। এই তিন জনের মৃত্যু ঘটে আলিবর্দির জীবিতকালে। তাঁর বড় মেয়ে, অপুত্রক ঘসেটি বেগম এরপর প্রচুর ধনসম্পত্তি নিয়ে মুর্শিদাবাদে আসেন। এবং মতিঝিল নামে বিরাট প্রাসাদ নির্মাণ করে বাস করতে থাকেন। মেজ মেয়ের পুত্র শওকতজঙ্গ পুর্ণিয়ার শাসনভার উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেন। ছোট মেয়ে আমিনার পুত্রই সিরাজদ্দৌলা। যিনি মুর্শিদাবাদে আলিবর্দির প্রশ্রয়ে ও আদরে বড় হয়ে ওঠেন। আলিবর্দি তাঁকে নিজের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্বাচন করে গেলে ক্ষমতা লোভী ঘসেটি বেগম বিষয়টি মেনে নিতে না পেরে চক্রান্ত শুরু করেন, ইতিহাসের এ ঘটনা সর্বজন বিদিত।

ইতিহাসের এই ঘটনা মোটামুটি বিশ্বস্ত ভাবেই গিরিশচন্দ্র অনুসরণ করেছেন। সমালোচকের মতে এই নাটকের, "কোনো ঘটনাই অনৈতিহাসিক নহে। তবে

প্রজাবৎসল, বাঙলা-প্রাণ এবং ফিরিঙ্গি-দ্বেষী সিরাজ বেশি একটু আদর্শায়িত।"[১১] সমকালীন জাতীয় ভাবাবেগের ফসল গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা' নাটক। এ নাটকের নায়ক সিরাজদ্দৌলা যুগান্তরের আড়াল থেকে জাতির এক বিশেষ সংকটের দিনে নবযুগের প্রতিনিধি হয়ে দাঁড়িয়েছেন। এই নাটকেই শোনা যায়, জাতীয় সংহতির মূল মন্ত্রগুলি, পাওয়া যায় সুসংহত জাতিকে নেতৃত্বদানকারী সুযোগ্য জাতীয় অধিনায়ককে। জাতীয় সংহতির মূল মন্ত্রগুলি হল- ব্যক্তিস্বার্থ দূর করা, দেশপ্রেম, প্রেম তথা ভক্তির আদর্শ প্রচার। নায়ক সিরাজের মধ্যে এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলিই বিদ্যমান ছিল।

ইংরাজদের নিকট ভারতবাসীর পরাজয়ের মূল কারণ ছিল, নিজেদের মধ্যে লড়াই আর পারস্পরিক বিশ্বাসঘাতকতা। ঈর্ষা, স্বার্থপরতা, লোভ, পরশ্রীকাতরতা ভারতবর্ষের মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। এই বিচ্ছিন্নতা দূর করে ঐক্যবদ্ধ জাতি, জাতীয় সংহতি গড়ে না তুললে ইংরাজদের মত প্রবল প্রতিপক্ষের কাছ থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনা সম্ভব ছিল না। উনিশ শতকের সচেতন সাহিত্যিকেরা তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে সেই জাতীয় সংহতি সৃষ্টির প্রয়াস করেছিলেন। গিরিশচন্দ্র তাঁর এই নাটকে বাঙালি তথা ভারতবাসীর চরিত্র তুলে ধরে একদিকে দর্পনে প্রতিবিম্ব আপন প্রকৃত রূপ দর্শনে তাদের আত্ম শোধনের সুযোগ দিয়েছিলেন। সিরাজের সংলাপে সেই প্রতিবিম্ব বিম্বিত হয়েছে, "যদি কখনো সুদিন হয়, যদি কখনো জন্মভূমির অনুরাগে হিন্দু-মুসলমান ধর্ম-বিদ্বেষ পরিত্যাগ করে, পরস্পরের মঙ্গল সাধনে প্রবৃত্ত হয়, উচ্চ স্বার্থে চালিত হয়ে সাধারণের মঙ্গল যদি আপন মঙ্গলের সহিত বিজড়িত জ্ঞান করে, যদি ঈর্ষা, বিদ্বেষ, নীচ প্রবৃত্তি দলিত করে স্বদেশ বাসীর অপমানে আপনার অপমান জ্ঞান করে, যদি সাধারণ শত্রুর প্রতি একতায় খড়াহস্ত হয়, এই ফিরিঙ্গি দমন তখন সম্ভব; নচেৎ অভাগিনী বঙ্গ মাতার পরাধীনতা অনিবার্য! মীরমদন। আক্ষেপ ত্যাগ করো। জেনো বাঙ্গালায় সকলেই মীরমদন নয়।"[১২]

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ছাড়া জাতীয় সংহতি গড়ে উঠতে পারে না। আলোচ্য নাটকের নায়ক সিরাজ স্বয়ং অসাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্নই শুধু নন, তিনি চেয়েছেন হিন্দু মুসলমান এক জাতি এক প্রাণ হয়ে দেশের শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াক। সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলকে আহবান জানিয়ে তিনি বলেছেন,—

"ওরে হিন্দু মুসলমান -
এস করি পরস্পর মার্জনা এখন;
বঙ্গের সন্তান হিন্দু মুসলমান,
বাঙালার সাধহ কল্যাণ,
তোমা সবাকার যাহে বংশধরগণ -
নাহি হয় ফিরিঙ্গি নফর।
শত্রু জ্ঞানে ফিরিঙ্গিরে কর পরিহার;
বিদেশি ফিরিঙ্গি কভু নহে আপনার,

স্বার্থপর চাহে মাত্র রাজ্য হাহাকার।"[১৩]

তাঁর এই উক্তি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিরই পরিচায়ক। এ শুধু তাঁর মুখের কথা ছিল না, কার্য ক্ষেত্রেও দেখা যায়, মুসলমান কর্মচারীদের সরিয়ে তিনি মোহনলাল মীরমদনকে উচ্চ পদ দান করেছেন এবং তাঁদের উপর বিশ্বাস রেখেছিলেন। এমনকি মীরমদনকে 'ভাই' বলে বুকে টেনে নিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে আত্মীয় বিয়োগ ব্যথা অনুভব করে বিলাপে কাতর হয়েছেন। অন্যদিকে মীরমদন ও মোহনলাল আমৃত্যু তাঁর বিশ্বাসের মর্যাদা রেখেছেন। যে করিম চাচা সিরাজের সঙ্গে শেষ মুহূর্তে বেশ বদল করে আপন প্রাণকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে নবাবের প্রাণ বাঁচাতে চেয়েছেন, তিনিও আসলে হিন্দু। এ সবই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিচায়ক। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়কে বিচ্ছিন্ন করতে ইংরাজদের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে এ নাটকে এভাবেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চিত্র দেখিয়ে নাট্যকার ধর্ম নিরপেক্ষ ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠনেরই চেষ্টা করেছেন।

গিরিশচন্দ্র তাঁর 'মীরকাশিম' (১৯০৬) নাটকের ভূমিকায় জানিয়েছেন, 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের সাফল্যে উৎসাহিত হয়েই তিনি 'মীরকাশিম' নাটক রচনা করেছিলেন, "সিরাজদ্দৌলা নাটক, সাধারণের প্রীতিকর হওয়ায়, আবার ঐতিহাসিক মীরকাশিম, ঐতিহাসিক পটে চিত্রিত করিবার সাহস পাইয়াছি।"[১৪] অনেক সমালোচকও মনে করেছেন সমকালীন জাতীয় ভাবাবেগের দিকে লক্ষ্য রেখে মঞ্চসাফল্য সৃষ্টির জন্য এ নাটক রচনা করেছিলেন। তিনি। "সিরাজদ্দৌলা নাটকের মতই তৎকালীন জাতীয় ভাবাবেগকে মূলধন করে মঞ্চসাফল্য সৃষ্টির দিকে লক্ষ্য রেখেই মীরকাশিম নাটকটিও রচিত হয়েছিল।"[১৫]

মীরকাশিম নাটকে জাতীয় সংহতি সৃষ্টিতে নাট্যকারের প্রধান অবলম্বন নাটকের নায়ক চরিত্র। মীরকাশিমকে নাট্যকার তাঁর যথার্থ স্বরূপে চিত্রিত না করে উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করেছেন এমন অভিযোগের উত্তর গিরিশচন্দ্র লিখেছেন, "কিন্তু মীরকাসিম যে স্বদেশানুরাগী, প্রজাবৎসল, দীনপালক, ন্যায়বান, মিতব্যয়ী, রাজনীতিজ্ঞ ও কার্যকুশল নবাব ছিলেন তাহা কেহ, মীরকাশিমের ছিদ্রানুসন্ধানী কোন গ্রন্থকারের ইতিহাসের দ্বারাও অপ্রমাণ করিতে সমর্থ হইবেন না।"[১৬] নাটকে মীরকাশিমের এই সব গুনাবলীর চিত্রণ পরিলক্ষিত হয়। মীরকাশিম নাটকের অন্যতম দেশপ্রেমিক চরিত্র। জাতীয়তাবাদ প্রচারের বাহন রূপে নাট্যকার এই চরিত্রের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, "তুমিই বঙ্গমাতার সুসন্তান, তুমিই দুঃখিনী জন্মভূমিকে উদ্ধার করতে সক্ষম। দুঃখিনী বঙ্গমাতা তোমার মুখ চেয়ে আছে।"[১৭] দেশের দুর্দিনে বৃহত্তর ও মহত্তর দায়িত্ব পালনের জন্য ঘুষ দিয়ে মসনদ লাভের মতো হীন উপায় অবলম্বনও তুচ্ছ হয়ে যায়। মীরকাশিম চরিত্রের কলঙ্ক মুছে যায় তাঁর উদ্দেশ্যের সাধুতায়। উল্লেখ্য, নাট্যকার বর্ণনা করেছেন, মীরকাশিম ঘুষ দিয়ে ইংরেজদের নিকট হতে মসনদের দখল নিয়েছিলেন। এর পিছনে যে মহৎ কারণ ছিল সে বিষয়ে সজাগ থাকা আবশ্যক। তাঁর পূর্বতন অপদার্থ, অকর্মণ্য নবাব

মীরজাফরকে মসনদ থেকে সরাতে এছাড়া মীরকাশিমের সামনে অন্য কোন পথ ছিল না।

জাতীয় সংহতি গঠনে নাট্যকার আরও একটি চরিত্রকে বিশেষভাবে ব্যবহার করেছেন, সে হল তারা। 'সিরাদ্দৌলা' নাটকের জহরার মত তার গতি সর্বত্র। পার্থক্য অবশ্য অনেক বড়। জহরা তার স্বামী হত্যার প্রতিশোধ নিতে চারিদিকে আগুন জ্বালিয়েছে। আর তারা দীন দরিদ্র প্রজাদের দুঃখে কাতর হয়ে, জন্মভূমির দুর্দশায় পীড়িত হয়ে সর্বত্র তার প্রতিকার খুঁজে বেড়িয়েছে। কখনো মীরকাশিমকে বাংলার নবাবি গ্রহণে উৎসাহিত করে, কখনো তকী খাঁকে বীরত্বে উদ্দীপ্ত করে, কখনো ষড়যন্ত্রীদের সাবধান করে, কখনো ইংরাজদের মনুষ্যত্ব জাগ্রত করার চেষ্টা করে সে উদ্দেশ্য পুরণ করতে চেয়েছে। এই চরিত্রের মধ্যে দিয়ে নাট্যকার প্রচার করতে চেয়েছেন, দেশপ্রেম। তুলে ধরেছেন পরাধীনতার যন্ত্রণা। ইংরাজ রাজত্বে ভারতবাসীর বর্তমান ও ভবিষ্যতের দুর্দশার চিত্র এবং দেশবাসীর প্রকৃত চরিত্র। নির্জীব বঙ্গবাসীকে উদ্দীপ্ত করতে, একতার বাঁধনে বাঁধতে তারা সর্বত্র ভ্রাম্যমান।

হয়তো হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতির চিত্র এ নাটকে সেভাবে দেখা যায়নি, তবে সাম্প্রদায়িক বিভেদের চিত্রও নাট্যকার দেখাননি। বিশ্বাসঘাতক যেমন উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আছে, তেমনি বিশ্বস্ত সৈনিকও উভয় সম্প্রদায়ে বর্তমান। মীরকাশিম তাঁর হিন্দু মুসলমান প্রজাদের কোন বিভেদ করেননি, আলাদা চোখে দেখেননি। তারার সংলাপে নাট্যকার শুনিয়েছেন, মীরকাসিমের রাজত্বে হিন্দুরা উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য রাজবল্লভ জানিয়েছেন, মীরকাশিম হিন্দুদের পদচ্যুত করে মুসলমানদের রাজকার্য দিয়েছেন। কিন্তু সে বিদ্বেষের কারণ হিসেবে তারা হিন্দুদের দায়ী করেছেন। বিদেশীর আনুগত্য, হিন্দু-মুসলমানে ভেদ, ষড়যন্ত্র যে হিন্দুরাই করছে - এই সত্যও তারার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন নাট্যকার। সেই সঙ্গে নাটকে ছায়া ফেলেছে নাট্যকারের সমকাল। সেও তারারই সংলাপে 'বিদেশী ভেদমন্ত্রে হিন্দু-মুসলমানে প্রভেদ – উঠে আসে এখানে বঙ্গভঙ্গের সমকাল।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অশ্রুমতী' নাটকের কাহিনী দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটক 'রাণা প্রতাপ সিংহ - এর (১৯০৫) বিষয়। কাজেই এ সম্পর্কে বিস্তারিত কাহিনী বর্ণনাদান নিষ্প্রয়োজন। এক্ষেত্রে জাতীয় সংহতি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি মুসলমান চরিত্রগুলির মধ্যে দিয়ে কেমন আত্মপ্রকাশ করেছে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা যেতে পারে। গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের একটা পার্থক্য চোখে পড়ার মত। জাতীয় চেতনা জাগরণের যে সময় এই ধরণের নাটকগুলি রচিত হয়েছিল, সেই সময় জাতীয় সংহতির জন্য প্রয়োজন ছিল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির। বিশেষ করে হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ সৃষ্টির জন্য ব্রিটিশ শাসকের কূটনীতির ফলস্বরূপ এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দূরত্ব কমানোর জন্য দ্বিজেন্দ্র পূর্ববর্তী নাটকে হিন্দু- মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতির চিত্র বার বার তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকেও এই সাম্প্রদায়িক

সম্প্রীতিকে আমরা দেখি, শক্তি সিংহের পত্নী রূপে দৌলৎউন্নিসার উপস্থিতি। রাণা প্রতাপ সিংহের পুত্র অমর সিংহের মেহেরুন্নেসার প্রতি আকর্ষণ। আকবর পুত্র সেলিমের সঙ্গে রাজপুত কন্যা রেবার বিবাহের আয়োজন। প্রতাপ কন্যা ইরা ও আকবর কন্যা মেহেরুন্নেসার মধ্যে সুগভীর আন্তরিক ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব। প্রতাপের বীরত্ব ও মহত্বে সেলিম বা আকবরের মুগ্ধতা ইত্যাদি চিত্রে। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি আরও ভেবেছেন, এই সব সম্প্রদায়গত বিভেদ ভাবনার উর্দ্ধে এক উদারতর মানব-ধর্মের কথা।

রাণা প্রতাপ সিংহ নাটকে নাট্যকারের এই ভাবনার বাহন হিসেবে এসেছে ইরা ও মেহেরুন্নেসা চরিত্র দুটি। একদিকে প্রতাপের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে ইরাকে বলতে শোনা যায়, "আর যুদ্ধ কেন? মানুষের সাধ্য যা, তা করেছ? সম্রাট মনুষ্যত্ব খুইয়ে যদি চিতোর নিয়ে সুখী হন, হোন। কি হবে কাটাকাটি মারামারি করে সব? ছেড়ে দাও, আকবর চিতোর চান, নেন। তার সঙ্গে আরও কিছু তোমার থাকে, দিয়ে দাও! নেন, তিনি সব নেন! ক'দিনের জন্য বাবা!"[১৮] অন্য দিকে মেহেরুন্নেসা তার পিতাকে বলেছেন, "ধর্ম্মে একা ঈশ্বর এক! নীতি এক! মানুষ স্বার্থপরতায়, অহঙ্কারে, লালসায়, বিদ্বেষে, তাকে বিকৃত করেছে। ধর্ম্ম। আকাশের জ্যোতিষ্কমন্ডলীর দিকে চেয়ে দেখুন সম্রাট, দিগন্ত প্রসারিত সমুদ্রের দিকে চেয়ে দেখুন পিতা, সুপ্রসন্না শ্যামলা ধরিত্রীর দিকে চেয়ে দেখুন মহারাজ! - সেই এক নাম লেখা; সে নাম ঈশ্বর। মানুষ তাকে পরব্রহ্ম, আল্লা, জিহোবা, এইসব ভিন্ন নাম দিয়ে পরস্পরকে অবজ্ঞা কচ্ছে। মানুষ এক; পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন মানুষ জন্মেছে বলে তারা ভিন্ন নয়।"[১৯] এইসব উক্তিতে আছে সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা; হিন্দু-মুসলমান মিলনের কথা শুধু নয়, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মিলনের কথা। এই মহামিলনের বাণী বাংলা ঐতিহাসিক নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ই প্রথম এমন উচ্চকণ্ঠে শোনালেন।

'রাণা প্রতাপ সিংহ' নাটকে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির যে চিত্র আমরা দেখেছি, দ্বিজেন্দ্রলালের পরবর্তী ঐতিহাসিক নাটক 'দুর্গাদাস' নাটকেও তার উজ্জ্বল উপস্থিতি। ঔরঙ্গজেবের পৌত্রী ও আকবরের কন্যা রাজিয়ার সঙ্গে মারবাড়রাজ যশোবন্তের পুত্র অজিত সিংহের প্রেম, দুর্গাদাসের প্রতি গুলনেয়ার বেগমের প্রণয়াকর্ষণ, বিশ্বস্ততা ও প্রভুভক্তিতে উজ্জ্বল কাশিমের চরিত্র, দিলির খাঁ ও আকবরের উদারতা ইত্যাদি চিত্র তারই প্রমাণ। ঔরঙ্গজেবকে যেমন ধর্মান্ধ রূপে নাট্যকার দেখিয়েছেন, তেমনি হিন্দু দয়াল সাহার কাজীদের শত্রুমুন্ডন, কোরাণ কূপে ফেলে দেওয়া, মসজিদ ধ্বংস করার কথাও শুনিয়েছেন দিলির খাঁর সংলাপে। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কথা একাধিকবার তিনি এনেছেন এই মুসলমান দিলির খাঁর কণ্ঠেই, "তারা এ জিনিষটা জানতো না। সম্রাট পথ দেখিয়েছেন। সম্রাট হিন্দুর বেদ অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করেন নি? ব্রাহ্মণকে ধরে কলমা পড়ান নি? দেবমন্দির বিচূর্ণ করেন নি? জনাব! কথা শুনুন! হিন্দু বিদ্বেষ পরিত্যাগ করুন, জিজিয়া কর রদ করুন। হিন্দু মুসলমান এক হোক।"[২০]

হিন্দু-মুসলমান এক হলে, বিভিন্ন জাতি-বর্ণ-ধর্মের মানুষেরা মিলিত হলে, ইংরাজরা যে আর ভারতবর্ষকে নিজেদের অধীনে রাখতে পারবে না। সেই বার্তাই সমকালের মানুষকে দিতে চেয়েছেন, “হিন্দু-মুসলমান একবার জাতিদ্বেষ ভুলে, পরস্পরকে ভাই বলে আলিঙ্গন করুক সম্রাট। সেদিন হিমালয় হতে কুমারিকা পর্যন্ত এমন এক সাম্রাজ্য স্থাপিত হবে, যা সংসারে কেউ কখনো দেখে নাই।”[২১] অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিই পারে ঐক্যবদ্ধ জাতি গড়ে তুলতে, যে একতার শক্তিতে গড়ে ওঠে পরাধীনতামুক্ত দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

তথ্যসূত্র :

১. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খন্ড, এ. মুখার্জী এন্ড কোং প্রা. লি., কলকাতা, ১৯৭৫, পৃঃ ২৫৫
২. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যসংগ্রহ, পৃঃ ১৬০
৩. ঐ, পৃঃ ১১৫
৪. ঐ, পৃঃ ১৯৮
৫. ঐ, পৃঃ ১৪১
৬. ঐ, পৃঃ ২২৭
৭. ঐ, পৃঃ ১৫৬
৮. ঐ, পৃঃ ১৪৫
৯. অজিত কুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৭০, পঞ্চম সং, পৃঃ ১৬৬
১০. হরলাল রায়, বঙ্গের সুখাবসান, দ্বিতীয় অঙ্ক, চতুর্থ গর্ভাঙ্ক, পৃঃ ২০২
১১. গিরিশ রচনাবলী, প্রথম খন্ড, চতুর্থ অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ২০০২, পৃঃ ৬০৮
১২. গিরিশ রচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড, দ্বিতীয় অঙ্ক, ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ২০০২, পৃঃ ৫৮৯
১৩. গিরিশ রচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড, প্রথম অঙ্ক, পঞ্চম গর্ভাঙ্ক, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ২০০২, পৃঃ ৫৬২
১৪. গিরিশ রচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ২০০২, পৃঃ ২৮১
১৫. প্রভাত কুমার গোস্বামী, দেশাত্মবোধক ও ঐতিহাসিক বাংলা নাটক, পুস্তক বিপণি, কলিকাতা, ১৩৮৫, পৃঃ ১৬৪-৬৫
১৬. গিরিশ রচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ২০০২, পৃঃ ২৮২
১৭. গিরিশ রচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড, প্রথম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ২০০২, পৃঃ ২৮৫

১৮. দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী, রাণা প্রতাপ সিংহ, প্রথম খন্ড, তৃতীয় অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য, পৃঃ ১৪৭

১৯. ঐ, প্রথম খন্ড, তৃতীয় অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য, পৃঃ ১৪৪

২০. দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী, দুর্গাদাস, প্রথম খন্ড, তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য, পৃঃ ২০৪

কাব্যতত্ত্বে যতীন্দ্রনাথ : কবিতায় দ্যুতি ও দীপ্তি

শম্ভুনাথ কর্মকার
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
বিশ্বভারতী

সারসংক্ষেপ : রবীন্দ্র-ঐতিহ্যে নিমগ্ন না থেকে আত্মপ্রকাশের সাধনায় প্রথম থেকেই তন্নিষ্ঠ ছিলেন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। নজরুল, মোহিতলালের পাশাপাশি রবীন্দ্রেতর কবি হিসাবে তাঁর পরিচিতি বিশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকের কবিদের কাছে আধুনিকতার ভাববাহী। কবিতা রচনায় তিনি যেমন প্রাতিস্বিকতার পরিচায়ক, কাব্যতত্ত্ব আলোচনায় তেমনই ভিন্নধর্মী রসভাষ্যের স্রষ্টা। কবি ও পাঠকের আন্তঃসম্পর্কের মূল্যায়নে তিনি প্রাজ্ঞ সমালোচক। ভাবসম্পাদনের দার্শনিক অভিব্যক্তি এবং সাধারণীকরণের স্তরগুলিকে বুঝবার জন্য তাঁর কাব্যতত্ত্ব সম্বন্ধীয় 'কাব্য-পরিমিতি' নামক গ্রন্থটি অবশ্যপাঠ্য। হৃদয়গত ভাব এবং বুদ্ধিগত রম্যার্থের আশ্রয়ে তাঁর কবিতাগুলি দ্যুতি ও দীপ্তির নিলয়। আমাদের আলোচনায় সেই ব্যঞ্জনাঋদ্ধ কাব্যপ্রকাশ ক্রমান্বয়ে প্রতিভাসিত।
সূচকশব্দ : অলংকার, ব্যঞ্জনা, রস, কল্পনা, পাঠকৃতি।

রবীন্দ্রানুসরণের যুগে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত স্বতন্ত্র কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন। কবিতা লেখার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর স্বচ্ছ ধারণা গড়ে উঠেছিল যা নিয়ে তিনি বিস্তৃত আলোচনাও করেছেন 'কাব্য-পরিমিতি' (১৯৩১) গ্রন্থে। ১৩৩৩ সালে 'সবুজ পত্র'-এ অতুলচন্দ্র গুপ্তের 'কাব্যজিজ্ঞাসা' নামে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল; পরে ১৯২৮ সালে 'কাব্যজিজ্ঞাসা' নামেই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত সেই প্রবন্ধগুলি যতীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন নিশ্চয়, কিন্তু তার প্রত্যক্ষ প্রভাব 'কাব্য-পরিমিতি'র জন্ম দেয়নি বলেই আমাদের বিশ্বাস। অতুলচন্দ্রের আগে সুশীলকুমার দে'র 'Studies in the History of Sanskrit Poetics' (Two parts, 1923, 1925) গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু তা শুধু সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব-চর্চার ধারাবাহিক ইতিহাস। কাব্যের অন্তর্গত বিষয়, কাব্যের উপাদান, কাব্যজগৎ-নির্মাণের কৌশল সম্বন্ধে কোন আলোচনা সেখানে নেই। সেই আলোচনা বাংলায় প্রথম করলেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত। এবং তা করতে গিয়ে কিছু ভুল ব্যাখ্যাও করলেন যা পরে সংশোধিত হয়নি কখনও; যদিও সংশোধনের সুযোগ এবং সময় ছিল যথেষ্ট।

বামনের 'কাব্যং গ্রাহ্যম্ অলঙ্কারাৎ' (১/১/১, 'কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি') সূত্রের ব্যাখ্যায় অতুলচন্দ্র অনুপ্রাস, উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি শব্দালংকার এবং অর্থালংকারকেই কাব্যসৌন্দর্যের হেতুরূপে গণ্য করে লিখেছেন, "কাব্য যে মানুষের

উপাদেয়, সে এই অলংকারের জন্য। কাব্যং গ্রাহ্যমলংকারাৎ। এ মতকে বালকোচিত ব'লে উড়িয়ে দেওয়া কিছু নয়। এই মত থেকেই কাব্যজিজ্ঞাসা শাস্ত্রের নাম হয়েছে অলংকারশাস্ত্র।”[১] কিন্তু কাব্যসৌন্দর্য তো অনির্বচনীয়; অনুপ্রাস, যমক, উপমা, রূপক প্রভৃতি অলংকারগুলি তার উদ্ভাসে এবং উপলব্ধিতে সহায়ক মাত্র। ঠিক সেই কারণে ‘কাব্যজিজ্ঞাসাশাস্ত্রে'র নাম ‘অলংকারশাস্ত্র' হয়নি। বামন পরবর্তী সূত্রেই তা স্পষ্ট করেছেন, ‘সৌন্দর্য্যম্ অলঙ্কারঃ' (১/১/২, ‘কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি')। শ্যামপদ চক্রবর্তী এর যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা করেছেন—“‘কাব্যং গ্রাহ্যম্ অলঙ্কারাৎ'-এর অলঙ্কার Beauty এবং উপমাদি হ'ল অন্যতম Beautifying Instrument (“করণব্যুৎপত্ত্যা"—বামন)।... অনুপ্রাস উপমা রূপক ইত্যাদির আলোচনা থাকার জন্যই “কাব্যজিজ্ঞাসা শাস্ত্রের নাম অলঙ্কারশাস্ত্র" হয় নাই। সাধারণভাবে সর্ব্বাঙ্গীণ সৌন্দর্য্যের অর্থাৎ ভাববাচ্যে নিষ্পন্ন অলঙ্কারের তত্ত্বকথা আলোচিত হওয়ায় কাব্যজিজ্ঞাসাশাস্ত্রের নাম হয়েছে অলঙ্কারশাস্ত্র।"[২] এককথায় অলঙ্কারশাস্ত্র বা কাব্যতত্ত্ব কাব্যের অন্তরঙ্গ বিষয়। কবি যতীন্দ্রনাথ সেই অন্তরঙ্গ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে কাব্যরস আস্বাদনের অনুকূল অবস্থানে দুটি পৃথক ধারার কথা বলেছেন—একটি কবিচিত্তধারা, অপরটি পাঠকচিত্তধারা। বস্তুজগৎ থেকে উপাদান সংগ্রহ করে কবি ‘আপন মনের মাধুরী' মিশিয়ে কবিতা রচনা করেন। এবং কবিতা রচনা সম্ভব হয় ‘অপূর্ববস্তু-নির্মাণ-ক্ষমা প্রজ্ঞা'র বলে। কল্পনার কোমল স্পর্শও থাকে তাতে; যে-কল্পনাদেবীকে স্মরণ করে ‘মেঘনাদবধ কাব্য'-এর প্রথম সর্গে লিখেছিলেন,

তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।[৩]

আর লিখেছিলেন ‘চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র আটত্রিশ সংখ্যক সনেট—‘কল্পনা'। যতীন্দ্রনাথ কল্পনার সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন—“কোন্ মন্ত্রে এমন অসম্ভব সম্ভব হয় যে রামসীতা বিরহের অসহ দুঃখ হইতে আমরা আনন্দ লাভ করিতে পারি; অপরের শোক হইতে আনন্দ পাইবার অভিলাষে রঙ্গালয়ে ছুটিয়া যাই? কবিচিত্ত যে উপায়ে এই অসাধ্যসাধন করে তাহাকে আমরা ‘কল্পনা' বলি।"[৪] যতীন্দ্রনাথের কবিতায় এই কল্পনার স্থান কতটুকু—এবার তা আমরা বিশ্লেষণ করে দেখব।

যতীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের দুটি পর্ব। প্রথম পর্ব ‘মরীচিকা' (১৯২৩), ‘মরুশিখা' (১৯২৭) ও ‘মরুমায়া' (১৯৩০)—এই তিনটি কাব্যগ্রন্থ নিয়ে। এবং দ্বিতীয় পর্ব ‘সায়ম্' (১৯৪১), ‘ত্রিযামা' (১৯৪৮), ও ‘নিশান্তিকা' (১৯৫৭)—এই তিনটি কাব্যগ্রন্থ নিয়ে। প্রথম পর্বে শাণিত বাচনভঙ্গির প্রাধান্য, কাটাছাঁটা সোজা কথা বলবার অভিপ্রায় থেকেই যেন কবিতা লেখার সূত্রপাত। দ্বিতীয় পর্বে গভীর জীবনানুরাগের আকুতি, ঈশ্বর, প্রেম এবং সর্বোপরি রবীন্দ্রপ্রীতি, আশ্রয়ের অনুসন্ধানে ক্লান্ত পান্থের শেষের কবিতা রচনার

প্রয়াস। দ্বিতীয় পর্বের আরেকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য; সেটি হলো আধ্যাত্মিক নিঃসঙ্গতার চূড়ান্ত অভিমান। যদিও প্রথম পর্বের কাব্যগুণেই যতীন্দ্রনাথ স্বতন্ত্র এবং লোকপ্রিয় কবি হয়ে উঠেছেন। তার থেকেও বড় কথা এই দুটি পর্বে কবিতার তত্ত্বগত পরবর্তন ঘটেছে আমূল। সে-পরিবর্তন কবিতার প্রকৃতিভেদে দীপ্তি ও দ্যুতিকেন্দ্রিক। 'কাব্যালোক' গ্রন্থে সুধীরকুমার দাশগুপ্ত এদুয়ের সংজ্ঞা দিয়েছেন—"কাব্যের এই দুই জাতির নাম রসকাব্য ও রম্যবোধকাব্য না রাখিয়া চিত্তের দুই বিশিষ্ট গুণানুযায়ী দ্রুতিকাব্য ও দীপ্তিকাব্য রাখা সঙ্গত বোধ করি; ইহাতে কাব্যের ভেদ ও তাহার কারণ নিঃশংশয়ে স্পষ্ট হইয়া উঠে। দ্রুতিময় কাব্য দেয় চিত্তে আস্বাদন, অবলম্বন তার হৃদয়-গত ভাব; দীপ্তিময় কাব্য দেয় চিত্তে রম্যবোধ, অবলম্বন তার বুদ্ধি-গত রম্যার্থ।"[৫] এবার আসি কল্পনা প্রসঙ্গে। প্রথম পর্বের কবিতায় যতীন্দ্রনাথ কল্পনাপ্রধান বা ভাববাদী কবিদের ব্যঙ্গবিদ্ধ করেছেন; এবং কল্পনাকে নিয়ে মস্করা করতেও ছাড়েননি।

ওগো কল্পনা, সাথে-সাথে চল—হালকা তোমার পাখা,
কানে-কানে তারে বলে দাও, ও রে! সামনে সকলি ফাঁকা![৬]

কিংবা একঘেয়ে বিনোদনের রংবাহারে যখন ঝুলতে থাকে ক্লান্ত মুখোশ—

কল্পনা তুমি শ্রান্ত হয়েছ, ঘন বহে দেখি শ্বাস,
বারমাস খেটে লক্ষ কবির একঘেয়ে ফরমাস!
সেই উপবন, মলয় পবন, সেই ফুলে-ফুলে অলি,
প্রণয়ের বাঁশি, বিরহের ফাঁসি, হাসা-কাঁদা গলাগলি![৭]

আবার প্রথম পর্বেই এমন কিছু কবিতা আছে, যেখানে কবি নিজেই কল্পনায় ভর করে মানবজীবনের যন্ত্রণাকাতর, আরক্তস্পন্দন অসহায়ত্বের 'ইঙ্গিত' দিয়েছেন। 'ইঙ্গিত' শব্দটি কাব্যতত্ত্ব আলোচনায় ব্যঞ্জনামূলক, দ্যোতনাময়। যতীন্দ্রনাথ প্রদত্ত ব্যঞ্জনার সংজ্ঞা—"কোনো কাব্যে বাক্যার্থকে ছাড়িয়া যে অর্থান্তরের ইঙ্গিত ফুটিয়া উঠে তাহাই সে কাব্যের ব্যঞ্জনা।"[৮] যতীন্দ্রনাথ যখন কোনো কবিতায় সচেতনভাবে অলংকার প্রয়োগ করেছেন তখন এই ইঙ্গিত-নৈপুণ্য আরো বেশি প্রত্যয়নিষ্ঠ এবং নান্দনিক হয়ে উঠেছে। রূপকের আধারে উচ্ছলিত রূঢ় সত্য শোক ভাবের জন্ম দিয়েছে,

অভাবের লাখো ফুটো বাক্যের ফাঁস বুনে
মামুলি প্রেমের নেট্-মশারিটা টাঙিয়ে নে।
তার মাঝে শুয়ে বল মশারির নেই আদি—
অনন্ত, অমধ্য, অভেদ্য ইত্যাদি।[৯]

লোকসানের ব্যবসায় হাত দিয়ে 'রাতের খাতায়' শেষ পর্যন্ত দুঃখের জের টানতে হয় নিজেকেই; কারণ 'দেনা শোধবার ভার' বয়ে নিয়ে বেড়াতে হয় সারাজীবন। কিন্তু 'জীবনখাতার প্রতি পাতায়' হিসাব-নিকাশ যতই লেখা হোক বা মনে থাক তা আসলে ভ্রান্তিবিলাস ছাড়া কিছুই নয়, শেষ পর্যন্ত 'কিছুই রবেনা'। 'দুখবাদী' কবিতায় আমরা পেলাম এক নগ্ননির্জন দুঃসহ চিত্রকল্প:

বজ্র লুকায়ে রাঙা মেঘ হাসে পশ্চিমে আনমনা—
রাঙা সন্ধ্যার বারান্দা ধরে রঙিন বারাঙ্গনা!

বজ্র যতীন্দ্রনাথের কবিতায় একটি ভিন্ন মাত্রায় বিবর্তিত রূপকল্প। এই কবিতাতেই আছে কাকুবক্রোক্তির আশ্রয়ে বজ্রশাপগ্রস্ত শঙ্কিত সৌন্দর্যের দুর্নিবার মোহমুক্তির কথা—

বজ্রে যে-জনা মরে,
নবঘনশ্যাম শোভার তারিফ সে বংশে কেবা করে?[১০]

নেহাৎ অলংকারিক চাতুরী দেখানোর অভীপ্সা কবির ছিল না বলেই কবিতার ভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে করুণ রসকে সঞ্জীবিত করতে পেরেছেন। স্বরভঙ্গির Negation-Affirmation এখানে গৌণ হয়ে গিয়েছে। শশীভূষণ দাশগুপ্তের মতে "প্রকৃতির প্রতি এই সন্দেহ এবং বিদ্বেষ যতীন্দ্রনাথকে তাঁহার কাব্য-জীবনের প্রথমার্ধে রীতিমত চরমপন্থী করিয়া তুলিয়াছিল। মনে হয় তাঁহার নিজের অন্তরের মধ্যে একটা নিত্য জ্বালাকর ক্ষত কোথাও ছিল—মনের জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে সেই ক্ষতকে তিনি প্রকৃতির সর্বত্র সর্ব বিষয়ের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিলেন।"[১১]

'মরুশিখা'র 'দুখবাদী' এবং 'মরুমায়া'র 'নবান্ন' কবিতার বাচনভঙ্গির আপাতবৈসাদৃশ্য থাকলেও ভাবসম্পাদনে একই ক্রিয়ার অনুসারী। যে-জন সহজে 'প্রকৃতির টোপ' গিলতে চায় না, তার ওপরেই নেমে আসে তত জগদ্দল পাথর। মায়াবিজড়িত জগতে এ তো আত্মবিস্মৃতির নামান্তর।

সুনীল আকাশ, স্নিগ্ধ বাতাস, বিমল নদীর জল,
গাছে-গাছে ফুল, ফুলে-ফুলে অলি সুন্দর ধরাতল।

প্রকৃতির প্রলোভন ত্যাগ করা কঠিন। অথচ জীবন সহজ হতে চায়, সহজ পথে চলতে চায় সকলেই। সাধনার পথ দুর্গম, সাধনার নাম সহজ! এ-বিরোধের অবসান কোথায়—তা জানতে চেয়ে অবশ্য যতীন্দ্রনাথ মৃত্যু প্রার্থনা করেননি। কারণ নেতির বলয়ে তাঁর ভাবনা ঘুরপাক খায় না। যিনি শোক ভাবের তাত্ত্বিক প্রস্থান গড়ে তোলেন তিনি পরিণতমনস্ক কবিই শুধু নন, তিনি জীবনরসিকও। 'জীবনরসরসিকতা'য় তাঁর সহজাত অধিকার। কবিতায় ভাবের আবেদন রসসৃষ্টির উপায়কে অতিক্রম করলেই তা সিদ্ধরসে পরিণত হয়। রামায়ণ সেই সিদ্ধরসের কাব্য। এ প্রসঙ্গে যতীন্দ্রনাথের মন্তব্য—"তাঁহার সেই শোকভাব স্মৃতির স্তর বাহিয়া কল্পনাস্তরে উঠিবার অবসর পায় নাই। ইহাকে ভাবসমুত্থ কাব্য বলিলে নিতান্ত অন্যায় হয় বলিয়া মনে হয় না।"[১২] 'নবান্ন' কবিতায় গ্রামের চাষির ভরাডুবির বর্ণনা দিতে গিয়ে যতীন্দ্রনাথ অগ্রহায়ণের মনোরম শোভায় অবগাহন করেন।

তার চেয়ে এস প্রভাত-আলোকে চেয়ে থাকি দূর-দূরে,—
বাঁকা নদী যেথা চরের কাঁকালে জড়ায় জড়ির ডুরে।
যেথায় আকাশে ভুলে নেমে আসে মানস-মরালশ্রেণী,

যেথা দিকবালা শীতের বেলায় এলায় আঁচল-বেণী।

একদিকে কল্পনার অভিসার, অন্যদিকে কল্পনাপ্রধান কাব্যের প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণার প্রকাশ—এই বর্ণনায় মেলে। হাজারো দুর্বিপাকেও নবান্নের দিনে 'চাষার ঘরে যে কুটুম ফিরাতে নাই।' আমাদের দেশে আত্মীয়, অতিথি পূজিত হন। যতীন্দ্রনাথ মনুষ্যত্বের ধারায় মাথা নত করে সেই পরম্পরার কথা শুনিয়েছেন। যে-চাষির ক্ষেতভরা পাকা ধান নষ্ট হয়েছে, ফসলবিলাস তাকে মানায় না। গোলাভর্তি ধানের স্বপ্ন দেখার আনন্দ তার প্রাণেও জেগেছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে তাও ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। তুচ্ছ ধানের গল্প বলে সে আর বন্ধুর সহানুভূতি প্রার্থনা করে না। রবীন্দ্রনাথের 'কাঙালিনী' কবিতার কথা মনে পড়ে যায়। 'কাব্য-পরিমিতি'তে শোকভাবের করুণরসে রূপান্তরের দৃষ্টান্ত হিসাবে কবিতাটির ব্যাখ্যা করেছেন যতীন্দ্রনাথ। কবিচিত্তধারার সঙ্গে পাঠকচিত্তধারার ভাবসম্মিলনেই রসপ্রতীতি সম্ভব। যতীন্দ্রনাথের কথায় "বাসনা-ব্যতিরেকে পাঠকচিত্ত কব্যাস্বাদনের উপযোগী হয় না। রতি শোক ইত্যাদি ভাবের স্মৃতি যে পাঠকের চিত্তে বাসনা-আকারে সঞ্চিত নাই, তাহার মনে মধুর বা করুণ রসের কাব্য প্রতিফলিত হইতেই পারে না।...বাসনালোক হইতে পাঠকচিত্ত কাব্যক্ষেত্রে উঠিয়া রসের সন্ধান করে। কবিচিত্ত ও পাঠকচিত্ত এই কাব্যক্ষেত্রে মুখোমুখী হইয়া আপন আপন প্রকৃতি ও যোগ্যতা অনুসারে পরস্পেরর পরিচয় গ্রহণ করে। যে পথ দিয়া কবিচিত্ত রস হইতে কাব্যে যাতায়াত করিয়াছে, কাব্যেই তাহার ইঙ্গিত থাকে, কারণ সেই চলাচলের পথে অস্পষ্ট পায়ের দাগ পড়িয়া যায়। সমধর্ম্মী ও সমবাসনাবিশিষ্ট পাঠকচিত্ত কাব্য হইতেই সেই পথের সঙ্কেত পায়।"[১৩]

যতীন্দ্রনাথের 'দুখবাদী' কবিতা এবং তাঁর দুঃখবাদের বিপক্ষে মোহিতলালের 'দুঃখের কবি' কবিতাটি সামান্য আলোচনা করা যেতে পারে। মোহিতলালের মতে প্রচলিত 'দুঃখের কবি' কথাটি সোনার পাথরবাটির মতো। দুঃখের কবিরা কাব্যে বাস্তবতার প্রতিফলন দেখাতে গিয়ে মাটিকে মাটি এবং আলোকে আলোই বলেন। তাঁরা মনে করেন জীবনের কঠোর-কঠিন তত্ত্ব উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে কাব্যের সত্য পাঠকের প্রত্যক্ষগোচর হবে। কিন্তু আরিস্টটলের 'কাব্যতত্ত্ব' পাঠক, আমরা জানি ইতিহাসের সত্যের চেয়ে কাব্যের সত্য যোজনদূরে অবস্থান করে। কাব্যের সত্য দূরদর্শিতায় লভ্য; তা সম্ভাবনায় উজ্জ্বল। কাব্যের আত্মা রসের ক্ষেত্রেও একই কথা। সুখ-দুঃখময় জীবনের শিল্পায়নই কাব্য। যতীন্দ্রনাথ প্রথম পর্বে দুঃখের জয়গানে মুখর হয়েছেন কিন্তু দুঃখবিলাসিতায় গা ভাসাননি। তাঁর সম্পর্কে অশ্রুকুমার সিকদারের মন্তব্যটি যথার্থ—"যে কবি "মানুষ", "চাষার বেগার", "দেশোদ্ধার" প্রভৃতি কবিতা লিখেছেন, যাঁকে এখনকার ভাষায় অনায়াসে সমাজসচেতন কবি বলা যায়, তিনি শুধু মানবসত্তার মধ্যে আপতিক-বাস্তবিকের বৈপরীত্যের কথা ভাবেন নি, তিনি বাঙালাদেশের গ্রামাঞ্চলে তার বাস্তব রূপটির রূঢ় সত্যকে তুলে ধরতে পেরেছেন।"[১৪] পাশাপাশি এও সত্য যে যতীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় পর্বের কবিতায় ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি নিবিষ্ট আস্থার পরিচয়

দিয়েছেন। রামপ্রসাদ শ্যামাকে কখনো মা, কখনো আদরের দুলালি মেয়েরূপে কল্পনা করে মান-অভিমানের লীলায় মগ্ন হতেন, যতীন্দ্রনাথ 'বেদিনী' কবিতায় সেই রেশ থেকে গিয়েছে। ভ্রাম্যমাণ অনিকেত জীবন অসীমের সন্ধানে চিরকাল উদাসীন। মোহিনী মন্ত্রের উচ্চারণ আর বীণের সুরলহরীতে বেজে ওঠে শিবপার্বতীর টানাপোড়েনের সংসারের নিত্যদিনের ব্যথা-বেদনার কথা। মধ্যযুগের 'শিবায়ন' কাব্যের নবরূপায়ণ যেন যতীন্দ্রনাথের এই কবিতা। মিথ-পুরাণের ভাঙাগড়ায় কবির শৈল্পিক নৈপুণ্য প্রশংনীয়। বীতশ্রদ্ধ জীবনের ত্রুটিবিচ্যুতি বিস্মৃত হয়ে ঐশিক-দর্শনের জগতে নিঃশব্দ উত্তরণ আমাদের মুগ্ধ করে।

হাওয়ার উজানে দিক ঠিক রেখে
আঁধারে আঁধারে চল্—
আকাশে খেলায় লয়া-লয়া শাপ
পারের সাপুড়ে দল।
কি ভাবিস মিছে, আয় পিছে-পিছে
যা হবার তাই হোক—
বেদে-বেদেনীরা ভয় পায় যদি—
হাসিবে গাঁয়ের লোক।[১৫]

দীপ্তিকাব্যের চমৎকার উদাহরণ এটি।

কবিচিত্ত ও পাঠকচিত্তের কাব্যিক একাত্মতার ভিত্তিতে যতীন্দ্রনাথ কাব্যের এবং পাঠকচিত্তের চারটি করে আটটি বিভাগ দেখিয়েছেন। সেই বিভাগগুলি যথাক্রমে নিম্নে দেওয়া হলো

কাব্য:

১. ভাবসমুখ কাব্য
২. বাসনাসমুখ কাব্য
৩. কল্পনাসমুখ কাব্য
৪. রসোত্তীর্ণ কাব্য

পাঠকচিত্ত:

১. ভাবমুখী চিত্ত
২. বাসনামুখী চিত্ত
৩. কল্পনামুখী চিত্ত
৪. রসোন্মুখী চিত্ত

রসোৎপত্তির প্রক্রিয়াটিকে যতীন্দ্রনাথ যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা একইসঙ্গে বৈজ্ঞানিক এবং কাব্যিক—"ইহাদের মধ্যে ভাবসমুখ কাব্যের সহিত ভাবমুখী চিত্তের, বাসনাসমুখ কাব্যের সহিত বাসনামুখী চিত্তের, কল্পনাসমুখ কাব্যের সহিত কল্পনামুখী চিত্তের, রসোত্তীর্ণ কাব্যের সহিত রসোন্মুখী চিত্তের অয়নচক্র সম্পূর্ণ হওয়ায় আনন্দের

উৎপত্তি হয়, যদিও সেই সেই আনন্দের প্রকার ও পরিমাণের তারতম্য আছেই। রসোত্তীর্ণ কাব্যের সহিত (অর্থাৎ কাব্যবিশেষে প্রকাশিত রসোত্তীর্ণ কবিচিত্তের সহিত) রসোন্মুখী (পাঠক) চিত্তের যে মিলন, তাহাই শ্রেষ্ঠ আনন্দের কারণ-স্বরূপ হয়; এই আনন্দেরই অপর নাম 'রস'।"[১৬] কাব্যতত্ত্বের বিচারে যতীন্দ্রনাথ রসবাদী। রসের অনুভূতি যে অনির্বচনীয় তা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এবং সেইজন্যই হয়ে উঠেছিলেন রবীন্দ্রকবিতার সহৃদয় পাঠক। 'কাব্য-পরিমিতি'র স্থানে স্থানে তাঁর এই পাঠকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। ভাবতন্ময় চিত্তে সংবিদানন্দের চর্বণাই যদি রসের আস্বাদ দেয় তাহলে সেই আস্বাদে সহৃদয় কাব্যপাঠকের একান্ত অধিকার। এ-প্রসঙ্গে পি. ভি. কানে লিখেছেন "Rasa is out of the ordinary, can be understood only by सहृदयs and the only proof of its existence is the चर्वणा or आस्वाद which a सहृदय has."[১৭]

দ্বিতীয় পর্বের কবিতায় রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠেছেন যতীন্দ্রনাথের আশ্রয়। 'কল্লোল' গোষ্ঠীর বিরোধিতার দিন ততদিনে শেষ। ভাববাদী সাহিত্যিকদের প্রতি কটাক্ষের নারাচ আর তীব্র গতিতে ছুটে আসে না। আধুনিকতার কাব্যতত্ত্বে নিবিষ্ট কবিরা পাশ্চাত্যের শিল্প-সাহিত্য-আন্দোলনের সচেতন বোদ্ধা এবং বিশ্লেষক। এসময়ে রচিত যতীন্দ্রনাথের দুটি ব্যতিক্রমী কবিতা—'কচি ডাব' ও 'কবি নহি'। যদিও দুটি কবিতা রচনার মধ্যে এক দশকের ব্যবধান, তবু 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' তারা 'সমান অংশীদার'। সকালের আলোর নির্বাক আহ্বানে সাড়া দেওয়ার অর্থ কবি জানেন। 'কচি ডাব'-এর রুদ্রসংকেত তাঁকে অস্থির করে তোলে প্রত্যহ। কবি যখন সামাজিক হয়ে ওঠেন তখন কবি-ব্যক্তিত্বের লৌকিক অধ্যাস ভূমিনিষ্ঠ এবং দৃঢ় হয়। যতীন্দ্রনাথ সেই অবিচল গোত্রের কবি। তাই অশ্রুকুমার সিকদার যখন বলেন "'সায়ম্' থেকে তাঁর পশ্চাদপসরণ দুর্ভাগ্যজনক। তিনি যত বড়ো কবি, যদি তার চেয়েও বড়ো কবি হতেন, তাহলে হয়তো 'বিদ্রূপপরায়ণ অবিশ্বাসের আমি' থেকে তাঁর যে প্রথম পর্বের কবিতার সূত্রপাত, তাকে হয়তো এক মহত্তর ইতিবাচক উত্তরণে পৌঁছে দিতে পারতেন। তা সম্ভব হয় নি, শেষ পর্যায়ের কবিতা যেন অবিশ্বাসকে suspend করে বিশ্বাসের কবিতা। ব্যক্তিগত বিশ্বাস কবিতায় বিশ্বস্ত হয়ে ওঠে নি।"[১৮] —তখন তাঁর এই মূল্যায়ন যতীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের পালাবদলের মৌল চিহ্নগুলিকে নিষ্প্রভ করে তোলে। কাব্যনামগুলির মধ্যেই নিহিত হয়ে আছে যতীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন এবং আনুপূর্বিক অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞান। কাব্যতত্ত্ব আলোচনায় তাঁর কাব্যজীবনের দর্শন ও অভিজ্ঞতার অনুপম উদ্ভাস লক্ষ করা যায়।

তথ্যসূত্র :

১. 'কাব্যজিজ্ঞাসা', অতুলচন্দ্র গুপ্ত, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ১৭, চতুর্থ সংস্করণ: ভাদ্র ১৪২১, পৃষ্ঠা ১৪।

২. ‘অলঙ্কার-চন্দ্রিকা', শ্যামাপদ চক্রবর্তী, কৃতাঞ্জলি, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, পুনর্মুদ্রণ: ২০১৩, পৃষ্ঠা ২৯৯-৩০০।
৩. ‘মধুসূদন রচনাবলী', মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা ৭০০০০৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ: অগস্ট ২০১২, পৃষ্ঠা ৩৫।
৪. ‘কাব্য-পরিমিতি', যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কালীঘাট রসচক্র সাহিত্য সংসদ, ১ সি, লেক রোড, কলকাতা ৭৫, প্রথম সংস্করণ: আষাঢ় ১৩৩৮, পৃষ্ঠা ৬ (অতঃপর ‘কাব্য-পরিমিতি' নামে উল্লিখিত)।
৫. ‘কাব্যালোক', সুধীরকুমার দাশগুপ্ত, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, চতুর্থ সংস্করণ: জানুআরি ২০১৮, পৃষ্ঠা ২২।
৬. ‘ঘুমের ঘোরে', ‘যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা', সুশান্ত বসু সম্পাদিত, ভারবি, ১৩/১ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, পুনর্মুদ্রণ: জানুআরি ২০১৭, পৃষ্ঠা ৩২ (অতঃপর ‘যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা' নামে উল্লিখিত)।
৭. তদেব, পৃষ্ঠা ৩২।
৮. ‘কাব্য-পরিমিতি', পৃষ্ঠা ২৮।
৯. ‘মন-কবি', ‘যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা', পৃষ্ঠা ৪৩।
১০. ‘দুখবাদী', ‘যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা', পৃষ্ঠা ৫৩।
১১. ‘কবি যতীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাঙলা কবিতার প্রথম পর্যায়', শশীভূষণ দাশগুপ্ত, এ মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রা. লি., ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ১২, দ্বিতীয় সংস্করণ: মাঘ ১৩৬৬, পৃষ্ঠা ৫১।
১২. ‘কাব্য-পরিমিতি', পৃষ্ঠা ৪০-৪১।
১৩. তদেব, পৃষ্ঠা ৩১-৩২।
১৪. ‘যতীন্দ্রনাথ: আধুনিকতার সূচনা', অশ্রুকুমার সিকদার, চতুরঙ্গ, বর্ষ ৪৮, সংখ্যা ৬, অক্টোবর ১৯৮৭, পৃষ্ঠা ৫০৮ (অতঃপর ‘যতীন্দ্রনাথ: আধুনিকতার সূচনা' নামে উল্লিখিত)।
১৫. ‘বেদিনী', ‘যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা', পৃষ্ঠা ৯৬।
১৬. ‘কাব্য-পরিমিতি', পৃষ্ঠা ৫২-৫৩।
১৭. ‘History of Sanskrit Poetics', P.V. Kane, Motilal Banarsidas Publishers Private Limited, 41 U.A. Bungalow Road, Jawhar Nagar, Delhi 110007, Fourth Edition: Delhi 1971, Page 364.
১৮. ‘যতীন্দ্রনাথ: আধুনিকতার সূচনা', পৃষ্ঠা ৫০৯-৫১০।

কমল চক্রবর্তীর পরিবেশ চেতনা : প্রসঙ্গ 'অরণ্য হে'

রাখী গরাঁই
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া

সারসংক্ষেপ : কমল চক্রবর্তী বিশ শতকের সত্তরের দশকের কথাসাহিত্যিক। তাঁর কথাসাহিত্যে বিচিত্র বিষয়ের ভিড়। নাগরিক জীবনের নানা জটিলটা, নপুংসক–হিজড়েদের জীবন যন্ত্রণার কথা উঠে আসার সাথে সাথে অরণ্য, অরণ্য প্রাণী, আদিবাসী জীবন সমানভাবে প্রাধান্য পেয়েছে। পরিবেশ সচেতন কমল চক্রবর্তী অরণ্য-স্রষ্টা, 'ভালো পাহাড়' তাঁর অন্যতম সৃষ্টি। তাঁর "অরণ্য হে"(২০২২) উপন্যাসটি অরণ্য ও অরণ্য প্রাণীর বিপন্নতাকে নিয়ে লেখা। পরিবেশের সার্বিক অবনমনের দিকগুলি এই উপন্যাসে উঠে এসেছে। অরণ্যে বসবাসকারী আদিবাসীদের জীবন সংকটের কথাও দেখানো হয়েছে। আবার উপন্যাসটি ভ্রমণকেন্দ্রিক। বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণের পরিবেশ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা উঠে এসেছে। তাছাড়া কমল চক্রবর্তীর বেড়ে ওঠা ও হয়ে ওঠা সুবর্ণরেখা নদী ও দলমা পাহাড়ের কোলে। কিন্তু চোখের সামনে এদের অবনমন তাঁর মনে গভীর প্রভাব ফেলেছে।
সূচক শব্দ : অরণ্য, বন্যপ্রাণী, বৃক্ষ, পরিবেশ, সচেতনতা, প্রকৃতি।

সত্তরের দশকের বিশিষ্ট কথাকার কমল চক্রবর্তী (১৯৪৪, ৩০ ডিসেম্বর)। তাঁর কথাসাহিত্যের একটি বড় অংশই অরণ্য ও আদিবাসীদের জীবন নিয়ে লেখা। যেমন 'বৃক্ষু'(১৯৯২), 'জঙ্গল'(১৯৯৬), 'প্রিয় ফরেস্টের'(১৯৯৯) 'ধান'(২০০5) ইত্যাদি বৃক্ষ বা অরণ্যকে নিয়ে লেখা উপন্যাস। বাস্তবের অরণ্য-স্রষ্টা কমল চক্রবর্তীর অরণ্যকেন্দ্রিক লেখাগুলিতে অরণ্যপ্রাণীর বিপন্নতা, অরণ্য ক্ষয় ও তার প্রভাব, অরণ্য সম্বলিত পাহাড় বা নদীর ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা, আরণ্যক মানুষের অসহায়তা, সর্বোপরি অরণ্যকে বা প্রকৃতিকে নিবিড়ভাবে অনুধ্যান করার বিষয়টি সহজেই অনুভব করতে পারি। তাঁর 'অরণ্য হে' এরকমই একটি উপন্যাস। যেটি 'লংজার্নি' পত্রিকায় ২০২২-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পায়। আলোচনার মধ্যে থাকবে এই 'অরণ্য হে' উপন্যাসটি।

কমল চক্রবর্তীর 'অরণ্য হে' উপন্যাসে অরণ্য কথার ফাঁকে ফাঁকে পরিবেশ সচেতনতার দিকটি দেখতে পাই। কিন্তু এর আগে অনেক উপন্যাসে পরিবেশ সচেতনতার কথা বা পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার কথা উঠে এসেছে। সেই উপন্যাসগুলি নদীকেন্দ্রিক বা অরণ্যকেন্দ্রিক যাই হোক না কেন সেখানে কিন্তু পরিবেশচিন্তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এসেছে। তবে আশির দশক থেকেই মূলত দেশে-বিদেশে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন পরিবেশ বিপর্যাসের ঘটনা এবং পরিবেশরক্ষা বিষয়ক

আন্দোলনগুলিও মানুষের মনে দাগ ফেলেছে। তাই পরিবেশ নিয়ে ভাবনাচিন্তা আরও বেশি গুরুত্ব পেয়েছে এই সময় থেকে। সাহিত্যিকদের কলমে উঠে এসেছে পরিবেশ সচেতন নতুন নতুন উপন্যাস। যেমন অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'মহিষকুড়ার উপকথা'য় (১৯৮১) যন্ত্র সভ্যতা কিভাবে গ্রাস করছে জনসমাজকে বা বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বনবিবির উপাখ্যান'এ (১৯৮১) সুন্দরবনের পরিবেশ ও জীবন সংগ্রাম উঠে এসেছে। দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' উপন্যাসে (১৯৮৮) নদী বাঁধ নির্মাণে স্থানীয় মানুষদের বাস্তুচ্যুত হওয়ার ঘটনা, বুদ্ধদেব গুহর 'শালডুংরি' (১৯৮৭), লীলা মজুমদারের 'হাওয়ার দাঁড়ি' (১৯৮৩), চিত্তরঞ্জন মাইতির 'মন অরণ্য' (১৯৮৮) প্রভৃতি উপন্যাসে পরিবেশের বিপন্নতা, চোরাকারবারি, মানব অস্তিত্বের সংকট প্রভৃতি বিষয়গুলি উঠে এসেছে। নব্বই এর দশকে পরিবেশগত সমস্যার বিভিন্ন দিক আরো বেশি করে প্রতিফলিত হতে দেখা যায় বিভিন্ন উপন্যাসে। এ প্রসঙ্গে কিন্নর রায়ের 'প্রকৃতি পাঠ' (১৯৯০) ও 'মেঘ পাতাল' (১৯৯৫) দুটি উপন্যাসে দেখি মাঠ-পুকুর জবরদখল করে বহুতল নির্মাণ ও অরণ্যকে ধ্বংস করে বসতি নির্মাণের একটি প্রবণতা। মহাশ্বেতা দেবীর 'ক্ষুধা' (১৯৯১) বনরক্ষকদের ভক্ষক হয়ে যাওয়ার কথা, জয়া মিত্রের 'একটি উপকথার জন্ম' (১৯৯৪) উপন্যাসে শিল্পনগরী স্থাপনের ফলে ওই এলাকার ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন ও বিকৃতির চিত্র অথবা সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'জলতিমির' (১৯৯৮) উপন্যাসে দেখতে পাব জলদূষণ সমস্যার কথা। এইভাবে আট ও নয়ের দশকে রচিত উপন্যাসগুলিতে পরিবেশ সচেতনতা ও মানুষের কর্তব্যবোধ সম্বন্ধে জনমানবকে জাগিয়ে তোলার দিকটি আমরা লক্ষ করি।

কমল চক্রবর্তীর 'অরণ্য হে' উপন্যাসটিকে একটি ভ্রমণধর্মী উপন্যাস বলতে পারি। তবে এই ভ্রমণ মূলক উপন্যাসটিতে ভ্রমণ কথার সাথে সাথে অরণ্যকথা সমানভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। আবার অরণ্যের বহুবিধ ভূমিকা তুলে ধরার সাথে সাথে লেখকের পরিবেশ সচেতনতা ও মানুষের পরিবেশের ওপর ঋণাত্বক কার্যকলাপের দিকটি উঠে এসেছে। পৃথিবীর আদিসৃষ্টি বৃক্ষ ছাড়া পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব। এখন মানুষচালিত এই পৃথিবীতে বৃক্ষের গুরুত্ব ক্রমশ বিস্মৃতির পর্যায়ে। পরিবেশ সচেতন সাহিত্যিক কমল চক্রবর্তী বৃক্ষ বা অরণ্যের গুরুত্ব নানাভাবে তুলে ধরেছেন এই উপন্যাসে। উপন্যাসটিতে একটি জায়গা ভ্রমণ করতে গিয়ে বা সেখানকার কথা বলতে গিয়ে লেখকের পূর্ব ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা উঠে এসেছে, আবার কোনো ব্যক্তির সাথে কথোপকথনের সময় অভিজ্ঞতাবাহী অথবা কল্পনাবাহী অনেক প্রসঙ্গ লক্ষণীয়। তাছাড়া যেসব জায়গা বা অরণ্য নিজের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আছে তা কথায় কথায় উঠে আসা। আসলে কমল চক্রবর্তীর লেখার বুনোটটিই এরকম।

'অরণ্য হে' উপন্যাসের 'আলাপ' অংশে কমল চক্রবর্তী বলেছেন - "চোখের সামনে দেখেছি, আমার পাঠশালা উৎখাত, আগুন জ্বলছে, আমার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের হত্যা। আমি নিমকহারাম। গাড়ল হে! নতুবা আমার 'পাঠশালা' অরণ্য শেষ! আমার

শিক্ষাদাতা, হরিণ, হাতি, চিতা, বাঘ, কাঠবেড়ালি প্রায় - শেষ হবার মুখে।”[১] বলা যায় গোটা উপন্যাসের মূল ভিত্তি এটিই। প্রকৃতির বা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকারী উপাদানগুলি বিনষ্ট হতে দেখার তৃতীয় চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি তাঁর মধ্যে রয়েছে বলেই এই ধরনের উপন্যাস লেখা সম্ভব। মূলত দলমা, সিমলিপাল, সারান্ডা, ডুয়ার্স বা ভুটানের ভূপ্রকৃতি এই উপন্যাসের প্রেক্ষাপট হিসেবে এসেছে। উপন্যাসের শুরুতেই আদিবাসীদের ‘জাহিরা’ থান/ধর্মস্থান এর কথা বলেছেন যেখানে মোটা মোটা শাল বৃক্ষ দিয়ে ঘেরা কিন্তু শাল বৃক্ষগুলো এখন আর নেই বললেই চলে। আবার দলমা পাহাড়ের কোলে অবস্থিত সুইসা গ্রামের হিরগুনাথের মন্দিরের কথা বলা হয়েছে যেটি এক প্রাচীন জৈন মন্দির। যা প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। কথার ফাঁকে এই মন্দিরের প্রসঙ্গ এসেছে ঠিকই কিন্তু তা তুলে ধরার উদ্দেশ্য সেই প্রাচীনতা নিয়ে। এরকম প্রাচীন বৃক্ষ তো থাকতেই পারতো কিন্তু নেই। সেই আক্ষেপটিই লেখক তুলে ধরতে চাইছেন। দিনরাত ঠক ঠক কুঠারের শব্দ শুনতে পান তিনি আর হাজার হাজার বর্গ মাইল জুড়ে থাকা অরণ্যে আগুন। আসলে ভেতর জ্বলতে থাকে, লেখক বলেছেন - “পোড়া গাছের মড়া বল্কলে, হাত। দু-হাতে জড়াই। আমার মানব জন্মের, বৃক্ষনাথ। গুঁড়িতে মাথা, কাঁদি। কান্না কেউ শোনে। মানুষকে বলা যায় না। কারণ আগুন লাগিয়ে মানুষ ভাবে, বেশ। এই আর কি ক্ষতি হলো! এই তো অশোক ব্যানার্জি বলল, কি ক্ষতি! পাতা পুড়ে স্যার হবে। অরণ্যের জন্য দারুন সার। আহা কত জ্ঞানী, অশোক ব্যানার্জি।”[২] সত্যিই! এরকম অনেক অশোক ব্যানার্জি রয়েছে আমাদের মধ্যেই। যীশু যেমন ক্ষমা করে দিয়েছিলেন আমাদের তেমনই রুগ্ন অসুস্থ সমাজব্যবস্থার জন্য বৃক্ষনাথের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন লেখক।

তিনি ডুয়ার্সের কথা বলার সময় বলেছেন সেখানের করলা নদীর পাশে টোটোপাড়ার কথা। সেখানকার কুলিপাড়াতে বাঘ ভাত, রুটি, এমনকি মানুষকে এসেও খেয়ে যায়। আবার হাতি সন্ধ্যে বেলায় এসে তাদের হাঁড়িয়া মহুয়া খেয়ে যায়। এই চা বাগান যেন রিজার্ভ ফরেস্টের মিনি সংস্করণ। তাছাড়া বাঁদর, হরিণ, শঙ্খচূড়, বিছে, বহুরূপী, ক্যামেলিন, বাইসন তো আছেই। তবে এই ইন্ডিয়ান বাইসনও কখনও কখনও মানুষের এক্তিয়ারে এলে রক্ষা পায় না। লেখক ইঙ্গিত দিয়েছেন এইভাবে - “যখন সেই ক্ষুধার্ত বাইসনের হুঁশ ফিরল, তখন চারপাশে অসংখ্য লাঠি সোটা, তীর ধনুক, শব্দভেদী বান এবং আগুনে মশাল! তারপর যা হয়! বা অরণ্যকান্ডে যা হয়েছিল! মাংস ভাগবাটারা...ঢেলে মাংসের ঝোল। অতএব, হ্যাঁ! লড়ে যা পাগলা!”[৩] তাছাড়া যেকোন সময় হাতি বা অন্যান্য বন্যপ্রাণীরা হুটহাট লোকালয়ে ঢুকে পড়ে এবং তার ফলে সেখানকার মানুষের ওপর যে উপদ্রব চালায় তা একটি উক্তিতে স্পষ্ট হয় - “স্যার, আমাদের কষ্ট দুঃখ বেতন বৃদ্ধি এসব বলছি না! চিতাবাঘ, হাতি, বাইসন, খুব ক্ষতি করে! এইটা একটু দেখেন।”[৪] নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র মাথায় রেখে আমাদের একটু ভাবা উচিত কেননা আমরাই তো তাদের নির্ভরশীলতার জায়গাকে ধীরে ধীরে

বিনষ্ট করে ফেলছি। প্রকৃতি সচেতন লেখকের ভাবনায় উঠে এসেছে গভীর সহমর্মীতার বোধ - "কেন যে আমরা সবাইকে মেরে, সব প্রাণী যারা এই মহা পৃথিবীর, সে বৃক্ষ অথবা পক্ষী, নদী অথবা পাহাড়, শুধু মানুষ থাকবে! কেন এত হীন ভাবনা!"[৫] উত্তরবঙ্গ হাতি অধ্যুষিত অঞ্চল। রেল লাইনের পাতা ফাঁদে হাতি নিয়মিতই পড়ে। নির্মমভাবে তাদের হত্যার যন্ত্রণায় লেখক স্মরণ করেছেন হাতির ঐতিহ্যময় অস্তিত্বের দিকটি, আবার সেই ঐতিহ্যের বিনাশের রুপটিও - "একদা ভারতীয় কোন শিল্পী, পন্ডিত, মহান ঋষি, এই আশ্চর্য প্রাণীর শুঁড় মানুষের মুখে প্রতিস্থাপন করে, গণেশের জন্ম দেন। কতটা মুগ্ধ, আশক্ত হলে সম্ভব!... হাতি কি আর বাঁচবে! থাকার জায়গা! আফ্রিকার বনে, শুধু বিষ দিয়ে অসংখ্য মৃত্যু!"[৬]

শুধু অরণ্য বা অরণ্য প্রাণী নয়, নদী, পাহাড়, বিপন্ন জনজাতির কথাও উপন্যাসটিতে এসেছে। যেমন করলা নদী বা তিস্তা , তোর্সা নদীর কথা। নদীর সাথে একাত্মতা, নদীর স্বাস্থ্য, জলকেলি বা রমনীয়তার নির্জনতায় অনুভব করতে চেয়েছেন। শান্তনু রাজার মত যুবতী তিস্তাকে বিয়ে করতে চেয়েছেন। এই প্রগাঢ়তার মূলে অবশ্যই রয়েছে প্রকৃতিকে নিজের সত্তার সাথে সচেতনভাবে মেলে ধরার প্রয়াস। আবার টোটো নামে এক প্রান্তিক অবলুপ্তপ্রায় জনজাতির সংখ্যা মাত্র ৯৮ জন। তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে, ঈশ্বর রয়েছেন। কিন্তু এই অবিমিশ্র জাতি নেপালিদের জন্য ঘাঁটাঘাঁটি হয়ে যাচ্ছে। নেপালিরা তাদের মেয়েদের বিয়ে করছে বলে। আশ্চর্য এই জাতির সবার পদবী একই। দুজন স্কুল ফাইনাল আর একজন শুধু রয়টার্সে কাজ করে। তাদের একটাই ডাক্তার, ডাক্তার সেন। এই টোটোদের বিশুদ্ধতা ও স্বতঃস্ফূর্ত যাপনের চিত্র মুগ্ধতার দাখিল। তাদের মধ্যে নেই কোন্দল, তুচ্ছতা, আত্মকেন্দ্রিক-অশিক্ষা, নীচতা, অহংসর্বস্ব ঘৃণ্য মনোভাব। বিপন্ন এই টোটো প্রজাতির জন্য লেখকের প্রার্থনা- "টোটোরা ভালো নেই ঈশ্বর, টোটোদের অসুখ করে। ঈশ্বর টোটোদের বাঁচান লাগে। কাঁদি।... পৃথিবী ভালো আছো তো! টোটোরা ভালো নেই।"[৭] আবার ১৯৮০ সালে যখন ভুটান ভ্রমণে গিয়েছিলেন এবং তার প্রায় ১০ বছর পরেও ভুটান পাহাড়ের সহাস্য নির্জন প্রকৃতির অনাবিল রূপ। এই নির্মল প্রকৃতির প্রতি লেখকের আন্তরিক আকাঙ্খার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর একটি চিঠিতে - "তোমাকে ভালোবাসি। তোমাকে ব্যাকটেরিয়া মুক্ত স্বচ্ছ-ভুবনের চুম্বন"[৮]। এই ভ্রমণধর্মী উপন্যাসে বার বার প্রকৃতির শুদ্ধতার কামনা করে গেছেন লেখক। কলকাতা থাকাকালীন সময়ে যেসব ব্যাধির নিয়মিত আনাগোনা ছিল তার থেকে মুক্তি পেতে এইসব নির্জন অরণ্য অধ্যুষিত এলাকার নিরোগ পরিমণ্ডলে জীবনকে উপভোগ করার কথা শুনি - "কলকাতায় থাকতে নিয়মিত সর্দিকাশিতে ভুগতাম। এখানে এই কদিনে এক্কেবারে সাদা ধবধবে ফুসফুস!... আসলে পাহাড়ি অক্সিজেন! কোটি কোটি বৃক্ষের এই ওষুধ হাওয়া।"[৯] ভুটানের চুখা (জলবিদ্যুৎ) ঝর্নার কথা ও ব্যাথা অনুভব করেছেন লেখক। চুখা কে দেখেছেন এক মানবী রূপে, অনূঢ়া-জল-কন্যা রূপে। সে হাহাকারমিশ্রিত কান্নায় বলতে চেয়েছে- "একজন ভালোবাসো। হে মানুষ

একজন!”[১০] ঝর্নার এই ক্রন্দন আমরা শুনতে পাই কি? রবীন্দ্রনাথের ‘মুক্তধারা’ নাটকে ঝর্নার গতিকে রুদ্ধ করার ফল কি আমরা দেখতে পাই নি! আমাদের এই অমানবিকতার চরম অবস্থার শরিক হয়ে কেবলই বার বার চোখের ধারাপাত হয়েছে লেখকের।

ভুটানকে দেখে মনে হয়েছে মানবিক গুণসম্পন্ন কেননা লক্ষ লক্ষ গাছে ঘেরা, শান্ত, এক বিশাল হলিডে হোম। ভুটানের এই প্রকৃতি লেখক কল্পনায় হয়ে উঠে এক ড্রাগন নামে প্রাণী, যে প্রাণীটির অস্তিত্ব বিষয়ে সংশয় রয়েছে। তবে বিভিন্ন দেশের উপকথায় দেখা যায় এই বিশালাকার প্রাণীটির বৈশিষ্ট্য মুখ থেকে আগুন বার হওয়া। যে একলহমায় সবকিছু ভস্মীভূত করে দিতে পারে। ওনার ভয় মানুষ এই প্রকৃতির প্রতি যা অন্যায় আচরণ করছে তার ফল হিসেবে প্রকৃতি ড্রাগন মনভাবাপন্ন হয়ে প্রতিশোধ না নেয়। লেখকের একটি উক্তি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য - “জানতে ইচ্ছে হয়, আজও কি শান্ত-ড্রাগন, শান্ত, সুন্দর! নাকি গ্লোবালাইজেশনের প্রভাবে পর্যুদস্ত, বেনিয়াটোলা! এই মানুষ নামক, ‘পশু’ কতটা বাসযোগ্য রেখেছে? ভয় হয়, মিষ্টি - ড্রাগন, হুংকার - ড্রাগন, যদি!...কোটি কোটি নির্জন পাইন, ধূপি, বিদায়! প্লিজ, ঘুমিয়ে থাক ড্রাগন! প্লিজ, মানুষ বড্ড অসভ্য, ইতর হয়ে যাচ্ছে গো ড্রাগন! ড্রাগন, তোমার ভুটান যেন, আরও হাজার বছর, বোকা হয়ে থাকে!...আমরা এগিয়ে এক ভয়ানক অন্ধকার পৃথিবীর কদর্যে ঢুকেছি! এক বৃক্ষহীন ধু ধু মরুভূমিতে। সভ্যতার সব থেকে বড়ো বিশেষত্ব প্রকৃতির সর্বনাশ।”[১১] কথাতেই ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। এখানে লেখক তাঁর বন্ধু সরোজ রায়চৌধুরীর একটি পোষা বাঘিনী ‘খৈরি’র কথা তুলে ধরেছেন। খৈরির প্রসঙ্গ তুলে ধরার উদ্দেশ্যে বলতে চেয়েছেন মানুষের সখের বাঘ প্রীতির কথা - “আমরা থোরাই করবেট বা কিপলিং যে সত্যি সত্যি বাঘ বা জঙ্গল প্রীতি! আমরা হলুম কেরানি এবং ওই আমাদের রাজধানী ‘কেরানিটোলা’/ ‘মহাকরণ’। হ্যাঁ, রাজ্য পিছু একটা করে ‘মহাকরণ’ এবং গোটা জাতটা একটা কেরানি-মনস্ক-ভুবনে।”[১২] সত্যি সত্যি আমরা তো কেরানি-মনস্কই। আদতে বাঘের জায়গা খেয়ে ফেলে দেখনদারিতেই মশগুল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ আমলের পথে পথে রেল লাইনের রমরমার কথাটি এনেছেন। রেলের স্লিপার তৈরির জন্য যে পরিমাণে শাল কাঠ ব্যবহার করা হয়েছে, বড় বড় অরণ্য কিভাবে নিঃশেষ হয়েছে তার কথা তুলে ধরেছেন লেখক। বিশ শতকের প্রথমার্ধ ১৯১০-’১৫ অব্দি শালগুড়ি বোঝাই জাহাজ শুধু নয় যেন এক একটি অরণ্য ইউরোপের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ সাধনার ধন শেষ হয়ে এসেছে। এইসব অভিজ্ঞতা নিংড়ানো ঘটনা বলার সঙ্গে আবার বলছেন - “হায় দীর্ণ, জীর্ণ, নাগরিক চেতনা! হায়, বৃক্ষ-অভিবাদন, বৃক্ষ-রূপকথা, তেপান্তর, ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমি, ফেলে, শহুরে কর্পোরেশনে, ট্যাপ টাওয়ার এর জিরো বি - অধ্যুষিত কংক্রিটের অরণ্যে। হতাশা, টেনশন, ভ্যালিয়াম-ফাইভ! গ্রাস, চরস, চন্ডু, খালাসিটোলা, আস্তাকুঁড়-পন্থী-রাজনীতি

এবং ছিন্ন ভিন্ন মনুষ্য তড়াসে।”[১৩] আজ বিশ্বায়নের যুগে আমাদের এই উই লাগার বিষয়টি টের পাচ্ছি প্রতি ক্ষণে। সামাজিক নাগরিক জীবন আমাদের জঙ্গল বিমুখ করেছে। আসলে আমরাই কাঠুরে। আমরা গাছের জন্য পোস্টার লাগাই, কখনো গাছও। সেটা সরকারি উৎসবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে গেছে। আমরা যেন দিন দিন রেপিস্ট হয়ে যাচ্ছি, লেখক বলছেন - “আঠারো নয় চোদ্দো বছরের মেয়ে দেখলেই যেমন রেফ জাগে! একটু নির্জন একটু নিরালা, তেমনি একটু মোটা গাছ দেখলেই উদ্যত কুঠার!”[১৪] বর্বরতার সীমা লঙ্ঘন করেই চলেছি।

লেখক বার বার অরণ্যের ধ্বংসের প্রতি যেমন অঙ্গুলি নির্দেশ করছেন তেমনই পাশাপাশি দেখিয়েছেন অরণ্যের প্রতিশোধ নেওয়ার একটা সম্ভাব্য ইঙ্গিত, এইভাবে - “যেখানে সভ্যতার তীব্র হলাহল, বিপর্যয়, খতম থেকে বাঁচতে, অরণ্য গোপনে, নিভৃতে একে একে গুছিয়ে রাখছে, লকার, সেই অকুস্থলে! দুর্দমনীয়-সবুজ-আলমারি!... বৃক্ষ, অরণ্য, বড়ো বড়ো লকারে তুলে রাখছে গভীর সি ডি, কালাধার, গোপন! বৃক্ষের ওঁ! সেদিন খুব দূরে নেই, বর্তমান সভ্যতা শেষ হয়ে যাবে। ফিরে আসবে লক্ষ লক্ষ হারিয়ে যাওয়া গাছ।”[১৫] তারপর বৃক্ষের সাথে মাটির যে অচ্ছেদ্য বন্ধন, বিবাহ বন্ধন তাও শেষ করে দিয়েছি - “বৃক্ষহীন শুখা মাটি, বিশাল সব ফাটল। ওই হল ধরিত্রী মায়ের হা। মা, চিৎকার করছে, ‘গাছ দে’, ‘গাছ দে’। সে কি কান্না। আমরা যেমন ‘ভাত দে’ ‘ভাত দে’ কাঁদি! কেউ তো শুনতে পায়!”[১৬] দলমা পাহাড় অধ্যুষিত অরণ্যের বুনো জন্তুর আবাসভূমিও সংকটাপন্ন অবস্থায়। বুনো জন্তুর তো কথায় নেই। এক. জঙ্গল মাফিয়া, দুই. আদিবাসীদের শিকার উৎসব। সব সাবাড় হয়ে যাচ্ছে - “তখন অলরেডি, দলমার কোটরা, হরিণ, বাঁদর প্রায় শেষ।”[১৭] এ প্রসঙ্গে একবার লেখক গুহবাবুকে সাতটি চিতা মারার কারণ জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি উত্তর দেন - “আমি না মারলেও ওরা আরও নিষ্ঠুরভাবে মরত। আমার ছিল গুলি এবং এক সট। ওরা মশাল, লাঠি এবং না খেতে দিয়ে মারত।... শোনো, বাঘ থাকবে কোথায়? ... তোমাদের কোন বাপ জঙ্গল বাঁচিয়েছে! কোন মন্ত্রী, মহামন্ত্রী জানে জঙ্গল কাকে বলে! অরণ্য চেনে।... আমি মেরেছি বলে মরতে মরতে ওরা আমায় আশীর্বাদ করেছে।”[১৮] আর হাতি এ পৃথিবীর তুলনায় আজ বর্জ্য পদার্থ। তার এখন অন্তিম দশা। না আছে থাকার, না খাওয়ার। না আছে স্নান আহ্নিকের জায়গা। লেখক বলছেন -“আমার নিশ্চিত ধারণা, যদি পৃথিবী আরো একশো বছর বাঁচে (যা এক্কেবারে অসম্ভব?), হাতি নামক প্রাণীটির দেখা, জাদুঘরে। কারণ খাদ্য ও বাসস্থান, দুই সমস্যা।”[১৯] সত্যি তো মানুষের আর কোনো প্রয়োজনে লাগছে না হাতি, না ‘সার্কাস’ না ’হাওদা’। কমল চক্রবর্তীর হামা, হাঁটা দলমা সারণ্ডার জঙ্গলে। কিন্তু দলমা বা সারণ্ডা ক্রমশ শেষ হতে চলেছে তার কথা উপন্যাসের অনেক জায়গায় এসেছে। দলমার পাথর ভাঙছে, ঘরবাড়ি রেস্তোরাঁ হচ্ছে। লেখক কল্পনায় এই অরণ্যের এক একটি শাল গাছ যেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় হয়ে উঠেছে, যিনি বলছেন - “তোরা অরণ্য শেষ করে, আরণ্যক পড়ছিস, ছিঃ! ওই গ্রন্থে তোরা হাত দিস

না। আমার অরণ্য ফিরিয়ে দে! ছায়া- বিভূতিভূষণের প্রবল কান্নায় নিশীথ অরণ্য ভেসে যায়।”[২০] হয়তো সেই পূর্নিয়া ভাগলপুরের ঘন অরণ্য আর নেই। আমরা তো কৃতঘ্ন। তাই বিভূতিভূষণের খেদ বুঝতে পেরেছেন লেখক। আবার এখানে মৃত্তিকা পুরাণের প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন। এই পুরাণে দীর্ঘবাহু নামে এক মুনি বৃক্ষ সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি দীর্ঘদিন তপস্যা করে ঈশ্বরের কাছে বর চান চলমান গাছ হয়ে যেতে। তিনি ঈশ্বরের কাছে বর পান এবং চলমান বটবৃক্ষ হন। এবিষয়ে লেখকের গভীর উদ্দেশ্য ধরা পড়ে - “ভাবি সেই পবিত্র ঋষির কথা, যিনি মান, গৌরব, অর্থ, জ্ঞান, পুরস্কার নয়, চেয়েছিলেন, কোন ছায়াতরু হতে। রৌদ্রদগ্ধ মানুষ, পথিক, একবার একটু দ্রবীভূত হবে ওই গাঢ় আশ্রয়ে, হায়! একজন ঋষি, গাছ হয়ে আজও বেঁচে।”[২১] এই বৃক্ষ এই অরণ্য অক্ষয় অবিনাশী হোক তা মনেপ্রাণে কামনা করেছেন কমল চক্রবর্তী। তাই উপন্যাসের শেষে লক্ষ করি বৃক্ষপ্রেমিকের আকুলতা - “আর একটু, মরে যাবার আগে, একটু যেন, তুমি, তোমারই আঙুল, ডালপালা, চুম্বন! তুমি আমার শেষ অরণ্য হে! শেষ বার হাঁটছি! শেষ আশ্রয়! শেষ ভালোবাসা। জয় বৃক্ষনাথ!”[২২]

সব শেষে এই কথা বলব যে এই উপন্যাস বৃক্ষনাথের আখ্যান। বৃক্ষনাথই পৃথিবীর ধারক ও বাহক। অথচ আমরা তো তা মনে রাখি না। আমরা বিশ্বায়িত, আধুনিক। আমরা কৃত্রিম ভাবে অক্সিজেন তৈরি করি আবার পথ্যের বদলে একটা ‘বড়ি’ খেয়ে দিন কাটাতেও পারবো। গাছ প্রয়োজন কিসের! আমাদের এই চেতনার মূলেই মূলত আঘাত দিতে চেয়েছেন কমল চক্রবর্তী তাঁর এই উপন্যাসে। অরণ্যআত্মাকে তিনি অনুভব করতে পারেন বলেই আমাদের সজাগ করতে চেয়েছেন। কেননা সবার আশ্রয় শেষ পর্যন্ত ‘বৃক্ষনাথ’।

উল্লেখপঞ্জি :

আকরগ্রন্থ :

১. কমল চক্রবর্তী, অরণ্য হে, প্রতিভাস প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি ২০২২

সহায়কগ্রন্থ

১. কমল চক্রবর্তী, উপন্যাস সমগ্র ১, অভিযান পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০১৫
২. কমল চক্রবর্তী, উপন্যাস সমগ্র ২, অভিযান পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১৭
৩. কমল চক্রবর্তী, উপন্যাস সমগ্র ৩, অভিযান পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৮
৪. কমল চক্রবর্তী, উপন্যাস সমগ্র ৪, অভিযান পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০২২

৫. বীরেন্দ্র দত্ত, বাংলা কথাসাহিত্যের একাল, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ ২০ ডিসেম্বর ১৯৯৮
৬. সুমিতা চক্রবর্তী, ছোটগল্পের বিষয়-আশয়, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ জুন ২০০৪

তথ্যসূত্র :

১. কমল চক্রবর্তী, অরণ্য হে, প্রতিভাস প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ বইমেলা জানুয়ারি ২০২২, ৮ পৃষ্ঠা
২. ঐ, ২৪ পৃষ্ঠা
৩. ঐ, ৪৪ পৃষ্ঠা
৪. ঐ, ৪৫ পৃষ্ঠা
৫. ঐ, ৫০ পৃষ্ঠা
৬. ঐ, ৫১ পৃষ্ঠা
৭. ঐ, ৬৫ পৃষ্ঠা
৮. ঐ, ৭৯ পৃষ্ঠা
৯. ঐ, ৮৩ পৃষ্ঠা
১০. ঐ, ৮৪ পৃষ্ঠা
১১. ঐ, ৮৯ পৃষ্ঠা
১২. ঐ, ৯৩ পৃষ্ঠা
১৩. ঐ, ৯৯ পৃষ্ঠা
১৪. ঐ, ১০৮ পৃষ্ঠা
১৫. ঐ, ১২০ পৃষ্ঠা
১৬. ঐ, ১২০ পৃষ্ঠা
১৭. ঐ, ১২৩ পৃষ্ঠা
১৮. ঐ, ১২২-১২৩ পৃষ্ঠা
১৯. ঐ, ১২৭ পৃষ্ঠা
২০. ঐ, ১৩২ পৃষ্ঠা
২১. ঐ, ১৪৩ পৃষ্ঠা
২২. ঐ, ১৪৪ পৃষ্ঠা

ভরত নাট্যশাস্ত্রে সংগীততত্ত্ব : একটি সমীক্ষাত্মক আলোচনা

কল্পিতা দাস
সহকারী শিক্ষক, সংস্কৃত বিভাগ,
মালদা গার্লস হাই স্কুল (উ.মা)

সারসংক্ষেপ : সুপ্রাচীন কালে আমাদের সংগীতে যে সমস্ত সংগীত বিষয়ক গ্রন্থ সৃষ্টি হয়েছিল তার মধ্যে ভরত রচিত নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থটি অন্যতম। ভারতীয় সাহিত্য এবং সংগীতের বৃহৎকোষ এই গ্রন্থ। রস, ছন্দ, ভাষা, বেশ -ভূষা, রঙ্গমঞ্চ, অভিনয়, সংগীত এবং নৃত্য প্রভৃতি বিষয়ের বিবরণ এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে ৩৬ টি অধ্যায় আছে। তার মধ্যে আঠাশ থেকে তেত্রিশ অধ্যায় পর্যন্ত এই ছয়টি অধ্যায়ে সংগীতশাস্ত্রের বিশদ উল্লেখ পাওয়া যায়। নাট্যশাস্ত্রে নাটকের বিস্তৃত আলোচনা যেমন রয়েছে তেমনি যথানুকূল নাটকের প্রারম্ভিক অবস্থা থেকে অন্তিম পর্যন্ত সংগীতের বিধিপূর্বক প্রয়োগের কথা উল্লেখিত আছে। সেখানে তৎকালীন,গায়ন-পদ্ধতি,গীত-প্রকার, গায়ক এবং বাদকের গুণ এবং অবগুণ বাদ্য-প্রকার,বাদ্য-বাদনবিধি,নৃত্য-প্রকার ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা রয়েছ। স্বর তথা শ্রুতির শাস্ত্রীয় মীমাংসা সর্বপ্রথম এই গ্রন্থেই পাওয়া যায়,সেখানে গান্ধর্ব জাতির কথা বলা হয়েছে যারা বৈদিক কাল থেকে সংগীত কলায় বিশারদ ছিলেন। গান্ধর্ব এমন এক সংগীত যার শাখা হলো বীণা এবং বাঁশি। গান্ধর্বের তিন অঙ্গ -স্বর, তাল এবং পদ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। ২৮ থেকে ৩৩ অধ্যায় পর্যন্ত ভরত যে বিষয়গুলি আলোচনা করেছেন সেগুলি হল -যন্ত্রানুসঙ্গীতবিধি, ততবাদ্য, সুষির বাদ্য, তালব্যঞ্জক, ধ্রুবাবিধান, অবনদ্ধ বাদ্য। সংগীত এবং বাদ্যের প্রয়োগের সাম্যতা বজায় রেখে 'অলাতচক্রের' কথাও নির্দেশিত হয়েছে,যার অর্থ প্রজ্বলিত কয়লা। 'অলাতচক্র' যেমন উজ্জ্বল,গান প্রভৃতি তেমন উজ্জ্বল হবে,যাতে নাট্যানুষ্ঠান শোভামন্ডিত হতে পারে। তাই সংগীত যে নাটকে মহত্তপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে তা আচার্য ভরত বুঝেছিলেন এবং সংগীতকে বিধিপূর্বক ব্যাখ্যা করেছেন। অধুনা আমরা যেসব নাটক মঞ্চস্থ হতে দেখি সেখানে সংগীতের ব্যবহার যে ভরত নাট্যশাস্ত্র থেকেই অনুপ্রাণিত তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আর সংগীতের প্রয়োগ যখন সংগীততত্ত্বের সহায়তায় করা যায় তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি ভাবে যুক্ত হয়।আলোচ্য প্রবন্ধে নাট্যপ্রয়োগে ভাব তথা রসের সঞ্চার ঘটায় এমন গীত ও বাদ্যের স্বরাত্মক এবং তালাত্মক প্রয়োগবিধির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

সূচক শব্দ: নাট্যশাস্ত্র, সংগীত, স্বরগত, তালগত,বাদনবিধি,গায়নপদ্ধতি।

মূল আলোচনা:

সৃষ্টির বহু পূর্ব থেকেই সংগীতের উপকরণ পৃথিবীতে উপস্থিত ছিল। পাখির সুমিষ্ট সুর, বাতাসের শন্ শন্ শব্দ, স্রোতস্বিনীর কল কল ধ্বনি ইত্যাদির মধ্যেই ছিল সংগীতের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত অর্থাৎ প্রকৃতির স্তরে স্তরে সংগীত ছিল পরিব্যাপ্ত। প্রকৃতির নিয়মে আদিম মানব যখন গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে বাঁচতে শিখলো তখন তারা নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান করত নানা প্রকার অদ্ভূত শব্দ এবং অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে। এই অঙ্গভঙ্গিই পরবর্তীকালে রূপ নেয় নৃত্যের। ক্রমবিবর্ত্তনে এই অদ্ভুত শব্দ রূপান্তরিত হলো ভাষায়, কিন্তু ভাষা মানুষের অন্তরতম অন্তঃস্থলে শাশ্বত আবেগকে অপরের নিকট উপস্থাপিত করতে অসমর্থ। তাই মানুষ অন্তরের বেদনা ও আনন্দ কে প্রকাশ করতে আশ্রয় নিল সুরের, ফলে কণ্ঠে আসলো গীত। প্রাকৃতিক ঝড়-ঝঞ্ঝা দাবানল প্লাবন ইত্যাদির কাছে বারবার পরাজিত হয়ে মানুষের মধ্যে জন্ম নিল ভয়।আর সেই শক্তিকে শান্ত করতে প্রয়োজন হল বন্দনা, পূজা পাঠ যা পরবর্তীকালে রূপ নেয় স্তব এবং স্তোত্রের।আদিম মানুষের জীবিকা ছিল শিকার। ফলে তারা শিখলো চামড়ার ব্যবহার। দলভুক্ত মানুষকে একত্রে করবার জন্য চামড়ার আচ্ছাদন দ্বারা তৈরি করল ড্রাম জাতীয় এক বাদ্যযন্ত্র। এর ফলে জন্ম নিলো অবনদ্ধ বাদ্যযন্ত্র। এছাড়া ধনুকের ছিলা বা জ্যা হিসেবে ব্যবহার করা হতো পশুর তন্তু বা শিরা।যা বর্তমানে ব্যবহৃত কিছু তন্ত্র বাদ্যযন্ত্রের উৎস।সুতরাং বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে বর্তমানে আমাদের কণ্ঠসঙ্গীত, অবনদ্ধ যন্ত্র, তন্ত্রবাদ্য এবং নৃত্য আজকের অবস্থায় পৌঁছেছে। তাই বলা হয়– "গীতং বাদ্যং নর্ত্তনঞ্চ ত্রয়ঃ সঙ্গীতমুচ্যতে"।[1] সংস্কৃত অভিধানে 'সংগীত' শব্দটির দ্বারা গীত, বাদ্য -নৃত্য তিন কলা কেই বুঝিয়ে থাকে।

সম্ পূর্বক গৈ ধাতুর ক্ত প্রত্যয় করে সংগীত শব্দ নিষ্পন্ন।, 'সম্যক্ গীয়তে ইতি সঙ্গীতম্'।রসাত্মক স্বর যা শুনে প্রাণীকুল আনন্দে বিভোর হয়। ভারতীয় সংগীতে প্রাচীন পরম্পরা অনুসারে সামবেদই হল সর্বপ্রকার সংগীতের উৎস। আমরা জানি ঋক মন্ত্র সুরে লীলায়িত করে গান করা হতো। উদাত্ত,অনুদাত্ত, স্বরিত এই তিন স্বরের প্রয়োগ আমরা সামবেদ থেকেই পেয়ে থাকি। ক্রমশ স্বরের বিস্তার হয়েছে পরে সামগান সপ্তস্বরে পরিবর্তিত হয়েছে।'পাণিনি শিক্ষা ' ও 'নারদীয় শিক্ষা' তে পাওয়া যায়-

উদাত্তে নিষাদ গান্ধারৌ অনুদাত্ত ঋষভধৈবতো।
স্বরিত প্রভবা হ্যেতে ষড়জমধ্যমপঞ্চমা।।

অর্থাৎ উদাত্ত- নিগা, অনুদাত্ত -রেগা স্বরিত-সা মা পা। [2]

সংগীতের জন্ম বৃত্তান্ত সম্পর্কে বিভিন্ন গুণীজনের বিভিন্ন মত রয়েছে। অনেকের ধারণা সংগীতের সৃষ্টি মহাদেব থেকে। মহাদেব তার পঞ্চশিষ্য-ভরত, রম্ভা, হুহু ও তুম্বরু মুনিকে তিনি প্রথম সঙ্গীত শিক্ষা দেন। পরবর্তীকালে ভরত সংগীত প্রচার করেন। আনুমানিক পঞ্চম শতাব্দীতে ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থটি রচনা করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য তৎকালে নাটকের সঙ্গে জড়িত অভিনেতাদেরই 'ভরত' বলা হত।কোনো

কোনো পণ্ডিতের মতে, ভ,র,ত অর্থাৎ ভাব, রাগ, এবং তাল। এ প্রসঙ্গে পি.ভি. কানে মহাশয় বলেছেন তৎকালে ভরত বা ভরতশাস্ত্র শব্দে নাট্য, নৃত্য এবং সংশ্লিষ্ট বিষয় সংক্রান্ত গ্রন্থ সমূহ কেই বোঝাতো।[3] পরবর্তীকালে ভরত কে অনুসরণ করে কিছু শাস্ত্রীয় সংগীত গ্রন্থ রচিত হয়।যেমন- মতঙ্গমুনিকৃত 'বৃহদ্দেশী',নারদকৃত। 'নারদীয় শিক্ষা', দত্তিল বিরচিত 'দত্তিলম্' শারঙ্গদেব রচিত 'সঙ্গীতরত্নাকর'।এছাড়াও 'সংগীত দামোদর' ও 'সংগীত পারিজাত' গ্রন্থ দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।

ভরত রচিত সমগ্র নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থটি ছিল সর্ববিধ কলার উৎসভূমি। নাট্য বিষয়ক আলোচনা মুখ্যত স্থান পেলেও ৩৬ টি অধ্যায়ের মধ্যে ২৮ থেকে ৩৩ অধ্যায় পর্যন্ত সংগীত বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। আচার্য ভরত মনে করেন নাটকে যিনি প্রযোক্তা তাকে সর্বপ্রথম সংগীতের জন্য পরিশ্রম করতে হবে। তিনি সংগীত কে নাটকের শয্যা বলেছেন। নাটকে গীত এবং বাদ্যের সম্পর্ক ভালো হলে কোন বিপত্তি থাকে না।[4] বর্তমানে পৃষ্ঠ সঙ্গীত বা ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক সাধারণত নাটক, সিনেমা, গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য ইত্যাদি অনুষ্ঠানে প্রয়োগ হয়ে থাকে। পরিবেশ ও অবস্থার গুরুত্বকে প্রাণবন্ত এবং সুপ্তির কোলে ঢলে পড়া চিন্তা কে জাগ্রত করে শিল্প জগতের এক চরম অনুভূতিলোকে আমাদের পৌঁছে দিতে নেপথ্যে সঙ্গীত এক বিশেষ উৎকর্ষতার সাক্ষ্য বহন করে। অভিনেতা-অভিনেত্রীর সংলাপে, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে, ভয়, দ্বিধাদ্বন্দ্বে,আনন্দ, বিষাদ, শোক ইত্যাদি বহু প্রকার পরিবেশে নানা বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে শিল্পচাতুর্যের এক অভিনব প্রকাশ ঘটে। আলোচ্য প্রবন্ধে ভরত নাটকে ব্যবহৃত সংগীতকে যে বিধিপূর্বক ব্যাখ্যা করেছেন তার উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

আমরা জানি মধুর আওয়াজেরই অপর নাম 'নাদ' যা সংগীতের মূল উৎস। নাদ শব্দ 'ন'এবং 'দ' এর সংযোগে হয়। এর অর্থ অব্যক্ত ধ্বনি। শাস্ত্রে 'ন' কে প্রাণবীজ এবং 'দ' কে অগ্নিবীজ বলা হয়। 'প্রাণ' এবং 'অগ্নির' সংযোগে নাদের উৎপত্তি।[5] নাদ থেকেই শ্রুতির উৎপত্তি। 'শ্রুতি' কথাটি 'শ্রুত' শব্দ থেকে উদ্ভূত অর্থাৎ আমরা যা শুনে থাকি তাই হল 'শ্রুতি'।শারঙ্গদেবের মতে বায়ুর কম্পন হেতু যে সমস্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ নাদ আমাদের শ্রুতিগোচর হয় তাকে শ্রুতি বলা হয়।সুতরাং 'শ্রুতি'র সাঙ্গীতিক অর্থ হল - প্রাচীন গুণীগন অসংখ্য নাদ থেকে যে ২২টি নাদকে নিয়ে স্বরসপ্তক রচনা করেছেন সেগুলো আমরা শুনে থাকি এবং একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করতে পারি। সঙ্গীতশাস্ত্রকারদের মতে ২২ টি শ্রুতি হলো -তীব্রা, কুমদ্বতী, ছন্দোপবতী, দয়াবতী, রঞ্জনী, রক্তিকা, রৌদ্রীকা, ক্রৌধী, বজ্রিকা , প্রসারিণী, প্রীতি, মার্জনী,ক্ষিতি, রক্তা, সংদীপনী, আলাপিনী, মদন্তী, রোহিণী, রম্যা, উগ্রা এবং ক্ষোভিনী।[6] নাট্যশাস্ত্রে ভরত মুনি স্বর স্থাপনার্থে এই ২২ টি শ্রুতিকে এক একটি সপ্তকে ব্যবহার করেছেন।

স্বর শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো শব্দ। কিন্তু সাংগীতিক পরিভাষায় তার অর্থ ভিন্ন। শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে বস্তু নিজেই শোভা পায় তাই স্বর। শ্রুতি

সমূহের অব্যবহিত পরেই যে মধুর রসাত্মক স্বর লহরী অনুরণিত হয়, মনের মাধুর্য্যকে এক অনির্বচনীয় নান্দনিক সুরসুধায় আপ্লুত করে নিরবিচ্ছিন্ন সুধারসে সঞ্চিত করতে সমর্থ্য, গুণীজন তাকেই স্বর নামে আখ্যায়িত করেছেন। এই স্বরকে নাট্যশাস্ত্রে বিভিন্ন দিক দিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নাট্যশাস্ত্রে যে 'গান্ধর্বজাতি'র কথা বলা হয়েছে তারা মূলত তিনটি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে সঙ্গীত রচনা ও পরিবেশন করতেন। স্বর,পদ,তাল এই ত্রিবিধ অঙ্গই হল সঙ্গীতের মূল।গান্ধর্ব জাতি বিধিবদ্ধভাবে, স্তোত্র জ্ঞানে ঈশ্বরের উপাসনা করতেন।তারা ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী এবং কলাতত্ত্বের জ্ঞানও ছিল অপরিসীম।তাই ভরত গান্ধর্বের লক্ষণে বলেছেন -

অত্যর্থমিষ্টং দেবানাং তথা প্রীতিকরং পুনঃ
গান্ধর্বানামিদং,যস্মাত্ তস্মাদ্ গান্ধর্বমুচ্যতে।। [7]

ভরত স্বরের দুটি মূলের কথা বলেছেন -
কণ্ঠ এবং বীণা। স্বর, গ্রাম, মূর্ছনা, তাল, স্থান, বৃত্তি, বর্ণ, অলংকার, ধাতু, শ্রুতি এবং বিধিস্বর গঠিত জাতি কাষ্ঠ বীণায় ও কণ্ঠবীণায় থাকে।
ভরত নাট্যশাস্ত্রে যে সপ্তস্বরের কথা বলেছেন তা হলো-

ষড় জশ্চ ঋষভশ্চৈব গান্ধারো মধ্যমস্তথা
পঞ্চমো ধৈবতশ্চৈব নিষাদঃ সপ্ত চ স্বরাঃ। [8]

অর্থাৎ ষড়জ (সা), ঋষভ(রে), গান্ধার(গা),মধ্যম(মা), পঞ্চম(পা),ধৈবত(ধা)ও নিষাদ (নি)।
এই সাতটি স্বরকে বলা হয় সপ্তক।
'সংগীত দর্পণ' প্রণেতা দামোদর পণ্ডিত সপ্তস্বর সম্পর্কে বলেছেন –

ময়ূরচাতকচ্ছাগক্রৌঞ্চকোকিলদর্দুরাঃ
গজেশ্চ সপ্ত ষড় জাদীনক্রমাদুচ্চারয়ন্ত্যমী। [9]

নাদস্থানের পরিপূরক শব্দই হলো সপ্তক। তাদের উঁচু-নীচুর উপর ভিত্তি করেই সপ্তকের জন্ম। যে নাদ স্বাভাবিক আওয়াজ থেকে নীচুতে অবস্থিত তাকে 'মন্দ্র নাদ স্থান' বা 'মন্দ্র সপ্তক' এবং যে নাদের আওয়াজ স্বাভাবিক অর্থাৎ বেশি নীচু বা উঁচু নয় তাকে 'মধ্য নাদ' স্থান বা 'মধ্য সপ্তক' অপরপক্ষে যে নাদের আওয়াজ স্বাভাবিক অপেক্ষা উঁচু তাকে 'তার- নাদস্থান 'বা 'তার সপ্তক' বলা হয়। এছাড়াও স্বরের আরো দুটি প্রকার রয়েছে -শুদ্ধস্বর ও বিকৃত স্বর। সা রে গা মা পা ধা নি এই সাত স্বর যখন নিজের স্থানে অবস্থিত থাকে তখন তাকে শুদ্ধ স্বর বলা হয়। রে গা মা ধা নি এই স্বর গুলি যখন নিজের স্থান থেকে উঁচুতে কিংবা নীচুতে সরে যায় তখন তাকে বিকৃত স্বর বলা হয়।

নাট্যশাস্ত্রে ভরত শ্রুতি গুলিকে এক একটি সপ্তকে দেখিয়েছেন যাকে গ্রাম বলা হয়।তিনি গ্রাম বলতে বুঝিয়েছেন গ্রামে যেমন সমস্ত মানুষ একত্রে বসবাস করে তেমনি শ্রুতি ব্যবস্থা রূপে স্বর, গ্রাম, মূর্চ্ছনা, তান, বর্ণ, ক্রম, অলংকার ইত্যাদিও

একত্রে মিলে বসবাস করে। গ্রাম হলো সুরের সম্ভার। নাট্যশাস্ত্রে দুটি গ্রামের কথা উল্লিখিত আছে ষড়জ গ্রাম ও মধ্যমগ্রাম।ষড়জ গ্রামে শ্রুতি গুলি হল- ষড়জ (চার) ঋষভ(তিন) গান্ধার (দুই) মধ্যম (চার) পঞ্চম (চার) ধৈবত(তিন) এবং নিষাদ(দুই)। আবার মধ্যমগ্রামে -মধ্যম(চার) পঞ্চম (তিন) ধৈবত(চার) নিষাদ (দুই) ষড়জ (চার) ঋষভ (তিন) এবং গান্ধার (দুই)। এইভাবে দুই গ্রামে ২২ টি শ্রুতির পারস্পরিক অন্তর দেখানো হয়েছে। [10]

ভরত স্বরের আন্তরিক সম্বন্ধে চার প্রকার মেনেছেন -বাদী, সাংবাদী, অনুবাদী এবং বিবাদী। বাদী স্বরকে রাগের প্রাণস্বর বা রাজা স্বর বলা হয়। রাগের অভিব্যঞ্জনার জন্য সপ্তস্বরে মহত্ত্বপূর্ণ স্বর এটি। বাদী অপেক্ষা কম প্রয়োগ করা হয় যে স্বর তাকে সংবাদী স্বর বলা হয। একে মন্ত্রীর সাথে তুলনা করা হয়েছে। রাগে ব্যবহৃত বাদী এবং সংবাদী ব্যতীত বাকি যে সকল স্বর প্রয়োগ হয় তাকে অনুবাদী স্বর বলা হয়। এই স্বর হল প্রজাতুল্য। যে রাগের সঙ্গে বিবাদ আছে তাকে বিবাদী স্বর বলা হয়। যার উপমা শত্রু দেওয়া হয়েছে। [11]

শুদ্ধ ও বিকৃত এই ১২ টি স্বর মিলে যে ঠাট উৎপন্ন হয় তার উৎস হল মূর্চ্ছনা বা স্কেল। মূর্চ্ছনার সৃষ্টি হয়েছিল সা থেকে নি এই সপ্তস্বরের স্থানান্তরণ থেকে থেকে। সা থেকে নি অথবা ধা অথবা পা এভাবে চলতে থাকবে। তবে ভরতের মূর্চ্ছনা সব সময় অবরোহী যেখানে সপ্তক থাকতো। ভরত তার নাট্যশাস্ত্রে ষড়জগ্রামে ও মধ্যমগ্রামে ৭টি করে মোট ১৪ টি মূর্ছনা দেখিয়েছেন। সেগুলি হল -উত্তরমন্দ্রা, রজনী, উত্তরায়তা, শুদ্ধ ষড় জা, মৎসরীকৃতা, অশ্বক্রান্তা, অভিরুদ্ গতা, সৌবিরী, হরিণাশ্বা, কলোপনতা, শুদ্ধমধ্যা, মার্গধী, পৌরবী ও হৃষ্যকা। [12]

গীত সমূহ পরিবেশন কালে শাস্ত্রীয় বিশেষ কয়েকটি বিধিবদ্ধতা সংরক্ষিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয় বলে গণ্য হতো। গীত ক্রিয়ার কালে গ্রহ, অংশ, ন্যাস,অপন্যাস, অল্পত্ব, বহুত্ব,ষাড়বত্ব,ঔড়বত্ব, মন্দ্র ও তার এই দশ প্রকার জাতির কথা উল্লেখ আছে। গ্রহ হল সকল জাতির অংশ স্বরূপ।গানের শুরুতে যে স্বর গৃহীত হয় তার নাম গ্রহ এবং অংশের বিকল্প। প্রথম পঞ্চস্বরের উপরে নির্ভরশীল তার গতি। অল্পত্ব হলো স্বরলঙ্ঘন এবং বহুত্ব তার বিপরীত। গানের উপসংহারে ন্যাস হবে এবং গানের মধ্যবর্তী অপন্যাস। মন্দ্রগতি ত্রিবিধ- নিম্ন গ্রাম অংশের উপর ন্যাসের উপর এবং অপন্যাসের উপর নির্ভরশীল। ষাড়ব(৬ স্বরযুক্ত) ও ঔড়ব(৫ স্বরযুক্ত)।

ব্যঞ্জনবর্ণ, স্বরবর্ণ, সন্ধি বিভক্ত, নাম (বিশেষ্য), আখ্যাত (ক্রিয়া) উপসর্গ, নিপাত, তদ্ধিত, বর্ণবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, সর্বদাই সংগীতের পদের সঙ্গে যুক্ত থাকে।এই পদ দ্বিবিধ- নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ।তালে আবদ্ধ করে যে গান করা হয় তাকে নিবদ্ধ গান বলা হয়। যেমন বর্তমানে খেয়াল, ধ্রুপদ, ধামার, ভজন ইত্যাদি সংগীত এবং তালে আবদ্ধ না করে যে গান আলাপের মাধ্যমে করা হয় তাকে অনিবদ্ধ গান বলা হয়। 'আলাপ্তিগান' অর্থাৎ আলাপের এক প্রকার, যা সেতারের গৎ বাজাবার পূর্বে বা আলাপে

রাগরূপ পরিস্ফুট করাকে অনিবদ্ধ গান বলা হয়।এই সমস্ত পদ ছন্দকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। গান অথবা পদ যখন লয় ও বর্ণ যুক্ত হয় তখন তাকে গীতি বলা হয়। এই গীতির আলাদা ভাগ রয়েছে যেগুলোকে কণ্ডিকা বলা হয়। ভরতের মতানুসারে এটাই ছিল শিবের তাণ্ডব নৃত্যের উৎস। কিছু গীতি নাট্যশাস্ত্রের পূর্বেই বিদ্যমান ছিল যা ধ্রুবা নামে পরিচিত ছিল। এই ধ্রুবা গানে সঠিকভাবে স্বর,পদ এবং তালের ভারসাম্য বজায় রাখা হতো। বিভিন্ন অবস্থার উপর নির্ভর করে ধ্রুবাগান কে পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছিল -প্রবেশ, আক্ষেপ, নিষ্কাম, প্রাসাদিক, এবং আন্তর।এদের মধ্যে ধ্রুবাগান কে যখন নাটকের দৃশ্যের প্রথমে ব্যবহার করা হত তখন তাকে প্রাবেশিকি,আর নাট্য প্রযোক্তার দ্বারা ধ্রুবাগানের ক্রম ত্যাগ করে দ্রুতলয়ের যে গান নাটকে প্রয়োগ করা হয় তাকে আক্ষেপিকি বলা হয়।কোন অংকের সমাপ্তি তে পাত্রের নিষ্ক্রমণ সময়ের গান হল নৈষ্ক্রামিকী।আকস্মিক দুর্ঘটনার পর দ্রুত গীতরূপে প্রস্তুত হয়ে রসান্তরকে আক্ষেপ বা সংকেতের দ্বারা সরিয়ে রঙ্গস্থ প্রেক্ষকদের চিত্তে আনন্দ দান করে যা তাই হল প্রাসাদীকি।এবং বিভিন্ন পাত্রের বিষন্ন কালে, বিস্মৃতকালে, মুর্ছিত কালে, বস্ত্র অলংকার ধারণকালে প্রভৃতি দোষের আচ্ছাদন করতে যে ধ্রুবাগান হয় তাকে অন্তরা বলা হয়।[13] ধ্রুবা গান ছিল উচ্চতর কাব্যিক বিষয়বস্তু যা নাটকের মুহূর্তকে তৎক্ষনাৎ পরিবর্তিত করতো। রস ও ছন্দ অনুযায়ী ধ্রুবাগান কে শ্রেণীবিভাগ করা হয়। ধ্রুবাগীতিতে মৃদঙ্গ অথবা পুষ্কর, বীণা, তাল, লয় যতি, পানি ইত্যাদি পরস্পর ভাবে যুক্ত ছিল। ধ্রুবার ভাষা ছিল কখনো শৌরসেনী কখনো মাগধী।তবে দিব্য চরিত্রের পক্ষে সংস্কৃত গান বিহিত ছিল।

সংগীতের মাধ্যম নাদ হলেও, নাদই সংগীতের জনক নয়,ব্যক্তি যত মধুর স্বরেই নাদকে সৃষ্ট করুক না কেন তা একাই সংগীত সৃষ্টি করতে পারে না, এক বিশেষ রূপ আকারের দ্বারা সংগীত সৃষ্টি হয়। যেমন নৃত্যে অঙ্গহারাদি প্রাধান্য পায়, তেমনি গীত এবং বাদ্যের সাথেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে।

ভরতমুনি বাদ্যের নিয়মাবলী ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রথমেই বলেছেন - আতোদ্যবিধিমিদানীং বক্ষ্যামঃ-(আ+তুদ্+ব্যত্,স্বার্থে কন্ চ) আতদ্য শব্দের ব্যুৎপত্তি "আ তুদ্যতে ইতি আতুদ্যম্" অর্থাৎ(বদ্ + ণিচ্ +যত্) =বাদ্য।আতোদ্য বা বাদ্যের মুখ্য কার্য ধ্বনি বা নাদ উৎপন্ন করা।[14] ভরতমুনির মতে আতোদ্য চার প্রকার- তত, অবনদ্ধ,ঘন এবং সুষির।তত বাদ্যে তার থাকে বীণা জাতীয় বাদ্যে তারের মাধ্যমে সুরের সৃষ্টি হয়।ভরত তার গ্রন্থে দুটি বীণার কথা উল্লেখ করেছেন সপ্ততন্ত্রী 'চিত্রা' এবং নবতন্ত্রী 'বিপঞ্চী'।অঙ্গুলীর দ্বারা চিত্রা বাজানোর বিধান রয়েছে এবং ধাতু দ্বারা তৈরি 'কোণ' নামে উপকরণ দ্বারা অঙ্গুলিতে ধারণ করে বিপঞ্চী বাজানোর বর্ণনা রয়েছে।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বীণাতে যে অলংকার গুলি ব্যবহৃত হয়, সেগুলি হল 'ধাতু'। বাদনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া গুলিকে ধাতু বলা হয়। সেখানে হস্ত এবং অঙ্গুলির বিভিন্ন নিয়মাবলী আলোচিত হয়েছে। আর চারিদিকে চামড়া দিয়ে মোড়ানো পুষ্কর বাদ্যকে অবনদ্ধ বলা

হয়। মেঘের অনুকরণে বাজানো হয় বলে একে 'পৌষ্কর' বলা হয়।'সংগীত পারিজাত' গ্রন্থে অবনদ্ধ বাদ্যের মধ্যে মৃদঙ্গ, দুন্দুভী, ভেরী, ডমরু, ইত্যাদিকে মুখ্য মেনেছেন। শারঙ্গদেব মর্দল,,কুডুক্কা প্রভৃতি বাদ্যের কথা বলেছেন।এছাড়া বিভিন্ন প্রকার ধ্রুবাগানে ঢাকবাদ্যের প্রকার আলোচিত হয়েছে। তালোপযোগী মঞ্জিরা বাজানো হয় যে বাদ্যের দ্বারা তাকে বলা হয় ঘন।তালের সমতা বজায় রাখার জন্য এই বাদ্য বাজানো হয়। কাঁসার দ্বারা নির্মিত ঘন্টা,ঘড়িয়াল, ঝাঁঝর ইত্যাদি বাদ্য তাল দেওয়ার অনুপম প্রমাণ বলে মানা হয়। যে স্বর এবং বর্ণের উৎপাদক হয়, তাকে তাল বলা হয়। বাঁশি বাজানো হয় যে বাদ্যের দ্বারা তাকে 'সুষির' বলা হয়। ছিদ্রযুক্ত বাদ্যই হলো সুষির। যেমন বেণু, বাঁশি, সানাই, সুন্দরী, হারমোনিয়াম ইত্যাদি। ভরতের এই পরিভাষা সনৎ কুমার ও মান্যতা দিয়েছেন। এই চার প্রকার বাদ্য ভেদের মধ্যে তত আর সুষির স্বরবাদ্য এবং ঘন আর অবনদ্ধ লয় বাদ্য।নাটকের রস ভাব দেখেই বাদ্যের উপযোগ করা হতো, ভরত নাটকে এই বাদ্যগুলির ত্রিবিধ প্রয়োগের কথা বলেছেন। কখনো কেবল তত এবং সুষির বাদ্যের প্রয়োগ হতো যাকে ততবাদ্যের কুতপ বা অর্কেস্ট্রা বলা হত। এখানে গায়ক মন্ডলী ছাড়াও বিপঞ্চী বীণা এবং বাঁশির প্রয়োগ ছিল।কোথাও কেবল অবনদ্ধ বাদ্যের কুতপের প্রয়োগ আছে। যার মধ্যে অন্তর্গত মৃদঙ্গ, পণব (ঢোল জাতীয় বাদ্য) এবং দর্দুর (কলসী জাতীয় বাদ্য)।এছাড়াও উত্তম-মধ্যম এবং অধম কোটির পাত্রের প্রকৃতি এবং মঞ্চ স্থিতির অনুকূল সমস্ত প্রকারের বাদ্যের সম্মিলিত কুতপের প্রয়োগ করা হতো। একে নাট্যকৃত বা নাট্য যোগ বলা হয়। ঘনবদ্ধ গীত বাদ্যে প্রয়োগ হতো। যেমন ভারতমুনি বলেছেন এই প্রকার বিভিন্ন আশ্রয়ের গান বাদ্য এবং নাট্য বা অভিনয় 'অলাতচক্রের' ন্যায় করবেন। এ প্রসঙ্গে অভিনব গুপ্ত ব্যাখ্যা করেছেন গান, বাদ্য তথা অভিনয় এই তিন সমূহ 'একীভাব'।অন্যেরা গীত বাদ্যবিহীন প্রয়োগে দশ রূপকের সিদ্ধি মানেন কিন্তু তা তো নাট্যের অপরিপূর্ণতা। গান, বাদ্য এবং অভিনয়ে সর্বানুগ্রাহী স্বরূপই ভরত মুনির নাট্য স্বরূপের পরিপূর্ণতা।

মহর্ষি ভরত ও অন্যান্য শাস্ত্রকারগণ মনে করেন মাত্রাবদ্ধ করে যতক্ষণ গানের অবয়ব বা সন্দর্ভ রচিত না হয় ততক্ষণ সংগীতের যথার্থ রূপ প্রতিষ্ঠা পেতে পারেনা। আর এই মাত্রাবদ্ধ তাল বিভিন্ন ছন্দে ছন্দায়িত হয়ে তার পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়।ভরতমুনি বলেন তাল হল 'কালকে' ধারণ করার বিধি এবং সংগীতকর্মে প্রযুক্ত 'কাল-মান' লৌকিক 'কাল- মান' থেকে পৃথক। 'অমরকোষ- গ্রন্থে লৌকিক ব্যবহারের জন্য ১৮ নিমেষে এক কাষ্ঠা এবং ৩০ কাষ্ঠাতে এক 'কলা' বলা হয়েছে যা বিভিন্ন মতে ৪৮ সেকেন্ড অথবা এক মিনিটের সমতুল্য। এইজন্যে ভরতমুনি বলেছেন পাঁচ নিমেষ পর্যন্ত সময়ের গান কালকে একমাত্রা এবং 'মাত্রা' গুলির যোগে 'কলা' গুলির উদ্ভব হয়। যারা সংগীতানুষ্ঠানে তাল প্রয়োগ করেন তারা 'কলা' শব্দে বুঝবেন 'তাল'। তারপর কলাকালের দ্বারা হয় লয়। এই লয় ত্রিবিধ -দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত। এগুলির মধ্যে 'লয়' প্রমাণ 'কলা' নির্ধারণ করে।এটি ত্রিবিধ বলে জ্ঞেয় এবং প্রাজ্ঞজনের মতে

তিন মার্গ দ্বারা নির্ধারিত হয়। চিত্র বৃত্তিতে তিন মাত্রা, বৃত্তিতে তার দ্বিগুণ, দক্ষিণে চারগুণ এই বিবিধ কলা, গানকে কলায় ভাগ করলে পরিমাণ হয় বলে তাল এই নামে অভিহিত। তাল দ্বিবিধ -চতুরস্র ও ত্র্যস্র।এদের দ্বিবিধ উৎস আছে -'চঞ্চৎপুট' ও 'চাপুট'। এদের প্রত্যেকটি থেকে চতুষ্কল বা দ্বিকল তাল জন্মে।চঞ্চৎপুট 'চতুরস্র' এবং 'চাপুট' ত্র্যস্র্য বলে জ্ঞেয়।[15] ভরত মুনি মৃদঙ্গের তাল, লয় এবং বোলের কিছু পদ্ধতি বলেছে। চঞ্চৎপুট-৮ মাত্রা,চাপুট-৬ মাত্রা,এবং পঞ্চপাণি- মিশ্র ৮ + ৬ মাত্রা উদ্ঘট।এই মাত্রা গুলি আবার লঘু, গুরু প্লুত নামে আখ্যায়িত। সুতরাং সংগীতে তাল অনিবার্য্য ও অপরিহার্য্য।কারণ তালের জ্ঞান ছাড়া, কোন ব্যক্তিই ভালো গায়ক ও বাদক হতে পারে না। ভরতের মতে গায়ক হবেন যুবক প্রকৃতিপ্রেমিক এবং সুকণ্ঠযুক্ত। লয়, তাল,কলা তাদের পরিমাণ এবং প্রয়োগ সম্পর্কে তিনি হবেন সম্পূর্ণভাবে অভিজ্ঞ এবং গায়িকা হবেন দীপ্ত বুদ্ধি মাধুর্য মিষ্ট ও মনোজ্ঞ প্রতিধ্বনি যুক্ত। এছাড়াও ভরত কণ্ঠস্বরের ষড় বিধ গুণের কথা বলেছেন,যথা- উচ্চ, ঘন, স্নিগ্ধ, মধুর, সযত্ন, তিন স্থানের(মস্তক, কন্ঠ ও বক্ষ) সঙ্গে স্পষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট। বীণাবাদক হবেন মধুর ধ্বনি উৎপাদনে ক্ষিপ্র হস্ত এবং সুগায়কের গুণযুক্ত। বংশী বাদক হবেন বলিষ্ঠ শ্বাসযুক্ত, স্থির, অবিরাম, বর্ণালঙ্কার প্রকাশক, প্রীতি জনক ও দোষাচ্ছাদক।এ প্রসঙ্গে ভরত গায়ক ও গায়িকার পাঁচটি দোষের কথাও বলেছেন -কপিল(কম্পিল), অর্থাৎ ঘরঘর শব্দ করা, অস্থির, সংদষ্ট,(দাঁতে দাঁত চেপে),কাকী(কাকের ন্যায়),ও তুম্বকী (নাকী স্বর)।এইভাবে ভরত স্বরের গুন ও দোষ সম্পর্কে সার তত্ত্ব গুলি আলোচনা করেছেন। [16]

ভরত সংগীতশাস্ত্রে দেখিয়েছেন কোন প্রকার গীতি বা গানের প্রয়োগ কোন পরিস্থিতিতে করা উচিত, কোন প্রকার স্বরযুক্ত জাতির গান রসের নিষ্পত্তি ঘটায়, কোন বাদ্যকে একক এবং সমবেতভাবে বাদন করা উচিত।পরবর্তী কালে যা স্বতন্ত্র রূপে বিকশিত হয়।ভরত রচিত নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থটিই তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ সংগীত বিষয়ক গ্রন্থ যার আধারের উপর ভিত্তি করে বর্তমানের ভারতীয় সংগীত প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বর্তমানে শাস্ত্রীয় বিধিবদ্ধ নিয়ম ও কঠিন অনুশাসন গুলি রক্ষা করে কতটা সঠিকভাবে সংগীত গাওয়া হয় সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে।তার জন্য প্রয়োজন একনিষ্ঠ সাধনা ও পরিশ্রম। সঙ্গীতের বিস্তৃতি ব্যাপক,তার নিজস্ব একটি ভাষা আছে।যার আবেদন ও ব্যাপ্তি সুদূর প্রসারী।তাই যে কোন সংগীত বা শিল্পে সত্যিকারের শিল্পী হতে গেলে সবিশেষ অনুশীলন ও অনুধাবন করা একান্ত প্রয়োজন।

তথ্যসূচী :

1. দ্রষ্টব্য সঙ্গীত তত্ত্ব (প্রথম খন্ড)- পৃষ্ঠা. ২
2. দ্রষ্টব্য 'সংগীত বিশারদ'- পৃষ্ঠা. ১৭
3. দ্রষ্টব্য 'ভরত নাট্যশাস্ত্র' (১)- পৃষ্ঠা. ১২
4 .দ্রষ্টব্য 'ভরত নাট্যশাস্ত্র' (৪)-শ্লোক নং ৪৯৩, পৃষ্ঠা ১৫৬

5. দ্রষ্টব্য 'সংগীত রত্নাকর'- পৃষ্ঠা ১০
6. শ্রুতি এবং স্বর স্থাপনা- https://sangeetclasses.blogspot.com/2
7. যেহেতু এটি দেবগনের অত্যন্ত ঈপ্সিত এবং এটি গান্ধর্ব গান কে খুব আনন্দ দান করে সেজন্য একে গান্ধর্ব বলা হয়।
8. দ্রষ্টব্য 'ভরত নাট্যশাস্ত্র'(8)-পৃষ্ঠা ৩
9. অর্থাৎ ময়ূর থেকে ষড়জ, চাতক থেকে ঋষভ, ছাগ থেকে গান্ধার, ক্রৌঞ্চ থেকে, মধ্যম, কোয়েল থেকে পঞ্চম ব্যাংঙ থেকে ধৈবত, গজ থেকে নিষাদ।
10. দ্রষ্টব্য 'ভরত নাট্যশাস্ত্র'(8) শ্লোক নং - ২৫,২৬,২৭,২৮, পৃষ্ঠা ৫, ৬
11. দ্রষ্টব্য 'সংগীত তত্ত্ব '(প্রথম খন্ড)- পৃষ্ঠা ৪০ ।
12. দ্রষ্টব্য 'ভরত নাট্যশাস্ত্র'(8)-শ্লোক নং ২৯,৩০, ৩১, ৩২, পৃষ্ঠা ৬
13. দ্রষ্টব্য ''ভরত মুনি কে নাট্যশাস্ত্র মে সংগীত তত্ত্ব'' পৃষ্ঠা. ৪৪
14. পূর্বোক্ত -পৃষ্ঠা ৪৯
15. দ্রষ্টব্য 'ভরত নাট্যশাস্ত্র' (8) পৃষ্ঠা ৪৭, ৪৮
16. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৫৭,১৫৯,১৬০

সহায়ক গ্রন্থ :

1. ভরত নাট্যশাস্ত্র (প্রথম অধ্যায়),(সম্পাদক) ডঃ সুরেশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, তৃতীয় মুদ্রণ ১৯৯৭,কলকাতা।
2. ভরত নাট্যশাস্ত্র (দ্বাত্রিংশ অধ্যায়),সম্পাদক - ডঃ সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চম মুদ্রণ ২০১8, কলকাতা।
3. সাহিত্যের ইতিবৃত্ত,অধ্যাপক ডঃ গোপেন্দু মুখোপাধ্যায়,দ্বিতীয় প্রকাশ ১৪২৬, কলকাতা।
4. ভরতমুনি কে নাট্যশাস্ত্র মে সংগীত তত্ত্ব (সংক্ষিপ্ত বিবেচন) ডঃ শীল,প্রথম সংস্করণ 2021, দিল্লী।
5. সংগীত তত্ত্ব -দেবব্রত দত্ত, পঞ্চম সংস্করণ ২০০, কলকাতা।
6. সংগীত পারিজাত (অহোবল),তৃতীয় সংস্করণ ১৯৭, সংগীত কার্যালয়, হাথরস উত্তর প্রদেশ।
7. সংগীত রত্নাকর (শারঙ্গ দেব) -ভাগ ৭, নবতম সংস্করণ, ২০২২, সংগীত কার্যালয় হাথরস, উত্তর প্রদেশ।
8. Sangeet damodarah, edited by Gourinath Sastri and Gobinda Gopal Mukhopadhyay, 1960 Kolkata .

কাশীদাসী মহাভারত : কচ ও দেবযানীর উপাখ্যান

সৌমিলি দেবনাথ
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : কাশীদাসী মহাভারতে দেবগুরু বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ পুত্র রূপে কচের পরিচয় প্রদান করা হয়েছিল। মহাভারত, মৎস্যপুরাণ এবং অগ্নিপুরাণে এই কচ চরিত্রটির বর্ণনা মেলে। ভারতীয় পুরাণে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করার মন্ত্র হিসেবে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। অসুরদের গুরু শুক্রাচার্যের কাছে বৃহস্পতি পুত্র কচ সেই সঞ্জীবনী মন্ত্র শিক্ষা করতে গিয়েছিলেন। সেখানেই কচের প্রতি দেবযানীর আকৃষ্ট হওয়া এবং পরবর্তীতে বিবাহে সম্মত না হওয়ায় কচের প্রতি দেবযানীর ক্রোধ ও শাপ। আর সবশেষে ইন্দ্রের নগরে কচের প্রত্যাবর্তন।
সূচক শব্দ : ১। বিবাদ ২। বিদ্যাশিক্ষা ৩। প্রণয়-অভিশাপ ৪। সংগ্রাম ৫। প্রত্যাবর্তন।

মূল আলোচনা :

আদি মহাভারতের কাহিনি অনুসরণে কাশীরাম দাস যে উপাখ্যানগুলি রচনা করেছিলেন, তার মধ্যে অন্যতম ছিল ‘কচ-দেবযানীর উপাখ্যান’। মহাভারতের আদি-পর্বে’র বিস্তৃত পরিসরে তিনি যে উপাখ্যানের বর্ণনা দিয়েছিলেন, সেই সম্পর্কিত বিশেষ কাব্যাংশগুলি হল এইরূপ:

(ক) চন্দ্রবংশ বৃত্তান্ত
(খ) কচ-দেবযানী চরিত
(গ) কচের সঞ্জীবনী বিদ্যালাভ
(ঘ) কচ-দেবযানীর পরস্পর শাপ

যে কাহিনির মধ্য দিয়ে কবি মধ্যযুগের বাংলাদেশের সাধারণ মানবচরিত্রের বা কাব্যশ্রোতার নিকট বিশেষ জীবনদর্শন ও তত্ত্ব-উপদেশ পরিবেশন করতে চেয়েছিলেন।

মহাভারতের বিভিন্ন ঘটনায় বহু চরিত্র, অনেক মনস্তাত্ত্বিক অনুভূতির পরিচয় মেলে। মহাভারতের মূল আখ্যানে দেখা যায় যে, কুরু-পাণ্ডবের গৃহবিবাদ ও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। এর মাঝে প্রসঙ্গক্রমে উঠে এসেছে নানান উপাখ্যান। অনেকসময় মনে হতে পারে যে, মহাভারত প্রাচীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থার গড়ে ওঠা একটি দলিল। বহুবার এখানে প্রেমের অবতারণা ঘটেছে। পাশাপাশি এসেছে বিচ্ছেদ, যুদ্ধ, নিষ্ঠুরতা, চক্রান্ত, কূটনীতি। আর প্রগাঢ় ভালোবাসায় আর্বতিত হয়েছে নর-নারীদের জীবন। সেসব প্রেমের মধ্যে রয়েছে মহাভারতের আদিপর্বে কচ ও দেবযানীর বিষয়টিও।

মহাভারতে দেবতা ও অসুরদের ক্ষমতা নিয়ে একদা উভয়ের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ দেখা দিয়েছিল। যুদ্ধে দেবতারা বৃহস্পতি এবং অসুররা শুক্রাচার্যের পৌরোহিত্য গ্রহণ করেছিল। শুক্রাচার্য জানতেন মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা। এই বিদ্যা দিয়ে মন্ত্রবলে মৃত ব্যক্তিকে পুনরায় জীবিত করে তোলা সম্ভব। ফলত দানবদের তখন সুসময়। দেবতারা যে সকল দানবকে যুদ্ধে পরাজিত করছেন, শুক্রাচার্য তাদের দেহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারছেন। দেবতারা এ সমস্যার কোনো সমাধান দেখতে পেলেন না। ফলে একে একে সকল মৃত দানবের দেহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হল। এমতাবস্থায় যুদ্ধ বেশ দুরূহ ব্যাপার হয়ে উঠল।

দেবতারা তখন সকলে মিলে বৃহস্পতিপুত্র কচের শরণাপন্ন হলেন। কচ তরুণ, সুদর্শন যুবক। শিল্পকলায় ছিলেন বিশেষ পারদর্শী। দেবতারা কচকে পরামর্শ দিলেন, শুক্রাচার্যের কাছ থেকে সঞ্জীবনী বিদ্যা রপ্ত করার। আর তাঁর কন্যা দেবযানীকে মুগ্ধ করতে পারলে বিদ্যার্জন সহজ হয়ে উঠবে। এই পরিকল্পনায় দেবতারা কচকে পাঠালেন শুক্রাচার্যের কাছে.কচ সেইমতো শুক্রাচার্যের কাছে উপস্থিত হলেন সঞ্জীবনী বিদ্যালাভের আশায়।

মহাভারতের আদি-পর্বে জন্মেজয় রাজা ভরতের বংশ কাহিনি শুনতে চেয়েছিলেন। যে 'ভরত' নাম থেকে 'ভারত' শব্দটির উৎপত্তি ঘটেছিল। সেই কাহিনির একটি অন্যতম পর্যায় ছিল 'কচ-দেবযানীর উপাখ্যান'। মহাভারতে কচের যে প্রাথমিক পরিচয় প্রদান করা হয়েছিল, তা ছিল এইরূপ- কচ ছিলেন দেবগুরু বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ পুত্র। একসময় দেবতা ও অসুরগনের মধ্যে রাজ্য নিয়ে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হয়েছিল। অসুরদের গুরু শুক্রাচার্য এক মন্ত্র জানতেন, তার বলে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত অসুরগনকে আবার পুনর্জীবিত করে দিতে পারতেন। কিন্তু বৃহস্পতি এইরূপ কোনো মন্ত্র জানতেন না। দেবতাদের অনুরোধে বৃহস্পতি পুত্র কচ ওই বিদ্যা শেখার জন্য শুক্রাচার্যের শিষ্য হন এবং সঞ্জীবনী বিদ্যার্জনের অনুরোধ জানান। কচ বলেন-

"অঙ্গিরার পৌত্র আমি জীবের নন্দন।
পড়িবারে আইলাম তোমার সদন।।
এত শুনি শুক্র তাঁরে দিলেন আশ্বাস।
পড়াব সকল শাস্ত্র যেই অভিলাষ।।"[১]

ব্রাহ্মণের পুত্র শিষ্যত্ব কামনা করছেন, তাই অপর ব্রাহ্মণ তা প্রত্যাখ্যান করলেন না। ফলে, শুক্রাচার্য কচকে শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করলেন। কচের বিদ্যাশিক্ষা শুরু হলো শুক্রাচার্যের কাছ থেকে। সঞ্জীবনী বিদ্যালাভের কারণে কচ শুক্রাচার্যের কুটিরে অবস্থান করতে শুরু করেন। এরপর শুরু হয় কচ-দেবযানীর সম্পর্ক ও সংঘাতের কাহিনি।

অন্যদিকে দেবযানী ছিলেন অসুর গুরু শুক্রাচার্যের কন্যা। প্রকৃতপক্ষে দেবযানী ছিলেন উর্জস্বতী গর্ভজাত। শুক্রাচার্যের গৃহে তিনি পালিতা হয়েছিলেন। কচ সঞ্জীবনী বিদ্যাশিক্ষালাভে শুক্রাচার্যের গৃহে আশ্রয় নিলে দেবযানী নানা প্রকারে কচের সেবা করতে করতে প্রেমাসক্ত হয়ে পরেন। কচের সঞ্জীবনী বিদ্যার্জনের সংবাদ যায়

অসুরদের মধ্যে। তাই তারা বারবার কচকে আক্রমণ করেছিল তাকে হত্যা করার জন্য। কিন্তু দেবযানীর কারণে তারা কচের কোনো অনিষ্ট সাধন করতে পারেনি। কচের বিদ্যাশিক্ষা দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলতে থাকে।

কিন্তু এদিকে দেবযানীর মন কচের প্রতি ক্রমশ দুর্বল হতে থাকে। নির্জন বনপ্রান্তর এই দুই নর-নারীর যৌথ সংগীতে কখনো কখনো প্লাবিত হতো। কচ বনের সবচেয়ে সুন্দর ফুলটি তুলে নিয়ে আসতেন দেবযানীর জন্য। এভাবে অতিক্রম করল প্রায় পাঁচশো বছর। কচ ধীরে ধীরে দানবদের ক্রোষানলে পরতে শুরু করলেন। দানবরা এবারে কচের এখানে আসার আসল কারণ অনুমান করতে পারল। কচ একবার এই সঞ্জীবনীবিদ্যা শিখে গেলে দানবদের আধিপত্য আর টিকবে না। তাই, কচকে মেরে ফেলাই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য। কচের উপর শুক্রাচার্যের গাভীদের দেখাশোনা করার ভার ছিল। একদিন বিকেলে, কচ বনে গরু চরানোর কাজে ব্যস্ত। সেই সুযোগে দানবেরা কচকে মেরে ফেলে, তার মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করে কেটে কুকুরকে খাইয়ে দিল।

যথারীতি সূর্য অস্ত গেলে গরুর দল ঘরে ফিরে এল। কচকে না দেখে দেবযানী দুশ্চিন্তা করতে শুরু করলেন। পিতা শুক্রাচার্যের কাছে গিয়ে নিজের আশঙ্কার কথা জানালেন দেবযানী। দেবযানী ধারণা করতে পারছিলেন, হয়তো কচকে কোনোভাবে হত্যা করা হয়েছে। অতএব, শুক্রাচার্য সঞ্জীবনীবিদ্যা প্রয়োগ করলেন। কুকুরের শরীর ভেদ করে অক্ষত শরীরে কচ উপস্থিত হলেন। প্রাণ ফিরে পেয়ে কচ আবারও গুরুর কথা মতো চলতে লাগলেন।

অন্যদিকে, দানবেরা এত সহজে হাল ছেড়ে দিল না। এরপর একদিন দেবযানীর খোঁপার জন্য এক বিশেষ ধরণের ফুলের সংগ্রহে কচ ক্রমশ গভীর বনে এগিয়ে যেতে লাগলেন। সেখানে অসুরেরা কচকে পুনরায় হত্যা করল এবং তার হাড়-মাংস ছুঁড়ে ফেলে দিল সমুদ্রে। এবারও কন্যার করুণ আর্তিতে পিতা শুক্রাচার্য কচকে প্রাণদান করলেন।

পরপর দুইবার এরকম নিদারুণ ব্যর্থতা দানবদেরকে ভাবিয়ে তুলল। তাই এবার কচকে মেরে তার মৃতদেহের ছাই সোমরসের সঙ্গে মিশিয়ে শুক্রাচার্যকে খাইয়ে দিল দানবেরা। দেবযানী পিতার কাছে কচের প্রাণ ভিক্ষা চাইলেন আবারও। শুক্রাচার্য কন্যাকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন, মৃত ব্যক্তির জন্য বারবার বিলাপ অনর্থক। তবু দেবযানী বললেন যে, কচকে ফিরে না পেলে তিনি মৃত্যুবরণ করবেন।

'কচের সঞ্জীবনী বিদ্যালাভ' অংশে কবি কাশীরাম দাস বিদ্যালাভ বর্ণনা প্রসঙ্গে নানা উপভোগ্য অলৌকিকতার বর্ণনা দিয়েছেন। যা মধ্যযুগের সাধারণ শ্রোতার নিকট পরম উপভোগের বিষয় হয়ে ওঠে। সেই কাহিনি সংযোজনে কাশীরাম দাস ব্যাসবহির্ভূত বিষয়ের অবতারণা করে নিজ মৌলিকতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। কচ পুষ্প চয়নে কাননে গমন করলে অসুরগণ তাঁকে হত্যা করে। যাতে কচ পুনরুজ্জীবিত হতে না পারেন, তার

জন্য তিলের মত ছোট ছোট কনায় তাঁর দেহ কাটা হয়। তারপর সেই অস্থিমাংশ ঘিয়ে ভেজে মদের সঙ্গে শুক্রাচার্যকে খাইয়ে দেওয়া হয়। দেবযানী দীর্ঘকাল কচকে না দেখতে পেয়ে পিতার নিকট ক্রন্দন করেন। তখন শুক্রাচার্য ধ্যানযোগে দেখেন কচ তাঁর উদরের মধ্যে অবস্থান করছেন-

"শুক্র বলে কচ তুমি করহ বিবরণ।
আমার উদরে এলে কিসের কারণ।।"[২]

কচ উদরে থেকে শুক্রাচার্যকে সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিলেন। তখন রোষান্বিত শুক্রাচার্য কচকে উদরের মধ্যে রেখে কচকে মন্ত্র শিক্ষা দিলেন। কচও সেখান থেকে মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। সঞ্জীবনী শিক্ষাদানের শেষে কচকে মুক্তি দিতে শুক্রাচার্য নিজের পেট চিরে ফেললেন। তাতে কচের মুক্তি ঘটল। কিন্তু শুক্রাচার্যের মৃত্যু হল। কচ তাঁর গুরু প্রদত্ত সঞ্জীবনী মন্ত্র প্রয়োগ করে পুনরায় শুক্রাচার্যের জীবনদান করলেন। জীবিত শুক্রাচার্য মদের উপর রোষান্বিত হয়ে অভিশাপ দিলেন-

"ব্রাহ্মণ হইয়া যেই করে সুরাপান।
থাকুক পানের কাজ লহে যদি ঘ্রাণ।।
অধার্মিক ব্রহ্মঘাতী বলিবে সে জনে।
ব্রহ্মতেজ নষ্ট তার হইবে সেইক্ষণে।।"[৩]

এইরূপে দীর্ঘ পরিসরে মদের উপর শুক্রাচার্যের অভিশাপে মধ্যযুগের সুরাপান বিরোধী কবিমানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় কাশীরাম দাসের মধ্যে।

এর কিছুদিন পর অসুরগণ আবার কচকে বধ করেন এবং কচকে পুনরায় জীবিত করেন শুক্রাচার্য। কচের বিদ্যাশিক্ষান্তে সঞ্জীবনী বিদ্যা স্বর্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য শুক্রাচার্যের নিকট বিদায় নিতে যায় কচ। কিন্তু তখন কচ জানতে পারেন, শুক্রাচার্যকন্যা তাঁকে নানা প্রকারে সেবা করার মাধ্যমে গভীর প্রেমে অনুরক্ত হয়েছেন। দেবযানী কচকে স্বামীত্বে বরণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু দেবযানীর সনির্বন্ধ অনুরোধেও কচ তাঁকে বিবাহ করতে রাজি হননি। তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে দেবযানী কচকে অভিশাপ প্রদান করেন। বলেন-

"যত বিদ্যা তোরে পড়াইল মোর বাপে।
সকল নিষ্ফল তোর হবে মোর শাপে।।"[৪]

সেই অভিশাপে কচ বিচলিত হন। তারপর বলেন, যেহেতু তুমি অন্যায়ে রূপে শাপ দিয়েছ, তাই এই মন্ত্র আমার পক্ষে ফলদায়িনী না হলেও যাকে সে এই বিদ্যা শিখিয়ে দেবে, তার পক্ষে কার্যকরী হবে। এই কথা বলে রোষান্বিত কচও দেবযানীর বিরুদ্ধে প্রতি-অভিশাপ প্রদান করেন। বলেন- কোনো ব্রাহ্মণ সন্তান তোমাকে বিবাহ করবে না। তাই পরবর্তীকালে ক্ষত্রিয় যযাতির সঙ্গে দেবযানীর বিবাহ নিষ্পন্ন হয়েছিল। কচও স্বর্গলোকে ইন্দ্রের সভায় ফিরে যান-

"এত বলি কচ গেল ইন্দ্রের নগর।

কচে দেখি আনন্দিত সকল অমর।।"[৫]

সঞ্জীবনী বিদ্যাশিক্ষান্তে কচের স্বর্গ প্রত্যাবর্তনে শেষ হয় 'কচ-দেবযানী উপাখ্যান'।

মহাভারতের আখ্যানে কচ-দেবযানীর উপাখ্যান তাই নানা দিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। এই কাহিনি রচনা করে দেবতাদের অমরত্বের ও সংগ্রামের নেপথ্য কাহিনিটি জানতে পারা যায়। শর্মিষ্ঠা-দেবযানী-যযাতি উপাখ্যানের পটভূমিটিও রচিত হয় এই আখ্যানের মধ্যে। আর অবশেষে কচের কাহিনিতে সংযোজিত অলৌকিকতা মধ্যযুগের কাব্যবৈশিষ্ট্যরূপে অসাধারণ উপাদেয় হয়ে ওঠে।

তথ্যসূত্র:

১. দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ' কাশীদাসী মহাভারত', 'কাশীখন্ড', সাহিত্য সংসদ, তৃতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১২, পৃ. ৫৬।

২. পৃ. ৫৭।

৩. পৃ. ৫৭।

৪. পৃ. ৫৮।

৫. পৃ. ৫৮।

বিব্লিওমানিয়া, গ্রন্থ সংগ্রহের মোহ ও আসক্তি : একটি আলোচনা

নান্টু আচার্য্য
গ্রন্থাগারিক
কাঁচরাপাড়া কলেজ, উত্তর ২৪ পরগণা

সারাংশ : ‘‘বিবিব্লিওমানিয়া : গ্রন্থ সংগ্রহের প্রতি আকর্ষণ’’ এবং আসক্তি নিয়ে একটি আলোচনা, গ্রন্থ সংগ্রহের প্রতি অতিরিক্ত আবেগ, প্রেরণা এবং পরিণতিগুলি পরীক্ষা করে। এই নিবন্ধটিতে সময়ের সাথে বিব্লিওমানিয়ার ঐতিহাসিক উৎস এবং এর বিবর্তন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, উল্লেখযোগ্য বিব্লিওমানিয়াস এবং তাদের সংগ্রহগুলি হাইলাইট করা হয়েছে। গ্রন্থ সংগ্রহের একটি ভারসাম্যমূলক পদ্ধতির গুরুত্ব এবং বিব্লিওমানিয়া একটি ক্ষতিকর আসক্তিতে পরিণত হওয়া থেকে বিরত রাখার জন্য আত্মসচেতনতার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে আলোচনাটি শেষ হয়। সামগ্রিকভাবে, এই নিবন্ধটি একটি জটিল ঘটনা হিসাবে বিব্লিওমানিয়া সম্পর্কে আলোকপাত করার লক্ষ্য রাখে, এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, মনস্তাত্ত্বিক অসম্পূর্ণতা, এবং ব্যক্তি ও সমাজের উপর এর প্রভাব সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে।
সূচক শব্দ : সংগ্রহ; আসক্তি; অতিরিক্ত নেশা; মনস্তাত্ত্বিক দিক; সংরক্ষণ;আসক্তি প্রতিরোধ।

ভূমিকা:

গ্রন্থ দীর্ঘকাল ধরে মানব সংস্কৃতিতে একটি বিশেষ স্থান ধরে রেখেছে। এটি জ্ঞানের পাত্র হিসাবে কাজ করে, কল্পনার প্রবেশদ্বার হিসাবে কাজ করে এবং মানুষের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে। বিব্লিওমানিয়া এই উপলব্ধিকে অসাধারণ উচ্চতায় নিয়ে যায় এবং গ্রন্থের সংগ্রহকে সর্বব্যাপী সাধনাতে পরিণত করে। এটি ব্যক্তিগত আনন্দ, পরিপূর্ণতা এবং এমনকি মোহের উৎস হয়ে ওঠে।

সত্যিকার অর্থে বিব্লিওমানিয়া বোঝার জন্য আমাদের অবশ্যই এর উৎস উন্মোচন করতে হবে। মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন গ্রন্থাগার থেকে শুরু করে রেনেসাঁ যুগের পন্ডিতদের সংগ্রহ পর্যন্ত মানুষের সভ্যতার পাশাপাশি গ্রন্থ সংগ্রহ করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। এখানে বিব্লিওমানিয়ার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং বিভিন্ন সংস্কৃতি ও যুগের তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে।

বিব্লিওমানিয়া সংজ্ঞা

গ্রন্থ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য একটি অতিরিক্ত বা অযৌক্তিক আবেগ বর্ণনা করতে ব্যবহৃত একটি শব্দ। এটি গ্রীক শব্দ "Biblio" থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ গ্রন্থ, এবং

""Mania"" অর্থ উন্মাদনা বা মোহনা।" বিব্লিওমানিয়াযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রন্থগুলি অর্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা দ্বারা চালিত হয়, প্রায়শই তাদের বিষয়বস্তু, মূল্য বা ব্যবহারিকতা নির্বিশেষে। এই অবস্থার মধ্যে রয়েছে বাধ্যতামূলক গ্রন্থ সংগ্রহ, মজুত করা এবং আরও গ্রন্থ জমা করার এক অতৃপ্ত প্রবণতা। বিব্লিওমানিয়া একটি সর্বগন্ধ্র হিসাবে প্রকাশ করতে পারে, যেখানে গ্রন্থের সন্ধান একজন ব্যক্তির জীবনের কেন্দ্রীয় কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে, প্রায়শই অন্যান্য দায়িত্ব এবং আগ্রহের ক্ষতির জন্য। "গ্রন্থ-ওমানিয়া শব্দটি কখনও কখনও গ্রন্থের প্রতি প্রবল ভালবাসা রয়েছে এমন কাউকে বর্ণনা করার জন্য কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত হয়, তবে এর ক্লিনিকাল অর্থে এটি গ্রন্থ সংগ্রহের একটি চরম এবং প্যাথোলজিকাল রূপকে বোঝায়।"

মেরিয়াম-ওয়েবস্টার ডিকশনারি অনুসারে, বিব্লিওমানিয়ার সংজ্ঞা নিম্নরূপ:

গ্রন্থ সংগ্রহ, বিশেষত সূক্ষ্ম বা অস্বাভাবিক মুদ্রণ, বাঁধাই, বা এইরকম কিছু উদাহরণ হিসাবে, গ্রন্থ সংগ্রহ একটি প্যাথলজিকাল অবস্থা হিসাবে।

"গ্রন্থ কেনার স্বাদ বা আকাঙ্ক্ষা, বিশেষ করে বিরল বা প্রাচীন।"

অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারি: ""গ্রন্থ সংগ্রহ ও রাখার প্রতি গভীর অনুরাগ, গ্রন্থ সংগ্রহের প্রতি আগ্রহ"।

ক্যামব্রিজ ডিকশনারি: "গ্রন্থের চরম ভালবাসা, বিশেষ করে সেগুলো সংগ্রহ করা"।

কলিন্স ইংলিশ ডিকশনারি: ""গ্রন্থের চরম ভালবাসা, বিশেষ করে বিরল"।

এই সংজ্ঞাগুলি গ্রন্থগুলির প্রতি গভীর অনুরাগ, উৎসাহ এবং প্রেম তুলে ধরে যা গ্রন্থপঞ্জি বৈশিষ্ট্যযুক্ত। এ ছাড়া, তারা গ্রন্থ সংগ্রহ করার ও সেগুলো সংগ্রহ করার দিকে মনোযোগ দেয়, বিশেষ করে যেগুলো দুষ্প্রাপ্য, মূল্যবান অথবা অদ্বিতীয়। সামগ্রিকভাবে, বিব্লিওমানিয়া গ্রন্থগুলির জন্য একটি শক্তিশালী এবং প্রায়শই বদ্ধ উন্মাদনা এবং সংগ্রহ হিসাবে বোঝা যায়।

বিব্লিওমানিয়ার ইতিহাস

বিব্লিওমানিয়ার ইতিহাস প্রাচীন কালে পাওয়া যায়, যেখানে গ্রন্থের প্রতি ভালোবাসা এবং সেগুলো সংগ্রহ করার ইচ্ছা প্রকাশ পায়। প্রাচীন সভ্যতা যেমন মিশর, গ্রীস এবং রোমের লোকেরা মূল্যবান সম্পদ হিসেবে গ্রন্থগুলোকে মূল্যবান বলে গণ্য করত, সেগুলোকে জ্ঞান ও মর্যাদার প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করত। যাইহোক, ১৮শ শতাব্দীতে জ্ঞানালোকের যুগে 'বিব্লিওমানিয়া' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছিল, কারণ গ্রন্থ সংগ্রহের আগ্রহ নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছিল। মুদ্রণযন্ত্রগুলির প্রাপ্যতা এবং গ্রন্থাগারগুলির বৃদ্ধি গ্রন্থ অর্জনের উৎসাহকে বাড়িয়ে তোলে। এই সময়ে গ্রন্থিওমানিয়া একটি স্বতন্ত্র ঘটনা হিসাবে স্বীকৃত হতে শুরু করে, যা তাদের বিষয়বস্তু বা ব্যবহারিকতা নির্বিশেষে গ্রন্থ সংগ্রহের তীব্র আকাঙ্ক্ষা দ্বারা চিহ্নিত। স্যার থমাস ফিলিপস এবং লর্ড চার্লস স্পেন্সার সহ ইতিহাস জুড়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থপঞ্জি প্রকাশিত হয়েছিল, যার বিশাল সংগ্রহ

জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, বিব্লিওমানিয়া সামাজিক পরিবর্তন, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিকশিত হতে থাকে, তবে এর নির্যাস গ্রন্থের চিরন্তন অন্তর্নিহিত এবং লিখিত শব্দ সংরক্ষণের আগ্রহের মধ্যে নিহিত রয়েছে।

কেন বিব্লিওমানিয়া

বিব্লিওমানিয়ার উৎসকে কারণগুলির সংমিশ্রণ হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে গ্রন্থের ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং মূল্য, জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক উদ্দীপনার জন্য মানুষের আকাঙ্ক্ষা এবং শারীরিক বস্তু হিসাবে গ্রন্থের অন্তর্নিহিত আবেদন। এখানে কিছু কারণ তুলে ধরা হল যে, কেন গ্রন্থপঞ্জি তৈরি হতে পারে:

সাহিত্যের প্রতি ভালবাসা: গ্রন্থকে জ্ঞান, কল্পনা এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পাত্র হিসেবে গণ্য করা হয়। লিখিত বাক্যে আমাদের বিভিন্ন জগতে নিয়ে যাওয়ার, আমাদের চিন্তাভাবনাকে চ্যালেঞ্জ করার এবং বিভিন্ন আবেগ জাগিয়ে তোলার ক্ষমতা রয়েছে। গ্রন্থপঞ্জি সাহিত্যের প্রতি গভীর ভালবাসা এবং উপলব্ধিবোধ থেকে উদ্ভূত হতে পারে, যেখানে লোকেরা গ্রন্থের মাধ্যমে সান্ত্বনা, অনুপ্রেরণা এবং ব্যক্তিগত বৃদ্ধি খুঁজে পায়।

বুদ্ধিবৃত্তিক কৌতূহলোদ্দীপক: জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক উদ্দীপনার জন্য অনমনীয় তৃষ্ণার কারণে বহু গ্রন্থপঞ্জি তৈরি হয়। তারা বিভিন্ন বিষয় অনুসন্ধান, বিভিন্ন ঘরানার মধ্যে অনুসন্ধান এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ নিয়ে কাজ করার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করে। গ্রন্থগুলি নতুন ধারণা, অন্তর্দৃষ্টি এবং অভিজ্ঞতার প্রবেশদ্বার হিসাবে কাজ করে, এবং গ্রন্থিলিওমানিয়া হতে পারে একজন ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তিক দিগন্ত বিস্তৃত করার অবিচ্ছিন্ন সাধনা।

নান্দনিকতা এবং আবেদন সংগ্রহ: গ্রন্থ নান্দনিকভাবে মনোরম বস্তু হতে পারে, তাদের বিভিন্ন বাঁধন, চিত্র এবং টাইপোগ্রাফি সহ। কিছু কিছু গ্রন্থপঞ্জি গ্রন্থের শারীরিক সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং এগুলো সংগ্রহ ও প্রদর্শনের মধ্যে আনন্দ খুঁজে পায়। এ ছাড়া, নিজেকে সংগ্রহ করা রোমাঞ্চকর ও পরিপূর্ণতার এক উৎস হতে পারে। দুষ্প্রাপ্য সংস্করণ খোঁজার শিহরণ, সংগ্রহের কাজ শেষ করা অথবা মূল্যবান ও লোভনীয় গ্রন্থ কেনার পরিতৃপ্তি দ্বারা বিব্লিওমানিয়া চালিত হতে পারে।

*ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক তাৎপর্য:*গ্রন্থ মানব জ্ঞান, ধারণা এবং গল্পের সংগ্রহস্থল হিসাবে ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক তাৎপর্য রয়েছে। তারা অতীতকে একটি বাস্তব সংযোগ প্রদান করে এবং সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও প্রেরণের একটি উপায় হিসাবে কাজ করে। জ্ঞান ও ইতিহাস সংরক্ষণে অবদান রাখতে এই সাংস্কৃতিক নিদর্শনগুলির অধিকার ও সুরক্ষার আকাঙ্ক্ষা থেকেই গ্রন্থপঞ্জি উদ্ভূত হতে পারে।

মনস্তাত্ত্বিক কারণগুলি: কিছু ক্ষেত্রে, বিব্লিওমানিয়া মানসিক কারণ যেমন বাধ্যতামূলক আচরণ, নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা, বা মানসিক চাহিদা পূরণের মধ্যে নিহিত হতে পারে। গ্রন্থ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা সান্ত্বনা, নিরাপত্তা অথবা পরিচয় প্রদান

করতে পারে। গ্রন্থ অর্জনের কাজটি হয়ত জীবনের অন্যান্য দিক থেকে সাময়িক পলায়ন বা বিক্ষেপ প্রদান করতে পারে, যা বাধ্যতামূলক আচরণের চক্রের দিকে পরিচালিত করে।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, যদিও বিব্লিওমানিয়া আনন্দ ও পরিপূর্ণতা আনতে পারে, তবে চরম পর্যায়ে গেলে এর নেতিবাচক পরিণতিও হতে পারে। এর ফলে হয়তো আর্থিক চাপ, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা অথবা সংগ্রহ করার প্রতি আসক্তি কাটিয়ে উঠতে অসুবিধা হতে পারে। যেকোনো আগ্রহ বা আগ্রহের মতো, গ্রন্থের সঙ্গে এক স্বাস্থ্যকর সম্পর্ক নিশ্চিত করার এবং সার্বিক মঙ্গল বজায় রাখার জন্য ভারসাম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিব্লিওমানিয়াকে যেভাবে শনাক্ত করা যায়

কিছু লক্ষণ রয়েছে যা ব্যাধিটিকে প্যাথলজিকাল হোর্ডিং বা বিব্লিওমানিয়া হিসাবে প্রতিফলিত করে। যার ফলে মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি হতে পারে।

- অপ্রয়োজনীয় এবং মূল্যহীন গ্রন্থ মজুত করা
- গ্রন্থ পাওয়ার জন্য অসমর্থিত আকাঙ্ক্ষা যদিও সেগুলো কখনো পড়া হয় না
- একই গ্রন্থের অসংখ্য কপি সংগ্রহ
- হোর্ডিং-এর গ্রন্থ-এর প্রতি আসক্তি এত বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে যে, এমনকি তা আক্রান্ত ব্যক্তির দৈনন্দিন তালিকার ক্ষেত্রেও হস্তক্ষেপ করে
- সংগ্রহের ব্যাপারে উদ্বেগ, হতাশা এবং অনির্বচনীয় উদ্বেগ
- ব্যক্তিগত জীবন বা ব্যক্তিগত সম্পর্কে আগ্রহের অভাব

বিব্লিওমানিয়ার চিকিৎসা কী?

বিব্লিওমানিয়া নির্ণয় রোগীর লক্ষণ, উপসর্গও ইতিহাসের মতো কিছু কারণের উপর নির্ভর করে। চিকিৎসা পেশাদাররা প্রায়ই এই বিষয়গুলি উল্লেখ করে থাকে যখন তারা এই ধরনের বিষয়গুলি পরিচালনা করে। এই ঘটনার শিকার ব্যক্তিদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হচ্ছে, তারা এক মিনিট জন্যেও তাদের সংগ্রহ ছেড়ে চিকিৎসকের কাছে যেতে চায় না। এটি বলা হয় যে, DSM-IV বিব্লিওমানিয়াকে গুরুতর রোগ হিসাবে গ্রহণ করে না,তবে DSM-IVএর পরবর্তী সংস্করণে স্বীকার করা হয়েছে যে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি উপস্থিত থাকলে এটি একটি রোগ।

- গ্রন্থের মূল্য যাই হোক না কেন তা ক্রয় করা।
- উদ্বেগ বা চাপের গভীর অনুভূতি এবং সর্বদা একটি ভয় অনুভব করা যে কেউ তাদের সংগ্রহ ধ্বংস করতে পারে।
- স্বাভাবিক সামাজিক বা ব্যক্তিগত সম্পর্ক নেই।
- এই গ্রন্থ ভাণ্ডার এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছায়, যেখানে তা এক গুরুতর স্বাস্থ্য অথবা নিরাপত্তার চাপ হয়ে দাঁড়ায়।
- গ্রন্থের বাধ্যতামূলক সংগ্রহ ছাড়া আর কোন মানসিক ব্যাধি পাওয়া যায়নি।

বিব্লিওমানিয়ার প্রভাব

বিব্লিওমানিয়া, প্রায়ই গ্রন্থের প্রতি আবেগ হিসাবে দেখা হয়, ব্যক্তির উপর ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় প্রভাব থাকতে পারে। এখানে বিব্লিওমানিয়ার কিছু সম্ভাব্য প্রভাব রয়েছে:

ইতিবাচক প্রভাব:

জ্ঞান এবং সমৃদ্ধকরণ: বিব্লিওমানিয়া বিস্তৃত পাঠ এবং বিভিন্ন বিষয়, শৈলী এবং লেখকদের প্রকাশ করতে পারে। এর ফলে গভীর ও বিচিত্র জ্ঞানের ভিত্তি, বিস্তৃত দৃষ্টিকোণ এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সমৃদ্ধি হতে পারে।

*সাংস্কৃতিক সংরক্ষণ:*গ্রন্থ, পাণ্ডুলিপি, এবং সাহিত্যিক নিদর্শন সংরক্ষণ ও সংরক্ষণে বিব্লিওমানিয়া অবদান রাখতে পারে। সংগ্রাহকরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের দীর্ঘতা নিশ্চিত করে তাদের সংগ্রহ সংরক্ষণ ও সংরক্ষণের জন্য অত্যন্ত যত্ন নিতে পারেন।

সম্প্রদায় এবং সংযোগ: বিবিলিওফাইল এবং সংগ্রাহকরা প্রায়শই সম্প্রদায় এবং নেটওয়ার্ক গঠন করে, সহ-উৎসাহী, লেখক, গ্রন্থাগারিক এবং পণ্ডিতদের সাথে সংযোগ স্থাপন করে। সম্প্রদায়ের এই ধারণা, আলোচনা এবং সহযোগিতার বিনিময়, গ্রন্থের প্রতি আগ্রহ রয়েছে এমন ব্যক্তিদের মধ্যে সামাজিক সংযোগ বৃদ্ধি করার অনুমতি দেয়।

অনুপ্রেরণা এবং সৃজনশীলতা: গ্রন্থগুলিতে নিজেকে নিমজ্জিত করা অনুপ্রেরণা, সৃজনশীলতাকে জাগিয়ে তুলতে পারে এবং লেখক, শিল্পী এবং অন্যান্য সৃজনশীল ব্যক্তিদের ধারণার উৎস হিসাবে কাজ করতে পারে। বিব্লিওমানিয়া সৃজনশীল কাজে প্রেরণা ও প্রেরণা যোগায়।

নেতিবাচক প্রভাব:

বিব্লিওমানিয়া উল্লেখযোগ্য আর্থিক ব্যয়ের দিকে পরিচালিত করতে পারে, বিশেষত যখন বিরল বা মূল্যবান সংস্করণগুলি অনুসরণ করা হয়। গ্রন্থ সংগ্রহ করা এক ব্যয়বহুল শখ হয়ে উঠতে পারে আর লোকেরা হয়তো নিজেদের সাধ্যের অতিরিক্ত খরচ করতে, আর্থিক সমস্যা অথবা ঋণের দিকে পরিচালিত করতে পারে।

বিব্লিওমানিয়া, যদি চরমভাবে নেওয়া হয়, তবে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা হতে পারে। অতিরিক্ত পরিমাণে সময় সংগ্রহ করা, তালিকাভুক্ত করা এবং একটি সংগ্রহ বজায় রাখা সামাজিক মিথস্ক্রিয়া হ্রাস করতে এবং অন্যান্য সামাজিক ক্রিয়াকলাপ থেকে প্রত্যাহার করতে পারে।

প্রচুর পরিমাণে গ্রন্থ সংগ্রহ করা যথেষ্ট শারীরিক স্থান গ্রহণ করতে পারে, যার ফলে আঁকড়ে ধরা ও সংগঠনের প্রতিদ্বন্দ্বিতাগুলো দেখা দিতে পারে। বিব্লিওমানিয়া গ্রন্থ ভর্তি থাকার জায়গা তৈরি করতে পারে, যার ফলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।

গুরুতর ক্ষেত্রে, বিব্লিওমানিয়া অবসেসিভ আচরণ হিসাবে প্রকাশ করতে পারে, যেখানে গ্রন্থ অর্জনের প্রচেষ্টাগুলি সব-সময় কেড়ে নেয়। এই আকাঙ্ক্ষা হয়তো দৈনন্দিন জীবন, সম্পর্ক এবং সার্বিক মঙ্গলের ক্ষেত্রে বাধা দিতে পারে, যা দুর্দশা ও ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে।

বিব্লিওমানিয়া কখনও কখনও মনোযোগের একটি সংকীর্ণ দিকে পরিচালিত করতে পারে, যেখানে ব্যক্তির মনোযোগ সম্পূর্ণরূপে গ্রন্থের উপর কেন্দ্রীভূত হয়, অন্যান্য শখ, অনুধাবন বা দায়িত্বগুলির ক্ষতি করে। এর ফলে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে ভারসাম্য ও পরিপূর্ণতার অভাব দেখা দিতে পারে।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, যাদের গ্রন্থের প্রতি ভালবাসা আছে বা সংগ্রহ করার আগ্রহ আছে, তারা এই নেতিবাচক প্রভাব ভোগ করবে না। গ্রন্থ সংগ্রহ এবং জীবনের অন্যান্য দিকগুলির মধ্যে একটি সুস্থ ভারসাম্য বজায় রাখার দক্ষতার উপর নির্ভর করে বিব্লিওমানিয়ার প্রভাব পরিবর্তিত হতে পারে। আসক্তি কাটিয়ে ওঠার উপায় খুঁজে বের করা সম্ভাব্য নেতিবাচক পরিণতিগুলো দূর করতে সাহায্য করতে পারে।

বিব্লিওমানিয়ার সাথে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ

এখানে উল্লেখিত ব্যক্তিদের তালিকা এবং বিব্লিওমানিয়ার সাথে তাদের সংযোগ রয়েছে:

১. স্টিফেন ব্লুমবার্গ: ব্লুমবার্গ একজন কুখ্যাত ব্যক্তিত্ব, যিনি তার বিব্লিওমানিয়াক প্রবণতা এবং অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য পরিচিত। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন লাইব্রেরি থেকে কোটি কোটি ডলার মূল্যের বই চুরি করার অভিযোগে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। বিরল ও মূল্যবান বই সংগ্রহের প্রতি তাঁর মোহে এই চুরির ঘটনা ঘটে।

২. স্যার থমাস ফিলিপস: স্যার থমাস ফিলিপস, ১৯ শতকের একজন ব্রিটিশ ব্যারনেট, তার এক্সট্রিম বিব্লিওমানিয়া জন্য পরিচিত ছিলেন। তাঁর গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপির সংগ্রহ ১৬০,০০০-এরও বেশি ছিল, যা এটিকে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ব্যক্তিগত সংগ্রহের একটি করে তোলে। তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর সংগ্রহ এক শতাব্দী পরে নিলামে তোলা হচ্ছিল।

৩. প্রকা. ডব্লিউএফ Whitcher: Rev. ডব্লিউএফ হুইটচার ছিলেন উনিশ শতকের একজন মেথোডিস্ট যাজক যিনি বিব্লিওমানিয়া রোগে ভুগছিলেন। তিনি বিরল বই চুরির সাথে জড়িত ছিলেন, যা পরে তিনি ফিরে আসেন এবং স্থানীয় বই বিক্রেতাদের কাছ থেকে মূল্যবান বলে দাবি করেন। তাঁর কাজগুলো প্রমাণ করেছিল যে, কিছু সংখ্যক বিব্লিওমানিয়াকস তাদের সংগ্রহের জন্য কতদূর পর্যন্ত যেতে পারে।

৪. লর্ড চার্লস স্পেন্সার: লর্ড চার্লস স্পেন্সার, ১৮ থেকে ১৯ শতকের একজন বিখ্যাত বই সংগ্রাহক, বিরল বই কেনার প্রবল আগ্রহ ছিল। তিনি নিলামে অংশগ্রহণ এবং প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রের জন্য পরিচিত ছিলেন।

ডিক্যামেরনের প্রথম সংস্করণে তাঁর উল্লেখযোগ্য দরপত্রে ঈপ্সিত বইগুলি সুরক্ষিত করার জন্য ঐকান্তিকতা এবং উৎসর্গ প্রকাশ করা হয়েছে।

৫. রিচার্ড হেবার (১৭৭৩-১৮৩৩): রিচার্ড হেবার ছিলেন একজন ইংরেজ বই সংগ্রাহক, যিনি তার বিস্তৃত গ্রন্থাগারের জন্য পরিচিত, যার মধ্যে ১,৫০,০০০ এরও বেশি খণ্ড ছিল। হেবারের বইবলিওমানিয়া তাকে প্রচুর পরিমাণে বই কিনতে পরিচালিত করে, প্রায়শই তার নিজস্ব সংগ্রহ প্রসারিত করার জন্য পুরো গ্রন্থাগারগুলি কিনে।

৬. স্যার হ্যান্স স্লোয়ানে (১৬৬০-১৭৫৩): আইরিশ চিকিৎসক ও সংগ্রাহক স্যার হ্যান্স স্লোয়ানে বই ও পাণ্ডুলিপির প্রতি গভীর অনুরাগ পোষণ করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সংগ্রহ ব্রিটিশ মিউজিয়ামের ভিত্তি গঠন করে। স্লোয়ানের বিবিলিওমানিয়া তাকে বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক উপকরণগুলির বিশাল ভাণ্ডার অর্জন করতে পরিচালিত করেছিল।

এই ব্যক্তিরা, তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে, বই সংগ্রহের ক্ষেত্রে তাদের সংগ্রহ, বৃত্তি বা অবদানের মাধ্যমে বিবলিওমানিয়া জগতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বইয়ের প্রতি তাদের ভালবাসা এবং সাহিত্য সম্পদ সংরক্ষণের জন্য তাদের উৎসর্গীকরণ সাহিত্য ও বইয়ের ইতিহাসে এক স্থায়ী প্রভাব রেখেছে। এই ব্যক্তিরা বিবলিওমানিয়ার বিভিন্ন প্রকাশ এবং চরম উদাহরণ, সংগ্রহ থেকে চুরি পর্যন্ত, এবং তাদের অবসানের উল্লেখযোগ্য প্রভাব তাদের জীবন এবং পায়ে ছিল। এই ব্যক্তিরা, ইতিহাস জুড়ে অন্যান্যদের মধ্যে, বিব্লিওমানিয়ার সাথে জড়িত আবেগ, উৎসর্গীকরণ এবং কখনও কখনও অদ্ভুততার উদাহরণ। তাদের সংগ্রহ এবং অবদানগুলি সাহিত্য, গ্রন্থাগার এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জগতে স্থায়ী উত্তরাধিকার রেখে গেছে।

বিব্লিওমানিয়া বনাম বিবলিওফিলিয়ার পার্থক্য

বিব্লিওমানিয়া এবং বিবিলিওফিলিয়া উভয়ই গ্রন্থের প্রতি প্রেমের সাথে সম্পর্কিত, তবে তাদের স্বতন্ত্র অর্থ এবং অর্থ রয়েছে। এখানে দু'জনের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরা হলো-

বিব্লিওমানিয়া: গ্রন্থ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য বিব্লিওমানিয়া বলতে অত্যধিক বা অবসেসিভ আবেগ বোঝায়। এর বৈশিষ্ট্য হল, বিষয়বস্তু বা মূল্য যা-ই হোক না কেন, গ্রন্থ অর্জন করার এক অনিয়ন্ত্রিত প্রবণতা। বিব্লিওমানিয়াগ্রন্থ সংগ্রহ, মজুত করা, বা বিরল বা মূল্যবান সংস্করণের পিছনে অতিরিক্ত সময় ও অর্থ ব্যয় করার প্রবণতা হিসাবে প্রকাশ করতে পারে। বিব্লিওমানিয়া কখনও কখনও নেতিবাচক পরিণতির দিকে পরিচালিত করতে পারে, যেমন আর্থিক চাপ বা সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, যখন মোহটি সব-পরিচয়ের হয়ে ওঠে।

বিবিলিওফিলিয়া: অন্যদিকে, গ্রন্থ এবং পাঠের প্রতি গভীর ভালবাসা এবং উপলব্ধি প্রকাশ করে। এটি আরও ভারসাম্যপূর্ণ এবং সূক্ষ্ম শব্দ, যা গ্রন্থ, বিষয়বস্তু এবং পড়ার কাজের উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে। গ্রন্থ নিয়ে বিবলিওফাইলদের আগ্রহ

রয়েছে এবং তারা সংগ্রহ করতে পারে, তবে তাদের প্রধান লক্ষ্য সাহিত্যের সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক এবং মানসিক সংযোগ। গ্রন্থের বিষয়বস্তু, সাহিত্যিক গুণ এবং নান্দনিক গুণাবলিকে বিবিলিওফিলিস প্রায়ই মূল্য দেয়। তারা হয়তো গ্রন্থের বাস্তবতাকে মূল্যবান বলে গণ্য করতে পারে, বিভিন্ন ধরন ও লেখকদের অন্বেষণ করতে পারে এবং গ্রন্থ আলোচনা ও সাহিত্যচর্চায় জড়িত হতে পারে।

বিব্লিওমানিয়ার বিরুদ্ধে আইন

বিব্লিওমানিয়ার বিরুদ্ধে কোন নির্দিষ্ট আইন নেই, কারণ এটি ফৌজদারি অপরাধ বা অবৈধ কার্যকলাপ হিসাবে বিবেচিত হয় না। গ্রন্থ সংগ্রহের প্রতি গভীর অনুরাগ থাকা, সাধারণত একটি ব্যক্তিগত বিষয় এবং ব্যক্তিগত আগ্রহ এবং আচরণের ক্ষেত্রে পড়ে।তবে, এটা খেয়াল রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, গ্রন্থ সংগ্রহ বা গ্রন্থ সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে কিছু আইনি বিবেচনার প্রয়োজন হতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে:

- মেধাস্বত্ব আইন লেখক, প্রকাশক এবং অন্যান্য কপিরাইটধারীদের অধিকার রক্ষা করে।
- চুরি, অননুমোদিত অপসারণ, বা পাবলিক লাইব্রেরি, ব্যক্তিগত সংগ্রহ বা প্রতিষ্ঠান থেকে গ্রন্থ ধ্বংস অবৈধ এবং এর ফলে ফৌজদারি অভিযোগ হতে পারে।
- কিছু দেশে রপ্তানি বা সাংস্কৃতিক হস্তশিল্পের বাণিজ্য সম্পর্কিত নির্দিষ্ট আইন এবং প্রবিধান রয়েছে, যার মধ্যে বিরল গ্রন্থ রয়েছে।
- আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রম করার সময় গ্রন্থ বা সীমান্ত পারের গ্রন্থ লেনদেনের ক্ষেত্রে কাস্টমস রেগুলেশন এবং নির্দিষ্ট গ্রন্থ বা পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আমদানি বা রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা মানতে হবে।

এটি লক্ষণীয় যে আইন এবং প্রবিধানগুলি দেশভেদে পরিবর্তিত হতে পারে, তাই প্রযোজ্য আইন ও প্রবিধান মেনে চলার জন্য গ্রন্থ সংগ্রহ বা গ্রন্থ বাণিজ্য সম্পর্কিত কার্যক্রমে জড়িত থাকলে স্থানীয় আইনি সংস্থানগুলির সাথে পরামর্শ করা বা পেশাদার পরামর্শ চাওয়া বাঞ্ছনীয়।

উপসংহার:

বিব্লিওমানিয়া গ্রন্থের প্রতি এক গভীর ও স্থায়ী আকর্ষণকে চিত্রিত করে। এটি গ্রন্থের সংগ্রহ, অবসানের মনোবিজ্ঞান, বিব্লিওফাইলদের চ্যালেঞ্জ এবং গ্রন্থের উত্তরাধিকার সংরক্ষণের গুরুত্বকে অন্তর্ভুক্ত করে।বিব্লিওমানিয়ার অন্তর্নিহিত সংযোগগুলি ব্যক্তির সাথে গ্রন্থ, জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক কৌতূহলের সাধনা এবং নিজেকে সংগ্রহের কাজ থেকে প্রাপ্ত আনন্দ। এটি মালিকানা, অধিগ্রহণ এবং আত্ম-প্রকাশের গভীর মানবিক আকাঙ্ক্ষার মধ্যে পড়ে। তবে, আর্থিক বোঝা, মহাকাশ প্রতিবন্ধকতা, সম্ভাব্য সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এবং অপ্রতিরোধ্য সঞ্চয়ের ঝুঁকি সহ বিব্লিওমানিয়া তার চ্যালেঞ্জ ছাড়া নয়।কিন্তু, এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও, বিব্লিওমানিয়া গভীর পুরস্কার প্রদান করে। এটা

ব্যক্তিবিশেষকে তাদের ব্যক্তিগত রুচি, আগ্রহ এবং মূল্যবোধকে প্রতিফলিত করে এমন সংগ্রহগুলোকে একত্রিত করার সুযোগ করে দেয়। গ্রন্থের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা এবং তাদের অফুরন্ত সম্ভাবনার দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে বিবলিওফিলের অনুসন্ধান জীবনব্যাপী যাত্রা হয়ে ওঠে।

তথ্যসূত্র :

https://en.wikipedia.org/wiki/Bibliomania
https://web.archive.org/web/20190302024724/https://www.inlifehealthcare.com/2015/09/09/a-detailed-study-about-bibliomania/
FERRIS, I. (2009). Book Fancy: Bibliomania and the Literary Word. *Keats-Shelley Journal*, *58*, 33–52.
http://www.jstor.org/stable/25735166

বাংলা কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের বিকাশে পত্রপত্রিকার ভূমিকা

সুচন্দ্রা রায়
স্বাধীন গবেষক ও প্রাবন্ধিক

সারসংক্ষেপ : পাশ্চাত্য সাহিত্যে সায়েন্স ফিকশন একটি বিশিষ্ট আধুনিক সাহিত্যধারা। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ঔপনিবেশিক ভারতে বাংলা সাহিত্যে কল্পবিজ্ঞানের ধারার ক্রমবিকাশ ঘটতে থাকে। তবে সারা বিংশ শতাব্দী জুড়ে এটি বিশেষভাবে শিশু-কিশোর পাঠোপযোগী হিসাবেই সাহিত্য জগতে পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠা পায়। এর পিছনে আছে বিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকার বিশেষ ভূমিকা। কারণ তারা শুরু থেকেই আগামীকালের মানবসভ্যতার ভাবী কাণ্ডারীদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোলের প্রতি বিশেষ আগ্রহ তৈরি করতে চেয়েছিল। বাংলা শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকাদের উদ্যোগেই বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট কল্পবিজ্ঞান রচয়িতাদের আবির্ভাব ঘটেছে। অধুনা পত্রপত্রিকাগুলিও বর্তমানে কল্পবিজ্ঞানের উপর বিশেষ কাজ করে চলেছে। বাংলা কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক পত্রপত্রিকাগুলির অবদান অপরিসীম।

সূচক শব্দ : কল্পবিজ্ঞান সাহিত্য, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সত্যজিৎ রায়, ঘনাদা, প্রফেসর শঙ্কু, শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকা, সন্দেশ, আনন্দমেলা।

মূল আলোচনা :

বাংলা কল্পবিজ্ঞান সাহিত্য আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় ধারাগুলির মধ্যে বিগত প্রায় দেড়শো বছরে বিশিষ্ট স্থান অর্জন করেছে। বাংলা সাহিত্যে কল্পবিজ্ঞান সম্পূর্ণ রূপে আধুনিকতার ফসল। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে ঔপনিবেশিকতার আবহে যে প্রভূত পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার সূচনা হয়েছিল, তারই একটি উল্লেখযোগ্য ফলাফল হিসাবে বাংলা সাহিত্যে কল্পবিজ্ঞান রচনার সূত্রপাত হয়। সূচনা-পর্বেই নবীন এই আঙ্গিকটি কল্পবিজ্ঞান নামে পরিচিত ছিল না, তাকে বলা হত, ‘বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প’। এই নামকরণ থেকেই বোঝা যায়, বাংলা সাহিত্যে কল্পবিজ্ঞান ধারার উদ্ভবের পিছনে সেই সময়ের প্রভূত বিজ্ঞান চর্চার আবহ কীভাবে কল্পবিজ্ঞান নামক কথাসাহিত্যের নতুন শাখা হিসাবে ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে প্রাথমিক প্রেক্ষাপট রচনা করেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞান-নির্ভর প্রবন্ধ প্রকাশের প্রতি গভীর আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রকাশিত ‘দিগদর্শন’ পত্রিকায় ছাত্রপাঠ্য বিজ্ঞান প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে। এরপর ‘পশ্বাবলী’, ‘বিজ্ঞান সেবধি’, ‘বিজ্ঞান সার সংগ্রহ’ ইত্যাদি পত্রিকাসহ সারা ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে ৬৫টা

বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশিত হত। বিজ্ঞানের নতুন নতুন জ্ঞানের সম্ভাবনা যত উন্মোচিত হয়ে চলেছিল, তত তার প্রতি বাঙালি-মানসের আগ্রহ আকর্ষিত হতে থাকে। প্রাবন্ধিকের কথায়, "In spite of the deficiencies in the teaching and research of science in schools and colleges, science was increasingly gaining popularity among the educated elite."[১] বিশেষ করে পরবর্তী প্রজন্মকে এইসব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও বিজ্ঞানের সম্ভাবনার কথা জানানোর প্রতি উৎসাহ অনেক বেশি প্রবল হয়। তাই বিজ্ঞান-নির্ভর রচনার প্রথম পর্বে তার টার্গেট পাঠক করা হয় বিশেষভাবে শিশু ও কিশোরদের। এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয় সেই সময়ের বিভিন্ন শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকা। বিজ্ঞানের কাহিনিকে আরো আকর্ষণীয় ও মনোগ্রাহী করে তুলতে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে গল্পের ছলে বৈজ্ঞানিক সত্যকে ও বিজ্ঞানের সম্ভাবনাকে তুলে ধরার প্রচেষ্টা শুরু হতে দেখা যায়। বাংলা কল্পবিজ্ঞানের সূচনাও ঠিক এইখান থেকেই। "Getting influenced by scientific discoveries and inventions, and observing human progress, Bengali science writers started writing various popular science and science fiction books in the letter half of the 19th and early 20th centuries. These played a vital role in popularising science among the people."[২] বাংলা কল্পবিজ্ঞানের প্রথম পর্বের লেখকেরা, অর্থাৎ, জগদীশ চন্দ্র বসু, জগদানন্দ রায় কিংবা হেমলাল দত্তরা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বিজ্ঞানকে আশ্রয় করে যে কল্পকাহিনি লেখার ধরন শুধু করলেন, পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে তা বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের কলমের গুণে মহীরুহ হয়ে ওঠে।

পাশ্চাত্য সাহিত্যে কল্পবিজ্ঞানের শাখাকে সময়ের সঙ্গে সমৃদ্ধ করেছে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা। এদের মধ্যে ১৮৮৬ সালে সুইডেন থেকে প্রকাশিত বিশ্বের প্রথম সাই-ফাই ম্যাগাজিন 'স্টেলা', ১৯২৬ সালে আমেরিকা থেকে প্রকাশিত 'Amazing Stories', ১৯৩৮ সাল থেকে প্রকাশিত জন উড ক্যাম্পবেলের 'Astaunding Stories' অন্যতম। বিশ্বের কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের পরিচিতি নির্মাণে বিভিন্ন দেশের এই পত্রিকাগুলির অবদান গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত, সাহিত্যের যেকোনো শাখার দ্রুত ক্রমবিকাশে পত্রপত্রিকাগুলিদের বিশেষ ভূমিকা থাকে। বাংলা কল্পবিজ্ঞানের বিকাশে পত্রপত্রিকাগুলি কীভাবে সাহায্য করেছে এবং কীভাবে নির্ধারিত করে দিয়েছে তার বৈশিষ্ট্য, তা এখানে আলোচনাসাপেক্ষ। ঔপনিবেশিক ভারতে কল্পবিজ্ঞানের যে চর্চা শুরু হয়, সময়ের সঙ্গে তা একটি নিজস্ব ধরনে গড়ে ওঠে। বিশ্ব সাহিত্যের কল্পবিজ্ঞানের মূল ধারা থেকে তা অনেকাংশেই ভিন্ন। এমনকি বিশ্বসাহিত্যের কল্পবিজ্ঞানের মূল ধারার কল্পবিজ্ঞানের কাহিনিগুলির সবগুলিকে কল্পবিজ্ঞান পদবাচ্য করা যায় নাকি, তা নিয়েও নানা বিতর্ক চালু রয়েছে। অনীশ দেবের মতে, "কল্পবিজ্ঞানের প্রকৃত সংজ্ঞা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্কের শেষ নেই। তবে দেখা গেছে, প্রায় সবক'টি সংজ্ঞার মূল চাবিকাঠি একই।

কল্পবিজ্ঞান কাহিনীতে বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণী ভূমিকা থাকবে। থাকবে অজানা সম্ভাব্য জগতের কথা, প্রাণীর কথা, আর আগামী দিনের কথা। তবে এত সত্ত্বেও কল্পবিজ্ঞানের বহুমুখী বিচিত্র জগৎকে সংজ্ঞার বাঁধনে বাঁধা সম্ভব নয়।”[৩] এখানে তিনি কল্পবিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্ধারণের চেষ্টা করেও তার বিপুল সম্ভাবনাকে অস্বীকার করতে পারেননি। আর এই সম্ভাবনা থেকেই আসলে বাংলা সাহিত্যে নিজস্ব কল্পবিজ্ঞানের ধারা গড়ে উঠেছে। সুরজিৎ দাশগুপ্তের কথায়, “কল্পবিজ্ঞানের গল্পকে আধুনিক যুগের রূপকথা বলতে পারি। আধুনিক মানুষ চারপাশের বস্তুবিশ্বের চরিত্র ও স্বরূপ সন্ধান করে, সেই বিশ্বকে নিজের প্রয়োজন মতো উন্নত বা পরিবর্তন করার সাধনা করে—মানুষের এই সন্ধান ও সাধনাকে অবলম্বন করেই আধুনিক রূপকথা বা কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের উন্মেষ।”[৪] কল্পবিজ্ঞান আধুনিক যুগের রূপকথা হয়ে উঠলো বলেই মূলত সমস্যা দেখা দিল যেকল্পবিজ্ঞানে বৈজ্ঞানিক সত্য কতটা থাকবে এবং কতটা কল্পনার মিশেল থাকবে, সেবিষয়ে সবাই একমত হতে পারলেন না। যে বক্তব্যটি সবচেয়ে জোরালো, তা হল, কল্পবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হল পাঠকের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সত্যের পরিচয় ঘটানো এবং কল্পনার প্রাধান্য থাকলেও পাঠক যেন কল্পবিজ্ঞান পাঠে বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেন। আদর্শ কল্পবিজ্ঞানের এটাই সংজ্ঞা বলে মনে করেন আমেরিকান কল্পবিজ্ঞান-লেখক আইজ্যাক আসিমভ থেকে শুরু করে অনেক কল্পবিজ্ঞান-সমালোচক। কিন্তু বাংলা কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যকে এই সংজ্ঞায় বাঁধতে গেলে সামান্য গুটিকয়েক গল্পকেই পাওয়া যাবে এবং বহু বিখ্যাত বাংলা কল্পবিজ্ঞান রচনা এর বাইরে রয়ে যাবে। শুধু বাংলাই নয়, বিশ্বজুড়ে প্রচলিত কল্পবিজ্ঞানের গল্পকাহিনির ক্ষেত্রেই এই সংজ্ঞা সমস্যাসৃষ্টি করেছে। ১৯৫৭ সালে আমেরিকান সাহিত্য-সমালোচক পি স্যুইলার মিলার ‘হার্ড সায়েন্স ফিকশন’ বলে কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের একটি ধরনকে চিহ্নিত করেন, যেগুলি উপরিউক্ত সংজ্ঞাকে মেনে আদর্শ কল্পবিজ্ঞানের গল্প রচনা করেছে। এর ফলে হার্ড সায়েন্স ফিকশনের বাইরে যত কল্পবিজ্ঞানের রচনা আছে যেগুলিতে বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যকে ব্যাখ্যা না করেই তার আশ্চর্য সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করে কল্পিত গল্প রচনা করা হয়েছে, সেগুলি ‘সফট সায়েন্স ফিকশন’-এর তকমা পেয়ে যায়। বাংলা সাহিত্যে কল্পবিজ্ঞানের এই ‘সফট’-রূপটিরই রমরমা দেখা যায়।

সারা বিংশ শতাব্দী জুড়ে বাংলা হার্ড ও সফট সায়েন্স ফিকশনের ক্রমবিকাশে বিভিন্ন পত্রপত্রিকার ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রায় সিংহভাগ কল্পবিজ্ঞানই লেখা হয়েছে বাংলা জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচারমূলক ও শিশু-কিশোরপাঠ্য পত্রপত্রিকার চাহিদা মেটাতে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে যে সমস্ত শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞানের প্রবন্ধ প্রকাশিত হত, সেগুলিতেই বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প বা কল্পবিজ্ঞানের গল্প প্রকাশে আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। ১৮৮২ সালে হেমলাল দত্তের ‘রহস্য’ দুই পর্বে প্রকাশিত হয়েছিল যোগেন্দ্র সাধুর সচিত্র পত্রিকা ‘বিজ্ঞান দর্পণ’-এ। এই গল্পে বৈজ্ঞানিক সত্যকে জানানোর চেষ্টা করা হয়নি, বরং আগামী দিনে বিজ্ঞানের সম্ভাবনা কত আশ্চর্যজনক

হয়ে উঠতে পারে, তার আভাস দেওয়া রয়েছে। গবেষকের মতে, “For the urban elite of Calcutta, science stories were a kind of myth formation of the industrial age.”[৫] হেমলাল দত্তের রচনা তার সার্থক উদাহরণ। বিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোলের জ্ঞানকে তুলে ধরার পাশাপাশি কল্পবিজ্ঞানকেও আরো সমৃদ্ধ করে তোলার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। এই সময়ের বিখ্যাত কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যিকদের আবির্ভাবই ঘটেছে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখালেখির মাধ্যমে। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ‘সন্দেশ’ পত্রিকার পাতায় ১৩৩০ বঙ্গাব্দে সুকুমার রায় তাঁর হাস্যরসাত্ম কননসেন্স-জাতীয় রচনার ধরনে কল্পবিজ্ঞানের গল্প লেখেন ‘হেঁসোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরি’। এখানে তিনি তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা ‘খিচুড়ি’র মত নানা অদ্ভুত প্রাণীর কথা কল্পনা করেছেন, তারা কারাকোরাম-বন্দাকুশ পর্বতের দুর্গম স্থানে থাকা প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রাণী, যাদের প্রত্যেকের নামকরণ তিনি করেছেন বাংলা নামের সঙ্গে গ্রীক-ল্যাটিন নামের রসায়নে। সুকুমার রায়ের মৃত্যুর দীর্ঘদিন পর ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দে সন্দেশ পত্রিকার সম্পাদক হন সত্যজিৎ রায়। তাঁর হাতে সন্দেশের পাতায় আবার কল্পবিজ্ঞানের বিশেষ ধারা উন্মোচিত হয়। এইসময় তিনি সন্দেশের আশ্বিন, কার্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায় রচনা করেন প্রফেসর শঙ্কুর প্রথম গল্প ‘ব্যোমযাত্রীর ডায়েরি’। এছাড়াও ‘বঙ্কুবাবুর বন্ধু’সহ তাঁর আরো নানা ধরনের কল্পবিজ্ঞানের গল্প সন্দেশের বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য যে, সত্যজিৎ রায়ের রচনাগুলি শুধুই কল্পবিজ্ঞানের গল্প ছিল না, বরং তার সঙ্গে অ্যাডভেঞ্চার, রহস্যময়তা, অতিলৌকিকতা, ট্রাভেলগ ও চরম নাটকীয় মুহূর্তের এমন মেলবন্ধন ছিল যে তাঁর রচনাগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও সেগুলি কল্পবিজ্ঞানের পদবাচ্য হবে নাকি সে নিয়ে এখনো বিতর্কের অবসান হয়নি। পাশাপাশি, তাঁর রচিত কল্পবিজ্ঞানের গল্পগুলি প্রায় সবক্ষেত্রেই কোনো বৈজ্ঞানিক সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে না, বরং সেগুলিকে ‘বিজ্ঞান-সুবাসিত রূপকথা’ বললে কোনো অত্যুক্তি হয় না। অনেকে তাই তাঁর রচনাকে ‘সায়েন্স ফিকশন’ না বলে ‘সায়েন্স ফ্যান্টাসি’ বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু প্রফেসর শঙ্কু বাংলা সাহিত্যের কল্পবিজ্ঞানেরই বিশেষ চরিত্র হিসাবে পাঠকবর্গের কাছে আদৃত। এই চরিত্রটিকে বাংলা কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। প্রফেসর শঙ্কুকে বা সত্যজিৎ রায়ের অন্যান্য কল্পবিজ্ঞানের গল্পকে সায়েন্স ফিকশন বলে মেনে নিলে বাংলা কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের বৈচিত্র্যপূর্ণ সংজ্ঞা তৈরি হয়। তাই এক্ষেত্রে বলা যায়, বিংশ শতাব্দীতে বাংলা কল্পবিজ্ঞানের বিশেষ সংজ্ঞা নির্মাণে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী-প্রণীত ‘সন্দেশ’ পত্রিকার ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যের ‘রামধনু’ পত্রিকা ছিল বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ শিশু-কিশোর পত্রিকাগুলির মধ্যে অন্যতম। তিনি নিজেই কল্পবিজ্ঞানের গল্পকার হিসাবে এই পত্রিকার পাতায় আত্মপ্রকাশ করেন ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে ‘কাশ্মীরী রহস্য’ নামক কল্পবিজ্ঞানের গল্প রচনার মাধ্যমে। এই পত্রিকার পাতায় ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে ‘পিঁপড়ে পুরাণ’

নামক কল্পবিজ্ঞানের গল্প লিখে বাংলা কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের জগতে আবির্ভূত হন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র। শিশু-কিশোর-মননে পৃথিবীর ইতিহাস, ভূগোলের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা ও তাদের নিত্যনতুন বৈজ্ঞানিক সত্য অবগত করার ক্ষেত্রে তাঁর আগ্রহ ছিল অপরিসীম। সুরজিৎ দাশগুপ্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের কল্পবিজ্ঞান রচনার প্রেরণার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মনে করেছেন, "...একটি কারণ হল ছোটদের বিকাশশীল চরিত্রে বিজ্ঞানমনস্কতা জাগ্রত করার দায়। তাঁর মুখে শুনেছি, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর কিছুদিন পরে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধে, তখন তিনি চলে যান তাঁর জন্মস্থান বারাণসীতে এবং সেখানে কলকাতা থেকে আসেন মনোরঞ্জন ও ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য দু-ভাই। বিজ্ঞানে আগ্রহ উদ্দীপক বাংলা শিশুসাহিত্য গড়ে তোলার জন্য তখন তিনজনে মিলে নানা পরিকল্পনা শুরু করেন।"[৬] এই পরিকল্পনারই ফসল হল ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যের 'রামধনু' পত্রিকা এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের পিঁপড়ে পুরাণ উপন্যাস, যা রামধনু পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়। "বিজ্ঞানচেতনা সঞ্চার করা ছিল প্রেমেন্দ্রর জীবনের একটা ব্রত।"[৭] এ কারণেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের হাতে যথার্থ বাংলা হার্ড সায়েন্স ফিকশনের জন্ম হয়। পিঁপড়ে পুরাণের পরে দেব সাহিত্য কুটির থেকে প্রকাশিত ১৩৫২ বঙ্গাব্দের পূজাবার্ষিকী 'আলপনা'তে তাঁর ঘনাদা চরিত্রের প্রথম গল্প 'মশা' প্রকাশিত হয়। ঘনাদা চরিত্রটি প্রেমেন্দ্র মিত্রের এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। এই চরিত্র-সৃষ্টির কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সুরজিৎ দাশগুপ্ত বলেছেন, "ঘনাদার বানিয়ে বানিয়ে নিজের বাহাদুরির গল্পগুলির অবলম্বন যেসব তথ্য বা তত্ত্ব রয়েছে তাঁর কোনোটাই বানানো বা লেখকের উদ্ভাবিত নয়, সবগুলোই সম্পূর্ণ সত্য, শুধু ঘটনাবলির বিন্যাসটাই যেটুকু উদ্ভাবিত, প্রকৃতপক্ষে তাঁর সমস্ত গুলগল্পই ছদ্মবেশী শিক্ষামূলক সাহিত্য। ঘনাদার মজাদার গল্পের মোড়কে জ্ঞান বিতরণকেও প্রেমেন্দ্র মিত্র মনে করতেন তাঁর সাহিত্যিক কর্তব্য বলে। বিনোদন আর জ্ঞানদান একই সাহিত্যিক প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়েছে ঘনাদার গল্পগুলিতে।"[৮] ঘনাদা চরিত্র নিয়ে ধারাবাহিক রচনায় তাঁর বিশেষ পরিকল্পনা না থাকলেও কেবলমাত্র জনপ্রিয়তার জন্য নানা পত্রিকার পাতায় ঘনাদার নানা গল্প লিখতে তিনি উদ্বুদ্ধ হন। এরপর 'পক্ষীরাজ' পত্রিকার পূজাবার্ষিকীতে প্রকাশিত হয় ঘনাদা সিরিজের 'কালো ফুটো সাদা ফুটো', 'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান'-এর ১৯৮৭ সালের পূজাবার্ষিকীতে প্রকাশ পায় 'মৌ-কা-সা-বি-স বনাম ঘনাদা', সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ঘনাদার উপন্যাস 'সূর্য কাঁদলে সোনা' প্রকাশিত হতে থাকে। এছাড়াও সুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'মৌচাক' পত্রিকায় তিনি তাঁর অন্য এক কল্পবিজ্ঞানের নায়ক মামাবাবু চরিত্রটিকে ফুটিয়ে তোলেন। তাঁর অন্যান্য কল্পবিজ্ঞানের গল্পও এই পত্রিকার পাতায় প্রকাশিত হত। প্রেমেন্দ্র মিত্র বিশিষ্ট সাহিত্যিক হলেও তিনি বাংলা সাহিত্যের কল্পবিজ্ঞানের বিশেষ রচয়িতা হয়ে ওঠেন শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকাগুলির দৌলতে। এই পত্রিকাগুলির একান্ত

প্রচেষ্টা ব্যতীত বাংলা কল্পবিজ্ঞানের অন্যতম নায়ক ঘনাদাকে ও তার গল্পগুলিকে এত পরিণতরূপে পাওয়া সম্ভব হত না।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা কল্পবিজ্ঞানের স্বতন্ত্র পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ দেখা যায়। এতদিন অন্যান্য পত্রিকাতেই বিভিন্ন বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের মধ্যেই কল্পবিজ্ঞান মনোরম শিশু-কিশোর পাঠ্য হিসাবে আলাদা স্থান পেয়েছিল, কিন্তু ১৯৬৩ সালে 'আকাশ সেন' ছদ্মনামে অদ্রীশ বর্ধনের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'আশ্চর্য' হল বাংলা কল্পবিজ্ঞানের প্রথম নিজস্ব পূর্ণাঙ্গ কল্পবিজ্ঞান পত্রিকা। বাংলা কল্পবিজ্ঞানের ইতিহাসে এই পত্রিকার ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ এটি সত্যজিৎ রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্রের মত ব্যক্তিদের সান্নিধ্যলাভ করেছিল। সত্যজিৎ রায় ছিলেন এই পত্রিকার প্রধান পৃষ্ঠপোষক আর প্রেমেন্দ্র মিত্র ছিলেন এর প্রধান উপদেষ্টা। তাই এর উৎকর্ষতা ছিল প্রায় প্রশ্নাতীত। এই পত্রিকা প্রায় সাত বছর চলেছিল। এরপর আবার অদ্রীশ বর্ধন 'বিস্ময়' নামের আরেকটি কল্পবিজ্ঞানের পত্রিকা প্রকাশনার কাজ শুরু করেন। কিন্তু এটি ছিল একেবারেই ক্ষণস্থায়ী। অদ্রীশ বর্ধনের এর পরবর্তী কাজ ছিল 'ফ্যানটাস্টিক' ম্যাগাজিন। কিন্তু অনিয়মিত প্রকাশনার জন্য এই পত্রিকাও বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। অদ্রীশ বর্ধনের পরে বাংলা কল্পবিজ্ঞান পত্রিকার সম্পাদক ও লেখক হিসাবে উল্লেখযোগ্য কাজের নজির গড়েছেন অনীশ দেব। প্রথম সারির শিশু-কিশোর পত্রিকার জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কল্পবিজ্ঞান বিভাগ পরিচালনার পাশাপাশি বিজ্ঞানভিত্তিক রচনাতেও সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তিনি। বিমল করের 'গল্পপত্র' পত্রিকার বিশেষ কল্পবিজ্ঞান সংখ্যার সম্পাদনার কাজও তিনি করেন।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে আনন্দসাহিত্যগোষ্ঠী। তাদের শিশু-কিশোর পত্রিকা আনন্দমেলায় তারা বছরভর বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানমূলক আলোচনা ও কল্পবিজ্ঞানের গল্প বরাবর প্রকাশ করে এসেছে। ১৯৮৬ সালে আনন্দমেলার ডিসেম্বর সংখ্যাটি ছিল কল্পবিজ্ঞান বিশেষ সংখ্যা। এখানে প্রকাশিত হয় প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদা সিরিজের 'ঘনাদার চিংড়ি-বৃত্তান্ত' ও সত্যজিৎ রায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, অনীশ দেব, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সঙ্কর্ষণ রায়, সুবোধ সরকার প্রমুখ সাহিত্যিকদের কল্পবিজ্ঞানের গল্প। প্রকাশিত হয় অন্নদাশংকর রায়ের কলমে কল্পবিজ্ঞানের ছড়া 'চন্দ্রযান'। শুধু শিশু-কিশোর পাঠ্য আনন্দমেলাই নয়, আনন্দসাহিত্যগোষ্ঠী তাদের পরিণত মননশীল পত্রিকা 'দেশ'-এও কল্পবিজ্ঞানের কাহিনী প্রকাশ করে ১৯৮৭ সালের নভেম্বর সংখ্যায়। এই সংখ্যায় শিশুপাঠ্য উচ্ছ্বাস নয়, বরং বিজ্ঞানের সম্ভাবনা ও যুক্তিবাদিতাকে বজায় রেখে কল্পবিজ্ঞানের পরিণতমনস্ক তিনটি গল্প প্রকাশ করা হয়—জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকরের 'পুত্রবতী ভব', বিমল করের 'বিচিত্র সেই রামধনু', এবং শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'সময়'। আনন্দমেলার পাতাতেই শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কল্পবিজ্ঞানের গল্প-সম্বলিত 'অদ্ভুতুড়ে সিরিজ' জনপ্রিয়তা লাভ করে। প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের কল্পবিজ্ঞানের লেখক হিসাবে

প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে আনন্দসাহিত্যগোষ্ঠীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। এই শতাব্দীতেও তারা আনন্দমেলায় কল্পবিজ্ঞানের গল্প প্রকাশ করে চলেছে। এই বছরের জুলাই মাসের সংখ্যাটিও তাদের কল্পবিজ্ঞানের বিশেষ সংখ্যা। তাদের 'আরো আনন্দ' অ্যাপের 'আরো সাহিত্য' বিভাগে তাদের সমস্ত প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের জন্য পৃথক একটি সেকশন রয়েছে। তাদের এই প্রচেষ্টা প্রমাণ করে যে কল্পবিজ্ঞানকে শুধুই শিশুতোষ পাঠ্য করে না রেখে তাদের উদ্দেশ্য সেটাকে পরিণতমনস্কের উপযোগী করে তোলা।

১৯৬৮ সালে শিশুসাহিত্যের দরবারে আত্মপ্রকাশিত পত্রভারতী প্রকাশনার 'কিশোরভারতী' পত্রিকাটি প্রথম থেকেই কল্পবিজ্ঞানকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। কিশোরভারতীর পাতায় প্রকাশিত হয়েছে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'মামাবাবু' সিরিজের নানা গল্প, অনীশ দেবের কল্পবিজ্ঞানের গল্প, এবং 'বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প', 'বিজ্ঞানের সরস কাহিনী', 'বিজ্ঞানভিত্তিক ধারাবাহিক উপন্যাস' ইত্যাদি নানা বিভাগ। বস্তুতঃ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এমন একগুচ্ছ কিশোরমনস্ক পত্রিকার আবির্ভাব হয়েছিল যারা বিজ্ঞানের আশ্চর্যজনক খবর নিয়ে প্রবন্ধ রচনার পাশাপাশি কল্পবিজ্ঞানের গল্পকেও তাদের প্রকাশনার অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করেছিল। উপরিউক্ত পত্রিকাগুলি ছাড়াও তাদের মধ্যে আরও কিছু উল্লেখযোগ্য পত্রিকা হল 'বিজ্ঞানমেলা', পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের 'কিশোর বিজ্ঞানী', লীলা মজুমদার ও ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্যের 'আনন্দ বার্ষিকী' ইত্যাদি।

বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলা কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের দাবিদার বাংলাদেশ। বাংলা কল্পবিজ্ঞানের ধারাকে শুধুই শিশুপাঠ্য করে না রেখে তাকে বিশ্বমানে উন্নীত করার প্রয়াস প্রথম বাংলাদেশের লেখকদেরই করতে দেখা যায়। বাংলাদেশের বিজ্ঞানপত্রিকা 'বিজ্ঞান সাময়িকী'-এর পাতায় ধারাবাহিকভাবে কল্পবিজ্ঞানের উপন্যাস 'তোমাদের জন্য ভালবাসা' লিখে কল্পবিজ্ঞান লেখক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ। বাংলাদেশের বাংলা সাহিত্যের আরেকজন জনপ্রিয় কল্পবিজ্ঞান লেখক মুহম্মদ জাফর ইকবাল 'সাপ্তাহিক বিচিত্রা'-এর পাতায় তাঁর প্রথম গল্প 'কপোট্রনিক ভালবাসা' লিখে কল্পবিজ্ঞান লেখক হিসাবেই সাহিত্যের দরবারে আবির্ভূত হন। এঁদের কলমে কল্পবিজ্ঞানের প্রচলিত ধারার সঙ্গে মানবিকতা ও আবেগের মিশেলে বাংলা কল্পবিজ্ঞান হয়ে উঠেছে পরিণতমনস্ক ও সার্বজনীন। তবে বাংলাদেশের বিখ্যাত কার্টুনিস্ট আহসান হাবীব বাংলাদেশের প্রথম কল্পবিজ্ঞান পত্রিকা 'মৌলিক' প্রকাশনার কাজ শুরু করলেও তা তিন বছরের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়। তার কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে, "The magazine gathered a wide following but went defunct within three years because the new-generation writers and translators could not follow suit."[৯]

বর্তমানে বাংলাভাষায় পূর্ণাঙ্গ কল্পবিজ্ঞান পত্রিকা হল ২০১৬ সাল থেকে প্রকাশিত ওয়েব ম্যাগাজিন 'কল্পবিশ্ব'। এই পত্রিকাগোষ্ঠী শুধু কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যই নয়, কল্পবিজ্ঞানের ডকুমেন্টারি, সেমিনার ও বাংলা কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী তথ্য সংগ্রহে নির্ভরযোগ্য কর্মকাণ্ডের নিদর্শন রেখে চলেছে। কল্পবিজ্ঞান রচনায় পুরুষ লেখকদের প্রাধান্য বেশি থাকায় তারা বর্তমানে মহিলা লেখকদের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছে মহিলাদের কল্পবিজ্ঞান রচনায় উৎসাহিত করার লক্ষ্যে। সুকুমার রায়ের পরে হয়তো তারাই প্রথম কল্পবিজ্ঞানের সঙ্গে হাস্যরসের মেলবন্ধন ঘটানোর প্রয়াস দেখিয়েছে এবং হাস্যরসাত্মক কল্পবিজ্ঞানের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছে বিষয়ে বৈচিত্র্য আনার জন্যে। তবে তাদের প্রভূত কাজের নিদর্শনের পরেও বলা যায়, সত্যজিৎ রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অদ্রীশ বর্ধন, অনীশ দেবের পরবর্তী প্রজন্ম এই ধারায় এখনো শক্তিশালী লেখকের আগমনের অপেক্ষায় আছে। নতুন প্রজন্মের আধুনিক জীবনবোধের সঠিক বীজ বপন করার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের নিজস্ব বাংলা কল্পবিজ্ঞানের জন্ম দেওয়া যতদিন না সম্ভব হবে, ততদিন এই প্রচেষ্টার কোনো মূল্যায়ন সম্ভব নয়।

রেনেসাঁ পরবর্তী যুগে কল্পবিজ্ঞান বাঙালিকে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিয়েছে এ সম্পর্কে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। বর্তমান রূপকথার জায়গা সম্পূর্ণরূপেই নিয়ে নিয়েছে কল্পবিজ্ঞান। বইমেলা বা বইয়ের বছরভর বাজারে বিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট লেখকদের কল্পবিজ্ঞানের গল্প এখনো বেস্ট সেলার। বাংলা সাহিত্যের এই সমৃদ্ধ শাখায় দেড় শতাব্দী ধরে পত্রপত্রিকাগুলির বিশেষ উদ্যোগ থাকায় কল্পবিজ্ঞান রচয়িতাদের তাদের লেখনীর উৎকর্ষতার সঙ্গে পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করা সম্ভব হয়েছে। বাংলা কল্পবিজ্ঞানের স্বতন্ত্র জগৎ নির্মাণে এই পত্রপত্রিকাগুলির অবদান অনস্বীকার্য। এগুলোই ছিল সমগ্র বিংশ শতাব্দী জুড়ে কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের চরম উৎকর্ষতালাভের প্রধান চালিকা শক্তি। তবে একথাও মানতে হয় যে, শিশু-কিশোর পাঠ্য পত্রিকার হাত ধরে বাংলা সাহিত্যে কল্পবিজ্ঞানের যে অবতারণা, তার বিশেষ বদল পরবর্তীকালে আর সম্ভব হয়নি। এ প্রসঙ্গে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতামত উল্লেখযোগ্য, "বাংলায় বয়স্ক পাঠকদের মত এখনও কোনও সার্থক বিজ্ঞানভিত্তিক উপন্যাস রচিত হয়নি। ছোটদের জন্য লিখেছেন কেউ-কেউ, তবে সেগুলি ঠিক বিজ্ঞানভিত্তিক রচনা নয়, তার নাম দেওয়া হয়েছে, কল্পবিজ্ঞান। অর্থাৎ বিজ্ঞানের একটু আভাসমাত্র আর অনেকখানিই কল্পনা! এই কল্পবিজ্ঞানই এ যুগের রূপকথা।"[১০]এখানে উনি কল্পবিজ্ঞান বলতে শিশুপাঠ্য বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পকেই মূলত বুঝিয়েছেন। একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে বাংলা কল্পবিজ্ঞান সম্পর্কে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই মতামত বাংলা কল্পবিজ্ঞানের একটি বিশেষ অচরিতার্থতাকেই নির্দেশ করে। পশ্চিমী সভ্যতায় কল্পবিজ্ঞানের যে ধারা এগিয়েছে তার থেকে বাংলা কল্পবিজ্ঞানের ধারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, শুধু কিছু অনুবাদ গল্প ছাড়া পাশ্চাত্য কল্পবিজ্ঞানের মূলভাবটিকে বাংলা সাহিত্যে আত্তীকরণ করার চেষ্টা হয়নি। বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে কল্পবিজ্ঞানকে পরিণতমননের উপযোগী করার চেষ্টা

চললেও তা বাংলার মূলধারার সাহিত্যে স্বতন্ত্র স্থান করে নিতে পারেনি। প্রয়াস হিসাবেই রয়ে গেছে। বাংলার সমৃদ্ধ কল্পবিজ্ঞানের ধারাটিকে বজায় রাখতে বর্তমান পত্রপত্রিকাগুলির, বিশেষ করে কল্পবিজ্ঞান পত্রিকাগুলির এখন বিশেষ দায়িত্ব এই দিকে গুরুত্ব আরোপ করা। বাংলা কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের ভবিষ্যৎ নির্ধারক এখনও এই পত্রিকাগুলিই।

তথ্যসূত্র :

১. Debjani Sengupta, "Sadhanbabu's friends: Science fiction in Bengal from 1882–1961.", *Sarai Reader*, 2003,p. 77

২. N. C. Mondal, "Popular science writing in Bengali–past and present.", *SCIENCE REPORTER*, March 2012, p. 43

৩. অনীশ দেব, "কল্পবিজ্ঞান প্রসঙ্গে", *সেরা কল্পবিজ্ঞান*, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা ৭

৪. সুরজিৎ দাশগুপ্ত, "ভূমিকা", *ঘনাদা সমগ্র*, প্রথম সংকরণ, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স পাইভেট লিমিটেড, ২০০০, পৃষ্ঠা ১১

৫. Debjani Sengupta, "Sadhanbabu's friends: Science fiction in Bengal from 1882–1961.", *Sarai Reader*, 2003,p. 76

৬. সুরজিৎ দাশগুপ্ত, "ভূমিকা", *ঘনাদা সমগ্র*, প্রথম সংকরণ, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স পাইভেট লিমিটেড, ২০০০, পৃষ্ঠা ৭

৭. ঐ।

৮. ঐ।

৯. Ashfaq Wares Khan, "Translating Imaginations.",*Star Magazine*, 12 Mar. 2004, archive.thedailystar.net/magazine/2004/03/02/interview.htm. accessed on 29.07.2023

১০. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, "শুরুর আগে", *কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র*, কলকাতা, পত্রভারতী, ২০০৫, পৃষ্ঠা ৬

জীবজগতের অস্তিত্ব সংকট : পরিত্রাণের খোঁজে ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার ভূমিকা

মারুফা খাতুন
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
দ্বিজেন্দ্রলাল কলেজ

সারসংক্ষেপ : মানুষের আবির্ভাবের প্রায় কয়েক লক্ষ বছর কেটে গিয়েছে বর্বর বিপদ সংকুল প্রাণীদের সঙ্গে সংগ্রামরত অবস্থায়। যাযাবর জীবনে নিত্যদিন চলত অস্তিত্বের লড়াই। মানুষ ক্রমশ সভ্য হল। স্থায়ী বসতি স্থাপন করলো। গড়ে উঠল গ্রাম ও শহর। মানুষ ক্রমাগত উন্নয়নের নেশায় মেতে উঠল। নগরায়নের নেশায় অপরিকল্পিতভাবে প্রকৃতিকে ব্যবহার করতে লাগল। ফলে দেখা দিল জীবজগতের অস্তিত্ব সংকট। বহু তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায় যে কিভাবে জীব ও জড় জগৎ-এর অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। এই সংকট থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসেবে পরিবেশ নীতিবিদ্‌দের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। তথ্য থেকে উঠে এসেছে পরিবেশকে সংরক্ষণ করতে হবে নিজের অস্তিত্বকে সংকটের হাত থেকে রক্ষার জন্য এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য। জীবজগতের অস্তিত্ব সংকটের অর্থ হল মানুষের নিজেরই অস্তিত্ব সংকট।
সূচক শব্দ : জীবজগৎ, প্রকৃতি, উন্নয়ন, মানব সভ্যতা, নৈতিকতা, অস্তিত্ব।

সৃষ্টির আদি লগ্ন থেকে জীব, জড় ও মানুষ এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। পৃথিবীতে যেমন প্রাণ আছে, তেমনি প্রাণ ধারণের উপাদানও আছে। কিন্তু আধুনিক মানুষের অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রা জীবজগৎ অর্থাৎ প্রকৃতিকে করেছে বিপন্ন। সৃষ্টিলগ্ন থেকে মানুষ জল, আলো, বাতাস, মাটি, গাছপালা, পশুপাখি – এসবের ব্যবহার প্রয়োজনের তাগিদে করত। তাই প্রকৃতি ও মানুষের ভারসাম্য বজায় ছিল। কিন্তু আধুনিক মানুষ স্বল্প সময়ে সমস্ত পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় আনতে চেয়েছে। প্রয়োজনাতিরিক্ত চাহিদা প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে দূরত্ব বাড়িয়েছে। তাই অনেক কিছু পেয়েও আমরা অনেক কিছু হারিয়েছি। মানুষ, জীবজগৎ (পশু-পক্ষী, এমন কি বৃক্ষ) এবং জড় (পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, জল, আলো, বাতাস, গতি পরিবর্তন, ঋতু পরিবর্তন) – এসবের সমগ্রতাই পরিবেশ। পরিবেশের অন্তর্গত জীব ও জড়ের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও আদান-প্রদানই হল জড় ও অজড়ের ভারসাম্য অবস্থা (Ecology)।মানুষের অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রা এই ভারসাম্য ব্যাহত করে। ফলে দেখা দেয় জীবজগতের অস্তিত্ব সংকট।

“আকাশ ভরা সূর্য-তারা, বিশ্ব ভরা প্রাণ, তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান...”(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘প্রকৃতি’পর্যায়ের গান)। সৃষ্টির আদি লগ্নে প্রকৃতি ছিল বন্ধ্যাপাষাণী। প্রাণহীন সমুদ্রগর্ভে প্রাণের সঞ্চার ঘটে, এরপর বৃক্ষ-তরুলতা এবং

সবশেষে আবির্ভাব ঘটে মানুষের। প্রাণহীন পাষাণী পৃথিবীকে যদি মূল রূপে গণ্য করা হয় তবে পরবর্তী পর্যায়গুলি সবাই সবাইকে অর্থাৎ পাষাণ পৃথিবী বৃক্ষ-তরুলতাকে ধারণ করার জন্য, বৃক্ষ-তরুলতা জীবজগৎকে ধারণ করার জন্য এবং জীবজগৎ মানুষকে ধারণ করার জন্য এক প্রস্তুতিপর্ব। তাই বলা যায়, প্রতিটি পরবর্তী পর্যায় পূর্ববর্তী পর্যায়ের উপর নির্ভরশীল। এদের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার মধ্যে একটি পর্যায় সুরক্ষিত না থাকলে অন্যটি সুরক্ষিত থাকে না। এভাবে চলে জড় ও অজরের ভারসাম্য অবস্থা। এই ভারসাম্য নষ্ট হলে সুজলা-সুফলা পৃথিবী আবার বন্ধ্যা পাষাণীতে রূপান্তরিত হবে। মানুষের আবির্ভাবের প্রায় কয়েক লক্ষ বছর কেটে গিয়েছে বর্বর বিপদ সংকুল প্রাণীদের সঙ্গে সংগ্রামরত অবস্থায়। যাযাবর জীবনে নিত্যদিনে চলত অস্তিত্বের লড়াই, বেঁচে থাকার লড়াই। খাদ্যের সন্ধানে মানুষ দিশেহারা, প্রকৃতির কাছে অসহায়। ঝড়, ঝঞ্ঝা, বাতাস, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও হিংস্রজন্তুর হাত থেকে কিভাবে নিজেকে রক্ষা করবে সবই অজানা। আতঙ্ক থেকে রক্ষার জন্য মানুষ শুরু করল প্রকৃতি পূজা। দিশেহারা মানুষ ক্রমে প্রস্থর খন্ডের সাহায্যে অস্ত্র বানাতে শিখল। পাথরের ঠোকাঠুকিতে আদিম মানুষ দেখতে পেল আলোর ঝল্কানি। অস্ত্র ও আগুনের আবিষ্কার মানুষের সভ্যতাকে কয়েক ধাপ এগিয়ে দিল এবং অন্যান্য সমস্ত প্রাণী থেকে আলাদা করে দিল। খাদ্যের জন্য অনিশ্চিত পশুশিকারের উপর নির্ভর না করে শুরু করল পশুপালন। ভূমিকর্ষণ, বয়ন ও কুলালের কাজ মানুষকে সভ্যতার আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে দিল। শুরু হল স্থায়ী বসতি স্থাপন। গড়ে উঠলো গ্রাম ও নগর।

এরপর মানুষ ক্রমাগত উন্নয়নের নেশায় মেতে উঠল। ক্রমশই মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির দূরত্ব বাড়তে থাকল। লৌহ-ইস্পাতের ব্যবহার মানব সভ্যতার জয়যাত্রাকে ত্বরান্বিত করল। অতঃপর বারুদের ব্যবহার,বাষ্পীয় শক্তির আবিষ্কার, তড়িৎ শক্তির উদ্ভাবন, বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ ও পরমাণুর ব্যবহার মানব সভ্যতার নতুন দিগন্ত খুলে দিল। নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য শুরু হলো প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার। ভোগবাদের লালসায় যথেচ্ছ পশুনিধন ও বৃক্ষচ্ছেদন জীবজগতের অস্তিত্ব বিপন্ন করেছে। ফলে ব্যাহত হচ্ছে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য।

“মানুষ অমিতাচারী, যতদিন সে অরণ্যচর ছিল ততদিন অরণ্যের সঙ্গে পরিপূর্ণ ছিল তার আদান-প্রদান;ক্রমে সে যখন নগরবাসী হল তখন অরণ্যের প্রতি মমত্ববোধ হারালো; যে তার প্রথম সুহৃদ...সেই তরুলতাকে নির্মমভাবে নির্বিচারে আক্রমণ করল ইট কাঠের বাসস্থান তৈরি করার জন্য” (অরণ্য দেবতা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খন্ড)।

“...মানুষ গৃধ্নুভাবে প্রকৃতির দান কে গ্রহণ করেছে; প্রকৃতির সহজ দানে কুলোয়নি, তাই সে নির্মমভাবে বনকে নির্মূল করেছে। তার ফলে আবার মরুভূমিকে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ হয়েছে”। (অরণ্য দেবতা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খন্ড)।

স্বার্থলোভী মানুষ এমনভাবে প্রকৃতিকে ধ্বংস করে চলেছে যে অপরিনামদর্শী মানুষ ক্রমে নিজের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে চলেছে। ইট-কাট-পাথরের শহর ও নগর, কলকারখানাবেষ্টিত শিল্পমন্ডলে চরম পরিণতি রূপে দেখা দিয়েছে উষ্ণ পরিমন্ডল (Greenhouse effect)।আমরা যতই সাইবার দুনিয়ায় বিচরণ করি না কেন বাস্তবে আমাদের বেঁচে থাকার একমাত্র আশ্রয়স্থল প্রকৃতি। প্রকৃতির মুক্ত বায়ু, পরিশুদ্ধ জল, নির্মল আলো, বাঁচিয়ে রাখবে আমার আত্মাকে,

দর্শন অতি প্রাচীন শাস্ত্র হলেও দর্শনের শাখা হিসাবে পরিবেশ নীতিবিদ্যার ধারণাটি অতি প্রাচীন নয়।মোটামুটি ১৯৭০ সাল থেকে পরিবেশ ভাবনার উপর লিখিত বিষয় আমরা পাই। বিংশ শতাব্দীর পরিবেশ নীতিবিদ্‌দের লেখনি ও আলোচনায় আমরা দেখতে পেয়েছি যে পরিবেশের প্রতি অর্থাৎ জীবজগতের প্রতি আমাদের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। সৃষ্টির আদি লগ্ন থেকে দুর্যোগ ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় ছিল কিন্তু তার জন্য মানুষ দায়ী ছিল না। প্রাকৃতিক শক্তিকেই দায়ী করা যায়। কিন্তু আধুনিক বিশ্বে মানুষ নিজেই প্রকৃতির ধ্বংসের কারণ। মানুষ প্রকৃতির বুকে এমনই এক ধংসলীলায় মেতে উঠেছে যে সারা বিশ্ব আজ আতঙ্কিত। দেখা দিয়েছে নৈতিকতার প্রশ্ন।

এই সংকট মোচনের জন্য অনেকে ভাবতে শুরু করেছেন।Peter Singer একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন।“A river tumbles through forested ravines and rocky gorges towards the sea. The state hydroelectricity commission sees the falling water as untapped energy. Building a dam across one of the gorges would provide three years of employment for a thousand people, and longer-term employment for twenty or thirty. The dam would store enough water to ensure that the state could economically meet its energy needs for the next decade. This would encourage the establishment of energy-intensive industry thus further contributing to employment and economic growth.

The rough terrain of the river valley makes it accessible only to the reasonably fit, but it is nevertheless a favoured spot for bush walking. The river itself attracts the more daring white-water rafters. Deep in the sheltered valleys are stands of rare Huon Pine, many of the trees being over a thousand years old. The valleys and gorges are home to many birds and animals, including an endangered species of marsupial mouse that has seldom been found outside the valley. There may be other rare plants and animals as

well, but no one knows, for scientists are yet to investigate the region fully.”

এখন প্রশ্ন হল উপরোক্ত দুটি দিকের মূল্যায়নের মানদন্ডে পাহাড়ি নদীটির গতিরোধ করে বাঁধ নির্মাণ করা কি উচিত? যাদের কাছে বনসম্পদ ও প্রাণিসম্পদ রক্ষার তুলনায় কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন বেশি মূল্যবান, তারা হয়তো বাঁধ নির্মাণের স্বপক্ষে যাবেন। আবার যারা ব্যবহারিক নৈতিকতার দিক থেকে পরিবেশ সুরক্ষাকে মুখ্য বলেন, তারা বাঁধ নির্মাণের বিপক্ষে মত দেবেন। এটি একটি বিতর্কিত বিষয়।

পরিবেশ ও প্রকৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন ভাবধারা আলোচিত হয়েছে বিশেষ করে ইহুদিদের ভাবধারা ও প্রাচীন গ্রীক দর্শনে অ্যারিস্টটল্-এর ভাবধারা।Old Testament-এর সৃষ্টি তত্ত্বে বলা হয়েছে:“And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.

So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.

And God blessed them, and God said upon them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it; and have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth.”

অ্যারিস্টটল্-এর মতে: “Plants exist for the sake of animals, and brute beasts for the sake of man-domestic animals for his use and food, wild ones (or at any rate most of them) for food and other accessories of life, such as clothing and various tools.

Since nature makes nothing purposeless or in vain, it is undeniably true that she has made all animals for the sake of man.”

তবে প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকগণ প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করেন। এই মত অনুসারে শুধুমাত্র মানুষ স্বতঃমূল্যবান নয়, জগতের সব কিছুই স্বতঃমূল্যবান।সব কিছুই আনন্দের প্রকাশ।ঋক্সংহিতা-এ বলা হয়েছে,“মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।মাধ্বীর্নঃসন্ত্বোষধীঃ। মধু নক্তমুতোষসোমধুমৎপার্থিবং রজঃ। মধু দৌরস্তু নঃ পিতা।মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তুসূর্য্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তুনঃ”।

অর্থাৎ ‘জগৎ মধুময়, বাতাস মধু বহন করে, সমুদ্র মধুক্ষরণকরে।বনস্পতি মধু বহন করুক, রাত্রি মধু হোক,ঊষা মধু হোক, পৃথিবীর ধূলিকণা মধু হোক, সূর্য মধুময়

হোক'। মানুষের জীবনে যে মধুময় আনন্দের প্রকাশ সমগ্র জগতে তারই প্রকাশ উপলব্ধ হোক। বুদ্ধদেবও সমস্ত প্রাণীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ কামনা করেছেন।

এটা অবশ্য স্বীকার্য যে পরিবেশের প্রতি আমাদের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য বিদ্যমান।এ কথা স্বীকার করে নিয়েতিনটি উল্লেখযোগ্যমতবাদ পরিলক্ষিত হয়।

১)Anthropocentric view বা নৃকেন্দ্রিক মতবাদ: এই মতবাদ অনুসারে পরিবেশের প্রতি আমাদের যে দায়িত্ব ও কর্তব্য তা প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ। মানুষের প্রতি আমাদের নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে। তাই মানুষের প্রয়োজনের কথাচিন্তা করেই প্রকৃতিকে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। নির্বিচারে প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস করলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবন রক্ষা করা কঠিন হবে। মানুষের প্রতি কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে বলে মানুষের স্বার্থে প্রকৃতিকে সংরক্ষণ করা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

২) Non-anthropocentric view বা অ-নৃকেন্দ্রিকমতবাদ:এই মতবাদ অনুসারে প্রকৃতি বা পরিবেশের প্রতি আমাদের নিঃস্বার্থ দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। আমরা প্রাণীদের হত্যা করতে পারিনা, কারণ তারা কষ্ট পায়। আমরা বৃক্ষলতাকে ধ্বংস করতে পারিনা, কারণ তাদের অস্তিত্বের মূল্য আছে।

৩) Holistic ethics:আমরা জানি জীবন ধারণের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। তাই সমস্ত প্রাণী বা উদ্ভিদকে আমরা সংরক্ষণ করতে পারিনা। এসব ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি সামগ্রিক হওয়া উচিত। জীবনের তাগিদে কিছু কিছু প্রাণী হত্যা করা হলেওসমস্ত প্রজাতি যেন বিলুপ্ত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা আমাদের কর্তব্য। মার্কিন বাস্তুবিদ্আল্দো লিওপোল্ড বাস্তুবিদ্যাকে নীতিবিদ্যার সাথে যুক্ত করেন। তিনি সর্বপ্রথম Land Ethics বা ভূমিকেন্দ্রিক নীতিবিদ্যার ধারণা প্রবর্তন করেন।তিনি এখানে Land কথাটি শুধুমাত্র 'ভূমি' অর্থে ব্যবহার করেননি। তার মতে ভূমি হল 'শক্তির উৎস'। যে শক্তি মৃত্তিকা থেকে উদ্ভিদে এবং উদ্ভিদ থেকে প্রাণীতে প্রবাহিত হয়।তাইLand বা ভূমিকে রক্ষা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

মানুষ তার যথেচ্ছ ক্রিয়া-কলাপের দ্বারা প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস করলে বায়ুতে ওজোন-এর পরিমাণ কমে গিয়ে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যায়, যা পরিবেশের প্রতিকূল নয়। তাই আমেরিকান পরিবেশবিদ Bill McKibben-এর "The End of Nature" গ্রন্থকে সমর্থন করে বলতে পারি,মানুষের যথেচ্ছ ক্রিয়া-কলাপের দরুন যতটুকু প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস হয়েছে, হতাশ না হয়ে যেটুকু অবশিষ্ট রয়েছে তা রক্ষা করা উচিত। মনুষ্যকৃত বিপর্যয়গুলি কমে গেলে স্বাভাবিক নিয়মেই প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলি কমে যাবে। এমন কতগুলি বিষয় আছে যা আমরা জানি কিন্তু সচেতন নই, তাহলে যতই পরিবেশ বাঁচানোর জন্য চিৎকার করি না যেন তা নিস্ফল হবে। যেমন-সুগভীর বন-জঙ্গল পশু-পক্ষীর আশ্রয় বা আবাসস্থল। অরণ্যের ফলমূল খেয়ে বন্যপ্রাণীগুলি জীবন ধারণ করে। বৃক্ষচ্ছেদনের ফলে সুগভীর অরণ্য ধ্বংস হচ্ছে যা বন্যপ্রাণীদের স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অন্তরায়। দুই তৃতীয়াংশ মানুষ যখন খাদ্যের

টানে দিশেহারা। এক তৃতীয়াংশ মানুষের ভোগবিলাসের দরুন বৃহৎ অরণ্য ধ্বংস হচ্ছে। অতিরিক্ত পশু মাংস ভক্ষণের ফলে গবাদি পশুর খাদ্য যোগানের উদ্দেশ্যে ঘন অরণ্য ধ্বংস করে কৃষি-ক্ষেত্র ও বিচরণ ক্ষেত্র তৈরি করা হচ্ছে। উগ্রভোগবাদ ওবিলাসীতার জন্য এবংমূল্যবান কাঠের গৃহস্থালির আসবাবের জন্য অরণ্য যথেচ্ছভাবে ধ্বংস হচ্ছে।নিরামিষাশী হয়েও বিলাসবহুল জীবনযাত্রার ফলে বাঘ, গন্ডার, হাতি প্রভৃতি দুর্লভ পশুদের নিধন করে চামড়া, শৃঙ্গ,দাঁত ও মাংসের লোভে নির্মমভাবে প্রাণীদের নিধন করছে। বৃহৎ বনভূমি কেটে পাকা রাস্তা ও রেলপথ আজকের অরণ্য সমাজকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে। যার জ্বলন্ত উদাহরণ রেল লাইনেহাতির মৃত্যু। এছাড়া অরণ্য অঞ্চলে পিকনিকের আনন্দে মাইক বা ডিজে ব্যবহারের ফলে বন্যপ্রাণীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ছন্দপতন ঘটছে। মানুষ যদি একটু সচেতন হয়, ভোগ বিলাসের মাত্রা যদি একটু কমিয়ে আনা যায়,তাহলে হয়তো এত দ্রুত অরণ্য সম্পদ নষ্ট হয়ে যাবে না। যতদিন না গভীর জঙ্গলে রেললাইনে ওয়াইল ক্যান্টিলিভার ব্রিজ হয় ততদিন বিকল্প সড়ক পথে যদি মানুষ যাতায়াত করে তাহলে হয়তো বন্যপ্রাণীদের ভবিষ্যতে হারাতে হবে না।

পরিবেশের প্রত্যেকটি জলাভূমির একটি গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য আছে। আমরা জানি জলের অপর নাম জীবন। কিন্তু সেই জল যদি দুর্গন্ধযুক্ত, ঘোলাটে, জীবাণুযুক্ত ও অস্বচ্ছ হয় তখন তাকে কি জীবন বলা যায়? গৃহস্থালির কাজে ব্যবহৃত জল, হোটেল-কারখানার নির্গত বর্জ্য, কৃষিকাজে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার, কীটনাশক জল দূষণ ঘটায়। জলের উপরে তলে শৈবাল নামে মোটা আস্তরণ তৈরি হয়। ফলে জলজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষ করতে পারেনা এবং মারা যায়। সমুদ্রের জলে জাহাজ থেকে নির্গত ডিজেল, মবিল মিশে গিয়ে সামুদ্রিক প্রাণীদের জীবনহানি ঘটে।আমরা জানি, গঙ্গা দূষণের মূল কারণ হলো- গঙ্গার ধারে বসবাসকারী কয়েক কোটি মানুষের মলমূত্র, গৃহস্থালির বর্জ্যপদার্থ। এইসব বর্জ্য পদার্থ সরাসরি গঙ্গার জলে মিশে যাওয়ার ফলে 'ফিক্যাল কলিফর্ম' নামক ব্যাকটেরিয়া জন্মায়। এই জল পেটে ঢুকলে টাইফয়েড, কলেরার মতো অসুখ শরীরে বাসাবাঁধে। এই বর্জ্য পদার্থ গঙ্গার বুকে না মিশতে দিয়ে যদি বাইরে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে হয়তো আবার দূষণমুক্ত গঙ্গাকে ফিরে পাওয়া সম্ভব। বর্তমানে মৃত্তিকা দূষণের সবচেয়ে বড় কারণ হলো গৃহস্থালি, কারখানা থেকে নির্গত বর্জ্য পদার্থ। গৃহস্থালির পরিত্যক্ত পলিপ্যাক, প্লাস্টিকের কৌটো, বোতল- এইসব পদার্থ মৃত্তিকার উপরিভাগে বিভিন্ন প্রকার প্রোটোজোয়া, ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়ার আশ্রয়স্থল হয়ে থাকে।আমরা যদি সচেতন ভাবে গভীর গর্ত করে এগুলো ফেলি এবং মাটি চাপা দিই, যেসব পদার্থ পুড়ে ছাই হয়ে যায় সেগুলি পুড়িয়ে ফেলি কিংবা যেগুলি রিসাইকেল করা সম্ভব সেদিকে নজর দিই, তাহলে মৃত্তিকা দূষণ কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণে থাকবে। মৃত্তিকা দূষণের আরো একটি বড় কারণ হলো মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক সার ব্যবহার। অতিরিক্ত ভূমিকর্ষণের ফলে মাটি তার উর্বরশক্তি ক্রমশ হারিয়ে ফেলছে।

অতিরিক্ত খনিজ তৈল উত্তোলন, যথেচ্ছ বৃক্ষছেদন, পর্বত শঙ্কুল পরিবেশে অবৈধ ইমারত স্থাপন ভূমি ধ্বংস ও ভূমিক্ষয়কে ত্বরান্বিত করছে। মানুষ সচেতন হলে মৃত্তিকা দূষণ রোধ করা সম্ভব। নির্মল বাতাস প্রকৃতির দান। প্রাণিজগতে বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেন আবশ্যক। অক্সিজেন বায়ুমন্ডলের ওজোন স্তর তৈরি করে। এই ওজোন স্তর না থাকলে প্রাণের অস্তিত্ব অসম্ভব হয়ে পড়বে। অপরিকল্পিত শিল্পস্থাপন ও যানবাহনের উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বায়ু দূষিত হচ্ছে। গৃহস্থালির উদ্ভূত ধোয়া ও অত্যধিক ধূমপান বায়ুকে দূষিত করছে। ফলে বায়ুতে ওজোন গ্যাসের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। কারখানার ধোয়া ও গ্যাস বায়ুকে বিষাক্ত করে তুলেছে। শরীরে প্রবেশ করলে তীব্র বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। মানুষ সচেতন হলে প্রথমে চিন্তা করবে কিভাবে বায়ু দূষণের উৎসমুখ বন্ধ করা যায়। শিল্প কারখানা অবশ্যই স্থাপন করতে হবে। কিন্তু কারখানা নির্গত বিষাক্ত গ্যাস কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় তারও বিকল্প প্রযুক্তির পথ খুঁজতে হবে। আমরা ভোপালের গ্যাস দুর্ঘটনা কথা বিস্মৃত হইনি। আমরা ভুলিনি জাপানের পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের কথা। চের্নোবিল পারমাণবিক দুর্ঘটনার কথা। দমদম এর নাগেরবাজারে হিমঘরের গ্যাস নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে অ্যামোনিয়া গ্যাসকে যে জলাশয় ফেলা হয়েছিল তার জল সবুজ হয়ে যায় এবং জলাশের মাছ ও অন্যান্য প্রাণীরা মারা যায়।

উপসংহারে বলা যায় যে এসব বিষয়ে আমরা সকলেই জানি কিন্তু প্রশ্ন হল জানা এবং চেতনা কি এক বিষয়? যদি আমাদের চেতনা জাগে তাহলে অবশ্যই তার সঙ্গে দায়িত্ব ও কর্তব্য কথাটি জড়িয়ে থাকবে। আমাদের একমাত্র নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য হবে আমরা যে সম্পদ ইতিমধ্যে নষ্ট করে ফেলেছি সেসব চিন্তা না করে যেটুকু সম্পদ রয়েছে তাকে কিভাবে সংরক্ষণ করব এবং আগামী প্রজন্মের জন্য কিছুটা দূষণমুক্ত পরিবেশ উপহার দিতে পারব। আজকের পরিবেশ কেন্দ্রিক নীতিবিদরা বলেন একান্ত প্রয়োজন ছাড়া শুধুমাত্র নিজের সুখ ও স্বাচ্ছন্দের জন্য পরিবেশ বা বাস্তুসংস্থানের ক্ষতি সাধন করা অন্যায় বা অনুচিত।

সূত্র নির্দেশ :

১) Practical Ethics: 2nd Edn- Peter Singer, Cambridge University Press.

২) সান্মানিক নীতিবিদ্যা: সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বুকসিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড।

৩) নীতিবিদ্যা ও ফলীত নীতিবিদ্যা: ড. দীক্ষিত গুপ্ত,সোমা বুক এজেন্সী।

৪) আধুনিক পরিবেশ বিদ্যা: ড. আশিস মুখোপাধ্যায় ও ড. সূর্য প্রকাশ আগারওয়াল, ভট্টাচার্য্য ব্রাদার্স।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : প্রসঙ্গ আরণ্যক চেতনা

বৈদ্যনাথ বাস্কে
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
নিউ আলিপুর কলেজ

সারসংক্ষেপ : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোধ্যায়ের সাহিত্যে আরণ্যক' চেতনার পরিচয় বর্তমান। অথচ তাঁর 'আরণ্যক'(১৯৩৯) উপন্যাসের আধারে আরণ্যক চেতনা বিস্তার লাভ করেছে। যেকারণে তাঁর ছোটগল্পে আরণ্যক চেতনা অনালোকিত থেকে যায়। অথচ তাঁর ছোটগল্প নামক সাহিত্য শাখাতেও তাঁর 'আরণ্যক' চেতনার প্রকাশ প্রতিফলিত হয়। তাঁর ছোটগল্পে কখনো প্রত্যক্ষ ভাবে, কখনো পরোক্ষ ভাবে আরণ্যক চেতনার পরিচয় নিবিড়তা লাভ করেছে।
সূচক শব্দ : আরণ্যক, ঈষোপনিষদ, আদিবাসী, সাঁওতাল, ইছামতী

মূল আলোচনা :

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যে আরণ্যক চেতনার নিবিড় যোগ বর্তমান। তাঁর একটি উপন্যাসের নাম হল 'আরণ্যক'(১৯৪৯)। যা তাঁর অরণ্য চেতনাকে প্রতিভাত করে তোলে। উপন্যাসের জনপ্রিয়তার জন্যই তাঁর আরণ্যক চেতনার সীমাবদ্ধতা লক্ষ করা যায়। তবে উপন্যাস ছাড়াও তাঁর ছোটগল্পের মধ্যেও আরণ্যক চেতনা নিহীত। এ বিষয়ে চণ্ডীকাপ্রসাদ ঘোষাল বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরণ্যক চেতনা সম্পর্কিত রচনা সংকলন প্রকাশ করেছেন 'অরণ্য সমগ্র বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়' গ্রন্থের মধ্যে। উক্ত গ্রন্থে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরণ্যক বিষয় সম্পর্কিত গল্পের তালিকা প্রস্তুত করেছেন। শুধু তাই নয়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেশ কিছু গল্পে আরণ্যক চেতনার বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে আরণ্যক চেতনার বিস্তারের নেপথ্যে নানা কারণ সক্রিয়। তাঁর সাহিত্যে মানুষ ও প্রকৃতির মুখ্য ভূমিকা রয়েছে। প্রকৃতি চেতনার সূত্র ধরেই তাঁর আরণ্যক চেতনার বিকাশ সম্পন্ন হয়েছিল। গাছপালা, লতাপাতা, ফুল ফলের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগ লক্ষ করা যায়। এছাড়া ইছামতী নদীতীরের শ্যামল, সবুজ প্রকৃতি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরণ্যক চেতনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সহায়তা করেছিল। তিনি ইছামতী নদীতীরের এই শ্যামল, সবুজ প্রকৃতির জন্য একাত্মতা অনুভব করেন। এছাড়া সলতেখাগী কিংবা বকুল গাছের মধ্যে মানুষের মত ব্যক্তিত্বের ছায়া লক্ষ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, অরণ্যের সৌন্দর্যের রূপসুধা পান করার জন্যই চাতক পাখীর মত অরণ্যের অনুসন্ধান করেছেন। কুঠির মাঠ, চালকী,

গোপালনগর, বনগাঁর অরণ্য-প্রকৃতির সৌন্দর্য তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। তিনি চালকীর অরণ্য প্রকৃতি দেখে কষ্ট করে ট্রপিক্যাল ফরেস্ট দেখতে যাওয়াকে অনর্থক মনে করেন। আসলে শৈশব থেকেই তাঁর মনে আরণ্যক চেতনা সুপ্ত অবস্থায় ছিল। বড় হওয়ার সঙ্গে সেই চেতনা আরও গভীর হয়ে ওঠে। গৌরক্ষিণী সভার প্রচারক হিসেবে পূর্ববঙ্গে ভ্রমণের সময় আরাকান ইয়েমার পার্বত্য অরণ্য প্রদেশ দেখে তাঁর অরণ্যের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পায়। এছাড়া ১৯২৪-২৭ সাল পর্যন্ত বিহারের ভাগলপুরে খেলাৎ চন্দ্র ঘোষের জমিদারের ম্যানেজার হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। সে সময় তাকে অরণ্যময় লবটুলিয়া, নাঢ়া, ফুলকিয়া বইহারের অরণ্যে দিন অতিবাহিত করতে হয়েছিল । ফলে অরণ্যের সঙ্গে ঘনিষ্টতা আরও নিবিড় হয়ে ওঠে। এছাড়া ১৯৩৪ সালের পরে ঘাটশিলা সহ সিংভুম, মানভূম, ছোটনাগপুরের জঙ্গলে বিচরণ করেছেন। এশিয়া মহাদেশের বৃহত্তম অরণ্য সারেণ্ডা বনভূমি সহ কলহন অরণ্যে ঘুরে বেড়িয়েছেন। যেকারনে তাঁর কাছে অরণ্যই ছিল তীর্থক্ষেত্র। অরণ্যের টানে তিনি বারবার অরণ্যে অবগাহন করেছেন। স্বভাবিকভাবেই তাঁর মধ্যে আরণ্যক চেতনা প্রকট ভাবে লক্ষ করা যায়।

আসলে 'আরণ্যক' শব্দের অর্থ হল বন বা অরণ্য সম্বন্ধীয় কিছু। এছাড়া উপনিষদের একটি অংশকেও বোঝায়। আবার 'আরণ্যক' শব্দের মানে বনের বন্যতা তথা যৌনতা এবং হিংস্রতাকেও প্রকাশ করে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যে 'আরণ্যক' এর প্রথম দুটি অর্থ প্রকাশ পেয়েছে। তবে তৃতীয়টি তথা হিংস্রতা এবং যৌনতার কথা তাঁর সাহিত্যে অনুপস্থিত। সেদিক থেকে ব্যতিক্রম বিভূতিভূষন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরণ্যক চেতনা। তাঁর ছোটগল্পেও যৌনতা এবং হিংস্রতার পরিচয় নিবিড়তা লাভ করেননি। আসলে অরণ্য ভ্রমণের সুবাদেই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সত্তার মধ্যে আরণ্যক চেতনা সজীবতা লাভ করেছে। এজন্য তাঁর ছোটগল্পের অধিকাংশই অরণ্য ভ্রমণের সুবাদে লেখা গল্পগুলিতেই প্রত্যক্ষভাবে আরণ্যক চেতনার বিস্তৃতি সবুজ হয়ে উঠেছে। এছাড়া দীর্ঘদিন ধরে অরণ্যে বিচরণের জন্য আরণ্যক চেতনা নানা ভাবে তাঁর ছোটগল্পের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর ছোটগল্পগুলির বিশ্লেষণ করলে আরণ্যক চেতনার নানা দিকের স্বরূপ উন্মোচিত হয়ে পড়ে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম গল্প 'উপেক্ষতা'-র মধ্যে আরণ্যক চেতনা আর কথা নিহীত। অবশ্য প্রথম গল্পে প্রসঙ্গক্রমে আরণ্যক চেতনার কথা এসেছে। প্রত্যক্ষ ভাবে সেখানে আরণ্যক চেতনার সেভাবে নিবিড়তা লাভ করেনি। তবে পরবর্তীকালে লেখা বেশ কিছু গল্পের মধ্যে প্রত্যক্ষ ভাবে আরণ্যক চেতনা মূর্ত হয়ে উঠেছে। আসলে অরণ্যে ভ্রমণের সুবাদে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা গল্পগুলিতে ব্যক্তিগত জীবন-কথার আধারে আরণ্যক চেতনার বিষয়টি সক্রিয়তা লাভ করেছে। তাঁর সে সমস্ত গল্পের মধ্যে অরণ্যের সৌন্দর্যে মুগ্ধতার কথা নিহীত। সেই সঙ্গে অরণ্যচারী মানুষের জীবন-যাপন পদ্ধতিকে সচেতনভাবেই তুলে ধরেছেন লেখক। তাঁর 'অরণ্যে' গল্পের মধ্যে অরণ্যে বেড়ানোর সুবাদেই লেখা। লেখক দোলের ছুটিতে গালুডি থেকে

নিশিঝরনার উদ্দেশ্যে বেড়াতে যান। একজন সাঁওতাল গাইডকে সঙ্গে নিয়ে পথে কুড়ামালৌ গ্রাম পেরিয়ে গন্তব্যের পথে অগ্রসর হয়। নিশিঝরনার উদ্দেশে যাত্রার সময় অরণ্যের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছেন। একই সঙ্গে সাঁওতাল গাইডের সৌজন্যে চীহড় ফল খাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে চীহড় ফলের স্বাদ অনেকটা গোল আলুর মত বলেই মত প্রকাশ করেছেন। এই চীহড় ফল খাওয়ার মধ্যে আদিবাসীদের খাদ্যাভাসের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। তবে গল্পটি জুড়ে রয়েছে অরণ্যের কথা। অরণ্যে বিচরণের সুবাদে রোমান্টিক চেতনার সফল প্রয়োগ ঘটেছে। এজন্য গল্পের মধ্যে শঙ্খচূড় সাপের কথা এবং তামার পরিত্যক্ত ভগ্নপ্রায় বাড়িতে বাঘের অস্তিত্ব উল্লেখের মধ্যে সেই রোমাঞ্চকর কথাই প্রতিফলিত হয়। এছাড়া ধনঝরি শৈলমালাতে অপুর্ব বনভূমি দেখে মুগ্ধ হয়েছে। তেমনি সেই শৈলমালাতে থাকে তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত হয়। এজন্যই জনমানববিহীন শৈলমালাতে দেবতাদের সঙ্গে সম্পর্ক নিকট হয়ে আসে। যা পার্থিব চোখে দেখা যায় না বলেই ব্যক্ত করেছেন। স্বভাবিকভাবেই অরণ্যের নির্জন রাজ্যে অবগাহনের সূত্রেই তাঁর মনে অধ্যাত্মচেতনার রূপ উন্মুক্ত হয়েছিল।

'ছোটনাগপুরের জঙ্গল' গল্পের মধ্যে ব্যক্তিগত জীবনের কথা প্রতিভাত হয়েছে। গল্পের শুরুতেই নিজের কথাই লিখেছেন। এ প্রসঙ্গে বলেছেন : "শহর বা তীর্থের জাঁকজমক গোলমাল আমার ভালো লাগে না । আমি চিরদিন নির্জন ভালোবাসি। তাই পাহাড়, নদী, বনজঙ্গল দেখে বেড়াই।"[১] আর তাই অরণ্যে বিচরণ করেছেন। তাঁর যাত্রাপথে রয়েছে চাইঁবাসার পথ ধরে বাকৈলার ইন্সপেকশন বাংলোতে উপস্থিত হয়েছে। সেখানকার অরণ্য দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। সেই মুগ্ধতার প্রকাশ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে বিকেলে গৈলকেরা গ্রামে যাওয়ার সূত্রে। পরদিন সেখান থেকে কারো ও কোয়েল নদীর মধ্য দিয়ে পাল্টু বাংলোর উদ্দেশে যাওয়ার পথে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। অরণ্যের চেতনাকে দৃঢ় হয়েছে পথে ময়ূর দেখার মধ্য দিয়ে। এছাড়া শশাংদা শৈলরন্ধ্রে সৌন্দর্যকে মহাশিল্পীর শিল্প বলে মনে করেছেন। সেই মহাশিল্পর সৌন্দর্য তাঁর পুত্রের দেখার প্রত্যাশা গোপন করেনি। গল্পের আগাগোড়া শুধুমাত্র আরণ্যক চেতনার নিবিড়তা বর্তমান। একইসঙ্গে পথে অরণ্য অঞ্চলের অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিচয়ও প্রতিফলিত হয়েছে। পথে গাড়োয়ানদের গাড়িতে কাঠ বোঝাই দেখে অরণ্য অঞ্চলের জীবনের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়।

অরণ্যে বেড়ানোর সুবাদেই তাঁর 'অরণ্যকাব্য' গল্পটি রচিত হয়েছে। মানভূমের মাঠা পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সুবাদেই মাঠা পাহাড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছেন। উক্ত গল্পটিতেও সেখানকার অরণ্যচারী মানুষের জীবন জীবিকা সচেতনভাবে লেখক তুলে ধরেছেন। বিশেষ করে আদিবাসীদের জীবন জীবিকাকে তুলে ধরেছেন সযত্নে। এ প্রসঙ্গে বলেছেন : "গ্রামের লোকের উপজীবিকা বনজঙ্গল থেকে কাঠ চুরি করে বাঘমুণ্ডির হাটে বিক্রি করা; পাহাড়ের ওপর থেকে বেল, কেঁদ, পিয়াল, বুনো আলু, মিষ্টি ডুমুর, করঞ্জা প্রভৃতি

বন্যফল সংগ্রহ করে আনা এবং বন্যজন্তুর শিকার।”[২] গল্পের আগাগোড়া অরণ্যে অতিবাহিত দিনের কথাই প্রাধান্য পেয়েছে।

অরণ্য অঞ্চলের মানুষের কথা মূর্ত হয়েছে ‘চাউল’ গল্পের মধ্যে। গল্পের নায়ক মানভূম অঞ্চলের তোড়াং গ্রামের থুপির বাবা। উক্ত চরিত্রের মধ্যে গ্রামের জনজীবন এবং অর্থনৈতিক করুণ অবস্থার কথা তুলে ধরেছেন। থুপির বাবা পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতার স্বপ্ন নিয়ে পুরুলিয়া শহরে পাড়ি দিয়েছিল। সেখানে ভিক্ষা করে তাঁর দিন কাটত। কিন্তু সেখানেও চালের আকাল শুরু হলে আবার গ্রামে ফিরতে বাধ্য হয়েছে। অবশেষে করুণ পরিণতির দিয়ে গল্পের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। থুপির বাবা আর্থিক স্বাবলবির জন্য ঘন জঙ্গলে পাথর কাটার কাজে ডিনামাইটের বিস্ফোরণে তাঁর ছিন্নভিন্ন দেহের সলিল সমাধী ঘটেছে। তবে গল্পে বহরাগোড়া স্কুলেও ফ্যান ভাতের জন্য অপেক্ষরত লাইনে দাঁড়ানো ছেলে-মেয়েদের চিত্র ‘চাউল’ গল্পকে আলাদা মাত্রা দিয়েছে। ‘দিবাবসান’ গল্পের মধ্যে আরণ্যক চেতনার পরিচয় বর্তমান। গল্পটিতে বিকেলে গল্পকথক নির্জন প্রকৃতিরাজ্যে বিচরণের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। গল্পকথকের বেড়াতে গিয়ে দুটি বিষয় ভালো লাগার কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমত নির্জনতা। দ্বিতীয়ত গাছপালার সমাবেশ। দ্বিতীয়টির প্রসঙ্গে বর্ণনা তুলে ধরেছেন এভাবে : “গাছপালার সমাবেশ প্রকৃতির কোন দৈন্য চোখে পড়ছিল না—বনে, ঝোপে, পাতায়, লতায়, ফুলে ফলে খড়ে, ঘাসে অযত্ন— সজ্জিত প্রকৃতির পরিস্ফুট বন্যসৌন্দর্য।”[৩] গাছপালার অকৃত্রিম সৌন্দর্যে প্রাণে রস সঞ্চয় করে বলেই মনে করেন গল্পকথক। এজন্য এরকম পরিবেশে শেলির কবিতা, ডারউইনের লেখা বই পড়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। শুধু তাই নয়, এই রকম পরিবেশ মনে শান্তি জোগায় বলে মনে করেন। এছাড়া তিনি উদ্ভিদের সঙ্গে প্রাণী জগতের অচ্ছেদ্য সম্পর্কের পরস্পর নির্ভরতাকেও লক্ষ করেছেন। অবশেষে দিনের শেষে গল্পকথক বাড়ির পথে প্রত্যাবর্তনের সময়ও কাওরাপাড়ার ছেলে-মেয়েদের আগুন পোয়ানোর দৃশ্যের উপস্থাপনার মধ্যেও অরণ্য অঞ্চলে যাপিত মানুষের জীবনকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন লেখক।

ভ্রমণের সুবাদেই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আর একটি গল্প হল ‘কুশল পাহাড়ী’। গল্পটি ফ্ল্যাসব্যক রীতিতে লেখা । কলকাতার এক বড়লোকের বাড়ির পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন সতীশবাবু। সেখানকার বৈদ্যুতিক ঝলমলে আলোর মধ্যে শুধুই দেখেছিলেন বিত্তের প্রভাব। এছাড়া শুনেছেন ভদ্রলোকের বৈষয়িক কথাবার্তা। যা তাঁর মনে সেভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। এজন্যই তাঁর সাত বছর আগে ভাদ্রের শেষে গল্পকথক মনোহরপুর বেড়াতে যাওয়ার ঘটনা স্মরণীয় হয়ে উঠেছে। মন্মথবাবুর সহায়তায় তিনি সুন্দরগড় স্টেটের ভৈরভ থান -এ বেড়াতে গিয়েছিলেন। ভৈরভ থানেই এক সাধুর সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন গল্পকথক। সাধুজী বসেছিলেন এক প্রাচীন শালগাছের তলায় শিলাখণ্ডের ওপর। সাধুজী ঈষোপনিষদের স্লোক আবৃতি এবং ব্যাখ্যা করছিলেন। গল্পকথক তন্ময় হয়ে সেই ব্যাখ্যা শুনছিলেন। শুধু তাই নয়, গল্পের শেষে

আরণ্যক চেতনার পরিচয় তাৎপর্য লাভ করেছে। সময় সুযোগ থাকলে মনোহরপুরের সেই সাধুজীর কাছে বেড়িয়ে আসার পরামর্শ দানের মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ একদিকে প্রাচীন আরণ্যক ভারতবর্ষের ভাব উপলব্ধি করার জন্য। যা তপোবনের সঙ্গে সহজেই তুলনা করা যেতে পারে। অন্যদিকে অরণ্যের সৌন্দর্য উপভোগের জন্যই সতীশবাবু বেড়িয়ে আসার পরামর্শ দিয়েছেন। যা তাঁর আরণ্যক চেতনাকে প্রকট করে তোলে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরণ্যক চেতনার মূলে কিন্তু অরণ্যের সৌন্দর্যের পরিচয়কে তুলে ধরা। একই সঙ্গে অরণ্যের সঙ্গে মানুষের নিবিড় সম্পর্কের দিক আলোকপাত করা। এজন্য তিনি কোথাও আরণ্যের আদিমতা এবং হিংস্রতাকে তুলে ধরেননি। শুধুমাত্র অনুষঙ্গ হিসেবে অরণ্যের ভয়াল রহস্যময় জীবজন্তুর পরিচয়কে উল্লেখ করেছেন। এজন্যই তাঁর গল্পের মধ্যে আরণ্যক চেতনার নানা দিক লক্ষ করা যায়। 'মানতালাও' গল্পের মধ্যেও এজন্য কাঠচেরাই করাতের মতো বাঘের আওয়াজের কথা উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে অরণ্যের মধ্যে মানতালাও হ্রদের তীরের সবুজ দেখে মুগ্ধতার কথাই তুলে ধরেছেন। তবে 'শিকারী' গল্পের মধ্যে কিছুটা ব্যতিক্রমি দিক লক্ষ করা যায়। ঝাপড়িশোল গ্রামের মাগনিরাম সাঁওতাল ছেলে হয়েও স্বভাবের দিক থেকে কিছুটা আলাদা। এজন্য সে অন্যদের মতো গাছে উঠতে পারে না, বনে জঙ্গলে যেতে পারে না, কাঁড় ধরতে অক্ষম। এজন্য হীনমন্যতায় ভোগে। তাঁকে নিয়ে মেয়েরা হাসাহসি করে। অথচ তাঁর বাবার মতো সেও নামকরা হতে চায়। তাই সে বরজোর নালার ধারে বাজরা খেতে আসা হাতির শিকার করতে গিয়ে নিজেও শিকারে পরিণত হয়েছে। ম্যালেরিয়ায় ভোগা জীর্ণ শরীর নিয়ে হাতি শিকারের বীরত্বের ব্যঞ্জনাময় দিক তুলে ধরেছেন লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের আরণ্যক চেতনার বিস্তারের নেপথ্যে অরণ্য অঞ্চলের মানুষের প্রতি সহানুভূতি এবং সহমর্মীতা লক্ষ করা যায়। এজন্যই 'কালোচিতি' গল্পের মধ্যে গল্পকথকের সহানুভুতি জনিত মমত্বের পরিচয় নিবিড় হয়ে উঠেছে। গল্পে কালোচিতি গ্রামের স্কুল মাস্টার নরেন হাঁসদা ব্যবস্থাপনায় জমির বন্দোবস্ত করেছিলেনে গল্পকথকের জন্য। তাই প্রয়োজনের তাগিধেই গল্পকথক দুর্গম ডিবুডুংরি এবং সারোয়া পাহাড় অতিক্রম করে রূপকথার দেশের মত গ্রামে উপস্থিত হয়েছিলেন। গ্রামের বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখকের দৃষ্টি অতীতের অরণ্য সভ্যতার দিকে চলে যায়। যা প্রাচীন ভারতবর্ষের অরণ্য অঞ্চলের মানুষের আদিবাসী সম্পৃক্ততার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, সন্ধ্যের সময় কালিকাপুরের হাট থেকে দুজন সাঁওতাল মেয়ের প্রত্যাবর্তনের সাহস দেখে অবাক হয়েছেন। কিছুক্ষণের জন্য মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ার মনে হয়েছে এই বন শুধুমাত্র এদের জন্যই। এ প্রসঙ্গে বলেছেন : "তবে এ বন এদের জন্য, কিছু বোঝে না ওরা বন ছাড়া। স্নেহময়ী জননীর অঙ্গের সমান এই পাণ্ডববর্জিত বনাঞ্চল, বাঘ ভালুক ওদের বাল্যসঙ্গী।"[৪]

উক্তিটি থেকে স্বাভাবিকভাবেই অরণ্য অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে অরণ্যের নিবিড়তার কথা প্রকট হয়ে ওঠে। একই সঙ্গে আদিবাসী সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষের সহজ সরলতার পরিচয় লক্ষ করা যায়। তাদের আথিথেয়তার আভিজাত্যের গৌরব স্পষ্ট হয়। গল্পে নারান হাঁসদার মা বাড়িতে 'ঠাকরান' এসেছে বলে জানিয়েছে। অন্যদিকে বিদায় নেওয়ার সময় আত্মীয়তা স্বরূপ বিবেচনা করে উপঠৌকন উপহার দিয়েছে। তাঁর 'বোতাম' গল্পের মধ্যেও আদিবাসী নেতৃ এলিসবা কুইয়ের সেবা শুশ্রূষা, আতিথেয়তার পরিচয় প্রতিফলিত হয়েছে। একই সঙ্গে আদিবাসীদের জীবন যাপন পদ্ধতির এবং খাদ্যাভাসের পরিচয় পাওয়া যায়।

আসলে শহরের যান্ত্রিক জটিল কুটিল জীবনের বিপরীতে অরণ্যচারী মানুষের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে গল্পের মধ্যে। এ রকমই 'জাল' গল্পটিতেও আরণ্যক চেতনার প্রভাব সুস্পষ্ট। আসলে আধুনিক ভোগবিলাসী মানুষের বন কেটে বসতির পালা। সেখানে নগর পত্তনের পরিবর্তে অরণ্যের বিস্তার ঘটছে। গল্পের মূল বিষয় চব্বিশ পরগণার হীতেন্দ্রনাথ কুশারী জীবিকা অর্জনের জন্য হাজারিবাগের ভরহেচ নগরের সামনে উপস্থিত হয়। সেখানে নগরের পত্তনের মূলে স্বপ্ন দেখেছেন বৃদ্ধ বাড়ির মালিক রামলাল ব্রাহ্মণ। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে স্বপ্নের বসতি স্থাপনের অবসান ঘটেছে। তাঁর পুত্ররা দেনার দায়ে সেই ঘর বিক্রি করে দেয়। গল্পের নায়কও মুক্তি পান। গল্পের শেষ হয়েছে চমকপ্রদ ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে, 'বন আবার নগরীকে গ্রাস করেচে।'[৫] আসলে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় অরণ্য ধ্বংসের করে বসতি গড়ে ওঠার বিষয়টি সমর্থন ছিল না। এজন্য দেখা যায় আরণ্যক উপন্যাসের সত্যচরন মনে কষ্ট পেয়েছেন। এজন্য দেনার দায়ে বাড়ি বিক্রি হলে বনের স্বাভাবিকতা ফিরে পাওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

অরণ্য ধ্বংসের বিষয়টিকে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মেনে নিতে পারেননি। এজন্যই তাঁর 'কাঠ বিক্রি বুড়ো' গল্পের মধ্যে গল্পকথকের নিজস্ব কিছু গাছ বিক্রি করতে অনীহা প্রকাশ করেছে। কারণ গাছপালা দেশের সম্পদ। তাঁর একটা সৌন্দর্য আছে। তাছাড়া দেশ কালের গণ্ডী এড়িয়ে গাছের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক রয়েছে। এজন্য নেপলস উপসাগরের তীরে গাছপালার তলায় বসে প্লিনির বই লেখার সাধনার কথা উল্লেখ করেছেন। একইভাবে 'একটি মাকাল লতার কাহিনী' গল্পের মধ্যেও মাকাললতার ছায়ায় বসে কবিতা রচনার কথা নিহীত। এ গল্পের মধ্যেও আরণ্যক চেতনার পরিচয় প্রকট হয়ে উঠেছে। উদ্ভিদের নামে গল্পের নামকরণের মধ্যেই আরণ্যক চেতনা নিহীত। একই সঙ্গে গল্পকথক মাকাললতার সৌন্দর্যে লেখকের মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েন। শুধু তাই নয়, মাকাললতার মধ্যে ঐন্দ্রজালিকার শক্তি অনুভব করেন। অরণ্য আসলে মানুষের সাধনার আদর্শ স্থান সেকথা বারবার উল্লেখ করেছেন।

আরণ্যক চেতনার পরিচয় 'প্রভাতী' গল্পের মধ্যেও নিহীত। এই গল্পে লেখক নদীতীরে বেড়ানোর সুবাদেই নিত্য নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করেন। লেখক নদীতীরের

শ্যামল আভা, সবুজ মটরলতার ফল, মাকাল ফল, যজ্ঞিডুমুরের ফল, ঝোপে নাকজোয়ালের তিনরঙা ফুল লক্ষ করেন। এই সমস্ত সবুজের আভায় একটা নিবিড়তার আভাস পান। এজন্য তিনি বন্য গাছঝোপকে দেখতে ভালোবাসেন। এই রকম ঝোপঝাপ থেকে আবার পাখির ডাক শুনতে পেলে মনে হয়, তিনি যেন অন্য জগতের সন্ধান পান। দূরের অথচ নিকটের পরিচিত পরিচিত সেই জগতের অধরা মাধুরী তাঁর কাছে উন্মোচিত হয়। মুহূর্তের মধ্যে তিনি যেন সীমাহীন সৌন্দর্যের পথিক হয়ে পড়েন। সমস্ত কিছুই রহস্যময় ঠেকে। লেখক বিকেল বেলায় স্নান করতে গেলে সেই শ্যামলতা ও সবুজের রাজ্য খুঁজে পান ঠিকই; কিন্তু সকালবেলার সেই উপলব্ধি হারিয়ে ফেলেন। গোটা গল্প জুড়ে সবুজের জয়গান করা হয়েছে। সেই সঙ্গে লেখকের অন্তর্লীন উপলব্ধিও প্রকট হয়ে পড়ে। আসলে অরণ্যের মধ্যেই আধ্যাত্মিকতার সুলুক সন্ধান করেছেন। ভগবানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করেছেন। এজন্যই তাঁর মধ্যে এরকমের অনুভূতি উপলব্ধি করেন। একইভাবে প্রসঙ্গক্রমে নাস্তিক, হাসি, ডালুর বিপদ, সাহায্য, অভিশপ্ত, তারানাথ তান্ত্রীকের গল্প প্রভৃতি গল্পের মধ্যে আরণ্যক চেতনা লক্ষ করা যায়।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে আরণ্যক চেতনার নানা দিক লক্ষ করা যায়। তাঁর ছোটগল্পগুলিতে অরণ্য ভ্রমণের সুবাদে আরণ্যক চেতনা বিকশিত হয়েছে। আবার শৈশব থকে ইছামতী নতীর তীরে তাঁর বেড়ে ওঠা এবং গড়ে ওঠা। এজন্য শৈশব থেকেই ইছামতী নদী তীরের শ্যামল সবুজ প্রকৃতি তাঁর আরণ্যক চেতনার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল। তাই তাঁর গল্পগুলিতে অরণ্যের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধতার কথা লক্ষ করা যায়। আবার অরণ্যের সঙ্গে একাত্মতাও অনুভব করেন। তাছাড়া অরণ্য ধ্বংসের মেনে নিতে না পারার বিষয়টিও গল্পের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। অরণ্যের আদিম অকৃত্রিম পরিবেশেই নিজেকে খুঁজে পেতেন। অরণ্যের মধ্যেই ভগবানের অস্তিত্বকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। পেয়েছেন শান্তির আধার। আবার অরণ্য অঞ্চলের গাছপালা, পশু পাখির সঙ্গে অরণ্যবাসী মানুষের জীবনযাপনকেও নিস্পৃহ দৃষ্টিতে লক্ষ করেছেন। এ সমস্ত বিষয় তাঁর ছোটগল্পে বারবার নানা ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এভাবেই তাঁর ছোটগল্পে কখনো প্রত্যক্ষ ভাবে, কখনো পরোক্ষ ভাবে আরণ্যক চেতনার পরিচয় নিবিড়তা লাভ করেছে।

তথ্যসূত্র :

১। বিভূতিভূষণ রচনাবলী জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ - ৫, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৪০৪, কলকাতা-৭০০০৩১, পৃ- ৩৪০

২। বিভূতিভূষণ রচনাবলী জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ - ৮, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৪০৪, কলকাতা-৭০০০৩১, পৃ- ৩৮১-৮২

৩। বিভূতিভূষণ রচনাবলী জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ - ৯, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৪০৪, কলকাতা-৭০০০৩১, পৃ- ৪৩৬

৪। বিভূতিভূষণ রচনাবলী জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ - ৯, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৪০৪, কলকাতা-৭০০০৩১, পৃ- ৪৩৬

৫। বিভূতিভূষণ রচনাবলী জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ – ১০, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৪০৪, কলকাতা-৭০০০৩১, পৃ- ২৫৭

কবিতা সিংহের নির্বাচিত ছোটগল্পে অফিসকর্মী নারী : সংকট ও উত্তরণ

সায়ন্তনী ব্যানার্জি
স্নাতকোত্তর, বাংলা বিভাগ,
বিশ্বভারতী

সারসংক্ষেপ: কবিতা সিংহের গল্পে স্বাধীনতা পরবর্তী স্বনির্ভর নারীদের বহুস্তরীয় উপস্থাপন পরিলক্ষিত হয়। কবিতা সিংহ নিজে সারা জীবন ধরে নানা পেশায় যুক্ত ছিলেন, যার মধ্যে অফিসকর্মী হিসেবে তাঁর অবস্থান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সরকারি অফিসের ক্লার্ক, বিজ্ঞাপনের কপি লেখা, আকাশবাণীর প্রযোজক– প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কর্মে নিয়োজিত থেকে তিনি বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। এই অভিজ্ঞতায় কর্মরতা নারী হিসেবে তাঁর নিজস্ব নানা যাপন যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে তাঁর সহকর্মী মহিলাদের অভিজ্ঞতা ও অনুভবের নানা পরতও। কবিতা সিংহের এক স্মৃতিচারণ আমাদের কাছে স্পষ্ট করে সমাজে তৎকালীন অফিকর্মী মেয়েদের আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই–"সরলবাবু আড্ডায় বসলেই মেয়েদের লক্ষ্য করে বাছাবাছা ব্যঙ্গ ছুড়তেন।..উমাদি ছিলেন সরলবাবুর মতোই প্রোগ্রাম একজিকিউটিভ। একদিন উমাদি সরলবাবুকে বললেন, সরল তোমার ফোন এসেছে। ফোনটা ধরেই সরলবাবু বললেন, কে? লীলা কথা বলছ? না, না যে ফোন ধরেছিল ও একটা সামান্য কাজ করে। প্রোগ্রাম সেক্রেটারি। মনে আছে উমাদি রাগে সরলবাবুর দিকে পেপার ওয়েট ছুড়ে দিয়েছিলেন" (কবিতা সিংহ, আকাশবাণীর আসরে; দ্র. কলকাতার আড্ডা, সম্পা. সমরেন্দ্র দাস, গাঙচিল, কলকাতা ৭০০১১১, দ্বিতীয় মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর ২০১৪) আর এই সমস্ত অভিজ্ঞতাই কবিতার গল্পে অফিকর্মী নারীর বাস্তবনির্মাণে সহায়তা করে। আমাদের মূল আলোচনা কবিতা সিংহের নির্বাচিত গল্প অবলম্বনে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে অফিসকর্মী নারীদের নানা পারিবারিক, সামাজিক সংকট ও তার থেকে আত্মপ্রতিষ্ঠায় উত্তরণের পর্যালোচনায় বিস্তৃত হবে।

সূচক শব্দ: কবিতা সিংহ, অফিসকর্মী, স্বনির্ভর নারী, পারিবারিক সংকট, সামাজিক দ্বন্দ্ব, আত্মসম্মান, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য।

মূল রচনা:-

স্বাধীনতা উত্তর ভারতে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি, বিভিন্ন সুযোগসুবিধা ভারতীয় নারীকে নানান পেশা গ্রহণে উৎসাহিত করে এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর করে তোলে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৫৬-৬১) নারী-কল্যাণমুখী নানা কর্মসূচী গৃহীত হয়। তৃতীয়, চতুর্থ ও অন্তর্বর্তীকালীন পঞ্চবার্ষিকীতে নারীশিক্ষার ওপর এবং ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী

পরিকল্পনায় (১৯৮০-৮৫) নারীর স্বাস্থ্য-শিক্ষা-কর্মসংস্থানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তাই "মেয়েদের অর্থনৈতিক কর্মে যোগদানের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে শুধু যে সংখ্যাগত পরিবর্তন হয়েছে তাই নয়,... মেয়েদের কাজের চরিত্রগত পরিবর্তনও হয়েছে।"[১] আর কবিতার গল্পেও তাই প্রতিফলিত হয়েছে বিচিত্র পেশায় নিযুক্ত নানাস্তরের বাঙালি মহিলাদের পরিবর্তিত পারিবারিক অবস্থান, কর্মক্ষেত্রের নানা সমস্যা, দাম্পত্যের জটিলতা, চাকরি ও সংসারে পিষ্ট হয়ে ওঠার মানসিক চাপ এবং দ্বৈতভূমিকার সংকট। পাশাপাশি রয়েছে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের দ্বারা অর্জিত আত্মমর্যাদা; স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব গঠনের ও আত্মপ্রতিষ্ঠার উদ্‌যাপন।

স্বাধীনতা পরবর্তী ক্ষেত্রে মহিলারা যতধরনের পেশায় নিযুক্ত হন, তার মধ্যে অফিসকর্মীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর প্রেক্ষাপটে দারিদ্র, নগরকেন্দ্রিকতার বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা– মেয়েদের কর্মে নিযুক্ত হতে বাধ্য করে। আর তার মধ্যে সবচেয়ে সুবিধাজনক অথচ অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যপ্রদানকারী পেশা ১০টা-৫টার অফিসের চাকরি; যাতে জীবিকা ও সাংসার উভয়ের সামঞ্জস্য থাকতে পারে। ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত একটি সরকারি রিপোর্টের জনৈক সরকারি কর্মচারীর বক্তব্য–"I have never seen so many girls working in offices as there are today. Ones meets them everywhere and in every capacity."[২] কবিতা সিংহের গল্পেও অফিসকর্মীর ভূমিকায় নারী চরিত্রের নানা অবস্থান পরিলক্ষিত হয়।

'পার্শ্বচরিত্র 'গল্পটিতে দেখি কেরানী-মেয়ে 'শোভনা'-কে নিয়ে লেখা সুশোভনবাবুর একটি গল্প 'রানী'–র সমালোচনা করে মূল গল্প-কথক আর এক কেরানী মেয়ে। তার সমালোচনায় উঠে আসে দারিদ্রের বাধ্যতায় অল্প মাইনের চাকরিতে নিযুক্ত কেরানী মেয়েদের গৃহপ্রত্যাবর্তনের ক্লান্ত শরীর; বেশভূষার সস্তা অনুলেপনে অসচ্ছলতা ও হৃতযৌবন ঢাকার প্রয়াসটুকু মুছে ফেলে স্বপ্নহীন নিদ্রা যাপন- "...সেই সাদামাটা কুশ্রী-প্রায়, গতযৌবনা মেয়েটি যে শোবার আগে তার শেষ প্রসাধনও মুছে ফেলেছে, আড়াই টাকা দিয়ে কেনা যৌবন হুকে ঝুলির রেখে, আর কেউ দেখবে না ভেবে আটপৌরে শাড়ি জড়িয়ে নিশ্চিন্তে বিছানায় শুয়েছে...।"[৩] শোভনার গতানুগতিক কর্মের জীবনে দৈনন্দিন নানা সংকট, পাঁচটার ছুটির পর তার সামনে ভিড় করে আসে; অবসরে পুরুষ বন্ধুর আলতো প্রেমের সঙ্গ এই মধ্যবিত্ত খেটে খাওয়া মেয়েদের জোটে না–"অফিসের ছুটির পর শোভনা যখন ট্রামে ওঠে, তখন অফিস তার পিছু পিছু খানিকদূর পর্যন্ত তাড়া করে আসেই। কতকগুলো সত্যি ব্যাপার, যেমন তার মধ্যবিত্ত জীবন, তার রূপের দৈন্য, খুঁত, কতকগুলো মোটা মোটা দুঃখ, বাড়ির সমস্যা, এসব তাকে খোঁচা দিতে থাকে।... রোদ্দুরের হলুদ ঝরনা ছবিতে আঁকা অবাস্তব জ্যোতির মতো গলে গলে পড়ে;...তখন শোভনার মন হু হু করে ওঠে। একটি সঙ্গী না থাকার খারাপ লাগায়।"[৪]

কিন্তু এই মানসিক সংকটের কথা সুশোভনবাবু তাঁর গল্পে বলেন না। তাঁর গল্পের নায়ক সঞ্জীব কেরানী শোভনাকে বলে, সে তাকে ভালো না বাসলেও অর্থনৈতিক সমঝোতায়, 'দুজনের টাকায় অনটনের কুশ্রী মুখটা'[৫] ঢাকতে শোভনাকে বিয়ে করবে। গল্পের শোভনা আত্মমর্যাদায় দীপ্ত হয়ে বিয়ের পর একদিন রাতে এই সমঝোতা ভেঙে প্রেমহীন পুরুষকে ত্যাগ করে। আর এখানেই কথক তথা পত্র-প্রেরকের অভিযোগ,'রানী' গল্পের গল্পকার "পার্শ্বচরিত্রে...নায়িকাত্ব আরোপ"[৬] করে ফেলেছেন। কথক শোভনাকে নিজের আদলে 'আরো নিঃসঙ্ক'[৭] বাস্তবিক সত্যকার পার্শ্বচরিত্র করতে চান। এই শোভনা 'ভীরু কাপুরুষ...ট্রাপিজ নায়ক'[৮] সঞ্জীবকেই বিয়ে করবে। সে জানায়-"আমার যৌবনের অবশিষ্ট চারখানা নিয়েই ও সন্তুষ্ট থাকবে, বাকি বারোখানা পুষিয়ে দেবে আমার চাকরির টাকা কটার ঝনঝনানি।... তাহলে কি আমি চাকরির টোপ ফেলে এই পুরুষ মাছটিকে ধরছি, আমাদের প্রেম মানে কি এর মাইনের সঙ্গে ওর মাইনের যোগসাজশ? আমি জানি,... আপনি বলবেন,...যদি আমার এই প্রাইভেট ফার্মের মর্জির চাকরিটা 'না' হয়ে যায় তাহলে ত আবার সঞ্জীবের মনের দেয়াল বেয়ে এঁকে বেঁকে আরশোলা নামবে, আবার ওর হাঁটু থরথর করে কাঁপবে...।"[৯]

হ্যাঁ, কেরানি মধ্যবিত্ত মেয়েদের জীবনে প্রেম, মর্যাদা ও অর্থের এই সংকট অপরিচিত নয়। কিন্তু কথকের শোভনা এই সংকটের বাহক হয়েই সংসারে থাকে না; সে মনের ভেতর লালন করে এক আশা, মধ্যবিত্ত স্বনির্ভর বাঙালি মেয়ের স্বপ্ন– "একদিন প্রকৃত প্রেমে অন্তত এই পৃথিবীর একটি ভীরু কাপুরুষ যুবক, একটি প্রায়-গতযৌবনা রমণী আগুন থেকে আলো হয়ে যাবে।"[১০] সে জানে, স্বপ্ন হয়তো দেখে তার সহকর্মী টাইপিস্ট মেয়েটিও-"... যখন বিকেলের সূর্য থেকে খানিকটা সোনা ছলকে পড়ে তার টেবিলে, দু চোখের তারা দিয়ে সেই আলোটা টেনে নিতে নিতে সে কি ভাবে?"[১১] আর এই স্বপ্নকে উপজীব্য করেই কেরানি মেয়েদের পথ চলা।

'খেলতে খেলতে- একদিন' (১৯৭৩) গল্পেও পাই অফিসকর্মী অণিমাকে। পারিবারিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কারণে অণিমা ও তার স্বামী সুরেন যৌথ সিদ্ধান্তে পরপর দুটি সন্তানকে নষ্ট করে দেয়। কিন্তু সমাজের চোখে 'বাঁজা' অণিমা সংসার ও কর্মস্থান, পারবারিক ও অর্থনৈতিক– উভয় দায়িত্ব সামলাতে সামলাতে ক্রমে নিজের ব্যক্তিসত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। প্রতিনিয়ত অপমান সহ্য করা, অফিসের চাপে ক্লান্ত, স্বামীর অসংযত আচরণে বিধ্বস্ত অণিমা ক্রমে একাকিত্ব ধারণ করে-"...ধুলো মাখা পা, আঁটো শাড়ি-সায়ার বাঁধন, ঘাসে ভেজা ব্লাউজ ব্রেসিয়ারের পূতিগন্ধ, মুখে ঘাড়ে সারাদিনের কালি..."[১২] নিয়ে সে শুয়ে থাকে অফিস থেকে ফিরে। এখন "উঁচু উঁচু রেলিঙ অণিমা নিজেই তুলেছে। ঘর আর অফিস, বাঁধা লাইন, এছাড়া আর কোনো কিছুই তার নিজের থেকে ভালো লাগে না।"[১৩] এই ধরনের কর্মরতা নারীরা নারীর তথাকথিত সুকোমলস সুসজ্জিত 'ফ্যামিলি ট্র্যাডিশনের' বাহক হয়ে থাকতে পারে না। তার অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন তাকে খানিকটা হলেও স্বাধীনতা দিয়েছে। পরিবারের সদস্যরাও তার অর্থে পুষ্ট; অথচ পরিবারে তার অবস্থানের, সম্মানের বিন্দুমাত্র উত্তরণ

হয় না। অণিমা ডিপথেরিয়ার ভয়ে দেওরপুত্র দীপুর পাশে বসা বেড়ালকে লাথি মারলে বাড়ির 'ঝি' পর্যন্ত তাকে তিরস্কার করে অনায়াসেই। আর যে স্বামী 'ভোরবেলা একচোখ বন্ধ করে'[১৪] অণিমারই ব্যাগ থেকে ওভার টাইমের টাকাগুলো নেয়, সেই স্বামীই অণিমার দ্বারা নির্যাতিত হবার দাবি করে চিরাচরিত 'মেল ইগো' থেকে– "ও ভেবেছে ওর টাকায় কেনা গোলাম আমরা, যা করবে তাই সইতে হবে আমাকে...।"[১৫] কিন্তু অণিমা আজ আত্মমর্যাদায় দীপ্ত। "এককালে একটু আদরের জন্য স্বামীকে দেখিয়ে দেখিয়ে, ভাঙাচোরা মূর্তির মতো সে থাকত,... আজ আর স্বামীকে দেখিয়ে দেখিয়ে, সে দুঃখের চ্যারিটি শো করে না।"[১৬] একদা ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক হওয়ার স্বপ্ন দেখা অণিমা পরিস্থিতির চাপে অন্য মোড়ে এসে উপস্থিত। কিন্তু তার ভেতরের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা একদিন আত্মবিশ্বাস হয়ে প্রকটিত হয়। অণিমা একদিন আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়ে দোকানে দোকানে গিয়ে কৌশলে ঘুমের ওষুধ সংগ্রহ করতে থাকে। আর সেখানেই তার বাপের বাড়ির কাছের একটি দোকানের পূর্বপরিচিত, বর্তমানে বিস্মৃত এক 'মুগ্ধ' ছেলেকে অনায়াসে মিথ্যে বলে–'তাইই তো হয়েছি, ইউনিভার্সিটিতে পড়াচ্ছি।'[১৭] অণিমা শেষপর্যন্ত আত্মহত্যা করতে পারে না, কিন্তু তার প্রয়াস চালিয়ে যাবার শপথ নেয়। এভাবে গল্পটিতে এক অফিসকর্মী নারীর দাম্পত্য সংকট, আত্মসংকট, পারিবারিক অবস্থান ও শেষপর্যন্ত তার হেরে যাওয়ার ব্যঞ্জনা দ্যোতিত হলেও এর মধ্যেই নিহিত আছে তার অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনে গড়ে ওঠা আত্মমর্যাদাপূর্ণ অবস্থান।

মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জন্ম দেয়। তাই অনেক ক্ষেত্রেই খাওয়া-পড়া বা সন্তান মানুষের জন্য স্বামীর ওপর নির্ভরতা থাকে না তাদের। ফলে আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে, সমঝোতা করে, সব কিছু মেনে নিয়ে সংসার রক্ষায় নিমগ্ন থাকতে চায় না তারা। তাই ডিভোর্সের ঘটনাও অনেক বেশি দেখা যায়। তেমনই দুই ডিভোর্সি অফিসকর্মী নারীর একা সন্তানপালনের দৃষ্টান্ত পাই কবিতা সিংহের 'টুলির বড়দিন' ও 'কনকের আপনজন' গল্পদুটিতে।

'টুলির বড়দিন' (১৯৭৫) গল্পে দেখি টুলির 'বড়মানুষ' বাবা রিনি দত্তর সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। টুলির মা ইন্দিরা প্রথমে আর পাঁচটা নারীর মতোই নিরাপত্তা ও টুলির পরিচর্যার কথা ভেবে শত নির্যাতন (মানসিক ও শারীরিক) সত্ত্বেও মানিয়ে নিয়ে সংসার রক্ষা করতে চেয়েছিল। টুলির বয়ানে পাই– "বাবার পায়ের কাছে মুখ ঘষতে ঘষতে মা কাঁদছে– আমায় ছেড়ো না। ছেড়ো না। তুমি ওর কাছেই থাকো। কিন্তু আমাকে ফেলে দিও না। টুলির কথা ভেবে অন্তত।"[১৮] কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন ডিভোর্স হল, তখন আর ইন্দিরা নিজের আত্মমর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করে কোনো সমঝোতায় গেল না। স্বামীর থেকে কোনো এ্যালিমনি না নিয়ে আত্মবিশ্বাসে বলিষ্ঠ ইন্দিরা দ্বিগুণ পরিশ্রম করে একাই কন্যার সুপরিচর্যায় নিযুক্ত হল– "... মা কেবল টুলির হাত ধরেই চলে এলো। বাবার থেকে কিছু নিল না। .. মা বলেছিল, -টুলি যদি আমার কাছে থাকে, আমি টুলিকে একাই মানুষ করতে পারব। মা সেইজন্য চাকরি ছাড়াও বাড়িতে বসে বিজ্ঞাপনের কপি লেখে।... ছুটি থাকলে আগের দিনটা মায়ের অফিস

থেকে আসতে একটু দেরি হয়।"[১৯] এই বিজ্ঞাপনের কাজেও সে-সময়ের মেয়েদের অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ। মেট্রোপলিটন জীবনপর্বের 'ত্রিমূর্তি'– finance, insurance, advertising[২০]-র একটি, এই বিজ্ঞাপনের কাজে অংশগ্রহণ মেয়েদের অনেক বেশি বহির্মুখী ও সচেতন করে তোলে।

ইন্দিরার ডিভোর্সের পর তার সহকর্মী হিরণ ইন্দিরার সঙ্গে এক ঘনিষ্ঠ বাতাবরণ তৈরির চেষ্টা করে, যা সে-সময় ইন্দিরার পক্ষে মানসিকভাবে অত্যন্ত প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু মেয়ের কথা ভেবে ইন্দিরা এই সম্পর্ককে বন্ধুত্বের সীমানার বাইরে পৌঁছতে দেয় না। টুলির শিশুমনস্তত্ত্বে কর্মরতা মায়ের অনবসর ও হিরণের উপস্থিতি নানা আশঙ্কার জন্ম দেয়, সে অস্তিত্বের সংকটে ভোগে; ভয় পায়– মাও তাকে ছেড়ে হিরণমামার সঙ্গে চলে যাবে না তো? ইন্দিরার এই কর্মব্যস্ততা, অনবসর অবশ্যই তার কন্যা টুলির মধ্যে একাকিত্ব তৈরি করে, তবুও ইন্দিরা যথেষ্ট চেষ্টা করে টুলিকে সময় দেবার– তাকে রাত্রে রূপকথার গল্প বলা বা একসঙ্গে মার্কেটিং-এ যাওয়ার মধ্য দিয়ে। ইন্দিরার একার আয় টুলিকে পূর্বের মতো স্বাচ্ছন্দ্য দিতে না পারলেও (টুলির একসাইজ ছোট সস্তা উলের সুতলি ওঠা কার্ডিগান, কলার ছেঁড়া সাদা ব্লাউজ প্রভৃতি তার প্রমাণ), তার মধ্যে গড়ে তুলেছে মায়ের মতো আত্মমর্যাদার বোধ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। আর সেজন্যই গল্পের শেষে টুলিকে লোভী মনে করে বড়দিনের প্রেজেন্টেশন দিতে আসা বাবাকে টুলি প্রত্যাখ্যান করেছে। টুলির ইচ্ছায় ইন্দিরা-হিরণের ভাবী মিলনের ইঙ্গিতে শেষ হয় গল্পটি। আর শেষে মায়ের পক্ষে থেকে টুলির বাবার প্রতি এই প্রতিবাদ আরেক স্মৃতির কথা মনে করায় যেখানে টুলি নিজেকে মায়ের মতো ভাবে, মায়ের সঙ্গে একাত্ম বোধে তৃপ্ত হয়– "মা বলে, যত দিন যাচ্ছে টুলি নাকি বাবার মতো দেখতে হচ্ছে,"[২১] আর টুলি নিজেকে আয়নায় দেখে– 'নিরূপায় রাগী জেদী একটা মুখ'[২২] হিসেবে, যাতে কালশিটের মতো অন্ধকার যেন ঝাপটা মারছে; টুলি উপলব্ধি করে– "এমনি মুখ... নানা এমনি মুখ নয়, এমনি ভঙ্গি তার খুব চেনা। মায়ের মুখে সে এমনি ভাঙচুর কতই দেখেছে। তবে কি কেবল তার চেহারাটাই বাবার মতো...আর তার দেখা, শোনা, স্বাদ গন্ধ নেওয়া, ছোঁওয়া, ধরা, সব মার মতো?"[২৩] কর্মরতা মায়ের এই আত্মশক্তি মেয়ের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে গল্পটিকে অন্য মাত্রা প্রদান করেছে।

'কনকের আপনজন' গল্পেও এক অফিসকর্মী নারী কনকের সন্তান পালন ও সামাজিক প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই-এর কথা পাই তার স্বামী দিলীপের শোভার সঙ্গে দিল্লিতে স্থায়ী হয়ে যাবার পর। পাড়া-প্রতিবেশী বন্ধুদের নানা বাঁকা মন্তব্য, দেখনদারী সহানুভূতির দ্বারা বিধ্বস্ত উচ্চমধ্যবিত্ত কর্মরতা নারী কনক শেষপর্যন্ত নিম্নবিত্ত কর্মরতা বস্তির নারী (ইস্ত্রীর কাজ করে যে) রেশমীর সামাজিক সাম্মানিক অবস্থানের সঙ্গে একাত্ম বোধ করে। দৈহিক ও মানসিকভাবে নির্যাতিত রেশমী প্রতিবার কনকের কাছে একতরফা বকেছে ও কেঁদেছে এতদিন স্বামীর কথা বলে, আর আজ প্রতারিত কনক-ই রেশমীর কাছে বুক ভাঙা কান্নায় 'রক্তমাখা উলঙ্গশব্দ...প্রসব'[২৪] করতে থাকে। এই

ঘটনায় অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনেও যেকোনো স্তরের নারীর সামাজিক ও পারিবারিক প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থানটিই ফুটে ওঠে।

গল্পটিতে আমরা দেখি মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়া কনক তার স্বামীর ছেড়ে যাওয়ার কথা সকলের থেকে লুকোতে চায়। অফিসে সহকর্মীরা কৌশলে তার থেকে সত্যিটা জানার নানা প্রয়াস করে। সরলাদি অসুস্থতার খবর নেবার অছিলায় 'ছেলেটাকে মানুষ করতে হবে না?'[২৫] কথাটা জুড়ে দিয়ে ধরা পড়ে যায়। কনক বোঝে, সরলাদিও সব জানে। আধা সহানুভূতি, 'আধা মজা দেখার মুখ গুলোকে'[২৬] কনকের অসহ্য লাগে। তবু সে হার মানে না। সংসার, দীপু ও চাকরি একসঙ্গে চালিয়ে নিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। দুপুরে দীপু স্কুল থেকে ফেরার সময় কনক অফিসে থাকায় দীপু ঘন্টা দুয়েক বাড়িওয়ালার বিধবা মেয়েটির কাছে থাকে। কিন্তু বাড়ি ফিরেই কনক সমস্ত কাজ একা সামলাতে থাকে- দীপুর খাবার তৈরি, খাওয়ানো, রাতের রান্না, দীপুকে ঘুম পাড়ানো, মশারি টাঙানো– সব সমাপ্ত করে তবে অবসর পায়। গল্পে দেখি, কনকের ছেলে তার মায়ের সঙ্গে বাবার তুলনায় কনকের অপারগতাগুলিকে চিহ্নিত করে, যে না পারাগুলো মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রথাগতভাবে স্বাভাবিক; কনকও তেমনই এক সাধারণ নারী যে বল খেলতে পারে না, ক্যারাটে জানে না, দীপুকে বাবার মতো কাঁধে চড়াতেও পারে না, পারে কেবল লুডো আর ক্যারাম খেলতে। অথচ গল্পে সেই পারঙ্গম বাবার সমস্ত দায়িত্বহীনতা পূরণ করে এই অপারগ মা-ই। অফিস ও সংসার একসঙ্গে সামলায়, দীপুর যত্নের অভাব রাখে না। তবুও দীপু তার কাকার কাছে নিজের পরিচয় দেয় বাবার সঙ্গে যুক্ত করে– "আমার নাম দীপক।... দীপক বোস। সন অফ দিলীপ বোস।"[২৭] আসলে এটাই এক পুরুষতান্ত্রিক আবহের পরিচর্যা, যেখানে বাবার অনুপস্থিতিও এক স্বনির্ভর মায়ের পুত্রকে মাতৃপরিচয়ে দীপ্ত করতে পারে না।

দিলীপের ভাই দ্বিজেন কনকের বাড়ি এসে তাকে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে থাকার প্রস্তাব দেয়–"মা বলছিলেন, তুমি ও বাড়ি থাকবে চলো? দীপুর তো একটা ফ্যামিলি অ্যাটমসফিয়ার দরকার।"[২৮] কিন্তু কনক এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। একসময় নিজের টাকায় স্বামীকে সে টি-শার্ট বা গেঞ্জি কিনে অনেক সারপ্রাইজ দিয়েছে। আর আজ আত্মর্যাদাসম্পন্ন স্বাধীন স্বনির্ভর বৌদি কনক তার দেওরকে একগোছা বিদেশি ব্লেড ও একটা আফটার-শেভ লোশন উপহার দিয়ে তীর্যক স্বরে বলিষ্ঠ প্রত্যুত্তর দেয়- "...কত বছর পরে খোঁজ নিতে এলে। তুমি তো আমার সবচেয়ে ছোট দেওর ছিলে তাই না! এগুলো তোমায় প্রেজেন্ট করলাম। আমার তো আর কোনো কাজে লাগবে না।...এগুলো তুমি নাও।"[২৯]

এভাবে আমরা দেখলাম অফিসকর্মী মেয়েদের কর্মজীবন কবিতা সিংহের কলমে একইসঙ্গে বাস্তব সমস্যা ও সেখান থেকে উত্তরণের আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিসমেত আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১। আচার্য, মধুমিতা, স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে বাঙালি মধ্যবিত্ত কর্মরতা মেয়েদের ভূমিকা, কলকাতা: কমলিনী প্রকাশন, জানুয়ারি ২০১৩/মাঘ ১৪১৯, প্রথম প্রকাশ, পৃ. ১১।
২। Sengupta. Padmini. Trades and Professions: in women in India; দ্র. সিন্‌হা, সোহিনী, চাকুরিজীবি বাঙালিনী/প্রয়োজন ও পরম্পরা/উনিশ থেকে বিশ শতক, কলকাতা: অরুণা প্রকাশন, জুন, ২০১৫, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ৩।
৩। দাস, সমরেন্দ্র(সম্পাদিত), কবিতা সিংহ:পঞ্চাশটি গল্প, হাওড়া: সহজ পাঠ, জানুয়ারি ২০১৩, প্রথম প্রকাশ,পৃ. ১৬৫।
৪। তদেব,পৃ. ১৬৫-৬৬।
৫। তদেব, পৃ. ১৬৮।
৬। তদেব।
৭। তদেব।
৮। তদেব।
৯। তদেব।
১০। তদেব,পৃ. ১৬৯।
১১। তদেব,পৃ. ১৬৫।
১২। তদেব,পৃ. ১৫।
১৩। তদেব,পৃ. ১৬।
১৪। তদেব,পৃ. ১৭।
১৫। তদেব।
১৬। তদেব।
১৭। তদেব,পৃ. ২০।
১৮। তদেব,পৃ. ২৮।
১৯। তদেব,পৃ. ২৬।
২০। ঘোষ, বিনয়, মেট্রোপলিটন মন. মধ্যবিত্ত. বিদ্রোহ, কলকাতা: ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, জুলাই, ১৯৮৪, তৃতীয় মুদ্রণ, পৃ. ১২।
২১। দাস, সমরেন্দ্র (সম্পাদিত), কবিতা সিংহ: পঞ্চাশটি গল্প, হাওড়া: সহজ পাঠ, জানুয়ারি ২০১৩, প্রথম প্রকাশ,পৃ. ২৬।
২২। তদেব।
২৩। তদেব।
২৪। তদেব,পৃ. ৭৮।
২৫। তদেব,পৃ. ৭৬।
২৬। তদেব।
২৭। তদেব,পৃ. ৭৭।
২৮। তদেব।
২৯। তদেব,পৃ. ৭৮।

কৃষ্ণনগর মহকুমার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নদী, বিল, জলাশয় ও মৎস্যজীবীদের ভূমিকা এবং তার পর্যালোচনা

রাস মোহন সরকার
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, ইতিহাস বিভাগ,
দ্বিজেন্দ্রলাল কলেজ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া

সংক্ষিপ্তসার : যে কোন দেশ বা তার অন্তর্গত কোন অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন মানদন্ড থাকে। সেইরকম কৃষ্ণনগর মহকুমার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেরও বিভিন্ন মানদন্ড রয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য হল মৎস্যজীবীদের ভূমিকা। মৎস্যজীবীদের মাছ চাষ এবং মাছ ধরা যে আর্থসামাজিক উন্নয়ন করে, তা এই আলোচনাতে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। এই আলোচনার মূল বিশেষত্ব হল- মানুষের খাদ্য ও পুষ্টির যে চাহিদা রয়েছে তার প্রয়োজন মেটানো, বিভিন্ন সমাজের মানুষদের অংশগ্রহণের বিবরন, মহিলা স্বাবলম্বীকরণ, এই জীবিকার সমস্যা ও তার সমাধানের বিভিন্ন পন্থার বহুমুখী আলোচনা, ইত্যাদি। কৃষ্ণনগর মহকুমা অঞ্চলের মৎস্যজীবীদের পরিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে তাদের সার্বিক চিত্রকে তুলে ধরার প্রচেষ্টা এই আলোচনার মূল লক্ষ্য।

মূলশব্দ: মৎস্যজীবি, শরীর-স্বাস্থ্য, জীবিকা, আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি, কৃষ্ণনগর মহকুমা।

মূল আলোচনা:

নদীর বহমানতা সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে চলে, সঙ্গে বয়ে নিয়ে যায় তার ইতিহাস এবং গৌরবগাথা। বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে নদীর গুরুত্বকে স্বীকার করা হয়েছে প্রাচীনকাল থেকে, যেমন আমরা উদাহরণরূপে বলতে পারি- 'মিশরকে নীলনদের দান' বলা হয়। আমরা যদি নদীয়ার ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাব, নদীয়ার ইতিহাসে নদ-নদীর ভূমিকা অপরিসীম। নদীয়ার গুরুত্বপূর্ণ নদী হল- ভাগিরথী-হুগলি, এই নদী পলাশী থেকে ভাগীরথী নাম নিয়ে নদীয়ায় প্রবেশ করেছে এবং নবদ্বীপে জলঙ্গীর সংযোগস্থল থেকে ভাগিরথী নদী হুগলি নামে এগিয়ে চলে। এছাড়াও নদীয়ার অন্যান্য নদীগুলি হল- জলঙ্গি, মাথাভাঙ্গা, চুর্ণী, ইচ্ছামতী, পাগলাচণ্ডী, সাততলা বা ছোটগঙ্গা, ভল্লুকা বা সাতকুলি, যমুনা নদী (ইচ্ছামতীর সহায়ক উপনদী), চকাই, অলকানন্দা, অঞ্জনা, ভৈরব, হাউলিয়া নদী, ছোট জলঙ্গি নদী। এইসকল নদ-নদী আর্থ-সামাজিক দিক থেকে 'নদীর নদীয়া'-কে সমৃদ্ধ করেছে। শুধুমাত্র এই সকল নদী যে এই নদীয়ার, নদ-নদীর ইতিহাসকে তুলে ধরে, তা বললে 'অর্ধ ইতিহাস'কে তুলে ধরা হবে। জলাভূমি এবং মনুষ্য নির্মিত পুকুর এই অঞ্চলের পরিপূর্ণ ইতিহাসকে তুলে ধরে।

নদীয়ার জলাভূমির সংখ্যাও কিন্তু নেহাত কম নয়- গুরগুরে খাল, পোলতার খাল, পীরতলার খাল, অভয়নগর খাল, রানীনগর খাল, কালি গাঙনির খাল, খালবোয়ালিয়া খাল, বক্সিপুর খাল, স্বরূপপুর খাল, রামজীবনপুর খাল, কাঁচুখালী খাল, পিঠডাঙা খাল, চুলকানি খাল, ধরকুটোর খাল, চিংড়ির খাল, হংসের খাল, হাসাডাঙ্গা বিল ইত্যাদি।

'নদীর নদিয়ার'[1] এই বর্তমান চিত্র এবং অতীতের বিবরণের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে, পার্থক্য নদীর অস্তিত্ব, গাঁথা এবং বহমানতা ইত্যাদি নিয়ে। নদী এবং জলাভূমির উপকূলবর্তী অঞ্চলে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর জনবসতি। এই সকল জনবসতির ওপর নদী এবং জলাভূমির প্রভাব সর্বাধিক। কিন্তু আমরা যদি সবথেকে বেশি প্রভাবিত জাতিরূপে মৎস্যজীবীদের কথা বলি তা কোনভাবেই অত্যুক্তি হবে না। এই মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ে বাংলা সাহিত্যকেও সমৃদ্ধ হতে দেখেছি, আবার সেই সাহিত্য অধ্যায়ন করে আমরা তাদের করুন পরিস্থিতিকে উপলব্ধি এবং আলোচনা করতে পেরেছি। আলোচিত এইসকল সাহিত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- 'তিতাস একটি নদীর নাম', 'পদ্মা নদীর মাঝি', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের- 'আমাদের ছোট নদী', 'অঞ্জনা নদী তীরে চন্দনা গাঁয়ে' ইত্যাদি। নদীয়া জেলার অন্যতম গৌরবময় এবং প্রাচীন স্থান হল কৃষ্ণনগর। দীনবন্ধু মিত্র এই অঞ্চলকে নিয়ে লিখেছিলেন- "....অপূর্ব নগর এক নদী কিনারায়/ কৃষ্ণচন্দ্র নরপতি বিখ্যাত ভুবনে/ কবিতা কৌতুক সদা হাসিত সদনে।"[2] নদীয়া জেলার অন্তর্গত এই কৃষ্ণনগর মহকুমা প্রাচীনকাল থেকেই স্বাস্থ্যকর, এপ্রসঙ্গে নদীয়ার ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখিত- "কলিকাতার সাত আট ক্রোশ উত্তর হইতে প্রায় মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত এ অধিকারস্থ সকল প্রদেশেরই জলবায়ু স্বাস্থ্যকর ছিল। বিশেষত খরিয়া নদীর তটস্থ কৃষ্ণনগর প্রভৃতি গ্রাম সকলের জলবায়ু এতই উৎকৃষ্ট বলিয়া বিখ্যাত ছিল যে বাংলার নানা অঞ্চলের লোক স্বাস্থ্য লাভার্থে কৃষ্ণনগরে আসিত।"[3]

নদিয়া জেলাকে প্রশাসনিককার্যে সুবিধার জন্য চারটি মহকুমাতে বিভক্ত করা হয়েছে- কৃষ্ণনগর সদর, রানাঘাট, কল্যানী এবং তেহট্ট। কৃষ্ণনগর সদর মহকুমা সাতটি ব্লক নিয়ে গঠিত- কালীগঞ্জ, নাকাশিপাড়া, চাপড়া, কৃষ্ণগঞ্জ, কৃষ্ণনগর-।, কৃষ্ণনগর-।। এবং নবদ্বীপ। কৃষ্ণনগর সদর মহকুমায় ৭৭ টি পঞ্চায়েত এবং দুটি পৌরসভা (কৃষ্ণনগর এবং নবদ্বীপ) নিয়ে গঠিত। কৃষ্ণনগর মহকুমার মধ্যে প্রবাহিত নদীগুলি হল- ভাগীরথী-হুগলি, জলঙ্গি, মাথাভাঙ্গা, পাগলাচণ্ডী, সাততলা বা ছোটগঙ্গা, সাতকুলি বা ভালুকা নদী, ছোট জলঙ্গি, কলিঙ্গ নদী, অঞ্জনা নদী ইত্যাদি। এই সকল নদীগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নদী হল ভাগীরথী-হুগলি এবং জলঙ্গি। এই নদী কাব্যে উল্লেখিত হয়েছে এই রূপে- "জলঙ্গি হেরি গঙ্গা ভাসিল উল্লাসে / আলিঙ্গন করি তারে হাসিয়ে জিজ্ঞেসে- "বলো লো জলঙ্গি সখি! পদ্মা বিবরন; কেমন আছেন তিনি তুমি বা কেমন"।"[4] এই অঞ্চলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য খালগুলি হল- পোলতার খাল, গুড়গুড়ে খাল, পীরতলার খাল, খালবোয়ালিয়া খাল, কালীগাঙনির খাল, কাঁচুখালি খাল,

পিথডাঙ্গা খাল, চুলকানি খাল, এছাড়াও আছে নওপাড়া বিল এবং হাঁসাডাঙা বিল ইত্যাদি। এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য অনেক মনুষ্য সৃষ্ট পুকুর রয়েছে, যেখানে সুবিধামত পুকুরের মালিকেরা মাছ চাষ করেন। এই সকল নদ-নদী, জলাশয়, খাল-বিল এবং পুকুর এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করেছে। এছাড়াও এই অঞ্চলের মাছ চাষের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে, ধুবুলিয়ার তাতলা অঞ্চলে গড়ে ওঠা প্রলয় ফিশ ফার্ম। এখানকার হ্যাচারি থেকে বিভিন্ন প্রকার মাছের চারা পোনা তৈরি হয় এবং সেখান থেকে বিভিন্ন জায়গায় মাছের চারা সরবরাহ করা হয়।

Table 1:“The potential area of inland fishing in Krishnagar Sadar Sub Divition.”[5]

Sl.No.	Name of Blocks	Pond and Tanks (F.W) FFDA	Pond and Tanks (F.W) Non FFDA	Beel and Baor (F.W)	Reservoir, Canal, Borropit etc.	Total Production in Tons
01	Krishnaganj	598.64	733.80	846.29	1070.29	3249.02
02	Chapra	1805.44	2482.70	1843.50	0.00	6131.64
03	Nakashipara	2921.52	3434.18	422.2	0.00	6777.90
04	Kaliganj	1866.64	2156.6	1662.19	33.68	5719.11
05	Krishnagar-I	2806.88	1581.21	1125.66	2727.62	8241.37
06	Krishnagar-II	565.44	659.38	513.87	0.00	1738.69
07	Nabadwip	3497.44	289.81	218.18	787.55	4792.98

কৃষ্ণনগর সদর মহকুমার মোট আয়তন- 862.18 km^2। এবং ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী, এই অঞ্চলের মোট জনসংখ্যা ৭ লক্ষ ৯৬ হাজার ২৪৫ জন। যার মধ্যে 97.15% এবং 2.85% যথাক্রমে গ্রামীন এবং শহরের জনসংখ্যা।

Table 2: The Population structure in Krishnagar Sadar Sub Division.

Sl. No.	Name of Blocks	Population	Scheduled Caste (%)	Scheduled Tribe (%)	Hindu (%)	Muslim (%)	Signature Rate (%)
01	Krishnaganj	1,56,705	45.55	6.47	93.98	5.87	72.86
02	Chapra	3,10,652	15.85	0.65	37.15	59.72	68.28

03	Nakashipara	3,86,569	23.27	2.56	46.53	53.06	64.86
04	Kaliganj	3,34,881	15.22	0.49	41.36	58.51	65.89
05	Krishnagar-I	3,14,833	35.96	5.09	82.78	15.25	71.45
06	Krishnagar-II	1,39,472	18.33	1.64	57.02	42.84	68.52
07	Nabadwip	1,35,314	14.49	1.14	61.39	38.20	67.72

উর্বর পলিমাটি, পরিণত বদ্বীপ সমভূমি এবং স্বাভাবিক বর্ষা কৃষ্ণনগর মহকুমা অঞ্চলকে মৎস্য চাষের উপযোগী করে তুলেছে। শুধুমাত্র মৎস্য চাষ নয়, স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠা মৎস্যভূমিএই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিকেও উন্নত করে চলেছে। এই অঞ্চলের অনেক মানুষই জীবন-জীবিকার জন্য জলাভূমির উপর নির্ভরশীল। ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে মৎস্যজীবীদের ভূমিকা অনেকটাই। স্থানীয় বা আঞ্চলিকক্ষেত্রে সমাজ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের মানুষের ভূমিকা যথেষ্টই রয়েছে। আমরা আমাদের আলোচনাকে দুটি দিক দিয়ে দেখতে পারি- প্রথমত, শহুরে অর্থনীতিতে মৎস্যজীবীদের ভূমিকা এবং তাদের আর্থ-সামাজিক জীবন পর্যালোচনা, এবং দ্বিতীয়ত, গ্রাম্যজীবনের অর্থনীতিতে মৎস্যজীবীদের ভূমিকা এবং তাদের আর্থ-সামাজিক জীবনের পর্যালোচনা। আবার আমরা যদি মৎস্যজীবীদের দ্বারা যে আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাব, এর দুটি পৃথক দিক রয়েছে- একদিকে রয়েছে মৎস্য শিকার সংক্রান্ত প্রত্যক্ষ কার্যাবলী এবং অন্যদিকে রয়েছে মৎস্য শিকারে সহকারি পরোক্ষ কার্যাবলী। প্রত্যক্ষ কার্যাবলী বলতে আমরা বুঝি, মৎস্যজীবীদের মাছ ধরা, জাল বোনা, মৎস্য বিক্রয় ইত্যাদি। এবং পরোক্ষ কার্যাবলী বলতে আমরা বুঝি, মৎস্যজীবীদের সহযোগিতা করবার জন্য যে সহযোগী আর্থ-সামাজিক কার্যকলাপ চলে সেগুলিকে, যেমন- নৌকা তৈরি, মাছ চাষের বিভিন্ন উপাদান তৈরি, মাছের খাবারের ব্যাবসা ইত্যাদি। আমরা আগেই বলেছি এই অঞ্চলে মৎস্যজীবীদের কেন্দ্র করে একটি বৃহৎ অর্থনীতি পরিচালিত হয়। সেহেতু এখানে পুঁজি একটি বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। নদী এবং স্বাভাবিক জলাশয়গুলিতে মৎস্যজীবীরা মাছ ধরার প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুতকরণের মাধ্যমে তাদের জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে। আবার অন্যদিকে আমরা দেখতে পায়, লাভকারী একটি দিক হওয়ায় প্রচুর পুঁজি বর্তমানে মাছ চাষে ব্যায়িত হচ্ছে। এরা সকলেই যে, মৎসজীবী সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে পরে তা কিন্তু নয়, সমাজের উচ্চবিত্ত অনেক মানুষ এই পেশায় নিযুক্ত হয়েছেন। তারা এখানে পুঁজি বিনিয়োগ করে, মাছ চাষ করে বাজারে চাহিদা পূরণ করে এবং তার বিনিময়ে লভ্যাংশের আশা করে। বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নদী বা স্বাভাবিক জলাশয়ের উপর নির্ভরশীল সাধারণ মৎস্যজীবীরাও কৃত্রিম পদ্ধতিতে মাছ চাষের উপর ঝুঁকে পড়ছে। তাদের এই প্রবনতা যে সবসময়

তাদের ইচ্ছানুযায়ী হচ্ছে তা কিন্তু নয়, জীবন-যাপনের জন্য অনেকাংশে তাদের বাধ্য হতে হচ্ছে বলা যেতে পারে। বর্তমানে এই পেশা দ্বারা যে সকল আর্থ-সামাজিক কার্যাদি সম্পন্ন হয়ে থাকে, সেগুলি হল- আমিষ খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, পারিবারিক পুষ্টি যোগান, দারিদ্র্য বিমোচন, সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ, পরিবেশ এবং উন্নয়ন, কর্মসংস্থান উৎপাদন, মহিলা স্বাবলম্বীকরণ, কৃষির সহযোগী আর্থিক উন্নয়ন, বৈদেশিক মুদ্রা ভান্ডার বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির বিকাশ ইত্যাদি।

প্রোটিন মানুষের দৈহিক চাহিদার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রোটিন শিশুদের দৈহিক এবং মানসিক বিকাশের অর্থাৎ সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য প্রয়োজন, দৈহিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন। "বলা হয় ৮০%-এর বেশি ভারতীয়দের শরীরে প্রোটিনের ঘাটতি রয়েছে। 91% শাকাহারী এবং ৮৫% আমিশাষি ভারতীয়দের মধ্যে প্রোটিনের ঘাটতি রয়েছে।"[6] যে সকল উপাদানের মধ্যে প্রোটিন রয়েছে তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মাছ। মাছের মধ্যে প্রচুর প্রোটিন পাওয়া যায়, যা খুবই সহজলভ্য এবং সহজপ্রাচ্য একটি খাবার। মাছের মধ্যে থেকে আমরা প্রোটিন, ফ্যাট, ক্যালসিয়াম, আয়রন, ফসফরাস, কার্বোহাইড্রেট, ক্যালোরি, ইত্যাদি পেয়ে থাকি, যা আমাদের শরীরের বিভিন্ন চাহিদা মেটায়। আমরা এই অঞ্চলে যে সকল মাছের সন্ধান পেয়ে থাকি, সেগুলি হল- রুই, কাতলা, মৃগেল, বোয়াল, ট্যাংরা, ফোলুই, পুঁটি, খলশে, মাগুর, জিওল পাঙ্গাস, কালবাউশ, শোল, ল্যাঠা, গজাল, চিতল, তেলাপিয়া ইত্যাদি।

ভারতবর্ষ উন্নয়নশীল একটিদেশ। তবুও বর্তমান সময়ে ভারতের অর্থনীতির মূল ভিত্তি কৃষিকাজ। ভারতের একটি রাজ্যরূপে পশ্চিমবঙ্গও নদিয়া জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগর মহকুমার অধিকাংশ মানুষই কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল। কৃষির সহযোগীরূপে মৎস্য জীবিকা এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এই অঞ্চলে প্রচুর নদী, নালা, খাল, বিল, পুকুর থাকায় মাছ ধরাএবং মাছ চাষ অনেক মানুষের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ পেশায় পরিণত হয়েছে। বিশেষত গ্রামীণ জীবনের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নে মৎস্য জীবিকার অনেকাংশে অবদান রয়েছে।নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা অনেক জনবসতির মূল জীবিকা মাছ ধরা এবং মাছ চাষ। নদীকে কেন্দ্র করে তাদের জীবনযাত্রা পরিচালিত হয়। এই অঞ্চলের ছোট, মাঝারি এবং বৃহৎ মৎস্যজীবীদের মধ্যে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের ভূমিকাকে অস্বীকার বা ছোট করা যায় না। মৎস্য জীবিকার সঙ্গে সঙ্গে মাছের খাদ্যতৈরি, জাল বোনা, মাছের বাজারিকরণ, নৌকা তৈরি, যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন, জলাশয় সংরক্ষণ, ইত্যাদির মাধ্যমে এই শ্রেণীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন সংঘটিত হয়।

Table 3: "Contribution to employment and income of Fisheries in Krishnagar Sadar Sub Divition."[7]

Sl.No.	Name of Blocks	Employment (Fishers) 2023	Fish Production (Metric Ton)	Value (Crore Rs. Per year)
01	Kaliganj	27078	5719.11	57.19
02	Chapra	17209	6131.64	61.32
03	Nakashipara	24295	6777.90	67.78
04	Krishnagar-I	17715	8241.37	82.41
05	Krishnagar-II	12907	1738.69	17.39
06	Krishnaganj	13666	3249.02	32.49
07	Nabadwip	7845	4792.98	47.93

মৎস্য জীবিকায় মহিলাদের অংশগ্রহণ তাদেরকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলেছে। এই জীবিকাতে প্রধানত তারা যে সকল কাজ করে থাকে, সেগুলিহল- মাছ বিক্রয়, জাল বোনা, মৎস্য চাষে সহযোগিতা, ব্যাক্তিগত এবং যৌথ উদ্যোগে মাছ চাষ, ইত্যাদি। যাতে করে তাদের পারিবারিক আর্থিক স্বচ্ছলতার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের সামাজিক অবস্থানকে আরও মজবুত করে তোলে। মৎস্যজীবী মহিলাদের অধিকাংশই ছোট মাছ চাষী।এই সকল কাজে খুব বেশি পুঁজিব্যায় করতে না হওয়ায় গ্রামীন দরিদ্র মহিলারা নদী, খাল, বিলে মাছ ধরা বা মৎস্য জীবিকায় অংশগ্রহণ করেন।

Table 4: "Engagement of women in inland fishing of the Nadia District."[8]

Sl.No	Name of the Block	Total no. of Fishing villages in Block	Total no. of fishermen family in Block	Fisherman Male	Fisherman Female
01	Kaliganj	38	4908	114108	12970
02	Chapra	26	3100	9465	7744
03	Nakashipara	35	4391	13362	10933
04	Krishnagar-I	29	4133	10329	7386
05	Krishnagar-II	14	2325	7099	5808
06	Krishnaganj	17	2454	7516	6150
07	Nabadwip	10	2066	4707	3138

কৃষ্ণনগর মহকুমার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীগুলিকে কেন্দ্র করে কৃষিকাজ ও যাতায়াত ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়েছে এবং যার ফলে এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি অনেকাংশে পাল্টে গিয়েছে। এর সঙ্গে বন্যা এবং নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে এই অঞ্চলের মানুষদেরকে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। নদীর উপত্যকা অঞ্চলের মৃত্তিকা এমনিতেই উর্বর হয়, এছাড়া বন্যার ফলে উর্বর পলি মৃত্তিকার আস্তরণ চাষাবাদকে আরো উন্নত করে। এই অঞ্চলের মানুষের প্রধান খাদ্যশস্য হল ধান, ফলে এখানকার মৃত্তিকা ধান চাষের জন্য আদর্শ। এই প্রসঙ্গে বাংলার অতিত ইতিহাসকে একটু স্মরণ করা যেতে পারে- "সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলা একটি সমৃদ্ধশালী কৃষি অর্থনীতি ছিল, এশিয়া অঞ্চলে যার ফল ছিল- একটি সম্প্রসারিত কৃষি ব্যবস্থা, বাণিজ্য বৃদ্ধি, অর্থনীতি কার্যাদি বৃদ্ধি, এর সঙ্গে সঙ্গে এই সময়ে বিভিন্ন ইউরোপীয় বাণিজ্যিক সংগঠনগুলি বাংলায় এসেছিল।"[9] এই অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত খরস্রোতা ভাগীরথী নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে এই অঞ্চলের বসতির বিন্যাসও পরিবর্তিত হয়েছে বারংবার। "আমার অধ্যায়ন এলাকাটি পরিপক্ক গঙ্গা-বদ্বীপের একটি অংশ, সমুদ্রপৃষ্ঠের ১৩ মিটার উপর দিয়ে একটি বিস্তীর্ণ এলাকায় এটি প্রবাহিত এবং এটি তিনটি জেলায় বিভক্ত। নদীয়া জেলায় পুরাতন বদ্বীপ গড়ে ওঠে।"[10]

এই অঞ্চলের মৎস্যজীবীদের অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতি এবং সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। বর্তমানে মৎসজীবি সম্প্রদায়ের মানুষেরা বিভিন্ন প্রাকৃতিক এবং অপ্রাকৃতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়ে চলেছেন- বৃষ্টিপাত হ্রাস, নদীর নাব্যতা হ্রাস, কল-কারখানার বজ্র নিষ্কাশন, শিল্পায়ন, অবৈধভাবে মাছ চাষ, দূষণ, বিক্ষচ্ছেদন, অবৈধভাবে নদীতে বাঁধ নির্মাণ, মাছের প্রজনন এলাকার অভাব, মাছ ধরবার জন্য সূক্ষ্ম জালের ব্যবহার, নদ-নদীগুলিতে পাট ধোয়া, নদী তীরবর্তী অঞ্চলে জনবসতি নির্মাণ, নদীতে জনবসতির নোংরা জল নিস্কাশন, যাতায়াতের জন্য নদীর উপর নির্মাণকার্য, ইত্যাদির মাধ্যমে মাছেদের যে স্বাভাবিক জীবন চক্র রয়েছে, তাকে নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। বর্তমান সময়ে এই সমস্যাগুলি সমাধানের প্রচেষ্টা আবশ্যিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন, সমাজের সর্বনিম্ন স্তরের মানুষদের মধ্যে সচেতনতা বোধের জাগরণ ঘটানো। সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে, যে সকল সমস্যা আজ এই শ্রেণীর মানুষদের সামনে উপস্থিত হচ্ছে, সেগুলিকে সমাধানের প্রয়াস করা। যদি আজ আমরা এই সমস্যাগুলিকে সমাধান করতে না পারি, তাহলে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের মানুষ, বিশেষত নদী, বিলে মাছ ধরা প্রান্তিক মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের মানুষদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিপন্ন হয়ে পড়বে।

মৎস্য জীবিকায় বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হলেও বর্তমানে এটি একটি লাভজনক এবং সম্ভাবনাময় জীবিকা। এই জীবিকাতে অনেক মানুষের অংশগ্রহণ আমরা দেখতে পাই, যার মধ্যে অধিকাংশই গ্রামীণ মানুষ। এই সম্ভাবনাকে আরও বিকশিত করতে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প চালু আছে। কেন্দ্রীয়

সরকারের প্রকল্প- প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা।বিভিন্ন রাজ্য সরকারি প্রকল্প রয়েছে, যেমন- প্রবীণ মৎস্যজীবীদের পেনশন যোজনা, Diversified production of fish byproducts state grants to SFDC/WBFC for pisciculture operation, Construction and management of echo-hatchery, Development of infrastructural facilities in inland fishing village,Inland housing, Project for reclamation of bevels for enhanced fish production, Infrastructure facilities for fisherirs programme under FIDE, Infrastructure facilities for fisheries programme under RIDF, Contribution to primary/central fisherman's co-operativesocities to avail NCDC assistance, ইত্যাদি।সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের সহযোগিতার সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছ চাষের ফলে এই জীবিকা আরও সংগঠিত, লাভজনক এবং উন্নত হয়ে উঠছে।

তথ্য সূত্র:

1. সুপ্রতিম কর্মকার, নদীজীবীর নোটবুক, ধানসিঁড়ি, মে-2022, পৃষ্ঠা নং- 59.
2. দীনবন্ধু মিত্র, সুরধ্বনী কাব্য, সম্পাদক- শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পৃষ্ঠা নং- 97.
3. কমল চৌধুরী, নদীয়ার ইতিহাস দ্বিতীয় পর্ব, দে'জ পাবলিকেশন, এপ্রিল-2012, পৃষ্ঠা নং-13.
4. দীনবন্ধু মিত্র, সুরধ্বনী কাব্য,সম্পাদক- শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী সজনীকান্ত দাস,বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ - pp-97.
5. Assistant Director of Fisheries, Nadia, Pintu Paul &Dr. Sandipan Chakraborty, "Impact of Inland Fisheries on the Socio-Economic Development: A Focus on Perspectives on Development, Nadia District, West Bengal, India.", International Journal of Fisheries and Agriculture, Volume 6, Number 1 (2016) ,p-62.
6. Pintu Paul &Dr. Sandipan Chakraborty, "Impact of Inland Fisheries on the Socio-Economic Development: A Focus on Perspectives on Development, Nadia District, West Bengal, India.", International Journal of Fisheries and Agriculture, Volume 6, Number 1 (2016) , p-63.

7. Assistant Director of Fisheries, Nadia, Pintu Paul &Dr. Sandipan Chakraborty, "Impact of Inland Fisheries on the Socio-Economic Development: A Focus on Perspectives on Development, Nadia District, West Bengal, India.", International Journal of Fisheries and Agriculture, Volume 6, Number 1 (2016) , p-67.
8. তদেব, পৃষ্ঠানং-69.
9. Baijayanti Chatterjee, 'The Rivers of Bengal: The Role of the Fluvial Network in the Development of the Regional Economy, c. 1600-1700', The International Journal of Humanities & Social Studies, Vol 3, March, 2015, p- 146.
10. Abdus Sattar Shaikh, 'STUDY ON SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS OF FISHER COMMUNITY IN RURAL AREAS OF NADIA DISTRICT, WEST BENGAL, INDIA', Journal of Emerging Technologies and Innovative Research, Volume 6, June 2019, p-892.

আয়ুর্বেদশাস্ত্রে আচার রসায়ন : সুস্বাস্থ্যের নব উন্মেষণ

অরিজিৎ দাস
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ,
গঙ্গাধরপুর মহাবিদ্যামন্দির

সংক্ষিপ্তসার- অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ তথা আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের আটটি প্রধান অঙ্গের অন্যতম হল রসায়নতন্ত্র। রসায়নতন্ত্রে আয়ুর্বেদের ইতিবাচক প্রধান পদ্ধতিগুলি বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। ব্যবহারিক জীবনের এমন অনেক ক্রিয়াকলাপ রয়েছে যা ইতিবাচক আবেগ ও অভিজ্ঞতার জন্ম দিয়ে স্বাস্থ্য ও সুখকে উন্নত করে তোলে।এই ধরণের ক্রিয়াকলাপ আচার রসায়নের অন্তর্গত। আয়ুর্বেদ শাস্ত্র দৃঢ়ভাবে রোগের প্রতিরোধ, নিরাময় ও পুনর্বাসনের উপর জোর দেয়। দৈনন্দিন জীবনযাপনে কিছু ক্রিয়াকলাপ যা স্বাস্থ্যের জন্য অনুকূল এবং অবশ্যই অনুসরণীয় ---

- দিনচর্যা (প্রতিদিনের আচরণীয় নিয়ম)
- ঋতুচর্যা (ঋতু অনুযায়ী আচরণীয় নিয়ম)
- রাত্রিচর্যা (রাত্রিকালে পালনীয় নিয়ম)
- সৎবৃত্ত ও আচার রসায়ন (ন্যায়পরায়ণ আচরণ)
- আহার (সুষম খাদ্য)
- নিদ্রা (ঘুম)
- ব্রহ্মচর্যা (নিয়ন্ত্রিত কর্ম)

আচার রসায়ন বিষয়ে বিভিন্ন আয়ুর্বেদ শাস্ত্র সম্পর্কিত গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। "চরক সংহিতা" গ্রন্থের 'চিকিৎসাসংস্থান' অধ্যায়ে এই বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। আচার রসায়ন-এর অর্থ হল সৎ আচরণ বা সঠিক দিনচর্যা যা একজন মানুষের শারীরিক ও মানসিক আচার ব্যবহারকে ব্যক্ত করে তোলে।এটি এমন একটি প্রাণবন্ত উপাদান যেখানে ঔষধের কোনো ভূমিকা নেই। আচার রসায়নের আন্তরিক অনুশীলনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ জীবন প্রক্রিয়া অসুস্থতা মুক্ত হয়ে ওঠে। আচার রসায়নের গুণাবলীর যথাযথ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এগুলির অধিকাংশই মন, ধী বা ধৃতির সঙ্গে ভালো আচরণের সহাবস্থান।

সূচকশব্দ : রসায়নতন্ত্র, আচার, দিনচর্যা, রাত্রিচর্যা, সুস্বাস্থ্য।

ভূমিকা- আয়ুর্বেদ জীবনের একটি বিজ্ঞান। আয়ুর্বেদের প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য হল সুস্বাস্থ্য রক্ষা করে জীবনকে সুস্থ রাখা এবং রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করা[১]।আচার্যসুশ্রুতও এই মতকে সমর্থন করেছেন। প্রচলিত রূপে তিন ধরনের

রসায়নথেরাপি রয়েছে: **১. আচার রসায়ন-"** ইতিবাচক আচরণ বা সদাচরণ" **২.আজস্রিকা রসায়ন**-"স্বাস্থ্যকর খাদ্য" এবং **৩.ঋষি রসায়ন**-"ভেষজ বা ওষুধ" । আচার রসায়ন আয়ুর্বেদের একটি অনন্য ধারণা যা নৈতিকএবং উদার আচরণকে বোঝায় ।এই আচরণগুলি শরীরওমনেপুনর্জীবন নিয়ে আসে।যারা সত্যবাদী এবং ক্রোধমুক্ত, যারা মদ্যপান এবং অবাধযৌনতা বর্জিত, যারা হিংসা বা ক্লান্তিতে লিপ্ত হন না, যারা শান্তিপ্রিয় এবং আনন্দদায়ক, যারা জপ (মন্ত্র) এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, স্থির, নিয়মিত দান ও তপস্যা করে, যাদের জাগরণ ও ঘুমের সময়কাল নিয়মিত, যারা অভ্যাসগতভাবে দুধ ও ঘি গ্রহণ করে, যারা যৌক্তিকতার জ্ঞানে বিশেষজ্ঞ, যারা অহং মুক্ত, যাদের আচার-আচরণ ভালো, যারা সংকীর্ণ মনের নন, যারা আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাস করে, যাদের ক্ষিপ্র ইন্দ্রিয় আছে, যাদের আছে বয়োঃজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধা, আস্তিক (যারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে এবং বেদের অস্তিত্ব যারা স্বীকার করে) এবং যারা আত্ম-নিয়ন্ত্রণ রাখে এবং যারা নিয়মিত শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, তারা আচার রসায়ণকৃত সমস্ত সুবিধালাভ করে ও দীর্ঘায়ু লাভ করে।[২]যিনি খুব আশাবাদীভাবে আচার রাসায়ণের সমস্ত আচরণবিধি অনুসরণ করেন তাদের অন্য রসায়ন গ্রহণের প্রয়োজন নেই এবং যারা আচরণবিধি অনুসরণ না করে অন্যান্য রসায়ন গ্রহণ করেন তারা চরকের মতে রসায়নের সর্বোত্তম ফলাফল পান না।

উদ্দেশ্য -বর্তমানে আচার রসায়নের নীতিগুলো বড়ই প্রাসঙ্গিক।সুস্থ ও ভালো থাকার জন্য যে সব পরিকল্পনা তথা সমাধানের চেষ্টা আমরা করছি তার মূলে রয়েছে আচার রসায়ন। বর্তমান পরিবেশগত বিষাক্ততা এবং বেপরোয়া খাদ্যশৃঙ্খল যেভাবে আমাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে তার থেকে মুক্তির তথা আস্বাদ প্রাপ্তির অন্যতম উপায়রূপে আলোচ্য বিষয়টি প্রতিপাদিত হয়েছে।

সাহিত্য পর্যালোচনা –আচার রসায়ন বর্ণনা প্রসঙ্গে আচার্য চরকতাঁর 'চরকসংহিতা' গ্রন্থে বলেছেন যে প্রত্যেকে যারা দীর্ঘ আয়ু পেতে চান তাদের নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালনে সতর্ক হওয়া উচিত[৩]---

১.সত্যবাদিনম্--- সত্যবাদিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ .কারণ এটি সরাসরি একজন ব্যক্তির নৈতিক চরিত্রের সাথে সম্পর্কিত। মন এবং শরীরের অবিচ্ছেদ্য সংযোগ এখন আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারা সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত। যদি একজন ব্যক্তি মিথ্যা বলে তবে তার মধ্যে মানসিক চাপ তৈরি হয়। এই মানসিক চাপ শরীরে রোগ সৃষ্টি করতে পারে। নিজ বা অন্যের প্রতি সত্য না হলে মনের মধ্যে তৈরি মানসিক চাপের কারণে শরীরের শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তনগুলি একটি আত্ম-ধ্বংসাত্মক কাজ হতে পারে। যখন আমরা সত্যে বাস করি, তখন আমাদের শরীর তার সাদৃশ্য খুঁজে পায় এবং আমাদের নিজের মধ্যে ভারসাম্য খুঁজে পায়, যা আমাদের অন্তর্নিহিত ভারসাম্যহীনতা নিরাময় করতে সাহায্য করে।

২.অক্রোধম্--- পিত্ত দোষের সাথে রাগের বিষয়টি সম্পর্কযুক্ত । রাগ রক্তচাপের পাশাপাশি হৃদস্পন্দন বাড়ায়। রাগের ফলে উদ্ভূত চাপ শরীরের শারীরবৃত্তীয় পরিবেশের সামঞ্জস্যকে ব্যাহত করে। এটি শরীরকে রোগের জন্য সংবেদনশীল করে তুলতে পারে। ক্রোধহীনতাইস্বাস্থ্য এবং নিরাময়ের চাবিকাঠি।

৩.মদ্যনিবৃত্তম্--- চরক সংহিতায় মদ্যপান সম্পর্কিত অধ্যায়টি শুরু হয়েছে সতর্কবাণী দিয়ে যে অ্যালকোহলকে বিষ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। অ্যালকোহলের গুণাবলী হল লঘু, উষ্ণ, আমলা, রুক্ষ এবং বিষদা। এটি সরাসরি আমাদের সত্ত্বগুণকে প্রভাবিত করে। অ্যালকোহল কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে বিষণ্ণ করে এবং অল্প পরিমাণে সাইকোঅ্যাকটিভ প্রভাব ফেলে। তবে মদ্যপান, কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ, ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস, অ্যালকোহলযুক্ত লিভার ডিজিজ এবং ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি বাড়ায়। দীর্ঘস্থায়ী অ্যালকোহলের অপব্যবহার থেকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র এবং পেরিফেরাল স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি হতে পারে।

৪. মৈথুননিবৃত্তম্--- ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে । ব্রহ্মচর্য অনুসারে যৌন ক্রিয়ার অর্থ আজীবন যৌনতা থেকে বিরত থাকা নয়। ধারণাটি হল একাধিক যৌনসঙ্গী নয়, একটি বিশ্বাসযোগ্য সঙ্গীর সাথে যৌনতায় সক্রিয় হওয়া এবং ঋতু, দিনের সময় এবং উভয় সঙ্গীর আবেগের উপর ভিত্তি করে যৌন ক্রিয়া সম্পাদন করা।

৫. অহিংসকম্--- হিংসাত্মক মন একটি সহিংস পরিবেশ তৈরি করে। শরীর যখন শান্তিতে স্থির থাকে না তখন তার নিরাময় সম্ভব নয়। আমাদের শরীর নিরাময়ের একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায় । যখন আমরা ঘুমাই, বিশ্রাম করি বা শয়ন করি, ধ্যান করি এবং ব্যায়াম করি তখন পুরানো কোষগুলি মারা যাওয়ার সাথে সাথে নতুন কোষ তৈরি হয় ।আমাদের শরীর ও মনের পরিশুদ্ধিকরণের প্রক্রিয়াটি প্রতি মুহূর্তে শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো কিছু অনিচ্ছাকৃত কাজের সাথে ঘটে চলেছে । এই সমস্ত প্রক্রিয়াগুলি একই সাথে ঘটতে, আমাদের একটি স্থিতিশীল অহিংস শরীর এবং মন থাকা দরকার। সহিংসতা নিরপেক্ষ মনের প্রকৃতি এবং শরীরের স্বাচ্ছন্দ্য প্রকৃতিকে প্রভাবিত করে।

৬. অনায়াসম্--- অতিরিক্ত পরিশ্রম করা বাঞ্ছনীয় নয় কারণ এটি বাতের রোগকে বাড়িয়ে দেয়। আয়ুর্বেদ মতে সর্বোচ্চ ক্ষমতার পঞ্চাশ শতাংশ ব্যায়াম ব্যবহার করতে হবে অন্যথায় স্বাস্থ্যহানি ঘটবে । ব্যায়াম বা অনুশীলনের মাধ্যমে শরীর সুস্থ থাকে। আলোচ্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শরীর নিয়মিতরূপে কাজ করার শক্তি পেয়ে থাকে।

৭. প্রশান্তম্--- মনের শান্তি একটি অভ্যন্তরীণ অবস্থা । যখন মন শান্তিতে থাকে, তখন তা কোন ঘটনা বা সমস্যা দ্বারা প্রভাবিত হয় না এবং সমস্ত পরিস্থিতিতে অভ্যন্তরীণ স্থিতি বজায় রাখে। মন যখন শান্ত থাকে তখন শারীরিক স্থিতি বজায় থাকে।

৮.প্রিয়বাদিনম্--- কথার মাধ্যমে অন্যকে আঘাত করা উচিত নয়। সকলের সাথে মিলেমিশে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনযাপন করার জন্য শারীরিক, মানসিক বা মৌখিক ভাষার অপব্যবহার বর্জন করা উচিত। শব্দের শক্তি আছে কোনো কথা একবার বললে তা ফেরত নেওয়া যায় না। কথা বলার মাধ্যমেই আমাদের সার্বিক চরিত্রের প্রতিফলন ঘটে।

৯.জপপরম্--- সর্বদা ঈশ্বরকে স্মরণ করা উচিত। মহাবিশ্বের স্রষ্টা ঈশ্বরের প্রতি মনোনিবেশের ফলে মন একাগ্র হয়ে ওঠে।সবকিছুর মধ্যে সৌন্দর্যকে চিনতে পারলে তবেই জীবন আরও সমৃদ্ধ এবং পূর্ণ হয়ে ওঠে। আধুনিক সমাজের আত্মকেন্দ্রিক ভাবধারা ভারসাম্যহীন জীবনধারার একটি অন্যতম কারণ।

১০.শৌচপরম্--- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সুস্বাস্থ্যের প্রধান সূচক। আমরা যদি পরিষ্কার এবং শুদ্ধ থাকি তবে ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাসের মতো জীবাণুগুলি আমাদের শরীরে প্রবেশ করতে পারে না। পরিষ্কার মানুষ প্রায়ই স্বাস্থ্যকর এবং সুখী হয় ।

১১.ধীরম্--- মানসিক ধৈর্য জীবনে সাফল্য আনে । ভালো অভ্যাস অনুশীলন তথা গ্রহণের মাধ্যমে জীবনচর্যাসুন্দর হয়ে ওঠে ।

১২.দাননিত্যম্--- প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে।অতিরিক্ত সম্পদের সঞ্চয় কেবলমাত্র মানসিক তথা শারীরিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে না এর দ্বারা মনের স্বচ্ছতা বিঘ্নিত হয়। সরল জীবন যাপনের মাধ্যমে উচ্চতর চিন্তা প্রতিফলিত হয়। সঞ্চিত অর্থের কিছু পরিমাণ দানের দ্বারা আমাদের নিঃস্বার্থ সেবার চিন্তাভাবনা বিকশিত হয়।কেবলমাত্র আত্মকেন্দ্রিকতা নয় অন্যের বেঁচে থাকার মধ্যে নিজের আনন্দ খুঁজে নেওয়াতেই মানসিক প্রশান্তি গড়ে ওঠে ।

১৩.তপস্বিনম্--- ধর্মীয় বিষয়ে একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ মানব সভ্যতার অন্তরায়। কোনো একটি নির্দিষ্ট বিশ্বাস যেমন সকলের পক্ষে আদর্শ নয় তেমনি বহু জাতি, বহু ধর্মের সমাজব্যবস্থায় এ,কে অপরের প্রতি বিরূপ দৃষ্টি ভঙ্গি সমাজের ক্ষতি ডেকে আনে । তাই অন্যের উপর নিজের দৃষ্টি ভঙ্গি জোর করে চাপিয়ে দেওয়া একটি আত্মধ্বংসাত্মক কাজ । একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাবান হলে সমাজের স্থিতাবস্থা বিঘ্নিত হয় না এবং এক্ষেত্রে নিজস্ব আধ্যাত্মিক চিন্তা ভাবনার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

১৪.অর্চনম্--- শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্ – অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার শিক্ষা পিতামাতা, শিক্ষক এবং গুরুজনদের থেকে অর্জিত হয়ে সঠিক পথের দিশা দেখায়। একে অপরের প্রতি এই শ্রদ্ধা প্রদর্শনই সমাজের সাম্যাবস্থা তথা ব্যক্তির মানসিক স্থিথাবস্থা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

১৫.আনৃশংস্যপরম্--- নিষ্ঠুরতা ঘৃণার জন্ম দেয়; হৃদয় ও মনকে অস্থির করে তোলে। প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ চারপাশের সদয় ও উদার মানসিকতার পরিবেশ সংগঠিত হয়।

১৬.নিত্যং নিত্যং করুণবেদিনম্ --- আত্মকেন্দ্রিকতা বর্জন করে সমাজের প্রতি সদয় হলে মানুষের মানসিক প্রশান্তি গড়ে ওঠে। আত্মকেন্দ্রিকব্যক্তির প্রায়শই কম বন্ধু থাকে তাই এক্ষেত্রে মানসিক চিন্তাভাবনা একে অপরের মাথে বিনিময় করার অবকাশ থাকে কম।

১৭. সমজাগরণম্--- জাগরণ ও নিদ্রার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে । রাত্রে যেমন বেশিক্ষণ জেগে থাকা যাবে না তেমন দিনের বেলায় ঘুমানো যাবে না। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে মানব শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ দিন ও রাতের নির্দিষ্ট সময়ে অতিরিক্ত সক্রিয় থাকে। এই অঙ্গগুলির সর্বোত্তম কার্যকারিতা এবং স্বাস্থ্যের জন্য পরিমিত বিশ্রাম অথবা জেগে থাকা অবশ্য মেনে চলা উচিত। সেক্ষেত্রে আমাদের শারীরিক স্থিতাবস্থা বজায় থাকে।

১৮.নিত্যংক্ষীরঘৃতাশিনম্--- খাদ্য তালিকায় দুধ ও ঘি পরিমিত ভাবে গ্রহণ করতে হবে ।স্বল্পপরিমাণে জায়ফলের সাথে দুধের মিশ্রণ অনিদ্রাগ্রস্থ রোগীদের জন্য বিশেষ কার্যকরী । ঘি পিত্ত ও বাতকে উপশম করে। এবং রস,ধাতু ও শুক্রের জন্য বিশেষ সহায়ক।

১৯.দেশ-কাল-প্রমাণজ্ঞম্--- দেশ, কাল ও স্থানের উপর শরীরের সাম্যাবস্থা নির্ভর করে। একটি নতুন পরিবেশে জলবায়ু ও আবহাওয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে কিছুটা সময় লাগে। ঋতু ও প্রকৃতির সাথে সহাবস্থানে দেহ ও মনের সাম্যাবস্থা বজায় থাকে।

২০.যুক্তিজ্ঞম্--- জীবনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রয়োজন ধ্যান ও যোগাভ্যাসের মাধ্যমে মানসিক স্থিতি বজায় থাকে তথা লক্ষ্য নির্দিষ্ট হয়।

২১.অনহঙ্কৃতম্--- অহংবোধ বর্জন করতে হবে।বর্তমানে বেশির ভাগ ব্যক্তি অহংবোধ দ্বারা পরিচালিত। হৃদয় থেকে পরিচালিত হয়ে কেউ কোনো কাজ করে না তাই শরীর মন ও আত্মা থেকে অহংবোধ দূরীভূত হলে মনের প্রশান্তির পাশাপাশি কর্মেও সফলতা আসে।

২২.শস্তাচারম্--- সমাজের দিক্দর্শনকারী মহান ঋষিগণ যে পথে আমাদের দিশা দেখিয়েছেন এবং তাঁদের উত্থান-পতনের অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করেছেন সেটিকে শিরোধার্য করে চললে ব্যক্তিগতজীবনযাত্রায় মানসিক প্রশান্তির স্থিতাবস্থা বিঘ্নিত হয় না।

২৩.অসঙ্কীর্ণম্--- উদার মানসিকতার মাধ্যমে যদি সকলের সাথে মিলেমিশে থাকা যায় সেক্ষেত্রে মানসিক প্রশান্তি গড়ে ওঠে। উদার হওয়ায় এই অর্থ নয় যে সবকিছু ত্যাগ করা।এর অর্থ পারস্পরিক সহযোগীতার মাধ্যমে নিজের অস্তিতিব বজায় রাখা।

২৪.অধ্যাত্মপ্রবণেন্দ্রিয়ম্ --- যে কোনো কাজে বিশুদ্ধ চেতনা নিয়ে নিযুক্ত হলে তার সর্বাধিক ফলাফল পাওয়া যায়। সচেতন,বিশুদ্ধ তথা সাত্ত্বিক মন লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার অন্যতম সোপান ।

২৫.উপাসিতারং বৃদ্ধানাম্ --- প্রবীণব্যক্তিদের সম্মান করা উচিত।প্রবীণেরা তাদের জীবন দর্শন দিয়ে সকলকে লালনপালন করে এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দ্বারা বিভূষিত করে। তাদের প্রদর্শিত দিক্দর্শনের মাধ্যমে সকলের মানসিক স্থিতাবস্থা বজায় থাকে। এবং বিভিন্ন বিপদ থেকে মুক্ত হয়।

২৬.উপাসিতারম্ আস্তিকানাম্--- ধর্ম ও ঈশ্বরের সেবায় নিযুক্ত পুরোহিত ঋষি ও সাধুদের সম্মান প্রদর্শন ও সেবা করা উচিত। তাঁদের ধার্মিকতার আদর্শ পথ অনেক কিছু শেখায় ও জীবনকে সুন্দর করে তোলে।

২৭.উপাসিতারং জিতাত্মনাম্ --- ইন্দ্রিয়গুলি হল কামনার কারণ । মানুষের চাহিদা অনুযায়ী আকাঙ্ক্ষাও বিভিন্নরকম। পারে। ইন্দ্রিয়গুলি জয় করার মাধ্যমে অবাঞ্ছিত কামনাগুলির দমন করা যায়। এইভাবে চললে মানুষের শারীরিক ও মানসিক স্থিতি বজায় থাকে।

২৮.ধর্মপরম্--- ধর্মীয় আচার আচরণে নিযুক্ত থাকার মাধ্যমে মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা বজায় থাকে। নিবেদিত ও সাত্ত্বিক মনের অধিকারী ব্যক্তি যে কোনো বাধাকে অনায়াসে অতিক্রম করতে পারে ।

২৯.শাস্ত্রপরম্--- নিয়মিত বিজ্ঞানের অগ্রগতির গবেষণা এবং নতুন দিক্দর্শন সময়ের সাথে সাথেপরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হচ্ছে । প্রযুক্তি নতুন প্রকার ওষুধের উদ্ভাবন ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক প্রগতিই সমাজ ব্যবস্থার স্থায়িত্ব নিয়ে আসে।

বর্তমান আধুনিক জীবনযাত্রার ফলে মানসিক চাপ থেকে উদ্ভূত দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার সমাধানের জন্য আচরণগত চিকিৎসাপদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আচার রসায়নের নীতিগুলি সঠিকভাবে মেনে চলার মধ্যে দিয়ে সুস্থ ও রোগমুক্ত সমাজ নির্মাণ করা সম্ভব। এই পদ্ধতিতে শুধুমাত্র রোগ প্রতিরোধ নয়, রোগপ্রক্রিয়ার পর্যায়গুলিকেও অঙ্কুরে বিনাশ করা যায়। বর্তমান বিশ্বে দ্রুতগতির যুগে মানুষ মানসিক শান্তির জন্য যেখানে সন্দিহান হয়ে পড়েছে সেখানে আচার রসায়নই নব দিগদর্শন হয়ে উঠতে পারে।

পাদটীকা :

১. স্বস্থস্য স্বাস্থ্যরক্ষণম্ আতুরস্য বিকারপ্রশমনঞ্চ। চরকসংহিতা সূত্র. ৩০/২৬, পৃষ্ঠসংখ্যা- ৫১৬।

২. ন কেবলং দীর্ঘমিহায়ুরশ্নুতে রসায়নং যো বিধিবন্নিষেবতে ।
গতিং স দেবর্ষিনিষেবতাং শুভাং প্রপদ্যতে ব্রহ্ম তথৈতি চাক্ষরম্।।
চরকসংহিতা চিকিৎসাস্থানম্- ১/৮০ পৃষ্ঠসংখ্যা-১২।

৩. সত্যবাদিনমক্রোধং নিবৃত্তং মদ্যমৈথুনাত্।
অহিংসকমনায়াসং প্রশান্তং প্রিয়বাদিনম্।। ৩০।।
জপশৌচপরং ধীরং দাননিত্যং তপস্বিনম্ ।

দেবগোব্রাহ্মণাচার্যগুরুবৃদ্ধার্চনেরতম্।। ৩১।।
আনৃশংস্যপরং নিত্যং নিত্যং করুণবেদিনম্।
সমজাগরণস্বপ্নং নিত্যং ক্ষীরঘৃতাশিনম্।।৩২।।
দেশকালপ্রমাণজ্ঞং যুক্তিজ্ঞমনহঙ্কৃতম্।
শস্তাচারমসঙ্কীর্ণমধ্যাত্মপ্রবণেন্দ্রিয়ম্।।৩৩।।
উপাসিতারং বৃদ্ধানামাস্তিকানাং জিতাত্মনাম্।
ধর্মশাস্ত্রপরং বিদ্যান্নরং নিত্যরসায়নম্।।৩৪।।
গুণৈরেতৈঃ সমুদিতৈঃ প্রযুক্তে যো রসায়নম্।
রসায়নগুণান্ সর্বান্ যথোক্তান্ স সমশ্নুতে।। ৩৫।। চরকসংহিতা চিকিৎসাস্থানম্ ১/4 পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩১

REFERENCES:

- Sharma P.V., *SuśhrutaSaṃhitā:Text with Englishtranslation*,VoI-II,Chaukhambha Orientalia,Varanasi, 1998.
- Pandey Kashinatha, ChaturvediGorakhnath, *Carakasaṃhitā: Sabimarṣha'Vidyotini'hindivyakhyāpeta*, Chaukhambha Bharati academy, Varanasi, 2021.
- Vaisya Shyamsundaracharyya, *Rasāyanasāra,* Vol-I, Chaukhambha Krishnadas academy, Varanasi, 2014.
- Sharma P.V., *Āyurvedakāvaigānikaitihāsa*, Chaukhambha Orientalia, Varanasi, 2021.
- Vidyalamkara Atrideva, *Āyurvedakāvṛihatitihāsa*, Uttarpradesahindisamsthan, Lucknow,1991.
- Roy Chowdhury Amiya Kumar, *Man malady and medicine: History of Indian medicine*,Das Gupta & co. (p) Ltd., Calcutta,1988.

কথাকার মীনাক্ষী সেনের কলমে রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ

দীপিকা মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ

সারসংক্ষেপ : বাংলাসাহিত্যে উনিশ শতকের শেষার্ধ বঙ্কিম-যুগ এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধ রবীন্দ্র-যুগ যদি বলা হয় তবে খুব বেশি অত্যুক্তি হয় বলে মনে হয় না। লক্ষ করলে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজগতে পদার্পন উনিশ শতকের শেষ দুইদশকের একটু আগে হলেও মূলত বিশ শতকেই তাঁর প্রতিভার রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়েছিল। ফলে এ সময় বহু সাহিত্যিকই তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সাহিত্যজগতে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। এর ব্যতিক্রমও যে হয়নি তা নয়। তবে সেসময় তিনি যেমন সমগ্র বাংলাসাহিত্যকে আবিষ্ট করে রেখেছিলেন, আজও যার ঘোর কাটেনি। তাই তো আজও বাঙালির মননে-চিন্তনে রবীন্দ্রনাথ বিরাজমান। যা বেশ কিছু লেখকের রচনায়ও প্রকাশিত হতে দেখা গেছে। এমনই একজন কথাকার হলেন মীনাক্ষী সেন, যিনি সাহিত্যজগতে নিজের স্বতন্ত্র আসন নির্মাণ করে নিলেও মুক্ত নন রবীন্দ্র-ভাবনা থেকে। মূলত তাঁর রচিত সাহিত্যের পটভূমিতে আছে সমাজের নিপীড়িত-শোষিত-বঞ্চিত নারীরা। আর তাদের কথা বলতে গিয়ে তিনি কখনও কখনও রবীন্দ্র-সাহিত্যের দ্বারে উপনীত হয়েছেন। কিন্তু কীভাবে, কোন মাধ্যমে? অর্থাৎ মীনাক্ষী সেনের কোন কোন রচনায় রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ রয়েছে এবং কীভাবে রয়েছে - আলোচ্য প্রবন্ধে এসব দিকই বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা যেতে পারে। তবে তাঁর বাংলা সাহিত্যে পদার্পন জেলের ভেতর জেল নামক আখ্যানের মধ্যে দিয়ে। যা তাঁকে কালজয়ী করে তুলেছে।

সূচকশব্দ: নারী, নির্যাতন, ন্যায় বিচার, ক্ষমতা, শিক্ষা।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমকালীন সময়ে রবীন্দ্র-প্রতিভায় ম্লান বা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল অনেক প্রতিভাই। আবার কেউ তাঁর সাহিত্যের অনুসারী হয়ে গমন করেছিলেন পিছু পিছু। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালে তথা বর্তমান শতকেও অনেক লেখকের রচনায়ই বারংবার রবীন্দ্রনাথের জীবন কিংবা তাঁর সৃষ্টিকথা উঠে এসেছে। এমন একজন লেখক হলেন মীনাক্ষী সেন। কারও কারও মতে তিনি ত্রিপুরার কথাসাহিত্যিক। কিন্তু বাংলা ভাষার বাংলা সাহিত্যকে কি কোনও প্রদেশ বা অঞ্চলভেদে বিভক্ত করা যেতে পারে? তা বোধহয় ঠিক নয়। তবে বর্তমানে বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বহির্বঙ্গীয় বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের সম্পর্কে পাঠদান করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রেও মনে হয়, যেন এসব শব্দগুচ্ছের ব্যবহার বাংলা সাহিত্যকে খণ্ডিত করে দেয়। তাই মীনাক্ষী সেনকে লেখক হিসেবে শুধুমাত্র ত্রিপুরার লেখক বলে বাংলা সাহিত্যের

লেখকগোষ্ঠীর থেকে আলাদা করা ঠিক নয়। আর তাছাড়া দেখা যায়, তাঁর সাহিত্য সৃজনের ক্ষেত্রভূমি সীমাহীন প্রসারিত। তবে তিনিও রবীন্দ্রজীবন ও সৃষ্টি দ্বারা প্রভাবান্বিত। তাঁর খুব বেশি লেখা পাওয়া যায় না বা এখনও পর্যন্ত খুঁজে পায় নি। তবে এ প্রসঙ্গে তাঁর স্বামী, 'স্পন্দন' পত্রিকার সম্পাদক সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন –

"ছোটগল্প চর্চা শুরু করার প্রথম দিক থেকেই লেখিকা নিজের লেখা নিয়ে সন্দেহবাতিকগ্রস্থ। ফলে, তাঁর অনেক পাণ্ডুলিপি হারিয়ে যায়, আর যা পড়ে থাকে তার ওপর বারবার কলম চালাতে তাঁর বেশি পছন্দ। লেখিকার এইসব বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত বা প্রকাশিতব্য গল্পের সংখ্যাকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে চলেছে"।[১]

এছাড়া ব্যক্তিজীবনেও লেখক ছিলেন বেশ অগোছালো। ফলে তাঁর অনেক লেখাই কালের নিয়মে হারিয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে তাঁর নিজেরই একটি বক্তব্য –

"কোনো লেখারই কপি নিজের কাছে রাখি না, লিখি, পত্রিকা অফিসে পাঠিয়ে দিই"।[২]

ফলে পরবর্তীকালে গ্রন্থ প্রকাশনার সময় তাঁকে পড়তে হয়েছে বেশ অসুবিধার মুখে এবং এর ফলে অনেক লেখাই গেছে হারিয়ে। জানা নেই সেসব হারানো লেখাগুলি কোনওদিন খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা। তবে যা আছে কিছু কম নয়, যেমন – জেলের ভেতর জেল (২০১৪, অখণ্ড) *শতাব্দী শেষের গল্প* (১৯৯৯), *মীনাক্ষী সেনের ছোটগল্প* (২০০৪), *কয়েকটি মেয়েলি গল্প* (২০০৭), *একুশের প্রথম দশকের ত্রিপুরার চার প্রধান গল্পকার* (২০১০) নামক গল্পগ্রন্থে চারটি গল্প, *দশটি গল্প* (২০১১), *একটি কালো টুপি ও ন্যায় বিচার* (২০১৩), *ছেঁড়া পাতার নৌকো* (২০১৪) এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত আরো কিছু গল্প-প্রবন্ধ। এর মধ্যে তিনি জেলের ভেতর জেল গ্রন্থটির জন্য পেয়েছিলেন শ্রেষ্ঠ যুক্তিবাদী লেখিকা পুরস্কার।

বিশ শতকের শেষ দুই দশক ও একুশ শতকের প্রায় প্রথম দেড় দশক ছিল মীনাক্ষী সেনের সাহিত্য সৃষ্টির সময়কাল। কিন্তু এতকাল পরেও তিনি সাহিত্যে রচনায় রবীন্দ্রনাথকে এড়িয়ে যাওয়া বা ভুলে যাওয়া বা অস্বীকার করা - কোনওটাই করেন নি। আসলে তাঁর চিন্তন ও মনন ছিল রবীন্দ্রভাবনার পূজারী। ফলে তাঁর লেখায় রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য কোনওভাবেই আসবে না এ কেমন করে হতে পারে। এ ছিল সত্যিই অসম্ভব ব্যাপার। তাই মীনাক্ষী সেনের কয়েকটি রচনায় রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে দেখা যায়। আলোচ্য এই প্রবন্ধে মীনাক্ষী সেনের কোন কোন রচনায় কীভাবে রবীন্দ্র প্রসঙ্গ উপস্থাপিত করা হয়েছে তা বিশদে আলোচনার প্রয়াস থাকবে।

প্রথমেই আসা যাক, মীনাক্ষী সেনের লেখা প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রনাথ ও ন্যায়বিচার'-এ। এই প্রবন্ধটি প্রথমে 'অনুষ্টুপ' পত্রিকার গ্রীষ্ম ১৪১৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে লেখকের প্রবন্ধ সংকলন ছেঁড়াপাতার নৌকা-তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সুদূর ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালে দেখা যাবে সমাজ, সংসার, রাজনীতি – জীবনের সকলক্ষেত্রেই

মাৎস্যান্যায়। অর্থাৎ পুকুরের বড় মাছেরা চিরকালই ছোটমাছদের গিলে খেয়েছে এবং এখনও খেয়ে থাকে। দুর্বলের ওপর প্রবলের অত্যাচার চিরকালীন। এ-কথা যেমন রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ ও উপলব্ধি করেছিলেন। তেমন মীনাক্ষী সেনও বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতায় খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন। জেলের ভেতর জেল গ্রন্থের পাঠক মাত্রেই জানা যে, মীনাক্ষী সেন তাঁর জীবনের উনিশ থেকে তেইশ বছর – এই সময়পর্ব জেল নামক নরকের অন্ধকারে কাটিয়েছিলেন এবং সেখানে প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ ও উপলব্ধি করেছিলেন ক্ষমতার আস্ফালন। ক্ষমতা যাদের হাতে থাকে তারা কীভাবে বিনা দোষে অপরাধীদের ওপর জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন এবং জীবনের চরম পরিণতি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দিতে পারে – এসবই লেখকের খুব কাছ দেখা ও জানা। তাই তো লেখক সহজেই বলতে পেরেছেন –

"বিশেষত এই সময়ে, চারিদিকে যখন হামদো, মামদো, জামদো অপরাধীদের ভিড়, খুন, বধূহত্যা, ধর্ষণ, অপহরণ, মানুষ পাচার, জালিয়াতি, আর্থিক অপরাধ আরও কত যে অপরাধ। এসব অপরাধ যারা করে – তারা যদি একবার ক্ষমতাশালীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ফেলে অথবা ক্ষমতাশালীদেরই কেউ হয়, অথবা হয় আর্থিক বা সামাজিকভাবে শক্তিশালী, তবে তারা ধরা পড়ে না, ধরা পড়লেও ছাড়া পেয়ে যায়, শাস্তি পায় হাতে গোনা ক্ষেত্রে"।[৩]

লেখক এমন ঘটনাগুলি যেমন জেলে থাকাকালীন দেখেছেন, তেমনই ত্রিপুরার মহিলা কমিশনের সদস্য-সচিব (২৬ আগষ্ট, ১৯৯৮ – ৫ ডিসেম্বর, ২০০৩) থাকাকালীন যেন আরও সামনে থেকে দেখেছেন। তাই এমন সাহসী বক্তব্য অনায়াসেই তাঁর লেখনীতে বেরিয়ে এসেছিল। কিন্তু লেখকের প্রশ্ন –

"রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'গান্ধারীর আবেদন' –কাব্যনাটকে যখন বললেন 'দণ্ডিতের সাথে/ দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে/ সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার, তখন এর অর্থ বোঝা সহজ হয়। পিতা যখন পুত্রকে দণ্ড দেন, তখন তার অপরাধ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েই নিশ্চয়ই। সে বিচার তো নির্ভুল হওয়াই স্বাভাবিক। অতএব শ্রেষ্ঠ"।[৪]

কিন্তু এমনটা কি বাস্তবে হয়? পিতা পুত্র ছাড়া দণ্ডদাতা দণ্ডিতের জন্য কখনও কি কাঁদে? এমনটা বোধহয় কখনই হয় না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কীভাবে চিরকাল ন্যায়বিচারের পথ দেখিয়ে এসেছেন আলোচ্য প্রবন্ধে তা লেখক তুলে ধরতে চেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'গান্ধারীর আবেদন' কাব্যনাটকটি রচনা করেছিলেন ১৩০৫ সালে। যেখানে তিনি ন্যায়বিচারের মূল পথকে তুলে ধরেছিলেন উপরোক্ত উক্তির মাধ্যমে। কিন্তু এরপর আর রবীন্দ্রনাথকে এ ধরণের মন্তব্য করতে দেখা যায় না। এরই মধ্যে দেশে ঘটে গেছে নানান অহিতকর কাহিনী ব্রিটিশ শাসকের দ্বারা। ভারতবর্ষে চালু হয় মহারানির শাসনব্যবস্থা। তবে নাকি –

"কোম্পানির আমলের যা একটু আধটু বিশৃঙ্খল বা অন্যায় তার অবসান হয়েছে মহারানির সুশাসনে"।[৫]

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনসায়াহ্নে উপনীত হয়ে উপলব্ধি করেছিলেন, সে শাসনব্যবস্থার মধ্যে কত ফাঁকফোকর ছিল। লেখকের এই প্রবন্ধটি থেকে আরও একটি বিষয় জানা যায়, লেখকের ভাষায় –

"কথা সাহিত্যিক দেবেশ রায়ের মুখে শুনেছি ইংল্যান্ডে নাকি পুলিশকে মানুষ 'বুবি' বা বন্ধু বলে ডাকে। মানুষকে বিপদে-আপদে-প্রয়োজনে সাহায্য করা তাদের একটি অন্যতম প্রধান কর্তব্য বলে তারা জানে"।[৬]

কিন্তু আমাদের দেশে জন্মের পর থেকেই একটি শিশু পুলিশের প্রতি ভয় নিয়েই বড় হতে থাকে। কিন্তু কেন? আসলে ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার মধ্যে ছিল দ্বিচারিতা। অর্থাৎ ভারতবাসীর জন্য এক ধরনের দণ্ড, বিধি ও ব্যবস্থা এবং ইংরেজদের জন্য আলাদা শাসনব্যবস্থা। যা রবীন্দ্রনাথ জীবনসায়াহ্নে বুঝতে পারলেন এবং 'সভ্যতার সংকটে' তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু মীনাক্ষী সেন এখানেই রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রশ্নবান নিক্ষেপ করলেন, রবীন্দ্রনাথ যখন মধ্য-তিরিশের ছিলেন, তাঁর প্রতিভা নানাদিক দিয়ে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল তখন কি এসব উপলব্ধি করতে পারেননি, এমন কখনই হতে পারে না। তাই তো তিনি –

"ওই ব্রিটিশ প্রণীত 'দণ্ড' বা বিধি এবং ব্যবস্থা, যাকে রবীন্দ্রনাথ 'বাইরের জিনিস' – বলছেন, রাজনীতির ভাষায় বললে বলা যায় তা হল ইংরেজের আমদানি করা ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা"।[৭]

তবে এই দ্বিচারিতার প্রতি রবীন্দ্রনাথ সরাসরি কলম ধরেছিলেন তিরিশের দশক থেকে। দেশের নানা অহিতকর বিষয়ে প্রতিবাদী কলম ধরেছিলেন এবং দেশবাসীকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে তা দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এরপর রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হল, দেশ স্বাধীন হল, নতুন সংবিধান প্রনয়ণ হল। কিন্তু থেকে গেল সেই একই 'দণ্ড, বিধি, ব্যবস্থা'। স্বাধীন ভারতবর্ষে জাতীয় সংগীত রূপে বিবেচিত হল তাঁর লেখা। কিন্তু ভারতবর্ষ কি তাঁর দেখানো পথে হাঁটতে চাইল বা পারলো! আসলে আমরা যেন রবীন্দ্রনাথের বাণী, চিন্তাভাবনাকে বহন করেই চলেছি, পারিনি তাকে বাহন করতে। তাই তো আজও দণ্ডিতের সাথে দণ্ডদাতা কখনই কাঁদে না, বরং আনন্দ ও উৎফুল্ল বোধ করে। তাই তো দিন দিন বেঁড়ে যায় অপরাধের সংখ্যা, বেঁড়ে যায় অপরাধীর সংখ্যা। আজও কোনও শুভ অনুষ্ঠানের সূচনায় রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি জ্বলজ্বল করে থাকে। কিন্তু তা দেশের কর্মযজ্ঞ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে থাকে। মীনাক্ষী সেন এই প্রবন্ধে পাঠক তথা দেশবাসীকে বলতে চেয়েছেন, কবিগুরুকে শুধুমাত্র জাতীয় সংগীতের মধ্যে সীমাবদ্ধ ভক্তি ও শ্রদ্ধা না দেখিয়ে বরং তাঁর ন্যায়বিচারের পথ যদি অনুসরণ করা যায় তবে মানুষের অনেক বেশি মঙ্গল হবে।

এই প্রবন্ধ-সংকলনের অন্তর্গত আরও একটি প্রবন্ধ 'অথ মৃণাল সমাচার'। এটি গল্পের আঙ্গিকে লেখা। এই প্রবন্ধটিতে আছে মৃণালের কথা। রবীন্দ্র-পাঠক মাত্রই জানা যে, মৃণাল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প 'স্ত্রীর পত্র'-এর প্রধান চরিত্র। তবে

মৃণালকে যে এভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে তা মীনাক্ষী সেনের সৃষ্টির গুণ। বর্তমান সময়ে বিভিন্ন বক্তৃতা যে জ্ঞানমূলক হয়ে থাকে এবং সে বক্তৃতা সাধারণের বোধ বা চেতনার কাছে পৌঁছতে পারে না। তাই সেসব বক্তৃতা হয়ে ওঠে নিরাসক্ত। এমনই এক বক্তৃতা সভায় লেখকের উপস্থিতির কথা জানান এবং বাড়ি ফিরে তাঁর যুক্তিবাদী মনে-স্বপ্নে ও কল্পনায় উপস্থিত হয় মৃণাল এবং শুরু হয় কথোপকথন। আর তাতে উঠে এল বর্তমান সময়েরও নারীদের অবস্থা। আরও একটি বিষয় নজর কাড়ে – "আমি বললাম – দাঁড়াও, দাঁড়াও, হরদম যাতায়াত করো – লেখার টেবিলের পাশে বসে থাকো, আমার এখনও ষাট বছর হতেই দেড় বছর বাকি, রাজ্যে প্রগতিশীল সরকার না থাকলে পঁয়ষট্টি কি বাষট্টি বছর দিব্যি পড়াতে পারতাম – নেহাৎ আমলা হয়ে জন্মাইনি বলে ষাটেই অবসর,..." ।[৮]

এ থেকে বোঝা যায় ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবসরের বয়স উর্ত্তীন হয়ে গেলেও টিকে থাকা যায়। যাইহোক মীনাক্ষী সেনের বেশির ভাগ লেখাই নারীর প্রতি অত্যাচার, নির্যাতন, অসম্মানের কাহিনী নির্ভর বলা চলে। রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র'-এও দেখা যায় নারী নির্যাতনের চিত্র, নারীর আত্মসম্মানকে পদলেহন করার মত ঘটনা। কিন্তু নারীর এ সমস্যা সে সময় যেমন ছিল আজ একুশ শতকেও একই রকম রয়ে গেছে। বর্তমান সময়ে সামাজিক মাধ্যমগুলিতে একটি প্রশ্ন লক্ষ করা যায় যে, বর্তমান সময়ে বহুলাংশে বিবাহবিচ্ছেদের কারণ কী? পিতৃতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী একাংশের দাবী যে এক্ষেত্রে মেয়েরা এবং তাদের শিক্ষা অধিকাংশ ক্ষেত্রে দায়ী। এ মত কতটা গ্রহনযোগ্য এ বিষয়ে সংশয় থাকলেও এখনও যে –

"মেয়ে মানুষের বুদ্ধি থাকলে আজও তা অধিকাংশ অহংবাদী পুরুষের চক্ষুশূল" ।[৯]

তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। যাইহোক মেয়েদের আত্মসম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার জন্য লেখক উপায়ও বলে দিয়েছেন এ প্রবন্ধে –

"মেয়েরা যতক্ষণ শিক্ষা ও স্বাবলম্বনের ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে নিজের বাড়ি, নিজের সংসার গড়তে না পারে, ততক্ষণ বাপের ঘরও ঘর নয়, শ্বশুর ঘরও" ।[১০]

তাই নারী নিগ্রহ থেকে মুক্তি পেতে মেয়েদের সর্বোপরি স্বাবলম্বী হওয়া একান্ত প্রয়োজন বলেই মনে করা যেতে পারে।

মীনাক্ষী সেনের আরও একটি রচনায় রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির প্রসঙ্গ লক্ষ করা যায়। একটি কালো টুপি ও ন্যায় বিচার নামক গল্প সংকলনের 'দুই বোন অথবা এক খুনির গল্প' নামক গল্পে। এ গল্পে রবীন্দ্রনাথের 'দুই বোন' উপন্যাসের শর্মিলা, উর্মিলা ও শশাঙ্কের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। তবে এ গল্পেও রয়েছে আগের প্রবন্ধটির মতো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মের সার্ধ শতবর্ষ পালনের প্রসঙ্গ এবং বিশেষজ্ঞদের ভুলভাল বক্তব্যের প্রসঙ্গ।

যাইহোক পরিশেষে বলা যেতে পারে, মীনাক্ষী সেনের মত একজন রবীন্দ্র-অনুরাগীর রচনায় যে একাধিক ভাবে রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ পাওয়া যাবে তা আশানুরূপ। তবে প্রথম প্রবন্ধটিতে দেখিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের ন্যায়বিচার কেমন হতে পারে এবং তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে জীবনের শেষ দশকে উপনীত হয়েই দেশের কথা, দেশের মানুষের কথা বেশি করে ভেবেছিলেন এবং তাঁকে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা পূর্বোধিক মাত্রায় নাড়া দিয়েছিল এ কথাও নিঃসংশয়ে জানিয়েছেন। নারী নির্যাতনের মত প্রতিদিনের ঘটনাকে কী সুন্দর কৌশলে মৃণালের সঙ্গে কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন এবং এর পাশাপাশি মৃণালের অবস্থা ও পরিণতির কথা বলতেও লেখক ভোলেননি 'অথ মৃণাল সমাচার'-এ। পরিশেষে মীনাক্ষী সেনের রচনা প্রসঙ্গে কথাসাহিত্যিক দেবেশ রায়ের মন্তব্য দিয়ে এই আলোচনার ইতি টানা যেতে পারে –

"আমাদের আজকের প্রতিদিনের জীবন স্নায়ুধ্বংসী আঘাতে-আঘাতে তছনছ হয়ে যায়। মীনাক্ষীর গল্পের একটা প্রধান সন্ধান এই আঘাতের অভিজ্ঞতা, এই ট্রমার (Trauma) অভিজ্ঞতাও এই আঘাতকে শরীরে-মনে সইয়ে নেয়ার অভিজ্ঞতা। এইখানেই তাঁর আধুনিকতা আর এর শিকড় হয়তো আছে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শিকার তাঁকে হতে হয়েছিল নেহাতই কম বয়সে। সেখান থেকেই হয়তো বেরিয়ে এসেছে – আমাদের জীবনযাপনের প্রতিদিনের ট্রমা কী করে আমরা গ্রহণ করছি তার ভিতরে ঢুকবার ইচ্ছা ও গতি। এত সহজে এতটা নিষ্ঠুরতার গল্প মীনাক্ষী লেখেন যেন তিনি এক নিরস্ত্র শ্বাসহীনতার ভিতর আমাদের টেনে নিয়ে যান"।[১১]

যদিও দেবেশ রায়ের এ বক্তব্য মূলত মীনাক্ষী সেনের গল্প সম্পর্কে । কিন্তু এ কথা ঠিক যে, মীনাক্ষী সেনের সকল রচনাই বাস্তবতার ভিতের ওপর নির্মিত। তাই মীনাক্ষী সেনের প্রবন্ধ সম্পর্কেও একই কথা প্রণিধানযোগ্য বলেই মনে করা যেতে পারে।

তথ্যসূত্র:

১। সেন, মীনাক্ষী। শতাব্দী শেষের গল্প। বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন (সম্পাদনা)। শতাব্দী শেষের গল্প বিষয়ে (প্রকাশক) স্পন্দন, আগরতলা।
২। সেন, মীনাক্ষী। ছেঁড়া পাতার নৌকো। ভূমিকা। প্রান্তর প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, আগরতলা।
৩। সেন, মীনাক্ষী। ছেঁড়া পাতার নৌকো। প্রান্তর প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, আগরতলা, পৃষ্ঠা – ৩৬-৩৭।
৪। তদেব। পৃষ্ঠা – ৩৬।
৫। তদেব। পৃষ্ঠা – ৩৮।
৬। তদেব। পৃষ্ঠা – ৩৯।

৭। তদেব।

৮। তদেব। পৃষ্ঠা – ২১।

৯। তদেব। পৃষ্ঠা – ২৪।

১০। তদেব। পৃষ্ঠা – ২২।

১১। রায়, দেবেশ। মীনাক্ষী'র গল্প। সেন, মীনাক্ষী। মীনাক্ষী সেন-এর ছোটগল্প। সেতু প্রকাশনী।

গুরুবিভ্রাট ও মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় : শৈলবালা ঘোষজায়ার কথাসাহিত্য (নির্বাচিত)

রিঙ্কু রায়
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বিশশতকের প্রথমার্ধে পুরুষকণ্ঠের নিয়ন্ত্রণে চালিত নারীর যে জবানবন্দি-সেই গণ্ডি অতিক্রম করে শৈলবালা ঘোষজায়া যে অভিজ্ঞতা- উপলব্ধির দৃষ্টান্ত সাহিত্যে রেখে গেছেন তা অনবদ্য। সমাজের যে দৃশ্য তাঁর হৃদয়ে দাগ কেটেছে তাই দিয়ে তিনি তাঁর সাহিত্যের আঙিনা ভরিয়ে তুলেছেন।

শৈলবালা ঘোষজায়ার জন্ম ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রামের কক্সবাজারে। সামাজিক প্রথা, কুসংস্কার ও রক্ষণশীলতা না থাকায় পিতৃ পরিবার ছিল পড়াশুনার অনুকূল। বিবাহসূত্রে সাহিত্য সাধনায় প্রতিকূলতা আসে তবুও নিজের ঐকান্তিক আগ্রহে সাহিত্য চর্চা ও লেখালিখি চালিয়ে গেছেন তিনি। সমাজের শাসন, বঞ্চনা, অবদমন, আসঙ্গতি যা কিছু চোখে পড়েছে তা তিনি সাহসের সঙ্গে ভাষাদান করেছেন যা আত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। শৈলবালা ঘোষজায়ার বাস্তব দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত প্রখর তাই সমাজের ধর্মগুরু জাতীয় ভণ্ডামিও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। তাইতো "বিভ্রাট" উপন্যাসে যেমন দীক্ষা গুরুর বিষয় টিকে নিশ্ছিদ্রভাবে ব্যাঙ্গ করার সাহস দেখিয়েছেন তেমনি " কার্যকারণ " গল্পেও ধর্মানুষ্ঠানের কেন্দ্রে যুক্ত মানুষের দুর্মতির চিত্র তিনি সুন্দর ভাবে অঙ্কন করেছেন। এখন এই রচনাদুটি আলোচনার মাধ্যমে অজ্ঞতাহেতু গুরু বিভ্রাট, তার ভয়ঙ্কর পরিনাম ও গুরুর ভণ্ডামির চিত্র দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব।

এ প্রসঙ্গে আমাদের প্রথম আলোচ্য "বিভ্রাট" উপন্যাসটি। রচনার শুরুতেই মঙ্গলা নামক এক ৩০ বছর বয়সী বিধবার জীবনচর্যার পরিচয় আছে। বিধবা হলেও বাবা, মা, ভ্রাতা, ভাতৃবধূ পরিবৃত্ত পরিবারে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গেই তার দিনাতিপাত হতে দেখা গেছে। পিতা সংসারের দায়িত্ব পালন করেন। মঙ্গলার কাছে তার পিতা একজন শাস্ত্রজ্ঞ, ভক্তিশীল, মহাতান্ত্রিক ব্যাক্তি। দেখা যায় বাড়িতে ভ্রাতার সন্তান হয়ে বারবার মারা যাওয়া রোধ করতে এক মহাপুরুষ এনে বৌমার স্বস্ত্যয়ন করার দৃশ্য। এই সূত্রে মঙ্গলাকে দেখে তার প্রতি আসক্ত হয় সিদ্ধ বাবা। তাইতো কালবৈশাখী ঝড়ের রাতে নস্যের কৌটা নিতে আসার অছিলায় কাঁটামারী গ্রামের জমিদার বাড়ির তেতলার ঘর মঙ্গলার শয়নকক্ষে উপস্থিত হয় সিদ্ধবাবা। অনুমতি ছাড়া এই প্রবেশ যে তার জীবনের মোড় বিপথে চালিত করবে এ তার ভাবনার অতীত সেদিন। সিদ্ধবাবার প্রতি এই আস্থা তার জীবনে ভয়ঙ্কর পরিনাম ধার্য করবে যা পূর্বে অনুমানও করেনি।

এইভাবে ঝরের রাতে একলা ঘরে সিদ্ধবাবা তার মিথ্যার জাল বিছায়। মঙ্গলাকে সে যোগসাধন নেওয়ার কথা জানায় কারন হিসাবে তার সামনে বিপদ বলে উল্লেখ করে। এমনকি সে অত্যন্ত পুণ্যবতী তাই এই যোগসাধনার যোগ নাকি তার এসেছে এ কথাও জানায়। বিপদ আশঙ্কায় পিতার কাছে যোগসাধনার কথা জানালে তাদের মতে এ শিক্ষা দানের একমাত্র যোগ্য ব্যাক্তি ওই সিদ্ধবাবাই নির্ধারিত হয়।

এই ভাবেই পিতা মঙ্গলার যোগসাধনার সব কিছু প্রস্তুত করে সিদ্ধবাবাকে অগাধ ভরসা করে তার পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে কর্মস্থান মেদনীপুরের চন্দ্রকোনায় চলে গেলেন। এরপর সিদ্ধবাবার যোগসাধন শিক্ষাপর্ব শুরু। এভাবে শিক্ষা দিতে গিয়ে যখনই অশ্লীলতা এসেছে কথাবার্তায় তখনই ভুল যুক্তি এনে বোকা বানিয়েছে মঙ্গলাকে এমনিভাবে মদ্য, মৈথুন এসব বোঝাতে গিয়ে ভারি ভারি শ্লোক আওড়ায়। একাকী এই সাধন করতে হয় এটা জানিয়ে চক্রতত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে দেহ স্পর্শ করে মঙ্গলার, আপত্তি জানালে তাকে মেটিয়ার রানিকে যোগসাধন হেতু স্পর্শের কথা জানায় এবং বলেন একমাত্র তাকেই যোগসাধনা দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে মঙ্গলা সংশয়মূলক স্বরে বলেন-

" ব্রহ্মচারী নির্জনে পরস্ত্রীকে স্পর্শ করেছেন ,তা কি সম্ভব?" [১]

মঙ্গলার এই প্রশ্নচিহ্নের সম্মুখীন হয়ে সিদ্ধবাবা অর্জুনের ব্রহ্মচর্যের প্রসঙ্গ আনে মহাভারত থেকে। এমনকি তার পিতা ও ভ্রাতার সঙ্গে প্রয়োজনবশত যে স্পর্শ তার সঙ্গে সিদ্ধবাবা তার নিজের ব্যাপারটা তুলনা করে নিজেকে বাবার মত ভাবতে বলে মঙ্গলাকে। এছাড়াও উপবাসের পর খাবার প্রসঙ্গে তাকে শাসন করে যখন বলে-

"দেহ কি তোমার? দেহ তো গুরুর! দেহকে ক্লেশ দেবার কোনো অধিকার তোমার নাই। ধর্ম সুখের জন্য, দুঃখের জন্য নয়। দেহ মনের যা দাবি-যা প্রয়োজন, তা মিটিয়ে দিতে হবে। মনকে পরিতৃপ্ত করতে হবে। তবে মন সাধনায় তোমার সহায় হবে।"[২]

একথা যতই শ্রুতিমধুর হোক অর্থ কিন্তু মঙ্গলময় নয় যার বৈধতা-অবৈধতা বিচার এর আবশ্যকতা মঙ্গলা জানতেন না। এভাবেই একেরপর এক উক্তি ও মিথ্যা যুক্তির আশ্রয়ে মঙ্গলার বিশ্বাস অর্জন করলেন সিদ্ধবাবা।

এভাবে যোগসাধনার পর একদিন মঙ্গলা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় দেবতার হাওয়া লাগা, বায়ুরোগ, ডাইনের নজর ইত্যাদি ভাবা হয়। এসব নিশিকান্তর থেকে জেনে সিদ্ধবাবা মঙ্গলার কাছে গিয়ে গিন্নিমার খুড়ি ও সর্বভৌম মশায়ের বোন সত্যবতী-র সঙ্গে দেখা। তাদের কাছে মঙ্গলার যোগসঙ্কটের হেতু মূর্ছা যাওয়ার কথা জানিয়ে দিদিমা আর সত্যবতী ছাড়া বাকিদের বেরোতে বলে। এরপর সত্যবতীর পরিচয় জানতে আগ্রহ প্রকাশের পাশাপাশি মঙ্গলার মুখের কাছে মুখ এনে এক তরল পদার্থ দিতে থাকে যেটা মঙ্গলা ওই ঘোরের মধ্যে অস্বস্তিভরে পান করে। সব কিছু দেখে দিদিমা আগে দেখা যোগ সঙ্কট তা এমন নয় বলেন, এমনকি তারা কুঁড়ে বেঁধে

থাকতেন মা ছাড়া কারো মুখ দেখতেন না এসব জানালে কথা ঘুরিয়ে সবার যোগসঙ্কটের লক্ষণ এক নয় বলে দাবি করে সিদ্ধবাবা মঙ্গলার প্রতি দরদ বর্ষণ করে বলেন-

"তোমার সমস্ত ভোগ নিজের শরীরে আকর্ষণ করে নিয়ে, তবেই আমার নিষ্কৃতি। গুরুর দায়িত্ব কত,গুরুই জানে।"[৩]

এটা শোনার পর মঙ্গলার মুগ্ধতা বাড়লেও দিদিমা বিচলিত হন নানান সংশয়ে এবং সিদ্ধবাবাকে শুনিয়ে বলেন-

"গুরু, পুরুত ঠাকুর, দেবতা,-খেয়ালের লীলাখেলায় বিলাসের আসবাব। আস্তাবলে হাতি ঘোড়া পোষার মত। না রাখলে বৈভবের পরিচয় দেয়া যায় না,"[৪]

তারপর দিদিমার সঙ্গে সিদ্ধবাবার ধনী- দরিদ্র নিয়ে তর্ক বাঁধলে সাধু ধনী জন্ম পুণ্যের ফল বলে মানে এমনকি দিদিমার বারবার নানান প্রশ্ন করাতে অসন্তুষ্ট হয়ে জানায়-

"মূর্খ মেয়েগুলো শাস্ত্রের কিজানে, যে তাদের কথায় জবাব দেব?"[৫]

এই ক্রোধ মূলক উক্তিই অজ্ঞ সাধুর ভণ্ডতাকে প্রকাশ করে। এরপর দিদিমার আর বুঝতে বাকি থাকে না সাধুর ব্যাবহার। সঙ্গে সঙ্গে কক্ষ থেকে বের হন দিদিমা ।তখন সাধনের নাম করে মঙ্গলা ও সাধু একা। রাত্রিতে পায়চারি করে সব দেখে দরজা বন্ধ করে দেয় সিদ্ধবাবা পুরো বাড়ির মধ্যে চিন্তিত কেবল মা ও দিদিমা।

এরপর মঙ্গলা ও সাধুর যোগসাধনা আবার শুরু এবং সাধুর ব্যাবহারে মঙ্গলা অসন্তুষ্ট হলে সেই রাতে একাকি কেন সে এসেছিল তাকি মঙ্গলা বোঝেনি যে আজ এমন চমক এটা জানায়। চোখের সামনে হাজারো মিথ্যা যুক্তি হাজির করে মঙ্গলার মনের সিমিত অসন্তুষ্টি দূর করে দেন এবং কারণের বোতল থেকে নিজে খায় ও মঙ্গলাকে খাওয়ায় এমনকি এই অবস্থায় প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়ে জানায়-

"ভাদ্রের ভরা গাঙে যখন কোটালে বান আসে দেখেছ? অন্তরে যখন ভোগেচ্ছার ভোগবতী দুকূল ভেঙে প্রচণ্ড বেগে যায়, তখন সাত্বিক পঞ্চ- ম- কারের সাধ্য কি হালে পানি পায়! তখন বিষে বিষক্ষয় করবার জন্যে চাই রাজসিক পঞ্চ- ম- কার !"[৬]

এরপর আবারো বলেন-

"মনে যখন নরকের আগুন জ্বলে ওঠে, বেদ- বেদান্তের সাধ্য কি তখন নির্বাণের পথ দেখায় ! তখন আগে চাই আত্মসম্পুরতির সাধনা ।"[৭]

একথা শ্রবনের পর মঙ্গলা ভাবে-

" ইন্দ্রিয় -নিগ্রহ-ই আত্মনিগ্রহ ! সেই তো মহাপাপ !"[৮]

এই ভাবেই সব সংশয় ঘুচিয়ে সিদ্ধবাবার জালে জড়িয়ে সম্পূর্ণরূপে ধরা দেয় মঙ্গলা। এই অজ্ঞতাই ডেকে আনে বিভ্রাট।

এরপর যোগনিদ্রারত মঙ্গলাকে না জাগানোর নির্দেশ দিয়ে নিজেই জাগবে জানায়। এ সমস্তকিছু দিদিমা দেখতে না পেরে নিজ বাড়িতে ফিরে যান। এ সময়

যোগসাধনা করেছেন বলে প্রচণ্ড অহংকারবশত নিজেকে মহান ভাবতে শুরু করে। এমন সময় বান্ধবী সত্যবতী তার সঙ্গে দেখা করতে যায়। অহংকারে পরিপূর্ণ মঙ্গলা তার সাথে খারাপ ব্যাবহার করে। জানা যায় বহুপূর্ব থেকেই সত্যবতীর স্বামীর চেহারা মঙ্গলার পছন্দ তাই আজ সিদ্ধবাবার কাছে দীক্ষিত হওয়ার গর্বে সে সিদ্ধবাবার সঙ্গে সত্যবতীর স্বামীর তুলনা করে যা অত্যন্ত অপ্রিয় ঠেকে সত্যবতীর কাছে। এছাড়াও সত্যবতীর স্বামীর বাইরে থাকা নিয়েও দাসি সহযোগে কটু মন্তব্য করে। তারপর হঠাৎ এসব ছেড়ে "সাত্বিক পঞ্চ- ম- কার" নিয়ে জানতে চাইলে সত্যবতী জানায় –

"আহার সংযমে, চিত্ত সংযমে দেহকে যোগসাধনের অনুকূল ভাবেই তৈরি করে নাও শীঘ্র সুফল পাবে।" [৯]

এখানেও সত্যবতীর কথায় অসন্তুষ্ট হয়ে নিজেদের বাড়ির খাবারের গুনমান ভালো বলে অহংকার করে। পরক্ষণেই সত্যবতীর শ্বশুরবাড়ি শাক্ত কিনা জানতে চেয়েই "রাজসিক পঞ্চ- ম- কার " এর ব্যাপারটা কি জানার আগ্রহ করলে সত্যবতী জানায়-

"সস্তায় স্বর্গ দখলের লোভে, করেন বৈকি কেউ কেউ। কেন ?" [১০]

এছারাও সত্যবতী জানায় –

"দুর্নীতিমূলক অবৈধ ব্যাপারে যদি আত্মোন্নতি লাভ হত তাহলে ভগবানকে নয়, শয়তানকেই জগদীশ্বর বলে মানুষ স্বীকার করত।" [১১]

এভাবেই দুই সখির কথা বলার মাঝে সিদ্ধবাবা প্রবেশ করেই সত্যবতীর প্রতি অনুযোগের সুরে সেই অসুখের পর আর না আসার কারন জানতে চায় এবং সৎপ্রসঙ্গ শুনতে আসতে বলেন। তারপরে পরিচয় জানতে চায়, এমনকি সন্তান আছে কিনা জানতে চাইলে মঙ্গলা গুরুকেই কেন সন্তান হয়নি জানতে বললে সিদ্ধবাবার কাছে তাই ইতস্ততবোধ করে সত্যবতী। এরপর শ্বশুরবাড়ির পরিচয়ে কৃষ্ণপুর (নদীয়া) নাম শুনে সাধুর মুখ পানসে হয়ে যায় তা সত্যবতী লক্ষ্য করে। এরপরে মঙ্গলাকে খিদে পেয়েছে বলে বেগুনি ভাজতে বলায় মঙ্গলা খিদের সময় অন্য কিছু খেতে বললে ধমক দিয়ে যা করার নির্দেশ দিয়েছে তা করতে বলে। মঙ্গলা মতলব বুঝতে পেরে বেরিয়ে গেলে শুরু হয় সত্যবতীকে ভুল যুক্তি দিয়ে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা।

প্রথমেই সত্যবতী গীতা পড়েছে কিনা জানতে চেয়ে তার জীবনচর্যাকে ক্লেশকর বলেছেন, এমনকি তার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলে বলেন-

"ক্ষুধা-তৃষ্ণার মত, যৌবনে মানুষ মাত্রেরই একটা স্বাভাবিক তৃষ্ণার থাকে। যথাসময়ে সেটার দাবি না পূর্ণ করলে মহা অনিষ্ট ঘটে।" [১২]

এটা শুনে সত্যবতী মনে মনে বলে-

" গুরুদেব, পরিচয় প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। আর বেশি বাড়াবাড়ি না করিলেই ভাল হয়। মান রক্ষা করা দুষ্কর হইবে।" [১৩]

এরপর ক্ষুধা,তৃষ্ণা, ভোগ, ত্যাগের বৈধতা বিচারে সময়ের অভাব বলে ওঠার চেষ্টা করলে বসুন বলে বাধা দান করেন সিদ্ধবাবা। পরক্ষণেই মঙ্গলাকে বোকা বানানোর জন্য ব্যাবহার করা উক্তির পুনরাবৃত্তি করে বলেন-

"মহা শক্তির অংশ আছে আপনার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ।" [১৪]

এটা শুনে উত্তরে সত্যবতী প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ভগবান আছেন জানালে সিদ্ধবাবা একই সুরে আবারো বলেন-

"আপনি আরও উচ্চস্তরের জীব অতি ভাগ্যবতী। জন্মান্তরে মহা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এ জন্মেও জোর সাধন যোগ। হাঁ, স্বয়ং জগদম্বা আপনার দেহে অধিষ্ঠান করছেন।" [১৫]

এই সংলাপে সাধুবাবার মিথ্যাচার স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এছাড়াও এগুলি বলার পর যোগসাধনা নিতে বললে স্বামীর থেকে যথেষ্ট পেয়েছে বললে সত্যবতীর প্রতি ক্রোধে বলেছেন-

"অভাগিয়া কাক মজে জ্ঞান নিম্ব ফলে।" [১৬]

সব শুনে গুরুর ভণ্ডতা টের পেয়ে বেরিয়ে যায় দ্রুত মঙ্গলাকে আসছি বলে জানায়। মঙ্গলা ফিরে এলে তারকাছে সিদ্ধবাবা নিজের বড়াই করে বলেন-

"বাজিয়ে দেখলুম এঁকে ঘোরতর তমোগুণী, বিষম সংসারাসক্ত ।" [১৭]

জ্ঞান থাকলেই বিচার করার ক্ষমতা আসে তাইতো শিক্ষাকে এমন ইঙ্গিত তাঁর। এরপর বাইরের লোকের কাছে অপমান করায় কারণের মাত্রা বেশি ছিল কিনা জানতে চায় মঙ্গলা। সিদ্ধবাবা একনাগাড়ে সত্যবতীর প্রতি ক্রোধবশত তার অধঃপাতে যাবার কথা বলে এবং জানায় তাঁর কাছে সত্যবতী নাকি দাঁড়াতে পারেনি এটা শুনে সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলা বলে-

" কেন? দিব্যি তো সটান চলে গেল। দেখলুম, আপনিই আটকাতে পারলেন না।" [১৮]

পরে মঙ্গলার এই অবিশ্বাস করাকে পাপ বলে জানিয়ে দুই বান্ধবির থেকে লুকিয়ে শোনা কথা "রাজসিক পঞ্চ- ম-কার " এর প্রসঙ্গ এনে বিবাহিত দম্পতি ছাড়া এ সাধনা করা যায় না এটা যে ভাবে সে ভ্রষ্ট বলে জানিয়ে ভৈরবী তন্ত্র থেকে যুক্তি এনে বলেন-

"পানে ভ্রান্তিরভবেদ যস্য ঘৃণাস্যাৎ তক্ত রেতসোঃ। শুচৌ বা শুদ্ধতা ভ্রান্তিঃ পাপাশঙ্কা চ মৈথুনে। স ভ্রষ্টঃ পুজয়েদ্দেবিং চণ্ডী মন্ত্রং কথং জপেৎ ।" [১৯]

মঙ্গলা শুনে এটাকে ঘাড়ে কোপ বসানোর মন্ত্র বলে জানতে চায় নিজের স্ত্রী, কন্যা, পুত্রবধূ থাকলে এমন সাধনায় দীক্ষা দিতেন কিনা এবং বুঝতে পারে কোনো সুস্থ মানুষের পক্ষে এমন ভাবা সম্ভব নয়। মঙ্গলার ভুল যখন ভাঙে তখন মঙ্গলা সন্তানসম্ভবা, আফসোস ছাড়া তার আর কিছু করার নেই তখন। যোগের নামে ঠকিয়ে সিদ্ধবাবা তাকে বামাচার সাধনার পথে নামিয়েছেন। এইভাবে অন্ধবিশ্বাসের ফলভোগ

করতে হচ্ছে, ঐশ্বর্যের অহংকারে মত্ত হয়ে কারো যুক্তি সে যে গ্রহণ করেনি তার পরিণাম আজ সে টের পাচ্ছে কিন্তু করার কিছু নেই।

সবশেষে সত্যবতীর থেকে জেনে তার স্বামী মঙ্গলাদের এখানে এসে দেখে যা ভেবেছিলেন তাই সেই সিদ্ধবাবাই হল কৃষ্ণপুর গ্রামের হরিহর গাঙ্গুলী। পিতা গিরিশচন্দ্র গাঙ্গুলী। এই গাঙ্গুলী খুড়োই ছাত্রজীবনে মেধাবী হওয়ার জন্য ধনী গৃহে যেতেন এবং কূটকৌশলে এক ব্রাহ্মণ পরিবারের কন্যাকে ধর্মের নামে ভুলিয়ে পাপের পথে এনেছিলেন। মার খেয়ে দেশ ছাড়া হন তারপর যোগমার্গের অতিনিম্ন স্তরের কয়েকটি সিদ্ধি ও ঐন্দ্রজালিক কৌশল, তন্ত্রমন্ত্র, শিকরবাকরের গুণাগুণ জেনে সেই বিদ্যের সাহায্যে লোক ঠকিয়ে চলেছেন। এক আশ্রমও খুলেছিলেন কিন্ত কামিনী কাঞ্চনের লোভে আশ্রমেও কুকর্ম বাধিয়ে বসে সেই যে গা ঢাকা দেয় তারপর এখানে সিদ্ধবাবা রুপে আবির্ভাব। অবশেষে এসব জানার পর বাড়ির কর্তাকে চিঠিতে সব জানিয়ে আসতে বলা হয় সাতদিন পর ফিরে দেখেন সিদ্ধবাবা পলায়ন করেছেন। এদিকে মঙ্গলার অবস্থা জানতে পেরে মহাপাপানুষ্ঠান হল টাকার জোরে সব ঢাকা পড়ে গেল। পুত্র সত্যানন্দও নিঃসন্তান অবস্থায় প্রাণ ত্যাগ করল।

এ সবকিছু দেখে কর্তা স্তব্ধ। সন্তান হওয়ার বাসনা হেতু সিদ্ধবাবাকে আনার যে কি পরিনাম তা স্মরণ করে ভণ্ডতার চিত্র চোখে ভাসে। এইভাবে অন্ধবিশ্বাসে গুরুভক্তির যা পরিনাম রচনায় দেখা গেল তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। এর পাশাপাশি শিক্ষা যা বিবেচনা বোধ কে জাগ্রত করে তার চিত্রও দেখা গেছে সত্যবতী চরিত্রকে কেন্দ্র করে। এইভাবে বিনা বিচারে এমন গুরুতর সিধান্ত না নেওয়া ও কাউকে অন্ধবিশ্বাস না করার মত সচেতনতার ইঙ্গিত দিয়েছেন লেখিকা পাশাপাশি শিক্ষার সুফলকে তুলে ধরেছেন রচনায়।

এরপর "কার্যকারণ " গল্পেও দেখা যায় বৈবাহিক সূত্রে এক ব্রাহ্মণ তরুণীর বৈষ্ণবী হওয়ার দৃশ্য। তার স্বামী বনমালী দাস বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হয়ে রজ পেয়ে সংসার ত্যাগ করে। তখন এই তরুণীর উপর বৈষ্ণব ধর্মের মূল (ঠোরের প্রধান) ব্রজদাস বাবাজীর নজর পড়ে। অনেক সাধাসাধির পরও যখন তরুণীর কাছ থেকে কোনো সদর্থক ইঙ্গিত মিলল না তখন একদিন বাবাজী নিজে পথের মধ্যে সরাসরি তাকে জানায়-

"দেখ শ্রীমতী ঠাকরুণ, তোমার জেদ ছাড়। আমি তোমার অনেক তেজবাজী সয়েছি,কিন্তু আর সইব না,তুমি মনে রেখো, আমার নাম ব্রজদাস বাবাজী।"[২০]

এই উক্তিই প্রকাশ করে বাবাজীর চরিত্রের দম্ভ ও নৈতিক হীনতাকে।

এছাড়াও গল্পে মেয়েটিকে বাড়ি বাড়ি জল বিতরণ করে পাওয়া টাকায় দিনযাপন করতে দেখা গেলেও চরিত্রের স্খালন কিন্তু কোথাও চোখে পড়েনি।একদিন রোজা শেষে এক তৃষ্ণার্ত মুসলিম বৃদ্ধকে জলদান করে তাকে তৃপ্ত করলে সে তাকে আশীর্বাদ করে চলে যান। এদিকে ব্রজদাস বাবাজী নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একদিন ঘাট থেকে

মেয়েটিকে মুখ চেপে তুলে নিয়ে যায়। সাথে থাকা সন্তানের ক্রন্দন ও মেয়েটির আস্ফুট চিৎকার ঘাটের মাঝি সেই মুসলমান বৃদ্ধ হরিদাস শুনতে পায় এবং মেয়েটিকে রক্ষা করে কিন্তু মেয়েটি মারা যায়। সবশেষে ব্রজদাস বাবাজীর চেহারা সামনে এলে শাস্তিস্বরুপ আজীবন অনাথ ও বিধবাদের দায়িত্ব নিতে হয় তাকে। এইভাবে ধর্মের কেন্দ্রে থাকা মানুষের দুর্মতি ও তার পরিনামে অসহায় মেয়েটির প্রাণনাশের মত দৃশ্যের পাশাপাশি পাপের ক্ষয় ও পুণ্যের জয় দেখিয়েছেন লেখিকা।

এই ভাবে রচনা দুটিতে লেখিকা ধর্মগুরুদের নৈতিক অধঃপতনের যে ছবি তুলে ধরেছেন তা অত্যন্ত বেদনাবহুল। এমনকি এই দৃষ্টান্ত হেতু প্রকৃত সাধকদের প্রতিও আস্থা বিনষ্ট হয়। যাই হোক সেই সময়ের একজন লেখিকা হয়েও তিনি যেভাবে সমাজের এই অসঙ্গতিকে তুলে ধরেছেন তা যথেষ্ট হৃদয়গ্রাহী। আজও খবরের কাগজের পাতায় চোখ রাখলে এমন বিভ্রাট চোখে আসে তাই তাঁর লেখা যে যুগেই হোক না কেন তার এই সচেতনতা বোধের অবদান বর্তমানেও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এইভাবেই তাঁর রচিত সাহিত্য বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধি দান করেছে যা অতুলনীয়।

তথ্যসূত্র :

১। অরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.),১৪২৬, শৈলবালা ঘোষজায়া : সেরা পাঁচটি উপন্যাস, কলকাতা, মিত্র ঘোষ, পৃষ্ঠা- ৩০০
২। ঐ, পৃষ্ঠা-২৯৮
৩। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩১১
৪। ঐ, পৃষ্ঠা-৩১১
৫। ঐ, পৃষ্ঠা-৩১২
৬। ঐ, পৃষ্ঠা-৩১৫
৭। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩১৬
৮। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩১৮
৯। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩২৩
১০। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩২৬
১১। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩২৭
১২। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩৩২
১৩। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩৩২
১৪। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩৩৩
১৫। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩৩৩
১৬। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩৩৪
১৭। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩৩৬
১৮। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩৩৭

১৯। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩৩৮

২০। শৈলবালা ঘোষজায়ার গল্প সংকলন, ২০০০, কলকাতা, দেজ, পৃষ্ঠা- ১১০

গ্রন্থপঞ্জী

ক। আকর গ্রন্থ-

১। অরুন মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), ১৪২৬ ব , শৈলবালা ঘোষজায়া : সেরা পাঁচটি উপন্যাস , কলকাতা , মিত্র ঘোষ।

২। শৈলবালা ঘোষজায়ার গল্প সংকলন,২০০০, কলকাতা , দে'জ।

খ। সহায়ক গ্রন্থ-

১। অরুন্ধতী সুর (রায়), ২০১১, নারীর কলমে নারীর কণ্ঠ : আইন এবং সমাজ বিধান (১৯১৪-১৯৪৫), কলকাতা, সহযাত্রী।

২। অরূপ আচার্য (সম্পা.), ২০০৬, একান্তর একাদশী, কলকাতা, একান্তর।

৩। উদয়চাঁদ দাশ, ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০০৯, আখ্যানের সম্প্রসারণ উনিশ শতক বিশ শতক, রাজবাটি বর্ধমান, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

৪। গোলাম মুরুশিদ, ২০১৩, নারী প্রগতির একশো বছর : রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া, ঢাকা , অবসর।

৫। তাপস ভৌমিক সম্পাদিত, বইমেলা ২০১৭, কোরক সাহিত্য পত্

৬। সুদক্ষিণা ঘোষ, ২০০৮, মেয়েদের উপন্যাসে মেয়েদের কথা : 'কাহাকে' থেকে 'সুবর্ণলতা', কলকাতা, দে'জ।

নিম্নবর্গের সামাজিক সচলতা : সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে প্রতিফলন

কুন্তলা রায়
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : সামাজিক সচলতা বা Social Mobility র অর্থ প্রচলিত সমাজবিন্যাসে কোনো ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের অবস্থানের পরিবর্তন অর্থাৎ বিভিন্ন কারণে সামাজিক ক্ষেত্রে মর্যাদার হ্রাস বা বৃদ্ধি। সুপ্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষ বিভাজনকে লালন করে এসেছে। বিভাজনের শৃঙ্খলা নির্দিষ্ট সময়ে কঠোরভাবে রক্ষিত হলেও সময়ের সাথে সাথে তা শিথিল হয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসন পরবর্তী সময়ে তার রূপান্তর ঘটেছে ও স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সংবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে ভেদ মুক্ত সমাজ গড়ার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশক পরবর্তী সময়ে বাংলায় নিম্নবর্গ তত্ত্বের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, শেষ দশকের বিশ্বায়ন সহ বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা প্রাতিষ্ঠানিক বাংলা সাহিত্য চর্চার পরিসরে সামাজিক সচলতার বিষয়টিকে আরও উন্মুক্ত করেছিলো। বিংশ শতাব্দীর শেষের দশক ও একবিংশ শতাব্দীর সূচনাকালের সাহিত্যে হয়েছে ও সাহিত্যিক সমাজে এই সচলতার বিষয়টি প্রতিফলিত। আমরা আমাদের গবেষণা নিবন্ধে বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের দুটি বাংলা উপন্যাসের কাহিনি প্রসঙ্গে চরিত্রের সামাজিক সচলতা এবং একবিংশ শতাব্দীর শূন্য ও প্রথম দশকের প্রতিনিধিস্থানীয় দুজন লেখকের যাপনে সামাজিক সচলতার বিষয়টি তুলে ধরবো।

সূচকশব্দ : সামাজিক সচলতা, নিম্নবর্গ, হলুদ রঙের সূর্য, অন্তর্গত নীলস্রোত, মনোরঞ্জন ব্যাপারী, বেবী হালদার।

সামাজিক সচলতা বা Social Mobility-র অর্থ সামাজিক স্তর বিন্যাসে কোনো সম্প্রদায় বা ব্যক্তির অবস্থানের পরিবর্তনের পাশাপাশি বিভিন্ন কারণে সামাজিক ক্ষেত্রে মর্যাদার হ্রাস বা বৃদ্ধি। সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষের সমাজ বর্ণ এবং শ্রম বিভাজনকে লালন করে এসেছে। ব্রাহ্মনদের স্থান ছিলো সমাজের শীর্ষে। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র তারপরে ক্রমান্বয়ে অবস্থান করেছে। শ্রমের ক্ষেত্রেও উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট বিভাজন ছিলো। সেই ক্রম একটি নির্দিষ্ট কালে প্রকট আকার ধারণ করলেও পরবর্তী সময়ে মানুষে মানুষে পারস্পরিক বিভেদের বীজ যে সেখানেই নিহিত ছিলো তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সমাজে এই পারস্পরিক বিভাজনের ধারাগুলি আজও প্রবলভাবে বিদ্যমান। ঔপনিবেশিক শিক্ষা এদেশে প্রবেশের ফলে পারস্পরিক বিভেদ খানিকটা হ্রাস পেয়েও কিন্তু তা অবলুপ্ত হয়নি। তবে, সময়ের সাথে সাথে বর্ণ এবং বৃত্তিগত গমনাগমনের পথ

খানিকটা মসৃণ হয়েছে। আরও সুস্পষ্টভাবে বলতে গেলে, বহমান ধারায় কোনো ব্যক্তি বা সমষ্টির পূর্ব অবস্থান পরিবর্তিত করে নতুন কোনো অবস্থানে উন্নীত বা অবনমিত হওয়ার প্রক্রিয়া বর্তমানে প্রচলিত। এই অবস্থান্তরের প্রক্রিয়াকেই সামাজিক সচলতা বা Social Mobility বলা হয়। বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তির বা সমষ্টির সামাজিক অবস্থান ও আর্থসামাজিক ক্ষেত্রের সাথে সম্পৃক্ত। সুপ্রাচীনকাল থেকেই কোনো ব্যক্তির সামাজিক পরিচয় ও মর্যাদা নির্ধারিত হয় বাবা-মায়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার মানদণ্ডে। তবে, বর্তমান সময়ে জন্মসূত্রে তার অর্জিত অবস্থানটিই চূড়ান্ত নয়। একটি মানুষকে পরিমাপের সূচক হিসেবে শিক্ষা, চাকুরী, অর্থাগম, সামাজিক ক্ষেত্রে মেলামেশা, রাজনীতি... গুরুত্বপূর্ণ একক হিসেবে বিবেচিত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে একই সম্প্রদায়ে থেকেও শিক্ষা, চাকুরী, অর্থাগম ইত্যাদি বিষয়গুলির জন্য একটি মানুষ সমাজে মান্য স্থান পাচ্ছেন, আবার ঐ ক্ষেত্রে নিজেদের যথেষ্ট সঙ্গতি না থাকার কারণে একদল অবহেলিত থেকে যাচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী জনসাধারণের প্রায় প্রতিটি প্রজন্মেই এহেন সচলতার দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে। একে Intergeneration Social Mobility বা আন্তঃপ্রজন্ম সামাজিক সচলতা বলা হয়। এক্ষেত্রে সন্তান সন্ততি শিক্ষালাভ করে পূর্বপুরুষের পেশা ত্যাগ করে সরকারি, বেসরকারি চাকুরী অথবা স্বাধীন পেশা গ্রহণ করে। অর্থাৎ সামাজিক সচলতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একক পেশার পরিবর্তন। তা কখনো উল্লম্ব (Vertical), কখনো আনুভূমিক (Horizental)। উল্লম্ব সচলতায় কোনো ব্যক্তি এক সামাজিক স্তর থেকে অন্য সামাজিক স্তরে উন্নীত হন। এক্ষেত্রে ঊর্ধ্বগামী বা নিম্নগামী দুটি ধরন দেখা যায়। সমাজে যে পরিসরে একটি শিশু জন্মগ্রহণ করে, সেখান থেকে সে অর্থাগমের সূত্রে উচ্চতর সমাজে বা যথাযথ সংস্থানের অভাবে নিম্নতর পরিবেশে নিজেকে অভিযোজিত করে। অন্যদিকে, আনুভূমিক সচলতায় একই সামাজিক স্তরে দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক গমনাগমন ঘটে। বিয়ে, দেশত্যাগ, বা কর্মসূত্রে শুধুমাত্র আর্থসামাজিক অবস্থান পরিবর্তন হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সামাজিক সম্মানের বিশেষ পরিবর্তন হয়না। পশ্চিমবঙ্গে এই দুই প্রকার সচলতারই প্রভূত দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে। বেশ কিছু কারণ যেমন – জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শিল্পায়ন-নগরায়ন, শিক্ষার প্রসার, অর্থাগম, বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলন, যৌথ পরিবারে ভাঙ্গন ও একক পরিবারের উদ্ভব ইত্যাদি আমাদের চারপাশে ঘটে চলা সচলতার অনুঘটক হিসেবে কাজ করে।

নিম্নবর্গের মানুষের সামাজিক সচলতা বা Social Mobility নিয়ে আলোচনা করতে গেলে বলা আবশ্যক যে, জাতগত, শ্রেণিগত, লিঙ্গগত, অর্থনৈতিক সহ বিভিন্নভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষই নিম্নবর্গভুক্ত। এক্ষেত্রে জাত বলতে আমরা সেই বিশেষ অংশকে বোঝাতে চাই যারা বর্ণবিভাজনজনিত কারণে সমাজব্যবস্থার চতুর্বর্ণের একেবারে শেষে অবস্থান করছে। অর্থাৎ তলানিতে অবস্থানরত মানুষগুলি বেশিরভাগই শিক্ষা, অর্থ ও অন্যান্য যোগ্যতা কিংবা ক্ষমতায় দুর্বলতম। আবার এদের প্রাপ্য যাবতীয়

সুযোগ-সুবিধে ভোগ করেন এদেরই মধ্যে অবস্থান করেও যারা তুলনামুলকভাবে উপরিস্থিত। শ্রেনিগতভাবে দেখলে সমাজে দুটি শ্রেণি। শ্রমিক ও পুঁজিপতি। শ্রমিক শ্রম বিক্রি করেন। পুঁজিপতি বা বুর্জোয়া চালকের আসনে আসীন এবং তারা শ্রমের মূল্যের নির্ধারক। অথচ সংখ্যার বিচারে শ্রমিকশ্রেনিই অধিক জনবহুল।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে আমাদের দেশের রাজনৈতিক মানচিত্র বদলের সাথে সাথে সামাজিক কাঠামোর চিত্রটিও বদলাতে শুরু করে। বিংশ শতাব্দীর শেষ ও একবিংশ শতাব্দীর শুরুর দশকগুলিতে চোখ রাখলে যে সামাজিক সচলতা চোখে পড়বে, তা দীর্ঘ সামাজিক আন্দোলনের ফল, যার সূত্রপাত হয়েছিলো সমাজ সংস্কারক জ্যোতিবা ফুলে, দয়ানন্দ সরস্বতী, সাবিত্রী বাঈ প্রমুখের হাত ধরে। পরবর্তীতে যে আন্দোলনের সার্থক রূপ দান করেন ড. বি. আর. আম্বেদকর ও তাদের অনুগামীরা। সাংবিধানিক ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন করে পারস্পরিক বিভেদের মাত্রা হ্রাস করার প্রচেষ্টায় সংবিধান প্রণেতাদের অবদান অনস্বীকার্য, বলার অপেক্ষা রাখে না। আমাদের আলোচ্য নিম্নবর্গের সামাজিক সচলতার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের বিষয়গুলি যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই মহিলাদের আর্থসামাজিক অবস্থানটিও বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে। মনুবাদী সমাজে নারীর স্থান ছিল পুরুষের পেছনে। সমাজের উচ্চ-বর্গের নারীদের কঠোর অনুশাসনের মধ্যে জীবনযাপন করতে হতো। অথচ, সমসাময়িক কালে নিম্নবর্গের নারীরা রক্ষণশীলতার বর্ম অতিক্রম করে স্বাধীন জীবনযাপনের সুযোগ পেত। আদিবাসী, কৃষিজীবী সমাজে নারীরা গৃহকর্মের পাশাপাশি পুরুষদের সাথে সমস্তরকম কাজে অংশগ্রহণ করতো। বর্তমান সময়ে যাবতীয় সামাজিক বিধি টপকে বিভিন্ন পেশায় নারীদের সংযোজিত করার প্রয়াসও এই সামাজিক সচলতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

জাত ও শ্রেণি দুটি বিষয়ই বিভেদের রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত। যদিও এই দুই এর পারস্পরিক সম্পর্ককে অনেকেই অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে করবেন। তবে জাতপাত এর ব্যবধান সময়ের সাথে সাথে খানিকটা শিথিল হয়েছে বটে, সমাজের মূল ক্ষমতার জায়গায় আজও কোনো নিচুতলার মানুষকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় কিনা সেদিকে নজর রাখলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। এদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে সমাজে নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে পরিবর্তনের বেশ কিছু কারণ লক্ষ করেছেন স্নেহময় চাকলাদার। ‘ ভারতের জাতব্যবস্থা ও রাজনীতি’ (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২য় সংস্করণ, জুন ১৯৯৫, কলকাতা, ১০৭-১০৮ পাতা) তে বিবৃত যেসব কারণগুলিকে আমরা সামাজিক সচলতার কারণ হিসেবে গ্রহণ করতে পারি-

১. বৃত্তি নির্বাচনে অবাধ স্বাধীনতা, নতুন নতুন বৃত্তির উদ্ভাবন ও জাতিভিত্তিক বৃত্তির পরিবর্তন সাধন।

২. শিক্ষা ও প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বৃত্তি নির্বাচনের সুযোগ ঘটায় সামাজিক সচলতা বৃদ্ধি।

৩. ভৌগোলিক সচলতা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশেষকরে রেল, স্টিমার, ট্রাম, বাস প্রভৃতি যানে বিভিন্ন জাতের লোকজনের সাথে একসাথে ভ্রমণের ফলে অস্পৃশ্যতার কঠোরতা হ্রাস।
৪. গমনাগমনের সময় বা নাগরিক জীবনে বিভিন্ন জাতের লোকেদের হোটেল বা রেস্তোরাঁয় একই সাথে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা থাকার ফলে স্পৃশ্যাস্পৃশ্যের বিচার ও বিধিনিষেধের শিথিলতা।
৫. বিচারবিভাগ কর্তৃক জাত পঞ্চায়েতের ক্ষমতা সঙ্কোচন।
৬. স্কুল, কলেজ, ক্লাব প্রভৃতি স্থানে বিভিন্ন জাতের ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশার সুযোগ ঘটায় একজাতের সাথে অন্যজাতের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদি।

বিংশ শতাব্দীর শেষ ও একবিংশ শতাব্দীর শুরুর লগ্নের বাংলা সাহিত্যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন চোখে পড়ে। এযাবৎকালের সাহিত্যে নিম্নবর্গের অবস্থানের দুটি বিষয় আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতাপূর্ব বাংলা সাহিত্যে তো বটেই মোটামুটিভাবে বিংশ শতাব্দীর ৭০ এর আগের দশকগুলিতে চোখ রাখলে দেখতে পাবো নিম্নবর্গ সেখানে একটি চোরাস্রোত হিসেবে অবস্থান করেছে। বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশক ও পরবর্তী সময়ে নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট উন্মোচিত হওয়ার আগে বাংলা সাহিত্যে কাহিনীর প্রসঙ্গক্রম বাদে মূলধারায় নিম্নবর্গের সাহিত্য অখ্যাত ছিলো। **১৯৫৬** তে প্রকাশিত অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' একটি উল্লেখযোগ্য মাইলস্টোন হলেও পরবর্তীতে মহাশ্বেতা দেবীর হাতে বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গ পরিশীলিত রূপে আত্মপ্রকাশ করলো । বিংশ শতাব্দীর ৭০ এর দশক পরবর্তী সময়ে সাহিত্যে নিম্নবর্গ প্রসঙ্গ যেমন ধীরে ধীরে সাবালকত্ব অর্জন করলো, পাশাপাশি সেই শতাব্দীর শেষে বিশ্বায়ন ক্ষেত্রটিকে আরও পরিপুষ্ট করলো। এই সময়েই আমরা পেয়েছি বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গ ধারার খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের। নিম্নবর্গের জীবন আগে অঙ্কিত হতো যেসব লেখকদের হাতে, তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিলেন উচ্চবর্গভুক্ত। নিম্নবর্গ থেকে উঠে আসা সাহিত্যিকদের স্বীকৃতি তখনো মেলেনি। তাই স্বাভাবিকভাবেই বীক্ষার দূরত্ব বিদ্যমান। নিম্নবর্গের হাতে নিম্নবর্গ চরিত্র রূপায়ন অনেকটাই অধরা থেকেছে। পরবর্তী সময়ে প্রাতিষ্ঠানিক ধারা হিসেবে নিম্নবর্গের সাহিত্য স্বীকৃতি পেলে এই ঘরানার চর্চা পরিপূর্ণ আকারে ধরা দিলো।

আলোচনার নিরিখে আমরা সাম্প্রতিক সাহিত্যে নিম্নবর্গের অবস্থান ও তাদের সচলতার দিকটি ধরার চেষ্টা করবো। এ অংশে দুটি উপন্যাসের প্রসঙ্গের উল্লেখ করবো। পাশিপাশি, সামাজিক ক্ষেত্রে সচলতার সূত্রে সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের(একবিংশ শতাব্দীর) দুজন কথাসাহিত্যিকের জীবনমুখী উত্তরণকে উপস্থাপন করবো।

অভিজিৎ সেনের **'হলুদ রঙের সূর্য'** (১৯৯৬, দে'জ) এক নমঃশূদ্র যুবক মহাদেব বিশ্বাসের সংগ্রামের আখ্যান। বাংলাদেশ ছেড়ে এপারে এসে সে আশ্রয় নিয়েছে। জীবনসংগ্রাম তাকে বলিষ্ঠ করেছে। ছুতোরের কাজ করে মহাদেব ধীরে ধীরে অর্থের

সংস্থান করে। তার সাধ সে সরলা নদীর মাঝে জেগে ওঠা চরে বসতি স্থাপন করবে। সে ত্রিশ হাজার টাকার বিনিময়ে গ্রামের অবস্থাপন্ন ব্যক্তি দয়া ঘোষের কাছ থেকে সরলা নদীর চরের একটি জঙ্গলাকীর্ণ অংশ কিনে নেয়। শ্রম দিয়ে সেই চরকে তারা বাসযোগ্য করে তোলে এবং তার নামকরণ করে বেণি। সেখানে সে মান্য ব্যাক্তি হয়ে ওঠে। এই তার উত্তরণ। কিন্তু এহেন উত্তরণ গ্রামের জমিদারদের কাছে অপছন্দের ঠেকে। জমিদার দয়া ঘোষের সাথে সহদেবের সুসম্পর্ক বিদ্যমান। দয়া ঘোষের ভাই ও ছেলে যদিও এহেন নমঃশূদ্রের উত্তরণকে ভাল চোখে দেখে না। পাশাপাশি বেণিতে বসবাসকারী সাধাসিধে মানুষদের কুসংস্কারে আসক্ত করে রাখার প্রবণতা চলে নয়ন নামের এক গুণিনের কর্মকাণ্ডে। ব্যাঙ্ক থেকে সমবায় ঋণদানকে কেন্দ্রকরে সহদেবের সাথে তথাকথিত উচ্চবর্গের প্রতিনিধিদের বিরোধ বাধে। দয়া ঘোষের ছেলে ভবেশ, ভাই বনমালী সহ জমিদারের লোকজন বেণিবাসিদের আক্রমণ করে। সহদেব ও তার সঙ্গীদের নাস্তানাবুদ করতে ডাকাত দলকে পর্যন্ত ব্যবহার করে। এই আক্রমণের মোকাবিলা করতে গিয়ে গ্রামবাসী রক্তপাত ও প্রাণপাত করে। এভাবে বসতি ও বাসস্থান নির্মাণকে কেন্দ্র করে নিম্নবর্গের মানুষদের টিকে থাকার সংগ্রাম চলে।

ভগীরথ মিশ্রের উপন্যাস **'অন্তর্গত নীলস্রোত'** (১৯৯০, দে'জ)। মূল চরিত্র গুরুপদ জাতিতে তাঁতি। পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি বা প্রতিপত্তি বলতে তার কিছুই ছিলোনা। তাদের সামাজিক অবস্থানটিও ছিল খুবই দুর্বল। তার বাবা ছিলেন ভাগচাষী। ছোটোবেলা থেকেই সেও সংগ্রাম করে বেড়ে উঠেছে। করেছে রাখালের কাজও। ভাগ্যের ফেরে সে রাইটার্সে গ্রুপ ডি পদে একটি কাজ পায়। এরপর থেকেই তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা পরিবর্তিত হতে থাকে। আর্থিক দিক থেকে স্বচ্ছল হয়ে উঠলে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির জাত পরিচয় গৌণ হয়ে দাড়ায়। গুরুপদর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। গুরুপদ একসময় যে বাড়িতে রাখালের কাজ করে লাঞ্ছিত হয়েছে, তারাও আজ গুরুপদকে সম্ভ্রম করে চলে। দাদা বলে সম্বোধন করে। গুরুপদ চায় তাঁর মেয়ের বিয়ে হোক উচ্চ বংশে। এখন সে গণ্যমান্য ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ও নিজের সার্বিক উত্তরণ ঘটাতে উন্মুখ।

দুজন সাম্প্রতিক সাহিত্যিকের প্রসঙ্গ এখানে আমরা তুলে ধরবো। একজন মনোরঞ্জন ব্যাপারী ও অন্যজন বেবী হালদার।

শৈশব থেকেই প্রবল দারিদ্রে যাপন করা মনোরঞ্জন ব্যাপারী বরিশাল থেকে উদ্বাস্তু হয়ে এদেশে আসেন। সহায় সম্বলহীন অবস্থায় বেঁচে থাকার তাগিদে তাঁর বাবা জনমজুরের কাজ করতেন। এদেশে এসে লেখক উদ্বাস্তু ত্রাণ শিবিরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অসুস্থ হয়ে মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে আসেন বারবার। অস্থিতিশীলতা ও দারিদ্রের কারণে প্রথাগত শিক্ষা গ্রহণ হয়ে ওঠেনি। পেট চালানোর জন্য কখনও মুটের কাজ করেছেন, কখনও জনমজুর খেটেছেন, মেথরের কাজ করেছেন, ছত্তিসগড়ের জঙ্গলে কাঠ কুড়িয়ে বিক্রি করে খিদে মিটিয়েছেন, রিকশা চালিয়েছেন, নৈশপ্রহরীর কাজও

করেছেন। নকশাল আন্দোলনের সময়ে জেল যাপন করেছেন। জেলের কয়েদিদের কাছেই তাঁর অক্ষরপরিচয় ঘটেছিলো। আটের দশকের শেষদিকে যাদবপুরে রিকশা চালকের কাজ করতে করতে একদিন পরিচিত হয়েছিলেন তাঁরই রিকশায় সওয়ারি হওয়া সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবীর সাথে। লেখিকার অনুপ্রেরণায় তিনি নিজের জীবনকথাকে লিপিবদ্ধ করতে শুরু করেন। জীবন যুদ্ধে বেঁচে থাকার পাশাপাশি লেখা প্রকাশনার খরচ জোগাতে রাঁধুনির কাজ বেছে নিতেও তিনি কুণ্ঠিত হননি। প্রথাগত শিক্ষার বাইরে থেকেও শুধুমাত্র আত্মবিশ্বাসের ওপর ভর করে তিনি জনপ্রিয় লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। 'ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন' (২০১৬), 'জিজীবিষার গল্প'(২০১৭), 'বাতাসে বারুদের গন্ধ'(২০১৭), 'না মরা মানুষ ও অন্যান্য গল্প'(২০১৭), সহ তার লেখা একাধিক বই বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়েছে। সহায় সম্বলহীন উদ্বাস্তু পরিচয়ে জীবন শুরু করলেও প্রথম জীবনে নানাবিধ সংগ্রাম ও পরবর্তী সময়ে লেখক হিসেবে উত্থান তাকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্থিতি দিয়েছে।

বেবী হালদার। এক অতি সাধারণ বাঙালি মেয়ের জীবনসংগ্রামের সূত্রে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরিচিত হয়ে ওঠা । ছোটবেলায় পরিবারের সাথে সময় কাটলেও একসময় চাকুরিরত বাবা তাদের পরিত্যাগ করেন ও ক্রমে অর্থসাহায্য বন্ধ করে দেন। একসময় মাও নিরুদ্দেশ হয়ে যান সন্তানদের ফেলে। প্রতিবেশীদের অবজ্ঞা-অবহেলা, অনাহার-অনিদ্রা, দ্বন্দ্ব-দ্বেষ, সাত ক্লাসে পড়াশোনার ছুটি, ঋতুর দাগ চিনতে চিনতেই চালচুলোহীন দ্বিগুণ বয়সির সাথে বিয়ে, সেখানে মানিয়ে নিতে না পেরে ক্রমসংগ্রাম... অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, স্বামীর সাথে মনোমালিন্য, বৈবাহিক ধর্ষণ, সন্তানধারণ, এরপর প্রাণে বাঁচতে দিল্লি পালিয়ে যাওয়া মুক্তির পথের সন্ধানে। ঘর ছেড়ে পালিয়ে দিল্লি। বাঁচার তাগিদে পরিচারিকার কাজ করেছেন। আত্মসম্মান রক্ষার্থে তা থেকে কখনো বেরিয়েও এসেছেন। একসময় পরিচারিকার কাজে থিতু হলেন নৃতত্ত্ববিদ্যার অধ্যাপক প্রবোধ কুমারের বাড়িতে, যিনি সম্পর্কে সাহিত্যিক মুন্সি প্রেমচন্দের দৌহিত্র। পরিচারিকার কাজের অবসরে চলতো বেবী হালদারের পড়াশোনা। লিখলেন 'আলো আঁধারি'(২০০২), 'ঈষৎ রূপান্তর'(২০০৮), 'ঘরে ফেরার পথ'(২০১৪), 'কবে আমি বাহির হলেম'(২০১৯) সহ বেশকিছু গ্রন্থ। তাতে তাঁর জীবনসংগ্রামের সাথে পরিচিত হলেন পাঠক সমাজ। বিভিন্ন ভাষায় তাঁর লেখা অনুদিত হতে লাগলো। বেঁচে থাকাটাই যেখানে বিলাসিতা বলে মনে হয়েছিলো, সেখানে লেখিকার এহেন উত্তরণ ও সাহিত্যিক জগতে প্রতিষ্ঠা নিঃসন্দেহে সামাজিক সচলতার গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

সাহিত্যের পটে বিবৃত মহাদেব বিশ্বাস, গুরুপদ দের মতো চরিত্রের পাশাপাশি লেখক মনোরঞ্জন ব্যাপারী বা লেখিকা বেবী হালদার... এদের সম্পূর্ণ জীবনটাই সংগ্রামনির্ভর। সামাজিক সচলতা তাঁদের স্থিতি দিয়েছে। দিয়েছে সম্মান। অন্যদিকে সাহিত্যের পাতার নিপীড়িত দলিত চরিত্ররাও তাঁদেরই মতো জীবনসংগ্রামের মধ্যদিয়ে

খোঁজে একটু নিরাপদ আশ্রয়, যা তাদের পরবর্তী প্রজন্মকে উন্নততর জীবনপথে চালিত করবে এটাই পাঠকের বিশ্বাস।

তথ্যসুত্র :

আকর গ্রন্থ

মিশ্র, ভগীরথ। **অন্তর্গত নীলস্রোত**, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি **১৯৯০**, কলকাতা। মুদ্রিত।

সেন, অভিজিত। **হলুদ রঙের সূর্য**, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারী **১৯৯৬**, কলকাতা। মুদ্রিত।

সহায়ক গ্রন্থ :

চাকলাদার, স্নেহময়। **ভারতের জাতব্যবস্থা ও রাজনীতি** ,পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২য় সংস্করণ: জুন **১৯৯৫**, কলকাতা। মুদ্রিত।

ভদ্র, গৌতম , পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা)। **নিম্নবর্গের ইতিহাস**, আনন্দ**,** নবম মুদ্রণ: এপ্রিল ২০১৮, কলকাতা। মুদ্রিত।

সেন মজুমদার, জহর। **নিম্নবর্গের বিশ্বায়ন**, পুস্তক বিপণি, ২০১৭, কলকাতা। মুদ্রিত।

সেন, অমর্ত্য। অরিন্দম রায় (অনুবাদ)। **উন্নয়ন ও স্ব-ক্ষমতা**, আনন্দ, ২০১৬, কলকাতা। মুদ্রিত।

'নবান্ন' নাটকে দুর্ভিক্ষ-অনাহার এবং আত্মসম্মানের লড়াইয়ে নারী

ইন্দ্রজিৎ বিশ্বাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : নর ও নারী দুজনের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টাতেই সমাজ এবং সংসার সুষ্ঠ ভাবে পরিচালিত হয়। পৃথিবীকে সুন্দর করে তুলতে পুরুষের সঙ্গে নারীও নিরন্তর পরিশ্রম করে চলেছে। তবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীর পরিশ্রমের যথার্থ মূল্য বা সম্মান দেয়নি। সমাজ বা সংসারে নানা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নারীকে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে। দুর্ভিক্ষ,অভাব, অনাহারে ক্লিষ্ট পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীকে তার আত্মসম্মান রক্ষা করতে কীভাবে সংগ্রাম করতে হয়েছে তার জীবন্ত প্রমাণ 'নবান্ন' নাটকের পঞ্চাননী, রাধিকা, বিনোদিনী। নারীর সেই লড়াই বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়েও চলছে। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়েও নারী তার সম্মান রক্ষার্থে প্রতিবাদী, সাহসী এবং তার প্রাপ্য সম্মানের দাবীদার।

সূচক শব্দ : দুর্ভিক্ষ, কালোবাজারি, অনাহার, লড়াই-সংগ্রাম, সাধারণ মানুষ, প্রতিরোধ, নারী, আত্ম-সম্মান।

মূলবক্তব্য:

পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ স্বাধীনতা প্রাপ্তির উন্মত্ত বাসনায় উত্তাল ভারতবর্ষের সাধারণ জনজীবন যখন বিভ্রান্ত, সেই সময় ১৩৫০ বঙ্গাব্দে সারা বাংলায় যে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হয়েছিল তাতে সমগ্র বাংলা প্রায় বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল। শস্য–শ্যামলা সমগ্র বাংলা জুড়ে ফুটে উঠেছিল অভাব, অনাহার, ক্ষুধাতুর মানুষের করুণ জীবনচিত্র। সেই বিধ্বস্ত বাংলার দুর্ভিক্ষের ক্ষুধাতুর সাধারণ বঙ্গবাসীর করুণ অবস্থার কথা উঠে এসেছে বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকে। দুর্ভিক্ষ, অনাহার সাধারণ জনজীবনকে কীভাবে বিপর্যস্ত করেছিল তা উঠে এসেছে নাটকে প্রধান, কুঞ্জ, নিরঞ্জন, দয়াল, রাধিকা, বরকতদের সংলাপে। দুর্ভিক্ষে, অনাহারে মৃত্যুই ছিল সাধারণ মানুষের অনিবার্য পরিণতি। দুর্ভিক্ষের সেই মৃত্যুর ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা উঠে এসেছে রাধিকার সংলাপে-

> "দেখছ কী, কিছু কি থাকল! হুঃ, উজোড় হয়ে গেল গাঁ। উত্তর পাড়ায় তো সে একেবারে, থাক আর নাম করব না, একেবারে ছেয়ে গেছে। এমন অবস্থা হয়েছে যে, এক বিন্দু জল যে গালে দেবে তার পর্যন্ত কেউ নেই।– কী যে হবে সব!- এমন আকালও দেখিনি, এমন মৃত্যুও দেখিনি কোনো দিন।"[১]

মৃত্যুর ভয়াবহতা সাধারণ জনমানসকে শিহরিত করে। দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতিতে অনাহারে মৃত্যুই ছিল সাধারণ মানুষের অনিবার্য পরিণতি। সেই চরম পরিণতি স্বীকার করে নেওয়াই ছিল দুর্ভিক্ষে পীড়িত সুজন, ফকির, বুধে, বরকতদের ভাগ্যের নির্মম পরিহাস। পরিস্থিতির নির্মম পরিহাস মেনে নিয়েই বরকতকে আমরা বলতে শুনি-

"মরা তো হয়েছে হাতের পাঁচ। গেলেই হল!"[২]

১৩৫০ এর দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার ইচ্ছাকে শেষ করে দিয়েছিল। তবে 'নবান্ন' নাটকের একদিকে যেমন ফুটে উঠেছে অভাব, অনাহার, সাধারণ মানুষের দুর্গতি এবং কালোবাজারি স্বার্থপর শ্রেণীর গভীর চক্রান্তের কথা, অন্যদিকে উঠে এসেছে সাধারণ মানুষের সম্মিলিত প্রতিরোধ। যা সব প্রতিবন্ধকতা, চক্রান্তের বেড়াজাল ছিন্ন করে সাধারণ মানুষের অধিকারকেই প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। তাই নবান্ন নাটক প্রসঙ্গে বলা যায়–

> "'নবান্ন' নাটকের প্রথম থেকেই দুর্গতি ও দুর্ভিক্ষের পাশাপাশি প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের সম্ভাবনা গড়ে তোলা হয়েছে। নাটক শেষও হয়েছে প্রতিরোধের মধ্যেই।
>
> 'নবান্ন' নাটক তাই শুধু দুর্গতির নাটক নয়, প্রতিরোধেরও নাটক।"[৩]

নাটকে আমরা দেখি দুর্ভিক্ষ, অনাহার, কালোবাজারি, চক্রান্ত সবকিছুর বিরুদ্ধে গ্রাম বাংলার মানুষ জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলে। এই প্রতিরোধ শুধু পুরুষরা একাই গড়ে তোলেনি, গ্রাম বাংলার নারীরাও পুরুষের পাশে থেকে তাদের শক্তি, সাহস, উৎসাহ এবং আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে। জীবন রক্ষার এক চরম সংকটময় মুহূর্তে দাঁড়িয়েও নারী সমাজ এবং সংসার রক্ষার জন্য দায়বদ্ধতা সম্পর্কে তারা কখনো বিস্মৃত হয়নি। দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে সমাজ এবং সংসার রক্ষার পাশাপাশি আত্মসম্মান এবং নিজের অধিকার রক্ষাতেও নারীকে অবিচল থাকতে হয়েছে। কঠিন সংগ্রাম করতে হয়েছে স্বার্থপর সমাজ ও পরিস্থিতির সঙ্গে। নারী সংগ্রামের জীবন্ত প্রমাণ পঞ্চাননী, রাধিকা, বিনোদিনীরা এবং তাদের মতো গ্রাম বাংলার সহস্র সংগ্রামী নারীরা। গ্রাম বাংলার সহস্র নারীরা সেদিন পুরুষের সঙ্গে থেকে সংগ্রাম করে সমাজকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায়-

"বিশ্বে যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।"[৪]

কবি কাজী নজরুল ইসলামের এই বাণী যথার্থ তাৎপর্যপূর্ণ। আধুনিক পৃথিবী তথা আধুনিক সভ্যতা এবং সমাজকে সুন্দর করে তুলতে এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করতে পুরুষদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে চলছে নারী। তবে শুধু আধুনিক সময়ে নয় পুরুষের সঙ্গে নারীর পা মিলিয়ে চলা অনেক আগে থেকেই। সমাজের সামগ্রিক স্বার্থে, পরিবারের কল্যাণে নারী সদা-সর্বদা কর্ম তৎপর থেকেছে। তবে নারীর এই কর্মতৎপরতা ছিল মূলত গৃহকেন্দ্রিক। সংসার পরিচালনা তথা সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করে

চালিত করায় নারীর মূল কাজ হিসেবে বিবেচিত এবং নির্দেশিত থেকেছে। তাই নিরন্তর কর্মতৎপরতার পরেও নারী তার যথাযথ সম্মান কখনোই সমাজ থেকে ফিরে পায়নি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অধিকার, সম্মান বরাবরই লুণ্ঠিত হয়েছে। সমাজের কল্যাণে নিজেকে সর্বতোভাবে উৎসর্গ করে নারী। তবু নারী তার প্রাপ্য সম্মান না পেলেও অনেক সময়ই প্রতিবাদী হয়ে নিজের অধিকার দাবি করতে পারেনি। নারীর এই অক্ষমতার মূল কারণ তাদের সামাজিক সীমাবদ্ধতা, অর্থনৈতিক পরনির্ভরশীলতা। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর বঞ্চনার কারণ অনুসন্ধান বিষয়ে অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর 'পারিবারিক নারী সমস্যা' প্রবন্ধে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কথা তুলে ধরেছেন-

> "স্ত্রী পুরুষই যখন পরিবার গঠন, করে তখন স্বামীর উপরে থাকে অর্থ সংগ্রহের ভার, স্ত্রীর উপরে অর্থ ব্যয়ের। তাই নারীকে কোন কালে স্বাবলম্বন শিক্ষা করতে হয় না, স্বামীর অভাবে পরিবার চালাবার সামর্থ্যও অর্জন করতে হয় না, এইটেই তার যত দুঃখের কারণ। সেচায় পুরুষের আশ্রয়, তাই তাকে দাম দিতে হয় আত্মমর্যাদা। পুরুষের আশ্রয়ের বিনিময়ে সে আত্ম বিক্রয় করে, পুরুষের প্রভুত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হয়, তাই অধিকার দাবি করার অধিকার তার নাই।"[৫]

প্রাবন্ধিক অন্নদাশঙ্কর রায়ের এই মত যথার্থ। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী তার অধিকার কোনদিনই পায়নি। তবে শুধু অধিকারই শুধু নয়, আর্থিক পরনির্ভরশীলতার জন্য নারী সমাজ এবং সংসারে যথাযথ সম্মানটুকুও সর্বদা পায়নি। সমাজ এবং সংসারে অক্লান্ত পরিশ্রম করে, পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে পা মিলিয়েও নিজের অধিকার এবং সম্মানের জন্য নারীকে বরাবরই লড়াই করতে হয়েছে। লড়াই করেই সমাজে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে হয়েছে। তবে নারীর লড়াই অত্যন্ত কঠিন হলেও নারী সেই লড়াইয়ের ভূমি ছেড়ে পালিয়ে যায়নি। নারীর অধিকার এবং আত্মসম্মানের লড়াই-এর সেই প্রতিচ্ছবি উঠে এসেছে নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের অন্যতম নাটক 'নবান্ন'-তে।

পরাধীনতার যন্ত্রণা, আগস্ট আন্দোলনের উন্মাদনা, দুর্ভিক্ষের হাহাকার, কালোবাজারিদের দৌরাত্মে বাংলার সাধারণ জনজীবন যখন বিধ্বস্ত সেই প্রেক্ষাপটেই বিজন ভট্টাচার্য তার 'নবান্ন' নাটক লিখেছেন। উল্লেখ্য 'নবান্ন' নাটকটি গণনাট্য আন্দোলনে নতুন জোয়ার এনেছিল। 'নবান্ন' গ্রাম বাংলার নতুন অন্নের উৎসব, নাট্যকার তেমন এক নতুনের শুভ সূচনার বার্তায় দিয়েছেন সম্মিলিত প্রতিরোধের মধ্যে দিয়ে তার 'নবান্ন' নাটকে। সেই প্রতিরোধ শুধুমাত্র গ্রাম বাংলার পুরুষরাই করেছে তা নয় নারীও তাদের সঙ্গে প্রতিরোধে শামিল হয়েছে। পুরুষকে উৎসাহ দিয়ে উদ্বুদ্ধ করেছে জয় ছিনিয়ে নিতে। বাংলার দুর্ভিক্ষের, দুর্দশার চরম মুহূর্তে সেই সাহসী এবং উৎসাহী নারীর প্রতিমূর্তি আমরা দেখতে পাই প্রধানের স্ত্রী পঞ্চাননীর মধ্যে। নাটকের স্বল্প পরিসরে তার উপস্থিতি থাকলেও পঞ্চাননী শক্তি সাহস এবং উৎসাহের উৎস রূপে নাটকে ফুটে উঠেছে। বয়সের কাছে হার না মেনে সন্তান হারানোর যন্ত্রনা

বুকে নিয়েও জীবন ও আত্মসম্মান রক্ষার জন্য প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পঞ্চাননী দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। দারিদ্রতা যে সাধারণ মানুষের নিত্য সঙ্গী এবং আত্মসম্মান তাদের শুধু অহংকার নয় জীবন যাপনের অবলম্বন সেই কথা পঞ্চাননী জানে। অভাব, ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করে নিলেও নারীর সম্মান-সম্ভ্রমের প্রশ্নে পঞ্চাননী প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। আমরা তাই পঞ্চাননের কণ্ঠে শুনি-

> "প্রধান- সহ্য করতে এয়েছ সহ্য করে যাও। মুখ বুজে সহ্য করে যাও, কোন কথা কয়ো না। কোন কথা কয়ো না, অধর্ম হবে। মুখ বুজে...
> পঞ্চাননী- তার আর বলবে কি। আজ তিনদিন দাঁতে এট্টা কুটো কাটিনি, বুঝলে! শরীরের কষ্ট আমরা সহ্য করতে পারি। সে কোন কথা না। কিন্তু শরম !! লজ্জা !! তোমাদের দেশের মেয়ে মানষের অঙ্গের ভূষণ !! যা নিয়ে তোমরা গর্ব কর !! আর তারপর সবচাইতে বড় কথা ইজ্জত !! মেয়ে মানুষের ইজ্জত !! কী, কথা বলিস না যে ! চুপ করে থাকিস কেন, হ্যাঁ রা কুঞ্জ, কুঞ্জ কুঞ্জ !! !! !!"[৬]

তাই আমরা দেখি অভাব অনাহারের মধ্যে পঞ্চাননী আত্মসম্মান রক্ষার লড়াইয়ে নিজেও সামিল হয়েছে এবং গ্রামবাসী ও কুঞ্জকে উৎসাহ দিয়েছে নিজের অধিকার ছিনিয়ে নিতে। নাটকে পঞ্চাননীর উৎসাহী কণ্ঠে শোনা গেছে-

> "জনৈক ব্যক্তি- (ঘা খেয়ে) আরে ব্বাস রে, বাপ্ রে বাপ্।
> সকলে সমবেত কণ্ঠে এই-ই-ই শব্দ করে পিছিয়ে যায়
> পঞ্চাননী- আমিনপুরের কলঙ্ক, আমিনপুরের কলঙ্ক তোরা সব, তাই পেছু হটছিস। পেছোসনে, এগিয়ে যা। এগিয়ে যা তোরা সব, এগিয়ে যা।
> সমবেত কণ্ঠে-ও-ও-ও শব্দ করে জনতা এগিয়ে যায়।
> এগিয়ে যা, এগিয়ে যা সব।...."[৭]

পঞ্চাননী প্রতিবাদী, তার সঙ্গে সঙ্গে নাটকের অন্যতম প্রধান নারী চরিত্র কুঞ্জের স্ত্রী রাধিকা সেও প্রতিবাদী। রাধিকার প্রতিবাদ আত্মসম্মান রক্ষার, প্রতিবাদ নারীর অধিকার রক্ষার। দুর্ভিক্ষ অনাহারে যখন গ্রাম বাংলার সকল পরিবার বিপর্যস্ত, তখন রাধিকা ধৈর্যের সঙ্গে অভাবের মধ্যে, মনোমালিন্য হলেও হিসাব করে পরিবার চালাতে সক্রিয় থেকেছে। অনাহারে থেকেও পরিবারের সকলের জন্য নিরন্তর পরিশ্রম ও সংগ্রাম করে গেছে। অভাব তার শরীরকে জরাগ্রস্ত করেছে পথ্যের সংস্থান না হলেও সহনশীল নারী রাধিকা প্রতিবাদ করেনি, মুখ বুজে সহ্য করেছে শারীরিক যন্ত্রণাকে। কিন্তু আমরা দেখি কুঞ্জ যখন সংসার চালানোর জন্য রাধিকার মায়ের মল জোড়া বিক্রি করতে চেয়েছে তখন রাধিকা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে, গর্জে উঠেছে-

> "রাধি- তা সেকি আর আমি বুঝিনি! মনে তোমার অনেকক্ষণই পড়েছে, শুধু আমার বাপের বাড়ির জিনিস বলে চক্ষুলজ্জার খাতিরে একটু ভনিতে

করলে। কিন্তু সে মল আমার মায়ের দেওয়া। তার কথা মনে করে তুলে রেখেছি। সে আমি কিছুতেই দেব না। আর সবই তো খেয়েছ। এখন সেই মল জোড়ার উপর টনক নড়ছে। হা অদেষ্ট!

কুঞ্জ- না দিবি না দিবি, তা বলে হা অদেষ্ট হা অদেষ্ট করিস্ নি, হ্যাঁ! কুঞ্জ সমাদ্দার এখনও বেঁচে আছে, মরেনি।

রাধি- বেশ তো, তারই প্রমাণ দিক; সে তো আমার সৌভাগ্যি।”[৮]

রাধিকার এই প্রত্যাখ্যান রাধিকার আত্মসম্মান ও অধিকার বোধকেই প্রকট করে তোলে। মায়ের স্মৃতি মেয়ের অহংকার এবং অধিকারের স্থল, তা রাধিকা কুঞ্জকে তীব্র প্রতিবাদী ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছে। তবে একজন নারীর কাছে শুধু তার মা নয়, স্বামীও যে তার সম্মান ও অহংকারের আশ্রয় তা কখনোই রাধিকা বিস্মৃত হয়নি। তাই আমরা দেখি দারিদ্রতা, অভাব-অনাহারের মধ্যেও রাধিকা কুঞ্জকে ছেড়ে যায়নি। যোগ্য স্ত্রী হয়ে পাশে থেকেছে, ঘরহারা গ্রামছাড়া শহরের রাস্তায় অন্নপ্রার্থী হয়েও সব সময় কুঞ্জকে সাহস জুগিয়েছে। পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই-এ কুঞ্জের যোগ্য সহযোদ্ধা হয়েছে তার স্ত্রী রাধিকা। প্রকৃতপক্ষে স্বামীর সঙ্গে রাধিকার এই লড়াই পুরুষের সঙ্গে নারীর পা মিলিয়ে চলার লড়াই, বেঁচে থাকার লড়াই।

এছাড়াও এই নাটকে নিরঞ্জনের স্ত্রী বিনোদিনীর লড়াইও আমাদের চোখে পড়ে। দুর্ভিক্ষ ও অভাবের মধ্যে পড়ে আমরা দেখি চন্দরকে তার মা মরা মেয়েকে হারু দত্তের কাছে বিক্রি করে দিতে। সেই পরিস্থিতিতে নারীর সম্ভ্রম রক্ষা করা কতটা কঠিন ছিল তা সহজেই অনুমেয়। সেই পরিস্থিতির মধ্যে বিনোদিনী টাউটের ফাঁদে পড়ে কালীধনের সেবাশ্রমে আশ্রিত হলেও আত্মসত্ত্বাকে সে রক্ষা করতে পেরেছিল। আমরা দেখি নিরঞ্জনের সঙ্গে সেবাশ্রমে দেখা হবার পর আবার স্বামীর কাছে ফিরে যেতে সে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে-

“বিনোদিনী- আমি যাব, আমাকে ছেড়ে দাও। দাও, আমাকে ছেড়ে দাও আমি যাব।

রাজীব- (বাধা দিয়ে) আর এইডা কি কর! তুমি মাইয়া মানুষ তোমার স্থান হইল অন্দরমহলে। বাইরে যাবা ক্যান? যাও ভিতরে যাও।- কি আশ্চর্য!

বিনোদিনী- ছেড়ে দাও, আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও, আমি যাব।- যেতে দাও আমাকে।”[৯]

আমরা দেখি নিরঞ্জনের সঙ্গে দেখা হবার পর বিনোদিনী স্বামী নিরঞ্জনের সঙ্গে থেকে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কালীধনের কালোবাজারির মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছে। প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে নারী সংযমের পরিচয় দিয়ে কীভাবে পুরুষের শক্তি হয়ে ওঠে তা বিনোদিনীকে দেখে আমরা অনুধাবন করতে পারি। শুধু তাই নয় আমরা দেখি অভাব, অনাহার, সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার মধ্যেও বিনোদিনী আত্মসম্মানের লড়াই-এ

নিজেকে টিকিয়ে রেখেছে। আর লড়াইয়ের মধ্যে দিয়েই ঘরছাড়া, ঘরহারা অসহায় নারী বিনোদিনী শেষ পর্যন্ত স্বামীর গৃহে ফিরে এসেছে।

বিশ শতকের চারের দশক পরাধীন ভারতবর্ষের এক চরম অস্থিরতার সময়। পরাধীনতার দাসত্ব, দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য সাধারণ জনমানসের পুঞ্জিভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, অভাব-অনাহার সমস্ত কিছুর মধ্যে সাধারণ জনসমাজ বিপর্যস্ত। সেই বিপর্যস্ত সমাজকে টিকিয়ে রাখতে এক সম্মিলিত প্রচেষ্টা তথা প্রতিরোধের প্রয়োজন ছিল। আমরা সম্মিলিত সেই প্রতিরোধের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই এই 'নবান্ন' নাটকটিতে। সমাজের বিপর্যয়ে সমাজকে টিকিয়ে রাখতে নারীরা যে কীভাবে পুরুষদের উদ্বুদ্ধ করে তোলে তাও আমরা অনুধাবন করতে পারি পঞ্চাননী রাধিকা এবং বিনোদিনীর ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশের মধ্যে দিয়ে।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষ নারীকে চিরদিনই দমন করে রাখার প্রয়াস চালিয়ে এসেছে। বর্তমান অত্যাধুনিক সমাজেও সেই প্রয়াসের প্রতিফলন প্রত্যক্ষ করতে পারি। পরাধীন ভারতবর্ষ থেকে বর্তমান ভারতবর্ষ সময় অনেকটা অতিক্রান্ত হলেও নারীকে সমাজে টিকে থাকতে প্রতি মুহূর্তে সংগ্রাম করতে হচ্ছে। পুরুষ সমাজের নিয়ন্ত্রক থেকে নারীকে সমাজ রক্ষার এবং চালনার দায়িত্ব দিয়ে রেখেছে। তবে সেই সমাজে নারীর অধিকারের প্রশ্নে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ জিজ্ঞাসা চিহ্নই রেখে দিয়েছে। শুধু তাই নয় বর্তমান সমাজেও যখন নারীকে ভোগ্যপণ্য হিসেবে দেখা হয় তখন আত্মসম্মান রক্ষা করতে সমাজের মূল স্রোতে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে বর্তমান বিনোদিনীদের প্রতিনিয়ত লড়াই করতে হয়। বর্তমান অত্যাধুনিক সমাজে সমাজের আধুনিকতা, বিলাসিতার মধ্যে দাঁড়িয়ে নিজের অধিকার আত্মসম্মান রক্ষার জন্য প্রতিদিন নিরন্তর লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে বর্তমান সময়ের রাধিকারা। বর্তমানেও সমাজ ও সংসারের চরম বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত এবং বিভ্রান্ত পুরুষ যখন মুহ্যমান হয়ে পরে তখনও বর্তমানের পঞ্চাননী, রাধিকা, বিনোদিনীরা সাহস, উৎসাহ, ভালোবাসা, সঙ্গ দিয়ে পুরুষের তথা সমাজের সমস্যার উত্তরণে নিরন্তর লড়াই করে চলে। হয়তো আগামী দিন আসবে যেদিন এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীর লড়াইকে যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে প্রতিষ্ঠা দেবে। প্রতিটা নারীর লড়াইয়ের পরিসমাপ্তি হবে এক নতুন সূচনার মধ্যে দিয়ে।

তথ্যসূত্র:

১। নবারুণ ভট্টাচার্য ও শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, বিজন ভট্টাচার্য রচনা সংগ্রহ, প্রকাশক: সুধাংশুশেখর দে, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৪১৫, জুলাই ২০০৮, দেজ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ৫৯।

২। নবারুণ ভট্টাচার্য ও শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, বিজন ভট্টাচার্য রচনা সংগ্রহ, প্রকাশক: সুধাংশুশেখর দে, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৪১৫, জুলাই ২০০৮, দেজ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ১০১।

৩। দর্শন চৌধুরী, গণনাট্যের নবান্ন: পুনর্মূল্যায়ন, রাধারাণী সাধু খাঁ ও কেকা সাধু খাঁ কর্তৃক প্রকাশিত, বামা পুস্তকালয়, প্রথম প্রকাশ ১৫ই আগস্ট ১৯৯৭, ১১ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ১০৬

৪। কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলি জন্ম শতবর্ষ সংস্করণ দ্বিতীয় খন্ড, বাংলা একাডেমি ঢাকা, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, মে ২০১১, পৃষ্ঠা-৮৯

৫। অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রবন্ধ, প্রকাশক: শ্রী গোপালদাস মজুমদার, প্রথম প্রকাশ ইং সেপ্টেম্বর ১৯৬৪ বাং আশ্বিন ১৩৭১, পৃষ্ঠা ৬৬৩-৬৬৪

৬। নবারুণ ভট্টাচার্য ও শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, বিজন ভট্টাচার্য রচনা সংগ্রহ, প্রকাশক: সুধাংশুশেখর দে, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৪১৫, জুলাই ২০০৮, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ৪৩

৭। তদেব, পৃষ্ঠা ৪৫-৪৬

৮। তদেব, পৃষ্ঠা ৪৮

৯। তদেব, পৃষ্ঠা ৮৪

প্রসঙ্গ : মনসা মঙ্গল কাব্য ও হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির মিলন তীর্থ

চৈতালী ঘটক রায়
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
কৃষ্ণনগর দ্বিজেন্দ্র লাল কলেজ, কৃষ্ণনগর,নদীয়া

সংক্ষিপ্তসার : মধ্যযুগের দেব মাহাত্ম্য প্রচারমূলক এক বিশেষ শ্রেণীর সাহিত্য হল মঙ্গল কাব্য। মধ্যযুগের প্রথমার্ধে বাংলার শান্ত নিস্তরঙ্গ সমাজজীবনে তুর্কি আক্রমণের ফলে রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ সাহিত্যের পাশাপাশি আরেক শ্রেণীর আখ্যানমূলক সাহিত্য ধারা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সৃজন হয় সেটি হল মঙ্গলকাব্য। এই মঙ্গলকাব্যের প্রাচীনতম শাখা মনসামঙ্গল কাব্য। ত্রয়োদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত প্রায় ৫০০ বছর ধরে মনসামঙ্গল কাব্যের বিস্তার লক্ষ্য করা যায়। ভারতের ভীরু সশস্ত্র মানুষ তাদের স্বাভাবিক ভীতি থেকে মনসা বা সর্প পূজা প্রচার করে। এবং এই সর্প পূজা প্রচার থেকেই কবি মনে মনসা কে নিয়ে কাব্য রচনার ইচ্ছা প্রকাশিত হয়। যারই ফলশ্রুতি মনসামঙ্গল কাব্য। এই কাব্যের মধ্যে একদিকে যেমন সমাজ, রাষ্ট্র ভাবনা ফুটে উঠেছে অন্যদিকে তেমনি পরিবার ও লোকায়ক ভাবনাও স্থান পেয়েছে। তুর্কি আক্রমণের পরবর্তী সময়ে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষগুলি পারস্পরিক ধর্মীয় ও সামাজিক মিলন স্থাপন করাও এই মঙ্গলকাব্য বিশেষত মনসা মঙ্গল কাব্য গুলির মধ্যে দেখা যায়। এই কাব্যকে কেন্দ্র করে হিন্দু মুসলমান সংস্কৃতি মেলবন্ধন ঘটে। মনসামঙ্গলের মধ্যে হিন্দু আচার-আচরণ এবং ধর্মীয় পূজা পার্বণের সঙ্গে এক সুরে মিলিত হয়েছে মুসলমান পীর ফকিরদের ভাব ও ভাবনা। সুতরাং একথা তাই মনে হয় মনসামঙ্গল কাব্য হিন্দু মুসলিম সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের মহান ক্ষেত্র ।

সূচক শব্দ :- সমাজ, ধর্মীয় সমন্বয়, সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, আদর্শ জীবনচিত্র, প্রতিরক্ষা, মনসা, ভক্তিবাদ, মধ্যযুগ সংস্কৃতি, দেবযাজি সাহিত্য।

মূল আলোচনা

মনসা সংস্কৃতির মধ্যে নিহিত রয়েছে বহু ধারার সংস্কৃতি সমন্বয়ের দিক। আমাদের লোকায়ত জীবনে পটের গানে, মনসার যাত্রায় ঝাপন বা সখি গানে তাকে নানা ভাবে পাওয়া গেছে। এখানে হিন্দু মুসলমান সংস্কৃতি ও মিলেমিশে আছে নানা আঙ্গিকে। কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের হাসান হুসেন সমীপে মনসা পূজার বার্তা অংশে এই সংস্কৃতিগত মিলন অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যাখায়িত হয়েছে

‘এই তো হাসান হাটি হাসানের পাঠ ।
তাহে অবতার হইল হে হিঁদূয়ার ঘাট ।।

যবনের পুরে আইলো হিন্দুর দেবতা ।
হাসান হুসন দুধ মুখে শুনে কথা ।।

হাসান হুসেনের কাহিনীতে রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসে প্রভাব লক্ষণীয়। হিন্দু মুসলিম বিরোধ সম্প্রীতির চিত্রই এখানে শুধু ফুটে ওঠেনি এখানে হিন্দু ও মুসলমান প্রজাদের একত্রিতভাবে ইচ্ছা পূরণের দাবিও ফুটে উঠেছে। এই কাব্যে হাসানহাটির মানুষ থেকে শুরু করে নারকেলডাঙ্গা ভাটপাড়া প্রভৃতি পথের উল্লেখইকরণের মধ্যেও হিন্দু মুসলমান মিলনের ইঙ্গিত প্রতিভাত। ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীতে মনসামঙ্গল কাব্য সংক্ষিপ্ত গীতি রূপে ভাষান নামেও অভিহিত হতো । এই কাব্যের আঙ্গীকে ছত্রে ছত্রে ধর্মীয় মিলনের সুর খুঁজে পাওয়া যায়।

বঙ্গদেশে মুসলমান আগমন বনিকের ছদ্মবেশে ঘটে নি । সমগ্র বাংলাদেশে যখন বৌদ্ধ সংস্কৃতির সঙ্গে ব্রাম্মন্য সংস্কৃতির সংঘাত তুঙ্গে উঠেছে বাংলার জনমানসে যখন অবিশ্রান্ত এক অস্থির পরিবেশ ঠিক সেই সময়ে (১২০১-১২০২) অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে লক্ষন সেনের রাজত্ব কালে ইখতিয়ারউদ্দীন মহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী বাংলাদেশ আক্রমন করেন । ভীত লক্ষনসেন পরাজয় স্বীকার করে পূর্ববঙ্গে আশ্রয় নেন । এর পর থেকেই বাংলায় শুরু হয় মুসলিম আধিপত্য । ইসলাম সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্যবাদী আদর্শ প্রচ্ছন্ন থাকলেও ভারতে এসে কিন্তু তারা ভারতবর্ষের প্রাচীন ধারাকেই অনুসরন করেন । অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব পোষন করেন । নিজেদের অধিকারকে কায়েমি করার লক্ষ্যে তারা প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন করেন নি । সে সময় ভারতের সমাজ তথা অর্থনীতিতে তিনটি শ্রেনীর প্রভাব লক্ষ্যনীয় ভাবে ধরা পরে

এক- বিলাসী শাসক বা রাজপ্রতিনিধি সম্প্রদায় যারা ছিল কেন্দ্রীয় শাসনকর্তার দক্ষিনহস্ত স্বরূপ। তারা শাসক গনের তাবেদারী করে যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠেছিল।

দুই- এরা ছিল তাবেদার সম্প্রদায়ের সহায়ক কর্মচারী শ্রেনী । যারা ছিল প্রতিরক্ষার মূল দায়িত্বে অর্থাৎ এরা সৈন্যবাহিনীর কর্মী ও রাজসভার সেরেস্তার কর্মচারী।

তিন- দেশের সাধারন মানুষ বা অগণিত প্রজা ।এই অগণিত প্রজারা ছিল পূর্বে যেমন শোষিত হতে বর্নহিন্দু সম্প্রদায়ের বা উচ্চবর্নের জমি মালিকদের দ্বারা মুসলিম শাসনের ফলে সেই প্রজাগন শোষিত হল বর্নহিন্দু সম্প্রদায়দের পরিবর্তে বিজাতীয় বহিরাগত মুসলমানদের দ্বারা। এই সময়ে নিম্নবর্গের সাধারন প্রজা ও ভূমিহীন চাষী ও মজুরদের মধ্যে মুসলিম রাজঅনুগ্রহ লাভের ইচ্ছা জাগরিত হল বলাই বাহুল্য মুসলিমদের উদার সাম্যবাদী ধর্ম সাধারন মানুষকে অনুপ্রানিত করেছিল। সুতরাং মূলতঃ দুটি কারনে বঙ্গদেশের সাধারন মানুষ রাজশক্তির সাহচর্য লাভের আশায় এবং হিন্দুধর্মের গোড়ামি ও ধর্মীয় সংস্কারের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ইসলাম ধর্মে

দীক্ষিত হয়। মুসলিম শাসক গোষ্ঠীও এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে শোষিত নিম্নবর্গের মানুষের কাছে থেকে তাদের রাজশক্তি সপক্ষে রাখার কথা ভেবেছিল । আবার তুর্কী, আক্রমনের ফলে বঙ্গদেশের বর্ণহিন্দুগণ ও একথা অনুভব করেন যে তারা দরিদ্র প্রজাদের সঙ্গে না রাখার ফলেই তুর্কী আক্রমন প্রতিহত করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি এবং পরবর্তী কালে মুসলিম ধর্মান্তরিতকরন ঘটেছে সহজে চাই তারাও কিছুটা উদার হওয়ার পথে পা বাড়ান এরই ফলশ্রুতি স্বরূপ বঙ্গদেশে গড়ে ওঠে অনুবাদ সাহিত্যের ও মঙ্গলকাব্যের ধারা। সুতরাং মুসলিম আগমনই যে বঙ্গদেশে বাংলার সাহিত্যচর্চার ভিতটিকে দৃঢ ও ত্বরান্বিত করেছিল যে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং স্বেচ্ছায় ও অনিচ্ছায় সংমিশ্রনে যে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটেছে তারই ফলশ্রুতি হিসেবে আমরা ভক্তিবাদী আন্দোলনকে পেয়েছি। কবীর, নানক ও চৈতন্যর মতো ব্যক্তিত্বের আগমনে সেদিন পবিত্র ভূমিতে পরিনত হয়ে উঠলো। মানুষ মানুষে বিভেদের বিষচক্রকে ভেঙ্গে দেওয়াই ছিল এই ভক্তিবাদের মূল আদর্শ । এই মহান আদর্শকে পাথেয় করেই বাংলায় কাব্যেধারায় উঠে এলো হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির যৌথ ছবি। দেখা দিল মঙ্গলকাব্যের ধারা সেখানে অক্লেশে মুসলমান সমাজের জীবনছবি ও বঙ্গদেশের পরিবেশগত প্রতিচ্ছবি মিলেমিশে এক হয়ে গেল। বাংলাকাব্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের জীবনবর্ননায় প্রথম প্রকাশ লক্ষ করা যায় রামাই পন্ডিতের **‘শূন্যপুরাণ’** এ। সেখানে ব্রক্ষন সম্প্রদায়ের অত্যাচারের পাশাপাশি মুসলিম সম্প্রদায়ের বিধ্বংসী মনোভাবের পরিচয় ও তুর্কী আক্রমনের ছবি কবির বর্ননায় ফুটে উঠেছে। আলোচ্য কাব্যে হিন্দুদের কষ্ট ও পাষানদের দেবদেবীর পূজার পাশাপাশই মুসলমানদের নিরাকার পুজা পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৃহৎ শাখা শুধু মঙ্গলকাব্যে। এই কাব্য মূলত দেবযাজি সাহিত্যরূপেই পরিচিত । দেবতাদের বন্দনাগান এবং তাদের পূজা প্রচার কাব্য রচনার মূল প্রেরনা হলেও ভাবতে বিস্ময় জাগে যে এই কাব্য রচনার প্রেরনা যুগিয়েছিলেন হোসেন শাহ,পরাগল খা,কিংবা নসরৎ সাহের মতো মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায়। তারা শুধু সে যুগের হিন্দু কবিদের উৎসাহ দানই করেননি তারা সেই কবিদের সম্মানজনক পদে আসীন করেন ও নানা পুরষ্কারও ভূষিত করেন । তাদের এই উদার ও অসাম্প্রদায়িক সাহিত্য প্রীতি বঙ্গদেশে বাংলা সংস্কৃতি তথা সাহিত্য রচনাকর্মকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বঙ্গদেশে তুর্কী আক্রমন না ঘটলে বঙ্গদেশে বাংলা ভাষাচর্চা আরও সুদূর প্রসারী হয়ে উঠত। এছাড়া তুর্কী আক্রমনের জন্যই বঙ্গদেশের বর্ণহিন্দু সম্প্রদায় তাদের অস্তিত্ব অবলুপ্তির আশঙ্কায় নিম্নবর্গের মানুষদের সঙ্গে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন স্থাপন করে। এরই ফলে একদিকে নিম্নবর্ণের দেবদেবীরা সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের সুযোগ পেয়েছে অন্যদিকে মুসলিম রাজ অনুগ্রহ লাভের চেষ্টায় রামায়ন মহাভারত অনুবাদ ও মঙ্গলকাব্য যৌথ সংস্কৃতির মিলন ঘটেছে । সুতরাং একথা বলা যায় যে বিজয়ী ও বিজিতের যৌথ প্রচেষ্টায় সে যুগের বঙ্গ সংস্কৃতি ও বাংলা ভাষা চর্চা সমৃদ্ধির দ্বার প্রান্তে পৌছানোর

সুযোগ পায় । প্রাগাধুনিক যুগে মঙ্গলকাব্যই হল বাংলাচর্চার প্রথম স্বাধীন ক্ষেত্র । এযুগের কবিরা নবাগত মুসলিম সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগত থেকে তাদের কাহিনী কাব্য রচনার আঙ্গীক গ্রহন করেন । মুসলিম সুলতান দের সভায় মসনবী ও কশিদার কাহিনীকাব্য ও প্রসংশারগাথায় চর্চায় মঙ্গলকাব্যে অজস্র প্রতিভাবান ও অপ্রতিভাবান কবিদের ভিড়ে আমাদের আলোচ্য হল করেকজন কবি যাদের কাব্যে মুসলিম সমাজ তাদের আর্থসামাজিক প্রসঙ্গ ফুটে উঠেছে । যেমন **নারায়ন দেব** । তার কাব্যের নাম **'পদ্মাপুরান'** । তার কাব্যে মুসলিম প্রসঙ্গ ফুটে উঠেছে সংক্ষিপ্ত পরিসরে কয়েকটি ঘটনায়। পুত্র লক্ষিন্দরের বিবাহের পরে চাঁদ বনিক আর একদন্ড যেখানে অপেক্ষা করেনি। দেশে ফিরে আসার জন্য ব্যাস্ত হয়েছে এবং কারন হিসেবে বলেছে

'হুসেন হাসানের নিকট আমার পুরী
না জানি রাজ্যেতে কিবা হইল ডাকাচুরি।'

অর্থাৎ চুরি-ডাকাতির যাবতীয় দায় তিনি হুসেন হাসানের মতো লোকেদের উপর চাপিয়েছেন । এখানে হয়তো তুর্কী আক্রমনে ত্রস্ত সমাধানে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি ভীতি ফুটে উঠেছে কবির কলমে । মুসলিম হুসেন হাসান প্রসঙ্গ কবির কাব্যে আরো একবার ফুটে উঠতে দেখি কাল নাগিনীর প্রতি মনসার উক্তিতে । যেখানে হুসেন হাসানের অতাচারের পাশাপাশি দেবীর প্রতি তাদের পূজা প্রদর্শন ছবিও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই হুসেন হাসান ইতিহাসের হুসেন শাহ ই কিনা তা অনুমান সাপেক্ষ। তবে কবির পরিমিত রুচিবোধ ও সংযম দুই সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনে সচেষ্ট হয়েছিল একথা বলা যায়। মনসামঙ্গলের আরেক শক্তিমান কবি **বিজয় গুপ্ত**। তার গ্রন্থটিও **'পদ্মপুরাণ"** নামে খ্যাত। বিজয় গুপ্তের কাব্যে তৎকালীন মুসলিম সমাজ অনেক বেশি বাস্তবসম্মত ভাবে প্রতিভাত হয়েছে । এখানে মুসলমান পারিবারিক জীবনচিত্র বর্ননা করে যে যুগের মুসলিম সমাজের সাধারন আবেগ সংযম এবং হাস্যরস সকল বিষয় ফুটিয়ে তুলেছেন । এক মুসলিম যে কাপড় বুনে হাটে বিক্রি করে স্ত্রীকে টুকি টাকি জিনিস কিনে দিত সেই মানুষটির সর্পাঘাতে মৃত্যু হলে তা স্ত্রীর বিরহতাপিত স্মৃতিচারণার মধ্য নিয়ে সে যুগের আড়ম্বরহীন দুস্থ মুসলিম সমাজের ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আবার কাজীর বিলাসবহুল পারিবারিক জীবন বর্ননার মধ্যদিয়ে সে যুগে অভিজাত মুসলমান সম্প্রদায়ের পারিবারিক জীবনকে খুজে পাওয়া সম্ভব হয়। কবির **'পদ্মপুরাণে'** মুসলিম সমাজে নরনারীর একাধিক বিবাহ ও পরকীয়া প্রেমের সুনিপুণ ধারাভাষ্য ফুটে উঠেছে। অভিজাত কাজির তিনটি স্ত্রী থাকা সত্বেও দাসী মৃত্যু তাকে বেশী বেদনাহত করে তোলে।

'মরিল দুলাল বাঁন্দী তাহার লাগি কান্দে কাজি
স্মরনে রহিল তাহার কথা ।

কিন্তু কাজির এই পরকীয়া প্রেমে কবি যথেষ্ট রাশ টেনেছেন ।দেব চরিত্র শিবের বর্ননায় তিনি যে কামুকতা দেখিয়েছেন কাজি চরিত্রে তিনি তার অনেকটাই প্রশমিত করেন

হয়তো মুসলিম শাসকের বিরাগভাজন না হওয়ার জন্যই তার এই সংযম প্রদর্শন। । তবে কাব্যের শেষে হিন্দু দেবী মনসার উদ্দেশে কাজির হরষিত চিত্তে পুজা পাঠানোর মধ্য দিয়ে তিনি হিন্দু মুসলিম ভেদাভেদকে গৌণ করে তুলেছেন। এখানেই তার কাব্যের বিশিষ্টতা । মঙ্গল কাব্যে আর একজন বিশিষ্ট কবি **বিপ্রদাস পিপলাই** তার কাব্যের নাম **'মনসাবিজয়'** । এই কাব্য রচনায় তিনি বঙ্গসংস্কৃতির সঙ্গে মুসলিম সংস্কৃতি ও জীবন যাত্রার মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন এই আত্মিক টানে । তার কাব্যে চতুর্থ পালা ও পঞ্চম পালায় মুসলমান প্রসঙ্গ এসেছে নানা ভাবে। প্রথমে মনসার পূজা দানে বাধার সৃষ্টি করার জন্য মনসার সঙ্গে হাসান হুসেনের বিরোধ ও আঘাত উপস্থিত হয় এবং পরবর্ত্তী পর্বে এই বিরোধের মধ্যে দিয়েই গড়ে ওঠে মিলনের উৎসব। কবি মুসলিম সমাজের বর্ননায় সমাজের দুটি স্তরে জীবনাচরনের বর্ননা করেন । একদিকে শাসক বা মালিক শ্রেনী আড়ম্বরপুর্ন দিনযাপনের চিত্র অপর দিকে দরিদ্র চাষী জোলা ও মজুর শ্রেনী অনাড়াম্বর জীবননাট্য তার রচনার অন্যতম অভিনবত্ব এই যে, তিনি তার কাব্য হিন্দুকবি হয়েও সহস্রাধিক ইসলামী শব্দ ব্যাবহার করেন । বিপ্রদাস দুঃসাহসিক ভাবে দেখিয়েছেন গ্রামে বিরোধের মূল উৎস হিন্দু সম্প্রদায় রাখালগনই মনসার সঙ্গে কাজীর বিরোধ ঘটায় এবং কাজীর অজান্তে এবং অজ্ঞাতে মনসার সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হয়ে পড়ে যখন জানতে পারে যে মনসা তাকে অর্থাৎ কাজীকে পুত্র জ্ঞানে স্নেহ করেন তখন দেবীর প্রতি সহজাত শ্রদ্ধাবোধ দেখাতে কাজীর কোন অসুবিধাই হয়না। এখানেই সর্ব ধর্মকে ছাপিয়ে মানবধর্মের জয় ঘোষিত হয়। সন্তান ও মাতার শাশ্বত সম্পর্ক ভাস্মর হয়ে ওঠে।

'ডাকিয়া বলেন মাতা মধুর সুর স্বরে
শুন শুন ওরে পুত্র নৃপতি হাসান..'

এই যুগে কবিদের কাব্য রচনার জমি যে হিন্দু-মুসলিম যৌথ সংস্কৃতির জলসেচনে উর্বর হয়ে উঠেছিল একথা মেনে নিতেই হয়। সুতরাং কবির মধ্যে যে মহৎ মিলন মন্ত্র জাগরুক ছিল কাব্য রচনায় ও বর্ননা কর্মে তা প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। পশ্চিমবঙ্গের **'মনসামঙ্গল'** রচনাকারদের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় কবি **'কেতকা দাস ক্ষেমানন্দ'** তার কাব্যের নাম **'মনসামঙ্গল'**। কবির রচনায় যদিও হাসান- হুসেন পালাটির খন্ডিত, তথাপি পালা শেষে মনসার বিজয় গাথাই বর্নিত হয়েছে। তবে তার কাব্যে এক অপুর্ব ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাব লক্ষনীয়ভাবেই চোখে পরে। বিজয় গুপ্ত যেখানে হাসন হুসেন কে দিয়ে আবেগ তারিত ভাবে মনসার পুজার উপাচার সাজিয়েছেন। কেতকা দাস ঠিক তেমনটা করেননি। কবি হাসান হুসেন কর্তৃক মনসার পূজাপর্ব বর্ননা করেননি। রাখাল কর্তৃক মনসার পুজার কথা শুনলে হাসান হুসেন ক্রোধে জ্বলে ওঠে। ফলে মনসা তাদের গৃহ ধ্বংস করলেন। হাসান হুসেন ও সকল যবন পলায়ন করে **'পলায়িল যতেক যবন'** - বলে কবি উল্লেখ করেন । এক্ষেত্রে হয়তো কবির ব্যক্তিগত জীবনের প্রভাব কে দায়ী করা যায়। কারন গ্রন্থৎপত্তি বিবরন ও আত্মপরিচয় অংশে কবি বলেন যে তার

পিতৃনিবাস সেলিমাবাদ পরগনার অন্তর্গত। সেখানকার ফৌজদার বারা খাঁ যুদ্ধে নিহত হলে দেশে ওরাজকতা দেখা দেয় এবং কবির পিতা শঙ্কর মন্ডল তাদের বন্ধুস্থানীয় আস্কর্ন রায়ের সহায়তায় গ্রাম পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। সুতরাং কবির পারিবারিক জীবন মুসলিম রাজশক্তির দ্বারা সাময়িকভাবে বিচলিত হলেও তিনি মুসলিম শাসক বারা খাঁ প্রতি যেমন শ্রদ্ধাবোধ প্রদর্শন করেছেন তেমনি হিন্দু আস্কর্ন রায়ের প্রতিও শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন। ফলে তার লেখনিতে হিন্দু দেবদেবীর পাশাপাশি মুসলমান সাধু ও পীর-পয়গম্বর দের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ফুটে উঠেছে।

'বন্দনা বন্দিলাম ভাই মন করি স্থির
পান্ডোয়া বন্দিয়া গাইব সুভি খা পীর'

অর্থাৎ কবির অন্তরাজ্যে মুসলমান পীর ও হিন্দু মনসা উভয়ের জয়গান বর্নিত হয়েছে । এই ভাবে কবি কেতকা দাস ক্ষেমানন্দের কাব্যে এক ধর্মনিরপেক্ষ শুদ্ধ সমাজ গঠনের মনোভাব ফুটে উঠতে দেখি। সুতরাং সমগ্র মধ্যযুগের সাহিত্যে তো বটেই শুধু মঙ্গলকাব্য কিংবা আরো সংক্ষেপে বলা যায় শুধু মনসামঙ্গল কাব্যে বিভিন্ন কবিদের রচনার হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতির অভুতপুর্ব মেলবন্ধনের লক্ষ করা যায়। তাদের লেখনীতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনয়নের জন্য কোথাও পারম্পরিক সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রদর্শিত হলেও শেষ পর্যন্ত উভয় সংস্কৃতি যেন তাদের জীবনচর্চাকে একই সুত্রে গেঁথেছে। তাই আধুনিক কবির লেখনীতেও হিন্দু মুসলিম একই বৃত্তে দুটি কুসুম রূপেই প্রস্ফুটিত হয়ে তারা একই সঙ্গে ভারত মাতার নয়নের মনি ও প্রানের প্রতিমা । সুতরাং একথা বলা যায় প্রাগাধুনিক পর্বথেকেই বাঙ্গালী সংস্কৃতির ও ঐতিহ্যে মুসলিম মনন শ্রদ্ধার সঙ্গে ক্রিয়াশীল থেকেছে। "

গ্রন্থসূত্র / গ্রন্থঋণ :-

১) ডঃ মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায়ঃ- কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল জীবন বীক্ষার আলোকে, দীপাবলি-২০১০

২) অঞ্জন সেন, শেখ মকবুল ইসলামঃ- সর্পসংস্কৃতি ও মনসা, ২০১০ স্বাধীনতা দিবস

৩) সম্পাদনা - সনৎ কুমার নস্বর: কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল ১লা জানুয়ারী ২০১১, প্রজ্ঞা বিকাশ।

৪) ডঃ আদিত্যকুমার লালা : মনসামঙ্গল কাব্য জীবনদৃষ্টির বিচিত্র দর্পনে, ১লা ডিসেম্বর ২০১০

৫) বর্ণালী প্রামানিকঃ - লোক ঐতিহ্যের দুর্গনে জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গলে, ২০১২

তুলনামূলক সাহিত্য ও সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র ('বিবিধ প্রবন্ধ'-এর প্রথম ভাগের আলোকে)

বিভাস দত্ত
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : সমালোচনার বিভিন্ন ভাগের মধ্যে একটি অন্যতম হল তুলনামূলক সমালোচনা রীতি। সাহিত্যে এ-ধরনের আলোচনার কথা প্রথম বলেছিলেন ম্যাথু আর্নল্ড। আর বাংলা সাহিত্যে এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন অগ্রগণ্য। তিনি মূলত পাশ্চাত্য শিল্প-রীতি অনুযায়ী সমালোচনা কর্মে হাত দিয়েছিলেন। মিল, বেন্থাম, গ্যেটে, আর্নল্ড প্রমুখের চিন্তাধারা তাঁকে প্রভাবিত করেছিল । 'বিবিধ প্রবন্ধ'-এর প্রথমভাগের অন্তর্ভুক্ত 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব', 'শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা', ও 'উত্তরচরিত' - এই তিনটি প্রবন্ধে তুলনামূলক সমালোচনা রীতি লক্ষ্য করা যায়। তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র দেশ'জ মাধ্যমকে যেমন ব্যবহার করেছেন; তেমনি আবার পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে দেশ'জ সাহিত্যের নানান উপকরণের তুলনা করেছেন। পাশাপাশি সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রেও তিনি বিচক্ষণ ছিলেন। তাই পাশ্চাত্য ও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রেক্ষিতে তিনি বাংলা সাহিত্যের বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন এবং নিজের চিন্তা-চেতনা দ্বারা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

সূচক শব্দ : উপাখ্যান, প্রেক্ষিত, প্রগাঢ়তা, তেজস্বী, তড়াগ, ঘরানা।

বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। নিজের প্রতিভার আলোয় তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। একদিকে যেমন তিনি উপন্যাস, রম্য রচনা লিখেছিলেন; তেমনি অন্যদিকে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে সমালোচনাধর্মী প্রবন্ধ রচনাতেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র মূলত পাশ্চাত্য শিল্প-রীতি অনুযায়ী সমালোচনা কর্মে হাত দিয়েছিলেন। মিল, বেন্থাম, ডেইন, কোমৎ, গ্যেটে, ম্যাথু আর্নল্ড, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রমুখের চিন্তাধারা তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। পাশাপাশি সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রেও তিনি বিচক্ষণ ছিলেন। তাই পাশ্চাত্য ও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রেক্ষিতে তিনি বাংলা সাহিত্যের বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন এবং নিজের চিন্তা-চেতনা, মেধা ও চেষ্টা দ্বারা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাই স্বভাবতই বলেছেন - "তখন সময় আরো কঠিন ছিল।... লেখার প্রয়াস জাগিয়া উঠিয়াছে অথচ লেখার উচ্চ আদর্শ তখনো দাঁড়াইয়া যায় নাই। সেই সময় সব্যসাচী বঙ্কিম এক হস্ত গঠনকার্যে এক হস্ত নিবারণকার্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। একদিকে অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিতেছিলেন আর-এক দিকে ধূম এবং ভস্মরাশি দূর করিবার ভার নিজেই

লইয়াছিলেন। রচনা এবং সমালোচনা এই উভয় কার্যের ভার বঙ্কিম একাকী গ্রহণ করাতেই বঙ্গসাহিত্য এত সত্বর এমন দ্রুত পরিণতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।"[১]

আর 'রচনা' ও 'সমালোচনা'-র ভার নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে নতুন একটি ধারার শুরু করেন। সাহিত্যে তা তুলনামূলক সমালোচনা রীতি নামে পরিচিত। সমালোচনা বলতে আমরা খুব সংক্ষেপে বুঝি, কোনো কিছু নিবিড়ভাবে পাঠ করে নিজস্ব অনুভূতির প্রকাশ ঘটানো। সমালোচনা মানব-মস্তিষ্কজাত। এর সঙ্গে তাই যুক্তি নির্ভর চিন্তা-চেতনা জড়িত। সমালোচনার নানান প্রকারভেদের মধ্যে একটি অন্যতম রীতি হল তুলনামূলক সমালোচনা। এক্ষেত্রে একদেশের সাহিত্যের সঙ্গে অপর কোনো দেশের অনুরূপ সাহিত্যের কিংবা সমজাতীয় দুটি বিষয়ের মধ্যে পারস্পরিক তুলনা করা হয়। অর্থাৎ এখানে মিল-অমিল উভয়ই দেখাতে হয়। সাহিত্যে এ-ধরনের আলোচনা যে সম্ভব তা সর্বপ্রথম বলেছিলেন ম্যাথু আর্নল্ড। আর বাংলা সাহিত্যে এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন অগ্রগণ্য। তিনি তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে দেশ'জ মাধ্যমকে যেমন ব্যবহার করেছেন; তেমনি আবার পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে দেশ'জ সাহিত্যের নানান উপকরণের তুলনা করেছেন। সমালোচনা বলতে বঙ্কিমচন্দ্র মূলত সমগ্র আলোচনাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। অর্থাৎ কোনো রচনার বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে খণ্ড-খণ্ড করে তাকে আলোচনা না করে রচনার সামগ্রিক আলোচনায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। আমাদের এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় তাঁর 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে। তিনি লিখেছেন - "এ স্থান ভাল রচনা, এই স্থান মন্দ রচনা, এইরূপ তাহার সর্ব্বাংশের পর্য্যালোচনা করিলে প্রকৃত গুণাগুণ বুঝিতে পারা যায় না। যেমন অট্টালিকার সৌন্দর্য্য বুঝিতে গেলে সমুদয় অট্টালিকাটি এককালে দেখিতে হইবে, সাগরগৌরব অনুভূত করিতে হইলে, তাহার অনন্তবিস্তার এককালে চক্ষে গ্রহণ করিতে হইবে, কাব্য নাটক সমালোচনাও সেইরূপ।"[২]

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ রচনার প্রকৃত সূত্রপাত ঘটে 'বঙ্গদর্শন'-এর জন্মলগ্ন থেকে। ১৮৭২ খ্রি: বঙ্গদর্শনের সম্পাদক হয়েই তিনি প্রবন্ধ রচনার কথা উপলব্ধি করেন। তবে প্রথম জীবনে ঈশ্বরগুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর'-এ তিনি বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ১৮৭৬ খ্রি: 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল 'বিবিধ সমালোচনা'। এতে সাহিত্য-সমালোচনামূলক মোট ৯টি প্রবন্ধ ছিল। এরপর ১৮৭৯ সালে মোট দশটি প্রবন্ধের সমাহারে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'প্রবন্ধ পুস্তক'। পরবর্তীকালে এই দুটি গ্রন্থ পরিমার্জিত হয়ে 'বঙ্গদর্শন' ও 'প্রচার' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'বিবিধ প্রবন্ধ'-এর প্রথমভাগ (১৮৮৭ খ্রি:)। 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-ভাবনা, ইতিহাস চেতনা ও সাহিত্যনির্ভর চিন্তা-চেতনার ছাপ রয়েছে। সাহিত্য, রাজনীতি, ইতিহাস, ধর্ম, ভারতীয় দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিচিত্র বিষয় থেকে উপাদান সংগ্রহ করে তিনি প্রবন্ধগুলো রচনা করেছেন। আমরা 'বিবিধ প্রবন্ধ'-এর প্রথমভাগের 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব', 'শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা', ও 'উত্তরচরিত' - এই

তিনটি প্রবন্ধ সামনে রেখে তুলনামূলক সাহিত্য সমালোচক হিসেবে বঙ্কিমের চিন্তা-চেতনার উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করবো।

'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র দেশীয় কবিদের (বিদ্যাপতি ও জয়দেব) মধ্যে তুলনা করেছেন। তুলনা করতে গিয়ে তিনি যেমন উভয় কবির মিল-অমিল ফুটিয়ে তুলেছেন; তেমনি ইতিহাসের আলোকে গীতিকবিতার উৎস নির্ণয় করেছেন। সাহিত্য সৃষ্টি ও গীতিকবিতা উদ্ভবের কারণস্বরূপ তিনি দেশ-কাল-সমাজের প্রভাব আছে বলে উল্লেখ করেছেন। আসলে কবিও একজন সামাজিক মানুষ। সমাজ-পরিবেশের দাবিই তাঁর লেখাকে তরান্বিত করে। তাই যুগ ও সমাজের প্রেক্ষিতে তিনি স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে বুঝতে চেয়েছেন। সমাজ-পরিবেশে যখনই বদল এসেছে, দেখা গেছে - সাহিত্যও তখন বাঁক নিয়েছে। ফলত শিল্প-সাহিত্যে সংযোজিত হয়েছে নতুন-নতুন শাখা। ভারতবর্ষীয় সাহিত্যেও এভাবেই পর্যায়ক্রমে রামায়ণ, মহাভারত, ভক্তিশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, পুরাণ, কাব্য, নাটক ও গীতিকবিতার জন্ম হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গীয় গীতিকবিদের দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। একশ্রেণির গীতিকবি মানুষের হৃদয় অপেক্ষা প্রকৃতির রূপ-সৌন্দর্যে বেশি মুগ্ধ। তাঁরা প্রকৃতির আলোকে মানুষের হৃদয়-বৃত্তির বর্ণনা করেছেন। আর একশ্রেণির গীতিকবি আছেন যাঁরা অন্ত:প্রকৃতির স্বরূপ প্রকাশে ব্যস্ত। অর্থাৎ মানুষের হৃদয়-বৃত্তি বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁরা বাহ্য প্রকৃতিকে দূরে সরিয়ে রেখে মানুষের হৃদয়কেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে প্রথম শ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র জয়দেব এবং দ্বিতীয় শ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবে তিনি বিদ্যাপতিকে চিহ্নিত করেছেন। বিদ্যাপতি ও জয়দেব - উভয়েই বৈষ্ণব কবি এবং দুজনেই রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়গীত সম্পর্কীয় আলোচনা করেছেন। কিন্তু স্বভাবতই দুজনের আলোচনার ধারাটি ছিল আলাদা। জয়দেবের কাব্যে ফুটে উঠেছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অনুপম শোভা। অর্থাৎ তাঁর কাব্যে বহি:প্রকৃতির ('মাধ্বী যামিনী', 'মলয় সমীর', 'স্ফুটিত কুসুম', 'ললিতলতা', 'কোকিলকূজিত কুঞ্জ') প্রাধান্য লক্ষ্যণীয়; অন্যদিকে বিদ্যাপতির কাব্যে বাইরের জগৎ অপেক্ষা মানুষের হৃদয়ের চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে। জয়দেবের রচনায় রাধা-কৃষ্ণের ভোগ-বিলাসের ছবি ফুটে উঠেছে ; অন্যদিকে বিদ্যাপতির রচনায় রাধা-কৃষ্ণের পবিত্র প্রণয়-চিত্র এবং দু:খ-বেদনার চিত্র লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমের ভাষায়- "জয়দেব ভোগ; বিদ্যাপতি আকাঙ্ক্ষা ও স্মৃতি। জয়দেব সুখ, বিদ্যাপতি দু:খ। জয়দেব বসন্ত, বিদ্যাপতি বর্ষা।"[৩] বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন - জয়দেবের কবিতা ইন্দ্রিয়নির্ভর; অন্যদিকে বিদ্যাপতির কবিতা বিলাসশূন্য, ইন্দ্রিয়াতীত ও পবিত্র। কিন্তু বিদ্যাপতির 'মান' ও 'বয়:সন্ধি'-র পদগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, তাতে যথেষ্ট ইন্দ্রিয়ানুরাগের ছাপ রয়েছে। তবে তাঁর 'মাথুর' ও 'ভাব-সম্মিলন'-এর পদগুলো শুচিতা, পবিত্রতায় 'রুদ্রাক্ষমালা'-স্বরূপ।

উক্ত দুই শ্রেণির গীতিকবি ছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজি গীতিকবির (ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলী, কীটস্‌, বায়রন, প্রমুখ) অনুসরণে বর্তমানে তৃতীয় শ্রেণিভুক্ত আরেক শ্রেণির গীতিকবির উল্লেখ করেছেন। তাঁরা সভ্যতা-সংস্কৃতির বিচিত্র বিষয় থেকে কাব্য-কবিতার উপাদান সংগ্রহ করেছেন। সময় যত গড়িয়েছে অজানাকে জানার আগ্রহ যেমন বেড়েছে, জ্ঞানের পরিধি যেমন বিস্তৃত হয়েছে ; তেমনি তাঁদের রচনা 'বহুবিষয়িণী' হয়েছে। কিন্তু এতে আকার বৃদ্ধি পেলেও রচনার 'প্রগাঢ়তা' হ্রাস পেয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন - "বিদ্যাপতি প্রভৃতির কবিতার বিষয় সঙ্কীর্ণ, কিন্তু কবিত্ব প্রগাঢ় ; মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের কবিতার বিষয় বিস্তৃত, কিন্তু কবিত্ব তাদৃশ প্রগাঢ় নহে।... যে জল সঙ্কীর্ণ কূপে গভীর, তাহা তড়াগে ছড়াইলে আর গভীর থাকে না।" [৪] বঙ্কিমচন্দ্রের এই মতকে অবশ্য অনেকেই গ্রহণ করেননি। কেননা আধুনিককালের কবিদের চেয়ে প্রাচীনকালের সকল কবিই যে কবিত্ব গুণে শ্রেষ্ঠ - এমনটাও মানা যায় না। যেমন- বৈষ্ণব কবি মাধবদাস বা দেবকীনন্দনের চেয়ে মধুসূদনের কবিত্ব গুণ যে শ্রেষ্ঠ - এতে কোনো সংশয় নেই।

'শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা' বঙ্কিমচন্দ্রের অপর একটি বহুল চর্চিত তুলনামূলক রচনা। এখানে তিনি পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে দেশীয় সাহিত্যের তুলনা করেছেন। কেননা আলোচনার চরিত্র হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন, কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্‌' নাটকের নায়িকা শকুন্তলা এবং শেক্সপীয়রের 'Tempest' ও 'Othello' নাটকের নায়িকা যথাক্রমে মিরন্দা ও দেস্‌দিমোনাকে। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বঙ্কিমের আসল উদ্দেশ্য ছিল শকুন্তলা চরিত্রকে পরিস্ফুট করা। তাই তিনি শকুন্তলা চরিত্রকে মিরন্দা ও দেস্‌দিমোনা উভয়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র শকুন্তলাকে মিরন্দার সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে বলেছেন - (ক) শকুন্তলা ও মিরন্দা উভয়েই ঋষিকন্যা এবং ঋষিপালিতা। (খ) তাঁরা দুজনেই ঋষিকন্যা বলে অমানুষিক সাহায্যপ্রাপ্তা। (গ) তাঁরা উভয়েই সরলা এবং দৈহিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। দুজনের সৌন্দর্যকেই বনলতার সঙ্গে তুলনা করা যায়। আবার দুইয়ের মধ্যে অমিল স্বরূপ তিনি বলেছেন, শকুন্তলা সরলা হলেও অশিক্ষিতা নয়। তাঁর শিক্ষার চিহ্ন হল তাঁর লজ্জা। তাছাড়া সমাজপ্রদত্ত সকল সংস্কার শকুন্তলার মধ্যে আছে। তাই তাঁর প্রণয় লক্ষণ দ্বারা পরিস্ফুট হয়েছে। অন্যদিকে মিরন্দা এত বেশি সরলা যে, তাঁর মধ্যে কোনো সংস্কার ও লজ্জাবোধের চিহ্ন আমরা দেখতে পাইনা। তাই ফর্দিনন্দকে দেখা মাত্রই সে যেমন বলেছে - " I am your wife, if you will marry me;" [৫] তেমনি পিতার কাছেও ফর্দিনন্দের রূপের প্রশংসা করতে তাঁর একটুও বাঁধেনি।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র কেবল মিরন্দার সঙ্গে শকুন্তলার তুলনা করে তৃপ্ত হতে পারেননি। তিনি স্পষ্টতই বলেছেন, মিরন্দার সঙ্গে শকুন্তলার তুলনা করলে শকুন্তলা চরিত্রের কিছু অংশ বোঝা যায় কিন্তু বাকি অংশ ধোঁয়াশার মধ্যেই থেকে যায়। তাই সেই ধোঁয়াশাকে আলোর মধ্যে আনার জন্যই এরপর তিনি দেস্‌দিমোনার সঙ্গে

শকুন্তলার তুলনা করেছেন। আর তুলনা করতে গিয়ে তিনি দুজনের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য - এই উভয় দিকের উপরেই আলো ফেলেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন - (ক) শকুন্তলা ও দেস্‌দিমোনা উভয়েই গুরুজনদের অনুমতি ছাড়াই বীর পুরুষ দেখে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। (খ) তাঁরা উভয়েই শেষপর্যন্ত স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা হয়েছিলেন। (গ) শকুন্তলা ও দেস্‌দিমোনা উভয়েই সতী ও স্নেহশালিনী। তবে সতীত্বের দিক থেকে দেস্‌দিমোনা প্রশংসনীয়। কেননা তাঁর মধ্যে অগাধ স্বামী ভক্তি দেখা যায়। ধৈর্য ও আত্মবিশ্বাসই তাঁর জীবনে সব থেকে বড়। তাই স্বামী ওথেলো তাঁকে অপমান করলেও সে ইয়াগোকে অনুরোধ করে বলেছে - "Good friend, go to him; for, by this light of heaven, / I know not how I lost him. Here I kneel:"[৬] অন্যদিকে শকুন্তলার মধ্যে স্বামীভক্তি প্রগাঢ় হলেও কখনো-কখনো সে ক্রোধান্বিতা হয়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন - "স্বামিকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইলে শকুন্তলা দলিতফণা সর্পের ন্যায় মস্তক উন্নত করিয়া স্বামীকে ভৎর্সনা করিয়াছিলেন।"[৭]

আসলে ভরা রাজসভায় দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে যখন অপমান করেছেন, স্ত্রী হিসেবে যখন তাঁকে স্বীকৃতি দেননি, তখন তাঁর রাগ হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু রাগের পিছনে শকুন্তলার যে অভিমান মিশ্রিত ভালোবাসা ছিল, শকুন্তলার যে দু:খের বিস্তার তা বঙ্কিমচন্দ্র ততটা গুরুত্ব দেননি, যতটা গুরুত্ব দিয়েছেন দেস্‌দিমোনাকে। এর পিছনে অবশ্য কারণ রয়েছে। উপাখ্যান ও নাটকের মধ্যে পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেছেন - "ভারতবর্ষে যাহাকে নাটক বলে, ইউরোপে ঠিক তাহাকেই নাটক বলে না। উভয় দেশীয় নাটক দৃশ্যকাব্য বটে, কিন্তু ইউরোপীয় সমালোচকেরা নাটকার্থে আর একটু অধিক বুঝেন। তাঁহারা বলেন যে, এমন অনেক কাব্য আছে - যাহা দৃশ্যকাব্যের আকারে প্রণীত, অথচ প্রকৃত নাটক নহে।... সেক্সপীয়রের টেম্পেষ্ট এবং কালিদাসকৃত শকুন্তলা, সেই শ্রেণীর কাব্য, নাটকাকারে অত্যুৎকৃষ্ট উপাখ্যান কাব্য; কিন্তু নাটক নহে।"[৮] কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থে শকুন্তলা নাটক সম্পর্কে বলেছেন -" শকুন্তলার মতো এমন প্রশান্ত-গভীর, এমন সংযত-সম্পূর্ণ নাটক শেক্স্‌পীয়রের নাট্যাবলীর মধ্যে একখানিও নাই।"[৯] এখানেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের মতের পার্থক্য দেখা যায়। আসলে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয় আলংকারীকদের মতকে সমর্থন করেননি। তিনি পাশ্চাত্য সমালোচকদের মতকে গুরুত্ব দিয়ে 'শকুন্তলা'-কে 'উপাখ্যান কাব্য' বলেছেন আর 'Othello'-কে তিনি উৎকৃষ্ট নাটক বলেছেন। তাই শকুন্তলার চেয়ে দেস্‌দিমোনা চরিত্র বেশি উজ্জ্বল হয়েছে। এভাবে বঙ্কিমচন্দ্র মিরন্দা ও দেস্‌দিমোনার সঙ্গে শকুন্তলার তুলনা করে বলেছেন, শকুন্তলা হল এই দুজনের সম্মিলিত রূপ। অর্থাৎ তাঁর মধ্যে মিরন্দা ও দেস্‌দিমোনা দুজনের গুণই দেখা যায়। তিনি পরিণত শকুন্তলাকে দেস্‌দিমোনা আর অপরিণত শকুন্তলাকে মিরন্দার প্রতিরূপ বলে উল্লেখ করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের এরূপ আর একটি আলোচিত প্রবন্ধ হল 'উত্তরচরিত'। প্রবন্ধটি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ১২৭৯ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ থেকে আশ্বিন সংখ্যায় একটানা প্রকাশিত হয়। 'উত্তরচরিত' কাব্য-নাটকটির রচয়িতা হলেন ভবভূতি। ভবভূতি তাঁর নাটকের কাহিনি গ্রহণ করেছিলেন বাল্মীকি রামায়ণ থেকে। কিন্তু কোনো-কোনো স্থানে ভবভূতি মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। আর এই সূত্রেই বঙ্কিমচন্দ্র বাল্মীকির সঙ্গে ভবভূতির পারস্পরিক তুলনা করেছেন।

বাল্মীকি ও ভবভূতি - দুজনেই রামায়ণ কাহিনি নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি পরস্পর আলাদা। বাল্মীকি রামচন্দ্রকে কখনোই একেবারে নির্দোষ বা সর্বগুণ সমন্বিত করে অঙ্কন করেননি। অন্যদিকে ভবভূতির রাম কোমল প্রকৃতির। তাঁর চরিত্রে নানা দোষ-ত্রুটি রয়েছে - তার মধ্যে বালীবধ আর সীতা বিসর্জন সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় - "রামায়ণের রাম ক্ষত্রিয়, মহোজ্জ্বলকুলসম্ভূত, মহাতেজস্বী। তিনি পৌরাপবাদ শ্রবণে, হৃদ্বিদ্ধ সিংহের ন্যায় রোষে দু:খে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। ভবভূতির রামচন্দ্র তৎপরিবর্ত্তে স্ত্রীলোকের মত পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিলেন।"[১০] বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য এরজন্য কাল বা সময়ের প্রভাবের কথা বলেছেন। কেননা - বাল্মীকি যখন রামায়ণ রচনা করেন তখন আর্যজাতি ছিল বীরজাতি। তখন তাঁদের আধিপত্য বিস্তারের কাল। তাই বাল্মীকি রামায়ণের রাম মহাবীর, মহাতেজস্বী ও ধৈর্য-পরিপূর্ণ। অন্যদিকে ভবভূতির সমকালে ভারতবর্ষীয়েরা ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে উঠেছিল। তাই কোমলতা, অস্থিরতা, বীরত্ব ও ধৈর্যের অভাব ভবভূতির রাম চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে। ভবভূতির রামচন্দ্র শুধুমাত্র রাজকর্তব্যের কারণে প্রজাদের খুশি করার জন্য সীতাকে ত্যাগ করেছিল। দৃষ্টান্ত:

"স্নেহং দয়াং তথা সৌখ্যং যদি বা জানকীপমপি।
আরাধনায় লোকস্য মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা।।"[১১]

অর্থাৎ তিনি বলেছেন - সীতা তাঁর কাছে স্নেহ, দয়া কিংবা সুখ হলেও প্রজাদের খুশি করতে সীতাকে ত্যাগ করতেও তিনি পিছুপা হবেন না। বঙ্কিমচন্দ্র রাম চরিত্রের এই কোমলতা, ধৈর্যের অভাব এবং সীতার অপবাদ শুনে তাঁর বালিকাসুলভ কান্না দেখে তাঁকে 'কাপুরুষ' বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর কথায় - "উত্তরচরিতের প্রথমাঙ্কের রামবিলাপ মনোহর নহে। সে কথাগুলিন বীরবাক্য নহে - নবপ্রেমমুগ্ধ অসারবান্ যুবকের কথা।"[১২] তিনি শকুন্তলার জন্য দুষ্মন্তের কান্না, দেস্‌দিমোনার জন্য ওথেলোর ও 'ইউরিপিদিস' নাটকে আল্‌কেস্তিষের জন্য আদ্‌মিতসের কান্নার উল্লেখ করে রাম-বিলাপের ত্রুটি দেখিয়েছেন। আসলে কান্নার মধ্যেও যে আত্ম-সংযম দরকার, যে গভীরতা প্রয়োজন রাম চরিত্রে তা নেই। কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণের রাম সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি ভরা রাজসভায় সীতার অপবাদ শুনেও দুর্বল হয়ে পড়েননি। কারণ তিনি জানতেন সীতা শুদ্ধ ও পবিত্র। তবে রাজকুল অকীর্তির আশঙ্কায় তিনি সীতাকে

বিসর্জন দিয়েছিলেন। তাঁর স্পষ্ট স্বীকারোক্তি - "আমি রাজা শ্রীরামচন্দ্র ইক্ষ্বাকুবংশীয়, লোকে আমার মহিষীর অপবাদ করে। আমি এ অকীর্ত্তি সহিব না - যে স্ত্রীর লোকাপবাদ, আমি তাহাকে ত্যাগ করিব।"[১৩] অর্থাৎ অপবাদ ভীতিহেতু তিনি সীতাকে ত্যাগ করার দু:খ, কষ্ট সহ্য করে কেবল রাজধর্ম পালন করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র 'উত্তরচরিত' নাটকের প্রথম ও তৃতীয় অঙ্কের কার্যগত ত্রুটির কথা উল্লেখ করেছেন। পাশাপাশি নাটকের যে ত্রি-ঐক্য (কালগত, ঘটনাগত ও স্থানগত ঐক্য) রয়েছে, তাঁর মধ্যে 'উত্তরচরিত' নাটকে কালগত ঐক্য মানা হয়নি বলে তিনি জানিয়েছেন। কেননা - নাটকে ঘটনার যে বর্ণনা রয়েছে তার মধ্যে কালগত নৈকট্য নেই। নাটকের প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কের মধ্যে বারো বছরের ব্যবধান লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে তিনি শেক্সপীয়রের 'উইন্টর্স টেল' নাটকের সঙ্গে 'উত্তরচরিত'-এর মিল রয়েছে বলেছেন। 'উত্তরচরিত'-এর প্রথম অঙ্কে ছবি দেখার মাধ্যমে রাম ও সীতার দাম্পত্য প্রেম বর্ণিত হয়েছে। আবার নাটকের তৃতীয় অঙ্কেও দেখা যায়, পঞ্চবটী বনে এসে সীতার সঙ্গে বসবাসের নানান চিহ্ন দেখে রামের স্মৃতিতে সীতার প্রতি প্রেম ও স্নেহ জাগ্রত হয়েছে। নাট্য-ঘটনার এই পুনরাবৃত্তির কথা বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন এবং 'উত্তরচরিত' নাটকে ঘটনার পুনরাবৃত্তি জনিত ত্রুটির কথা বলেছেন।

আলোচনার অন্তিমে পৌঁছে তাই বলা যায়, বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের এই যে নতুন ঘরানা অর্থাৎ তুলনামূলক প্রবন্ধ রচনা করতে বসে বঙ্কিমচন্দ্র দেশ'জ ও পাশ্চাত্য উভয় বিষয়কেই সাদরে গ্রহণ করেছেন। পাশাপাশি আলোচনাকে সহজ ও সরস করার জন্য তিনি উপমার আশ্রয় নিয়েছেন। তাই একথা বলাই বাঞ্ছনীয় যে, বাংলা সাহিত্যে অন্যান্য দিকের ন্যায় তুলনামূলক প্রবন্ধ সাহিত্যেও পথিকৃৎ হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম চিরোজ্জ্বল হয়ে আছে এবং থাকবে।

তথ্যসূত্র:

১. রবীন্দ্র-রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড), বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড। কোলকাতা ১৭, অগ্রহায়ণ ১৪২১/ পৃ: ৫৩৩
২. বিশী, শ্রী প্রমথনাথ (সম্পাদনা), সাহিত্য-চিন্তা (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়), অমর সাহিত্য প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, চৈত্র ১৩৭৫ /পৃ: ৮০
৩. তদেব /পৃ: ৯১
৪. তদেব /পৃ: ৯২
৫. তদেব /পৃ: ৯৬
৬. তদেব /পৃ: ১০০
৭. তদেব /পৃ: ৯৯
৮. তদেব /পৃ: ১০১

৯. রবীন্দ্র-রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড। কোলকাতা ১৭, বৈশাখ ১৪২১/ পৃ:৭৩২
১০. বিশী, শ্রী প্রমথনাথ (সম্পাদনা), সাহিত্য-চিন্তা (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়), অমর সাহিত্য প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, চৈত্র ১৩৭৫ /পৃ: ৫৫
১১. তদেব /পৃ: ৫০
১২. তদেব /পৃ: ৫৭
১৩. তদেব /পৃ: ৫০

আকর গ্রন্থ:

১. বিশী, শ্রী প্রমথনাথ (সম্পাদনা), সাহিত্য-চিন্তা (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়), অমর সাহিত্য প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, চৈত্র ১৩৭৫ ।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন, বঙ্কিম-সৃষ্টি-সমীক্ষা, দে'জ পাবলিশিং, পুনর্মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৬, বৈশাখ ১৪২৩।
২. দে, ড: শ্রী অধীর, আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ধারা, সৃষ্টি প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ, চৈত্র ১৩৬৬ ।
৩. মিশ্র, ড: গোকুলানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ প্রবন্ধ': পর্যালোচনা, সাহিত্য সঙ্গী, প্রথম প্রকাশ, ১লা বৈশাখ, ১৪১৮/ ১৫ এপ্রিল, ২০১১
৪. সান্যাল, ভবানী গোপাল (সম্পাদনা), বঙ্কিমচন্দ্রের বিবিধ প্রবন্ধ, প্রজ্ঞা বিকাশ, পুনর্মুদ্রণ, এপ্রিল, ২০১২।
৫. পান, ড: প্রফুল্লকুমার, বাংলা গদ্যের প্রথম শিল্পীগোষ্ঠী, সাহিত্যলোক, কলকাতা-০৬,সেপ্টেম্বর, ২০১৪।

প্রাবন্ধিক সুচিত্রা ভট্টাচার্য

সুমিতা মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
সুন্দরবন অনিলকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়, হিঙ্গলগঞ্জ,
উত্তর চব্বিশ পরগনা

সুচিত্রা ভট্টাচার্য ছোটোগল্প ও উপন্যাস রচনাতেই স্বচ্ছন্দ। কিন্তু তিনি ভ্রমণকথাও লিখে গেছেন। লিখেছেন প্রবন্ধ; সমসাময়িক সমাজ জীবন সম্পৃক্ত নানা সমস্যা ও বিতর্কিত বিষয় নিয়ে। দায়বদ্ধতায় কোনোদিনও বিস্মৃত হননি তিনি। শতং বদ যা লিখ নীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন বিপরীত কোটির অবস্থানে শতং লিখ মা বদ। মুখের কথা তো বেশি মনের কাছে পৌঁছায় না। সহযেই তা বিস্মৃতির অন্তরালে চলে যায়। লিখিত বস্তু সে তুলনায় দীর্ঘস্থায়ী। অনেকের কাছেই তা সংগতকারণেই পৌঁছায়। অসুখ না প্রবৃত্তি বর্তমান সমাজে এক দুর্নিরোধ্য ব্যাধি সম্পর্কিত। মানুষ যতই সভ্য হচ্ছে বর্বরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা rationalityর তুলনায় animalityর প্রকাশ বেশি ঘটাচ্ছি। ধর্ষণ নিয়ে লেখিকা তাঁর দুশ্চিন্তাই প্রকাশ করেননি, সেখানে প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করেছেন। জীবজগতে মাতৃত্ব যেমন সহজাত প্রবৃত্তি, পুরুষদের ক্ষেত্রে ধর্ষণও কি তাই? লেখিকা এ বিষয়ে যথোচিত গবেষণার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। 'মুঠো যন্ত্রণার আক্কেল গুড়ুম' মোবাইলের দৃষ্টিকটু ব্যবহার সম্পর্কিত। এর ব্যবহারকারীরা যে নির্লজ্জতা শরিকদের স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা করে না তার বেশকিছু দৃষ্টান্ত উল্লিখিত। মোবাইলের অপ্রয়োগ সম্পর্কে লেখিকা তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করেছেন। সমাজজীবনকে কতখানি কলুষিত করছে মোবাইল, লেখিকাতাঁর নির্দিষ্ট দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। মোবাইল মাধ্যমে কচি কচি মগজগুলো যে মিথ্যাচারের রোগে আক্রান্ত হচেছে, লেখিকা সেজন্য তাঁর দুশ্চিন্তাকে প্রকাশিত করেছেন।

'ভাতের বদলে ভাতা' রচনাটির প্রতিপাদ্য গৃহাভ্যন্তরে যে রমণী গৃহকার্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখে তার উপযুক্ত পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে সরকার যে আইন প্রণয়নে ব্রতী, তার অবাস্তবতা প্রসঙ্গে লেখিকা তাঁর বাস্তববোধ সম্মত অভিমত জ্ঞাপন করেছেন। **'দিক শূন্য পুর'** স্মৃতিচারণমূলক রচনা। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের তিরোধানে তাঁর স্মৃতি তর্পণ। কিন্তু এই স্মৃতি তর্পণে একদিকে যেমন ব্যক্তি সুনীল জীবন্ত হয়ে উঠেছেন, তেমনি লেখক সুনীলের মুন্সীয়ানা, তাঁর বহুধা বিস্তৃত সৃজনশীলতার পরিচয় প্রদত্ত হয়েছে।

'শৈশবের পুজো পাঠনে' লেখিকা এখনকার থিম পূজার বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। শিল্পীদের শিল্পসৃষ্টির বৈচিত্র্যের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। প্রতিদিনই বদলে যাচ্ছে মায়ের মুখ। লেখিকার বক্তব্য, '...না প্রয়োজন ছিল কোনো থিমের, না লাগত বহিরঙ্গের

কোনো সাজসজ্জা। নিজেরাই মনে মনে মাকে গড়ে নিতাম যে।

'বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে' রচনায় লেখিকা আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে বহু সাহিত্য চর্চারও উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে এক শ্রেণির মানুষর মাতৃভাষার প্রতি চরম অবজ্ঞার বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। শেষপর্যন্ত লেখিকা বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের উজ্জ্বল সম্ভাবনার প্রতিই তাঁর বিশ্বাসের কথা অকপটে জানিয়েছেন।

'আধুনিকতার ত্বকের নীচে' রচনায় লেখিকা মূলত এই একবিংশ শতাব্দীতে মানুষের মনে কুসংস্কার বদ্ধমূল হয়ে আছে কেমন তার সদৃষ্টান্ত আলোচনা করেছেন। আসলে মানুষের মধ্যে শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে, কোথাও একটা যেন আদিমতার বীজ লুকিয়ে রয়েছে। যাকে যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে একে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা ভীষণ... ভীষণ কঠিন।

'দূরারোগ্য নিকেতনে' এই রাজ্যে এক শ্রেণির চিকিৎসকের চরম অমানবিক ও ব্যবসায়িক আচরণ সমালোচিত। **'সম্মান রক্ষার বড়ি দেশে দেশে নন্দিত খুন'** রচনাটিতে অনার কিলিং প্রসঙ্গটি আলোচিত। লেখিকা যথার্থভাবেই একে পুরুষতান্ত্রিকতার একপেশে আচরণ বলে মনে করেছেন। অনার কিলিং এর শিকার হতভাগ্য মেয়েরা। **'বুদ্ধিতে কুলুপ চেতনায় অন্ধকার'** রচনায় লেখিকা সলমন রুশদি এবং তসলিমা নাসরিনের সঙ্গে এ রাজ্যের সরকার যে বিমাতৃসুলভ আচরণ করে নিন্দিত হয়েছে।

'তিন ঘন্টায় বদলে যায় জীবন' কে কি বলব স্মৃতি তর্পণ না প্রতিপদী প্রতিবেদন। পুলিশ অফিসার তাপস চৌধুরী ঘৃণ্য রাজনীতির শিকার হলেন। তাঁর অকাল প্রয়াণে তাঁর সাজানো সংসার গেল তছনছ হয়ে। **'আদর্শের বুলি পকেটে গুলি'** লেখাটি তীব্র আক্রমণ ও শ্লেষে শানিত প্রতিবাদের বাঙ্ময় প্রকাশ। কলেজ ইউনিয়নের মাধ্যমেই নিকৃষ্ট মেধার ছাত্ররা অসদুপায় অবলম্বনে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, পরবর্তীতে যা অসদুপায় অবলম্বনকারী রাজনীতিবিদ উপহার দেয়।

'রইল বাকি একটি দিন' রচনায় লেখিকা অরাজনৈতিক নারী দিবস পালনের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। ফি বছর রাষ্ট্রসংঘ একটি করে থিম ঘোষণা করে। যেমন পারিবারিক তথা সামাজিক যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে মেয়েদের ভূমিকা যেন পুরুষের সমান হয়,কিন্তু আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস উদ্‌যাপন ব্যতিরেকে তিনশো পয়ষট্টি দিনই নারী যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই তার অবস্থান।

'অ-আ-ক-খ সিলেবাসে নেই' বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার করুণ চিত্র উপস্থাপিত। ২০০৯ সাল থেকে শিক্ষার অধিকার সাধন আইন দেশে দেশে চালু রয়েছে। যার অর্থ চোদ্দ বছর পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের শিক্ষা লাভ আবশ্যিক। যদি আর্থিক দিক দিয়ে এই বয়সের কেউ অক্ষম হয় রাষ্ট্র তার দায়িত্ব পালন করবে। স্কুল তৈরি হচ্ছে, শিক্ষক নিযুক্ত হচ্ছে, ছেলেমেয়েদের মিড ডে মিলের ব্যবস্থা হয়েছে। অন্যান্য সুযোগ সুবিধাও বাড়ছে। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীরা শিখছে কি কিছু? ভয়াবহ চিত্র লেখিকা তুলে ধরেছেন।

কারণ শেখাবার দায়িত্ব পালনে শিক্ষকদের অনীহা। তাই নিছক আইন করে শিক্ষার অধিকারকে মান্যতা দিলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। লেখিকা এর মূলে রাজনীতিকে দায়ী করেছেন সঠিকভাবে।

'ধর্মঘটে রাজি কাজের বেলায় পাজি' রচনায় বাঙালির কর্মবিমুখতা সমালোচিত। কী ডাক্তার কী সরকারি কর্মচারী, কী আদালত সর্বত্রই কর্মহীনতার প্রতিযোগিতা। লেখিকা এই কর্মবিমুখতাকে বাঙালির সংস্কারে পরিণত করার জন্য বামপন্থীদেরই দায়ী করেছেন।

'আইনের অন্ধকারে' রচনায় লেখিকা নারী নির্যাতন রোধে যে আইন বলবৎ রয়েছে তার উল্লেখ করে প্রশ্ন তুলেছেন নিছক এই আইনই কী যথেষ্ট যদি না অত্যাচারীর মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে। **'লোভের আমি লোভের তুমি তথ্যনিষ্ঠ রচনা'** মূলত সারদা গোষ্ঠীর সুদীপ্ত সেনকে উপজীব্য করলেও অন্যান্য চিট্ ফান্ডের প্রসঙ্গও এনেছেন। বিশেষত 'ভুয়ো কারবারের ইতিহাস' বর্ণনায় রীতিমতো এই ব্যবসার অতীত ইতিহাসকে এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশে এই ব্যবসার প্রবঞ্চনা উল্লিখিত রয়েছে। **'উদ্দালক অরুণি এখন অতীত'** রচনায় শিক্ষকদের কাছে ছাত্র-ছাত্রীদের নির্যাতিত হওয়া এমনকি প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার মতো মর্মান্তিক ঘটনার উল্লেখ করে বর্তমান শিক্ষককুল সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যের কথা বলা হয়েছে।

'অর্ধেক আকাশ অনেক অন্ধকার' নিবন্ধে লেখিকা পশ্চিমবঙ্গের সকল ক্ষেত্রে অধোগতির জন্য দুঃখবোধ করেছেন। কী রকম! নারী নির্যাতনে পশ্চিমবঙ্গ সারা ভারতে প্রথম, কিডন্যাপিং-এ ভারতসেরা, নারী ধর্ষণে তৃতীয়। এ সবের জন্য লেখিকা দায়ী করেছেন এ রাজ্যের কুৎসিত রাজনীতিকদের। 'পশ্চিমবঙ্গের মতো দলীয় রাজনীতির এমন সর্বগ্রাসী কুসংস্কৃতি অন্য কোনো রাজ্যেই বোধ হয় এত ব্যাপক নয়। দলীয় রাজনীতি, প্রশাসক তথা পুলিশ এবং অপরাধ জগৎ- এই তিন মিলে ভয়ংকর এক ত্রিভুজ এই রাজ্যে রচনা করেছে।

লেখিকার দাবি, 'রাজনীতি, প্রশাসন আর বিরোধীদের অশুভ আঁতাত বন্ধ হোক'।

মৃত্যুপুরী দেবভূমিতে আমাদের অবিমৃষ্যকারিতার কথা বলা হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মূল কারণ আমাদের অপরিণামদর্শিতা। প্রকৃতির উপর বলপ্রয়োগ। প্রকৃতিও মুখ বুজে সব সহ্য করে না। মাঝে মাঝেই সে তার প্রত্যুত্তর দেয়। তাতেই মানুষের জীবন সংশয় হয়। আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির বিপুল ক্ষতি হয়।

'গণতন্ত্রে দ্বিচারিতা' নিবন্ধে লেখিকার সামাজিক দায়বদ্ধতা তথা রাজনৈতিক মননের পরিচয় মেলে। নানা ঘটনার উল্লেখে তিনি দেখিয়েছেন সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে পুলিশের অন্যায় ও অমানবিক আচরণ। লেখিকার মন্তব্যটি স্মর্তব্য :

'রাষ্ট্রও কেন মৌলবাদীদের মতো আচরণ করবে। এত তো ধর্মে ধর্মে ঘৃণা আরও বাড়ে। মৌলবাদকে তোষণ যেমন অন্যায়, তেমনি ধর্মের অজুহাতে প্রতিটি

নাগরিকের প্রতি সমদৃষ্ট হতে না পারাও তো অন্যায়।'

'সুখের কথা মেলে না আর' রচনাটি ভিন্ন গোত্রের লেখিকা অনুসন্ধান করেছেন সুখের । সুখ কী অপ্রাপ্যনীয় কিংবা যত মানুষ শিক্ষিত হয় বিদ্বান হয়, ততই তার সুখ বিলীন হতে থাকে ? ভারতবর্ষে মানুষের অসুখের অন্যতম প্রধান কারণ হল অনৈতিকতা এবং অন্যায়ের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি। মানুষ একে মেনে নিতেও অপারগ আবার এই দুইয়ের বিরুদ্ধে প্রতিকারে তার অক্ষমতা।

'অন্য সুঃ ঘচাং ফু' রচনাটিতে আই. এ. এস এবং আই. পি. এস-দের করুণ অবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে। রাজনৈতিক প্রভুদের ইচ্ছাধীন এঁরা। নিরপেক্ষতা তাই চুলোর দোরে। রাজনৈতিক প্রভুদের তুষ্ট করতে না পারলে এইসব আধিকারিকদের গলা ধাক্কা খেতে হয় পদাবনতি ঘটে অথবা আত্মসম্মান রক্ষায় নিজেরাই চাকরি থেকে অবসর নিতে বাধ্য হন।

'টুকতে টুকতে টোডরমল' রচনাটির বিষয় পরীক্ষায় টোকাটুকি। কিছুটা পরিহাসের সুর থাকলেও ভবিষ্যতের দুর্ভাবনা গোপন থাকেনি। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিখুঁত শৈলীতে দলতন্ত্রের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে গেছিলেন অনিল বিশ্বাস। আজ তারই ফলশ্রুতিতে দেখা যাচ্ছে পরীক্ষাহলে অবাধ টোকাটুকি।

'র‍্যাগিং রস' রচনায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে র‍্যাগিংয়ের উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্তির মূলে পশ্চিমী অনুকরণকে দায়ী করেছেন লেখিকা। আইন হয়েছে র‍্যাগিং বন্ধে, তবু র‍্যাগিং বন্ধ হচ্ছে না। লেখিকা তাঁর মতো করে র‍্যাগিং বন্ধের দাওয়াই বাতলেছেন।

'রোমন্থনের নকশিকাঁথা' মূলত দুর্গাপূজাকে উপজীব্য করে লেখা। অতীতে দুর্গাপূজার সঙ্গে সম্পৃক্ত নানা কিছু বিষয় বর্তমানে অতীত। যেমন বিজয়ায় পোষ্টকার্ডে শুভবিজয়া জানান, কিংবা বিজয়া উপলক্ষ্যে বাড়িতে নানা লোভনীয় আহার্যের প্রস্তুতি। এখন এসব সুদূর অতীতের বিষয়।

'ছোটোগল্পের বড়ো দুঃখ' রচনাটির উপলক্ষ্য কানাডিয়ান মহিলা বিরাশি বছরের অ্যালিস মানসের ছোটোগল্প রচনায় উৎকর্ষ প্রদর্শনের জন্য নোবেল প্রাপ্তি। **'সংস্কারই পরিবহণ ব্যবস্থাকে চাঙ্গা করবে'** প্রতিবেদনটির সঙ্গে সাহিত্য সংস্কৃতির কোনো যোগ নেই। একান্ত সামাজিক মানুষ হিসাবেই লেখিকা বর্তমানের একটি জ্বলন্ত সমস্যাকে তুলে ধরেছেন। পেট্রল ডিজেলের দাম ঊর্ধ্বমুখী। তাই পরিবহণ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত যারা তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। যাত্রীর ভাড়া বাড়াতে সরকার অনিচ্ছুক। তাই পরিবহণ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত যারা তারা পরিবহণ ব্যবস্থা সচল করতে বদ্ধপরিকর। লেখিকা দু'পক্ষের মতামতকেই বিচার করেছেন। দু'পক্ষের বক্তব্যেই যুক্তি খুঁজে পেয়েছেন। তিনি একটি কার্যকরী পন্থা নির্দেশ করেছেন। যাত্রীভাড়া কিছু বৃদ্ধি করে পরিবহণ ব্যবস্থাকে চালু রাখার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন।

'গডম্যানদের কুকীর্তি' রচনাটিতে লেখিকা তথাকথিত ধর্মগুরুদের কেচ্ছা-কেলেংকারির বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। আর এদের এত বাড়বাড়ন্তের কারণ স্বরূপ

নির্দেশ করেছেন এদেশের মানুষের অন্ধ ধর্মবিশ্বাস ও কুসংস্কারকে। **'ষড়যন্ত্রের ভূত দেখেছন তিনি'** নিবন্ধে লেখিকা সরাসরি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে অভিযুক্ত করেছেন। যখনই কোনো অন্যায় অবিচারের ঘটনা ঘটে, খুন, ধর্ষণের মতো কুকীর্তির সংবাদ মেলে, তখনই মুখ্যমন্ত্রী তার পেছনে ষড়যন্ত্রের হাত দেখেন। নিরপেক্ষতা দেখাতে তিনি অক্ষম।পুলিশ প্রশাসনও মুখ্যমন্ত্রীরি তল্পীবাহক। তাই ত বিচারের বাণী নিরবে নিভৃতে কেঁদে চলেছে। **'সাধারণ মানুষ ঘরের কথাই তো ভাববে'**-তে লেখিকা পশ্চিমবঙ্গের অধোগতি নিয়ে তাঁর দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেছেন। শিক্ষা কিংবা স্বাস্থ্য অথবা নারী পাচার পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় অনেক উপরের দিকে।

'হ্যালো হ্যালো...ক্রস্ কানেকশন' লঘু ভাবের রচনা। টেলিফোনেও প্রথম দিকের কী অবস্থা ছিল তারপর তা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমানে কী অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে। টেলিফোনের মাধ্যমে অন্যের সঙ্গে প্রেমালাপ কিংবা অকারণে বিরক্ত করা, ক্রস্ কানেকশনের ঝকমারি সবকিছুই এসেছে। শেষপর্যন্ত ল্যাণ্ডলাইনের জন্য লেখিকার নস্টালজিক মানসিকতা লেখাটিতে ভিন্ন মাত্রা যুক্ত করেছে।

'এরা তো রোবট' ক্রিকেটারকে নিয়ে লেখা। মেয়েরা ক্রিকেটভক্ত যে কমল ভট্টাচার্য, পুস্পেন সরকার কিংবা প্রেমাংশু চ্যাটার্জীদের মতো ধারাবিবরণ দানকারীদের দৌলতে। লেখিকা সুদর্শন ক্রিকেটারদের নিয়ে নারী সমাজে উত্তেজনা, উদ্দীপনা এবং হৃদয় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার কথা হালকা চালে বলেছেন।

'প্রাণের শহর আছে প্রাণে' কলকাতাকে নিয়ে লেখা। কলকাতা বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। লেখিকার কলকাতাপ্রিয়তা ধরা পড়েছে তাঁর অকপট স্বীকারোক্তিতে 'আমি তো শহর কলকাতা ছেড়ে কোথাও গিয়ে বেশিদিন থাকতে পারি না। তা সে পাহাড় জঙ্গল সমুদ্রেই যাই, কী আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া। খুব মন কেমন করে শহরটার জন্য, খুব।' খুব শব্দটির প্রয়োগেই লেখাটা ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে।

'অর্ধেক আকাশের সঞ্চালিকা' মেয়েলি আড্ডা কেন্দ্রিক রচনা। লেখিকা মেয়েলি আড্ডার স্বাতন্ত্র্য জীবন্ত করে তুলেছেন। নানা ধরনের মেয়েদের নানা ধরনের আড্ডা। পুরুষদের আড্ডার সঙ্গে মেয়েলি আড্ডার স্বাতন্ত্র্য নিয়েও আলোকপাত করেছেন। লেখিকার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তির সমন্বয়ে লেখাটি ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে।

'ছেলে মেয়েতে বিভেদ মেয়েরাই তৈরি করে' শিরোনামে লেখাটা আসলে লেখিকার এক সাক্ষাৎকারের বিবরণ।

'ভক্ষকই যদি রক্ষক হয়' ধর্ষণকারী এবং ধর্ষিতা রমণীদের বিষয়ে সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেছেন— কোনো ধর্ষিতা যদি কোনো ধর্ষককে বিবাহ করতে চায়, তাহলে মেয়েটির ধর্ষককে মান্যতা দেওয়া প্রয়োজন। লেখিকা সঠিকভাবেই বলেছেন প্রধান বিচারপতির উদ্দেশ্য মহৎ হতে পারে কিন্তু বাস্তবে কোনো ধর্ষিতা রমণী কি স্বেচ্ছায় তার ধর্ষণকারীকে বিবাহ করতে সম্মত হবে? কেবল

পারস্পরিক শ্রদ্ধার উপরেই নির্ভর করে দাম্পত্য সাফল্য। এক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে সেই শ্রদ্ধাবোধ থাকবে তো?

'প্রতিবাদ করলে মরতে হবে, এটাই কী তবে শেষ কথা' নানা অন্যায় প্রতি মুহূর্তেই ঘটে চলেছে। এসবের বিরুদ্ধে কেউ প্রতিবাদ করলে লাভ করেছে প্রহার, এমনকি প্রতিবাদীর মৃত্যুও ঘটছে। প্রশ্ন উঠছে তাহলে কী অন্যায় দেখেও নীরবতা অবলম্বন করতে হবে? সকল সময় সেই পথেই অগ্রসর হচ্ছি। কেবল অন্যায়কারীদের উপযুক্ত দণ্ডবিধান হচ্ছেনা। পুলিশ প্রশাসন হয় রাজনৈতিক শাসকের অঙ্গুলি হেলনে চলে নতুবা বিত্তবানদের অর্থের প্রলোভনের শিকার তারা।

'বিদ্যাসাগর' তুলনামূলকভাবে দীর্ঘাকৃতির একটি প্রবন্ধ। বর্ণপরিচয়ের একশো পঞ্চাশ বছর, বিদ্যাসাগর ও সমাজচেতনা শীর্ষক আলোচনাচক্রে প্রদত্ত বক্তৃতা এটি। দস্তুর মতো এটি একটি গবেষণা নিবন্ধ। মূল বিষয় বর্ণপরিচয়। লেখিকা 'বর্ণপরিচয়'-এর পরিকল্পনা তার বিষয়বস্তু এবং বৈজ্ঞানিক উপস্থাপনা সম্পর্কে তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন। **"রবীন্দ্রনাথ"** বিশ্বভারতীতে লেখিকা প্রদত্ত বক্তৃতা। ছেলেবেলা থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয়, বড়ো হয়ে নতুন করে রবীন্দ্রনাথকে জানার আনন্দ লেখিকা প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্র কাব্য, ছোটোগল্প, উপন্যাস সম্পর্কে লেখিকার নিজস্ব মূল্যায়ন উপস্থাপিত।

"কনকলতা দাস" স্মৃতিচারণা মূলক রচনা। লেখিকা ইউনাইটেড মিশনারি গার্লস হাইস্কুলের ছাত্রী। এই স্কুলেরই প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন কনকলতা দাস। এঁর সুশিক্ষা ও ব্যক্তিত্ব লেখিকাকে পরিস্ফুট করেছেন। তাছাড়া স্মরণ করেছেন অন্যান্য শিক্ষিকাদেরও। লেখিকার স্কুলের প্রতি ভালোবাসা দিদিমণিদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ আমাদের মুগ্ধ করে।

"সৌন্দর্যও এখন ব্যবসা" দীর্ঘাকৃতির প্রবন্ধ। বলা চলে গবেষণা নিবন্ধ। নানা তথ্যে ঠাসা। এই প্রবন্ধে আমরা যেন অন্য এক সুচিত্রা ভট্টাচার্যকে পাই। বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতা থেকে শুরু করে ছেলে-মেয়েদের সৌন্দর্য চর্চার অতীত ইতিহাসের প্রসঙ্গও এসেছে, এমনকি বিশেষভাবে বাঙালির সৌন্দর্যচর্চাও আলোচনা থেকে বাদ পড়েনি। লেখিকার অনুসন্ধিৎসা এবং তথ্যনিষ্ঠা বাস্তবিকই আমাদের চমৎকৃত করে।

"বিনোদনের দুনিয়ায় বাঙালী" দীর্ঘাকৃতির আলোচনা। এই আলোচনায় লেখিকা বিনোদনের সবকটি ক্ষেত্রেই বাঙালি প্রতিভার ছবি ও ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। **"বাংলা সাহিত্য ও নতুন প্রজন্ম"** একটি মননশীল প্রবন্ধ। লেখিকা যথার্থই বলেছেন নতুন প্রজন্মকে বাদ দিয়ে সাহিত্য রচিত হয় না, হতে পারে না। প্রশ্ন হল নতুন প্রজন্ম বলতে আমরা কাকে বুঝব? বয়সে যারা তরুণ কেবল তারাই নতুন প্রজন্মের এমনটা নয়। বয়স নয় নতুন প্রজন্মের মানসিকতার প্রেক্ষিতে বিবেচিত হয়। দীর্ঘদিনের সংস্কারকে যে বা যারা যুক্তিনিষ্ঠ দৃষ্টিতে দেখে, বিচার করে, বিরোধিতা করে তারাই নবপ্রজন্মের। সেদিক দিয়ে আশি বছরের মানুষও নবপ্রজন্মের

হতে পারে। লেখিকা বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রোত্তর যুগের বিভিন্ন লেখার উল্লেখে নবপ্রজন্ম কেমনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তা উল্লেখ করেছেন।

"শিক্ষার হদ্দমুদ্দ" প্রবন্ধে লেখিকা বর্তমান শিক্ষার ব্যবস্থার গোড়ার গলদ কোথায় তার বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ দিয়েছেন। ছেলে-মেয়েরা কিছু না শিখেই একের পর এক ক্লাসে উঠে যাচ্ছে। শিক্ষক শিক্ষিকারা সরকারি নিয়মানুসারে সদা ব্যস্ত। **"হ্রদের দেশে, বরফের দেশে"** লেখিকার নিউজিল্যান্ড ভ্রমণের প্রাণবন্ত বর্ণনার আকর্ষণীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনায় লেখিকার সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে তাঁর রসসৃষ্টি এবং সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় মেলে।

"গেলেম নতুন দেশে" ভ্রমণ বৃত্তান্ত। অস্ট্রেলিয়ার সিডনি, মেলবোর্ন, ক্যানবেরা মাউন্টেন বেড়ানোর প্রাণবন্ত বিবরণ আকর্ষণীয়। লেখিকার যে দেখার চোখ ঠিক, বর্তমান বিবরণই তার প্রমাণ।

"অদ্বিতীয়র স্বচ্ছ উত্তর এবং স্মরণজিৎ ও সুচিত্রা ভট্টাচার্য" লেখা দুটি সাক্ষাৎকার ভিত্তিক। লেখিকা প্রশ্নকর্তাদের প্রশ্নের জবাবে একদিকে যেমন তাঁর ব্যক্তিগত জীবন, ভালোলাগা, মন্দলাগা, তাঁর জীবনদর্শন ইত্যাদি নিয়ে খোলামেলা বক্তব্য পেশ করেছেন অন্যদিকে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের, কথাও বলেছেন অকপটে। **"চুমু ঘিরে নানা ধমক-চমক"** এটি একটি লঘু রচনা। কৌতুক রস রচনাটির মূল কিন্তু সুচিত্রা ভট্টাচার্য তাঁর স্বাভাবিক প্রবণতা অবশ্য এক্ষেত্রে চুম্বনের প্রকারভেদ এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চুম্বনের প্রয়োগ ক্ষেত্রের বৈচিত্র্য নিয় সন্ধানী দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন।

"যা চলছে, সেটা খ্যাপামি" মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রেক্ষিতে এই রচনা। লেখিকা সংগত কারণেই বলেছেন জীবনের এই প্রথম বড়ো পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীসহ তাদের অভিভাবকদেরও কিন্তু স্নায়ুর টানটান উত্তেজনা থাকে। তাই এই পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে এত দুর্ভাবনা, দুশ্চিন্তা ও উত্তেজনা। কিন্তু এই পরীক্ষায় অসফল হলেই জীবন ব্যর্থ হওয়ার নয়। আরও পরীক্ষা আছে জীবনে। চেষ্টা সত্ত্বেও কৃতকার্য করায়ত্ত না হলে শিক্ষার্থী যেন ভেঙে না পড়ে এই মানসিকতা তৈরি করে দেওয়া প্রয়োজন।

"সুখ দুঃখের জীবন্ত দলিল" নবকুমার বসুর বৃহত্তম উপন্যাস 'চিরসখা'র গ্রন্থ সমালোচনা সীমিত পরিসরে লেখিকা গ্রন্থটির পরিচয় উপস্থাপিত করেছেন। **"পাশেই তো ছিলাম, ঋতু"** এক হৃদয়স্পর্শী রচনা, বিশেষত শেষ পঙ্‌ক্তিটি। ঋতুপর্ণের সঙ্গে লেখিকার পরিচয়, দহন চলচ্চিত্রের জন্য ঋতুপর্ণের লেখিকার সম্মতি যাচঞা দহনের সুবাদে দুজনের আত্মিক সম্পর্ক তৈরি, দহন উপন্যাস সম্পর্কে লেখিকার মূল্যায়ন, মানুষ এবং চলচ্চিত্রকার রূপে ঋতুপর্ণের স্বাতন্ত্র্য এ সবকিছুই স্বল্প পরিসরে আলোচিত হয়েছে।

"সেই লেজেণ্ডেই রয়ে গেলেন" উত্তমকুমারকে নিয়ে লেখা। লেখিকার প্রিয় নায়ক। উত্তমকুমার কেন বাঙালি হৃদয়ে আজও অদ্বিতীয় নায়কের আসনে অধিষ্ঠিত

লেখিকা তার কারণ অনুসন্ধান করেছেন। **“মেয়েদের অচেতনতা”** নিবন্ধে লেখিকা এতখানি এগিয়ে যাওয়া যুগেও ভারতবর্ষে নানা সময়ে নারী নির্যাতন, বধূ নিগ্রহ, কন্যাভ্রূণ হত্যা ইত্যাদির উপস্থিতিতে হতাশা প্রকাশ করেছেন।

“গৃহবধূদের অপরাধবোধ” এই নিবন্ধে লেখিকা পরপর কয়েকটি গল্প বলে গেছেন। গল্পগুলির মাধ্যমে বলতে চাওয়া হয়েছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অমর্যাদার স্থানটি কোথায়। নারী হল দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক। পুরুষ রোজগেরে। তাই তারই কদর। সংসারের নিয়ন্ত্রক। নারী ঘর-সংসার সামলায়। সে উপার্জন করে না। তাই সংসারে সে মূল্যহীন কিংবা দায় স্বরূপ। তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে নারী অপরাধবোধে ভোগে। **“পোশাক নিয়ে ফরমান”** রচনাটির সূচনায় নারীদের পোশাক সম্পর্কিত কয়েকটি কলেজের অধ্যক্ষের ফরমানের উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর লেখিকা বাঙালি মেয়েদের শাড়ির তুলনায় সালোয়ার কামিজ পরার প্রবণতা এবং তার কারণ বিশ্লেষণ করেছেন। **“উৎসবের একাল সেকাল”** দীর্ঘাকৃতির রচনা। সমস্ত রচনাটি নস্ট্যালজিক, লেখিকার সেকালের উৎসবের দিকে ঝোঁক। তখনকার উৎসবে ছিল প্রাণ। হ্যাঁ, হয়তো একালের মতো অত বৈভব ছিল না। ছিল না বৈচিত্র্য, কিন্তু আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলকে নিয়ে পূজার কদিন জমে উঠত। মানুষজন এখনকার মতো হৃদয়হীন ছিল না।

“লেখক যখন বিয়ের কনে” একটি আকর্ষণীয় রচনা। বেশ কয়েকজন বিখ্যাত মহিলা কবি সাহিত্যিকের বিবাহ সম্পর্কিত বিবরণ তথা তথ্যাদি পরিবেশিত হয়েছে।লেখিকা বলেছেন অধিকাংশ মহিলা কবি সাহিত্যিক আধুনিক বিবাহের পক্ষালম্বনকারী। লেখিকা এর কারণানুসন্ধান করেছেন। কোনো স্থির সিদ্ধান্তে অবশ্য উপনীত হননি। **“আমার চোখে সুন্দর পুরুষ”** স্বল্প দৈর্ঘ্যের রচনা। লেখিকার মতে রূপ হল আসলে হৃদয়ের সৌন্দর্য। তাঁর দৃষ্টিতে সুন্দর পুরুষ তিনিই যাঁর রয়েছে গভীর সংবেদনশীল মন, প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন যিনি, স্বল্পবাক, জ্ঞানী, রোমাণ্টিক, আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন এবং সৎ। লেখিকা তাঁর নির্বাচিত সুন্দর পুরুষদের যে তালিকা ধরিয়েছেন তাতে সর্বাগ্রে উল্লিখিত রয়েছেন বিদ্যাসাগর, তারপরে রবীন্দ্রনাথ। এছাড়া সুভাষচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ এমনকি সংগীত শিল্পী আমীর খান, খেলোয়াড় শচীন তেণ্ডুলকর, সৌরভ গাঙ্গুলি, সুনীল গাভাসকর, অমিতাভ বচ্চন এঁরাও বাদ যাননি।

“বিন্দুতে সিন্ধু” রচনাটির বক্তব্য লেখিকার ‘রবীন্দ্রনাথ’ শীর্ষক প্রবন্ধই ইতিপূর্বে পাওয়া গিয়েছে। **“অসমাপ্ত লেখা”** সুচিত্রা ভট্টাচার্য গল্প বলতে ভালোবাসেন। প্রবন্ধ নিবন্ধ রচনা করতে গিয়ে প্রায়শই তিনি গল্পের আশ্রয় নেন। এইসব গল্পে হয়তো সত্যনির্ভরতা থাকে। অসমাপ্ত লেখাটিও গল্পনির্ভর। দুই বাল্য বন্ধু নিজেদের বন্ধুত্বের সম্পর্ককে দৃঢ় করতে পারিবারিক সম্পর্ক তৈরিতে জোর দিয়ে ধারাবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী।

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের প্রবন্ধগুলিতে সমসাময়িক সমাজ জীবন সম্পৃক্ত ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা ও বিতর্কিত বিষয় আলোচিত হয়েছে। তাঁর প্রবন্ধগুলিতে বাংলা তথা বাংলার

সমাজ,সাহিত্য ও ক্রিড়াজগতের সমস্ত বিষয়ে অনুপুঙ্খ পর্যালোচনা করেছেন। তাঁর এই সমাজ সচেতন প্রবন্ধগুলির মাধ্যমেই প্রাবন্ধিক সুচিত্রা ভট্টাচার্যের সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা ও সমাজের নানান ঘুণধরা কুসংস্কারগুলোকে তিনি তাঁর তীক্ষ্ম লেখনীর মাধ্যমে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন সুন্দরভাবে। বাংলা ও বাঙালির স্বাভিমান, বাঙালির অস্তিত্ব সেটির প্রতি যেমন দৃষ্টিপাত করেছেন তেমনই শিক্ষার সংকটকেও দেখাতে ভুল করেননি। আসলে সুচিত্রা ভট্টাচার্যের চিন্তন বর্তমান তথা সমসাময়িক সমাজ ও দেশ-কালকে আশ্রয় করেই- তাই তো তিনি বর্তমান কালের প্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিক এবং আগামীতেও তাঁর প্রাসঙ্গিকতা থাকবে।

সহায়ক গ্রন্থ :

- বর্ণময় সুচিত্রা ভট্টাচার্যের কলমে সংকলিত রচনা অবলম্বনে আলোচিত,প্রকাশক- লালমাটি, ২০১৬।

শাক্তগানে নজরুল : ভিন্ন স্বাদের সন্ধানে

অপি হালদার
স্নাতকোত্তর, বাংলা বিভাগ,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

(১)

অগ্নিবীনার কবি নজরুলকে আমরা মূলত বিদ্রোহের, সাম্যবাদের ও সম্প্রীতির কবি বলেই জানি। জীবনের অধিক সময় দুঃখ ও নৈরাশ্যের মধ্যে কাটিয়েছিলেন ব'লে তাঁর গানগুলিতে আমরা প্রেম-বিষাদের সুর প্রতিনিয়ত শুনতে পাই। তবে এই নিবন্ধে কবির সেই বিদ্রোহ, প্রেম বা নৈরাশ্য নিয়ে আলোচনা করছি না। সাম্যবাদী ভাবধারার প্রভাবে কবি যে গীতিগুলি রচনা করে গেছেন, তার মধ্যে একটি বিশেষ পর্ব হল তাঁর হিন্দু দেব-দেবী নিয়ে রচিত গান। বিশেষত, শ্যাম ও শ্যামাকে নিয়ে লেখা নজরুলের শ্যামাসংগীতগুলির গ্রহণযোগ্যতা ও সাহিত্যিক তাৎপর্য কতখানি তা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবো এই নিবন্ধে। প্রখ্যাত সংগীত বিশেষজ্ঞ শম্ভুনাথ ঘোষ নজরুলের সংগীত সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, "ধর্মে তিনি উদার মতাবলম্বী ছিলেন বলে এই সকল সংগীতে পড়েছে বিভিন্ন ধর্মের প্রভাব। তাঁর নিজের ইসলাম ধর্ম ছাড়াও বৈষ্ণব ও শাক্ত ধর্মের প্রভাবেও তিনি প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। কারণ কবির জন্মস্থান চুরুলিয়া গ্রামটি সুফি ও বাউল ধর্ম প্রভাবিত স্থান। তাই কৈশোর থেকেই এ দুই মতবাদের প্রতি তিনি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন।"[১]

বিশ্বজুড়ে যখন রাম রহিমকে নিয়ে হানাহানি দলাদলি চলছে, তখন ইসলাম ধর্মাবলম্বী একজন কবি বঙ্গদেশের মাটিতে ব'সে কালীকীর্তন গাইছেন, এ অবিশ্বাস্য হলেও চরম সত্য। নজরুল মূলত বিদ্রোহী কবি হিসেবে পরিচিত হলেও স্বাধীনতা সংগ্রামী তথা প্রেমিক কবি নজরুলের কাছে শ্যামা হয়ে উঠেছিলেন স্বয়ং দেশমাতা। প্রতিবাদী কবিতা রচনা করতে করতে কবি কখন যে ভক্তিবাদী গান রচনা করতে শুরু করে দিলেন তা যেন তিনি নিজেই টের পেলেন না। তিনি যে কেবল হিন্দু দেব-দেবীদের নিয়ে গান লিখেছেন তা তো নয়; এত সংখ্যক ইসলামী গান রচনা করেছেন যা অন্য কোন মুসলমান কবিও করতে পারেননি। আবার, হিন্দু বা মুসলিম কোনো ধর্মের প্রতি তাঁর যে বিশেষ পক্ষপাতিত্ব ছিল এ কথাও বলা যায় না। আসলে নজরুল ছিলেন প্রকৃত সেক্যুলার কবি। কবি নিজেই নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন,- "যবন না আমি কাফের ভাবিয়া খুঁজি টিকি দাড়ি নাড়ি কাছা!"[২]

২৪৭ টির মতো শ্যামাসংগীত কাজী নজরুল ইসলাম সৃষ্টি করেছেন। ভক্তিবিহীন হয়ে কেবল বাহ্যজ্ঞান প্রকাশের তাড়নায় কবি এতগুলি সংগীত রচনা করে ফেললেন, এমনটা হওয়া কখনোই সম্ভব নয়। মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও হিন্দু দেব-দেবী বিশেষত মা

কালীর উপর তাঁর প্রগাঢ় ভক্তি ও আস্থা ছিল। বসন্ত রোগে কবির দ্বিতীয় পুত্র বুলবুলের অকালমৃত্যুর পর মানসিকভাবে দুর্বল কবি মুর্শিদাবাদের লালগোলা বিদ্যালয়ের হেডমাষ্টার বরদাচরণ মজুমদারের কাছে যান। বরদাচরণ ছিলেন তন্ত্রসাধক ও কালীভক্ত। তিনি যোগবলে কবির মৃত ছেলেকে দেখাতে পারবেন, একথা শোনা মাত্রই নজরুল তার দীক্ষা গ্রহণ করেন। নজরুল আদৌ যোগবলে পুত্রকে দেখতে পেয়েছিলেন কিনা তা জানা যায় না, তবে তিনি যে একজন প্রকৃত কালী সাধক হয়ে উঠেছিলেন তার প্রমাণ তাঁর শ্যামাসংগীতের অজস্র সম্ভার। প্রকৃত কালী ভক্ত ও সাধক হওয়ার জন্য নজরুল সাধক বামাক্ষ্যাপার কাছেও গিয়েছিলেন বলে শোনা যায়। তবে এ বিষয়ে মতান্তর রয়েছে। "শ্যামাসঙ্গীত রচনা করতে শুরু করেছিলেন নজরুল অন্ধ গায়ক কৃষ্ণ চন্দ্র দে'র অনুরোধে। ওই মহৎ শিল্পীর অনুপ্রেরণায় নজরুল সৃষ্টি করেছিলেন, 'আর লুকাবি কোথায় মা', 'আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায়' ইত্যাদি অপূর্ব শ্যামাসংগীত।"[৩]

(২)

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে সামন্ততন্ত্রের স্বতন্ত্র উদ্যমে শক্তিপূজার উদ্দীপনা অভূতপূর্ব ও ব্যাপক আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। কালী বিষয়ক প্রচলিত কাহিনি থেকে যেমন কালিকা কেন্দ্রিক ভক্তিসঙ্গীত সৃষ্টি হলো, উমা বিষয়ক থেকেও তেমনি আগমনী বিজয়া বিষয়ক গানের উদ্ভব হলো। শাক্তপদাবলীতে রামপ্রসাদ সেন শ্রেষ্ঠ আসনটি এমনভাবে দখল করে ব'সে আছেন যে তাঁর পাশে কমলাকান্ত একটু দাঁড়াবার জায়গা পেলেও দ্বিজরামপ্রসাদ, রাম বসু, কৃষ্ণচন্দ্র রায়, দাশরথি রায়, নন্দকুমার রায় প্রমুখ'রা ধারে কাছে আসতে পারলেন না। অথচ, মুসলমান হয়েও আধুনিক যুগে কাজী নজরুল ইসলাম যেসব শাক্তগীতিগুলি রচনা করেছেন তা শুধু তাঁর কবিতা রচনার দক্ষতা নয় ; পদমাধুর্য, ভক্তিমাধুর্যের বিচারেও মনোমুগ্ধকর। ঊনবিংশ শতক থেকে কাজী নজরুল ইসলাম ছাড়া আর কোন উল্লেখযোগ্য শাক্তপদকর্তার নাম পাওয়া যায়না। তবে রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের শাক্তগীতিগুলি যেমন আগমনী, বিজয়া, ভক্তের আকুতি এই পর্যায়গুলিতে বিভক্ত, তেমন কোন বিভাগ নজরুলের শ্যামাসংগীতগুলিতে পাওয়া না গেলেও প্রবল ভক্তিভাবের কোন অভাব কাজীসাহেবের গানগুলিতে তো নেই-ই, বরং ইসলাম ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর গানে যে ভক্তি, যে আকুতি ও আধ্যাত্মিকতা লক্ষ্য করা গেছে নজরুল পরবর্তী আধুনিক কোনো হিন্দু কবি'র রচনায়ও সেইরূপ ভক্তি-ভাবতন্ময়তা দেখা যায়না। রামপ্রসাদ সেন বলেছিলেন-

"হৃদি পদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আধার যাবে ছুটে
তখন ধরা তলে পড়বো লুটে, তারা বলে হব সারা।"[৪]

নজরুলের মুখে ও শুনতে পাই,

"যা কিছু মোর পুড়ে কবে, চিরতরে ভস্ম হবে
মার ললাটে আঁকব তিলক সেই ভস্ম বিভূতিতে।"[৫]

রামপ্রসাদ তারা তারা বলে ভক্তির অগাধ সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে চেয়েছেন, আর নজরুল নিজের সবকিছু পুড়িয়ে ভস্ম করে সেই ভস্ম দিয়ে শ্যামা মায়ের অঙ্গ সাজাতে চেয়েছেন। এখানে সবকিছু বলতে কবি কোনো বিষয়-সম্পত্তির কথা বলেননি, বলেছেন কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, ও মাৎসর্য, মানবদেহে থাকা এই ষড়রিপুর কথা।

আরেকজন প্রধান শাক্তপদকর্তা, কমলাকান্ত তাঁর একটি পদে বলেছেন,

"আদিভূতা সনাতনী শূন্যরূপা শশী ভালি
ব্রহ্মাণ্ড ছিলনা যখন মুন্ডমালা কোথা পেলি।"[৬]

নজরুলের লেখাতেও তেমনি মায়ের অসুরবিনাশী মূর্তিটি প্রকট হয়েছে।

"ওরে হতভাগী রক্তখাগী কোথায় ছিলি বল
তোর দেখে ছিরি ভয়ে মরি চোখে আসে জল।"[৭]

(৩)

শাক্তগানগুলিকে নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করলে এর কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। (ক) গীতিধর্মিতা (খ) বাউল তত্ত্ব ও দর্শন (গ) ভক্তের সঙ্গে আরাধ্যের নিবিড় সম্পর্ক (ঘ) তন্ত্রসাধনা ও যোগ (ঙ) কল্যানময়ী জগজ্জননীর রূপমাধুর্য ও লীলামাধুর্য বর্ণন (চ) বৈষ্ণবদর্শনের প্রভাব (ছ) ব্রহ্মে লীন হওয়ার বা মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা। নজরুলের শ্যামাসঙ্গীতগুলিতে শাক্তপদের এই বৈশিষ্ট্যসমূহ কতখানি মানা হয়েছে তা বিচার ও বিশ্লেষণ যোগ্য।

প্রথমত, নজরুলের শ্যামাবিষয়ক যা কিছু রচনা তা মূলত সংগীত। সংগীতে নজরুলের যে অসামান্য দক্ষতা তার নজির বিশ্ব সংগীত-জগতে দূর্লভ। চমৎকার গীতিধর্মিতার কারণে তাঁর বহু কবিতাও গানের মর্যাদা পেয়েছে। তিনি যে শ্যামাসংগীতগুলি রচনা করেছেন তা ভৈরবী, বাগেশ্রী, বেহাগ, সিন্ধু-কাফি, বারোয়া, কৌশি, মালকোষ, দেশ, যোগিয়া প্রভৃতি রাগ -রাগিনীতে নিহিত এবং দাদরা, ঝাঁপতাল, কার্ফা, তেওড়া প্রভৃতি তালে নিবদ্ধ। এছাড়া রামপ্রসাদী সুরেও তিনি শ্যামাসংগীত রচনা করেছেন।

"থির হয়ে তুই ব'স দেখি মা খানিক আমার আঁখির আগে,
দেখব নিত্য লীলাময়ী থির হলে তুই কেমন লাগে।"[৮]

দ্বিতীয়ত, একধরনের প্রহেলিকাপূর্ণ রচনার দ্বারা ধর্মীয় অনুভূতির কথা গোপন করে রাখা, বাউলধর্মের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য যা মধ্যযুগের শাক্তগানগুলির মধ্যে তো বটেই নজরুলের গানের কিছু কিছু ক্ষেত্রেও তা লক্ষনীয়।

"(তুই) সুরাসুরে ভুলিয়ে রাখিস ইন্দ্রত্বের মোহে
(ওমা) গুণের কিছু ঘাট নাই তোর, নির্গুন তাই কহে।"[৯]

তৃতীয়ত, মধ্যযুগের শাক্তপদকর্তাদের গানে যেমন তন্ত্রসাধনার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে নজরুলের গানে তেমনটি না থাকলেও বিন্দুমাত্র ভক্তির অভাব তাঁর মধ্যে ছিল না;

নইলে তাঁর মত মুসলমান কবির কলমে এই মহামূল্যবান শ্যামাসংগীতগুলি সৃষ্টি হতো না। কবি নিজেই বলেছেন,

"মাগো আমি তান্ত্রিক নই তন্ত্র-মন্ত্র জানি না মা,
আমার মন্ত্র যোগসাধনা, ডাকি শুধু শ্যামা শ্যামা।

....
শিশু যেমন অনায়াসে জননীরে ভালোবাসে
তেমনি সহজ সাধনা মোর, তাতেই পাবো তোর দেখা মা।"[১০]

চতুর্থত, ভক্তের সঙ্গে আরাধ্যের যে সম্পর্ক (পুত্র-মাতা) তাও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় এই গানের মধ্য দিয়ে। শাক্তগীতিগুলির ধর্মই হলো ভক্তের সঙ্গে আরাধ্যের অত্যন্ত নিবিড় বন্ধন।

পঞ্চমত, কাজী নজরুল ইসলাম একটি শ্যামাসঙ্গীতে কলম দিয়েছেন,

"মাগো কে তুই কার নন্দিনী ভ্রমর লয়ে মা করিস খেলা
তনুতে মা তোর সপ্তবর্ণ ইন্দ্রধনুর রঙের মেলা।
একি অপরূপ চিত্রকান্তি/ স্নিগ্ধ নয়নে একি প্রশান্তি
চিত্রভ্রমর মুঠো মুঠো নিয়ে আকাশে ছড়াস সারাটি বেলা।"[১১]

কেবলমাত্র এই একটি গানে নয় নজরুলের বহু গানেই শ্যামামায়ের রূপকান্তির বর্ণনা, লীলা ও গুণের বর্ণনা অতি সুন্দরভাবে ফুঁটিয়ে তুলেছেন কবি।

ষষ্ঠত, শাক্তদর্শনের সাথে বৈষ্ণবদর্শনের অনেক ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকলেও শাক্তগানগুলিতে বৈষ্ণবধর্মের কিছু প্রভাব ও পড়েছিল যার ফলশ্রুতিতে কালী ও কৃষ্ণকে একাত্ম করে দেখার রীতি রেওয়াজ ছিল। রামপ্রসাদ সেন যেমন কালী ও কৃষ্ণ কে একাকার করে দিয়েছিলেন, নজরুল ও তার অন্যথা করেননি।

রামপ্রসাদের লেখনীতে আমরা পাই,

"অসি ছেড়ে বাঁশী লয়ে, আর নয়নে চেয়ে,
গজমতি নাসায় দুলুক;
যশোদার সাজানো বেশে, অলকা আবৃত মুখে
অষ্ট নায়িকা, অষ্টসখী হোক।"[১২]

নজরুল ও বলছেন,

"আমার মা যে গোপাল-সুন্দরী
যেন এক বৃন্তে কৃষ্ণ-কলি অপরাজিতার মঞ্জরী
মা আধেক পুরুষ অর্ধ অঙ্গে নারী
আধেক কালি আধেক বংশীধারী।"[১৩]

সপ্তমত, অন্যতম শাক্তগান রচয়িতা নন্দকুমার রায় লিখেছিলেন-

"কবে সমাধি হবে শ্যামা চরণে।
অহং তত্ত্ব দূরে যাবে সংসার বাসনা সনে।"[১৪]

নজরুলের কণ্ঠে ও ভিন্ন সুরে, ভিন্ন ঢঙে ওই একই কথা গীত হয়েছে।

"মধু যে পায় শ্যামা পদে/ কাজ কিরে তার বিষয়ে মদে।
যুক্ত যে মন যোগমায়াতে/ ভাবনা কি তার রোগ ব্যাধিতে।"[১৫]

উভয় গানেই বাণীর অর্থ ও দার্শনিক তত্ত্ব একই। ক্ষুদ্র আমিত্ব দূরীভূত হলে হৃদয়ে সত্যের উন্মোচন ঘটে। নন্দকুমারের পদটিতে যেমন যোগসাধনার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে তেমনি নজরুলের মুখে বিষয়-বাসনা ত্যাগ ক'রে শ্যামা পদে মতি রাখা তথা জাগতিক মুক্তি লাভের আকাঙ্খার কথাই উচ্চারিত হয়েছে।

(৪)

"শ্যামা নামের লাগল আগুন আমার দেহ ধূপকাঠিতে
যত জ্বলি সুবাস তত ছড়িয়ে পড়ে চারিভিতে।
ভক্তি আমার ধুমের মতো, ঊর্ধ্বে ওঠে অবিরত
শিব লোকের দেব দেউলে মা'র শ্রীচরণ পরশিতে।"[১৬]

নজরুলের এই গানে ভক্তের সুনীল নিবিড় আকুতি এক অপরূপ ভক্তিতত্ত্বের সন্ধান দিয়েছে। অনুভূতির গভীরতায়, বিশ্বাসের একনিষ্ঠতায়, পাণ্ডিত্যের প্রখরতায় এবং রসবোধের ঔজ্জ্বল্যতায় সাংগীতিক পদসমূহটি এক অপরূপ দ্যুতি লাভ করেছে।

শাক্তপদাবলী মূলত উমা বিষয়ক ও শ্যামা বিষয়ক এই দুই ভাগে বিভক্ত। নজরুল শ্যামাবিষয়ক গান অধিক রচনা করলেও উমা বিষয়ক গান অল্প রচনা করেছেন। এর কারণ স্বরূপ বলা যায়, নজরুল ইসলাম শাক্তপদাবলীর কবি হওয়ার উদ্দেশ্যে শ্যামাসংগীতগুলি লিখতে বসেননি, লিখেছিলেন পুত্রের মৃত্যুজনিত কারণে আকস্মিকভাবেই কালীভক্তিতে, কালীনির্ভরতায় ও বিশ্বাসে। উমাবিষয়ক যে গানগুলি পাওয়া যায় তার মধ্যে- এলোরে শ্রী দুর্গা......, এলো শিবানী উমা এলো এলোকেশে......., এস আনন্দিতা ত্রিলোকবন্দিতা......, এসো মা দশভুজা......, ওমা দনুজ দলনি মহাশক্তি......., আনন্দরে আনন্দ/ দশ হাতে ওই দশ দিকে........, আদরিনী মোর কালো মেয়েরে কেমনে কোথায় রাখি........, প্রভৃতি কবির প্রতিভার সাক্ষর বহন করে চলেছে। এগুলিকে অনায়াসেই আগমনী পর্যায়ে রাখতেই পারি।

প্রকৃতপক্ষে, কাজী নজরুল ইসলাম এমন একজন কবি ছিলেন যাঁর সমগ্র জীবনকাহিনী ও রচনাসম্ভার পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, দুঃখভারাক্রান্ত কবির কণ্ঠে কেবল বিরহের সুর ধ্বনিত হয়নি। স্বাধীনতাকামী সোচ্চার কবি কেবল প্রতিবাদী কবিতাই রচনা করেননি। অত্যন্ত নিঁপুন দক্ষতার সাথে যেমন ইসলামী গান, গজল প্রভৃতি সৃষ্টি করেছেন; তেমনি হিন্দু না হয়েও হিন্দুধর্মে ভক্তি, আস্থা ও বিশ্বাস রেখে একের পর এক ভক্তিগীতি রচনা করে হিন্দুদের হৃদয়-আসনে চিরস্থায়ী স্থান করে নিতে

পেরেছেন। কলকাতা বেতারেও নজরুলের খ্যাতি ও অবদান কম ছিলনা। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে কলকাতা বেতার থেকে 'রক্তজবা' নামে একটি সঙ্গীতালেখ্য প্রচারিত হয়েছিল। তার মধ্যে সাতটি শ্যামাসংগীত ছিল নজরুল রচিত। সংগীত অধ্যক্ষ শম্ভুনাথ ঘোষ বলেছেন, "শ্যামাসংগীত রচনায় সাধক-গীতিকার নজরুলের যেন একটি সহজ স্ফূর্তি ছিল যা তাঁর প্রত্যেকটি গানকে করেছে একাধারে মর্মস্পর্শী এবং রসোত্তীর্ন। উপলব্ধির গভীরতায়, সহজ সাবলীল প্রকাশভঙ্গির বিশিষ্টতায়, প্রেম-ভক্তির স্বতঃস্ফূর্ততায়, সমর্পিত-হৃদয়ের ব্যাকুলতায় তাঁর ভক্তিগীতি গুলি সাধক রামপ্রসাদ কমলাকান্ত প্রভৃতির গানের মতই হয়েছে কালোত্তীর্ণ।"[১৭] শুধু কালী নয়, দুর্গা, শিব, লক্ষ্মী, নারায়ণ, রাধা-কৃষ্ণ প্রভৃতি দেবদেবী বিষয়ক সংগীতও তিনি রচনা করেছেন। তবে শাক্তগীতির লক্ষণ ও প্রকৃতি নজরুলের শ্যামাবিষয়ক গানগুলিতে যেভাবে প্রকট হয়েছে তা কেবল প্রশংসনীয়ই নয়, সেজন্য কাজী নজরল ইসলামকে আধুনিক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ শাক্তপদকর্তা বললেও অত্যুক্তি হয়না।

তথ্যসূত্র :

১) প্রশ্নোত্তরে নজরুল গীতি, শম্ভুনাথ ঘোষ, পৌষ ১৪০৩, দাস প্রেস, ৮৯ বি টি রোড, কলিকাতা- ২, (পৃষ্ঠা-২৩)

২) নজরুল রচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড, কার্তিক ১৪২৫, তৃতীয় মুদ্রণ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ, (পৃষ্ঠা-১২৮)

৩) নজরুল জীবনী, রফিকুল ইসলাম, ওরিয়েন্টাল মিডিয়া ফোরাম, প্রথম ভারতীয় সংস্করণ, জুন ২০১৬, ১১২/১ পার্ক স্ট্রিট, কোলকাতা- ১৭ (পৃষ্ঠা-৩৬৫)

৪) শাক্তপদাবলীর রূপরেখা, ড: হীরেন চট্টোপাধ্যায়, এস ব্যানার্জি এন্ড কোং, ৬ ডি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা- ০৯, পুনর্মুদ্রণ, বিশ্বকর্মা পূজা ১৪১১, (পৃষ্ঠা-২২৮)

৫) নজরুল গীতি (অখণ্ড), পুনর্মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১৮, হরফ প্রকাশনী, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা ০৭ (পৃষ্ঠা-৪৭৬)

৬) শাক্তপদাবলীর রূপরেখা, ড: হীরেন চট্টোপাধ্যায়, এস ব্যানার্জি এন্ড কোং, ৬ ডি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা- ০৯, পুনর্মুদ্রণ, বিশ্বকর্মা পূজা ১৪১১, (পৃষ্ঠা-২০৪)

৭) নজরুল গীতি (অখণ্ড), পুনর্মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১৮, হরফ প্রকাশনী, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা ০৭ (পৃষ্ঠা-৩৪৪)

৮) তদেব, (পৃষ্ঠা-৩৯৪)

৯) তদেব, (পৃষ্ঠা-৪৭১)

১০) তদেব, (পৃষ্ঠা-৪৪৮)

১১) তদেব, (পৃষ্ঠা-৪৪৮)

১২) শাক্তপদাবলীর রূপরেখা, ড: হীরেন চট্টোপাধ্যায়, এস ব্যানার্জি এন্ড কোং, ৬ ডি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা- ০৯, পুনর্মুদ্রণ, বিশ্বকর্মা পূজা ১৪১১, (পৃষ্ঠা-২৩২)
১৩) নজরুল গীতি (অখণ্ড), পুনর্মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১৮, হরফ প্রকাশনী, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা ০৭ (পৃষ্ঠা-৩১৩)
১৪) শাক্তপদাবলীর রূপরেখা, ড: হীরেন চট্টোপাধ্যায়, এস ব্যানার্জি এন্ড কোং, ৬ ডি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, পুনর্মুদ্রণ, বিশ্বকর্মা পূজা ১৪১১, (পৃষ্ঠা-২২৮)
১৫) নজরুল গীতি (অখণ্ড), পুনর্মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১৮, হরফ প্রকাশনী, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-০৭ (পৃষ্ঠা-৩১২)
১৬) তদেব, (পৃষ্ঠা-৪৭৬)
১৭) প্রশ্নোত্তরে নজরুল গীতি, শম্ভুনাথ ঘোষ, পৌষ ১৪০৩, দাস প্রেস, ৮৯ বি টি রোড, কলিকাতা-০২, (পৃষ্ঠা-২২)

অভিজ্ঞানশকুন্তলমের বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা

মধুমিতা জানা
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ,
মহিষাদল রাজ কলেজ

সারসংক্ষেপ : মানবিক মূল্যবোধ হচ্ছে সুশৃঙ্খল ও ন্যায় সমাজ গঠনের প্রাথমিক শর্ত। যে সমস্ত ভাবনা চিন্তা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মানুষের স্থায়ী বিশ্বাস, মানবিক আচরণ, ব্যবহার কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রন ও পরিচালিত করে তাই হল মানবিক মূল্যবোধ । সততা, শিষ্টাচার, বড়দের সম্মান করা, আর্তের সেবা করা, ভালো ব্যবহার, সহনশীলতা, ন্যায়পরায়নতা প্রভৃতি মানবিক মুল্যবোধের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারকে সুশৃঙ্খল ও উন্নত করার জন্য ধর্মীয় ও আদর্শগত ধারনার মাধ্যমে মানসিকভাবে একজন মানুষের মধ্যে মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। মূল্যবোধের বিভিন্ন বিষয়গুলোর মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর মাধ্যমে একজন ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত, ন্যায়-অন্যায় প্রভৃতি বিচার করতে শেখে। সংস্কৃত সাহিত্যে নাট্যকারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হলেন কালিদাস। কালিদাসের নাটকত্রয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নাটক অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্। কালিদাস সপ্তাঙ্ক বিশিষ্ট এই নাটকের সমগ্র অংশ জুড়ে আমাদের সাংসারিক জীবনে কোনটা করণীয় কোনটা করণীয় নয়, কোনটা সঠিক কোনটা সঠিক নয় এসমস্ত বিষয়ে সুন্দরভাবে আলোচিত হয়েছে। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকে মহর্ষি কণ্বের গুরুত্বপূর্ণ উক্তিগুলির মাধ্যমে নৈতিক মূল্যবোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এই নৈতিক মূল্যবোধবিষয়ক উক্তিগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও বাস্তবসম্মত। মহর্ষি কণ্বের বাস্তবসম্মত মূল্যবান উক্তিগুলি বর্তমান সমাজেও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত হয়। এমনকি কণ্বাশ্রমের তাপস-তাপসীদের জ্ঞানগর্ভ উক্তিগুলি অধুনাতনকালেও বাস্তবসম্মত বলে মনে হয়। মাতা মেনকার যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্ত দূরদর্শিতার পরিচয় প্রকাশ করে। শকুন্তলার দুই প্রিয়সখী অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা শকুন্তলার কষ্টের দিনে এবং খারাপ সময়ে চিন্তাভাবনা ও যুক্তিসম্মত উক্তিগুলি নৈতিকমূল্যবোধসম্মত। নাটকের মূল কেন্দ্রবিন্দু রাজা দুষ্যন্তের সংকটময় সময়ে শাস্ত্রসম্মত যুক্তিযুক্ত বিশ্লেষণগুলো নৈতিকতার অংশ বলে বিবেচিত হয়। রাজা দুষ্যন্তের নর্মসহচর হাস্যরসিক বিদূষকও সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে, নৈতিকতাসম্মত উচিত- অনুচিত জ্ঞান দান করেছেন। রাজা হিসাবে দুষ্যন্তের কার্যপদ্ধতি, দোষত্রুটি প্রভৃতি হাস্যরসিক বিদূষক হাস্যকর বচন ভঙ্গির মাধ্যমে যে যুক্তিগুলি তুলে ধরেছেন সেগুলি নৈতিকতাসম্মত। প্রাচীনকালে মানবিক মূল্যবোধকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে করা হত। ঋষিরা তাদের জীবনে কিছু মানবিক মূল্যবোধ অনুসরণ করত। ঋষিরা তাদের আচার আচরণের মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধ শিখিয়েছিলেন। অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকে নৈতিকতা মানুষ ও প্রকৃতির অসহিষ্ণু

সহাবস্থান প্রভৃতি বিষয়গুলি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। একজনকে তার কাজের দ্বারা সম্মান করা উচিত, তার পদবী দ্বারা নয়। ষষ্ঠাঙ্কে কালিদাস এক মৎস্যজীবির সততা নিয়ে প্রশংসা করেছেন। নৈতিকতার মূল বিষয়গুলির একটা হল সততা। প্রথমাঙ্কে বৈখানস মুনি রাজা দুষ্যন্তকে মনে করিয়ে দিয়েছেন – তাঁর অস্ত্র দুঃস্থদের সুরক্ষার জন্য নিরপরাধকে মারার জন্য নয়। দুর্বাসার অভিশাপের মাধ্যমে কালিদাস দেখিয়েছেন প্রত্যেক মানুষের প্রথমে সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা উচিত পরে ব্যক্তিগত চিন্তা। শকুন্তলাকে অভিশাপ প্রদানের মাধ্যমে কর্তব্যে অবহেলা হলে শাস্তি অবশ্যম্ভাবী এই বার্তা দিয়েছেন। অভিজ্ঞানশকুন্তলে মহাকবি কালিদাস নৈতিক মূল্যবোধের বিষয়টি অসাধারন সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। তাই নাটকটি আজও এত জনপ্রিয় হয়ে রয়েছে।

মূলশব্দ : মানবিক মূল্যবোধ, বর্তমানযুগ, অভিজ্ঞান শকুন্তলম্, নৈতিক।

নৈতিকমূল্যবোধ জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অভিজ্ঞানশকুন্তলে যে নৈতিক মূল্যবোধ কালিদাস বিবিধ উপমার সাহায্যে ফুটিয়ে তুলেছেন তা মানব সমাজে অত্যন্ত কার্যকরী। প্রাচীনকালে আশ্রমিক জীবনে নিয়মকানুনগুলো মেনে চলার মাধ্যমে নীতি আদর্শ প্রভৃতি বিষয়ে বোধবুদ্ধি গড়ে উঠত। মুনি ঋষিদের শ্রদ্ধা ভক্তির মাধ্যমে গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি গড়ে উঠত। তাই নাটকের চতুর্থাঙ্কে কালিদাস দেখিয়েছেন শকুন্তলা আশ্রমে অতিথি সেবার দায়িত্ব নিয়েছিল, কিন্তু দায়িত্বে থাকাকালীন সদ্য রাজধানীতে ফিরে যাওয়া রাজা দুষ্যন্তের চিন্তায় এতই বিভোর যে, সুলভকোপন মহর্ষি দুর্বাসা আশ্রমে আগমন উপলক্ষ্যে ''অয়মহং ভোঃ'' বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে নিজের উপস্থিতির কথা জানালেও আনমনা শকুন্তলা শুনতে পায়নি। এক্ষেত্রে শকুন্তলা তার কর্তব্যকর্মে যেহেতু অবহেলা করেছে তাই শাস্তিস্বরুপ তার জীবনে নেমে এসেছে তীব্র অভিশাপবানী। এখানে নাট্যকার দেখিয়েছেন প্রতিটি মানুষ যদি তার নিজ নিজ কর্তব্যকর্মে অবহেলা করে তাহলে তাদের জীবনেও এরকম হতে পারে। প্রত্যেকের সর্বপ্রথম সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা উচিত, তারপর ব্যক্তিগত চিন্তা করা উচিত। তাই কোনটি আগে করণীয় কোনটি পরে করণীয় এবিষয়ে জ্ঞান জন্মায়। কর্তব্যে অবহেলা করলে শাস্তি অবশ্যম্ভাবী এই বিষয়টি কালিদাস তাঁর মেঘদূতম্ কাব্যেও দেখিয়েছেন। কোন যক্ষ কুবেরের বাগান রক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্বে থাকাকালীন সদ্য বিবাহিতা পত্নী চিন্তায় এতই বিভোর যে হাতি এসে কখন বাগানের সবকিছু নষ্ট করে দিয়ে গেছে জানতেই পারল না। এরফলে শাস্তি স্বরূপ তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে একবছর দেখা করা যাবে না। এই শাস্তি বর্ষিত হয়েছিল।

পঞ্চমাঙ্কের শুরুতেই দেখা যায় শকুন্তলা রাজা দুষ্যন্তের রাজপ্রাসাদে স্ত্রীর দাবী নিয়ে গেলে রাজা দুষ্যন্ত দুর্বাসার অভিশাপের কারনে চিনতে না পেরে যথেষ্ট তিরস্কার করে। নৈতিকতার একটা মূল বিষয় হল সততা। এই সততার জয় অবশ্যম্ভাবী। তাইত

নানা ঘাত প্রতিঘাতের পর শকুন্তলার চারিত্রিক শুদ্ধতা ঘটিয়ে শেষ পর্যন্ত দুষ্যন্ত শকুন্তলার মিলন ঘটিয়ে সত্যের জয় ঘোষনা করেছে।

আশির্বাদ ও বরের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে এই বিষয়টি কালিদাস অভিজ্ঞানশকুন্তলমে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। স্বাভাবিকভাবে মনে হয় আশীর্বাদ ও বরের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কালিদাস এখানে দেখিয়েছেন আশির্বাদ ও বরের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আশির্বাদ করলে ফলতে পারে আর নাও ফলতে পারে কিন্তু কাউকে বর দান করলে অবশ্যই ফলবে। তবে মুনি, ঋষি ছাড়া সকলে বর দান করার অধিকারী হতে পারে না, আশীর্বাদ যে কেউ দান করতে পারে কিন্তু বর যে কেউ দান করতে পারে না।

সময়ানুবর্তিতা বিষয়টি অভিজ্ঞানশকুন্তলে স্পষ্ট। আশ্রমে নির্দিষ্ট সময়ে হোম এবং তৎসহযোগী কাজ থেকে বোঝা যায় সময় অনুযায়ী কাজ করতে হয় । এরফলে একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনধারণ সম্ভব হয় । পতিগৃহে যাবার সময় তাপসীদের জ্ঞানগর্ভ আশীর্বাণী বর্তমান দিনে বাস্তব সম্মত ও মূল্যবোধযুক্ত মনে হয় । দুই সখী অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার উক্তিগুলি থেকে অহিংসা বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট । শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রাকালে গাছেরা যে সমস্ত আভরণগুলো দান করেছিল তার থেকে মনে হয় গাছেদের আপত্যস্নেহে লালন পালন করলে তারাও প্রতিদান দিতে জানে । কৃতজ্ঞতাবোধ গাছেদের মধ্যেও প্রকট এবিষয়টি জানা যায় ।

প্রথমাঙ্কে দেখি, রাজা দুষ্যন্ত যখন আশ্রম হরিণকে বধ করতে উদ্যত এমন সময় ঋষি বৈখানস এসে নিষিদ্ধ করে জানালেন রাজার অস্ত্র দুঃস্থদের রক্ষা করার জন্য নিরপরাধকে মারার জন্য নয় । বন্যপশুসংরক্ষণ বিষয়টি প্রাচীনকাল থেকেই ছিল এবিষয়টি স্পষ্ট বোঝা যায় । আশ্রমিক পরিবেশে সম্মিলিতভাবে কাজ করার মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব গড়ে ওঠে । শুধু তাই নয় একসঙ্গে সকলে আশ্রমিক পরিবেশে থাকার মাধ্যমে সততা, উদারতা, পারস্পরিক আস্থা, সুস্থ সহযোগিতা এবং নৈতিক মূল্যবোধ প্রভৃতি গড়ে ওঠে ।

ভারতীয় সংস্কৃতির মূল শ্রদ্ধেয় ঋষিদের দ্বারা গঠিত ''বসুধেব কুটুম্বকম্'' এর নীতির চারপাশে আবর্তিত সমগ্র বিশ্বকে আমাদের নিজস্ব পরিবার হিসাবে বিবেচনা করা, যা নির্মল প্রেম, পরোপকার, দায়িত্বভাগ করে নেওয়া এবং সমস্ত প্রাণীর যত্ন নেওয়ার সার্বজনীনতাকে প্রতিফলিত করে । কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলে সবকিছুই রয়েছে । আশ্রমিক পরিবেশে দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার প্রেম নির্মল প্রেম হিসাবে পরিগণিত হয় । পরোপকার বিষয়টিও কালিদাস স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন । দুষ্যন্ত মৃগয়ায় এসে মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে অবস্থানকালে রাজধানী হস্তিনাপুর থেকে পুত্রপিন্ডপালন ব্রতানুষ্ঠানের রাজা দুষ্যন্তকে আমন্ত্রণ জানালে রাজা সুহৃদ বিদূষক মাধব্যকে তার প্রতিনিধি হিসাবে দুষ্যন্ত জানিয়েছে যে, মাতা তাকে চিরকালই পুত্রসম দেখে একথা শোনার পর এবং দুষ্যন্তের পূর্বরাগের মুহুর্ত বুঝতে পেরে মাধব্য পুত্রপিন্ডপালন

অনুষ্ঠানে যোগদান করে রাজার উপকার করেছে। আবার বিশেষ মুহুর্তে বিদূষককে রাজার ভুল ত্রূটি ধরিয়ে দিতেও দেখা যায়। কারন রাজা ভূল করলে তার সমালোচনা করার সাহস সাধারন মানুষের ছিল না । তাই নাট্যকার সুকৌশলে বিদূষক চরিত্রের উপস্থাপনা করে হাস্যকর উক্তির মাধ্যমে রাজার সমালোচনা করার জন্য বিদূষক তার হাস্য রসিক বচন ভঙ্গিকে যেভাবে বিষয়গুলো উপস্থাপন করে তাতে রাজার ক্রোধ সৃষ্টি করে না । বরং রাজা বুঝতে পারে তার কোনটা করণীয়, কোনটা করণীয় নয় । সেই আস্থা থেকে দুষ্যন্ত জটিল পরিস্থিতিতে বিদূষকের কাছে নিজের শকুন্তলার প্রতি আসক্তি ব্যক্ত করতে পেরেছে । দুষ্যন্তের মনে বিদূষকের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ছিল । সরলমনা বিদূষক সবসময় ভালো যুক্তি দেয় বলে ।

''যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি ....'' শ্লোকে মহর্ষি কণ্ব বুঝিয়েছেন ''স্নেহ পাপশঙ্কী'' অর্থাৎ স্নেহ অতি বিষমবস্তু । তাই বনবাসী এবং মহর্ষি হওয়া সত্ত্বেও শকুন্তলার প্রতি স্নেহবশতঃ চোখের জল সংবরণ করতে গিয়ে । কণ্ঠরোধ হচ্ছে । দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে । এসবকিছু থেকে মহর্ষি কণ্ব সাংসারী গৃহী পিতা মাতার কন্যার প্রথম বিচ্ছেদের কষ্ট উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন । কোনো বিষয়ে কষ্ট বোঝানো কখনো সম্ভব নয় । কষ্ট সবসময় উপলব্ধি করতে হয় । মানবিক মূল্যবোধ এই বিষয়গুলোকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে । ''পাতুঃ ন প্রথমং ব্যবস্যতি...'' শ্লোকে শকুন্তলা জলসেচন না করে জলপান না করা, নিজেকে সুন্দরভাবে সাজাতে ভালবাসলেও স্নেহ বশতঃ নতুন পল্লব ছিড়ত না । এসমস্ত বিষয় থেকে শকুন্তলার বৃক্ষ প্রেম এবং অরন্য সংরক্ষণ বিষয়টি প্রাচীনকাল থেকেই ছিল, এ বিষয়ে স্পষ্ট বোঝা যায়। সাংসারিক জীবনে কি করণীয় কি করণীয় নয় এই নৈতিক মূল্যবোধ মহর্ষি কণ্ব ''শুশ্রূষস্ব গুরুন্ ......'' শ্লোকে ব্যক্ত করেছেন । গুরুজনদের সেবা করা, সপত্নীদের সঙ্গে প্রিয়সখী সুলভ আচরণ, স্বামীর বিরূপ আচরণে রাগবশত বিরুদ্ধাচরণ না করা, পরিজনদের প্রতি দয়াদাক্ষিন্য দেখানো নিজের ভাগ্যে অহঙ্কার প্রকাশ না করা প্রভৃতি আচরণে সুগৃহিণীপদ লাভ করা যায় । এর বিপরীত আচরণ বংশের কলঙ্ক স্বরূপ । প্রত্যেকটি জ্ঞানগর্ভ উক্তিগুলি নৈতিক ও আদর্শ সম্মত । মহর্ষি কণ্বের এই জ্ঞানগর্ভবাণী বর্তমানকালেও বাস্তব সম্মত । এই নীতি ও আদর্শ মেনে চললে সংসারে সুখ শান্তি বজায় থাকে । মহর্ষি কণ্বের এই দূরদর্শী উক্তিগুলো যথাযথভাবে মেনে চললে সুগৃহিণী পদসহজে লাভ করা সম্ভব ।

''ন তাদৃশা আকৃতিবিশেষা গুণবিরোধিনো ভবন্তি'' প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দুই ধরনের প্রবৃত্তি থাকে। একটি হল দেবত্ব বা শুভ প্রবৃত্তি, অপরটি হল পশুত্ব বা অশুভ প্রবৃত্তি। বেশিরভাগ মানুষের মধ্যে পশুত্ব রূপটি উগ্রভাবে প্রকাশ পায়। তার ফলে মিথ্যাচার, ছলচাতুরী, শঠতা ও প্রবঞ্চনা প্রভৃতি অশুভ প্রবৃত্তি মানুষকে গ্রাস করে ফেলে। কিন্তু যেসব মানুষের প্রবৃত্তি হয় শুভ, তারমধ্যে নানা সদ্ গুনগুলি তাকে অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে। এছাড়াও সদ্ গুনগুলি বেশি পরিমাণে থাকার ফলে অসৎ

প্রবৃত্তিগুলি উগ্ররূপ ধারণ করতে পারে না। এই প্রবৃত্তি বা প্রকৃতির সঙ্গে আকৃতির একটি মিল আছে। যাদের আকৃতি সুন্দর তাদের প্রবৃত্তি সুন্দর হয়। সেই সুন্দর আকৃতির মানুষ অন্য সকলের হৃদয় জয় করে নেয় । তাই বলা হয় –

''প্রায়ো বিরূপাসু ভবন্তি দোষাং
যত্রাকৃতিস্তত্র গুনা বসন্তী ।''

এ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য কবি স্পেনসার (Spencer) মহোদয় বলেছেন –

''For all that fair is
Is by nature good.''

সাধারণত ধরা হয় রূপ যার অপরূপ সে অশেষ গুনের অধিকারী । এটাই জগতের চিরকালীন শাশ্বত ধর্ম ।

''যাত্যেকতোঅস্তশিখরং ...'' শ্লোকে তৎকালীন সময়ে সময় নির্ধারন পক্রিয়া যথেষ্ট যুক্তি সম্মত ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্মতও বলা যায় । মহর্ষি কণ্বের আদেশে জনৈক কণ্ব শিষ্যের সময় নির্ণয় করার সময় প্রভাতকালে অস্তাচলগামী চন্দ্র ও উদয়োম্মুখ সূর্যকে দেখে ব্যক্ত কথাগুলো তত্ত্বনির্ভর ছিল । সূর্য ও চন্দ্র এই দুই জ্যোতিষ্কের যুগপৎ উত্থান পতনের দ্বারা জগতের লোক আপন আপন অবস্থার উন্নতি ও অবনতি সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করতে পারে । এই সংসারে কেউই নিরবিচ্ছিন্ন সুখ বা দুঃখ ভোগ করে না । সুখ ও দুঃখ মিশিয়ে জীবন । মানুষের ভাগ্যচক্র সাইকেলের চাকার নীচের উপরে । উপরেরটা নীচে পর্যায়ক্রমে ওঠানামা করে তেমনি মানুষের জীবনে সুখ ও দুঃখ পর্যায়ক্রমে আসে ও যায় –

''নীচৈর্গচ্ছতি উপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ ।
চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ ।।'' (স্বপ্নবাসবদত্তম্/প্রথমাঙ্ক)

এটাই জগতের শাশ্বত নিয়ম মনে রেখে প্রত্যেকেরই সুখের দিনে অত্যধিক আনন্দোচ্ছাসে উৎফুল্ল হওয়া বা দুঃখের দিনে হতাশায় ভেঙে পড়া উচিত নয় – এই ধরনের নৈতিকজ্ঞান জন্মায় ।

যুগন্ধর নাট্যকার কালিদাসের প্রতিভা অপরিমেয় । কালিদাস মানবতাবাদী কবি । মানবিক নৈতিক মূল্যবোধকে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন বলেই কালিদাস পরবর্তী মানবসমাজে এতখানি গ্রহণীয় হয়ে থাকতে পেরেছেন । বিশ্বের প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ হল সংস্কৃতি । ভারতীয় সংস্কৃতির মূল শ্রদ্ধেয় ঋষিদের দ্বারা গঠিত **''বসুধেব কুটুম্বকম্''** এর নীতির চারপাশে আবর্তিত । পশু প্রকৃতি এবং মনের অশুভ প্রবণতা দূর করে মানুষের মধ্যে চেতনার ক্রমাগত পরিমার্জন এবং এর অভ্যন্তরীণ কেন্দ্রগুলিকে আলোকিত করার জন্য অভিজ্ঞান শকুন্তলে জ্ঞানগর্ভ নৈতিক উক্তিগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলে সততা, উদারতা, পারস্পরিক আস্থা, সহযোগিতা, নৈতিক মূল্যবোধ প্রভৃতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হওয়ায় নাটকটি শ্রেষ্ঠ নাটকে পরিণত হয়েছে।

উপসংহার – পরিশেষে বলা যায় নাট্যকার কালিদাস বিশ্বশ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞান শকুন্তলের সপ্তাঙ্কের উপমার সাহায্যে, যুক্তিনির্ভর উক্তির মাধ্যমে, চিত্তাকর্ষক কাহিনীর মধ্য দিয়ে নৈতিক মূল্যবোধের বিভিন্ন বিষয়গুলি ব্যক্ত করেছেন। যা জীবনে চলার পথে কাজে লাগবে। শুধু সংস্কৃত সাহিত্যে নয়, দেশ ও কালের ব্যবধান ছাড়িয়ে সমগ্র বিশ্বে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' চিরন্তন ও শাশ্বত হয়ে থাকবে।

সহায়ক গ্রন্থসূচী :

১। অভিজ্ঞান শকুন্তলম্, ড: অনিল চন্দ্র বসু, ২০০৫, সংস্কৃত বুক ডিপো ।

২। অভিজ্ঞান শকুন্তলম্, ড: সত্যনারায়ন চক্রবর্তী, ২০১০, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার ।

৩। কালিদাস রচনা সমগ্র, বসন্ত ভট্টাচার্য, ২০১২, সঞ্চিতা প্রকাশনী ।

৪। সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রেতিহাস, আচার্য রামচন্দ্র মিশ্র ২০১৩ খ্রীষ্টাব্দ, চৌখাম্বা বিদ্যাভবন

৫। স্বপ্নবাসবদত্তম্, শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৪১১, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার ।

৬। সংস্কৃতদিগ্‌দর্শিকা, চিত্রা ত্রিপাঠী, ২০১৩ খ্রীষ্টাব্দ, চৌখাম্বা বিদ্যাভবন ।

৭। সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের রূপরেখা, করুনাসিন্ধু দাস, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ, সংস্কৃত বুক ডিপো

৮। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, ড. দেব কুমার দাস, ১৪১২ বঙ্গাব্দ, কলিকাতা শ্রীবলরাম প্রকাশনী ।

৯। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, ড. গৌরীনাথ শাস্ত্রী, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ, সারস্বত লাইব্রেরী

১০। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, শ্রী পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, ১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দ, জয়দুর্গা লাইব্রেরী ।

১১। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০০০ খ্রীষ্টাবদ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ ।

১২। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, জাহ্নবী চরন ভৌমিক, ২০০৬ খ্রীষ্টাব্দ, কলিকাতা সংস্কৃত বুক ডিপো ।

১৩। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, আচার্য হংসরাজ অগ্রবাল, ২০০৭ খ্রীষ্টাব্দ, বারানসী, চৌখাম্বা সুরভারতী প্রকাশন ।

১৪। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, যুধিষ্ঠির গোপ, ২০০৭ খ্রীষ্টাব্দ, কলিকাতা সংস্কৃত বুক ডিপো ।

১৫। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, ড. বিজিত ঘোষ, ২০০৮, গ্রন্থতীর্থ ।

১৬। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, আচার্য লোকমনি দাহাল, ২০১১ খ্রীষ্টাব্দ, চৌখাম্বা কৃষ্ণদাস একাডেমি ।

১৭। সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা, ড. বিমান চন্দ্র ভট্টাচার্য, ২০০৬ খ্রীষ্টাব্দ, বুক ওয়ার্লক ।

আদিবাসী নৃতাত্ত্বিক নৈতিকতা : একটি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি

পিয়ালী ঘোষ
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, দর্শন বিভাগ,
মহাদেবানন্দ মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : ১৯৯৪ সাল থেকে জাতিসংঘের পক্ষ থেকে বিশ্বব্যাপী ৯ আগস্ট দিবসটি আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস হিসেবে পালন করে আসছে। এইবারও কিছু অন্যথা হয় নি। প্রসঙ্গ যখন আদিবাসী সভ্যতা তখন বিশেষভাবে উল্লেখ্য মানবজীবন বিবর্তনের পথ ধরে উত্তম পর্যায়ে উন্নীতোত্তর ধারাবাহিকতায় আজ একটি উন্নত সমাজজীবনে বসবাস করছে, আপেক্ষিকভাবে তা মনে হলেও তার যর্থাথতা নির্ণয়করণ বড়ই কঠিন। কারণ আমাদের সভ্যসমাজ তথাকথিত সামাজিক প্রোটোকল মানতে গিয়ে কতটা নৈতিকতার নীতি অনুসরণ করতে পারে তা যথেষ্ট সন্দেহের কিন্তু আদিবাসীদের জীবনশৈলীতে সহজাতভাবে নৈতিকতা এবং অনন্যাতা রয়েছে। কিন্তু সামাজিক বিভিন্ন উন্নয়ন ও প্রকল্পের কারণে প্রান্তিকরা ইতিমধ্যে নির্দ্বিধায় যখন আরও বিচ্ছিন্ন এবং শেষ পর্যন্ত তাদের অস্তিত্ব বিলুপ্তির পথে, তখন তাদের সমস্যাকে সর্বসন্মুখে তুলে ধরার জন্য দার্শনিক বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় এক নতুন চর্চার। জ্ঞানতাত্ত্বিকতার পরিসরের মধ্যে রেখেই জ্ঞানতাত্ত্বিক চর্চার মধ্যে আরও একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক (Epistemological) চর্চার প্রয়োজন অনুভব হয়। সেই জ্ঞানতাত্ত্বিক চর্চার নাম আদিবাসী জ্ঞানতাত্ত্বিক চর্চা বা Tribal Epistemology, যা আদিবাসীদের সমস্যাগুলিকে তুলে ধরে আদিবাসী দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হবে। গবেষণাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আদিবাসীদের সন্মুখিত সমস্যাগুলিকে তুলে তাদের কারণসমূহের মধ্যে ইণ্টারসেকশানালিটি অন্যতম কারণ, তা উল্লেখপুর্বক পরিবেশগত নৃতাত্ত্বিক নীতিতত্ত্বের মাধ্যমে সমাধানের চেস্টা করা হবে।

সংকেত লিপির সমাধান সূত্র :

আদিবাসী : একটি নির্দিষ্ট এলাকায় অণুপ্রবেশকারী বা দখলদার জনগোষ্ঠীর আগমনের পূর্বে যারা বসবাস করত এবং এখনও করছে, যাদের নিজস্ব পৃথক সংস্কৃতি, রীতিনীতি ও মূল্যবোধ রয়েছে,

প্রোটোকল : চুক্তির বা সন্ধির খসড়া,

জীবনশৈলী : জীবন যাপন করার ধরন,

জ্ঞানতাত্ত্বিকত : যে তত্ত্বে জ্ঞান, জ্ঞানের উৎস ও তার সীমা নিয়ে আলোচনা করে,

ফলিত নৃতাত্ত্বিকতা : কোন বিষয়বস্তুর ব্যবহারিক প্রয়োগ।

১৯৯৪ সাল থেকে জাতিসংঘের পক্ষ থেকে বিশ্বব্যাপী ৯ আগস্ট দিবসটি আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস হিসেবে পালন করে আসছে। এইবারও কিছু অন্যথা হয় নি। প্রায় সকল রাজ্যেই আনুষ্টানিকভাবে আদিবাসীদের শিল্প, ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে প্রাণবন্ততার সাথে উদযাপন করা হয়েছে। আদিবাসী জনগণ বলতে আমরা সাধারণত প্রথম জাতি, আদিম মানুষ, উপজাতি প্রভৃতিকেই বুঝে থাকি। কিন্তু আদিবাসী আর যাইহোক উপজাতি নয় এরা একটি বিশাল জাতি। কারন এরা কোন জাতির অংশ নয়। জাতিসংঘের বিভিন্ন গবেষনার পরও আদিবাসীদের কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা সম্ভব হয় নি, তথাপি নৃতাত্ত্বিক সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (এএসআই) এর মতো সংস্থাগুলির মানব জাতির উৎপত্তির মূল ইতিহাস কী? সেটি আলোচনা করতে গিয়ে আদিবাসীসে একটি সংজ্ঞা দেওয়া হয়, উপমহাদেশ এবং এর দ্বীপপুঞ্জে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শত শত আদিম উপজাতি গোষ্ঠীর একটি নির্দিষ্ট এলাকায় অনুপ্রবেশকারী জনগোষ্ঠীর আগমনের পূর্বে যারা বসবাস করত এবং এখনও করছে, যাদের নিজস্ব পৃথক সংস্কৃতি, রীতিনীতি ও মূল্যবোধ রয়েছে, যারা নিজেদের পৃথক সামাজিক সংস্কৃতির অংশ হিসেবে চিহ্নিত করে, তাদেরকেই আদিবাসী বলা হয়েছে। পাঁচটি মহাদেশের ৪০ টির বেশি দেশে বসবাসকারি প্রায় ৫,০০০ আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষের সংখ্যা প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ কোটি। যেমন- কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ভারত, চীন, পাপুয়া নিউগিনি এবং অধিকাংশ লাতিন আমেরিকার দেশসমূহের একটা বড় অংশই আদিবাসী। ভারতের যেসমস্ত জাতিগুলিকে আমরা আদিবাসী বলে মনে করি তারা যেমন দলিত, জারোয়া, সাঁওতাল, উরাও, মাহাতো, বড়াইক, কুর্মি, সিং, পাহান, মাহালি ইত্যাদি জাতি সমুদয়। এদের জীবনশৈলীতে সহজাতভাবেই নৈতিক এবং অনন্যাতার ছোয়া রয়েছে।

আমাদের সভ্যসমাজ তথাকথিত সামাজিক প্রোটোকল মানতে গিয়ে কতটা নৈতিকতার নীতি অনুসরণ করতে পারে যথেষ্ট সন্দেহের কিন্তু আদিবাসীদের জীবনশৈলীতে সহজাতভাবে নৈতিক এবং অনন্যাতা রয়েছে। কিন্তু সামাজিক বিভিন্ন উন্নয়ন ও প্রকল্পের উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে প্রান্তিকরা নির্দ্বিধায় যখন আরও বিচ্ছিন্ন এবং শেষ পর্যন্ত তাদের অস্তিত্ব বিলুপ্তির পথে, তখন তাদের সমস্যাকে সর্বসন্মুখে তুলে ধরার জন্য দার্শনিক বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। আমরা জানি আদিবাসিদের জীবনে রয়েছে এক নির্মল প্রাকৃতিকতার ছোঁয়া। শহরের কোলাহলে তাদের নিদ্রা ভঙ্গ হয় না। পাখির ডাকের সুমধুরে প্রভাত সুমধুরিত হয়। আদিবাসিদের পৃথক কোন ধর্ম নেই, বৃক্ষ বা সূর্য অর্থাৎ প্রকৃতি আরাধনাই তাদের জীবনশৈলীর অঙ্গ। জৈব সজ্জি আহার, তারা মাছ, কাঁকড়া, শূকর, পাখির মাংস পছন্দ করেন। আদিবাসিরা তেল মশলা ছাড়া নিজস্ব কায়দায় রান্না করা বিভিন্ন সেদ্ধ সজ্জি ঐতিহ্যভাবে রান্নার প্রচলন রয়েছে। নিজেদের হস্তে শুকনো পাতা, বাঁশ দিয়ে নির্মিত বাড়ীতেই আদিবাসীদের বাস। এখনো আধিকাংশ আদিবাসিরা উলঙ্গভাবেই জীবন যাপনে অভ্যস্ত। শরীরে কিছু গয়না থাকে। আদিবাসী নারীরা ঠোঁটের কাটা স্থানে বড় বড় চাকার গহনা পরেন। আদিবাসীদের

জীবন ও জীবিকা লক্ষ্য করলে দেখা যায় তাদের জীবনশৈলী সহজাতভাবে নৈতিক এবং অনন্য, যা আধুনিক মানব সভ্য সমাজে নগর গঠন ও নগর উন্নয়নের ক্ষেত্রে একদমই মানা হয় না। সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি আধুনিক মানব সভ্যতার সমাজজীবন থেকে আদিবাসীদের জীবন অনেক বেশি নৈতিক ও বাস্তুতন্ত্রে পুষ্ট। সভ্যতার ও উন্নয়নের লালসা আমাদের অনৈতিক করে তুলেছে।

সামাজিক বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প যেমন- বহুমুখী বিদ্যুৎ পরিকল্পনা, জলপ্রকল্প, খনির উদ্যোগ, সুপরিবহন ব্যবস্থা, নেটওয়ারকিং ইত্যাদি নির্দ্বিধায় ইতিমধ্যে প্রান্তিকদের আরও বিচ্ছিন্ন এবং শেষ পর্যন্ত অস্তিত্ব বিলুপ্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এমনকি যেখানে এর পরামর্শ চাওয়া হয়, সেখানে সরকার ও রাজনীতিবিদরা এর সুপারিশ অনুসরণ করেন না। উদাহরণস্বরূপ, ASI-এর পরামর্শের বিরুদ্ধে আন্দামানে আদিম জারোয়াদের সাথে সামাজিক যোগাযোগ শুরু হয়েছিল। ১৯৭৪ সালে নিয়ন্ত্রিতভাবে এই যোগাযোগ শুরু হয়েছিল প্রাথমিক পরিকাঠামোগত প্রয়োজনীয়তার পূরণের উদ্দেশ্যে যেমন – খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য ইত্যাদি। কিন্তু তাদের নির্জনবাস ধীরে ধীরে রাজনৈতিক নেতাদের প্রচারের ও ভ্রমণের স্থানে রূপান্তিত করা হয়। প্রাথমিক পরিকাঠামোগত প্রয়োজনীয়তায় আদিবাসী সম্প্রদায় এমন জীবন যাপনে অভ্যস্ত হতে শুরু করে, যার ফলস্বরূপ তারা প্রায়শই দ্বীপগুলির জলে দীর্ঘ সাঁতার কেটে খাদ্য অণেম্বণ করতেও শুরু করেছিল, এইসব অভিযান ডাকাতি ও সহিংসতার অঘটনা ঘটাতে শুরু করেছিল যাতে তারা তাদের নির্জন বাসে ও স্বাভাবিক সামাজিকীকরণে সুরক্ষিত রইল না, তাতে তাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও গোপনীয়তাকে আমরা আর্ন্তঃজাতিক ব্যবসায়িক স্থলে পরিণত করতে প্রচেষ্ট হচ্ছি। তাঁদের দুর্বল ভেবে এইসবে সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে অর্থ উপার্জন করার চেষ্টা চালাচ্ছি। আমরা শিক্ষিত ও সভ্যসমাজের মানব জাতি হয়েও এরকম ব্যবহার করতে পিছু পা হই না। যা নৃবিজ্ঞানীদের দ্বারা বিশ্বব্যাপী সমালোচিত হয়েছিল। আমরা আদিবাসিদের সমস্যার কথা যেমন তা কাঠামোগত হতে পারে, সভ্যতার নিরীক্ষে হতে পারে, অর্থনৈতিক ইত্যাদি হতে পারে, যা আমরা তথাকথিত সভ্য মানব জাতিপৃথকভাবে বোঝার বুঝতে চেষ্টা করছি না বা বুঝতে পারছি না।

আমরা তথাকথিত সভ্য মানব সমাজ পৃথকভাবে বুঝতে না পারার কারণ রয়েছে। কারণ স্থান, কাল ও পরিপ্রেক্ষিতানুযায়ী আদিবাসীরা ও আধুনিক সভ্যদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এখন স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসবে, পরিপ্রেক্ষিতগুলি কী কী হতে পারে ? পরিপ্রেক্ষিত সাধারণত সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, স্থান, কাল, লিঙ্গ ও পরিস্থিতি ভেদে নির্ধারিত হয়ে থাকে। সমাজে একজন অধিবাসি যে সমস্যার তা যেমন একজন সমাজে বসবাসকারী জাতি বা উপজাতি গোষ্ঠী সামাজিক অবস্থানের নির্ভর করে, তেমনি এই সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের উপর আমাদের জ্ঞান উৎপত্তির ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনও করে। এখন প্রশ্ন হল আদিবাসির অস্তিত্বের লড়াই অবলুপ্তির পথে নৈতিকভাবে কী আমরা দায়ী নই? এখান

থেকেই চলে আসে TRIBAL ETHICS বা আদিবাসী নৈতিকতার প্রসঙ্গ। কিন্তু আদিবাসী নৈতিকতার আলোচনায় দাশনিক সমস্যাটি কোথায়? এর উত্তর দিতে গিয়ে আমরা যদি পাশ্চাত্য দর্শনের চিরচারিত জ্ঞানতাত্ত্বিক চর্চার উল্লেখ করতে পারি।

প্রসঙ্গত আমরা দর্শনের জ্ঞানতত্ত্বের উল্লেখ করে বিষয়টি বোঝাতে পারি। চিরচারিত জ্ঞানতত্ত্বানুযায়ী, "S knows that P" অর্থাৎ S , P কে জানে। কিন্তু **S** যে P কে জানে সেগুলি কতগুলি শর্তের উপর নির্ভর করবে। শর্তগুলি হল 1. P কে সত্য হতে হবে, 2. P যে সত্য সেই বিষয়ে **S** এর বিশ্বাস থাকতে হবে, এবং 3. P যে সত্য এই বিষয়ে **S** এর যে বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসের সমর্থনে কিছু যুক্তি থাকবে। সর্ম্পূণটাই বিষয়ভিত্তিক। যার ফলবশতঃ আমাদের জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। এখানে "S knows that P" এর S কে আলাদা করে বিচার করা হয় নি অর্থাৎ **S** এর জায়গায় যে কেউ বসতে পারে। যেমন- আদিবাসী সভ্য, বর্বর জাতি, আধুনিক সভ্য, সাধারণ মানুষ, রাম, রহিম, সীতা, গীতা, যদু ইত্যাদি এবং যেই বসুক না কেন সকলেরই একই পদ্ধতিতে জ্ঞানের উৎপত্তি হবে। প্রসঙ্গত আসি একজন চৌর্যকারী একটি তালাকে চুরির বাঁধার অভিপ্রায় হিসাবে দেখবে। কিন্তু তালাটির অধিকারী ব্যক্তি সেই তালাটিকে প্রতিরক্ষার অভিপ্রায়ে দেখবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে তালাটি এক থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তিভেদে দৃষ্টিকোণ পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। কারণ পরিস্থিতি ভেদে **S** এর জায়গায় যে কেউ বসতে পারে। আরও বিস্তারিত ভাবে বলা এই পরিপ্রেক্ষিতে আদিবাসীর ন্যয্যাধিকারের দাবীর ক্ষেত্রে চিরচারিত জ্ঞানতাত্ত্বিক চর্চার ব্যর্থতা লক্ষ্য করা যায়, কারণ "S knows that P" এর **S** জায়গাটি পরিবর্তন যোগ্য হওয়ায় জাতি বা ব্যক্তিভেদে "S knows that P" কখনও এক বা সমান হবে না।

স্থান, কাল ও পরিপ্রেক্ষিতানুযায়ী আদিবাসীরা ও আধুনিক সভ্যদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকায় আদিবাসীদের তুলনায় সভ্য মানব সমাজ যারা কতকগুলি স্তরের মাধ্যমে আদিম মানব থেকে আধুনিক সভ্যতে রূপান্তরিত হয়েছে তাদের ক্রিয়াকে যুক্তিপুর্ণ বলবে এবং স্থান, কাল ও পরিপ্রেক্ষিতানুযায়ী উভয়ের জ্ঞান কখনও এক হবে না। এই জ্ঞানতাত্ত্বিক চর্চা সম্পূর্ণ P বস্তু কেন্দ্রিক হওয়ায় স্থান, কাল, পরিস্থিতি, জ্ঞাতা ভেদে P এর জ্ঞান পরিবর্তিত হচ্ছে সুতরাং আমাদের একটি নতুন জ্ঞানতাত্ত্বিক চর্চার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। তাই আমাদের আলোচনার পরিসরকে জ্ঞানতাত্ত্বিকতার মধ্যে রেখেই জ্ঞানতাত্ত্বিক চর্চার মধ্যে আরও একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক(Epistemological) চর্চার প্রয়োজন অনুভব হচ্ছে সেই জ্ঞানতাত্ত্বিক চর্চার নাম আদিবাসী জ্ঞানতাত্ত্বিক চর্চা বা Tribal Epistemology, যা আদিবাসী সমস্যাগুলিকে তুলে ধরে আদিবাসী দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যা সমাধানের সচেষ্ট হবে।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠবে আলাদা করে Tribal Epistemology কেন ? বিভিন্ন জাতীয় নীতি, আন্তঃ র্জাতিক নীতি, জাতিসংঘ তো রয়েছে এদের সমস্যাকে নিয়ে আলচনা করার। উত্তরে বলতে হবে না উপরিউক্ত মাধ্যম যদি সত্যি তৎপর

থাকত আদিবাসী সমস্যাকে সমাধানে তাহলে আদিবাসিদের দমন নির্যাতন ও হত্যার শিকা্র হতে হত না। আর সত্যি আলাদাভাবে আদিবাসী জ্ঞানতাত্ত্বিক চর্চারও প্রয়োজনীয়তা হত না, আমাদের আদিবাসী নৈতিক চর্চায় এক নতুন দিশা দেখাবে। প্রসঙ্গত উল্লখ্য কোন আদিবাসী নিজেদের অবস্থা ও পরিস্থিতি পরিবর্তন করার জন্য যখন শহরে যায় বা পড়াশোনা করে এগিয়ে যাওয়ার কথা ভাবলে বা সমাজে প্রতিষ্টিত হলে তাদের সাথে আদিবাসী সমাজের একটা দূরত্ব চলেই আসে। এই উভয় মনে দূরত্ব আসাটিও একটি অনৈতিকতারই ভিন্নই রূপ, যার কারণস্বরূপ আমরা ইন্টারসেকশানালিটির উল্লেখ করা যেতে পারে। ইন্টারসেকশনালিটি হল এমন একটি উপায় যেখানে লিঙ্গ, জাতি এবং অন্যান্য সামাজিক বিভাগগুলি একত্রিত হয় এবং এমনভাবে যোগাযোগ করে যাতে একজন ব্যক্তির জীবন এবং ফলাফল প্রভাবিত হয়। এটি একটি তাত্ত্বিক কাঠামো যা একজন ব্যক্তির জীবনের দিকগুলি যেমন তার সামাজিক-রাজনৈতিক পরিচয় বিশ্লেষণ করে মানুষ ব্যবহার করে। এর মধ্যে রয়েছে লিঙ্গ, জাতি, শ্রেণী, বর্ণ, ধর্ম, শারীরিক চেহারা ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ, একজন আদিবাসী মহিলা যখন একটি ব্যবসা চালায় জাতি এবং লিঙ্গ উভয়ের কারণে তাকে সমাজে বৈষম্যের সম্মুখীন হতে হয়। এগুলি তাদের প্রতিষ্টিত ও শিক্ষিত আদিবাসী থেকে আলাদা করেছিল কারণ তারা বিশ্বাস করেছিল যে তাদের লড়াই একটি বা দুটি বিষয়ের জন্য নয় বরং সম্পূর্ণ বিস্তৃত নিপীড়নকে মোকাবেলা করার জন্য।

এবার আমরা আলোচনা করব আদিবাসী হওয়ার কারণে সাংগঠনিক নীতি-নির্ধারণী প্রক্রিয়া থেকে বাদ পড়ায় যুগে যুগে এদের অনেকে প্রান্তিকায়িত, শোষিত। যার জন্য বাধ্যতামূলকভাবে একীভূত হয় এবং যখন এসব অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে নিজেদের অধিকারের স্বপক্ষে তারা কথা বলেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা দমন নির্যাতন ও হত্যার শিকার হয়েছে। আদিবাসীদের উদ্বেগের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার জন্য জাতিসংঘের আলোচনায় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর এ বিষয়টি বেশ গুরুত্বের সাথে নেওয়া হয় এবং ১৯৯৩ সালকে "আন্তর্জাতিক বিশ্ব আদিবাসী জনগোষ্ঠী বর্ষ ঘোষণাও করা হয়েছিল। ১৯৯৫ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত "আন্তর্জাতিক বিশ্ব আদিবাসী জনগোষ্ঠী দশক" ঘোষণা করা হয়েছিল এছাড়া ১৯৯৫ সালের ৯ আগস্টকে "বিশ্ব আদিবাসী দিবস" ঘোষণা করা হয়। জাতিসংঘ ১৯৮২ সালে সর্বপ্রথম আদিবাসীদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েয়েছিল। যা আন্তঃর্জাতিক ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। আদিবাসীদের এই অধিকার বিশেষ করে তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের বিষয়টি অনেক রাষ্ট্রের কাছে স্বস্তিদায়ক ছিল না। কারণ ঐ সমস্ত দেশের জনগণের একটা বড় অংশই আদিবাসী, যেমন- কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ভারত, চীন, পাপুয়া নিউগিনি এবং অধিকাংশ লাতিন আমেরিকার দেশসমূহ। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের বিষয়টি এ সমস্ত দেশে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে প্ররোচিত করবে যা ঐ সব দেশের ভৌগোলিক অখণ্ডতার প্রতি হুমকিস্বরূপ। অবশ্য সবখানে বাস্তবতা একই রকম নয়।

সুতরাং আদিবাসীদের নিজস্ব স্বকীয়তা ও সহজাতকতাকে বজায় রেখে আদিবাসীদের জন্য লড়তে হবে একদম গোঁড়া থেকে। তারজন্য প্রথমেই প্রয়োজন কাঠামোগত পরিবর্তন, তারপর অর্থনৈতিক পরিবর্তন, রাজনৈতিক পরিবর্তন, সামাজিক ও নৈতিক পরিবর্তনের মাধ্যমে স্বকীয়তা ও সহজাতকতাকে বজায় রেখে চলতে হবে, যা পরিবেশগত নৃতাত্ত্বিক নীতিতত্ত্বের সাহায্যে সমাধান করা যাবে। দার্শনিক গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসাবে পরিবেশগত নন্দনতত্ত্বের উত্থান, তারজন্য প্রথমেই বুঝে নিতে হবে পরিবেশ নীতিতত্ত্ব কি? পরিবেশ নীতিতত্ত্ব হচ্ছে দর্শনের একটি শাখা যা প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সেখানে মানুষের অবস্থান (আদিবাসী) নিয়ে আলোচনা করে। এটি মানুষের সাথে পরিবেশের মধ্যকার সম্পর্ক বিষয়ক বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, যেমন "যা আমাদের কাছে অ-মানব পরিবেশ তার মূল্য কী হওয়া উচিৎ ?", "পরিবেশগত সমস্যাগুলো যেমন পরিবেশ বিপর্যয়, দূষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আমাদের কীভাবে সারাপ্রদান করা উচিত", "কিভাবে আমরা প্রাকৃতিক জগৎ এবং মানব প্রযুক্তি ও উন্নয়নের মধ্যকার সম্পর্ক সবচেয়ে ভালভাবে বুঝতে পারব?" এবং "এই প্রাকৃতিক জগতে আমাদের স্থান কী হওয়া উচিৎ?"। অপরদিকে নন্দনতত্ত্ব দর্শনের একটি শাখা যেখানে সৌন্দর্য, শিল্প, স্বাদ এবং সৌন্দর্য সৃষ্টি ও উপভোগ নিয়ে আলোচনা করা হয়। আরও বৈজ্ঞানিকভাবে বললে হয় নন্দনতত্ত্ব মানুষের সংবেদনশীলতা ও আবেগের মূল্য এবং অনুভূতি ও স্বাদের বিচার নিয়ে আলোচনা করে। সুতরাং যে সমস্ত গবেষণায় নৈতিকভাবে পরিবেশগত সমস্যার সমাধান করা হয় এবং ত সেই গবেষণায় নন্দনতত্ত্ব অংশ গ্রহনতাকে পরিবেশগত নৃতাত্ত্বিক নীতিতত্ত্ব বলা হয়। প্রকৃতি তথা পরিবেশের আদিম মানব হিসাবে পরিচিত আদিবাসী সভ্যতা, যার জটিল বিকাশের ধারায় সৌন্দর্যতত্ত্বকেও প্রাথমিক যুগে সহজ এবং আধুনিককালে জটিল এবং বাস্তবেকে আরও অর্থবহ করে তোলে। সাধারণভাবে সৌন্দর্যানুভুতিকে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি আদিম অনুভূতি বলে মনে করা হয়। প্রকৃতির মোকাবিলায় আদিমকাল থেকে শুরু করে মানুষ বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উৎস হিসাবে কাজ করেছে। এরুপ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কোনো কোনোটি মানুষের মনের আবেগময় প্রতিক্রিয়া। এই আবেগময় প্রতিক্রিয়ার মূলে মানুষের জীবন রক্ষার অচেতন জৈবিক প্রয়োজনই আদিকালে সমধিক কাজ করেছে। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মানুষ প্রাকৃতিক ঘটনা এবং শক্তির প্রকাশকে আপন জীবন রক্ষার সহায়ক কিংবা ক্ষতিকারক বলে চিহ্নিত করেছে। এ সমস্ত শক্তিকে প্রয়োজন অনুযায়ী নিজের মনে জাগরূক রাখার সে চেষ্টা করেছে। এই আদিম বোধ থেকেই আদি শিল্পকার্যের সৃষ্টি। এই উৎস থেকে সামাজিক ভালোমন্দ বোধেরও উৎপত্তি। মানুষের নিজের জীবনের মতোই সৌন্দর্যানুভূতির ইতিহাস দীর্ঘ। তাই এই পরিবেশগত নৃতাত্ত্বিক নীতিতত্ত্ব গুরুত্ব দেবে উপজাতীয় উন্নয়ন প্রচেষ্টায়। আদিবাসীদের বেঁচে থাকার সমস্যা কারণসমূহকে নস্যাৎ করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, পেশার বৈচিত্র্য,

এবং কম মাইগ্রেশনের মাধ্যমে উন্নয়ন অর্জনের প্রতি দিকে পরিচালিত হবে, ফলে উচ্চতর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি পাবে। সমৃদ্ধি পাবে আদিবাসী জীবন পরিবেশগত সৌন্দর্যতায় সাথে সবসময় সর্বসন্মুখে গুরুত্ব পাবে নৈতিকতার প্রসঙ্গ। এটি যেমন সমাজে আদিবাসিদের প্রতিষ্টায়নে সহায়ক হবে তেমন সমস্যার সমাধান স্বরূপ আদিবাসিদের সামাজিক সমস্যাকে ঘিরে সৃষ্ট নৃতাত্ত্বিক মতবাদের যথার্থতা যাচাইকরণেও সমর্থ হবে। মানব কল্যাণের জন্য কোন সমস্যার প্রকৃতি পরীক্ষা, নিরীক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমেই সমাধানের ও ব্যবহারিক প্রয়োগের পথ নির্দেশ করা যাবে। পরিবেশগত নৃতাত্ত্বিক নীতি শাস্ত্রের ব্যবহারিক প্রয়োগের সাহায্যে আমরা এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছাই যে –

আদিবাসী নীতিশাস্ত্রের একটি মৌলিক লক্ষ্য হল ভূমি, পরিবার, গ্রাম এবং নিজের সাথে অপরের সম্পর্ক জেনে সম্পূর্ণ মানুষ হওয়া। আদিবাসী জাদুঘরের কর্মজীবনের ইতিহাসের উপর অঙ্কন করে, এই কাগজটি প্রদর্শন করবে কিভাবে আদিবাসী জাদুঘরের প্রেক্ষাপটে আদিবাসী নীতিশাস্ত্র প্রয়োগ করা হয়। আদিবাসী নৈতিকতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে, মূলধারার জাদুঘরগুলি উপজাতি গবেষক, কিউরেটর এবং সহযোগীদের সাথে কাজ করার সময় সেই নৈতিক অভিব্যক্তিগুলিকে আরও ভালভাবে সম্মানের মাধ্যমে আদিবাসী জ্ঞানতাত্ত্বিক চর্চা বা Tribal Epistemology একটি নতুন দিশা দেখাবে এবং সেই দৃষ্টিকোণগুলির মধ্যে একটি বিভাজন চিহ্নিত করা যাবে যা জ্ঞান এবং তথ্যকে পরিবেশের নান্দনিক উপলব্ধির জন্য অপরিহার্য করে তুলতে।

গ্রন্থপঞ্জী :

1. *Coates,* Ken S. (2004). A Global History of Indigenous Peoples: Struggle and Survival. New York: Palgrave MacMillan.p12 ISBN 0-333-92150-X.

2. Vidyarthi, L. P. & Rai, B. K. (1977). The Tribal Culture of India. Delhi : Concept Pub. Co.

3. ↑ Bodley, John H. (2008). Victims of Progress (5th. Edition) । Plymouth. England: AltaMira Press. ISBN 0-7591-1148-0.

4. Guyer, Paul (13th june ২০০৫)। *Values of Beauty - Historical Essays in Aesthetics*। Cambridge University Press। ISBN 0-521-60669-1.

5. Beardsley, M. C., 1958, *Aesthetics: Problems in the Philosophy of Criticism*, New York: Harcourt, Brace & World.

6. Bannon, B. E., 2011, “Re-Envisioning Nature: The Role of Aesthetics in Environmental Ethics,” *Environmental Ethics*, 33: 415–436.

রামপ্রসাদ ও তাঁর সময় : সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোটগল্প ও উপন্যাসে

সুকান্ত মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী

সারসংক্ষেপ(Abstract): বিশ শতকের সত্তরের দশকের অন্যতম একজন কথাকার হলেন সুব্রত মুখোপাধ্যায়। দীর্ঘ প্রায় পঞ্চাশ বছরের সাহিত্যজীবনে ছোটগল্প রচনার পাশাপাশি লিখেছেন কুড়িটিরও বেশি উপন্যাস। মূলত তাঁর গল্প-উপন্যাসে উঠে এসেছে সত্তর পরবর্তী বাংলার গ্রামজীবন, প্রান্তিক মানুষ, বিক্ষুব্ধ ভারতবর্ষ, খাদ্য সংকটসহ নকশাল আন্দোলনের মতো বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে গল্প-উপন্যাসে বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবন ও সময়কাল বর্ণনা তাঁর লেখার অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমরা সুব্রতর দুটি গল্প 'যে দেশেতে রজনী নাই' ও '১৭৫৭' এবং একটি উপন্যাস 'আয় মন বেড়াতে যাবি' বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে রামপ্রসাদের ব্যক্তিজীবন ও তৎকালীন বাংলার(অবিভক্ত) প্রতিচ্ছবি অনুধাবনের চেষ্টা করেছি। এক্ষেত্রে লেখক সুব্রত মুখোপাধ্যায় রামপ্রসাদের ব্যক্তিজীবন বলতে 'সাধক রামপ্রসাদ'-এর বাইরে 'সাধারণ মানুষরূপী' রামপ্রসাদের অনুসন্ধান করেছেন। পাশাপাশি রামপ্রসাদের কালপর্ব অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের সময়কালে বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থা ঠিক কেমন ছিল তার এক রূপরেখার পরিচয় দিয়েছেন সুব্রত তাঁর এই লেখার মধ্য দিয়েই। রামপ্রসাদের কবিতায় যে বারবার এই অস্থির, বিপন্ন বাংলার কথা উঠে এসেছে তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন লেখক। অতীত-ইতিহাসকে দক্ষতার সঙ্গে আখ্যানের মধ্য দিয়ে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। সর্বোপরি উক্ত প্রবন্ধে আমরা সুব্রতর নির্বাচিত ছোটগল্প-উপন্যাস বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বর্তমান সময়েও রামপ্রসাদ ও তাঁর কালপর্বের যে প্রাসঙ্গিকতা সেই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।
সূচক শব্দ(Key words): সুব্রত মুখোপাধ্যায়, রামপ্রসাদ, পলাশীর যুদ্ধ, অবিভক্ত বাংলা, বিদ্যাসুন্দর, সমর সঙ্গীত।

মূল আলোচনা(Discussion):

সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের আবির্ভাব আগে ছোটগল্পকার রূপে বিশ শতকের সত্তর দশকে এবং পরে ঔপন্যাসিক হিসাবে বিংশ শতাব্দীর আশির দশকে। তাঁর সাহিত্যচর্চার দীর্ঘ সময়পর্বের সরণিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিচিত্র বিষয়ের ছোটগল্প ও উপন্যাসের সম্ভার। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হল, রামপ্রসাদ জীবন ও তাঁর সমসময়। রামপ্রসাদ সেন (১৭২১-১৭৮১) অষ্টাদশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য শাক্তসাধক ও কবি। বলাবাহুল্য রামপ্রসাদ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সেই সঙ্গে সামাজিক পটপরিবর্তনের যুগে

রাজপৃষ্ঠপোষকতার বাইরে বেরিয়ে এসে নিজের অন্তরঙ্গ সাধনার অঙ্গ হিসাবে বিবিধ কবিতা, গান রচনা করেছিলেন। সুব্রত উক্ত কবির জীবন এবং সমসায়য়িক 'অস্থির বাংলার'(অবিভক্ত) ইতিহাসকে প্রেক্ষিত করে সাহিত্য নির্মাণ করেছেন। তাঁর দুটি ছোটগল্প এক. 'যে দেশেতে রজনী নাই', দুই. '১৭৫৭' এবং একটি উপন্যাস – 'আয় মন বেড়াতে যাবি' যার অন্যতম সাক্ষ্য।

'যে দেশেতে রজনী নাই' গল্পের শুরুতেই লেখক বিশেষ এক কালপর্বের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন- 'এগারশ ছিয়াত্তর বঙ্গাব্দের গ্রীষ্মকালের এক ব্রাহ্মমুহূর্ত।'[১] অর্থাৎ এ থেকে স্পষ্টত যে সময়কালটি হল- বাংলায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। আলোচ্য গল্পে সুব্রত মুখোপাধ্যায় কবি রামপ্রসাদ ও অযোধ্যানাথের পারস্পারিক কথোপকথনের মধ্য দিয়ে তৎকালীন বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থানকে তুলে ধরেছেন। পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে(১৭৬৫) কোম্পানি 'দেওয়ানি' লাভের সুযোগে বাংলার সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অবাধে রাজস্ব আদায় ও অত্যাচার করতে শুরু করে। সেইসময় বাংলায় কৃষকদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত সংকটপূর্ণ। গ্রামীণ কৃষিব্যবস্থা ও কারিগরির যুগ্ম বন্ধন ছিল বিছিন্ন । যার ফলস্বরূপ সমগ্র বাংলা জুড়ে এক দুর্ভিক্ষের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়। বাংলার গ্রামসমাজ প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়ে। পাশাপাশি বৃষ্টিহীন গ্রীষ্মকালের ফলে বাংলায় দুর্ভিক্ষ যেন এক চরম মাত্রা লাভ করে। ঐতিহাসিক William Wilson Hunter এই ধ্বংসাত্মক মহামারীর বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে: 'All through the stifling summer of 1770 the people went on dying. The husband-men sold their cattle; they sold their implement of agriculture; they devoured their seed-grain; they sold their sons and daughters, till no buyer of children could be found;...in june 1770, the resident at the Durbar affirmed that the living were feeding on the dead.'[২] প্রাসঙ্গিক গল্পে দুর্ভিক্ষের সেই ছবি উপস্থাপিত হয়েছে। গল্পকার এখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর কুমারহট্ট-হালিশহরের নিরন্ন সাধারণ মানুষের কথা বলেছেন। শীতকালে অপর্যাপ্ত ফসল উৎপাদন, দীর্ঘ অনাবৃষ্টি—প্রকৃতির এইরকম বিরূপতার কারণে অভূতপূর্ব খাদ্যসংকট দেখা দেয়। পাশাপাশি এই সমস্ত অঞ্চলে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াও ছিল সাংঘাতিক : 'কেন না ইতিমধ্যে পলাশীর যুদ্ধের পর এক যুগ পার হয়েছে। সদাশয় বানিয়া ইংরাজ এখন দেশের ভাগ্যবিধাতা।'[৩] এক্ষেত্রে লেখকের ইংরেজ সম্পর্কে 'বানিয়া' বিশেষণটির ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি এর দ্বারা বিদেশি শাসকের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক চরিত্রটি উন্মোচন করেছেন। দেখা যায়, একদিকে কোম্পানির রাজনৈতিক শোষণ এবং অন্যদিকে প্রকৃতির ভয়ংকর অনিয়মের ফলে বাংলার সমাজে সৃষ্ট হওয়া মন্বন্তরের ছবি গল্পে উঠে এসেছে: 'এই গ্রীষ্মে পদার্পণ করে দুর্ভিক্ষ আর নিজেকে সংযত রাখতে পারেনি। শুরু হয়েছে বল্গাহীন গণমড়ক। কুমারহট্টের পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলে মানুষ মরছে কীটের মতন। প্রতিবেশী মুর্শিদাবাদ এবং

সংলগ্ন গ্রামদেশে যে প্রতিদিন পাঁচ-ছয় শত মানুষ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করছে এ সমাচার নদীপথে পলাতক মাঝিমাল্লা আর ভাগ্যবান মানুষজন তীরবর্তী জীবিতদের জানিয়ে দিয়ে যায়। জানিয়ে যায় কেমন করে বহুদিন অন্নের স্বাদহীন মানুষ পরম উপাদেয় ভোজ্যবস্তুর মতন তারিয়ে তারিয়ে মৃত্যুর স্বাদ উপভোগ করছে। ক্ষুধার্ত মানুষ অবশেষে স্বয়ং মৃত্যুকেই ভক্ষণ করছে গো-গ্রাসে।’[৪]

আলোচ্য গল্পে রামপ্রসাদের কবি স্বভাবের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি তাঁর প্রত্যেক কর্মের মধ্য দিয়ে সাধন সঙ্গীতকে উপলব্ধি করেন। তবে গল্পকার মন্বন্তরের ফলে বাংলার মানুষের ঘরে লক্ষ্মী বিদায়ের পাশাপাশি রামপ্রসাদের ‘স্বরূপিনী দেবী’ সরস্বতীর দুরাবস্থানের ছবিটিকেও উপস্থাপন করেছেন। তিনি আরও দেখিয়েছেন, বাংলার এই অস্থির সময়ে কবি মনও বিশেষ ভাবে আন্দোলিত। রামপ্রসাদ যেন ‘বাণীহারা’ হয়ে পড়েছেন। তাঁর সৃষ্টিকর্ম থেকে তিনি দূরে অবস্থান করছেন। পরিবর্তে রামপ্রসাদের কণ্ঠে আশঙ্কার স্বরে উঠে এসেছে--- হালিশহর গ্রামের গণমড়ক,গ্রামকে গ্রাম শূন্য হয়ে যাওয়ার ঘটনা।

গল্পে রামপ্রসাদের কবি কৃতিত্বের বিশেষ পরিচয় থাকলেও গল্পকার বারবারই আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ছিয়াত্তরের বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতির কথা- ‘হিমের দিন শেষ হয়েছে, মাঝখানে কখন যে বসন্ত ঋতু আসা যাওয়া করেছে তার সমাচার নেবার সময় মানুষ কেন জীবজগতের কারোরই বুঝি হয়নি। কোকিলের কুহুধ্বনি পেঁচার কর্কশস্বরে চাপা পড়ে গেছে। শৃগালের অসময় আর্তনাদের সঙ্গে শকুনের উল্লাস যথাসময়ে এসে মিলেছে।’[৫] অর্থাৎ গল্পকার ‘পেঁচার কর্কশ’, ‘শকুনের উল্লাস’ প্রভৃতি শব্দবন্ধ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে এক সংকট সময়েরই ইঙ্গিত করেছেন। যে বাংলার চারদিকে শোনা যাচ্ছে ‘হায় হায় আত্মস্বর’। এই সময়ের আর্ত মানুষের অবস্থান চিত্রটি লেখক তুলে ধরেছেন। মানুষের মধ্যে এক ভয়, বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। খাদ্যের সন্ধানে বাস্তুচ্যুত হয়ে ‘মানুষ চলছে অবিরল, অনর্গল। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, নগর থেকে নগরীতে। পলায়ন করছে নিজবাস থেকে অনিশ্চিত পরবাসে— দিনের আলোয় অথবা গভীর নিশীথে। পিছনে ধেয়ে আসছে উন্মত্ত ঐরাবতের কালাপাহাড় আর সম্মুখে গর্জমান গরলসিন্ধু লক্ষ হাত তুলে আলিঙ্গন করতে চাইছে।’[৬] এ যেন মানুষের সংকটের চরম অভূতপূর্ব মুহূর্ত। মন্বন্তরের দৃশ্যকে এক বিশেষ ব্যঞ্জনার সঙ্গে লেখক গল্পে তুলে ধরেছেন। গঙ্গাবক্ষে কচুরিপানার মতো অগণিত মৃতদেহ ভেসে যাওয়া ছিল নিত্যনৈমিত্তিক কোনো ঘটনা। গল্পে তারও ইঙ্গিত রয়েছে।

সুব্রত মুখোপাধ্যায় এই গল্পে রামপ্রসাদকে কেবলমাত্র একজন ‘সাধক’ রূপেই দেখাননি বরং ‘মানুষ’ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর বিভিন্ন ক্রিয়া-কর্মের মধ্য দিয়ে সেই দিকটি প্রকাশিত। তিনি দুর্ভিক্ষ, গণমড়ক প্রভৃতিকে উপেক্ষা করে নিজের চতুর্থ সন্তানের জন্মদানের মধ্য দিয়ে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করেন এই মহাসংকটের কাল চিরস্থায়ী নয়। এমনকী অযোধ্যানাথের ‘মতিছন্ন’ কটাক্ষকেও

তিনি উপেক্ষা করে বলেন- 'তোমার মতন আমিও মানুষ আজু'। মহাবিপদের দিনেও যে 'সংসার মানুষ চায়' তা বার বার আমাদেরকে মনে করিয়ে দিয়েছেন রামপ্রসাদ। আসলে এ গল্পে ' অতীত তার বাহ্যিক প্রাচীনত্ব নিয়েই সাম্প্রতিক হয়ে যায়'[৭] এভাবে।

অপর একটি গল্প '১৭৫৭' –তে গল্পকার পলাশীর যুদ্ধের সমকালের ছবি তুলে ধরেছেন। '১৭৫৭'- এই নামকরণই যার অন্যতম স্বাক্ষ্য। এ গল্পেও কবি রামপ্রসাদের কবিতার বিশেষ প্রশংসা করে গল্পকার বলেছেন, 'বিশেষ করে শরীরে কবিতা ভর করলে, তার মধ্যে সুরের ভিয়েন পড়লে তিনি মাহারাজারও অধিক।'[৮] তবে লেখক এসব কিছুর ঊর্ধ্বে অষ্টাদশ শতাব্দীর পলাশীর যুদ্ধের ঠিক আগের মুহূর্তের বাংলার সমাজচিত্রটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। যখন রামপ্রসাদের কবিতাচর্চা অপেক্ষা গুরুত্ব হয়ে ওঠে 'যুদ্ধ'। সহচর ভজহরি তাই রামপ্রসাদকে বলে- 'ওসব ঐহিক টৈহিক এখন কাটান দাও দাঠাকুর। বাংলায় এবার যুদ্ধ লাগল বলে।'[৯] অবিভক্ত বাংলার ক্ষমতা দখলে নবাব সিরাজদৌল্লার সঙ্গে ইংরেজদের বিদ্রোহ। মুর্শিদাবাদের যুদ্ধের প্রস্তুতি কীভাবে গ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যে আশঙ্কার সঞ্চার করে সেই ছবিও এ গল্পে উঠে এসেছে।

রামপ্রসাদের বনে 'শিবাদল'কে শিবাভোগ দেওয়ার সময় এই যুদ্ধের বিষয়টা আরও তনিষ্ঠভাবে উপলব্ধি হয়েছে। শিয়ালদের এক খণ্ড খাবার নিয়ে সংঘর্ষ এবং ক্ষমতা দখল নিয়ে সিরাজদৌল্লার ও ইংরেজদের মধ্যে যুদ্ধ— এই দুটি বিষয় রামপ্রসাদের পরিপূরক বলেই মনে হয়েছে। ভজহরিও রামপ্রসাদকে সেই কথা স্মরণ করিয়ে দেয়- 'যুদ্ধ না করলে অন্ন মেলেনা। যুদ্ধুই অন্ন, যুদ্ধুই জীবন।'[১০] এই পর্যায়ে এসে তাই রামপ্রসাদের মনে হয়- 'জীবনের যেমন জীবন আছে তেমনি মরণ ভূমিখানিও ফেলে দেবার নয়। সেখানেও বাঁচবার তাড়না। সেখানেও কালদণ্ডধারিণী কবিতার ভয়ংকর সজীব বিচরণ।' আর এখান থেকেই লেখক 'সমরসংগীত' রচনার রসদ খুঁজে পান।

সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'আয় মন বেড়াতে যাবি' প্রকাশিত হয় জানুয়ারি ২০১০ খ্রিস্টাব্দে। উপন্যাসটি মোট চুয়াত্তরটি পরিচ্ছেদে(অধ্যায়) বিন্যস্ত। লেখক তাঁর আত্মজীবনের পাশাপাশি কাহিনির অধিকাংশ স্থান জুড়ে রামপ্রসাদ সেনের শিল্পজীবন ও সমসাময়িক অতীতকথা উপস্থাপন করেছেন। উপন্যাসে রামপ্রসাদের কাহিনি শুরু হয়েছে তাঁর কুমারহট্ট-হালিশহরে বসবাসকালের অপ্রতুল জীবনের বর্ণনা দিয়ে এবং শেষ হয়েছে পলাশীর যুদ্ধের সমাপ্তির মধ্য দিয়ে। এই উপন্যাসে রামপ্রসাদের অনিশ্চিত জীবন ও কাব্যচর্চা সেই সঙ্গে বাংলার তৎকালীন রাজনৈতিক পরিবেশ বর্ণিত হয়েছে। রামপ্রসাদের জন্ম এক দরিদ্র বৈদ্য পরিবারে। খুব স্বল্পবয়সে পিতৃবিয়োগের পর অভাবী সংসারের দায়িত্ব পড়ে তাঁর ওপর। এরপর কলকাতায় মহুরির চাকরিতে যুক্ত হন। অনুমান করা হয় এই সময়পর্ব থেকেই কবির গীতচর্চা শুরু। এই উপন্যাসে রামপ্রসাদের কবি পরিচয়ের পাশাপাশি তাঁর জীবনের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির বিভিন্ন মুহূর্তের

ছবি প্রতিফলিত হয়েছে। রামপ্রসাদ তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে কষ্টপূর্ণ জীবনের কথা তুলে ধরেছেন এভাবে:

আমার কপাল গো তারা
ভাল নয় মা, ভাল নয় মা,
ভাল নয় মা, কোন কালে।।
শিশুকালে পিতা মলো
মাগো রাজ্য নিল পরে,
আমি অতি অল্পমতি ভাসালে সাগরের জলে।।[১১]

তিনি কবিত্বের সঙ্গে সাধনাকে যুক্ত করে বাংলা কাব্যে এক বৈচিত্র সংযোজন করেছিলেন। তাঁর এ গীত রচনার মধ্য দিয়ে সমাজমনস্কতার, সমাজসংকটের বিবিধ দিক উঠে এসেছে। পাশাপাশি রামপ্রসাদের কাব্যে অধ্যত্ম সাধনা, বাস্তবতা, কাব্যরস প্রভৃতি দিকই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তির আত্মঅন্বেষণ, গোষ্ঠীচেতনা অপেক্ষা ব্যক্তি মানসিকতার মুক্তি তাঁর কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর উত্তরসূরির অভাবে মোঘল শাসনের অবসান ঘটে। কোম্পানি এর সুযোগে বাংলায় ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে। তখন আলিবর্দী খাঁ দ্বারা অনেকাংশ প্রতিহত হলেও পরবর্তীতে বর্গী আক্রমণ ছিল তীব্র আশঙ্কাজনক। এরপর আলিবর্দীর অবর্তমানে সিরাজদৌল্লা বাংলার নবাব হলে সমাজের অভ্যন্তরে এক অস্থিরতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। রামপ্রসাদের মূলত এই সময়পর্বে আবির্ভাব। তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার পালাবদলের এক বিস্তৃত কালপর্ব ।

ঔপন্যাসিক এই দীর্ঘ ইতিহাসের কোনো নির্দিষ্ট একটি ঘটনা নয়, বরং এক বিস্তৃত কালপর্বকে উপন্যাসের পটে তুলে এনেছেন। অর্থাৎ যেখানে স্থান পেয়েছে পলাশীর যুদ্ধের পূর্বমুহূর্ত, যুদ্ধের সমকাল এবং বাংলায় সমাজে তার প্রভাব প্রভৃতি ঘটনাবলি। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার জীবন, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সংকট প্রত্যক্ষ করেছিলেন রামপ্রসাদ। সমাজের অনান্য সকলের মতো রামপ্রসাদও চিন্তিত বাংলার ভবিতব্য নিয়ে। তার মনে আশঙ্কা জন্মেছে - 'আলিবর্দীর পর সিরাজ যদি সিংহাসনে বসেন তাহলে বাংলার ভবিতব্য কি হবে'। এ দুশ্চিন্তা যে কতখানি বাস্তবসম্মত ইতিহাসে আমরা তার প্রমাণ পাই- 'Alivardi died in 1756, mominating his grandson siraj-ud-daula his successor. But his succession was challenged by two other contenders for the throne, Shaukat Jung(Fajudar of Purnea) and Ghaseti Begum (Alivardi's daughter). This resulted in intense court factionalism, as the overmighty zamindars and commercial people felt threatened by an extremely

ambitious and assertive young nawab. This destabilised the administration of Bengal, and the advantage was taken by the English East India Company.'[১২] তবে মানুষের মধ্যে এই লড়াইয়ের তীব্র বিরোধী ছিলেন রামপ্রসাদ। তিনি তাঁর কাব্য, গানের মধ্য দিয়েই তা ব্যক্ত করেছেন।

অন্যদিকে এই উপন্যাসে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের শাসনপর্বের বিভিন্ন দিক গুরুত্ব পেয়েছে। মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন দয়ালু, ধার্মিক, অপরদিকে অমিতব্যায়ী ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ। তবে সিরাজবিরোধী বিভিন্ন কাজের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। ইংরেজদের সঙ্গে তার সু-সম্পর্কের কথা জানা যায়। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, রামপ্রসাদ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধেই 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য রচনা করেছিলেন। উপন্যাসে কবি ভারতচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের সময় এই কাব্যরচনা প্রসঙ্গে তার মানসিক দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এ কথোপকথন 'উপন্যাসগত অবস্থানে অসঙ্গত, অবিশ্বাস্য নয়।'[১৩] তাছাড়া এই সময়ই ভারতচন্দ্রের মুখে রামপ্রসাদের মনোজগৎ, কাব্যভাবনা সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক উঠে এসেছে। তিনি তার কাব্য ' দৎকলম' ছাড়া মুখে মুখেই রচনা করেন এবং কবিতার মূল উপজীব্য বিষয় তাঁর সামনে ঘটে চলা যে কোন বিষয়। তিনি কাব্য রচনা করেন জনজীবনের জন্য, তার গীতের উপর ভরসা করে লক্ষ্মীনারায়ণের মতো দীনাতিদিনের অন্নসংস্থান হয়। সে রামপ্রসাদের কাছে তাই পার্থনা করে '...একখানি গান যদি দাও। তোমার গান মানে অন্নদান।'[১৪]

এই উপন্যাসে সুব্রত রামপ্রসাদের কম আলোচিত অথচ গুরুত্বপূর্ণ গীত 'সমর সঙ্গীত'-এর উল্লেখ করেছেন। সাহিত্যের ইতিহাসে রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর', 'শক্তিগীতি', 'সীতা বিলাপ', 'শিব সঙ্গীত' প্রভৃতি কাব্য ও গীত সম্পর্কে পর্যালোচনা লক্ষ করলেও তাঁর এই রীতির গানের তেমন কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না।[১৫] ঔপন্যাসিকের মতে, এই গানগুলি ইতিহাসের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার বিভিন্ন অস্থির পরিস্থিতির কথা এই গানগুলিতে উঠে এসেছে। এই সঙ্গীতে কালীর করালরূপ, দেবতার ভয়ংকরত্ব, পলাশীর যুদ্ধ কিংবা সিরাজের বিপর্যয় ধ্বনি প্রভৃতি মিলেমিশে আছে:

'হুঙ্কারে সংগ্রামে ও কে বিরাজে বামা।
কামরিপু- মোহিনী ও কে বিরাজে বামা।।
তপন দহন শশী, ত্রিনয়নী ও রূপসী,
কুবলয়দল-তনু শ্যামা।
বিবসনা এ তরুণী, কেশ পড়িছে ধরণী,
সমর-নিপুণা গুণধামা।
কহিছে প্রসাদ সার, তারিণী সম্মুখে যার,
যমজয়ী বাজাইল দামা।'[১৬]

সুব্রত মুখোপাধ্যায় রামপ্রসাদ জীবন ও তাঁর সময়ের সংকট বিংশ শতকে দাঁড়িয়ে বুঝতে চেয়েছেন। তিনি এই কালপর্ব পূর্বোক্ত দুটি গল্প ও উপন্যাসে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছেন। বাংলা গল্প-উপন্যাসের ধারায় এ এক নতুন সংযোজন। ইতিহাসের এই কথাগুলি সুব্রত যথাসম্ভব চরিত্র ও পরিবেশ নির্মাণে ব্যবহার করেছেন। ইতিহাস থেকে বিষয় সংগ্রহ করেও সুব্রত অতীতের বন্ধন থেকে কাহিনিকে মুক্ত করে দিয়েছেন। ফলস্বরূপ কাহিনির বিষয়বস্তু পলাশীর যুদ্ধ কিংবা তার পরবর্তী সময় হলেও তা হয়ে উঠেছে সমকালীন ও সর্বকালীন।

উল্লেখপঞ্জি:

১. সুব্রত মুখোপাধ্যায়, দে দেশেতে রজনী নাই, শ্রেষ্ঠগল্প, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ: কলকাতা বইমেলা ২০০৪, পৃ. ৫০।
২. William Wilson Hunter, The Annals of Rural Bengal, smith elder and co, London, published: 1868,page-19.
৩. সুব্রত মুখোপাধ্যায়, যে দেশেতে রজনী নাই, শ্রেষ্ঠগল্প, পূর্বোক্ত করুণা প্রকাশনী, পৃ. ৫০-৫১।
৪. তদেব, পৃ. ৫৩।
৫. তদেব, পৃ. ৫১।
৬. তদেব, পৃ. ৫২।
৭. রামকুমার মুখোপাধ্যায়, শতাব্দী শেষের গল্প, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ২০০১, পৃ. ৭৭।
৮. সুব্রত মুখোপাধ্যায়, ১৭৫৭, গিরিশ দর্শন, প্যাপিরাস, কলকাতা-৭০০০০৪, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০০৯, পৃ. ৩৭।
৯. তদেব।
১০. তদেব, পৃ. ২৮৯।
১১. সুব্রত মুখোপাধ্যায়, আয় মন বেড়াতে যাবি, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা -৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ২৭।
১২. Sekhar Bandyopadhyay, From Plassey to Partition: A History of Mordern India, Orient Longman Private Limited, New Delhi- 110002, Reprinted : 2004, Page- 16.
১৩. রবিন পাল, 'আয় মন বেড়াতে যাবি': সুব্রত মুখোপাধ্যায়, উপন্যাসের বর্ণময় ভুবন, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা- ৭০০০০৬, প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ২০১১, পৃ.১৩৫।
১৪. সুব্রত মুখোপাধ্যায়, আয় মন বেড়াতে যাবি, পূর্বোক্ত দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৪৮৩।

১৫. নবেন্দু সেন, এমন মানব জমিন রহিল পতিত আবাদ করলে ফলতো সোনা, দ্র. জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায় ও নবেন্দু সেন সম্পাদিত 'অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য পুনর্পাঠ ও পুনর্বিবেচনা, সাহিত্যলোক, কলকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১১, পৃ. ১৩৫।
১৬. সুব্রত মুখোপাধ্যায়, আয় মন বেড়াতে যাবি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৯।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. রামপ্রসাদ : জীবনী ও রচনাসমগ্র, ডক্টর সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য(সম্পাদিত), গ্রন্থমেলা, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ১৯৭৫।
২. রামপ্রসাদ, যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পি.এম.বাকচি্ এণ্ড কোং প্রাইভেট্ লিমিটেড্, প্রথম প্রকাশ: ১৩২৪।
৩. সাধক রামপ্রসাদ, জ্যোতিপ্রকাশ সেনগুপ্ত, রত্না প্রকাশনী, প্রকাশ: ১৩৭৫।
৪. সাধক কবি রামপ্রসাদ, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ভট্টাচার্য্য সন্স লিঃ, প্রকাশ : ১৯৫৪।
৫. রামপ্রসাদ, পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যাপিরাস, প্রথম প্রকাশ: ২০০৩।

দাঙ্গার দিনগুলি ও একটি উপন্যাস : প্রসঙ্গ সেলিনা হোসেনের 'সোনালি ডুমুর'

বিশ্বনাথ কুইরী
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

অবিভক্ত ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন থেকে একদিন মুক্তির দিশা খুঁজেছিলেন সমস্ত দেশবাসী। মনের কোনে লালন করা স্বাধীনতার স্বপ্ন একদিন বাস্তবায়িতও হল। ছেচল্লিশের ভয়াবহ দাঙ্গার রক্তাক্ত উপত্যকা পেরিয়ে জনসাধারণের এই স্বপ্ন সত্যি হল। কিন্তু তার মূল্য চুকাতে হল দেশ ভাগ করে। দেশভাগ হয়ে গেলেও দেশভাগের ট্রমা থেকে বেরোতে পারা খুবই জটিল, তাই স্মৃতিতে দেশভাগ ও দাঙ্গার ভয়াবহ চিত্র লালিত হয়েছে সাধারণের মনে। সেলিনা হোসেনের (জন্ম ১৯৪৭) 'সোনালি ডুমুর'(২০১২) উপন্যাস ১৯৪৬, ১৯৫০ এবং ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার জ্বলন্ত দলিল। উপন্যাসের শুরুতেই ঔপন্যাসিক লিখছেন— "পথের ধকল অনিমেষকে কাহিল করেনি। অন্যরা পরিশ্রান্ত। কেউ কেউ ঠিকমতো কথাও বলতে পারছে না। ওরা আসছে অনেক দূর থেকে। সীমান্ত পার হয়ে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েছে। সূর্য ঢলেছে পশ্চিম আকাশে।"[১] এই তিনটি লাইন অনেকগুলো প্রশ্ন তৈরি করছে, যেমন—কে এই অনিমেষ? তারা কোন সীমান্ত পার হয়ে আসছে এবং কেন? বাকিরা শ্রান্ত কেন? সূর্য পশ্চিমে-এর কোন অন্য ইঙ্গিত আছে কী? ইত্যাদি। আসুন তাহলে পরিচয় সেরে নেওয়া যাক। কারণ কাহিনি আমাদের বিচিত্র পথে নিয়ে যাবে এরপর। এই কাহিনি একটি পরিবারের গল্প, অমিয়নাথ, স্ত্রী সরোজিনী ও ছেলে অনিমেষ, মেয়ে—শিলাও দোলা তার দাদা সুবোধনাথ, স্ত্রী বিম্ববতী এবং তাদের ছেলে প্রফুল্ল। দেশভাগের পর পরই বাংলাদেশের দেওভোগ গ্রামের পৈতৃক ভিটে মুসলিম লীগের নেতা ওয়াহেদ মিঞাকে বিক্রি করে অমিয়নাথ ও তার দাদা সুবোধনাথ নদীয়ায় চলে আসেন, কারণ ওয়াহেদ মিঞা বলেছিলেন এখানে তোমাদের থাকা যাবে না, তোমরা এখানে সংখ্যালঘু। আসলে ধর্মের ভিত্তিতে ভারতবর্ষের প্রাণ ছিঁড়ে আলাদা হল একটি ভূখণ্ড (১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট), নাম হল পাকিস্তান(পূর্ব)। তারপরই মানুষের এপার থেকে ওপারে বা ওপার থেকে এপারে যাওয়া-আসা শুরু হল। সমালোচক লিখছেন—"After partition, life in both the Punjabs had been disrupted. Millions of refugees had come to India from West Punjab and millions had left East Punjab for Pakistan."[২] এই চিত্র দুই বাংলার জন্যেও প্রযোজ্য। কারণ উভয় রাষ্ট্রেই একদল মানুষ সংখ্যালঘু হতে লাগল, ভারতে মুসলমান, পাকিস্তানে হিন্দু। "সে জন্য

দেশবিভাগের ঘটনাটি একটি ভূখণ্ডকে খণ্ডিত করার অপেক্ষা জনমানসে বিচ্ছেদ সৃষ্টির করুণতর কাহিনী।”[৩] তারা নদীয়াতে এসে বাড়ি কেনে। কিন্তু সুবোধনাথের ছেলে প্রফুল্লের নামে নদীয়ার বাড়ি থাকায়, সে তাদের আবার বাড়িছাড়া করে। নিজের সন্তানের কাছ থেকে এই যন্ত্রণা-বঞ্চনা পেয়ে আবার তারা বাংলাদেশে চলে যান। সেখানে সংখ্যালঘুর অনিকেত জীবন নিয়ে তারা সময় কাটাচ্ছেন। এই অনিমেষের বয়স এখন দশবছর, কিন্তু সে অনেক কৌতূহলী, সে বাবাকে প্রশ্ন করে— ‘দেশভাগ কী’? উত্তর না পেয়ে সে এই বয়সেই বুঝে যায়, সবসময় সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। আমাদের হয়ত মনে পড়বে কাঙালির (‘অভাগীর স্বর্গ’) কথা। ঔপন্যাসিক ছোট্ট অনিমেষের মধ্য দিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন— “দেশভাগ খুব খারাপ ব্যাপার। দেশভাগ হলে বাবা উত্তর দিতে পারে না। এমন দেশভাগ না হলে কী হয়?”[৪] অমিয়নাথরা পাকিস্তানে এসেছেন আবার। বাজারে অমিয়নাথের সঙ্গে ওয়াহেদ মিঞার দেখা হলে সে ঠাট্টা করে বলে—‘হিন্দু ভাইদের আদর যত্ন কিছু পান নি। ফিরেই আসতে হল।’ বাজারে লোক ডেকে ওয়াদেহ মিঞা চিৎকার করে করে অপমান করতে থাকে অমিয়নাথকে, এমনকি বলে যে এই গ্রামে কোন ঠাঁই হবে না, কারণ আপনি বাড়ি ঘর বিক্রি করে গেছেন। তারা এখান থেকে আবার চলে যায় চাঁদপুরে তাদের দূরসম্পর্কের মামাতো ভাই রণবীর সাহার কাছে।

এখানে এসে অনিমেষ সহ পরিবারের বাকি সন্তানদের পড়াশোনা শুরু হয়, স্থানীয় মানুষেরা কেউ কেউ সাহায্যেও এগিয়ে আসে। নতুন করে স্বপ্ন দেখে অনিমেষ ও তার পরিবার। কাহিনিতে আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ে এসে প্রফুল্লের মুখে শুনছি ছেচল্লিশের দাঙ্গার স্মৃতিচারণ ও মহাত্মা গান্ধীর নোয়াখালি যাত্রার কথা, তিনি এই চাঁদপুর থেকেই লঞ্চে করে ফিরে গিয়েছিলেন। শৈলেশকুমার লিখছেন— “কলকাতার দাঙ্গার প্রতিক্রিয়ায় চট্টগ্রাম, মৈমনসিং, বরিশাল ও পাবনা প্রমুখ জেলাতে ছোট বড় দাঙ্গা হলেও ১০ই অক্টোবর ভারতবর্ষের উত্তরপূর্ব কোণে নোয়াখালি, টিপরা, (কুমিল্লা) ও সন্দ্বীপ এলাকায় যে এক তরফা হিন্দু-নিধন ও উৎপীড়ন পর্বের সূত্রপাত হয়, তা এর মধ্যে ভীষণতম।...নোয়াখালি অঞ্চলে হিন্দু-বিরোধী মানসিকতার ব্যাপক প্রচারের পিছনে আর একটি স্থানীয় রাজনৈতিক কারণও ছিল। এ হল এক শ্রেণীর মুসলমান দ্বারা পীর রূপে পুজিত লীগের স্থানীয় নেতা মিঞা গোলাম সারওয়ারের নব দীক্ষিতের উৎসাহে সাম্প্রদায়িকতার প্রচার ও সংগঠন।”[৫] এখানে এসে বছর দুই কেটে গেছে, অনিমেষের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে স্থানীয় শিক্ষক ভুদেব দত্তের নাতনী মাধুরীলতার। উপন্যাসের কাহিনিতে নতুন একটি পর্ব যুক্ত হল এই মাধুরীলতাকে কেন্দ্র করে। কেন একথা বলছি তা মাধুরীলতার একটু পরিচয় নিলেই বোঝা যাবে। ঔপন্যাসিক লিখছেন— “মাধুরীলতা স্কুলশিক্ষক ভূদেব দত্তের মেয়ের ঘরের নাতনি। ছেচল্লিশের দাঙ্গার সময় সর্বাণীর নোয়াখালির কাজিরখিলে শ্বশুরবাড়িতে ছিল। সর্বাণী ভূদেব দত্তের একমাত্র

মেয়ে।...জামাই কীর্তিনাশন ছিল স্কুলশিক্ষক।...দাঙ্গায় মাধুরীলতার বাবা-মা নিহত হয়। কীর্তিনাশনের বাবা-মাসহ গোটা বাবামাসহ পুরো পরিবার। মোট এগারোজন ছিল - পরিবারের সদস্য। শুধু অলৌকিকভাবে বেঁচে যায় মাধুরীলতা। জ্ঞানহারা মাধুরীলতা রক্তের মাঝে পড়েছিল দেড়দিন।”[৬] প্রতিবেশী সতীশ মজুমদারের স্ত্রী ওকে তুলে, রক্ত পরিস্কার করে দিয়েছিল ভূদেব দত্তের কাছে, তাকে তুলে দেওয়ার সময় তিনি বলেন ওর রক্ত পরিস্কার করাই আমাদের জীবনের পুণ্য। এই পরিবারের কারও দাহ পর্যন্ত করার সুযোগ ছাড়েনি দাঙ্গাকারীরা, কেটে মাটিতে পুঁতে দিয়েছিল। পরবর্তীকালে মাধুরীকে এই নিয়ে আক্ষেপ করতেও দেখেছি আমরা। এখানেই শেষ নয়, মাধুরীলতার পরিবার ছেচল্লিশের দাঙ্গায় নিহত হয়, কিন্তু এই সাম্প্রদায়িক মনোভাব এখনও ছড়ানো হচ্ছে। আখ্যানে আমরা দেখি যে স্থানীয় হেডমাস্টার সন্ধ্যের পর তাঁর চার-পাঁচটি গোরু ছেড়ে দেন গ্রামে, কারও গাছ, কারও ফসল নষ্ট করে বেড়ায় এরা, হিন্দুদের ফসল নষ্ট হলেও তাদের মুখ বুজে সহ্য করতে হয়। ঔপন্যাসিক সুবোধনাথের মধ্য দিয়ে এই ভাবনা দিয়েছেন যে দেশভাগ হওয়ার আগে এরকম অবস্থা ছিল না। “নতুন দেশ বদলে দিয়েছে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক। ধর্ম এমন কঠিন বিষয়।”[৭] আবার হেডমাস্টার গ্রামে মেয়েদের জন্য হাই স্কুল করার জন্য উদ্যোগ নেন, গ্রামে ধনী হিন্দুদের ফেলে যাওয়া অনেক জমি থাকতেও তিনি গ্রামের কালীবাড়ি মন্দির চত্বরের অর্ধেক জায়গাকে এই কাজের জন্য নির্বাচন করলেন। পুরোহিত রাজি হয়নি। মুসলমান ছাত্রদের দিয়ে হেডমাস্টার মন্দির চত্বরের কলা গাছ কেটে সাফ করেন, হিন্দু টিচাররা ভয়ে চুপ করে থাকে। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এসে ভূদেব বাবুদের কথা না শোনেই তাঁদের ধমক দিতে থাকেন, তাঁকে ‘পঞ্চমবাহিনীর লোক’, ‘গুপ্তচর’ এসব নানান অপবাদ দিতে থাকেন। এখানে ঔপন্যাসিক মূল আখ্যানের সঙ্গে ছেচল্লিশের দাঙ্গার ইতিহাসকে চোখের সামনে অভিনীত হওয়ার প্রেক্ষাপট রচনা করেছেন। চাঁদপুরের বিভিন্ন গ্রাম যেমন— ষোলদানা, সাইসাঙ্গা, হাইমচর, আষ্টা, কড়ইতলী, ভূটালগ্রাম, তাম্রশাসন, আইটপাড়া, জয়শ্রী, গোবরচিত্রা, চৌরাঙ্গ, গড়িয়ানো, বড়গাঁও, বারপাইকা, লাউতলী, পোয়া, গজারিয়া, চর বড়ালি, চর পাইকা, রূপসা ইত্যাদি গ্রামে হিন্দুরা মুসলমানের দ্বারা অত্যাচারিত হয়েছে তার কথা ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন। নোয়াখালির শায়েস্তাগঞ্জ থেকে সুহাসিনী দাস চিত্তবাবুর বাড়ির ঘটনাটি বলেছেন— তিনি একটি মহালবাড়িতে থাকতেন। অনেক বড় বাড়ি। কয়েকশ লোক দাঙ্গা শুরুর পরদিন সেই বাড়িটি আক্রমণ করে। চিত্তবাবু তার মা, একজন পূজারী ও একজন বন্ধুকে নিয়ে বাড়ির ছাদে উঠে দাঙ্গাকারীদের বাধা দিতে শুরু করেন। সকাল আটটা থেকে বেলা দু'টো পর্যন্ত দুই পক্ষের লড়াই চলতে থাকে। আক্রমণকারীরা বাড়ির নিচে আগুন লাগিয়ে দেয়। দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে আগুন। ধ্বসে পড়তে শুরু করে বাড়ির ছাদ, তখন তিনি নিজের হাতে মাকে দু-টুকরো করে কেটে আগুনে ফেলে দেন। পরে পূজারী ও বন্ধুকেও আগুনে ফেলে দেন। তার

বন্দুকের গুলি শেষ হয়ে গেলে তিনি নিজের বুকে ছুরি ঢুকিয়ে দিয়ে আগুনে লাফিয়ে পড়েন। আক্রমণকারীরা তার মাথা কেটে নিয়ে বাড়ির সামনের গাছে ঝুলিয়ে রাখে। পোড়াবাড়ির দেওয়ালে লেখা ছিল— "কুকুর চিত্ত, তোর উপযুক্ত শাস্তি হইল – আল্লাহো আকবর- মূর্তিপূজক হিন্দুদের ধ্বংস কর— পাকিস্তান কায়েম হইল, এইরকম আরও নানা কথা।... মানুষের মাঝে মানুষই তো থাকে। সকলে একরকম হয় না। যারা এই ঘটনা নিজের চোখে দেখেছেন তারা বলেছেন, একজন মুসলমান চিত্তবাবুর স্ত্রী ও শিশুকন্যাকে রক্ষা করেছিলেন।"[৮] নোয়াখালির দাঙ্গার দু'আড়াই মাস আগে দাউদাউ পুড়েছে কলকাতা। বাড়িতে- রাস্তায় বয়েছে রক্তগঙ্গা। প্রাণ হারিয়েছে হাজার হাজার মানুষ। মুসলমান নিধনের খবরে বেশি প্রভাবিত হয়েছে নোয়াখালির মানুষ। ছেচল্লিশের কলকাতার রক্তস্রোতের পরিণতি নোয়াখালির মর্মান্তিক নৃশংস পরিণতি। ১৯৪৬ সালের "১৬ই আগস্ট সকালেই জোর করে হিন্দুদের দোকান বন্ধ করার প্রয়াসকে কেন্দ্র) উত্তর পূর্ব কলকাতার মানিকতলা অঞ্চলে (করে লীগের সশস্ত্র কর্মী ও সমর্থকদের দ্বারা এক তরফা হিন্দুদের আক্রমণের যেসব ঘটনার সূত্রপাত হয়, দিন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি ভস্মসাৎ অথবা লুণ্ঠিত ও নারীর অমর্যাদার বহু ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে নিরাপত্তার জন্য হিন্দুদের স্বধর্মীয়দের এবং মুসলমানদেরও মুসলিম অধ্যুষিত পাড়ায় বিপুল সংখ্যায় স্থানান্তরণ করে দেশ বিভাগের ভিত্তি রচনা করা হয়।"[৯] উপন্যাসে দুলালের মতো মানুষের কথা উঠে আসে, যারা হাইমচরের হরিজন। ছেচল্লিশের দাঙ্গায় তাদের জোর করে ধর্মান্তরিত করে দাঙ্গাকারীরা, কলেমা পড়ায়, গোরুর মাংসও খাইয়েছে জোর করে। পরে গান্ধীজী সেখানে গিয়ে তাদের সাহস দিয়ে বলেছেন— এভাবে জোর করে তোমাদের ধর্ম কেড়ে নেওয়া যায় না, তোমরা হরিজন, হরিজনই থাকবে। গান্ধীজী ভূদেব দত্তকেও বলেছিলেন যে তোমার নাতনীকে (মাধুরী) অহিংসার শিক্ষা দেবে, ওর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদও করেছিলেন।

উপন্যাস সতীশ মজুমদারের কাহিনী বর্ণনা করেছেন ঔপন্যাসিক যার পৈতৃক ভিটে ছিল কাজিরখিলে। চাষবাস করে সংসার চলত। দাঙ্গার ভয়াবহতা তাদের সংসারেও নেমে আসে। ঔপন্যাসিক লিখছেন—"দাঙ্গাবাজরা বাড়ি আক্রমণ করে প্রথমে লুটপাট করে। তারপর আমার স্ত্রী বেলার শাঁখা ভেঙে ফেলে, সিঁন্দুর মুছে দেয়। চিৎকার করে বলে, মুসলমান হয়ে যা। আমার মুখের সামনে ছোরা নাচিয়ে বলে, মুসলমান হয়ে যা। ছেলে মেয়েগুলো চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করলে ওদের গলার কাছে ছোরা ধরে দাঙ্গাবাজরা।...তখন একজন বলে তোরা আমাদের সঙ্গে কলেমা বল। লাইল্লাহা ইল্লালাহু।...ওরা আমাদেরকে লুঙ্গি ও টুপি পরিয়ে নামাজ পড়িয়েছে। মেয়েদেরকে নামাজ পড়িয়েছে। শাঁখা-সিঁদুর ছুঁতেও দেয়নি। সবচেয়ে বড় কথা আমাদের বাদল বাবুর বাড়ি থেকে গরু এনে জবাই করেছে। গরুর মাংস রান্না করে আমাদেরকে খেতে

দিয়েছে।”[১০] বাংলাদেশে বসে একজন এরকম করে লিখছেন, ভাবতেও অবাক লাগে! এ বিষয়ে ঔপন্যাসিকের বক্তব্য নিম্নরূপ—

“**প্রশ্ন:** ‘সোনালী ডুমুর’ উপন্যাসে সতীশ মজুমদারের মুখে আমরা শুনছি যে তখন দাঙ্গার সময় হিন্দু ধর্মের মানুষদের উপরে কিভাবে অত্যাচার হয়েছিল, তাদের পরিবারের লোকজনকে কেটে দিয়ে সেই রক্ত পান করানো হচ্ছে অন্যান্যদের। তাদেরকে গো মাংস পর্যন্ত খাওয়ানো হচ্ছে। এগুলো কতদূর সত্য?

সেলিনা হোসেন: এই উপন্যাসের পটভূমি পাকিস্তান আমলের। ১৯৪৬ সালে মহাত্মা গান্ধী এসেছিলেন দাঙ্গা-বিধ্বস্ত নোয়াখালিতে। ১৯৬৪ সালে শত্রু সম্পত্তি আইন পাশ করেছিল পাকিস্তান সরকার। নানাভাবে হিন্দুদের বাড়িঘর দখল করা হয়েছিল। এইগুলো একদম হয়েছিল। আমি যে রিসার্চ করেছি তাতে পেয়েছি এই তথ্য। আমি আবার দেখিয়েছি যে, মানুষ কত নৃশংস-নিষ্ঠুর হতে পারে ধর্মের নামে—এই জিনিসটাও আমার একটা লক্ষ্য।

প্রশ্ন: আচ্ছা, আর আপনাকে এর জন্য সমালোচিত হতে হয়নি?

সেলিনা হোসেন: সমালোচিত হওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। যারা ওই সময়ের মানুষ বা যারা ঘটনাগুলো জানে, তারা তো জানেই যে এটা হয়েছে। এটা নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নাই।”[১১]

কয়েকদিনের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী উপস্থিত হয়েছেন, তিনি সাহস দিয়ে তাদের ধড়ে প্রাণ নিয়ে এসেছেন। এই মানুষগুলো এতটাই ভীত হয়েছিল যে জল খেতে ভয় পেত। যে কোন তরল খেতে ভয় পেত, মনে হত জলের রং লাল। এরকম চণ্ডীপুর, মাছিমপুর, নন্দনপুর, সোনারপুর ইত্যাদি আশপাশের অনেক গ্রামে একই অবস্থা ছিল। এখানে স্রোতা সেলিমের মধ্য দিয়ে উপন্যাসে একটি প্রশ্ন করিয়েছেন ঔপন্যাসিক—‘কেন হিন্দুদের মারা হয়েছিল? কী করেছিল তারা?’ ওর কথার কোন উত্তর দেয় না কেউ। কেন হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা হয় এত বড় প্রেক্ষাপট বর্ণনা করার সাধ্য ওদের নেই বোঝার সাধ্য নেই। (একথার উত্তর ঔপন্যাসিক ফয়েজ আহমদের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন পরে) ভূদেব দত্ত নাতনীর পড়াশোনার জন্য পাশের কোন স্কুলে যাব বলেও পিছিয়ে যায় এই ভেবে যে তাদের জমি যদি দখল হয়ে যায়! এরকম ভয়াবহতার পাশাপাশি ঔপন্যাসিক হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির কথা মাঝে মাঝে তুলে এনেছেন। গান্ধীজীর নেতৃত্বে লীলা নাগের কথা আমরা জানতে পারছি। যিনি ৭ ডিসেম্বর চৌমুহনী থেকে যাত্রা করেছেন কোন যানবাহন ছাড়া পায়ে হেঁটে, ৯০ মাইল পথ হেঁটে রামগঞ্জে পৌঁছেছিলেন ডিসেম্বরের ১০ তারিখে। ত্রান কাজের জন্য, হিন্দু মুসলমানের জন্য দিনরাত কাজ করেছেন গান্ধীজি ও তার অনুগামীরা। সুচেতা কৃপালিনীর কথাও এখানে উঠে এসেছে। “শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনী নোয়াখালি অত্যাচারের কিছুদিন পরই (২০শে অক্টোবর) সেবাকার্য্যের জন্য সেখানে উপস্থিত হন। নোয়াখালিতে কিছুদিন সেবাকার্য্যে

রত থাকিবার পর তিনি কর্মোপলক্ষে দিল্লী যান। তিনি পুনরায় ২রা ডিসেম্বর নোয়াখালিতে ফিরিয়া যান। নারীর অসম্মানে দুঃসহ বেদনায় ও ক্ষোভে-অপমানে ব্যথিত চিত্ত লইয়া তিনি নারী উদ্ধার ও নিপীড়িত নারীদের অশ্রুজল মোচন করিবার উদ্দেশ্যে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া। ভয়াবহ সুদূর পল্লী অঞ্চলে সেবা কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন।”[১২] এখানে সত্যনারায়ণজী-র কথা উঠে এসেছে যিনি গান্ধীজীর আদর্শে এতটাই মুগ্ধ ছিলেন যে, পাকিস্তান সরকার তার নামে ‘কুইট পাকিস্তান’ অর্ডার জারি করলেও তিনি সে অর্ডার অমান্য করে এদেশে থেকে গেছিলেন, বলতেন জেল-জুলুম সহ্য করে হলেও এ দেশে থাকবেন, গান্ধীজীর আদর্শে অহিংসার বাণী প্রচার করবেন।

উপন্যাসে সতীশ বারবার নিজেকে দুঃখের সঙ্গী হিসেবে মনে করেছেন, কারণ তিনি যেখানে যে গ্রামে গেছেন, যখনই তিনি বলেছেন আমি নোয়াখালী কাজিরখালী থেকে এসেছি ১৯৪৬ দাঙ্গায় পীড়িত প্রতিটি মানুষ অতীত ইতিহাসকে স্মরণ করেছে। তাদের সে ট্রমা থেকে তারা বেরিয়ে আসতে পারেনি এখনও। মন্দিরের পুরোহিত সতীশকে মৃদুস্বরে বলেছিলেন আমার মামার পরিবারে আমার মামাতো বোনকে জোর করে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল মুসলমানের ছেলের সঙ্গে। ওই ঘটনার দু মাসের মধ্যে মামা মারা যায়, বাকিরা এদেশে থাকতে চায়নি। ঘর বাড়ি বিক্রি করে চলে গেছে ভারতবর্ষে। তিনি ভেতরে কান্নায় ভেঙে পড়লেন আর কিছু বলতে পারলেন না।

এরপরে আমরা জেনেছি যে গান্ধীজী জয়াগে একটি বুনিয়াদি বিদ্যালয়ও উদ্বোধন করেছিলেন। যেই গান্ধীজী জয়াগে চলে গেলেন, অমনি নোয়াখালীতে প্রচার হয়ে গেছিল যে কলকাতার দাঙ্গায় মুসলমানদের মারা হয়েছে; তাই তারা স্থির করেছিল লক্ষ্মী পূজার দিন তারা হিন্দুদের উপর অত্যাচার করবে। সতীশ মজুমদার স্মৃতিতে টেনে এনেছেন সেই দিনের কথা। “১০ অক্টোবর, ১৯৪৬ সাল। কোজাগরী পূর্ণিমার দিন ভীত সন্ত্রস্ত হিন্দুরা নিজ নিজ গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করল। হঠাৎ আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনিতে প্রায় ২০০০ মুসলমান গ্রামের হিন্দুদের আক্রমণ করল। সম্পূর্ণ নিরস্ত্র সংখ্যালঘিষ্ঠদের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠদের ভয়াবহ হিংস্র আক্রমণ। ভারতের এক প্রান্তে অবস্থিত এক ক্ষুদ্র অখ্যাত জেলা লিগের নায়ক মহম্মদ আলি জিন্নার পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার হিংসাত্মক সংগ্রাম। বীভৎস হত্যাকাণ্ড, গৃহদাহ, লুটতরাজ, নারীহরণ, নারীধর্ষণ, বলপূর্বক ধর্মান্তরিতকরণ। রাস্তাঘাট, টেলিগ্রাফ লাইন কেটে ফেলা হয়েছে। সাঁকো ভেঙে দেওয়া হয়েছে।”[১৩] সেই রাত্রি ছিল কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার রাত। সকালে সতীশবাবু আর কীর্তিনাশন বাজারে যান লক্ষী প্রতিমা কিনতে। কিন্তু তারা কিনতে পারেননি। মুসলমান বন্ধুরা বলেছিল বাড়ি ফিরে যান। কয়েকজন মুসলমান মজা করে জিজ্ঞেস করেছিল— ‘দাদা লক্ষ্মীপূজা করবেন না? নাড়ু খাওয়াবেন না? তারপর হা-হা করে যে হাসি, সে হাসিতে চেনা মানুষগুলো কীরকম অচেনা হয়ে যায়। একই অনুভব ছিল অমিয়নাথ-সুবোধনাথের। তারাও বলেছিলেন— ‘দেশভাগ হলে শেয়াল-কুকুর মানুষ

হয়ে যায়, আর মানুষ শেয়াল-কুকুর'। ১৯৪৭-র ২রা মার্চ তারিখে গান্ধীজি চাঁদপুরে এসেছেন, এখান থেকে তিনি চলে যাবেন বিহারে; সেখানে দাঙ্গা ছড়িয়েছে। আখ্যানে গান্ধীজী যেদিন চাঁদপুর ছেড়ে বিহারে চলে গেলেন, একইদিনে একইসঙ্গে আরেকটি বিদায়ের চিত্র এঁকেছেন ঔপন্যাসিক— মাধবীলতা তার দাদু ভূদেব দত্ত এবং পারুলের মা জয়াগে চলে যাচ্ছেন। গান্ধীজীর চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন মানুষের মনের আশাও চলে যাচ্ছে ক্রমশ।

আখ্যান এরপর চলে আসে কুমিল্লায়। অনিমেষ কুমিল্লায় কলেজে ভর্তি হয়েছে। সেখানে এসে হারিস এবং সুবিমল নামে দুই বন্ধু জুটে। সুহাস দাঙ্গাকবলিত। "দাঙ্গাকারীরা ওর বাবাকে বাড়ি থেকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে। সে বাবার খোঁজ আর পাওয়া যায়নি।...ওর তিন বোনকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। মায়েরও যেন কি হয়েছিল। ও ঠিক জানে না।...কয়েকদিন পর ওর দিদিদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল লোকেরা।"[১৪] কিন্তু সমাজ তাদেরকে ঠাঁই দেয়নি, একটি গান্ধী আশ্রমে তাদেরকে রাখা হয়েছিল, তারা চরকা কেটে দিন যাপন করত। ইতিমধ্যে সুহাসের মা মারা যায়। সুহাস এখন রিক্সো টানে, সেদিন প্রথম উপেন বাবুদের বাক্স-প্যাঁটরা টেনে টেনে তুলে দিয়েছে ট্রেনে। তারা পাকিস্তান ছেড়ে ভারতবর্ষে চলে যাচ্ছে। সেদিন সুহাস বুঝতে পারে দেশভাগ হয়েছে, মানুষ ভাগ হয়ে যাচ্ছে। আশরাফুল চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন 'ট্রেনের বাঁশি বাজলে তিনি জড়িয়ে ধরন উপেন বাবুকে। বলেন— 'আমাদের আবার দেখা হবে উপেন'। এভাবে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতিও চিত্রিত হয়েছে একই ঘটনায়। সুহাসের কাছ থেকে আমরা গান্ধী অনুসারী সেবাকর্মী অশোকা গুপ্তের কথা উঠে আসতে দেখেছি। তার বিভিন্ন অভিযানের কথা শুনেছি। দাঙ্গার ছয় সপ্তাহ পরেও মানুষ গ্রাম থেকে চলে যেতে চাইছিল। একদিন এক স্বামী-স্ত্রীকে বুঝিয়ে থানায় যেতে বলা হয়েছিল, তারা যেন তাদের সমস্ত নির্যাতন বলেন থানায়। মাথায় বড় একটি ঘোমটা দিয়ে স্ত্রী বলে দাঙ্গার দুই মাস পরে আমাকে দুই তিন জন তুলে নিয়ে যায়, প্রতি রাতে, ভোররাতে বাড়িতে রেখে যায়। এই মহিলা একা নন, প্রতিটি দাঙ্গা কবলিত মানুষ সেই ট্রমা নিয়ে বাঁচে। "*Trauma* is the Greek word for 'wound'. Although the Greeks used the term only for physical injuries...The psychological reaction to emotional trauma now has an established name: *post-traumatic stress disorder,* or PTSD. It usually occurs after an extremely stressful event, such as wartime combat, a natural disaster, or sexual or physical abuse; its symptoms include depression, anxiety, flashbacks, and recurring nightmares."[১৫] সেদিন সুহাসও বুঝতে পারে তার মা, দিদিদের সঙ্গে কী হয়েছে!

অনিমেষ কুমিল্লা থেকে বাড়িতে ফিরে এলে জানতে পারে শীলার বিয়ে ঠিক হয়েছে, পাত্রের নাম নৃপেন কুণ্ডু। এদের পরিবারও দাঙ্গা কবলিত। দাঙ্গার সময় ও ছয়-সাত বছরের ছিল। ওর সামনে ওর বাবা-মাকে মেরে ফেলা হয়; বড় দুটি ভাইকে মেরে ফেলা হয়েছিল। সেই দাঙ্গায় ওর একমাত্র বোনকে (বয়স তখন ১৫ বছর) একটি মুসলমান পরিবার তুলে নিয়ে যায়। বিয়ে করেনি, কিন্তু একটি ছেলের সঙ্গে ওকে প্রতিদিন থাকতে হয়েছে। অনেক পরে পুলিশ সে মেয়েটিকে তাদের পরিবারে দিয়ে যায়। এখনো দাঙ্গার ট্রমা থেকে বের হতে পারেনি নৃপেন। তার বিয়ে ঠিক হয়েছে ঠিকই, কিন্তু বিয়ে করতে তার ভয়। অনিমেষকে সে বলেছে- এ বিয়ে করতে আমার ভয় হয়। দাঙ্গার ভয়াবহতা দেখে সে আজও স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারে না। গান্ধীজীর পানিয়ালা গ্রামে যাওয়ার কথাও জেনেছি আমরা নৃপেন বৃত্তান্তে। ছেচল্লিশের দাঙ্গার ট্রমা প্রতিটি মানুষকে ঘিরে রাখে উপন্যাসে।

দাঙ্গার ভয়াবহতা কীভাবে হিন্দু মানুষেরা বহন করে চলেছিল তার চিত্র আমরা অনিমেষ- আশরাফের কথাবার্তার মধ্যে উঠে আসতে দেখি। যখন আশরাফ অনিমেষকে বলেছিল দাঙ্গায় তো আমিও মারা যেতে পারি। তখন অনিমেষ তাকে উত্তর দিয়েছে— “তোকে কেউ মারবে না আশরাফ। তুই তো মুসলমান। দাঙ্গা হবে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে। তুই সংখ্যালঘু নস। আমি হলাম সংখ্যালঘু। দাঙ্গায় সংখ্যালঘুরা মরে।”[১৬] অমিয়নাথ যেদিন অনিমেষকে ঢাকায় ছাড়তে যায়, সেদিনও তার মাথায় ভর করে দেশভাগের ছায়া, বলেন--- আমার ভয় করছে খোকা। এখনো মানুষের দেশ বদল, যাওয়া-আসা শেষ হয়নি। আমি ভুলে যাই না যে, এদেশে আমরা সংখ্যালঘু।

এরপরে উপন্যাসের কাহিনি অনিমেষের সঙ্গে ঢাকাতে পৌঁছে যায়, মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয় সে। ডক্টর নন্দীর কাছে এখন তার যাওয়া আসা। তিনি বিনামূল্যে চিকিৎসা করেন, দূর-দূরান্ত থেকে রোগীরা এসে যাতে শুয়ে বসে বিশ্রাম নিতে পারেন, সেজন্য তিনি বিছানা সাজিয়ে রাখেন, রুগীকে রান্না করে খেতে দেন তাঁর স্ত্রী শান্তি নন্দী। রোগীর কাছে ভগবানের মতো তিনি, হুড়মুড়িয়ে ভিড় করে প্রতিদিন তারা। ড. নন্দী ডাক্তারি পরীক্ষায় গোল্ড মেডেল পেয়েছিলেন, ইউরোপের উচ্চ শিক্ষার বৃত্তি তিনি ছেড়ে ঢাকার শ্রীনগরে মানুষের চিকিৎসার জন্য, সেবার জন্য থেকে গেছিলেন। ডক্টর নন্দীর মেয়ে মন্দিরা অনিমেষকে পঞ্চাশের ভয়াবহ দাঙ্গার কথা শুনিয়েছিল। “বাবা ঢাকায় আসার দু’বছরের মধ্যে একটি দাঙ্গা বাধে। ভয়াবহ দাঙ্গা। আমরা যোগীনগরে থাকতাম। সেদিন ছিল শুক্রবার। তিনদিন ধরে আগুন জ্বলেছে। দাউদাউ আগুন জ্বলছে। পুড়ছে ঘরবাড়ি। দৌড়াচ্ছে মানুষ। যোগীনগর থেকে ঠাটারিবাজার পায়ে হাঁটা পথ। আমরা ঘরের মধ্যে কুঁকড়ে আছি। মা আমাদের জড়িয়ে ধরে কাঁপছেন। বাবা ঘরে পায়চারি করছেন।”[১৭] সেদিন তার বাবার দুই বন্ধু, কাদের আলি আর মুনতাজ আহমেদ বাড়িতে না এলে তাদের যে কী হতো!

ঢাকাতে অনিমেষের আব্দুল মালেক নামে একজন রিক্সাওয়ালার সঙ্গে পরিচয় হয়। সে তার রিক্সোতে প্রতিদিন যাওয়া আসা করে। আব্দুল মালেকের বাবা দেশ (মুর্শিদাবাদ) ত্যাগ করে চলে এসেছেন ঢাকায়; কিন্তু ঢাকায় আসার পর মুর্শিদাবাদকে তিনি ভুলতে পারেননি। তারা বাধ্য হয়ে মুর্শিদাবাদ ছেড়ে এসেছিলেন কারণ তার বাবা বলেছিল এখানে থাকলে হিন্দুরা আমাদের কেটে ফেলবে। অনিমেষের সঙ্গে আব্দুল মালেকের বন্ধুত্ব উপন্যাসে সম্প্রীতির চিত্র তুলে ধরেছে। অনিমেষ চাল ডাল আলু কিনে একদিন আব্দুল মালেকের হাতে দিয়ে বলেছিল- মাসিকে রান্না করতে বলল আমি তোমাদের সঙ্গে খাব।

ডক্টর নন্দীর বাড়িতে এসে অনিমেষ নতুন করে বাঁচার মানে খুঁজে পায়। মন্দিরা-ইন্দিরা পঞ্চাশের দাঙ্গা দেখেছে তবু নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখে, গান করে, নাচ করে, সম্প্রতি রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী উদযাপন করবে বলে রবীন্দ্রনাথের ‘শ্যামা’ নৃত্য নাটকটি রিহার্সাল করছে। আসলে দাঙ্গার পরেও কীভাবে টিকে থাকতে হয়, সেই পাঠ ড. নন্দী, মন্দিরা-ইন্দিরা, ফয়েজ আহমেদ-এরা শিখিয়ে দিয়ে যাচ্ছে অনিমেষকে। গ্রামের সরকার অনিমেষদের বাড়িটি রিকুইজিশন করেছে, বাড়ি ছাড়ার নোটিশ দিয়েছে। সুবোধনাথ মৃদুস্বরে বলে—‘কতবার ঘর ছাড়তে হলো আমাদের! এই নিয়ে তিনবার’। এই ঘটনাতে অনিমেষের মনে পড়ে ‘এক্সোডাসে’র কথা। ‘এক্সোডাস’ হল, বহুলোকের একসঙ্গে চলে যাওয়া। খ্রিস্টপূর্ব ১৩০০ অব্দে মিশর থেকে ইজরায়েলিরা দল বেঁধে চলে গিয়েছিল এভাবে।

এরপরই উপন্যাসে জব্বলপুরের দাঙ্গার কথা উঠে এসেছে। ইন্দিরা-মন্দিরা এবং অনিমেষ গল্প করার সময় ইন্দিরা তাকে জব্বলপুরে গল্প শোনায়। ভারতের জব্বলপুরের দাঙ্গা বেধেছে, শত শত মানুষ নিহত হয়েছে, বেশিরভাগ মুসলমান। খবরটি পূর্ববঙ্গে আসতে সময় লাগেনি। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, চারদিকে গাড়ি চলতে লাগলো। পুলিশের আইজিকে ফোন করে সেদিন কোনো রকমে মুক্তি পাওয়া গেল। এরপরই উপন্যাসে ফয়েজ খবর নিয়ে আসে দাঙ্গার। শহরে গুজব ছড়িয়েছে যে কাশ্মীরের মসজিদে রাখা হযরত মোহম্মদের চুল নাকি হিন্দু কাফেররা চুরি করেছে, সেজন্য বিহারীরা ক্ষেপে উঠেছে, তারা প্রতিশোধ নেবে পূর্ব-পাকিস্তানে। লাঙ্গলবন্ধু হিন্দুদের তীর্থভূমি, সেখানে বিহারীরা লুটপাট করেছে, মেয়েদের নির্যাতন করেছে। ফয়েজ আহমেদ জানে এগুলো সবই রাজনীতি, যে কথা সুবোধনাথ বা সতীশ মজুমদার পূর্বে বলতে পারেনি, তা ফয়েজ অনায়াসে বলেছে অনিমেষকে— “এসব রাজনীতি। ক্ষমতার সাঁড়াশি। এভাবে ক্ষমতাধররা নিজেদের জায়গা ঠিক রাখতে চাই। পুড়ে মরে সাধারন মানুষ। ওদের কাছে মানবিকতা মূল্যহীন।”[১৮] তারপর একদিন ফয়েজ খবর নিয়ে আসে- সন্ধ্যা ছ’টা থেকে কারফিউ লাগানো হবে এবং শহরে দাঙ্গা বাঁধাবে মোনায়েম খান। নন্দীর পরিবারকে সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করে

ফয়েজ, কিন্তু মন্মথ নন্দী যেতে নারাজ। তিনি ভাবেন তাঁকে কে মারবে? এত মানুষের সেবা করেন তিনি, কত মুসলমান আছে তাদের মধ্যে, কিন্তু ডাক্তার সেই মুহূর্তে ভাবতে পারেন নি, হুজুগের কাছে তাঁর এই সেবা হেরে যাবে! নামাজের পর কারফিউ শুরু হয়, "অল্পক্ষণে দাও দাও জ্বলে উঠল আগুন। র‍্যাঙ্কিন স্ট্রিটের চারিদিকে আগুনের শিখা। দাউ দাউ পুড়ছে ঘরবাড়ি। আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে শিখা।"[১৯] ফয়েজ পুরো দমে দাঙ্গা মোকাবিলার জন্য ছাদে চলে যায় বন্দুক নিয়ে। দাঙ্গাকারীরা যেমন আছে, তেমনি ফয়েজ আহমেদের মত মুসলমানও আছে যারা ডক্টর নন্দীকে এই বিপদের দিনেও আগলে রাখতে চাই। বারবার বলা সত্ত্বেও নন্দী সেখান থেকে সরে যেতে রাজি নন, তিনি এই ঘটনা দেখে চুপ হয়ে গেছেন। যেমন স্তব্ধ হয়ে গেছিলেন অনিমেষের বাবা। পুলিশের জিপ গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে অনিমেষ, নন্দী এবং তার পরিবার দেখে যাচ্ছেন ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার আগুন। দাও দাও জ্বলছে ওয়ারি। জিপ যাচ্ছে ঠাঁটারিবাজারের মধ্য দিয়ে। পুড়ছে ঠাঁটারিবাজার। অনিমেষ মনে মনে মাধুরীকে বলে ছেচল্লিশের দাঙ্গায় তুমি রক্তে ডুবে বেঁচে গিয়েছিলে, আর চৌষট্টির দাঙ্গায় আমি আগুনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। এই ঘটনার পর শান্তি দেবীর মনে কোন উৎসাহ থাকে না, মাস দুই কেটে যায়, তিনি প্রায় বোবার মত হয়ে যান। তারপর একদিন টেলিগ্রাম আসে লুধিয়ানার হাসপাতাল থেকে। তার ছেলে ভাস্কর ও শেখর নন্দী দুই স্ত্রী ও শিশু সন্তানসহ মোটর গাড়ি এক্সিডেন্ট করেছে, তারা এখন হাসপাতালে ভর্তি। নন্দী ও তাঁর স্ত্রী তাদের দেখতে রৌনা দেয়, এদিকে আইয়ুব খান বেতারে ভাষণ দিতে শুরু করেন— পাকিস্তানের দশ কোটি মানুষের ঈমান পরীক্ষার সময় এসেছে। তিনি বলছেন ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে কোন যুদ্ধ ঘোষণা করেনি, অথচ আজ ভারতীয় বাহিনী আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রম করেছে। আমরা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছি। ১৭ দিন পর এই যুদ্ধ থেমে যায়। পাকিস্তান সরকার যুদ্ধের পরই 'এনিমি প্রপার্টি অ্যাক্ট' বা শত্রু সম্পত্তি আইন জারি করে। যে আইন হিন্দুদের দেশছাড়া করার একটি প্রক্রিয়া। হিন্দু মানে শত্রু। হিন্দুস্তান হিন্দুদের দেশ আর পাকিস্তান মুসলমানদের। হিন্দুদের জমি-বাড়ির সবই শত্রু সম্পত্তি। যখন তখন দখল করে নিতে পারে সরকার। এদিকে মোনায়েম খানের সরকার নোটিশ জারি করে মন্মথ নন্দীর র‍্যাঙ্কিন স্ট্রিটের ৩৭ নম্বর বাড়িটাকে শত্রু সম্পত্তি ঘোষণা করে। লুট হয় বাড়িতে। কারণ ডাক্তার নন্দী পাকিস্তানের শত্রু। মার্ক্সের আদর্শে বিশ্বাস করে যে মানুষটি শ্রীনগর হাসপাতাল বানাতে গিয়েছিলেন নিজের বৃত্তি ছেড়ে, যে মানুষটি দেশভাগের পর চলে যাননি, পঞ্চাশের দাঙ্গার ভয়াবহতা দেখার পরেও থেকে গিয়েছিলেন, হাজার হাজার মুসলমান সহ এলাকাবাসীদের বিনা টাকায় চিকিৎসা করতেন, সেই মানুষটি আজকে দেশের শত্রু! এভাবেই হয়ত মানুষ কুকুর-শেয়াল হয়ে যায়, আর কুকুর-শেয়াল মানুষ।

তবে উপন্যাসে সম্প্রদায়িক দাঙ্গার চিত্র, ভয়াবহতা যেমন আছে, তেমনি পাশাপাশি সম্প্রীতির চিত্রও আছে। যেমন— ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের ও নজরুলের কথা (বিশেষ করে প্রমীলার সঙ্গে বিয়ের প্রসঙ্গে) এনে সম্প্রীতির কথা তুলে ধরেছেন। একই সঙ্গে নজরুল ব্রিটিশ বিরোধী কর্মকাণ্ড করেছেন সেগুলো বলে উপন্যাসে অনিমেষ বা তার মতো নতুন প্রজন্মকে আন্দোলনের উৎসাহ দিয়েছেন লেখিকা। নজরুল তাঁর ছেলের নাম রেখেছিলেন কৃষ্ণ-মুহাম্মদ, এই নামের মধ্যেও যেন হিন্দু-মুসলিমের সম্প্রীতির চিত্র আমরা উঠে আসতে দেখেছি।

তথ্যসূত্র

১) হোসেন সেলিনা, *সোনালী ডুমুর,* আনন্দ পাবলিশার্স ২০২২ ,প্রথম সংস্করণ ডিসেম্ব , পৃষ্ঠা ১ :।

২) Azad Maulana Abul Kalam, *India Wins Freedom*, Orient Blackswan Private Limited, Reprinted 2020, page-237.

৩) চট্টোপাধ্যায়, ভবানীপ্রসাদ, *দেশবিভাগ পশ্চাৎ ও নেপথ্য কাহিনী,* পঞ্চম মুদ্রণ জুন ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা : ১২।

৪) হোসেন সেলিনা, *সোনালী ডুমুর,* আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ২০১২, পৃষ্ঠা : ২।

৫) বন্দ্যোপাধ্যায় শৈলেশকুমার, *দাঙ্গার ইতিহাস,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পঞ্চম মুদ্রণ মাঘ ১৪২৫, পৃষ্ঠা।৬৩

৬) হোসেন সেলিনা, *সোনালী ডুমুর,* আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ২০১২, পৃষ্ঠা : ৬৭।

৭) তদেব ,পৃষ্ঠা : ৭২-৭৩।

৮) হোসেন সেলিনা, সোনালী ডুমুর, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ২০১২, পৃষ্ঠা : ৭৪।

৯) বন্দ্যোপাধ্যায় শৈলেশকুমার, দাঙ্গার ইতিহাস, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পঞ্চম মুদ্রণ মাঘ ১৪২৫, পৃষ্ঠা : ৫৯।

১০) হোসেন সেলিনা, সোনালী ডুমুর, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ২০১২, পৃষ্ঠা : ৯৬-৯৭।

১১) রায় নবগোপাল ও কুইরী বিশ্বনাথ সম্পাদিত, কথায় কথায় সেলিনা হোসেন, পুনশ্চ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০২১, পৃষ্ঠা : ৩০-৩১।

১২) রায় সুকুমার, *নোয়াখালিতে মহাত্মা,* ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, প্রথম প্রকাশ ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭, পৃষ্ঠা : ৪৬।

১৩) চৌধুরী অশোক, নোয়াখালি ফিরে দেখা, অর্জুন গোস্বামী সমাপদিত, *কলকাতা ও নোয়াখালি দাঙ্গা,* গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃষ্ঠা : ১৭৯।

১৪) হোসেন সেলিনা, *সোনালী ডুমুর,* আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ২০১২, পৃষ্ঠা : ১২৪।

১৫) *https://www.merriam-webster.com/dictionary/trauma*

১৬) হোসেন সেলিনা, *সোনালী ডুমুর,* আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ২০১২, পৃষ্ঠা : ১৭২।

১৭) তদেব ,পৃষ্ঠা : ২২৬।

১৮) তদেব, পৃষ্ঠা : ২৭৬।

১৯) তদেব, পৃষ্ঠা : ২৭৭-৭৮।

Kaivalyopanisad and its' Commentators: A Survey

Monalisa Dutta
Assistant Professor, Dept. of Sanskrit.
Mrinalini Datta Mahavidyapith, Birati

Abstract : The post-vedic minor Upanisad-s are classified into six categories. They are: Vedānta, Yoga, Sannyāsa, vaisnava, Śaiva and Śākta. Even a number of books give us deferent classifications of these minor Upanisads. Among the categories each category has a lot of Upanisad-s under them. KvU generally has belongs into the Śaiva minor Upanisad-s. But here we find a debate. Because a few books maintained this Upanisad into Śaiva state but some texts provide their arguments in the side of Vedānta state. In this way we have accumulated different informations about the KvU. The KvU is one of the minor Upanisad and survives into modern times in two versions, one attached to the KYV and other attached with AthV. In present paper my aim is to determine the actual position of KvU with the light of the present text and help of a lot of commentators who offered their graceful offerings to the Lord in the form of their commentaries. The commentators and the term Kaivalya have been described here in different perspective.

1.0. <u>Introduction</u>:

The post-vedic minor *Upaniṣad*-s are classified into six categories. They are: Vedānta, Yoga, Sannyāsa, Vaiṣṇava, Śaiva and Śākta. Even a number of books[1] give us deferent classifications of these minor *Upaniṣad*s. Among the categories each category has a lot of *Upaniṣad*-s under them. *Kaivalya Upaniṣad* generally has belongs into the *Śaiva* minor *Upaniṣad*-s. But here we find a debate. Because a few books maintained this *Upaniṣad* into *Śaiva* state but some texts provide their arguments in the side of Vedānta state. Now the present position of the *Upaniṣad* is maintained below:

- *Kaivalyopaniṣad* in H.P.Sastris Govt. collection catalogue, is not included under the list of *ŚUp*.

[1] *Cf*. Kunjanaraja Mahashay. *Aprakāśita Upaniṣad*.

- The book *Thirty Minor Upaniṣads*[2] has maintained *Kaivalyopaniṣad* in *Vedānta* state.
- The said book *Aprakāśita Upaniṣad* has been entitled fifteen different *Upaniṣad*-s as *ŚUp*. Where *Kaivalyopaniṣad* has been stated into *Vedānta* state.
- The book *Sixty Upaniṣad of the veda*[3] has maintained Kaivalya *Upaniṣad*-s in *Śaiva* state.
- The book *One Hundred and Eight Upaniṣads* has received this *Upaniṣad*-s in *Śaiva* state.
- Texts of fifteen *Śaivopaniṣad*-s along with the commentaries of Upaniṣad-Brahma-Yogin, edited by A.M.Sastrin have been published from Adyar Library, Madras maintained this *Upaniṣad* into *Śaivopaniṣad*.

2.0. The commentators and the Commentaries of *KvU* are:

Appayācārya	*Bhāṣya*
Upaniṣad-brahmayogin	*Vivaraṇa*
Nārāyaṇāśramin	*Dīpikā*
Rāmānanda	*Dīpikā*
Vijñānabhikṣu	*Āloka*
Vidhāraṇya	*Dīpikā*
Śaṃkarānanda	*Dīpikā*
Sadāśivendra Sarasvatī	*Dīpikā*
Puruṣottama	*Arthasaṅgraha. (Vallabhiya)*
Gaṅgādhara Kavirāja	Comm.
Ānandagiri	Comm.
Upaniṣanmaṅgalābharaṇa	Comm.

Śaṅkarācarya[4]

---

2 Ed. K. Nārāyanasvāmi Āiyār. 1992.

3 Vol.2. Trans. from German by V.M.Bedekar and G.B.Palsule.

3.0. A description of a few Commentators:

3.1.1. Nārayaṇāśramin, as a commentator:

- Nārāyaṇāśramin was an Advaita scholar of 14th century AD. He authored *Dīpikā* commentary on more than 52 *Upaniṣad*s.
- He chose the Northern recension of *Upaniṣad*s for his commentaries.
- The main feature of his *Dīpikā* commentaries are belonging with a very simple in style and easy language of explanation.
- The commentator gave his explanation very briefly. Sometimes he became silent.
- At the beginning of more or less than each *Dīpikā* commentary he wrote a verse mentioning the main texture of the particular *Upaniṣad*s.
- He often quoted a number of verses or lines from different sources like other major *Upaniṣad*s, ŚamU, *Śrīmadbhagavadgītā*, *Vāyupurāṇam*, *Bhaviṣyapurāṇam*, *Brahmāṇḍapurāṇam*, *Viṣṇupurāṇam* etc.
- He referred variant readings of the *Upaniṣad*s. May be he was very much aware of the variant readings, available in different manuscripts of the same text.
- Nārāyanāśramin gave details grammatical explanations if necessary.
- If any verse of a particular *Upaniṣad* is available in any other *Upaniṣad* also, the commentator did mention that properly.

3.1.2. Śaṅkarānanda, as a commentator:

- Śaṅkarānanda was a scholar of 12th century AD.
- The writing style of Śaṅkarānanda is easy, very clear in concept and simple. His explanation style is very particular.
- Mainly he wanted to set up the theory of Brahman instead of Lord Śiva.
- His style of explanation is very similar to the style of Nyāyaprasthāna.
- At the beginning of the commentary he also authored a verse like Nārāyaṇāśramin. But he did not give any details information in his verse like Nārāyaṇāśramin.

---

[4] *Cf.* Prasanna Kumar Sastri. *Upaniṣadāvalī*. (This Śaṅkarācarya and Ādi Śaṅkarācarya are deferent persons.)

- At the last of the *Upaniṣad*s he mentioned his name with his spiritual teacher Śrimad Paramahaṁsa-parivrājakācārya.
- He described the words in many perspective in his commentaries.

3.1.3. Upaniṣadbrahmayogin, as a commentator:

- Upaniṣad-Brahmayogin was a commentator of 18th century AD. He authored *Vivaraṇa* commentaries on 108 *Upaniṣad*s.
- The commentator was also very particular for his word. And gave very brief commentaries of the *Upaniṣad*s.
- The style of explanation is simple, to the point and short. In his commentaries Lord Śiva has established as the main subject.
- His style of explanation is also more similar to Nyāyaprasthāna.
- He has also authored *maṅgalācaraṇa* at the first of each ŚamU, but it did not mention details about the *Upaniṣad*. Sometimes he mentioned the divisions of the *Upaniṣads*, like *Atharvaśikhopaniṣad*.
- He also quoted a few quotations from the *Śrutiśāstra* and *Smṛtiśāstra*.

4.0. What is *Kaivalya* :

The word *Kaivalya* is generally used in Sāṃkhya and Yoga Philosophy. It literally means the existence of *Puruṣa* in essence. In Sāṃkhya philosophy, *Puruṣa* and *Prakṛti* are distinguished from one another. The knowledge of this distinction is responsible for the attainment of *Kaivalya* or liberation. In other orthodox systems the word *Kaivalya* is not used.

4.1. *Kaivalya* in Vedānta:

The Advaitins preferred the word *mokṣa* or *mukti*. Ignorance is the cause of bondage and removal of ignorance means removal of bondage. This is due to the knowledge of Brahman, the ultimate reality of Advaita Vedānta.

4.2. *Kaivalya* in Jainism:

Kaivalya, also known as *kevala jñāna*, means omniscience in Jainism and is roughly translated as complete understanding or the Supreme wisdom. Kevala jñāna is believed to be an intrinsic quality of all souls. The quality is masked by karmic particles that surround the soul. Every soul has the potential to obtain omniscience by shedding off these karmic particles. Jain scriptures speak of twelve stages through which the soul achieves the goal. A soul, who has attained *kevala jñāna* is called a *kevalin*. According

to the Jainism, only *kevalin* can comprehend objects in all aspects and manifestation; others are only capable of partial knowledge.

4.3. *Kaivalya* in Yoga Philosophy:

Kaivalya, is the ultimate goal of *aṣṭāṅga* yoga and means solitude, detachment or isolation. This is the Ultimate stage of *asamprajñāta samādhi*. The soul has been stated as *kebala* or *asamprajñāta*, called *kaivalya*. This stage is the goal of Yoga. And this is possible when the yogi is free from all type of karmic impressions. The desire to live is eternal and impressions are also beginning-less. The thirty four Yoga Sutras of Patañjalī of the fourth chapter deal with impressions left by our endless cycle of birth and the rationale behind the necessity of erasing such impressions. So, who has attained *kaivalya*, as the entity, he must be gain independence from all bondages and achieve the absolute true consciousness, described in *Samādhi pāda*. Patañjalī said that, *puruṣārthaśūṇyānām guṇānam pratiprasavah kaivalyam, svarūpapratiṣṭhā vā citiśaktireti*; means, the resolution in the inverse order of the qualities, perfect of any motive of action for the *Puruṣa*, is *kaivalya*. Or it is the establishment of the power of knowledge in its own nature. The sweet Nature gentle took the self-forgetting soul by the hand, and showed him all the experiences in the Universe, all manifestations, bringing him higher and higher through various bodies, till his glory come back and he remembered his own nature. Some of them are lost their way in the trackless desert of life. But the nature is working, without beginning, without end. And thus through pleasure and pain, good and evil, the infinite river of souls is flowing into the ocean of perfection of self-realisation.

4.4. Kaivalya in *ŚaU*:

In the *ŚaU*, the Supreme God is Śiva. Śiva is the Brahman. Brahman is Ātman. The *Upaniṣad* discuss that the knowledge of self or Ātman is the path of attain liberation or *Kaivalya*. If you know yourself, you know Brahman and conquer the state of *Kaivalya*. This is a personal spiritual journey mentally detached from the outer world.

5.0. General outline of *KvU*:

KvU is another *Upaniṣad* belonging to the *AthV*. As the name suggest, the *Upaniṣad* deals with the ultimate state of *Kaivalya* i.e. super consciousness. According to Yoga Philosophy of Patañjali, *Kaivalya* is the state of enlightenment where *Puruṣa* is established in his real nature.

It is a transcendental state of consciousness i.e. pure consciousness which is within the Realm of *Prakṛti*. Therefore *Puruṣa* is called *Parātpara*, higher than the highest state, completely free from Gunas and Karmas. In this state, the differentiation between *Jīvātmā* (individual soul) and *Paramātmā* (ūniversal soul) are also disappeared.

This *Upaniṣad* elucidates that the ultimate state of *Kaivalya* is attained through self-knowledge alone and not through any other rituals, worship etc. At the end this *Upaniṣad* prescribes meditation and self-investigation. This *Upaniṣad* removes the illution of *Māyā* and reveals the non-dual nature of the self.

This *Upaniṣad* commences its exposition with a quest for *Brahma Vidyā*. Sage Aśvalāyana, teacher of *ṚgV*. didn't find satisfaction in the rituals and sacrifices included by the Vedas. He begins his quest for *Brahma Vidyā* which destroys all elusion.

After that the Grandsire (Brahmā)[5] said to him (the sage) that, this knowledge have known by faith[6], devotion and meditation; neither by works nor by progeny, nor by wealth but by renunciation alone.

Higher (*para*) than the heaven (*nākam*), hidden in the cave, it shines brilliantly into the man of self-restraint (*yati*), who having purified their mind through *sannyāsa-yoga*. They have well ascertained through the intuitive knowledge (*vijñāna*) of the *vedānta*. They all enter into *Brahma-Loka* at the time of final end (*parāntakāle*).

Seeking a solitary place (*viviktadeśa*), sitting in a comfortable posture, maintaining internal and external purity, keeping the neck, head and body in a straight line, transcending all *Āśrama-dharma*s or stages of life, controlling all the senses, bowing with devotion to the teacher. This verse prescribes that a man of self-restraint should resort a solitary place for meditation on the self or Brahman.

Transcending all Āśramas (Brahmacarya etc.), restraining all the senses, reverential saluting (mentally or physically) own preceptor (invisible or visible form) one should meditate in the centre of the lotus of

---

[5] The Grandsire (Brahmā)- A common epithet of the creator, who is the father of the Prajāpatis, from whom all beings have proceeded.

[6] Faith- the knowledge of Brahman cann't be given through words, this methods are prescribed.

the heart which is pure, with passion, clear, shining (*viśadam*) and free from sorrow (*viśokam*).

Absolute Brahman is beyond the reach of mind and intellect, beyond the purview of sense perception, infinite in form, auspicious, eternally tranquil, immortal, cause of the creator Brahmā, without beginning, middle and end, only one who is omnipresent (*vibhum*), consciousness, bliss, formless and supernatural.

Brahman is beyond the subject-object relationship of the intellect (*acintya*). He is the knower, known and knowledge. This non-dual nature of absolute Brahman is Śivam because it is free from all the cause of evil. He is the eternal truth and hence described as eternally tranquil (*praśāntam*). This truth is the basis of creative power. Thus, the absolute Brahman is the origin of the very creator (*Brahma yoni*).

By the meditation of the three-eyed, blue-necked lord with Umā, a sage attains him in beyond the darkness.

He is Brahmā, Śiva, Indra, Viṣṇu, Prāṇa, time, fire, moon and the supreme also. He alone is all. So, by knowing him one transcends death. Making the Atman as lower Araṇi and Om in upper, a wise man burns up the Pāśa.

Next a few hymns explain the different states of consciousness. Simultaneously the realisation of the great support of the universe, subtler than subtle and eternal Brahman that- 'I am Brahman' is liberated from all bounds. Then the verses describe the experience of disciple in the state of Brahmic consciousness. Here we find a similarity with the *Śvetā*[7].

6.0. Conclusion:

The word *Kaivalya* means Mokṣa. *Kaivalya* is derived from the word kevala, means without a second thing, matchless or non-dual, *advitiya*. Whatever is without a second, must be infinite, complete, full, *pūrṇa*. The absolute surrender to the Guru is the only way to get the Supreme knowledge or jñāna of liberation. Lord Śiva is represented here as the Supreme Being. The devotees believe that Lord Śiva is the creator, preserver and destroyer of all and a cause of transcendental virtues. In present paper I try to determine the actual position of KvU with the light of the present text and help of a lot of

[7] *Cf. Śveta*. (III.19) with the verse "*apāṇipādo…*" (21) from this *Upaniṣad*.

commentators who offered their graceful offerings to the Lord in the form of their commentaries.

List of Abbreviations:

AthV= Atharvaveda.
Comm.= Commentary.
KYV= Kṛṣṇayajurveda.
KvU= Kaivalyopaniṣad.
ṚgV= Ṛgveda.
ŚaU= Śaivopaniṣad.
Śvetā= Śvetāśvataropaniṣad.

Bibliography

Aṣṭottaraśatopaniṣatsu Śaiva- Upaniṣadaḥ, with the commentary of Upaniṣad-Brahma-Yogin. Ed. A. Mahadev Sastri. Delhi: Oriental Book Centre, 2008. Print.

Eight Minor Upaniṣads (*Path of Liberation*). Ed., trans. and notes. Pradeep. Delhi: Parimal Publication, 2008. Print.

Minor Upaniṣads. Ed. Swami Madhavananda. Kolkata: Advaita Ashrama. 2008 (10th ed.). Print.

Minor Upanishads, with text introduction, Eng. rendering and comments. Almora, Himalayas: Advaita Ashrama, 1938 (3rd ed.) (1st ed. 1928). Print.

Pātaṇjal Yogadarśaṇam. Pataṇjalī. Ed. Ramasankar Tripathi. Varanasi: Chaokhamba Krishnadas Academy, 2007. Print.

The Thirty Minor Upaniṣads. Trans. K. Narayanaswami Aiyar. Madras (now Chennai): The Adyar Library, 1914. PDF.

Internet sources:

https://en.m.wikipedia.org
http://www.hinduonline.co
http://yogaeducation.org
http://www.researchgate.net

A comparative study between the Buddhist and Hindu philosophy on women's rights and education

Ghaneshyam Mandal
Post Graduate, Dept. of Philosophy,
University of Kalyani

Abstract: This journal presents a comparative study of Buddhist and Hindu philosophies on women's rights and education. The research delves into the historical context of both religions, exploring the roles of women in ancient societies and their evolution under the influence of Buddhist and Hindu thought. The study analyses the core teachings of Buddhism, including the Four Noble Truths and the Eightfold Path, and how they relate to gender equality. Similarly, it examines Hindu religious texts such as the Vedas and Upanishads to understand the position of women within the Hindu philosophical framework. The social implications of these religious philosophies on women's status, education, and participation in society are also explored. Moreover, the research examines historical and contemporary efforts by Buddhist and Hindu communities to empower women through education and social reform. Lastly, the study discusses the modern perspectives and challenges in achieving gender equality and women's empowerment within these religious contexts. The findings contribute to a deeper understanding of the intersections between religion, women's rights, and education in Asian societies and highlight the ongoing work towards fostering gender equality and social justice.
Key Words: Buddhism, Hinduism, Gender Equality, Women rights, Education, Religious Influence, Asian Societies.

Introduction:

The status of women and their rights has been a subject of great importance and debate across various societies and throughout history. In Asian cultures, two major religions, Buddhism and Hinduism, have played a significant role in shaping gender norms, women's roles, and

access to education. This journal presents a comparative study of Buddhist and Hindu philosophies on women's rights and education, seeking to understand how these belief systems have influenced the position of women in their respective societies. Buddhism and Hinduism have deep-rooted histories, with origins dating back several millennia. As these religions spread and evolved, they not only impacted spiritual practices but also influenced the social and cultural landscapes of the regions they touched. Consequently, their teachings have left enduring imprints on the roles and rights of women in Asian societies. In the ancient world, women often faced various challenges and limitations when it came to their rights and opportunities. However, both Buddhism and Hinduism presented unique perspectives that sometimes challenged prevailing norms and, at other times, reinforced traditional gender roles. By examining these perspectives, we can gain valuable insights into the philosophical underpinnings that shaped women's status and education in their respective religious contexts. Buddhism, founded by Siddhartha Gautama, the Buddha, emerged in the 6th century BCE in ancient India. The Buddha's teachings focused on the Four Noble Truths, emphasising the alleviation of suffering and the pursuit of enlightenment through the Eightfold Path. As we delve into Buddhist philosophy, we will explore whether these core principles held implications for gender equality and whether women were afforded opportunities for spiritual growth and education within Buddhist monastic communities. Hinduism, one of the world's oldest religions, has a vast and diverse collection of sacred texts, rituals, and philosophical treatises. It is deeply woven into the tapestry of Indian society, and its principles have played a pivotal role in shaping social norms. Within the framework of Hindu philosophy, concepts like "dharma" (duty/righteousness) have influenced gender roles and prescribed certain responsibilities for women. We will examine the extent to which Hinduism has supported or limited women's rights and educational pursuits. The comparison of Buddhist and Hindu perspectives on women's rights and education will illuminate areas of convergence and divergence between these two religions. This study aims to highlight historical trends and social implications, shedding light on the religious and cultural factors that have affected the empowerment of women in

Asian societies. Furthermore, we will investigate the efforts made by Buddhist and Hindu communities over the years to empower women through education and social reform. By understanding the initiatives and challenges faced in promoting gender equality within these religious contexts, we can better appreciate the contemporary landscape of women's rights in Asian societies.

Objective:

1. To explore the historical context: Investigate the historical roles of women in ancient societies influenced by Buddhism and Hinduism and trace the evolution of gender norms and women's rights within these religions.
2. To understand Buddhist perspectives on women's rights and education: Analyse the core teachings of Buddhism, including the Four Noble Truths and the Eightfold Path, and their implications for gender equality. Examine the roles of women in Buddhist monastic communities and their access to education.
3. To comprehend Hindu perspectives on women's rights and education: Examine Hindu religious texts such as the Vedas and Upanishads to understand how the concept of "dharma" influenced gender roles, women's education, and participation in religious rituals.
4. To assess the social implications of these religious philosophies: Investigate how Buddhist and Hindu teachings have influenced the legal and cultural status of women in Asian societies, as well as their access to education and opportunities for personal and professional growth.
5. To explore women's education and empowerment initiatives: Investigate historical and contemporary efforts made by Buddhist and Hindu communities to empower women through education and social reform. Highlight the contributions of individuals and organisations working towards challenging traditional gender norms and promoting gender equality within their religious contexts.
6. To analyze modern perspectives and challenges: Examine how the philosophical perspectives on women's rights and education in Buddhism and Hinduism have evolved in contemporary times. Address the challenges that still exist in achieving gender equality and women's

empowerment within these religious frameworks and the broader societies they influence.

Buddhist and Hindu philosophy on women's rights reveals both similarities and differences in their attitudes and treatment towards women:

Similarities:

Recognition of Spiritual Potential: Both Buddhist and Hindu philosophies acknowledge the spiritual potential of women. In Buddhism, women were allowed to become bhikkhunis (nuns), providing them with opportunities for spiritual practice and advancement. Similarly, Hinduism recognizes the importance of women's participation in religious rituals and considers goddesses as divine and powerful beings.

The Impact of Cultural and Social Context: Both traditions have been influenced by the cultural and social norms of the regions in which they developed. As a result, women's rights and roles in society have been shaped by the prevailing attitudes and practices of their respective communities.

Diversity of Interpretations: Both Buddhism and Hinduism encompass a wide range of beliefs and practices, leading to diverse interpretations regarding women's rights. Different sects and regions within each tradition might have varying attitudes towards women's roles and social status.

Differences:

Monastic Order: Buddhism has a more established history of allowing women to join the monastic order as bhikkhunis. While this provided some women with opportunities for education, spiritual growth, and independence, the ordination of women has been a contentious issue in certain Buddhist countries and sects.

In contrast, in Hinduism, women historically did not have the same level of access to the monastic path as men. While there were instances of women pursuing spiritual pursuits, it was less common compared to Buddhism.

Caste System: Hindu society has been significantly influenced by the caste system, which has implications for gender roles and women's rights. The traditional caste system has often restricted opportunities for women

from lower castes, limiting their access to education and other rights (VERMA, 2018).

Gender Roles in Mythology: Hindu mythology features a mix of empowering and disempowering depictions of women. While goddesses are revered, there are also stories that perpetuate gender stereotypes and discrimination. In Buddhism, the focus is more on the teachings of the Buddha rather than elaborate mythological narratives (LEE, 2020).

Treatment of Widows: In historical Hindu society, widows faced severe social discrimination, with some traditions encouraging practices like Sati (a widow self-immolating on her husband's funeral pyre). While these practices have been legally banned, their impact on societal attitudes lingered for some time.

Women's Rights:

Buddhism:

In the early days of Buddhism, the Buddha's teachings were seen as relatively progressive concerning women's rights compared to some prevailing societal norms. The Buddha allowed women to join the monastic order and become bhikkhunis (nuns), which was a significant departure from the exclusion of women from spiritual pursuits in many other contemporary religious traditions (VIDYARANYA, 1999).

However, as Buddhism spread to different regions, the status of bhikkhunis varied greatly. In some countries, women faced significant discrimination and restrictions within the monastic community. For example, in Theravada Buddhism, women's ordination is still a contentious issue in some countries (Tanaka, 2020).

Hinduism:

Hinduism's approach to women's rights has been more diverse due to its vastness and the existence of numerous sects and practices. Historically, women had prominent roles in Hindu religious texts and mythology, and there were revered female figures like goddesses (GOPALAN, 2015).

However, Hindu society has also been influenced by patriarchal norms and practices, leading to the subordination of women in various contexts. The caste system and its association with gender roles have often perpetuated discrimination against women, especially in certain traditional and rural communities (SENGUPTA, 2017).

Women's Education:

Buddhism:

Buddhism places a strong emphasis on knowledge, education, and intellectual development. During the time of the Buddha, both men and women were allowed to renounce their household life to pursue a monastic life, which included the pursuit of education and philosophical study. Buddhist monastic institutions were centres of learning and scholarship (VIDYARANYA, 1999).

Regarding lay followers, there were opportunities for both men and women to receive education, though historical factors such as social norms and regional practices played a role in shaping access to education for women.

Hinduism:

In ancient Hindu society, education was predominantly reserved for the upper castes, and opportunities for women's education were limited. In the early Vedic period, some women from the upper classes might have received education in domestic skills and religious rituals, but access to broader education was restricted (Mondal, 1999).

As with Buddhism, there were exceptions, and some women in royal or elite families could receive education and participate in intellectual pursuits. In modern times, efforts have been made to promote education for women across Hindu communities (SHARMA, 2016).

Buddhist Philosophy on Women's Rights and Education:

In Buddhism, the teachings of Gautama Buddha advocate for equality and compassion for all beings, including women. Some key points to consider are:

Equality: The Buddha taught that all individuals, regardless of gender, race, or social status, have the potential to attain enlightenment (nirvana) and become liberated from suffering (dukkha) (VIDYARANYA, 1999).

Ordination: The Buddha allowed women to join the monastic Sangha (community of monks and nuns) at a time when women's participation in religious life was rare in many other traditions.

Path to Enlightenment: The Buddhist path emphasises individual effort and personal responsibility, allowing women equal opportunities to pursue spiritual growth and liberation.

Historical Context: While early Buddhism provided opportunities for women, over time, certain cultural and societal factors led to some limitations in women's participation in religious roles and leadership (LEE, 2020).

Hindu Philosophy on Women's Rights and Education:

Hinduism is a vast and diverse religion with various philosophical schools, texts, and practices. Some aspects to consider regarding women's rights and education in Hinduism are:

Vedic Period: During the Vedic period (1500 BCE - 500 BCE), women had relatively higher status, and some women scholars participated in intellectual and philosophical discussions. Examples include Gargi and Maitreyi from the Upanishads (GOPALAN, 2015).

Changes over Centuries: As Hinduism evolved, certain texts and social norms emerged that led to the restriction of women's rights, particularly in matters of inheritance and access to education. Manusmriti, an ancient legal text, is often criticised for its patriarchal views (Huang, 2019).

Goddesses: Hinduism has a rich tradition of worshipping goddesses, which, to some extent, offers a counterbalance to patriarchal norms. Goddesses like Saraswati (goddess of knowledge) and Lakshmi (goddess of wealth) embody knowledge and prosperity (SEN, 2014).

Modern Reforms: In recent times, various Hindu reform movements have emerged, advocating for women's rights, education, and gender equality.

Comparative Perspective:

While both Buddhism and Hinduism have philosophical elements that promote equality and respect for women, historical and cultural factors have influenced the extent to which these principles have been implemented in practice.

Buddhist teachings on individual liberation may have provided more direct access to spiritual opportunities for women compared to certain Hindu traditions, which have historically had more institutional and societal barriers.

Both religions have had periods of openness and restriction regarding women’s rights and education, and these aspects has evolved over time.

Conclusion:

This comparative study provides valuable insights into the historical, philosophical, and sociocultural aspects of women's rights and education in Buddhism and Hinduism. Both religions have played pivotal roles in shaping gender roles and women's empowerment in their respective societies. While Buddhism's teachings on gender equality and the establishment of the Bhikkhuni Sangha set an important precedent, Hinduism's diverse scripture leaves room for varied interpretations regarding women's roles and status.

As we move forward, it is essential to recognize and address the challenges that continue to impede progress towards gender equality within both religious traditions. By fostering a more inclusive and gender-sensitive approach, we can build upon the positive aspects of these ancient belief systems to create a more equitable and just society for all, regardless of gender. It is through collective efforts and a deep understanding of our historical roots that we can truly promote women's rights and education in Buddhist and Hindu communities and beyond.

References:

GOPALAN, R. (2015). Women’s Empowerment in Hindu Scriptures: A Comparative Analysis of Vedas and Upanishads. . Journal of Gender Studies in Religion, , 145-162.

LEE, S. K. (2020). Gender Roles and Women’s Status in Early Buddhist Societies: A Case Study of Theravada and Early Mahayana Traditions. Religian And Society, 315-330.

SEN, D. (2014). Bharatiya Darshan. KALKATA: West Bengal State Book Board.

SENGUPTA, A. (2017). The Influence of Patriarchal Interpretations on Women’s Rights in Hinduism. Feminist Theology Review, 180-195.

SHARMA, C. D. (2016). A Critical Survey Of Indian Philosophy. Delhi: MLBD.

Tanaka, Y. K. (2020). Reinterpreting Buddhist and Hindu Texts for Gender Equality: Insights from Modern Religious Scholars. Journal of Contemporary Religion, 76-92.

VERMA, R. M. (2018). Women's Empowerment through Education: Initiatives in Buddhist and Hindu Communities in India. International Journal of Women's Studies,, 45-60.
VIDYARANYA, S. (1999). Bauddha darshan o dharma. Kalkata: West Bengal State Book Board.
Huang, Y. (2019). Buddhism and Gender Equality: A Comparative Analysis of Buddhist Nuns' Educational Opportunities in Different Countries. Journal Of Buddhist Studies , 108-125.
Mondal, P. K. (1999). Bharatiya Darshan. Kolkata: Prograsive Publisher.

ONLINE TEACHING-LEARNING AND ACADEMIC ACHIEVEMENT OF UNDERGRADUATE STUDENTS DURING COVID-19 SITUATION

Asim Datta
State Aided College teacher
Department of Education
Behala college, West Bengal

Abstract : Many educational institutions worldwide suspended classroom teaching-learning due to the novel coronavirus pandemic and switched to online teaching. Most educational institutions have shifted to online learning platforms to keep the academic activities going. The present study aims to find out the online ways of teaching-learning process and evaluation system during COVID-19 situation, to find out whether there is significant difference the gender basis undergraduate students on their academic achievement. 90 male and female undergraduate students from humanities stream from different general colleges under the university of Calcutta participated in the study. Questionnaire constructed by the researcher self and academic records of the concern students were used in this study. The researcher collected the data through online. The survey research design was used in this study. The mixed method approach incorporating both quantitative and qualitative analysis was adopted. Teachers and students are both used different ways in taken online classes during COVID-19 situation. Gender had not significant impact on academic achievement.
Key Word : Online teaching-learning, Academic achievement, Undergraduate, COVID-19.

Introduction :

The covid-19 lockdown situation affected people all over the world. The pandemic of covid-19 caused several Schools, colleges and universities to remain temporally closed. Face to face education has ended by numbers schools, colleges and universities. This will negative impacts is crucial at this stage. Educational agencies are trying to find alternatives ways to

manage this difficult circumstance. This shutdown simulated the growth of online educational activities so that there would be no interruption to education. Many faculties have been involved in how best to offer online course material, involve students, and perform evaluations. Online teaching-learning is described as learning experiences using various electronic devices (smartphone, laptops, computers etc.). With internet availability in synchronous or asynchronous environmental conditions. Online teaching learning could be a platform that makes the process of education more student created, creative and flexible. The government of India started thinking gravely on this matter with emphasizing on ICT and use of online education as the part of compulsory teaching learning process at tertiary level. Moreover, it is reflected on preparing draft new education policy 2019 that has been regarded as a proactive and highly techno efficient step in the time this pandemic. Indian's apex regulatory body of higher education, UGC, has taken the present educational scenario very seriously and put some efforts proactively to resolve the deadlock of completing course and examinations in on-going semesters as well as issued circular regarding the academic achievement calendar after the recommendations of one of the committee's constituters by UGC itself. The educational scenario of the post COVID-19 outbreak would not be easy to manage teaching learning situations without using online teaching platforms rigorously. In this situation academic achievement can be generally defined as achieving a particular result in an online assignment, exam, subject or degree and is or dearly expressed in terms of a numerical grade or grade point average.

Objectives of the study:

i. To know the online way of teaching-learning process during COVID-19 pandemic.
ii. To know the online way of evaluation system during COVID-19 pandemic.
iii. To compare the academic achievement between the boys and girl's students at Undergraduate level.

Research design: Research design explain how you will find answer to your research question. It sets out the logic of your inquiry. Design of the research is a plan of procedure and strategies to be undertaken in research study. It is conceptual framework or the blueprint of detail activities within which the research is carried out. Good research design helps the

researcher to conduct the work with economy in time and effort. The survey research design was used in this study. The mixed method approach incorporating both quantitative and qualitative analysis was adopted. In this type of research, the investigator collects both type of data during the study and compiles the necessary information in the interpretation of the results.

Tools: Tools are described as a device use to collect the data, facilities observation and measurement of variables. They are implements without which exploration of mechanical efficiency is impossible for technicians; various tests inventories and scales have the same importance and role for social and educational psychologists. For present study data was collected through questionnaire. A questionnaire has been prepared by the researcher to know the online way of teaching learning process and evaluation system. Academic record (marks of B.A 3rd semester university examinations) of Education Honours students marks has been collected from individually to know about the academic achievement.

Sampling:A total number of 90 students were randomly selected in this study. There were five undergraduate general degree colleges (under Calcutta university) in total selected for this study. This colleges co-educational respectly. Third semester Education hons students were randomly selected into two group, students are selected following the random sampling techniques.

Dataanalysisand findings:

Objectives I: To know the online way of teaching learning process.

Table:1.1 Status of online teaching-learning using Apps

Online learning Apps	Percentage of using Apps
Google Meet	60%
Webex Meet	25%
zoom	15%

Table 1.1 revealed that, online teaching learning is using apps Google Meet Apps 60 %, Webex Meet Apps 25 % and Zoom Apps 15%.

Table:1.2 Status of using strategies during online classes

Strategies	Percentage of online classes using strategies
White board	05%
Video on	35%
Screen share	60%

Table 1.2 revealed that, teacher during online classes strategies use white board 05 percentage and switching on video 35 percentage and screen share with students 60 percentage.

Objectives II: To know the online way of evaluation system.

Table 2.1Status of different ways to received question paper during online examination

Online different ways	Using online ways percentage
College website	70%
Link	20%
Email	10%

Table 2.1 revealed that, online examination questions papers students received through different online ways. college website 70%, link 20% and email 10%.

Table 2.2 Status of different online ways to submitted answer script during online examination

Different online way	Using ways percentage
Link	80%
Email	12%
WhatsApp	04%
Others	04%

Table 2.2 revealed that, online different ways to submitted answer script through students during online examination by link 80%, email 12%, WhatsApp 04% and others way 04%.

3 Objectives III: To compare the academic achievement between the Boys and Girls students at under graduate level.

Ho 1: There is no significant difference between Boys and Girls undergraduate students with respect to their academic achievement.

Table 3.1Independent t test analysis on the impact of gender on the academic achievement of under graduate students.

	Gender	N	Mean	Std. Deviation	df	t
Academic achievement	Boys	45	304.511	44.10	88	0.020
	Girls	45	304.311	48.70		

Note: N= Number of students, df= degree of freedom, t= t calculated value.

Calculated value of t = 0.020
Critical value of t at 0.05 level = 1.662, at 0.01 level = 1.987
This table 3.1 also shows that, calculated value < critical values at 0.01 and 0.05 level. Therefore Ho 1 is accepted at both levels.Therefore Boys and Girls has no significant impact on the academic achievement of under graduates students.

Conclusion:

To the prevent spread of the novel Coronavirus, the contours of education system are changing with online education becoming the primary means of instruction. The findings of this study indicated that different online ways of teaching learning process and evaluation system during COVID-19 pandemic. The online learning was found to be advantages as it provided flexibility and convenience for the learners. However, most students also reported that online classes could be more challenging than traditional classroom because of the technological constraints, delayed feedback and inability of the instructor to handle effectively the information and communication technologies. Another challenge would be to succeed in changing the way teachers interact and communicate with students. Students' lack of active learning, critical thinking skills, their lack of ability to debate express their opinion are now becoming prominent in the higher education system in process of online learning. If during face-to-face courses teachers still managed to find methods to encourage students to develop such skills, in the online environment it seems very difficult for teachers to find new methods.

The lesson learnt from the COVID-19 pandemic is that teachers and students should be oriented on use of different online educational ways. After the COVID-19 pandemic when the normal classes resume, teachers and students should be encouraged to continue using such online ways to enhance teaching and learning. It is of utmost importance that teachers are available and open to students needs in order to increase their engagement and involvement in the educational process.

References:

- Mangal S. K. (2014); text book of statistics in psychology and education. Delhi. PHI learning private limited.
- Koul Lokesh. (2009); Methodology of educational research, U.P, Vikas Publishing House PVT. LMT.

- Creswell. W. John. (2015). Educational research, Noida, Pearson India Education Services PVT. LMT.
- Sidhu Sing Kulbir. (2014); Methodology of research in education. New Delhi. Sterling publishers (p) ltd.
- Paul, Behara & Pandey (2020); Technology in Education. Kolkata. Rita publication.
- Pokhrel Sumitra & Chhetri. (2020); A literature review on impact of COVID-19 pandemic on teaching and learning. Higher education for the future 8(I) 133-141.
- Dhawan Shivangi. (2020); Online learning: A panacea in the times of COVID-19 crisis. Journal of educational technology systems. Vol 49 (I) 5-22.
- Mahyoob Mohammad; Challenges of e-learning during the COVID-19 pandemic experienced by EFL learners. AWEJ, volume II, ISSN; 2229-9327.
- Nurdiawati Ela. (2020); University students online learning system during COVID-19 pandemic: Advantages, Constraints and Solutions. Vol. II, Issue 7,
- Slimi Zouhaier. (2020); Online learning and teaching during COVID-19: A case study from Oman, International journal of information teaching and language studies, Vol 4, Issue 2, pp 44-56.
- Wolters & Hussein. (2015); Investigating grit and its relations with college students' self-regulated learning and academic achievement. Metacognition learning. Vol. 10, pp 293-311.
- Strawser & Deborach Richmand; Student perception of teaching effectiveness and learning achievement: A comparative examination of online and Hybrid course delivery format. ISSN: 1740-4622.

Sundarban - In Dichotomy of Development and Marginality

Moumita Ghosh
Assistant Teacher, Dept. of Geography,
Tentulberia Anukul Chandra High School (HS)

Abstract: The word "development" means to create a better life for every people of the society by meeting their basic or essential need. In post globalisation period, center and state governments introduced various types of developmental schemes to improve the life of under privileged people of Sundarban Region. Practically some of these infrastructure developmental projects and schemes beneficial for one section of people of that area but another section of people are economically, socially and culturally marginalised after these project come into action. This paper mainly concentrate on thirteen CD Blocks of Sundarban Region of South 24 Parganas district and aims to identify how development induced marginality occurred and how some developmental schemes helps marginal people of the study area. As developmental project must not confine within the economic growth of that region but it's also having the responsibility to develop the socio-economic life of the local people.This paper also attempts to understand the developmental process and argue on is the basis of development is democratic or not and analysis the cause and effect of marginalization, which is the worst form of oppression and also suggests some rehabilitation scheme to sustain these marginalised people and give them social security.
Keywords: - development, marginalisation, rehabilitation, social responsibility, social security.

1. Introduction

"Development consists of the removal of various types of unfreedoms that leave people with little choice and little opportunity of exercising their reasoned agency. The removal of substantial unfreedoms, it is argued here, is constitutive of development." - Amartya Sen, Development as Freedom, 1999.

"An involuntary position and condition of an individual or group at the margins of social, political, economic, ecological, and biophysical

systems, that prevent them from access to resources, assets, services, restraining freedom of choice, preventing the development of capabilities, and eventually causing extreme poverty" - Franz Gatzweiler, Marginality: addressing the root causes of extreme poverty, 2011.

This is a case study based work, mainly based on two fundamental concepts of development and marginalisation and conducted in selected sub-divisions of South 24 Parganas district, West Bengal, which emphasizes on how local people of an almost underdeveloped region responded to specific infrastructural, economic, educational and cultural dimensions of developmental projects. The primary research question of this inquiry is to find out the implications of state-sponsored policies and projects on development for the betterment of standard of living of the people, and at times how these lead to marginalisation in contradiction to development.

In 1990s, the concept of Millennium Development Goals (MDG) had crystallized and came into action by the year 2000, with the most important goal of eradicating poverty by some time-bound targets that recognized interdependence among growth and poverty reduction; and it acknowledged that the foundation of development must rest on democratic governance, rule of law and respect for human rights (UN Development Goals). Thus, the concept of 'democratic development' emerged as the most modern concept of development which focused on democratic control over economic progress as a central theme of our age. Social transformation and pro-poor policy on equality, possibility, and livelihood are the condition of democracy which means collective freedom to make the basic decisions to determine individual and social existences (Peet, 2009).

According to International Geographical Union (2003), marginality is a temporary state of living in relative isolation at the edge of economic, social, cultural and political systems. There are two major conceptual frameworks in marginality: viz. (i) Societal framework which focuses on various dimensions like demography, religion, culture, caste, class, gender, economic and political aspects of individual and public in connection with access to resources. Here, the main emphasis is placed on understanding of the actual cause of inequality, exclusion from the main stream, and spatial segregation of the people living in the same society (Brodwin, 2001); and (ii) Spatial dimension of marginality that

mainly emphasises on the physical location and distance from the centre of development lying in the edge of the system (Larsen, 2002; Leimgruber, 2004). Moreover, marginality emerges at various scales in different socio-economic and geo-political environment, and marginality is defined as a dynamic concept (IGU, 2003).

Socially marginalised people when live in the geographically isolated areas, they are actually standing in the overlap area and are extremely distressed.

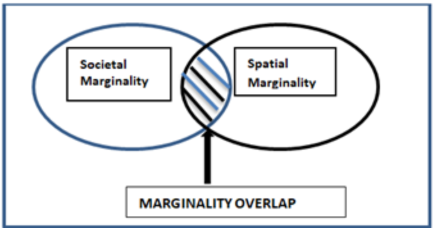

Fig. 1: Diagrammatic Representation of Marginality Overlap. (Source-Muller-Boker et al., 2004).

A section of people are excluded from not only economic growth but also other dimensions of development and progress, and they are indicated as extremely poor being in the margin of society and marginality is frequently considered as root cause of poverty, so marginalised poor are those who are affected by marginality and poverty.

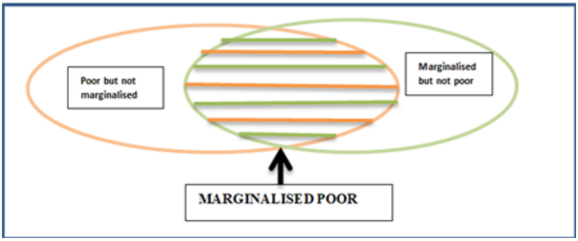

Fig. 2: Diagrammatic representation of Marginalised Poor (Source-Gerster, 2000).

2. Study Area and Types of Marginality

The Sundarban region is one of the richest ecosystems in the world. The region contains arguably the world's largest remaining area of mangroves, and is known for its exceptional biodiversity, About 40 per

cent of the nearly 10,000 square kilometres (km2) of the Sundarban forest lies within West Bengal; the rest is in Bangladesh. . The Sundarban were originally measured (about 200 years ago) to be of about 16700 sq.km. Today, the area has been reduced and comprises approximately, 1,000 sq.km. of mangrove forests in 102 islands, with about400 interconnected tidal rivers, creeks and canals. After the Partition of India, Bangladesh received about 2/3rd of the forest; the rest is on Indian side (Sarkar, 2011). Administratively the Sundarban region is covered by two districts of West Bengal, namely North 24 Parganas and South 24 Parganas,this region was marked by Dampier-Hodge line in the north western part and district boundary of North 24 Parganas in the east. But I have confined this study in selected areas of the 13 Community Development (CD) blocks of South 24 Parganas district. As general idea on demography, socio-economic status of the people, development and development-induced marginality and poverty are important issues for my study conducted on the basis of secondary information obtained for these CD blocks. However, I have chosen four sites of this area to analyse different types of marginality. These four sites are located in four CD blocks, namely- Canning I, Namkhana, Kakdwip and Joynagar to explain various dimensions of marginality.

I. Development-Induced Occupational Displacement and Economic Marginality: Case Studies in Canning I and Namkhana CD Block
II. Development Schemes to Reduce Marginality for Empowerment of Socially Marginal Groups in Kakdweep Block
III. Cultural Marginalization due to Globalisation: A Case Study of Gajan in Joynagar CD Block

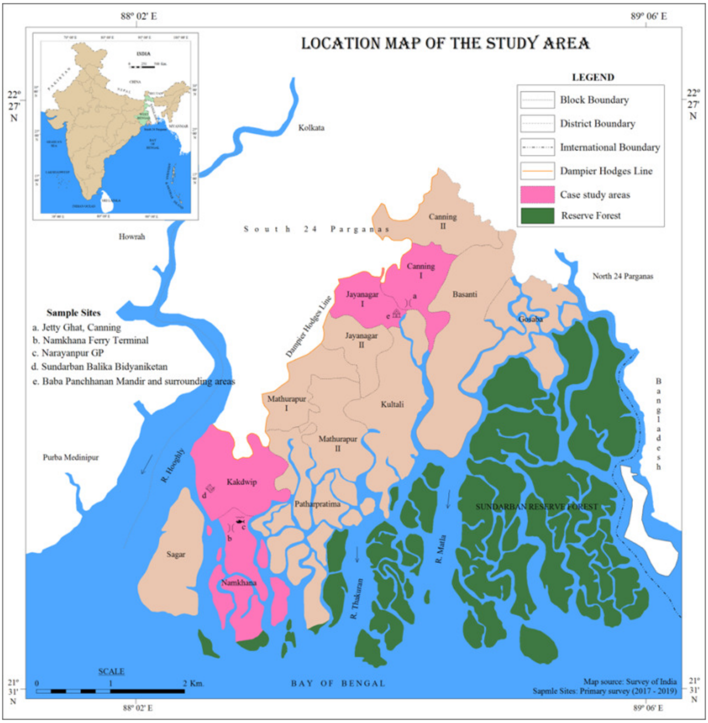

Map 1: Location of the Case Study Areas within the Study Area (Source: - Survey of India)

3. Objectives of the Study

The present research attempts to fulfil the followings major objectives:

I. To enlist different developmental projects and groups of people who have been benefited and those marginalised after implementation of these projects/policies in the study area.

II. To understand the nature of change of their socio-economic status or standard of living.

4. Development-Induced Occupational Displacement and Economic Marginality: Case Studies in Canning and Namkhana

In my first and second study area infrastructure development, e.g. construction of two river bridges, one on the River Matla (644 m, open in 2011) in Canning I Block, research site Canning I Jetty ghat and the other (3.3.km, opened in 2019) on the River (Creek) Hataniya Doyaniya in Namkhana Block, research site is Namkhana ferry terminal has been responsible for occupational displacement for more than a hundred

boatmen who were previously involved in ferry services. Income of these boatmen decreased by more than 60%, and these people and their family members are now living under extremely distressed condition, as they have little matching skills for alternative jobs (Mishra, 2018). It is true, that the river bridges have created better connectivity in the Sundarban which has been helping it to grow economically through various businesses like export-import of goods and especially tourism. But, at the same time this infrastructural development has caused substantial occupational displacement of the local poor people leading to further development-induced marginalization and out-migration.

In my third case study, I have analysed how commercial shrimp farming practice in Namkhana CD Block, research site is Narayanpur GP has been helping rich farm owners to grow economically, as at present export of commercial shrimp earns huge foreign currencies. West Bengal is one of the leading shrimp exporting states in India, where high technology and foreign seeds (sometimes) are used and expert labourers from various parts of the country are engaged in shrimp farms to augment production. A survey was done by this researcher (in 2019) on shrimp farming practices in Namkhana CD Block, the objective of which was to understand the problem of marginalisation occurred due to commercial and profit-oriented shrimp farming introduced in this area. It has been found that, a section of poor local small farmers, agricultural labourers, and traditional small fish collectors have become marginalised as they are losing their livelihood, impoverished and vulnerable.(Primary Survey, 2018-2020). So, according to my third case study, highly developed commercial shrimp farm practice is found to be profitable for a smaller section of people, but the larger section of local poor people have lost their job, occupationally displaced from their own land, besides denial of their right to use natural resources as ‘coastal people’. This is definitely an example of development-induced economic marginality.

5. Development Schemes to Reduce Marginality for Empowerment of Socially Marginal Groups

In chapter five of this thesis I have discussed the fourth case study of my research, which is conducted in Kakdwip CD Block, research site Sundarban Balika Bidyalaya with a comparative analysis behalf of the whole of state of West Bengal to understand the actual scenario of implementation of a democratic development policy implemented at the

lower stratum of the developmental pyramid to explore how it has impacted the marginal people. Kakdwip has been chosen as case study block because according to mapping of marginality (intersection method) Kakdwip is identified as the most developed block among thirteen blocks of the Sundarban region. In this case study Kanyashree Prakalpa (project), which is a conditional cash transfer (CCT), an integrated development scheme of the Government of West Bengal, to improve socio-economic status of under privileged girl child of the state has been evaluated. Geography of gender mainly focuses on the description of the effects on gender inequalities, liberal feminism and their welfare, whereas the discrimination between men and women evolved from inequality and the relationship between capitalism and patriarchy (Harding, 1990). In this context, it may be mentioned that a section of the women in West Bengal can be considered as an important focus group in the study of development and marginalization. The objective of this paper is to analyse the life of women who are affected in the process of marginalization and how the Kanyashree Prakalpa, has been acting as a helping tool for women, to combat against child marriage, maternal health, school drop-outs and girl child trafficking. The work is based on various reports of the Government of India and the State Government of West Bengal, news published in printed and digital media and primary survey done on 1500 Kanyashree Beneficiary students of school located in Kakdweep CD Block.

6. Traditional culture of a region became endangered due to developmental policies which advocates globalisation

Rich folk culture and traditional heritage have always been the most important part of Indian art and culture. The state West Bengal is also famous for some of its very indigenous folk culture, and Gajan is one of them. It is a part of Charak festival observed on the occasion of the worship of the lord Shiva/ or Dharmaraj; as He is revered as the prime-mover. Gajan is a particular branch of local culture in the southern part of Sundarban Region, South 24 Parganas. This is my fifth case study where development policy induced cultural marginality and power structure has been discussed. From my study area Joynagar I CD Block has been chosen for primary survey and interviews of Gajan artists were also taken from this block. Gajan-gaan (Gajan songs) originates in the heart of common people, and this expresses their social, religious and political

status, demonstrating the history of class struggle, social stratification, and exploitations of marginal class by the upper class and political hegemony. It plays a vital role in religious and cultural unification of the people of different caste and creed and geographical identity (Sen, 1994). Gajan generally deals with two types of marginalized groups: firstly, the Namsudras (untouchable); and secondly, the group of women. This festival gives the subaltern masses the power to sabotage caste system; order of hierarchy and in every form of classification possible, like caste, class, gender, dialect and so on. It also expresses different feelings of a woman- like anger, hunger, thirst, fear which gives men an "anti-penis envy". According to the Foucauldian discourse analysis power relationship in the society expressed through language and practice and this festival is the form of resistance of marginal downtrodden group of people towards the power structure and power exercise of upper class of the society as where there is a power there is a resistance and power is multidirectional and resistance is another form of power (Foucault, 1980). Gajan is the festival of bloody sacrifice and influence of Hinduism and Buddhism especially tantric rituals can be found on the mythmaking of this festival, it is also the festival of liberation of two types of marginalized group of society- the Namsudras (caste of untouchables) and a section of women. A large number of Namsudras or local rural, poor lower caste male became Gajan Sannyasi throughout the month of Chaitra and for this month people from upper class touch their feet for blessing. In this festival fertility of women and their power of womb is also worship and compare it with mother earth's power of fertility and productivity and male artists are also dressed like women to feel their trouble and struggle of life.

7. Conclusion

The study of marginalisation and marginal groups of the society and also helps to understand that with changing paradigm of development how social system, mode of production and face of class struggle will change. This literature also contributes to understand relationship between poverty and marginality and how some integrated policies works to decrease the gap between classes.

Most important part of my research is to analysis that development induced marginality and displacement occurred in various places of my study area in post globalisation period. As we all know this objective of

development is improve the life of people living in all strata of the society and positive result of developmental policy should be distributed democratically, because wide contradictions within the class can't be the sign of a good civilization.

8. References

(2003). *IGU (International Geographical Union) (2003) Homepage.* http://www.swissgeography.ch/igucevol2.htm, October 3, 2003.

(2015). *The Millennium Development Goals Report.* New York: United Nations Development Programme.

Brodwin.p. (2001, Octobr). Marginality and Cultural Intimacy in a Trans-national Haitian community. *91.*

Foucault, M. (1980). *Language, coumter memory, Practice : Selected Essays and Interviews.* NewYork: Cornwell University Press.

Gatzweiler, F. (2011). System Dynamics for Marginality Analysis. *Workshop organized at BRAC Center.* Dhaka: Workshop report, Bonn: ZEF.

Gerster, R. (2000). Alternative Approaches to Poverty Reduction Strategies. *SDC-Working Paper.*

Harding, s. (1990). *Feminism, Science and the Anti-Enlightenment Critiques".* (Nicholson, Ed.)

Mishra, S. K. (2018, December DOI: 10.5958/0976-0148.2018.00008.2). Development-Induced Displacement in India: An indegenous perspective. *Journal of Management and Public Policy, 10*(1), 25-36.

Muller-Boker. (200). *Sustainable Development in Marginal Regions of South Asia.* (S. R., Ed.)

Peet R, E. H. (2009). *Theories of Development, Contentions,Arguments,Alternatives* (2nd ed.). New York: The Guilford Press.

Sarkar, K. (2011). *Sundarbaner Itihaas.* Kolkata: Rupkatha Prakasana.

Sen, A. K. (1999). *Development as freedom* (1st ed.). New York: First Anchol Books Edition.

Sen, S. (1994). The Spring Festivals of India: Texts and Traditions. *The Journal of Asian Studies, 54*(4).

Yoga and Self – Realization : An Indian Philosophical Perspective

Sk Nur Upsar
Assistant Professor
Dept. of Philosophy, THLH Mahavidyalay
Mallarpur, West Bengal

Abstract : Now a days we are very much familiar with the term *Yoga* and the practices of it. It is also done by many of us in our everyday life. Many of us think that by practicing of *Yoga* we will be physically fit and also look perfect. But it's not only about physical perfection rather it purifies our inner self also. It is also true that the people who practice it properly are able to realize this kind of inner purification and when it happened properly, they also discover a new self. Sofrom here we can say that the awareness about the benefits of *Yoga* for the physical health as well as mental health, increases day by day. This *Yoga* or the practical uses of Yoga is introduced by Maharshi Patanjali and his theory is called *Yoga* Philosophy. *Yoga* Philosophy is one of the six major orthodox schools of Indian Philosophy. In both, the foundational concepts include two realities: Purusha and Prakriti. A living being is held in both schools to be the union of matter and mind.

The Yoga school's systematic studies to better oneself physically, mentally and spiritually has influenced all other schools of Indian Philosophy. The "*Yoga Sutra*" of Patanjali is a key text of the Yoga school of Indian Philosophy. The Indian systems of thought elaborate on the means to realizing or knowing the true nature of the self within, through the multi-faceted and individualized process of *Yoga.* The purpose of human life is to unite with the ultimate Reality, the Divine, by living life righteously according to prescribed ways and by achieving detachment from the illusion of the world.

An aspirant who has learned to control and suppress the obscuring activities of the mind and has succeeded in ending attachment to material objects will be able to enter Samadhi—i.e., a state of deep concentration that results in a blissful ecstatic union with the ultimate reality.

I would like to discuss critically the details of this striking view in my paper.

Key Words: - *Yoga Philosophy, orthodox schools, self,Purusha, Prakriti and Samadhi.*

Yoga is essentially and predominantly the path of knowledge. The *Yogi's* ideal is Self-Realization which cannot be attained without knowledge. Man is a supreme figure among living beings. He is greater than all the other creatures in the world, because he alone has the sixth sense, which is the capacity for realising the existence, functions and results of all the manifestations in the Universe. When the sixth sense develops to a certain level, the quest for realising the self, blossoms. This aspiration takes the shape of the valuable questions: Who am I? When the question Who am I? arise in one's mind, it indicates that he is mature enough for Self-Realization.[1]Unless and until he realises Self, he cannot get peace of mind because the mind with such a quest cannot secure proper satisfaction from any other contact or enjoyment. Therefore, the Realization of Self becomes an inevitable need for developed souls.

The systems of thought and reflection that were developed by the civilizations of the Indian subcontinent is called Indian Philosophy.In India Philosophical emergenceis an enquiry into the mystery of life and existence. The main purpose of philosophy is to know how to gain the absolute self in this life with the help of vision and insight. When someone attends the ultimate self that time, he or she will reach the state of ultimate freedom.Now the question is what is ultimate freedom and how one can achieve that. To answer this question firstly, we need to discuss about Purusārtha. Itis an important concept of traditional Indian Philosophy.Purusārtha refers to the aim and purposes of one's life. There are four Purusārthas in Indian Philosophy, such as *Dharma, Artha, Kāma and Mokṣha.*[2]The fourth Purusārtha is Mokṣha. Mokṣha means liberation, emancipation or final release. It is the concept of ultimate freedom. Mokṣhameans release from the life-death cycle and in this stage absolute freedom may be attained.Moksha or freedom plays an important role. Moksha means the ultimate freedom.However, different thought of Indian schoolshasbeen given different names to this Moksha.Various

terms have been used in Indian philosophy to describe liberation which are Apavarga, Kaivalya, Moksha etc.

It is customary to divide Indian Philosophy into two broad classes. First one is Astika(orthodox) school and second one is Nastika (heterodox)school. There are three Nastika schools those are Charvaka, Buddha and Jaina and Six Astika schools those are Nyāya, Vaiseśika, Samkhya, Yogo, Mimansa and Vedanta. These six systems are popularly known as SadaDarshana (Six Philosophies). It is true that Charvaka system rejected Moksha as ParamPuruṣārtha. butothersaccept Moksha as Param Puruṣārtha because Mokṣha has an intrinsic value and it is an end in itself.

The Philosophers who accept Mokṣha as *Parampurushartha*, they do not accept the nature of Mokṣha in the same way. According to Jaina system when someone is able to achieve Mokṣha, the eternal knowledge of the soul of his or her remains in the form of eternal strength and eternal joy. Mokṣha or liberation is called Nirvāna in Buddhist philosophy. When Goutam Buddha tried to find out the reason behind Dukkho.He discovered the Four Nobel Truth, those are – Suffering, cause of Suffering, cessation of Suffering and way of cessation of Suffering. He claimed if someone is able to gain the knowledge of Four Nobel truths then he or she will able to attain the Mokṣha. In the third Nobel Truth of Buddhism, we find the concept of Nirvana which is Mokṣha.According to Buddha, Avidyā is the main or root cause of suffering. So, the cause of our bondage is ignorance or Avidyā. We are bound in the '*Aṁsārchakra*' or '*Bhavachakra*'.[3] If anyone isable to stop the movement of the '*Saṁsārchakra*', then that person can obtain Nirvāna. According to Buddhism, it is possible in this life to obtain liberation.

In the Nyāya-Vaiseśika Philosophy, *Mokṣha* is known as Apavarga. According to Nyāya, soul has no gunas means it is nirguna and also inactive. People do the mistake when they think that consciousness is either eternal attribute or natural attribute of the soul. Because consciousness is non-eternal and accidental attribute of the self. When the self is related with the manas, manas is related with the senses and senses are related with the external objects, then consciousness emerges in the self. Because of Avidyathe self feels itself identical with body, mind and

sense. And as a result, we feel various types of suffering. Avidyā or Ajñāna is the fundamental cause of suffering. By the right knowledge of the sixteen categories (Tattvajñāna) one can attain liberation.Naiyāyikas, however, hold that, "liberation is the soul's final deliverance from pain and attainment of eternal bliss".[4]The early Mimaṁsakas do not accept four Puruṣārthas. They have accepted three *Puruṣārtha, Dharma, Artha and Kāma*. According to Mimāṁsā, heaven is Param Purushartha or highest good or ideal. They realize that by the performance of Vedic action or rituals (Dharma) we may obtain heaven. But the later Mimāṁsakas believe in Mokṣha. Their concept of liberation is called Apavarga. Prabhakara and Kumarila both believed in liberation and said that the goal of human life is liberation. It is a state where the soul remains in its own intrinsic nature. According to Advaita-Vedānta, Jīva is Brahman and Jīvatmā is Pramātmā.Moksha or Liberation is the realization of the identity between the self and Brahman. Rāmānuja's concept of liberation and Saṅkara's concept of liberation are different. According to RamanujaLiberation does not mean the identity of soul and God. The liberated soul has pure consciousness. When the soul realizes God, who is free from the body forever, then it destroys all types of ignorance and can attain liberation. So, it is not right to say that liberation means that soul is identical with God. Sāmkhya and *Yoga* schools explained liberation in another way. According to them, the soul is always free. So, there is no bondage or Mukti of the soul. The bondage of the soul and the idea of liberation of it is a kind of appearance. According to Sāmkhya, the main reason for the bondage is unconsciousness (Ajñāna).According to Sāmkhya, 'liberation' means complete cessation of all sufferings which is the summum bonum, the highest end of life.So, we can say that if someone wants to attain Mokṣha then he or she should know or understand about the real nature of self then only one can get the liberation from the cycle of life. So,realization of self is very much necessary for oneself. Now I will concentrate on the self-realisation of Yogic Philosophy according to the needs of my paper.

The word *Yoga* is used in a variety of senses. The word *Yoga*is derived from the root '*Yuj*', which means '*Yoking*' or connecting. The primary sense of the *Yoga* in the Gita is derived from the root

'*yujir*' '*yoge*' or '*yuj*', to join, with which is connected ina negative way the rootyuj in the sense of controlling or restricting anything to that to which it is joined.[5]The word *Yoga* may mean: i)Spiritual unification, i.e., the union of the soul with the supreme soul. ii)Concentration of the mind, iii) Complete suppression of the mental modes. In the Patanjali system, the word *Yoga* is used in the third sense of the term. Patanjali system the word Yoga is used in sense of turn It may simply mean 'method'. In the Upanishad and the Bhagavad Gita, the soul in its worldly and sinful condition is used to live separate and strange from the Supreme soul. The root of all sin and suffering is separation, disunion, estrangement. To be rid of sorrow and sin, we must attain spiritual unification, the consciousness of two in one, or *Yoga*. In Patanjali, the *Yoga*defines Yoga as skill in action. Yoga consists in the performance of disinterested actions. In the Yoga system, however, the Yoga is used to mean separation (*Vijoya*) between Purusha or the self and Prakriti.[6]

In Hinduism, Yoga encompasses a variety of systems of philosophy-based practices which outline how an individual can unite body, mind, and soul, or his or her actions The term *Yoga*comes from the Sanskrit language and it means union.Now a days we are very much familiar with the term Yoga and the practices of it, is also done by many of us in our everyday life. Many of us think that by practicing of *Yoga* we will be physically fit and also look perfect. But it's not only about physical perfection rather it purifies our inner self also or we can say more. It's also true that the people who practice it properly they are able to realize this kind of inner purification and when it happensproperly, they also discovera new self. So from here we can say that the awareness about the benefits of *Yoga* for the physical health and as well as mental health, increases more day by day. This *Yoga* or the practical uses of *Yoga* is introduced by Maharshi Patanjali. While many people around the world associate *Yoga*with physical exercises, they may not be aware of the other, often considered more important aspects, that are integral to a variety of *Yogas*. These aspects may include moral values, ethical practices, posture, breath, meditation, focused awareness, devotion and worship of God, and scriptural study. Hindus are encouraged to find a Yoga that fits their individual temperament and personality and which

best utilizes their strengths to ultimately get closer to achieving Mokṣha.The Indian systems of thought elaborate on the means to realizing or knowing the true nature of the self within, through the multi-faceted and individualized process of *Yoga*. The purpose of human life is to unite with the ultimate Reality, the Divine, by living life righteously according to prescribed ways and by achieving detachment from the illusion of the world.

In Indian Philosophy, Samkhya and *Yoga*systemare called '*Samantantra*'. *Yoga*is intimately allied to Sankhya. The Gita calls them one.[7]Both the theories have similarities concerning the individual human being has twenty-five elements, or evolutes, that develop progressively out of one another.But the practical aspects of *Yoga* play a more important part than does its intellectual content, which is largely based on the philosophy of Samkhya, with the exception that *Yoga*assumes the existence of God, who is the model for the aspirant who seeks spiritual release. Concepts of the self in the Sānkhya and the Yoga schools are also sufficiently similar to be treated together. In Sānkhya the self is called Purusha or soul and represents pure consciousness, which is opposite to prakriti. Prakriti represents matter. The self loses its inherent consciousness by mistakenly identifying itself with the body as involved in the process of Sansara; the self is utterly passive and merely a spectator but mistakes itself for an actor and thus undergoes the ups and downs of the cosmic drama. Although the word Purusha is often used in the singular, in reality the system allows for a plurality of Purusha, all consisting of pure consciousness, but distinct from each other and Prakriti or matter. The Purusha in *Sānkhya* and *Yoga* is an uncaused, eternal, all-pervading, and changeless reality, which witnesses change as a transcendent subject distinguished by pure consciousness that can itself never become an object of knowledge. Salvation consists of this discrimination (*Viveka*) that one is pure spirit and not the mind with whose derivative reality one identifies oneself.[8]

The Purusha is defined as that reality which is pure consciousness and is devoid of thoughts or qualities. The Prakriti is the empirical, phenomenal reality which includes matter and also mind, sensory organs and the sense of identity (self, soul). A living being is held in both

schools to be the union of matter and mind. The *Yoga* school and its variousapproaches in the field of improving oneself physically, mentally and spiritually has influenced all other schools of Indian Philosophy. Patanjali begins by stating that all limbs of *Yoga* are necessary foundation to reaching the state of self-awareness, freedom and liberation. Yoga is defined as the cessation of the modification of Chitta. Now we need to discuss what is mean by *Chitta.Chitta* means the three internal organs of Sankhya- Buddhi or Antahkarana. It is Mahat or buddhi which includes ahankara and manas.Chitta is the first evolute of Prakrti and has the predominance of Sattva. It is in itself unconscious. But being finest and nearest to Purusha, it has the power to reflect the Purusha and therefore appears as if it is conscious. When it gets related to any object, it assumes the 'form' of that object. This form is called *Vrtti* or modification.[9]

The Eight Limbs of Yoga outlined by Patanjali in his *Yoga Sutras* can be interpreted as steps on the path to attaining Mokṣha. In Yoga, there are four paths to achieving this freedom; Jnana, Bhakti, Karma and Raja.I am going tofocuson some of them andalso discuss about the concept of self-realisation as found in some of those paths. According to Bhakti Yoga through bhakti, people can connect to the Divine in a very personal way. In the Bhagavad Gita, Prince Krishna, whom Hindus believe to be in incarnation of God, tells Prince Arjun that people turn to God under four conditions- when they are in trouble, when they want something desperately, when they seek to understand the nature of God, and when they simply love God without any expectations. This last scenario of love is called bhakti, or loving devotion.So, if someone want to realize oneself then he or she need to connect with God through Bhakti.

JñānaYoga is the Path of Knowledge.*Jñāna* calls for self-realization through intellectual pursuit of spiritual knowledge.*Karma Yoga* is the Path of Selfless and Righteous Action.Many Hindus believe that Prince Krishna gave Prince Arjuna the basics of the path of Karma Yoga during their conversation, which the Bhagavad Gita is believed to be a record of"Surrender the fruits of your actions to Me, Perform your duty without any expectation of reward. Do what you have to do because

it's the right thing to do, not because there's something you want out of it."[10]

The purpose of *Yoga* meditation is to steady the mind on the gradually advancing stages of thoughts towards liberation, so that vicious tendencies may gradually be more and more weakened and at least disappear altogether. But before the mind can be fit for this lofty meditation, it is necessary that it should be purged of ordinary impurities. The intending *Yogin* should practice absolute non injury to all living beings (Ahimsa), absolute and strict truthfulness (Satya), non- stealing (Asatya), absolute sexual restrained (Brahmacarya) and the acceptance of nothing but that absolutely necessary (Aparigraha). These are collectively called Yama. Again, side by side with these abstinences one must also practice external cleanliness by ablutions and inner cleanliness of the mind, contentment of mind, the habit of bearing all remaining silent in speech (Tapas), the study of Philosophy (Svadhyaya) and meditation on Isvara (Isvara Pranidhana). These are collectively called Niyamas.[11]

In *Ashtanga Yoga*, the most important aspect of the practice is to observe the Breath. Observing the breath will give help one to have a place of focus otherwise one can fall into the chaos of one's mind. By focusing one's awareness on the breath, it will help one to be grounded in the Present Moment and learn about what's happening on one's body and in one's mind—helping one to develop Stillness and Self-knowing. So, when practising Ashtanga, there's no need to focus so much on getting the poses perfect or elegant. The attachment to these desires will only impede one's journey of Self-transformation. The importance is to focus on the breath so that one does not lose themselves through the journey of poses. The focus is to simply try one's best, learning to forgive oneself, encourage oneself to keep on moving forward until one reaches the end of the sequence. This path is also known as ashtanga, which means eight-limbed, as there are that many components to this path.*Yoga* gives us the Eightfold path of Discipline (*AstangaYoga*): i)Yama- Morals. It means abstention and includes the five vows of Jainism. i.e., - ahimsa, satya, asteya, brahmacarya and aprigraha. ii) The second discipline of Niyama or observancesconsists of cleanness, contentment, austerity, study of the

scriptures and surrender to God iii) The third discipline is the Asana or bodily Posture. Asana is a physical help to concentration. iv)The fourth discipline is Pranayama or Control of the breath. It consists in controlling natural breathing and subjecting it to a definitely law. v)The fifth discipline is Pratyahara, which means the withdrawal of the external sense- organs from theirobjects. vi)The sixth discipline is Dharana or fixing the mind on a particular object. In short, it means concentration. vii)The seventh discipline is Dhyana ormeditation. It consists in the continuous flow of the same cognition of the object of attention undisturbed by any other cognition. and viii) The eighth discipline is Samadhi or absorption concentration.[12] Of the eight disciplines, the first five (abstention, observances, posture, breath control and withdrawal of the senses) are the external aids (Bahiranga- Sadhana). They present the stage of purgation. They are accessories to Yoga, and are not themselves elements in it. The last three disciplines(attention, meditation and concentration) are known as internal aids (*Antaranga-Sadhana*) to *Yoga*.[13]

The first two stages are ethical preparations. They are Yama (restraint), which denotes abstinence from injury (ahimsa), falsehood, stealing, lust, and avarice; and Niyama (discipline), which denotes cleanliness of body, contentment, austerity, study, and devotion to God. The next two stages are physical preparations.Asana (seat), a series of exercises in physical posture, is intended to condition the aspirant's body and make it supple, flexible, and healthy. Mastery of the Asanas is reckoned by one's ability to hold one of the prescribed postures for an extended period of time without involuntary movement or physical distractions. Pranayama (breath control) is a series of exercises intended to stabilize the rhythm of breathing in order to encourage complete respiratory relaxation.The fifth stage, Pratyahara (withdrawal of the senses), Involves control of the senses, or the ability to withdraw the attention of the senses from outward objects. Whereas the first five stages are external aids to Yoga, the remaining three are purely mental or internal aids. Dharana (holding on) is the ability to hold and confine awareness of externals to one object for a long period of time. This common exercise is to help in fixing one's

mind to an object.Dhyana (concentrated meditation) is the uninterrupted contemplation of the object of meditation, beyond any memory of ego.Samadhi (total self-collectedness) is the final stage and is a precondition of attaining release from samsara, or the cycle of rebirth.In this stage the meditator perceives or experiences the object of his meditation and himself one.As in so many other doctrines, the path to salvation also lies through detachment (Vairagya) and meditation (*Yoga*). Detachment in the beginning can only be provisional (Apara-vairagya) for in its mature form (Para-vairagya) it presupposes complete knowledge. The preliminary moral training is included under the first to heads, which we had occasion of Yama and Niyama of the eight-fold means (Astanga) of *Yoga*. *Yoga*is mostly negative consisting of non-injury (Ahimsa), truth speaking (Satya), abstention (Asteya), celibacy (Bramha- Charya) and disowning possessions (Aparigraha).[14]

The *yogic* training may be divided into two stages, the first comprising the next three of the eight-fold help Asana (posture), Pranayama (control of breath) and Pratyahara (withdrawal of senses from their objects) which aim at restraining the mind from the physical side; and the second comprising the remaining three of Dharana, Dhyana and Samadhi, which are different forms of concentration and aim directly at controlling the same.[15]

Most of the Indian schools of thought share common beliefs around the concept of self-realization and enlightenment. The possibility of freedom, liberation, and emancipation from the bondage of suffering, attachment, and ignorance are the guiding principles of these spiritual paths. While the philosophical concepts of Moksha, Maya, Karma, and Samsara can be difficult to understand, they are necessary for yogis to learn and study if they wish to move along the path of enlightenment. Even if your goal is not self-realization, the spiritual practices originating from these philosophies can reduce suffering and increase inner-peace, contentment, and joy. Every step that we take towards a state of moksha can bring us more peace, joy, and happiness in our lives.

Meditation is necessary for Self- Realization; and Virtue for doing one’s duty to other livings beings. Self- Realization in Yoga denotes a state in which an individual knows who they truly are and is fulfilled in

that understanding. In order to realize the self, one has to listen about the truth of ultimate reality from the Lips of an illuminated soul. One has to meditate on a regular basis, systematically and sincerely. The importance of meditation in the life of an aspirant need hardly be overemphasized. Anybody can eventually realize the self through meditation. It is fervently hoped that the above discussion, Self- Realization through *Yoga*philosophy will stimulate the sincere seeker to pursue the spiritual path with better understanding, dedication, devotion and a determined will until he or she attains Samadhi. In order to have genuine Insight, the aspirant needs to practice. He should learn to control his body, his mind in order to gain Self- Realization. Self- Realization means the reunion of the individual self, Atma and cosmic self (Paramatma). In this way we attain freedom and inner peace. Unless you practice you will never realize what *Yoga*means.Thus, through Self- Realization we are enable to realize everything.

REFERENCES:

1. Maharishi, Thathuvagnani Vethathiri, Yoga for Modern Age, Bangalore Indiranagar Sky Trust, Bangalore- 560075, 2006, p.75
2. Sanyal,Jagadiswar, Guide to Indian Philosophy,Sribhumi Publishing Company, Calcutta-9, 1991, p.19
3. Saha,Nitai, Analysis of Indian Concept of Mokṣa: A Philosophical Study, Internationaljournalof Multidisciplinaryeducationalresearch, Volume:10, Issue:1(3), January :2021. pp-3-4
4. Chatterjee, Satischandra & Datta, Dhirendramohan. An introduction to Indian philosophy. Motilal Banarsidass Publishers, Delhi 2016, p.207
5. Dasgupta, Surendranath, A History of Indian Philosophy, Volume-II, Motilal Banarasidass Publishers Private Limited Private, Delhi, Reprint, 2014., p.444
6. Radhakrishnan, S., Indian Philosophy, Volume- 2, Oxford University press, 2008, p.309
7. Sharma, Chandradhara,A Critical Survey of India Philosophy, first edition 1960, Delhi, 14th reprint, Delhi 1994, ISBN- 978-81-208-0364-(Cloth), ISBN-978-81-208-0365-5(paper), p.169

8. Sanyal,Jagadiswar, op. cit., p.276
9. Right Hon. Professor Max, Muller, K.M,The Six System of Indian Philosophy, Chowkhamba Sanskrit Series Office, Varanasi, 2008, pp-336-37
10. YogaPhilosophy – Britannica. AstangaYoga for Self-Realization and Liberation from Suffering, https://www.creationwithin creation.com, on 15/9/22 at 10.30 am
11. Dasgupta, Surendranath, A History of Indian Philosophy, Volume-1, Motilal Banarasidass Publishers Private Limited Private, Delhi, Reprint, 2012., p.270
12. Sharma, Chandradhara, op. cit., p.172
13. Sanyal,Jagadiswar, op. cit., p.291
14. Hiriyana,M.,Outlines of Indian Philosophy, Motilal Banarasidass Publishers Private Limited Private, Delhi, Reprint, Delhi, 2009, p.294
15. Hiriyana,M., op. cit., p.295

Analysis of the National Education Policy 2020

Subrata Acharyya
State Aided College Teacher, Dept. of Education,
Ramananda College
Nasiruddin Khan
Post Graduate, Dept. of Education,
Aliah University

Abstract: The National Education Policy 2020 consists of 4 parts and 27 chapters. In the policy, the government of India drafted various barriers and situations that affect children education. The draft initially starts with the introduction part which states about the fundamental requirement of the children, how to achieve human potential, development of equality and just in the society, National development, quality education, scientific advancement, national integration and, cultural preservation. It also describes goal 4 of the 2030 agenda adopted by India in 2030. Goal 4 is to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all by 2030. The policy also discusses the quickly changing global economy and employment opportunities that create criticality to the student in learning. India also aims to provide high-quality education by 2040. The policy focuses on the changes, objectives and major challenges of new policy of education in 2020. This policy purposes the revision and revamping of all aspects of structure of education including its regulation and governance to create a new system which is aligned with the inspirational goals of education system. Introduction of a four-year multidisciplinary undergraduate programme with multiple exit options and also to discontinue the programme of M Phil. The NEP 2020 recognizes the role of technology in education and aims to leverage it to improve teaching outcomes the education policy says that students until class 5 should be taught in their regional language or mother tongue. NEP 2020 aims to provide inclusive education to all students irrespective of their backgrounds. It envisions a curriculum that not only promotes gender sensitivity but also encourages critical thinking about social justice issues concerning diversity and inclusion. We have critically examined the policy in this paper and proposed changes to ensure a seamless continuum with its predecessor in addition to its

predecessor, boosting its importance. The current paper describes the analysis of the requirements for NEP 2020 provisions and management practices at the university level.

Keyword: knowledge-based society, Gross Enrolment Ratio (GER), multilingualism, Academic credit transfer schemes, Equal highly skilled workforce, e-learning ecosystem, Global Opportunities.

What are the objectives of the National Education Policy 2020?

The National Education Policy 2020 of India is an ambitious plan to transform the education system of the country by 2040. The policy has outlined several objectives that will help achieve its goal of creating a vibrant knowledge society in India. One of the foundational pillars of the policy is Access, Equity, Quality, Affordability, and Accountability [1]. Towards this objective, the policy aims to increase state expenditure on education from 3% to 6% of GDP as soon as possible [1]. The policy also aims to achieve 100% gross enrolment ratio in school education by the year 2030 [1]. One of the key objectives of the National Education Policy 2020 is to promote equitable and inclusive education [1]. This is to be achieved through a strengthened and transparent teacher recruitment process [2]. The National Council for Teacher Education will frame National Professional Standards for Teachers by 2022 and a National Curriculum Framework for Teacher Education by 2021 [2]. Additionally, the minimum requirement for becoming a teacher will be a 4-year Bachelor of Education by 2030 [2]. The policy also aims to prevent student dropouts by providing flexibility in education and promoting a multidisciplinary approach [1]. The National Education Policy 2020 emphasizes the use of mother tongue or local language as the medium of instruction till Class 5, and at least two of the three languages learned by students should be native to India [2]. The policy also aims to achieve Foundational Literacy and Numeracy for all students till class 3 by the year 2025, with the highest priority being accorded to this objective [1][2]. To achieve this goal, the NIPUN Bharat Mission and a National Mission on Foundational Literacy and Numeracy will be set up by the Ministry of Education on priority [2]. In conclusion, the National Education Policy 2020 aims to bring a revolution in the education system and create new educational institutes, bodies, and concepts [1][2].

What are the key changes proposed in the National Education Policy 2020?

The National Education Policy 2020 proposes a vast array of changes and reforms to transform India's education system into an international standard. The policy aims to bring out the unique capabilities of each student and make school and college education more holistic, flexible, and multidisciplinary [3]. The policy is based on the foundational pillars of Access, Equity, Quality, Affordability, and Accountability [3]. The policy replaces the 34-year-old National Policy on Education, 1986 [3]. The key changes proposed in the National Education Policy 2020 include a shift from a marks-centric to a skills-centric approach, with a focus on competency rather than choice. This is intended to ensure that no child is left behind in gaining education [4]. The policy aims to move from an examination-centric to an experimental-centric approach, with a focus on 'learning to learn' instead of memorization [4]. The policy also aims to shift the Indian higher education system from teacher-centered to student-centric and from information-centric to knowledge-centric. It emphasizes on arts and extra-curricular activities to create a more diverse society, and moving towards research-oriented learning. [4]. The NEP proposes reforms which will be implemented gradually until the year 2040, with subject-wise committees set up by the GOI at both central and state-level ministries to discuss the implementation strategy [5]. The policy also proposes the establishment of a National Education Technology Forum, providing universal access to education from pre-school to secondary level, vocational education from Class 6 onwards, and encouraging the use of technology and digital education. Additionally, the policy aims to increase the Gross Enrolment Ratio in higher education to 50% by 2035 and proposes the establishment of an Academic Bank of Credit [4]. The National Education Policy 2020 is a broad changing concept for the nation's education system, and its implementation will be a collaboration between the Central and State Governments [4][5]. The schooling starts from age 3 in the form of Anganwadi or kinder garden. The education structure had changed from 10+2 to 5+3+3+4.

HOW DOES THE 5+3+3+4 EDUCATION STRUCTURE PERFORM?

This revised policy expands the term of compulsory education from 6-14 years to 3-18 years. The government also aims to provide free education for economically backward students under this scheme. The new system consists of 12 years of schooling along with the 3 years of Anganwadi and pre-schooling. The new academic structure consists of the following classifications.

1. Foundation Stage- 5years from age 3 to 8 years in Anganwadi or pre-school education and class 1 & 2 system. This system possesses only multi-level play activity, interactive school activity, and basic learning of literature and numerals.
2. Preparatory Stage- 3 years from age 8 to 11. This stage includes class 3- class 5. This system will consist of the basic learning of all subjects and their activities.
3. Middle Stage- 3years from age 11 to 14. This stage includes class 6- class 8. This system consists of the practical learning of arts, social activities, humanities, science, and mathematics with corresponding internships to experience the working environment in the described fields.
4. Secondary Stage- 4 years from age 14 to 18. This stage includes class 9- class 12. This system consists of multidisciplinary education, Critical analysis and thinking, student's choice of subjects, and expertise in it.

Further, in addition to this, it is also laid that the 360-degree holistic progress card will be introduced to evaluate the students as well as to keep track of the student\'s achievement and establishments. It is also proposed that National Curriculum Framework for Teacher Education 2021 will be formed and new degree qualifications for teachers will be introduced.

What are the potential benefits and drawbacks of the National Education Policy 2020?

The National Education Policy 2020 has been the subject of much debate and discussion, with various stakeholders analyzing its potential benefits and drawbacks. While the policy aims to promote holistic education, multilingualism, skill development, and flexibility [6], it has been criticized on several fronts. One concern is that the policy may

create a language barrier and lack clarity [6]. Additionally, some have expressed worry that the policy may promote privatization of education and standardize the education system [6]. Furthermore, while the policy has been developed after consulting with various stakeholders and the general public for nearly five years [7], many segments of the policy have caused concern and received staunch criticism [8]. However, the policy also has numerous proposals that have been praised for their potential benefits and forward-looking approach, which can bring important changes to the education system [8]. It is important to closely analyze the highlights of the policy to discuss their merits and demerits [7]. The government will need to monitor the policy's implementation to ensure that it can achieve its intended goals, but this may face challenges due to a lack of teachers and sound infrastructure in numerous government schools [6][9]. The policy should prove beneficial to the education sector and the students, but there is a need to review and update any unacceptable parts of the NEP 2020 to close all the loopholes [8]. Overall, the National Education Policy 2020 is a holistic, comprehensive, and versatile system that has the potential to transform India into a vibrant knowledge society [9].

CONCLUSION:-

With the view of the current education system and the student’s expectation, it is believed that the NEP 2020 will bring a new revolution in the educational policy, and also there is larger scope to improve the rate of literate in India. This NEP 2020 also helps students from dropping out of education between the age of 3- 18. This also helps students in pursuing a flexible system of education without any restrictions. Many students are expecting the new changes were few students not but according to my observation it is the right time to brought changes to the existing system and the NEP2020 will be the first policy that possesses various changes that benefits the students. The most admirable part of the policy is that their aim of goal4 making Indian students equipped with universal knowledge is the best part which helps the students to launch themselves in the global platforms.

Reference

1. National Education Policy 2020: An analysis. (n.d.) Retrieved June 2, 2023, from thedailyguardian.com

2. National Education Policy 2020. (n.d.) Retrieved June 2, 2023, from en.wikipedia.org/wiki/National_Education_Policy_2020
3. Currency Converter. (n.d.) Retrieved June 2, 2023, from www.ibef.org
4. Critical Analysis on New Education Policy 2020. (n.d.) Retrieved June 2, 2023, from legalreadings.com
5. New Education Policy: Advantages & Disadvantages. (n.d.) Retrieved June 2, 2023, from timesofindia.indiatimes.com
6. National Education Policy 2020 – Pros and Cons. (n.d.) Retrieved June 2, 2023, from schoolyears.org
7. National Education Policy 2020: Good, Bad and ….. (n.d.) Retrieved June 2, 2023, from cxotv.techplusmedia.com
8. NEP Advantages and Disadvantages. (n.d.) Retrieved June 2, 2023, from blogs.kalpas.in/nep-advantages-and-disadvantages/
9. Advantages and Disadvantages of New Education Policy 2020 [2021]. (n.d.) Retrieved June 2, 2023, from medium.com

The contribution of 'Samyaraj Party' to the spread of Communist Party and Communist ideology in Bengal

Bhabananda Roy
Assistant professor, Department of History
Ranaghat College, Nadia

Abstract : In the late twentieth century and the first part of the thirties, the role of the 'Samyaraj Party' was significant in the development of the Communist movement and the publicity and promotion of communism.'Samyaraj Party' left the traditional path to gain 'Swaraj' or `freedom' and explore this alternative path. The details published in the print matters regarding the 'Samyaraj Party' are inadequate. In the book of Saroj Mukhopadhyay, Ranen Sen's book and two other articles, the 'Samyaraj Party' is mentioned.

But it is very rarely mentioned. The 'Samyaraj Party' is also mentioned in the memoir of the renowned 'Anushilan Revolutionary communist' Dhani Goswami. David M. Laushley and Horace Williamson's writings also mention the 'Samyaraj Party'. But in the writings of Saroj Mukhopadhyay, Ranen Sen, Dharani Goswami and David Laushey, the mention of the 'Samyaraj Party' is limited to three to five lines. The only Horace Williamson's book contains an 18-line discussion on the 'Samyaraj Party'. There is no mention of the 'Samyaraj Party' in the then newspapers. In this case, the necessary information about the 'Samyaraj Party' was compiled mainly from some of the books that were recalled by the Bengali police sources, the National archives, and Some of the books recalled by the members of the 'Samyaraj Party'; some information is revealed.

Key Notes: Samyaraj Party, Communist Movement, Bengal Volunteer's Party, Swaraj Party.

Main Article

In the late twentieth century and the first part of the thirties, the role of the 'Samyaraj Party' was significant in the development of the Communist

movement and the publicity and promotion of communism. The 'Samyaraj Party' left the traditional path to gain 'Swaraj' or `freedom' and explore this alternative path. The details published in the print matters regarding the 'Samyaraj Party' are inadequate. In the book of Saroj Mukhopadhyay[i], Ranen Sen's book[ii] and two other articles[iii], the 'Samyaraj Party' is mentioned.

But it is very rarely mentioned. The 'Samyaraj Party' is also mentioned in the memoir of the renowned 'Anushilan Revolutionary communist Dhani Goswami.[iv] David M. Laushley[v] and Horace Williamson's[vi] writings also mention the 'Samyaraj Party'. But in the writings of Saroj Mukhopadhyay, Ranen Sen, Dharani Goswami and David Laushey, the mention of the 'Samyaraj Party' is limited to three to five lines. The only Horace Williamson's book contains an 18-line discussion on the 'Samyaraj Party'. There is no mention of the 'Samyaraj Party' in the then newspapers. In this case, the necessary information about the 'Samyaraj Party' was compiled mainly from some of the books that were recalled by the Bengali police sources, the National archives, and Some of the books recalled by the members of the 'Samyaraj Party'; some information is revealed.

Birth and initial activity of the Samyaraj Party

The actual establishment of the Samyaraj Party is quite controversial. Without any preliminary document, no proper solution to this debate is possible. In some books, the party was founded in 1919, according to the 'Samyaraj Party' rubber stamp.[vii] But no other source was supported by this establishment. None of the members of the 'Samyaraj Party' and the expressed people about this party said in their interview that the year of establishing 1919 was the year of the party: no written description and the establishment of the Samyaraj Party in 1919 in the Bengali police sources. In fact, in 1919, the founding members of the 'Samyaraj Party' were a boy or a teenager. So,without any other credible formula, it is impossible to regard 1919 as the establishment of the Samyaraj Party. Of course, the mystery of this rubber stamp has no solution.

In 1925 or in 1926, Aghar Sen moved from Dhaka to Calcutta. His contact with the National Revolutionary Party 'Bengal Volunteers' was in

Dhaka. Aghar Sen came to Calcutta, a house on 12 Paikpara Road. In Dhaka, Aghar Sen understood the limitations of the National Revolutionary Movement and the Terrorist Working system. Aghar Sen came to Calcutta, attracted the communist ideology, and realised the need for a mass movement. He recognised the need to work among the workers and exposed the class and political consciousness among the workers. Aghar Sen was contacted by his prominent friend in the Tala area of Kolkata, Haridas Ganguly's brother Badal Ganguly and Kumud Nath Dutt of the Tala area.The initiation of Badal Ganguly and Kumudnath Dutt's communism was through Aghar Sen.Atulkrishna Roy, a school student who lived at the 12 house onPikepara Road. Atulkrishna Roy's first lesson on communism is near Aghar Sen.[viii]

From the very beginning of 1928, political activities began with the concerted efforts of Aghor Sen, Badal Ganguly, and Kumudnath Dutt. In 1928, three people formed a party. The party is named 'Samyaraj Party'. The founding members of the 'Samyaraj' Party were associated with the 'Swarajya Party' before the formation of the new party in Bangladesh. They were known as the Radical Members of the Swarajya Party. In imitation of the name 'Swarajya Party', they named the new party 'Samyaraj Party'. The 'Samyaraj Party debuted by declaring Marxism as its ideology, mass revolution and independence and establishment of socialism as the purpose of the establishment of socialism. Aghar Sen, Badal Ganguly, Kumudnath Dutt 'Samyaraj Party' founding members believed that the non-violent 'non-cooperation' or 'law disobedience' movement or the revolutionary terrorist movement, on the other hand, is not the real way for independence, but the alternative to independence. That alternative path is the path of the labour movement, the path of the mass movement, the path of the mass revolution.[ix] After the establishment of 1928, the first office of the 'Samyaraj' party was at 12 Paikpara Road. Aghar Sen and Atulkrishna Roy lived in that house. Also, in Kumudnath Dutt's 14, Kali Kumar Banerjee Lane's house also held a party meeting.[x] Apart from these two houses, the party held a party meeting in an opening rice house on the west side of Kumudnath Dutt's house in Tala. The house was in a non-Bengali labour slum. Due to the high lack of space in that room, there was a lot of discussion on the

street.[xi] It increased the number of members of the 'Samyaraj Party'. Atulkrishna Roy joined the 'Samyaraj Party' in 1928. Yashoda Bhowmik, Sudhir Dutt, Nani Sengupta, Subrata Mukherjee, Santosh Roy, Sushil Chattopadhyay, Dharani Sen, Khitish Ghosh were joined by 1928 to 1930. Some members of the 'Hindustan Socialist Republican Association', like Sudhir Ghosh and Shankar Banerjee, also joined the 'Samyaraj Party' during this period.[xii] At this stage, the 'Hindustan Socialist Republican Association' had close contact with the 'Samyaraj Party until 1930, and several members of the Hindustan Socialist Republican Association joined the 'Samyaraj Party' by 1930.[xiii]

Saroj Mukhopadhyay, Ranen Sen, and David Laushey wrote that the 'Samyaraj Party' was established in 1930.[xiv] The fact is that the 'Samyaraj Party, established in 1928,was formally formed. That year, the party office was opened by installing a signboard in a small house in Shyamabazar, 3, Bhavnath Sen Street, Kolkata, 4. The name of the party on the signboard was written above the "Samyaraj Party" below the Communist Party of Bengal.[xv] It was during this time that the 'Samyaraj Party' was contacted by Dr.Bhupendranath Dutta and Bankim Mukherjee. Dr. Dutta and Bankim Mukherjee used to come to the party office on 3 Bhabanath Sen Street. Aghar Sen and his colleagues discussed in detail Bhupendranath Dutta and Bankim Mukherjee's 'Marxism', 'Labour Movement', and other accessories. They used to take classes of 'Marxism' members of the 'Samyaraj Party'.[xvi]

On February 3, 1928, the 'General Strike' was held on the day of the 'Simon Commission' in Bombay, and from that day onwards anti - Simon Commission protests began. Members of the 'Samyaraj Party' participated in the red flag in Kolkata. The annual session of the 'Indian National Congress' was held at Park Circus in Calcutta by December 1928. Members of the 'Samyaraj Party' also joined the session.[xvii]

Samyaraj Party's activities and expansion in Calcutta and its surrounding areas

In 1930, members of Aghar Sen, Badal Ganguly, and Kumudnath Dutt's 'Samyaraj Party' started to participate in the 'labour movement' and efforts to organise the workers on the basis of their own economic demands. In the early thirties, three 'labour unions' were led by the

'Samyaraj Party'. The first one was 'Kashipur Municipality Scavengers Union'. This union was the union of the municipalities in the Kashipur and Chitpur regions. Kaliprasad Chowdhury was the president of this union. The second union was named 'Carters Union'. It was the union of the vehicles (*Garoyan*). Kaliprasad Chowdhury was also the president of this union. And the third was called the 'Motor Transport Workers Union'. The secretary of this union was Pratap Singh.[xviii] Pratap Singh was associated with the 'Communist Organization' of the Sikhs of Calcutta with the Bengal Kirti Kisan Party.[xix] The Bengal Kirti Kisan Party had a close relationship with the 'Samyaraj Party' and members of both the 'Motor Transport Workers Union' worked jointly.

In November 1934, just before the *Durga Puja* of the Samyaraj Party, a strike of the Municipality of Kashipur-Chitpur region was called by the Kashipur Municipality's Scavenger's Union. Among the various demands of the bush in the strike, the main one was to demand advance for the worship of *Chat*. The main leaders of the strike of the swiperswere Aghar Sen, Badal Ganguly, and Kumudnath Dutta, the leaders of the 'Samyaraj Party'. Atulkrishna Roy, the chief party activist, was an active participant in the strike.[xx]

Leading members of the 'Samyaraj Party' like Aghar Sen, Badal Ganguly, and Kumudnath Dutta, also worked among the workers and tried to organise the economic demands of the workers based on the workers.[xxi] Of course, there was no quick strike in the single effort of the 'Samyaraj Party'. All the strikes were held in the joint efforts of the labour leaders, including all parties.

Badal Ganguly played a significant role in the labour movement in Bengal. The eleventh conference of the All-India Trade Union Congress was held in Calcutta on July 3-7, 1931. The 'All India Trade Union Congress' was divided at that conference. Communists and association associations left the 'All India Trade Union Congress and formed a counter-organisation- the Red Trade Union Congress. Badal Ganguly was one of the vice -presidents of this 'Red Trade Union Congress.[xxii]

In December 1933, the 'Union' of the Port Dock Workers Union was formed by the leaders of the Bengal Labour Party, especially Niharindu Dutta Majumdar. Badal Ganguly was one of the vice

presidents in the union led by the Labour Party. He then joined the Labour Party as the leader of the 'Samyaraj Party'.[xxiii] From November 28, 1934, to December 16, a total of 19 days, 14000 dock workers joined the strike led by the union.[xxiv] The main leaders of the strike were Niharindu Dutta Majumder and Shishir Roy (general secretary of the union). Badal Ganguly, along with other leaders of the 'Union' and 'Labour Party', also participated in the strike. Although not able to fully claim, these dock workers brought a new life to the strike workers' movement.

The main office of the 'Samyaraj Party was at 3 Bhabanath Sen Street at Shambazbazar, but a branch office of the party was officially opened in 1931 to the house of Kumudnath Dutta, Kali Kumar Banerjee Lane. Gradually it became the party's main office.[xxv] The 'Samyaraj Party' was characterised as a very militant organisation. Theywear red shirts, which the party's volunteers used to parade the house of Kumudnath Dutta.[xxvi] It was as if the upcoming armed mass revolution was going on.

Through other events, the militant character of the 'Samyaraj Party' is identified, though the practical application of the militant attitude has not been especially seen. The annual session of the National Congress began in Karachi on March 29, 1931. Shortly after the Karachi Congress, the political conference of the Burdwan District Congress was held in 1931 at the initiative of Saroj Mukhopadhyay and Vinay Chowdhury. During the district political conference, Saroj Mukhopadhyay, Vinay Chowdhury, the Communist-minded Congress workers (yet they did not become a member of the Communist Party) were organised by the Burdwan Divisional Socialist Conference and Youth Conference at Burdwan Town Hall. Entrepreneurs invited Calcutta's familiar political groups to attend the Socialist Conference and Youth Conference. Members of the Calcutta Committee of the newly formed Communist Party, also Somnath Lahiri (he did not officially join the Communist Party), Aghar Sen, Badal Ganguly, 'Samyaraj Party'. Bankim Mukherjee raised the red flag at the Burdwan Divisional Socialist Conference, and Dr. Bhupendranath Dutta read the printed speech. President of the Youth Conference Bankim Mukherjee also read the printed address. President of the Youth Conference Bankim Mukherjee also read the printed address.[xxvii]Three militant leaders of the Samyaraj Party, such as Aghar

Sen, Badal Ganguly and Kumudnath Dutta, redshirt, red pants, and redshoes, attended the 'Samajwadi' conference.The three gave the most aggressive anti-Congress slogans at that conference and called for a bloody revolution.[xxviii] The prudent president, well-experienced Marxist revolutionary Dr. Bhupendranath Dutta, however, did not approve of the non-preparatory stubborn call, and the other representatives present at the conference of the bloody revolution of the moment did not shake.

In this way, a secretparty with leftist revolutionary ideology on the ground of Bengal was formed to make the anti-British movement. Even though their functions are not significantly promoted or extended, they have to salute their objectives and plans. This 'Samyaraj Party' greatly impacted the promotion of leftist rhetoric on the soil of Bengal.

References

i. Saroj Mukhopadhyay, *'Bharater Communist Party O Amra'*, vol.1, (1930-1941), Ganashakti Patrika Department, Calcutta, May 1985, p. 62.

ii. Ronen Sen, *Banglay Communist Party Gathaner Pratham Jug (1930-48)*, BingshaSatabdi, Calcutta, May 1981, pp. 46-47.

iii. Ronen Sen, '*Communist Movement in Bengal in the Early Thirties'*, Marxist Miscellany, No. 6, January 1975, New Delhi, p.7; Ronen Sen*, 'Banglar Trish Dashaker Prathomardher Communist Andalan',* Communist, (CPI on the half-century anniversary of the Communist Party of India, A special number published by the West Bengal State Council of the party), Calcutta, p. 166.

iv. Dharani Goswami, *Bharater Communist Andalaner Trisher Dashaker Ek Adhyay'* (Vol. II), Parichay, Year 43, Number 5, 1380 BS, Aghrahayan, December 1973, Calcutta, p. 504.

v. David M Laushey, *Bengal Terrorism and the Marxist Left : Aspects of Regional Nationalism in India*, 1905 to 1942, Pharma K.L. Mukhopadhyay, Calcutta ,1975 p. 97.

vi. Horace Williamson, *India and Communism*, (with an introduction and explanatory notes by Mahadevaprasad Saha), Editions Indian, Calcutta, 1976, pp. 231-232.

vii. Amitabha Chandra, *Abibhakta Banglay Communist Andalaner Suchana Parba*, Pustak Bipani, Calcutta, 1960, p. 145.

viii. Amitabha Chandra, *Abibhakta Banglay Communist Andalaner Suchana Parba*, Pustak Bipani, Calcutta, 1960, p. 146.

ix. Amitabha Chandra, *Abibhakta Banglay Communist Andalaner Suchana Parba*, Pustak Bipani, Calcutta, 1960, p. 146.

x. Amitabha Chandra, *Abibhakta Banglay Communist Andalaner Suchana Parba*, Pustak Bipani, Calcutta, 1960, p. 146.

xi. Amitabha Chandra, *Abibhakta Banglay Communist Andalaner Suchana Parba*, Pustak Bipani, Calcutta, 1960, p. 146.

xii. Amitabha Chandra, *Abibhakta Banglay Communist Andalaner Suchana Parba*, Pustak Bipani, Calcutta, 1960, p. 147.

xiii. Horace Williamson, *India and Communism*, (with an introduction and explanatory notes by Mahadevaprasad Saha), Editions Indian, Calcutta, 1976, P. 97.

xiv. Saroj Mukhopadhyay, *'Bharater Communist Oarty O Amra'*, vol.1, (1930-1941), Ganashakti Patrika Department, Calcutta, May 1985, p. 62.

xv. Amitabha Chandra, *Abibhakta Banglay Communist Andalaner Suchana Parba*, Pustak Bipani, Calcutta, 1960, p. 147.

xvi. Amitabha Chandra, *Abibhakta Banglay Communist Andalaner Suchana Parba*, Pustak Bipani, Calcutta, 1960, p. 147.

xvii. Amitabha Chandra, *Abibhakta Banglay Communist Andalaner Suchana Parba*, Pustak Bipani, Calcutta, 1960, p. 147.

xviii. Amitabha Chandra, *Abibhakta Banglay Communist Andalaner Suchana Parba*, Pustak Bipani, Calcutta, 1960, p. 148.

xix. Amitabha Chandra, *Abibhakta Banglay Communist Andalaner Suchana Parba*, Pustak Bipani, Calcutta, 1960, p. 148.

xx. Amitabha Chandra, *Abibhakta Banglay Communist Andalaner Suchana Parba*, Pustak Bipani, Calcutta, 1960, p. 148.

xxi. Amitabha Chandra, *Abibhakta Banglay Communist Andalaner Suchana Parba*, Pustak Bipani, Calcutta, 1960, p. 148.

xxii. Amitabha Chandra, *AbibhaktaBanglay Communist Andalaner Suchana Parba*, Pustak Bipani, Calcutta, 1960, p. 148.

xxiii. Amitabha Chandra, *Abibhakta Banglay Communist Andalaner Suchana Parba*, Pustak Bipani, Calcutta, 1960, p. 148.

xxiv. Subodh Roy (ed), *Communist Movement in India : Unpublished documents*, (Vol.1), (1925-34), National Book Agency, Calcutta, 1980, p. 416.

xxv. Amitabha Chandra, *Abibhakta Banglay Communist Andalaner Suchana Parba*, Pustak Bipani, Calcutta, 1960, p. 149.

xxvi. Amitabha Chandra, *Abibhakta Banglay Communist Andalaner Suchana Parba*, Pustak Bipani, Calcutta, 1960, p. 149.

xxvii. Saroj Mukhopadhyay, *'Bharater Communist Oarty O Amra'*, vol.1, (1930-1941), Ganashakti Patrika Department, Calcutta, May 1985, pp. 45-47.

xxviii. Amitabha Chandra, *Abibhakta Banglay Communist Andalaner Suchana Parba*, Pustak Bipani, Calcutta, 1960, p. 149.

A brief discussion on the relationship between religion and symbol

Sangeeta Bhattacharyya
Assistant Professor, Department of Philosophy
Baruipur College

Abstract : Humans are social creatures. Every society has its own definite structure, as well as its own traditions and culture, through which people live their lives. The flow of culture is created by fusing together everyone's social structure, history, and religion.Human interaction is an important part to keep society moving and symbol is considered as the most indispensable tool for communication.Because of his ability to comprehend and utilize language, man is regarded as one of the greatest animals in the entire animal kingdom. It is important to highlight that symbols form the foundation of all languages or it can be said that it is the substratum of any language. Symbol have been interpreted and used in different ways in different fields like, the way how a psychologist gives explanation of a symbol, that explanation or interpretation may not accepted by a sociologist and a theologian. In fact, symbols are considered as a medium or web that can represent individuals, groups, community, subject and also ideas in different ways from their different ground. We cannot separate ourselves from society because society is the source of the exploration of our existence. Society is made up of different types of institutions and also it has a definite structure. These institutions influence this society and human life according to their functions. If try to noticed very minutely, we can understand that institutions have their own symbols through which they can represent themselves. This paper tries to focus on religion among other institutions of society because we all know that, symbols play an important role in the field of religion and we also find that different religions have different kind of symbols. Objective of this paper is to discuss in a brief the relationship between religion and symbol and in this regard we cannot ignore the discussion about society, culture and the role of symbol from social and religious ground. At the end of this paper, would like discuss the relationship between religion and symbol from my perspective.

Key words : Religion, Society, Creature, Community, Symbol, Psychologist, Sociologist, Theologian, Languages, Represent, Existence, Relationship, Institutions.

Introduction

The first point that becomes important in accordance to the objective of this paper is why religion has been chosen for this paper among other institutions of society? In fact, just as we see the use of symbols in language, we also witness the use of symbols in religion, maybe more than in any other institution of society.When we try to understand the society or civilization of a particular period, we also try to understand the history, politics and religious system associated with it because they represent the picture of that period before us. Therefore, religion has been chosen among other institutions of society because none of us can completely deny that religion is one of the most important means of understanding society and culture. Each symbol represents a different subject and meaning also, as most Christians wear a cross pendant, while Hindus often wear pedants of various god and goddesses. Now the question is what do these pendants signify? They actually signify their devotion, faith and sacredness, that is the Christians or Hindus referred to here, and on the other hand also represent their clans also. In this case it can be said that how far these significance of symbols is reasonable? In this context it is important to mention that religion is a kind of belief system, naturally it can take different formation for different types of people. When we are talking about symbols and their significance which associated with our faith or belief system, these significances naturally will not be the same for all people, hence, it is obvious to have debates in that area as well, however, the purpose of this paper is not to discuss about the debate rather it tries to explain the relationship between symbols and religion. If we examine the matter of religion, we will understand that symbols represent actually the entire concept of religion. Anything in any religion can be symbolic, and it can also carry a special message for society.

Symbols do not express always the religious thing or religious matters, they can represent humanity, clans, race, truth, beauty etc. also. If we want to find out the function of symbols, we can understand that symbols themselves are full of significance or concepts, when we try to

understand them, they actually represent society, culture, history etc. to us at the same time.If we noticed the evolution of religion, we can understand the evolution of society and culture. If we look back at the history of religion, we will get many names of sociologists and anthropologists those who talked about the relation between religion and symbol and many of them also explain the importance of symbols. As we can found the name of Emile Durkheim who was a famous name in the field of sociology. In explaining the simplest form of religion, he referred to the Arunta tribe of Australia in his book *The Elementary Forms of the Religious Life.* According to him the Arunta tribes were divided into small group or clan. To comprehend the evolution of religion he talked about totemism, which is according to him the simplest form of religion. Each clan had its own totem. For him anything can be considered as a totem like a deer a tree or a rock anything but when they become totems, they must at the same time become sacred that means these are completely separated from our daily lives or what he called profane. Each clan or group represented themselves through their own totems. So we can understand here that totems were considered as a symbol for each clan or group. Rules and regulations were followed by each clan according to their totem. So it is clear that according to Durkheim totems were actually used as symbols. When a deer or a rock is worshiped by the clan members, they consider these totems as sacred. If we noticed, we can understand, these tomes wereactually part of our society that means the members of the clan are literally showing their loyalty to the society through their worship. This is how Durkheim tried to symbolize society as God in his book *The Elementary Forms of the Religious Life.* Indeed, symbols used in religion not only show us the ideas of that religion, also draw the socio-cultural picture of that particular time. When a religion makes its debut in a society, it tries to give messages through its symbols and these symbols are consisting of ideas, myths, rituals of that particular religion.These messages may be religious or secular, but we can never deny that symbols used in religion represent something to us.

The role of symbols is also very important in the field of culture because through symbols we can understand the traditional differences between one culture from another.We know that culture is associated with rituals and practices and these rituals and practices can explore with the help of symbols. We know Om or Swastika used in Hinduism as a

symbol to express sound of entire universe. As the Cross of Christianity signifies Jesus Christ, it also signifies their religious beliefs. Hence, symbol is the medium of representation.

Finally, from myperspective it seems that when we are choosing a symbol for a subject, the function of the symbol is to symbolize the entire subject as well as it helps to explain the meaning and essence of the whole subject. When we selecting to symbolize something, may be the subject is religion, culture or society or whatever, we should give importance to the significance of that subject, welfare, truth, love, justice, brotherhood etc. It is not new that these things or matters are important in the selection of symbols, especially in the selection of religious symbols but that which is moral and auspicious if it is repeated in society, is as beneficial as it is necessary for that society.

References

1. Abraham Francis, *Modern Sociological Theory: An Introduction*. Delhi, Oxford University Press, 1982.
2. Mahapatra Anadikumar. *Samakalin Samajtattva*, Suhrid Publication, 2011.
3. Macionis, John j. *Sociology,* 10th edition. India, Dorling Kindersley Pvt.Ltd., licensees of Pearson Education in South Asia. 2006.
4. Lessa A William and Vogt Z Evon, *Reader In Comparative Religion An Anthropological Approach.* 4th Edition.

Early Phase of Worker and Employee Organizations and Movements : A Study of Calcutta Port and Dock

Chitrabhanu Biswas
Assistant Professor, Dept. of History
Domkal Girls' College

Abstract: Calcutta was a very busy port for trade. All the shipping Companies here were English owned. The Calcutta Port and dock presented a complex configuration of different types of employees, engaging a workforce that varied in skills, employment patterns and educational attainment. Very interestingly, whereas industrial workers work for a single employer, dock workers work for various employers such as shippers, stevedores, dock labour board and port trust. Workers engaged in the same workplace in its different activities are employed by more than one employer. From the beginning of the second decade of the twentieth century, the Calcutta port and dock workers' organizations can be seen to develop and strikes and agitations based on various demands are observed among them. But there is no well-organized research on the movement, organization and lifestyle of those port workers. This article will mainly try to shed light on the organization and movement of those neglected-understudied workers of Calcutta Port and Dock. Due to the limitation in the scope of the discussion, only early stage movements and organizations are included in the discussion.
Keywords: Port, Dock, Worker, Labour, Employee, Organization, Movement.

In the mid-nineteenth century, the modern industry was established in Bengal and India as well. With the establishment of this modern industry, a new social class had emerged. The newly emerged social class was the 'working class'.[1] During this period jute mills, tea gardens, coal mines, iron and steel, textile, paper and engineering industries developed in Bengal. Later electricity, chemical, electronics, soap and rice mills were gradually established. Railway, port, streamer service and tramway were established along with the colonial modernity. The size of the working

class grew enormously in the late nineteenth and early twentieth century through the establishment of all this factory, industries and the development of transportation system.[2]In the early twentieth century more than three lakh workers were engaged in this modern industry.[3] From these statistics it can be easily inferred that, although the percentage of peasant in agricultural Bengal was very large, but the number of working class was not small at all. In the early period Bengali workers were mainly employed in all these industries. But, the rapid expansion of factories from the beginning of the twentieth century led to a huge demand for workers and as a result, local Bengali workers were replaced by workers from the neighboring states of Bihar, Orissa, Uttar Pradesh in droves.[4] From this time non-Bengali workers were in the majority rather than Bengali workers due to the Bengalis' apathy to industries hard work. Also, the rise of the middle class and the wave of national movements affected the people of Bengal more than other provinces. As a result, British owners started recruiting non-Bengali workers from the outside of Bengal to ensure increasing profits in the industry.[5]In the first two decades of the twentieth century, the participation of workers in the 'organized sector' as well as in the 'unorganized sector' increased considerably. One such important 'unorganized sector' was the port, where large numbers of workers were employed.[6]But there has been little discussion of the 'unorganized sector' engaged in a variety of activities outside the large scale industries such as textiles, jute, coal, tea, railways and steel.[7] Thus, this article will discuss how the organization and movement of the workers of Calcutta Port, an important port during the colonial period and independent India, started and what was its condition in the early stages.

Before discussing the labour organization and movement of Calcutta port, it is necessary to give a brief idea about port and dock workers. In the late nineteenth century, the modern Calcutta Port emerged for the steamship trade of the British Empire.[8] Calcutta was a very busy port for trade. All the shipping Companies here were English owned. The activities of the port can be divided into various categories.[9] The Calcutta Port and dock presented a complex configuration of different types of employees, engaging a workforce that varied in skills, employment patterns and educational attainment.[10] Interestingly, whereas industrial workers work for a single employer, dock workers work for various

employers such as shippers, stevedores, dock labour board and port trust. Workers engaged in the same workplace in its different activities were employed by more than one employer.[11] However, port and dock workers can be broadly divided into three categories. First category is stevedore worker. 'Stevedoring workers who are employed by private stevedores (work contractors) to load and unload ships, and who work only aboard the ships.'[12] Second category is shore worker, who handle the cargo on shore. The majority of stevedore and shore workers were mostly uneducated Muslims and they came from remote areas of Uttar Pradesh, Bihar in the Ganges Valley.[13] The number of stevedoring workers were much higher than the shore workers. Both the labourers of the first and second categories were employed on a piece-work basis.[14]Amongst the dockyard worker women, children as well as aged men are not found for the arduous nature of the work.[15] Port workers and employees were in third category, those are engaged in port services other than the cargo handling. They are directly employed by the Calcutta Port Commissioners. 'Amongst them, as can be expected, on finds more educated and skilled workers, hailing from far and near places, many of them being Bengalis, especially, displaced persons from East Pakistan.'[16] In the 1920s, the Port Trust around 6,754 workers were directly employed.[17] In 1947, the total number of workers had risen to 18,000.[18]

In the late nineteenth century, the problems of modern industrial workers in Bengal attracted the attention of educated society. Efforts to organize workers were observed from this period.[19]The nationalist leaders of Bengal from the beginning of the twentieth century also deeply realized the problem of the working class and its social and political significance. Among them an interest can be also observed to involve the working class in the national movement. There were two real reasons for this – one economic, the other one political. In the early twentieth century, commodity prices rose due to the declining food grain production and population growth. As a result, workers were the most affected. In addition to the increase in commodity prices, workers were dissatisfied with their working hours, wages and other demands. In this way the strike and movement started among the workers of Bengal.[20]

The Calcutta Port and Dock labour movement is important especially for two reasons. 'Firstly, the port and dock, taken together, employed a large number of workforces. Secondly, the port and dock had

a crucial importance in the economy of not only Bengal also of neighboring provinces.'[21]Whereas the stevedores and the Bird & Company were recruited the dock workers, at their port workers and employees were direct employee of Port Trust. Although the Calcutta port and dock workers came from roughly the same social background, their movements and organizations differed due to variations in their working conditions and employment.[22] The dock unions can be easily classified in Calcutta, as those who cater in the stevedoring workers and those that cater to the port employees and workers and also shore workers.[23]

'The files of the Registrar of Trade Unions of West Bengal indicate that altogether seventeen registrar associations existed at one time or another during the history of the docks, of these, ten are in existence.'[24] The first initiative to establish an organization or union among the port workers can be seen from the leftist. The Lal Jhanda (Red Flag) Union was formed under the leadership of the Leftists. Later, Kala Jhanda (Black Flag) Union was established under the leadership of the Muslim League leaders among the port workers in the middle of the third decade of the twentieth century. However, left-wing unions were able to maintain dominance among dock workers until World War II. Throughout the 1940s, the Muslim League and leftist unions worked among workers in the Calcutta port and dock. After the independence of India in 1947, Congress filled the void left by the Muslim League in leadership among the port workers.[25] However, this essay mainly focuses on the period, when the Leftists were active among the Calcutta port workers. Therefore, the discussion here will be limited to the end of the third decade of the twentieth century.

The papers of the Port Commissioners' meeting in May 1877 contain an early mention of labour agitation in the Calcutta Port. Work was suspended on 30th April as a result of "a strike among Sardars and coolies" brought on by the municipality's imposition of a license levy on Sardars. At that time port authorities knew and understood little about existing labor organizations.[26] There were sporadic work halts in several departments at the ports and jetties in the wake of the escalating labour unrest in the post-World War I era. However, when testifying before the Royal Commission on Labour (1929), the port authorities and their labour contractors attested to the lack of organization or combination among

dock labour in Calcutta.[27] However, additional evidence points to an increasing trend, among dock workers to voice their demands and complaints.[28] Several resolutions were accepted at a mass gathering of over 1500 dock workers held in December 1927 under the supervision of the provincial committee of the AITUC, which was led by its President Mrinal Kanti Bose. A close examination of these decisions reveals that, despite several requests made to the port authorities, they were unable to solve the problems. The formation of the "Dock Workers' Union" as a union for these dock employees was decided. They sought better housing and a provident fund in addition to the elimination of recruitment bribery given to sardars and babus.[29] However, not much is known about the proposed union. According to a source from 1930, the National Union of Dockers, Calcutta was renamed the 'Calcutta Dock Workers' Union' in April of that year, and a committee was established with left-leaning Congress leader Hemanta Kumar Sarkar as its president and S I Yatzdani as its general secretary. But it appeared that all of these unions were largely paper-based and temporary.[30]From the discussion above, we see that the port authority was not providing any trade union information to the Royal Commission until the First World War. But on the contrary, in the information given by Nilmani Mukherjee, we come to know about a meeting of the workers and some demands. Also, Nirban Basu traces a short-lived port workers' union to a trade union document dated April 1930. Thus, it can be said that from the inception of the Port Trust till the second decade of the twentieth century, no such organized, permanent and strong union was formed among the workers of Calcutta port. On the contrary, during this period, isolated and scattered strikes and agitations based on various demands can be observed among them.

On April 12, 1920, Dr. Moreno, a Christian missionary, founded the Calcutta Port Trust Employees' Association (CPTEA), largely as a social welfare organization. This is the first union of Calcutta port employees. I B Sen, a respected labour leader and barrister, served as the organization's president. Nripaul Bhattacharya, the Joint Secretary, was one of the other white-collar workers who made up the other leaders and members.[31] The union had 1400 members in total.[32] The early enthusiasm of the members quickly faded, but Bhattacharya, whose name Nripaul was distorted by labourers into Nepal, revitalized the Association in 1922. According to the Indian Trade Union Act of 1926, it was registered

as a union on June 20, 1929. Following recognition, during the years when it had no competitors, it successfully negotiated significant gains on issues like provident funds, leave, and other fringe benefits. After 1929, the union started recruiting shore workers in addition to port staff.[33]

Contrarily, although there were periodic work stoppages that were the earliest signs of the labour movement in the case of the dock workers as early as the late nineteenth century, it wasn't until the early 1930s that real attempts were made to organize the dock workers. The Bengal Labour Party was founded by Niharendu Dutta Majumdar, and it attracted Marxist academics that cared about the suffering of workers to its ranks. After learning about his actions, the dock workers asked him to help them form a union in January 1934. As a result, the Calcutta Port and Dock Workers' Union was founded, and by the end of the first year, it claimed to have 14,000 members.[34]

The Bolshevik Party, a Marxist-Trotskyite organization primarily confined to Bengal, took the initiative to establish the "Calcutta Port Trust Employees Association" and the "Calcutta Port and Dock Workers' Union" in both cases. The CPTEA did not face any significant competition until 1938, when the National Union of Port Trust Employees (NUPTE) was founded by leaders of the Muslim League, who wished to seize control from the leftist CPTEA. Up until the late 1920s, the CPTEA's membership consisted only of clerical and supervisory port employees, who at the time were not particularly notable for their union activism. The port and shore workers' unions were also engage in this conflict between the Kala Jhanda and Lal Jhanda traditions, although in their case, the Lal Jhanda was more entrenched and older. Another distinction is that the port authorities were the only employer those unions had to deal with. Additionally, because the workforce was better educated, the movement was able to develop its own leadership.[35] As a result the port workers' unions were stronger and better organized than the dock workers' union.[36]

In a memorandum to the authorities in November 1934, the union wanted two gangs per crane in place of the current one gang per crane, shorter working hours for dock workers, and higher wages. Workers began to take strikes on November 26, 1934, when the authorities rejected their charter of demands.[37] From November 26 to December 14, 1934, there was a strike. The Times acknowledged the economic nature

of the striking demands while maintaining that communism was the root of the problem.[38]A women leader Sudha Roy was active in dock workers' in this strike. A year earlier, she had joined the Bengal Labour Party. The task was not easy at all. In such a situation, when all workers are male and majority of leader also male, there handled the leadership of a middle-class woman in a labour field with great importance and courage, it can be said without a doubt.[39] However, at a meeting of the employees at Calcutta Maidan on December 16, the union's strike committee formally announced that the union had decided to call off the strike in light of promises made by the Shipping Agents that no victimization will occur. The union also anticipated that the government would provide a guarantee that, if a solution could not be reached within three weeks of the workers' return to work, a Court of Enquiry under the Trade Disputes Act would be appointed by the government.[40] Eventually, the dock labourers' shifts were cut from eleven to nine hours, and the daily pay for the twelve-person gangs increased from twelve to fourteen and then to sixteen rupees.

However, the 1934 strike was not entirely successful. In reality, the government's oppressive actions, including the implementation of Cr P C 144 and the arrest of leaders, as well as the splintering strategies of a rival union founded by Muslim League leader H. S. Suhawardy, forced the cancellation of the strike.[41] The government after the end of the dock workers' strike in 1934 quickly declared the Calcutta Port and Dock Workers' Union illegal on the grounds that its leader N Dutta Majumdar was seditious. Viswanath Dubey, however, continued the union's work under a new name, the Dock Mazdoor Union. The Dockmens' Union, founded in 1937 by Nepal Bhattacharya, was renamed the Bird & Co. Workers' Union in 1942 after the private company that handled freight on the coast.[42]

In this discussion on the labour organization and movement of Calcutta Port and Dock, it has been seen that during this period, mainly the left wing, especially the Bengal Labour Party, actively participated among the port workers and conducted the organization and movement among them. Also, towards the end of this period, left-wing port workers' unions began to face competition from Muslim League unions. But the important political party in India at this time, the National Congress is not found in the discussion in this phase. Because they could not build any

active organization among the port workers at this time. However, it must be noted that the influence of the National Congress was also seen in the port workers and other various labour organizations. After World War I, workers in various fields were inspired by strikes and agitations of Congress. As an example in the case of port workers, during civil disobedience movement the port workers were inspired by this and went on strike in 1932.[43] Workers wanted to further legitimize their struggle by associating the strike with the nationalist movement. Although, the Congress as a party had no enthusiasm for these movements and rarely took part in organizing strikes.[44] Therafter, the port workers' union and movement moved slowly towards the next phases.

References

1. Subodh Kumar Mukhopadhyay, *Banglar Arthik Itihas: Bingsho Satabdi (1900-1947)*, 2nd edn., (Kolkata: K P Bagchi and Company, 2011), 145.
2. Sekhar Bandyopadhyay, *From Plassey to Partition: A History of Modern India*, (New Delhi: Orient Longman Private Limited, 2006), 369.
3. Mukhopadhyay, *Banglar Arthik Itihas*, 145.
4. Nirban Basu, 'Banglar Shromik Charchar Itibritto: Boichitro O Simabaddhata', In Nirban Basu, ed., *Anusandhane Shromik Itihas*, (Kolkata: Setu Prakashani, 2013), 28.
5. Manju Chattopadhyay, 'Bandor Shromik Dharmaghat (1934) O Communist Netri Sudha Ray', In Nirban Basu, ed., *Anusandhane Shromik Itihas*, (Kolkata: Setu Prakashani, 2013), 421.
6. Bandyopadhyay, *From Plassey to Partition,* 369.
7. Ranjit Dasgupta, 'Shromik Itihas Charchar Dhara', In Nirban Basu, ed., *Anusandhane Shromik Itihas*, (Kolkata: Setu Prakashani, 2013), 12.
8. Aniruddha Bose, *Class Conflict and Modernization in India: The Raj and Calcutta Waterfront (1860-1910)*, (London: Routledge, 2017), 144.
9. Chattopadhyay, 'Bandor Shromik Dharmaghat', 421.
10. Michael V D Bogaert, *Trade Unionism in Indian Ports: A Case Study at Calcutta and Bombay*, (New Delhi: Shri Ram Centre for Industrial Relations, 1970), 1.

11. C S Venkata Ratnam, 'Human Factor in Port: A Review of Literature', Indian Journal of Industrial Relations, 11, 2 (Oct., 1975): 194.
12. Michael V D Bogaert, 'Dynamics of Political Unionism: A Study of the Calcutta Dock Unions', Indian Journal of Industrial Relations, 4, 2, (Oct., 1968): 203.
13. *Ibid*, 204.
14. Nirban Basu, *Trade Union, Working Class Politics and Protest Bengal: 1937-47*, (Kolkata: Progressive Publishers, 2019), 332.
15. Shubhankita Ojha, 'Regulating work: Decasualisation of Dock Labour in Colonial India', Social Scientist, 42, 3/4, (March-April, 2014): 78.
16. Bogaert, 'Dynamics of Political Unionism', 204.
17. Prerna Agarwal, 'Dock Labour and A Connected History of Workers in Early Twentieth Century Calcutta', Journal of India Ocean World Studies, 6, 2, (2022): 187.
18. Shantaram Ramkrishna Deshpande, Report on an Enquiry into the Conditions of Labour Employed in Ports, (Simla: Government of India Press, 1946), 11.
19. Mukhopadhyay, *Banglar Arthik Itihas*, 147
20. *Ibid*, 147-148. .
21. Basu, *Trade Union*, 333-334.
22. *Ibid.*
23. Bogaert, 'Dynamics of Political Unionism', 204.
24. Bogaert, *Trade Unionism in Indian Ports,* 23.
25. *Ibid*, 24.
26. Nilmani Mukherjee, 'Port Labour in Calcutta, 1870-1953: Some Trends of Change', In M V Chaudhuri, ed., *Trends of Socio-Economic Change in India 1871-1961, (Vol. 7)*, (Simla: Indian Institute of Advanced Study, 1969), 464-473.
27. Report of the Royal Commission on Labour in India, London, 1931, 319-320.
28. Basu, *Trade Union*, 334.
29. Mukherjee, 'Port Labour in Calcutta', 464-473.
30. Basu, *Trade Union*, 335.
31. Bogaert, *Trade Unionism in Indian Ports,* 27-29.

32. Rajat Ray, *Urban Roots of Indian Nationalism: Pressure Groups and Conflict of Interests in Calcutta Politics, 1875-1939*, (New Delhi: Vikas Publishing House PVT LTD, 1979), 85-88.
33. Bogaert, *Trade Unionism in Indian Ports*, 29.
34. *Ibid*, 24.
35. Bogaert, 'Dynamics of Political Unionism', 204-205.
36. Basu, *Trade Union*, 334.
37. Panchanan Saha, *History of The Working Class Movement in Bengal*, (New Delhi: People's Publishing House, 1978), 140.
38. Basu, *Trade Union*, 336.
39. Samita Sen, 'Gender and the Politics of Class: Women in Trade Unions in Bengal', South Asia: Journal of South Asian Studies, 44, 2, (2021): 372.
40. Saha, *History of Working Class,* 142.
41. Basu, *Trade Union*, 336.
42. Bogaert, *Trade Unionism in Indian Ports,* 25.
43. Bandyopadhyay, *From Plassey to Partition,* 377-79.
44. *Ibid.*

Distance education in West Bengal and the role of educational institutions : a general study with special reference to NSOU and Ravindra Mukta Vidyalaya

Sabana Begum
Librarian
Abhedananda Mahavidyalaya
Sainthia, Birbhum

Abstract: The history of distance education in India is not very old. it is a post independence phenomena. the true revolution in distance education in India was heralded with the establishment of the first Open University in the country namely Andhra Pradesh Open University, Hyderabad (1982) which was later renamed as Dr. B.R. Ambedkar Open University.

The Open Universities are established with a view to introduce and develop concept of open and distance education in which quality education could be ensured through optimum use of Technology. They are expected to be innovative, flexible in terms of offerings, methods and medium of instructions, completion time of the courses and cost effective non formal channel of education combined with the distance education institutes. They are to play a momentous role in the domain of Higher Education in the country to democratize higher education to large segments of the population in particular the disadvantaged group such as those leaving in remote and rural areas, working people, women etc., to provide an innovative system of university level education which is both flexible and open in terms of methods and pace of learning; combination of courses; eligibility for enrollment; age of entry; conduct of examination and implementation of the program of study

Keywords: Distance education, Open Distance Learning, NSOU, RMV.

Introduction:

The distance learning courses in West Bengal are provided by the universities of West Bengal and other West Bengal Distance Learning Institutes. These distance learning courses in West Bengal are highly in demand as they allow the students to nurture other interest along with

their studies. The initial hesitation of pursuing education through distance learning mode has gradually evaporated in West Bengal. On the contrary today distance education in West Bengal is looked forward as a suitable mode of pursuing higher education. It is easier for the student to pursue a correspondence course from the University of West Bengal as the course fee of these distance learning courses are much lower as compared to that of the regular courses. Moreover the distance learning Institutions of West Bengal also offer necessary study materials to the students. The West Bengal distance learning institutions offer fare amount of flexibility to the students.

The directorate of distance education of Vidyasagar University is a leading provider of distance education in West Bengal. Established in 1994 in the main campus it started offering courses from 1994-95. It offers correspondence courses in M.A. (Political Science with rural administration, Bengali, history, Sanskrit and English), M.Com (commerce with farm management), Bridge courses (Political Science with Rural administration, History, Bengali, English and Commerce with farm management) M.Sc. (Physics and Techno Physics, Botany and Forestry, Zoology, Environment, Applied Mathematics, Dietetics and Community Nutrition Management). In West Bengal the Directorate of Distance Education of the University of Burdwan is another important institute that is making distance education accessible to a large number of people in the state of West Bengal. It offers courses in M.A. (English, Bengali, History, Philosophy, Political Science) M.Sc. (in Geographic Information System and Remote Sensing) MBA in Insurance and Risk Management and Apparel Design, B.A. in Interior Design and B.Sc. in Bioinformatics. Several other institutes also offer distance learning courses in West Bengal.

There are other Open universities in West Bengal that are mainly formed to provide education in distance mode. These are Netaji Subhash Open University (NSOU), Rabindra Mukta Mahavidyalaya (RMV) and Indira Gandhi National Open University (IGNOU).

Netaji Subhash Open University (NSOU):

Netaji Subhas Open University s an open university imparting distance education in India. It was established by the West Bengal act XIX of 1997 to commemorate the birth centenary of Netaji Subhas Chandra Bose. It has its headquarter at 1, Woodburn Park, Kolkata, once the

residence of Netaji. It's medium of instruction are English and Bengali. Modeled on the Open University UK and IGNOU, it offers courses in different disciplines to teach graduate and post graduate studies and is one of the largest growing distance education universities in eastern India. It is the 58th largest University in the world.

Netaji Subhas Open University was set up with an objective to spread higher education throughout the state and reach the unreached with quality education in the open distance learning mode. NSOU is the sole State Open University of West Bengal and the largest one in India recognized by the University Grant Commission (UGC) and Distance Education Council (DEC) of India. In 2006 the university receives the Excellence in Distance Education Award (EDEA) for institutional achievement conferred by Commonwealth of Learning (COL), Vancouver, Canada. The university is also a member of the Association of the Indian University (AIU), New Delhi, Association of Asia and Open University (AAOU), Malaysia and the Association of Commonwealth University (ACU) United Kingdom.

With nearly 25,0000 students enrolled in NSOU has achieved a mega University status. The university provides higher education through the distance learning mode in the language of the state that is Bengali and makes education affordable to the disadvantaged. Netaji Subhas Open University offers various programs like Under graduate(three years), Post graduate (2 years), Post graduate diploma (1 year), certificate (6 months) and vocational programs (6 month, 1 year and 2 years). At present the university conducts 77 courses. There are two second degree programs. These include Bachelors in Library and Information Science and B.Ed.

Recently, three Village Knowledge Centres (VKC) have been set up at the Shanti Devi Vidya Niketan Plassey, Nadia, Nari Shikha Samit, Jhargram, Paschim Medinipur and the Anjali Social Welfare Research Foundation, Panskura, Purba Medinipur in collaboration with non-government Organizations for providing free computer and internet access to students.

Under the ODL system it is not mandatory to attend face to face classroom for students. The University organizes contact programs for all the courses at the designated study centres for the benefits of the

students. For the vocational courses, the University has made it compulsory to attend practical classes.

Materials available:

The university is headquartered at 1, Woodburn Park, Kolkata, and has a Regional Centre at Kalyani. It has a wide network of 120 study centres located all over West Bengal. The students can get admitted at the Study Centre nearest to their residence. The Self- Learning Course material is distributed to students through the study centres of their choice. The university also organizes counseling programs (face to face teaching) for the students at the study centre. The evaluation process is in dual mode, one is continuous evaluation and the other is term end examination. The students are awarded degrees on the basis of these two examinations.

Programs offered by Netaji Subhash Open University:

Number of undergraduate programs: 13 (Bengali, English, History, Political Science, Sociology, Public Administration, Commerce, Mathematics, Geography, Botany, Zoology, Physics and Chemistry).

Professional courses: undergraduate and postgraduate level- 3 (BCA, BLIS, Specialization in B.Ed. for the physically challenged).

Vocational courses: Number of courses- 30.These include Certificate, Diploma and Postgraduate Diploma courses. These are pre primary teachers training, tailoring and dress designing, psychological counseling, travel and tourism, Hospital front office management, taxation etc. the University has also launched job oriented and skilling programs in the current session. These include diploma in safety skills and security management, diploma certificate in automobiles, diploma in refrigeration and air conditioning, diploma or certificate in plastic moulding and post diploma programs in export import management and operational skills and disaster management.

Teaching methods:

To provide individualize supports to its students NSOU has large number of study centres throughout West Bengal. NSOU uses a variety of methods for distance learning:

1. Self-instructional material: self-instructional study materials are distributed to the students through the study centre.

2. Audio-video CD: audio and video cassettes of a specific program are supplied to the study centres. The audio tapes are run and video cassettes are screened at this study centre.
3. Personal contact program: instructions are important through self - instructional study materials and personal contact program. The personal contact program is generally held on Saturdays and Sundays.
4. Gyan Vani FM channel: NSOU started the Gyan Vani FM channel, Kolkata, a radio channel on 105.4 MHz. for communication.
5. Interactive radio counseling: the university broadcasts different subjects on 4th Sunday of every month through All India Radio (AIR) at Kolkata B. Apart from the regular classes various topics on awareness programs; support services special programs of national importance are also broadcast.

Netaji Subhash Open University in collaboration with Central Institute of India Languages, Mysore has launched Bangla Online (an online language teaching course on Bengali language) on 24th March 2004.

Library system:

The Central Library of Netaji Subhas Open University is located at Golpark campus of the university (second floor 134/1, Meghnath Saha Sarani, Kolkata- 29). Phone library facilities are also available at the study centres. The college library has a collection of books both text and reference, Journals, collections of paper, few educational CDs and floppies to meet the immediate requirement of the students and other members. Membership of the library is open to the students of the college. The number of books amount to about 20,000 to which every year materials are added from the UGC and the college fund. Internet facilities are added for the deserving candidates. Integrated automation software was introduced along with this student administration.

Library rules and regulations:

- Library cards are issued to the students from the library on production of the college fees books.
- Each bonafide student gets two library cards 1.reading card and 2.lending card.
- In case of library card is lost duplicate card may be issued only after submission of a formal application and the fee of rupees 5/.
- Library card is not Transferable.

- Library cards must be surrendered before feeling up forms of university examination or to get transfer certificate.
- Students of Honors' classes can avail maximum two books at a time and that of general classes one book at a time.
- Lending hours for morning section 7:30 a.m. to 8:30 a.m. and lending hours for day and evening section 11:30 a.m. to 1:30 p.m.
- Late fine for delayed return of books is rupees 1 per book per week.
- Working hours Monday to Friday 7:30 a.m. to 5:30 p.m.
- Saturday 7:30 a.m. to 1:30 p.m.

Rabindra Mukta Vidyalaya (RMV):

Synthesis of different data reveals that the major portion of our population is less privileged. Though the state government tries its best to ensure education for all, a vast population is depriving from the right to education specially due to the socio economic reasons and other social hurdles with the objective of extending education among all sections of men, women and children of society irrespective of their different age groups, the state government made a great effort in setting up state open schools under the State Education Department. It was named Rabindra Mukta Vidyalaya (RMV). In 1998 RMV subsequently became a statutory organization from 1st August 2001 under the Rabindra Mukta Vidyalaya Act 2001 passed by the West Bengal State Legislature. RMV imparts learning through its study materials which are provided to their registered students. In addition they have numerous study centres scattered all over the district of West Bengal. Procedures and rules were flexible as they were formulated bearing in mind the need and circumstances of the target group of learners RMV imparts education to its students through its study centres on a wide range of subjects, conducts examination and certification at the Secondary And Higher Secondary Level. It has as many as 168 study centres for the secondary level and 64 study centres for the higher secondary level. The students of RMV are primarily neo-literates, school dropouts, unemployed and self employed young man and woman, elderly people, challenged persons or any other person from the weaker section of society.

Under a new system introduced by Rabindra Mukta Vidyalaya Students who have passed in some subjects as regular candidate in Madhyamik And Higher Secondary examinations but not declared

successful needs not to sit for those subjects if they appear in the Madhyamik examination and Higher Secondary examination form RMV

RMV has decided to introduce few vocational courses and increase the number of study centres. Introduction of new subjects and courses is also under contemplation of vidyalaya.

Role of Rabindra Mukta Vidyalaya: reaching the unreached :

In 2002-2003 the number of study centres for Madhyamik level Rose from 57 to 109 and for higher school from 23 to 36. Enrollment in Madhyamik course remains at 8022 And Higher Secondary course at 942. The West Bengal Council for Higher Secondary Education has declared the pass out from RMV eligible for admission into affiliated schools and colleges. In West Bengal RMV has also become a member of COBSE.

Target groups: neo-literates, school dropouts, unemployed and self employed young man and woman, full time or part time workers in different establishments, peasants and elderly people handicapped and others from weaker sections of the society.

Course offered: In both Secondary and Higher Secondary levels the learners has to clear the compulsory and minimum subjects stipulated by the WBBSE and WBCHSE for equivalence.

secondary level subjects: Bengali, English, Mathematics, physical science, life science, history geography, Political Science, Commerce, home science and Economics.

Higher secondary level subjects: Bengali, English, History, Commercial Geography, Political Science, Education, Accountancy, Business Organization and Management. Self learning materials are prepared by the subject experts and experienced teachers available free of cost.

Activities:

- direct conventions in four districts with the participation of Zilla Parishad, representatives of Gram Panchayats, Head Teacher of school, teachers, educationalist and NGOs.
- Meeting at the study centres and schools.
- Meeting with the coordinators.

Future program envisaged:

- Introduction to more subjects at Higher school level
- holding workshops, seminars, conference, for promotion of Open Schooling and for writers of study materials

- introduction of Vocational courses after conducting service to ascertain region specific needs of Vocational subjects
- understanding research activities and setting up a library
- playing significant role in the SSA program.

Conclusion:

West Bengal is a state where majority of people live in villages and suburban areas. To get access to higher education is not so easy as insufficient number of regular schools and colleges mainly in the village areas. One school or college has to serve many students as a result overflow of students beyond the allotted sit numbers. Due to the distance problem many students cannot attend classes regularly. Beyond this problem there are financial problems too. Most of the families are lying under the poverty line. Hence the children of these families are involved in farming or with any other work to earn. Hence in this situation distance education plays a pivotal role to educate people in distance mode. Distance learning mode is the only way to give access to education to various types students from different backgrounds. In order to increase the number of educators distance education is the only way out.

References:

1. Asirvatham, Sandy. (2000). Beyond the distance barrier. Journal of Property Management. 65(5), p.42-8.

2. Berge, Zane L. et al. (2001). Obstacles faced at various stages of capability regarding distance education in institutions of higher education. Tech Trends. 45(4), p. 40-5.

3. Dunn, S. (2000). The virtualising of education. The Futurist, 34(2), p.34-38.

4. Garrison, D.R. (1990). An Analysis and evaluation of audio teleconferencing to facilitate learning at a distance. The American Journal of Distance Education, 4(3), 13-24.

5. Koul, B.N. et. Al. (1988). Studies in distance education. AIU, IGNOU, New Delhi.

6. Mulilenburg, Lin and Berge Zane L. (2001). Barriers to distance education: a factory analysis study. The American Journal of Distance Education. 15(2), 7-22.

“Bidrohi” : Unveiling Posthumanist Undercurrents amidst Shifting Historical Tides

Rajarshi Das
Librarian,
Central Library, Banwarilal Bhalotia College,
Ushagram

Abstract: "Bidrohi" is a poetic masterpiece that emerged during the fervent epoch of modernist ideals, encapsulating the memories of seismic global occurrences such as the First World War, the Caliphate's demise in Turkey, the birth of the USSR in Russia, and the genesis of the Indian Communist Party. The poem was penned in a somnambulistic trance by Kazi Nazrul Islam, who transcribed his words onto paper. The poem was a declaration of defiance, capturing the essence of an era brimming with unrest and transformation. The poem's genesis occurred within the fervent embrace of modernist ideals, at a time when the world was seething with change and the future was painted with both hope and uncertainty. The embers of the First World War still glowed, casting a long shadow of devastation and disillusionment. The fall of the Caliphate in Turkey sent ripples of political and religious transformation across the Muslim world. In Russia, the dawn of the USSR was breaking, heralding the rise of a new ideology that would shape the course of history. Closer to home, the nascent Indian Communist Party was taking its first steps, promising radical change in the subcontinent. In the confines of a shared room, destiny conspired to unite two distinct yet interconnected pillars of dissent: Kazi Nazrul Islam and Mujaffar Ahmed. Their coexistence in that room became a crucible of revolutionary thought, a space where the fumes of fervour intertwined and gave rise to ideas that would shape the course of history. "Bidrohi" stands not merely as a poem but as an enduring monument of resilience and audacity. It embodies the spirit of an era that refused to succumb to the shackles of complacency and dared to dream of a world reborn from the ashes of turmoil. The poem's verses transcend his era, resonating with the stark realities of today's battlefields, where the clashing forces are not just men and machinery but also the convergence of artificial intelligence-infused drones, robotic soldiers, and unmanned modern marvels.

Keywords: Posthumanism, "Bidrohi," Modernist Belief, Technological Advancement, Human Vulnerability, Artificial Intelligence.

Introduction:

In the annals of history, a remarkable convergence of events birthed "Bidrohi," a poetic masterpiece that etched itself as a bullet wound upon the canvas of time. Emerging during the fervent epoch of modernist ideals, this poem encapsulated the memories of seismic global occurrences such as the First World War, the Caliphate's demise in Turkey, the birth of the USSR in Russia, and the genesis of the Indian Communist Party. Penned in a somnambulistic trance, the poet Kazi Nazrul Islam transcribed his words onto paper, giving life to a cathartic proclamation that unfolded within a room shared with the communist patriarch, Mujaffar Ahmed. Conceived in the incandescent crucible of a twenty-two-year-old's spirit, 'Bidrohi', a literary masterpiece, has recently celebrated its triumphant centennial journey.

In the intricate tapestry of history, where the threads of time are woven by the hands of fate, there exists an extraordinary convergence of events that gave birth to a poetic opus so potent, it left an indelible mark on the very fabric of existence. This opus, none other than "Bidrohi," emerged as a sublime embodiment of human expression, a resounding bullet wound etched onto the canvas of time itself. This article embarks on a journey to unravel the profound impact of "Bidrohi," a masterpiece that transcended mere words to become a testament to the spirit of an era.

Expansion:

A Symphony of Epochs: The Context of Creation

The genesis of "Bidrohi" occurred within the fervent embrace of modernist ideals, a time when the world was seething with change and the future was painted with both hope and uncertainty. It was an epoch where the very foundations of societies were trembling under the weight of global upheavals. The embers of the First World War still glowed, casting a long shadow of devastation and disillusionment. The fall of the Caliphate in Turkey had sent ripples of political and religious transformation across the Muslim world. In the vast expanse of Russia, the dawn of the USSR was breaking, heralding the rise of a new ideology that would shape the course of history. Closer to home, the nascent Indian

Communist Party was taking its first steps, promising radical change in the subcontinent.

Transcending Sleep: The Birth of Expression

In the midst of this tumultuous era, a poet named Kazi Nazrul Islam found himself in a state of somnambulistic trance. In this altered state of consciousness, words flowed like a river, pouring out from the depths of his being onto the stark canvas of paper. With a pen as his conduit, he gave life to verses that resonated with the collective heartbeat of a generation. The result was "Bidrohi" – a declaration of defiance, a poetic outcry that captured the essence of an era brimming with unrest and transformation. Through his verses, Nazrul Islam channelled not only his own emotions but also the aspirations, frustrations, and dreams of countless souls who yearned for change.

A Confluence of Minds: The Shared Room

Within the confines of a shared room, destiny conspired to unite two distinct yet interconnected pillars of dissent – Kazi Nazrul Islam and Mujaffar Ahmed. The former, a poet whose verses would ignite the flames of rebellion, and the latter, a communist patriarch who would champion the cause of the proletariat. Their coexistence in that room became a crucible of revolutionary thought, a space where the fumes of fervor intertwined and gave rise to ideas that would shape the course of history. It was here that the potent potion of "Bidrohi" was concocted, drawing inspiration from the very air they breathed, the fervor that enveloped them, and the shared dreams that bound their souls.

A Lasting Impression: "Bidrohi" as a Monument of Resilience

"Bidrohi" stands not merely as a poem, but as an enduring monument of resilience and audacity. It embodies the spirit of an era that refused to succumb to the shackles of complacency, an era that dared to dream of a world reborn from the ashes of turmoil. Its verses are not confined to the past; they reverberate through the corridors of time, reminding us that the echoes of defiance are immortal. With each stanza, "Bidrohi" encapsulates the fiery determination of human beings to confront adversity head-on, to challenge the status quo, and to stand unwavering in the face of oppression.

A Harmonic Confluence of Conflict and Technological Advancement

Within the labyrinthine tapestry of "Bidrohi," the threads of recurrent allusions to warfare and its inexorable connection to technological

progress are intricately woven. The poem emerges as an eloquent symphony that not only laments the ravages of war but also embraces its evolution as a reflection of humanity's relentless pursuit of dominance. As if peering through the corridors of time, Kazi Nazrul Islam's verses transcend his era, resonating with the stark realities of today's battlefields, where the clashing forces are not just men and machinery, but the convergence of artificial intelligence-infused drones, robotic soldiers, and unmanned modern marvels.

A Metamorphosis of Conflict: From Torpedoes to Technological Titans

The evolution of warfare, like an alchemical transformation, has transitioned from the crude weaponry of torpedoes and mines to a realm where the orchestration of conflict is conducted by an array of technological titans. The poetic verses in "Bidrohi" echo with a prescient awareness of this transformation. The battlefields of today are no longer defined solely by the might of steel and fire, but by the hum of algorithms and the dance of electrons. Drones, the aerial sentinels of modern warfare, soar with a quiet menace, their synthetic eyes surveying the terrain with an unblinking vigilance. Robots, devoid of human frailty, march unflinchingly into danger, executing orders with a calculated precision. Unmanned devices traverse land, sea, and air, embodying a fusion of human ingenuity and mechanized efficiency.

Harari's Echo: The Triumph of Technological Ascendancy

In the verses of "Bidrohi," the resonances of Yuval Noah Harari's concept of the paradigm shift from Homo sapiens to Homo deus reverberate with a profound clarity. This shift symbolizes a metamorphosis in which the mantle of divine authority is usurped by the ascendancy of technological prowess. The poem, penned in a different epoch, becomes a poignant conduit for expressing the triumph of human invention and innovation over the constraints of mortality and the vagaries of nature. Just as Harari illuminated the trajectory of human evolution, "Bidrohi" envisions a world where the dominion over destiny is wrested from celestial beings and etched into the algorithms and codes of our own creation.

The Unceasing Overture of Progress

In the grand opus that is "Bidrohi," the resonance of war and technological progress reverberates as an unceasing overture of human ambition. The poem's verses, like a timeless aria, remind us that the

dynamics of conflict and the march of innovation are intertwined, inseparable partners in the symphony of human history. As the world continues to metamorphose, the tapestry woven by Kazi Nazrul Islam retains its vivid hues, a testament to the enduring echo of the eternal duel between human aspiration and the ceaseless march of progress.

Human Frailty Amid the Pandemic Storm: A Call to Posthumanist Exploration

Amidst the relentless onslaught of the COVID-19 pandemic, the fragility of human existence stands illuminated with an almost brutal clarity. As societies grapple with the turmoil wrought by this global crisis, a pressing imperative emerges – one that compels us to shift our gaze beyond the confines of human-centric perspectives. This crucible of affliction acts as a catalyst, urging us to ponder upon the myriad non-human actors and entities that have remained relatively unscathed amidst the pandemic's indiscriminate havoc. The once-asserted dominion of Homo sapiens is called into question, and the linguistic stronghold of the pronoun "I" within the verses reveals itself as a reflection of the deeply ingrained paradigm of human supremacy. It is within this juncture that the lens of posthumanism becomes not just relevant but necessary for recalibration.

Redefining Supremacy through a Posthumanist Prism

In "Bidrohi," the preponderance of the pronoun "I" weaves a tapestry of human-centrism, an emblem of our species' innate tendency to position itself as the focal point of significance. However, the global crisis has rendered this perspective increasingly myopic. The verses of the poem, once read solely as an expression of individualism, take on new meanings when viewed through the prism of posthumanism. This paradigm shift invites us to question the hierarchical divide between the human and the non-human, to acknowledge the agency and impact of entities that exist beyond the boundaries of our species. By delving into this poem, we embark on a journey of dismantling the conventional scaffolding of human supremacy, embracing instead the interconnectedness of all life forms and acknowledging the silent yet powerful presence of non-human actors.

"Bidrohi" as a Proto-Posthumanist Testament

In its very essence, "Bidrohi" resonates with the spirit of defiance, a rallying cry against oppression and injustice. However, as we traverse its verses with a posthumanist lens, its significance deepens. The poem, like

a beacon from the past, becomes a proto-posthumanist testament, inviting us to disassemble the apparent monolith of modernist individualism and excavate the subtle threads of posthumanist thought woven within. It urges us to challenge the binaries that separate humanity from the rest of the world, to transcend the ego-driven confines of the pronoun "I," and to recognize the intricate interplay of human and non-human forces that shape our shared existence.

Unearthing the Layers of Meaning

In a world shaken by pandemic, where human vulnerability stands naked, "Bidrohi" emerges as a multidimensional masterpiece. Its verses, once confined to the realm of personal expression, acquire new dimensions when scrutinized through the lens of posthumanism. As we peer through this lens, we unearth layers of meaning that resonate with our evolving understanding of our place in the world. The poem serves as an invitation – an invitation to embrace humility in the face of nature's might, to relinquish the reigns of human exceptionalism, and to navigate the complex web of existence as partners rather than dominators. In the symbiotic dance of life, "Bidrohi" beckons us to shed the armor of anthropocentrism and embrace a future where the boundaries between the human and the non-human blur into a harmonious continuum.

The Emergence of a Paradigm Shift: Illuminating the Dawn of Posthumanism

Emerging from the intellectual soil of the 1990s, posthumanism stands as a paradigm shift that challenges the boundaries of traditional humanism. Like a bolt of lightning illuminating the night sky, this new current of thought beckons humanity to explore uncharted waters, to transcend the limitations of the known and venture into the realm of the evolving. The canvas of this paper transforms into a vessel for exploration, embarking on a voyage to peel back the layers of convention and uncover the hidden strands of posthumanist DNA. In doing so, it unveils a profound connection between the venerable verses of "Bidrohi" and the burgeoning discourse of posthumanism, revealing a tapestry woven with threads of anticipation, daring to imagine the contours of an altered future.

Unmasking the Veiled Essence: Humanism's Camouflaged Heir

As the verses of "Bidrohi" resonate across the corridors of time, they carry a secret treasure – an essence that hints at the birth of posthumanism long before its terminology gained currency. Beneath the

well-trodden path of humanism that the poem appears to traverse lays a latent narrative that yearns for something beyond. It beckons us to read between the lines, to recognize the stirrings of an ethos that transcends anthropocentrism and embraces a wider kinship of existence. The poem's fervent declaration of defiance gains an additional layer of meaning when seen as a harbinger of posthumanist thought, a clarion call to break free from the shackles of human exceptionalism and embrace the unity of all beings.

"Bidrohi" as a Glimpse into a Transformed Landscape

"Bidrohi," penned in an era preceding the digital revolution and the whirlwind of global capitalism, remarkably foreshadows the very essence that would later define the landscape of posthumanism. The poem's unyielding spirit of rebellion, its refusal to bow to conventional norms, prefigures the ethos of a posthuman world where boundaries between organic and artificial, human and machine, begin to blur. This paper contends that "Bidrohi" stands not just as a relic of its time, but as a prophetic artifact that resonates with the shifting tides of posthumanist discourse. In a world propelled by the currents of technology, capital, and information, the seeds of posthumanism sown within the verses of "Bidrohi" germinate into a lush garden of transformed perspectives.

Echoes of the Future in the Past

In the intimate interplay between the past and the future, "Bidrohi" becomes a bridge that spans epochs, carrying within its verses the whispers of a world yet to fully emerge. The poem, once confined to the literary realm, emerges as a touchstone for a new era of thought. It beckons us to recognize that the seeds of transformation were sown long before their sprouting, and that the dawn of posthumanism was heralded not by theorists or technocrats, but by a poet's ink and a visionary's quill. In the subtle echoes of "Bidrohi," we find the resonance of a future that continues to unfold before our eyes, inviting us to embrace the evolving tapestry of human existence in all its intricate, posthumanist glory.

In Lieu of Conclusion:

A Timeless Legacy of Resilience and Transformation: The Unfading Mark of "Bidrohi"

In its resplendent defiance of temporal boundaries, "Bidrohi" achieves a transcendence that reverberates through the corridors of history, etching itself onto the collective consciousness as an immutable testament to the

endurance of the human spirit and the ceaseless march of evolution. Its verses, like eloquent echoes from the past, continue to resonate across epochs, a testament to the perennial relevance of its message. The poem emerges as an intricate thread woven into the fabric of time, guiding us through the intricate labyrinth of war's turmoil, the symphony of technological evolution, and the stark vulnerability exposed by the pandemic's onslaught.

A Symphony beyond Its Time: The Unveiling of Posthumanist Horizons

Amidst the backdrop of these seismic forces, "Bidrohi" emerges not merely as an artistic creation of its era, but as a harbinger of transformation that extends its grasp into the very core of our present and beyond. Its verses beckon us to unshackle ourselves from the confines of conventional humanist paradigms, inviting us to cast our gaze towards the vast horizons of posthumanist contemplation. It stands as a beacon, guiding us towards an understanding that transcends the temporal limitations of its birth, urging us to envision a world where the boundaries of human, machine, and nature interweave in a dance of unprecedented harmony.

A Challenge and an Invitation

As we step away from the tapestry woven by "Bidrohi," its impact lingers, its significance resounding in the chambers of our minds. It invites us to challenge the limitations we impose upon ourselves, to question the status quo, and to journey into the uncharted territories of thought. "Bidrohi" is not a mere relic of the past, but a living testament that urges us to be architects of our evolution. In the face of war's tumult, technological revolutions, and the vulnerability of pandemics, it stands as an unwavering beacon, guiding us towards an era where the boundaries that divide us are transcended, and the dawn of posthumanist horizons beckons with an audacious promise of transformation and unity.

References:

Harari, Yuval Noah. "Homo Deus: A Brief History of Tomorrow." Harper, 2015.

Nazrul Islam, Kazi. "Bidrohi" (The Rebel). [Poem]

Bandyopadhyay, Anik. "Kazi Nazrul Islam: A comprehensive study." Routledge, 2020.

Wolfe, Cary. "What is Posthumanism?" University of Minnesota Press, 2010.
Krishnan, Madhuja. "Homo Deus and the Pandemic: Posthumanist Reflections on Biotechnology and the 'New Normal'." South Asian History and Culture, 2021.

Six years of Challenging Patriarchy & Amplifying Voices : The Interplay between #MeToo Movement, LoSHA and Gender Activism in Jawaharlal Nehru University Campus

Shreyasi Biswas
Research Scholar, Centre for Political Studies,
School of Social Sciences,
Jawaharlal Nehru University

Abstract:The global #MeToo movement had a significant impact on Indian academia, including student activism in campuses, particularly in JNU. Eminent academicians and student activists were named in viral online lists (LoSHA), sparking debates and raising questions about inter-organizational mechanisms and women's participation in campus activism. The movement observed widespread use of social media for political response and the formation of cross-border support networks. Responses varied, ranging from advocating for better institutional arrangements to address sexual harassment to forming informal networks of women to confront harassers in their immediate environment. New women's groups emerged, and intra-campus women's meetings were held. Despite a shared goal of promoting gender rights and political participation, the movement revealed significant differences between partisan student organizations (AISA, SFI, AISF, DSF, BASO) and non-partisan groups (BAPSA, Dalit Women's Collective, PinjraTod, Women of JNU) in terms of their approaches to political mobilization and women's participation in campus activism. Despite a shared cause, these groups have faced challenges in working together and have accused each other of flawed feminism. While the mentioned organizations lean towards Ambedkarite, liberal, and socialist ideologies, right-wing student organizations in Delhi have shown little response. JNU was chosen as a case study due to two reasons: 1. The involvement of prominent academics and student activists in the MeToo and LoSHA lists. 2. The ongoing struggle between retaining Gender Sensitization Committee Against Sexual Harassment (GSCASH) and Internal Complaints Committee (ICC) in JNU, which is crucial in assessing the impact of the

MeToo movement. The period from 2017 to 2023 presents diverse opinions and sustained efforts towards achieving gender justice.

This paper examines the impact of the #MeToo movement and LoSHA on women's groups and student organizations, fostering communication and participation in campus activism despite ideological differences. It analyzes scholarly commentary, organization publications, interviews with student activists, and audio/visual materials to trace the trajectory of gender justice in JNU.

Keywords: Gender Justice, #MeToo Movement, Student Activism, Sexual Harassment**.**

Introduction

In 2017, the phrase "Me Too" underwent a significant transformation, evolving into the hashtag #MeToo on social media platforms like Twitter, Facebook, Instagram, and Myspace. Originally used by Tarana Burke, a survivor of sexual harassment, "Me Too" aimed to foster empathy, understanding, and unity among women who had experienced sexual harassment. It empowered survivors by providing a means to share their emotional trauma. However, with the Harvey Weinstein case, the hashtag gained more power and attention, inspiring collective indifference towards sexual harassment and demanding accountability.[1]The phrase reached a global audience, sparking debates and discussions across various media platforms. People from all walks of life shared their stories, making it one of the largest global networks of solidarity despite internal contradictions. This movement raised crucial questions about gender, harassment, consent, and related topics.

The #MeToo movement had a significant impact on academia worldwide, including in India. Raya Sarkar, then an LL.M. Candidate at the University of California, Davis School of Law, compiled and published the "List of Sexual Harassers in Academia" (LoSHA), which accused several Indian academicians of harassment. The list was initially created as a crowd-sourced document and later became a public Google document, allowing people to add names and incidents, albeit with limited details.[2] In India, the prevalence of a patriarchal society and male dominance has made women particularly vulnerable to sexual harassment. Social stigma, fear of retaliation, and a lack of accessible institutional avenues for redressal worsen the problem and empower

perpetrators. It is important to note that laws addressing sexual harassment in India were only enacted in 2013. Implementation of guidelines for addressing workplace harassment in academia, established by the Supreme Court of India in the Vishaka judgment of 1997, has been minimal, with many educational institutions still lacking proper measures to address these issues.

The list highlighted the urgent need to address sexual harassment in academia, where existing systems often fail to provide support and accountability. It also raised questions about due process and institutional redressal versus extra-judicial methods for gender justice. The controversy had a significant impact on campuses, particularly in JNU, where individuals named in the list were students or faculty members. The publication of the list sparked intense debates and allegations of defamation, polarizing opinions and leading to attacks on critics. While the list brought visibility to the issue of sexual harassment, it also faced criticism for potentially diverting attention from institutional responsibility and the need for proper investigation and legal justice.[3]Despite legal concerns, the list provided hope to survivors and played a role in overcoming the barrier of disbelief. Alongside the dismantling of GSCASH and the establishment of ICC, the impact of LoSHA and the #MeToo movement on gender activism in JNU remains significant.

JNU and GSCASH: A short preview

JNU students are renowned for their advocacy in addressing gender issues and combating sexual violence. The campus fosters a sensitive and supportive environment, providing women with freedom and rights often violated elsewhere. This empowering atmosphere is attributed to the Gender Sensitization Committee Against Sexual Harassment (GSCASH), established in 1999. The committee includes representation from all university levels and has played a significant role in creating and maintaining this empowering environment through workshops, lectures, and discussions. In 2017, a significant shift occurred at JNU when the Garkoti Committee's Report recommended replacing the Gender Sensitization Committee Against Sexual Harassment (GSCASH). Dissenting comments by K.B. Usha, a former Chairperson of GSCASH, were suppressed in the report. Despite opposition, the Executive Council approved the supersession of GSCASH and formed the Internal

Complaints Committee (ICC) on the same day.[4] The ICC's composition raised concerns, as individuals from the university administration were involved, creating a conflict of interest. Unlike GSCASH, the ICC became a nominative body with limited student representation. It also introduced provisions for punishment in cases of false complaints and action against the complainant if the accused was cleared. This arrangement faced criticism for its ineffective functioning and allegations of administrative interference. Legal battles on this issue continue.[5]Despite opposition, GSCASH elections were held in 2017, and the committee has been functioning, albeit with limited activity, since then.

LoSHA in JNU and perpetual Debates

LoSHA and the #MeToo movement go beyond traditional awareness-raising methods. LoSHA highlights the prevalence of gendered violence that existing justice processes struggle to address. Sarkar, the person behind the list, claimed to have evidence for each incident and included entries from credible sources and first-hand accounts. This aligns with the principle in feminism of initially believing the victim. While Sarkar kept certain third-party information confidential, she shared some incidents on her Facebook profile to establish credibility without compromising anonymity. Other information was kept private to protect victims from further harassment and pressure to retract their statements.[6]

The digital nature of the list facilitated its rapid dissemination, thanks to its easily shareable features, prompting activists and individuals alike to express their opinions and engage in the ensuing debate. Strong criticism, particularly from long-standing feminists who had fought for improved mechanisms to address sexual harassment and promote gender sensitivity over the course of several decades, emerged. The primary argument against the list is that it undermines the achievements of institutional mechanisms and their ongoing improvement. A statement published on Kafila and signed by 12 prominent feminists (many of them associated with JNU) sparked debates, with the signatories facing intense backlash on social media. The statement emphasized the unaccountable and vague information provided by the list, where incidents were often lacking in detail, potentially leading to errors, and exposing innocent individuals to victimization or public trials without proper procedures, but based solely on emotional responses.[7] Critics also raised concerns

about the errors, anonymity of contributors, the lack of contextual information, and the overall format of the list. Moreover, they raised a crucial question: 'where does this direction lead the political struggle for justice?'

Benjamin Zachariah, who was named on the list, shares concerns about anonymity and argues that it can be exploited for personal disputes. He believes the list creates fear and undermines institutional procedures, distinguishing it from the empowering and collective nature of #MeToo. Zachariah emphasizes that LoSHA's individual-focused approach lacks necessary context and fails to foster collective action. This approach leads to heightened self-surveillance and psychological paranoia. Zachariah mentions prominent academicians who, even if not listed, avoid personal interactions due to the list's impact.[8]

In contrast, opponents of LoSHA were labelled as condescending "auntie feminists" by supporters of the name and shame campaign, who viewed them as outdated and excessively reverent towards state mechanisms. Supporters of the campaign argued that due process was not a viable option, as these existing structures had been largely inaccessible and ineffective. Advocates for the list contended that, to reclaim control over the narrative, it was essential to prioritize believing the victim, without placing excessive emphasis on tangible proof. They also emphasized the right of victims to establish their own scale for measuring the trauma they had endured, thereby highlighting the existence of broader cultures of violence rather than isolated incidents.[9]The conviction of Lawrence Liang, a professor named on the list, further validated their arguments.[10]

Zachariah counters the perspective by asserting that "believing the victim" means acknowledging their experience of trauma and conducting a thorough inquiry, rather than conducting a social media trial.[11]LoSHA supporters see the list as a recognition that justice cannot be solely achieved through due process, as sexual misconduct involves complex nuances beyond a simple consent or non-consent framework. LoSHA aims to foster transformative discussions outside of legal channels, addressing power dynamics and their influence on sexual misconduct.

Response of Student Organisations

In JNU, differing opinions emerged among activists and individuals regarding the discussed issues. Student organizations like AISA, SFI, and DSF stated their commitment to taking complaints seriously, irrespective of the accused's position within the organization. However, they emphasized that social media should not replace proper institutional investigations for determining punishments. Criticism arose, suggesting these organizations lacked sensitivity and needed better understanding of gender relations. In response, they urged reporting of misconduct involving their members, ensuring internal trials. Some organizations, like SFI, initiated gender classes and established committees to address such instances at a national level. However, they faced criticism, with activists favouring due process. This led to demands for GSCASH in universities lacking redressal cells and intra-organizational GSCASH within student organizations like AISA and SFI.[12] Harassment complaints within organizations too had raised concerns about "slut shaming" and victim blaming, highlighting the need for effective organizational redressal.

BAPSA and the Dalit Women's Collective criticized privileged-caste activists from partisan organizations for overlooking the intersectionality of caste and gender.[13]LoSHA gained significance by accusing high-profile academics with institutional support, making legal action feasible. The ICC and GSCASH were seen as more viable options than filing an FIR, but they were considered exclusive to privileged groups, neglecting marginalized communities. The dominance of Savarnas in gender sensitivity committees tilted due process in favor of higher social echelons, raising doubts about the authenticity of activism.[14] Another list targeting activists from Dalit organizations received little discussion, with silence from Dalit organizations and insistence on due process from partisan groups.

It is noteworthy that alongside these debates, several other events related to #MeToo and LoSHA unfolded on the JNU campus. One significant development was the formation of small informal WhatsApp groups among women across the campus to share information about potential sexual predators both on and off campus and provide tips for personal safety. Many platforms, such as Women of JNU and Women Hostellers in JNU, released pamphlets addressing everyday sexism and

misogyny that contribute to sexual violence and called for a sense of sisterhood. A major aspect of these discussions revolved around identifying "enablers" and "predators." The idea being debated was to identify individuals who enable the accused person and hold them accountable.[15]The silence of academics was not merely viewed as complicity or awareness of sexual harassment in academia but also as enabling the perpetuation of a culture of harassment and abuse. This often blurred the line as various levels of behaviour were considered enabling or predatory. Identifying "enablers" and "predators" was discussed, holding accountable those who perpetuate a culture of harassment. Supporters of GSCASH expressed the need for its modifications, while a Facebook page called '#MeToo JNU Confessions' brought attention to various forms of violence. However, the page was shut down due to false confessions. In 2018, complaints were filed against Professor AtulJohri, leading to eight FIRs being lodged, but his arrest was delayed. The ICC absolved Johri of all charges, triggering protests and reinforcing the demand for a reinstated GSCASH. The complainants sought help from GSCASH instead of the ICC, citing bias in the latter's composition.[16]

The Johri movement highlights the preference for GSCASH over the ICC, indicating the importance of gender sensitivity and a safe space for survivors. Structural exclusion of elected student bodies and administrative interference in due process are evident. The case raises concerns about defining sexual harassment and the burden of proof in academia's power dynamics, where exploitation of women is common and redressal is challenging due to subjective interpretation.

Conclusion

The list-statement controversy divided feminists in JNU based on generational differences. Emotional friction arose, with older feminists feeling discredited and younger activists fearing loss of allies. The call for due process came from those who had worked on developing these mechanisms. The controversy highlighted the intersectionality of caste, patriarchy, and sexuality. In the Indian context, intersectionality is both a concept and a practice that recognizes multiple forms of marginalization. It allows us to differentiate between lived experiences and accumulated experiences, highlighting the vulnerability of populations at the intersections of these identities and how sexual violence can be systematically perpetuated against them to a greater degree. The ‘burden

of proof' on parts of the survivors have been long contested by scholars calling it the grey area where most of the time it is impossible to furnish acceptable proof of harassment in absence of a physical touch. The structural imbalance is forgone in most of these cases where young women are severely pressurised to submit to diktats of senior Professors, the refusal to which can result in significant problems in their academic life. One must remember that there is always the other grey area that fails to distinguish between genuine complaints and false ones (cases of complaints in the event of a consensual relationship gone into disarray) but it does not in any way dismiss the concern that a structural imbalance exists, and the laws are mostly bent towards the more powerful persona in such set ups.

While the merits and drawbacks of LoSHA continue to be debated, one cannot overlook the significant contributions of the #MeToo movement and LoSHA in opening discussions on institutional and alternative approaches to addressing the issue of sexual harassment. It has also led to the exploration of new discourses on what constitutes harassment. There have been arguments in favour of establishing charges of mental harassment to address inappropriate manipulative behaviour in power dynamics where consent becomes more complex than a simple yes/no and is often circumstantially influenced. It also emphasizes the need for immediate gender sensitization workshops within academic circles where everyday sexism finds a prominent place. In JNU, post #MeToo, we have witnessed sincere efforts to sustain a women's network on campus through social media platforms and informal communication networks that effectively disseminate information. The value of these groups lies not only in their capacity for effective protest but also in providing a safe space for conversations and fostering a sense of collective identity through the notion of 'sisterhood,' offering support and encouragement to survivors.

Currently, there is no definitive solution available to address these issues. Both institutional and online solidarity networks have become exhausted due to the categorization and division of multiple identities. In the absence of GSCASH, gender debates have seemingly come to a halt at the institutional level. The formation of alliances for gender activism is also being closely examined. However, there is an important observation to be made. Organizations, particularly women

activists within them, are demanding better organizational mechanisms to address harassment within their own ranks. It is commendable to see organizations holding regular discussions on this matter. Alongside the youth of the country, women in JNU have regained their enthusiasm in fighting for a more just society and have taken a leading role in this battle. The quest to explore constitutional means and mechanisms, as well as the development of new discourses, is ongoing. What has transpired is a heightened awareness of the intricacies of sexual violence and healthier debates on addressing the concerns of all groups for a better future and a renewed sense of collective purpose. The road forward is lengthy and requires all activists to be aware of the nuances and a determined effort to reshape the structural imbalance that exists in the society.

REFERENCES

1. Amnesty Internationl Report, *Tarana Burke: The Woman Behind Me Too,* Dated August 21, 2018. Retrieved From: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/08/tarana-burke-me-too/
2. Sarkar,R.(2018), post on Facebook. Retrieved from : https://www.facebook.com/RxyaSxrkar/posts/1765067340207277
3. Gajjala, R. (2018) *When an Indian Whisper Network Went Digital,* Retrieved from: https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/57272321/tcy025_CCC2018.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DCommunication_Culture_and_Critique_When.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20200123%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20200123T090900Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=0f03df0938b10f170b456c98d0bdd6a65af62b74dbe4fe2ee0c91cd49e561ef5
4. Chadha, G. (2017), Towards complex feminist solidarities after the List Statement, *Economic and Political Weekly*, 16 December. Retrieved from: https://www.epw.in/engage/article/towards-complex-feminist-solidaritieslist-statement

5. Ibid.
6. Rana, S (2020) Visualizing the Semiotics of Protest: The 'Nirbhaya' Rape Case In*Indian Journal of Gender Studies* (Vol. 27, I), Sage Publications. Retrieved From: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0971521519891482
7. Menon, N. (2017), Statement by feminists on Facebook campaign to "name and shame", *Kafila*, 24 October. Available at: https://kafila.online/2017/10/24/statement-byfeminists-on-facebook-campaign-to-name-and-shame
   Chachra, M. (2017), Naming sexual harassers without due process is mob justice, *Asia Times*,27 October.
8. Interview with Benjamin Zachariah, University of Trier, 8/10/19, Kolkata, India. Recording in possession of author.
9. Menon, N. (2017), From Feminazi to Savarna Rape Apologist in 24 Hours, *Kafila,* October 28. Retrieved From: https://kafila.online/2017/10/28/from-feminazi-to-savarnarape-apologist-in-24-hours/.
10. Ladies Finger Staff (2018), What's the punishment for sexual harassment? Ambedkaruniversity ruling its law school dean guilty opens up a big debate, *The Ladies Finger*, 14 March.
11. Interview with Benjamin Zachariah, University of Trier, 8/10/19, Kolkata, India. Recording in possession of author.
12. *We stand with the survivors*, SFI Appeal and parcha dated 27th November, 2017.
   DSF parcha dated 27/10/17, Jawaharlal Nehru University.
   AISA parcha dated 28/10/17, Jawaharlal Nehru University.
13. BAPSA parcha dated 28/10/17, Jawaharlal Nehru University.
14. Kappal, B. (2017), Breaking the "savarna feminism" rules – how Raya Sarkar's list of alleged harassers divided opinion in India, *New Statesman*, 30 November, Delhi.
15. NDTV Round Table on LoSHA (2017) Name and shame online initiative. Trial by social media? *NDTV*, Aired26 October
   Das, P. (2017) , What do we do about the sexual harasser's list?, Arré, 27 October.
16. Kidwai, A. JNU's Eight and their fight for justice. In *Indian Express,* March 20,2018. Retrieved from:

https://indianexpress.com/article/opinion/jnu-sexual-harassment-allegations-prof-atul-johrivc-students-union-education-5104596/

BIBLIOGRAPHY

Adetiba, E. and T. Burke (2018), Tarana Burke says #Metoo should centre marginalized communities, In Verso Books (ed.) *Where freedom starts. Sex, power, violence, #Metoo.A Verso report.* London: Verso.

*Economic and Political Weekly,*Vol. 52 (60): Power and Relationships in Academia.

a-response-to-the-kafila-signatories&catid=119:feature&Itemid=132

Retrieved from: http://www.epw.in/engage/article/misreading-dalit-critique-university-space

Retrieved from: http://www.newindianexpress.com/nation/2017/oct/27/important-to-name-perpetratorssays-

Bargi, D. (2017), On Misreading the Dalit Critique of University Spaces. *Economic*

Bates, L. (2014), Everyday sexism. New York: Thomas Dunne.

Bhandaram, V. (2017), Raya Sarkar's list of academic "predators" is the disruptor we need in sexual harassment discourse, *Firstpost*, 27 October. Retrieved from: http://www.firstpost.com/india/raya-sarkars-list-of-academic-predators-is-thedisruptor-we-needed-in-sexual-harassment-discourse-4179573.html

Boda, M. (2018), Why the disbanded GSCASH in JNU Needs to be reconstructed #MakeMyCampusSafe, *Feminism in India*, March 5. Retrieved from: https://feminisminindia.com/2018/03/05/disbanded-gscash-jnu-reconstitution/

Chadha, G., et al (2017), Power and Relationships in Academia.*Economic and Political Weekly,* Vol.52(60), Available at: http://www.epw.in/engage/special-features/power-relationships-academia

Chatterjee, P. and R. Sarkar (2017), ParthaChatterjee's statement on the "Name and Shame" Campaign, *The Wire*, 30 October.

crowd-sourced list of sexual harassers. 27 October.

Datta, S. (2018), *(Re)imagining Feminist Solidarities in Academic Spaces, Economic and Political Weekly*, Vol.53(1).

Davis, K. and D. Zarkov (2018), Ambiguities and dilemmas around #Metoo: #ForHowLong and #WhereTo*?*, European Journal of Women's *Studies*, Vol. 25(1), pp. 3-9.

Fair, C.C. (2017), #HimToo. A Reckoning, *Buzzfeed News*, 25 October.

Ghosh, A. (2017), The Civil War in Indian Feminism—A Critical Glance, *Sabrang*, 7

Gopinathan, S. (2017), The men on Raya Sarkar's list of sexual predators are all hiding under the table and hoping we forget about them, *The Ladies Finger*, 1 November. Retrieved from: http://theladiesfinger.com/raya-sarkar-list-of-sexual-harassmentaccused-academics

Indian Express (2017) Important to name perpetrators, says V Geetha on Raya Sarkar's

Kafila: 10 years of a common journey. Available at: https://kafila.online/about/

Khomami, N. (2017), *#MeToo. How a hashtag became a rallying cry against sexual* harassment, *The Guardian*, 20 October.

Kohm, S.A. (2009), Naming, shaming and criminal justice: Mass-mediated humiliation as entertainment and punishment, In *Crime, Media, Culture*, Vol.5(2), pp. 188-205.

Kurian, A. (2018), #MeToo is riding a new wave of feminism in India, *The Conversation*, 1 February. Available at: https://theconversation.com/metoo-is-riding-a-newwave-of-feminism-in-india-89842ephemera: theory & politics in organization 19(4): 721-743 742 | article

Menon, N.(2018), JNU faculty stands with the women of SLS, *Kafila*, Available at: https://kafila.online/2018/03/16/jnu-faculty-stand-with-the-women-students-of-sls/

November, Retrieved from: https://sabrangindia.in/article/civil-war-indian-feminism-%E2%80%93-criticalglance

October, *Round Table India*. Retrieved from: https://roundtableindia.co.in/index.php?option=com_content&view=article&id=9216:et-tufeminists-

Ray Murray, P. (2017), Writing new sastras notes towards building an Indian feminist archive. In S. Jha& A. Kurien (Eds.), *New feminisms*

in south Asian social media, film, and literature: Disrupting the discourse, (pp. 105–117). New York: Routledge.

Roy, S. (2017), Whose feminism is it anyway*?* Available at: https://thewire. in/gender/whose-feminism-anyway

Shukla, M. and Kundu, A. (2017), Et tu'Feminists'?: A Response to the Kafila signatories. 28

The Wire Staff (2018), All you need to know about three weeks of me too and its big impact.*The Wire*. Retrieved from: https://thewire.in/women/all-you-need-to-know-three-weeks-of-metoo-and-its-big-impacts

Verso Report (2018), Where Freedom Starts: Sex Power Violence #metoo. London: Verso.

Retrieved from : v-geetha-on-raya-sarkars-crowd-sourced-list-of-sexual-harasser-1684340.html

Visvanathan, S. (2018), The Chilly Justice of the Gulag. *Outlook: The Magazine*, 7 May 2018. Available at: https://www.outlookindia.com/magazine/story/the-chilly-justice-of-the-gulag/299993

Some Glimpse on the Conception of *Kathā* in the *Nyāya* Philosophy

Koushik Sarkar
Assistant Professor, Dept. of Philosophy,
Dr. A. P. J. Abdul Kalam Government College

Abstract:*Vāda, jalpa* and *vitaṇḍā* – these three are the types of *kathā* in the Nyāya philosophy. Actually, they are various types of debate. The *Vāda* type of debate is set for attaining truth where as other two are set for mainly winning the debate. Not only regarding their aim but also regarding the conditions they are different. Though philosophers have instructed us to avoid the later two, still they all are equally relevant to substantiate and protect the truth.
Keywords: *Nyāya, Vāda, Jalpa, Vitaṇḍā.*

In the *Nyāya* system of philosophy there is a word '*kathā*'. Generally, the word '*kathā*' refers to the meaning of 'meaning-full sound'. In some cases, it is also used to refer 'story'. But in the Nyāya philosophy it has a technical usage.

In the *Nyāya* philosophy,*kathā* refers to three types of argumentations, which arecompletely the topics of *ānvīkṣikī*. They are namely,*vāda, jalpa,* and *vitaṇḍā*. Though Sūtrakāra Maharṣi Gautama and commentator Vātsyāyana did not feel the need of giving any definition of *kathā* in general, but Vācaspati Miśrahas offered us the definition of *kathā* in general in his *Tātparyaṭīkā*. In his words, *kathā* is a set of or bundle of sentences which are spoken, maintaining or following all the rules and regulations of argumentation, by many (more than one) people, regarding an object which is under critical analysis. In Vṛttikāra-s words, *kathā* is '*tattvanirṇayavijayānyatarasvarūpayogyanyāyānugatabacana sandarbhaḥkathā*'. That means *kathā* is a set of propositions, maintained by rules and regulations of *nyāya*, which are eligible to establish the truth about an object (*tattvanirṇaya*) or conquer the debate. Hence, it is understandable that, keeping Vācaspati Miśra and Viśvanāth's view in mind, the *kathā* is a kind of debate where there are at least two people holding opposite view to each other regarding an object (*viṣaya*), and

putting forward their own arguments in a certain manner with an intention to win the debate or establish the truth about the object. Not any kind of debate is included in *kathā*, like the debate which we can find happening daily here and there between common people. Because, these kinds of debate are not well maintained or well-formed with the rules and regulations prescribed by the Naiyāyika-s. It is also a fact that these kinds of debates or argumentation are eligible for establishing the truth or conquering the debate. Hence, it is concludable that the people, being opponent and proponent, can join a *kathā (*debate*)* only if they possess the will for establishing the truth critically or will for win. Viśvanātha in his *Vṛtti* has mentioned this clearly. This kind of debate will must have a single object of debate, on which they will hold the opposite view to each other. This object of debate is called '*vicāryyaviṣaya'*.

Now as we have come to know, in this paper, that in the Nyāyaphilosophy, Maharṣi Gautama has prescribed three kinds of *kathā*, it is time to discuss about them to understand their nature by analyzing their characteristics.

In *Nyāyasūtra* 1/2/1, Maharṣi Gautama has offered the defining characteristics of *vāda*. *Vāda* is the first type of debate or *kathā*.

Pramāṇa-tarka-sādhanopālambhaḥ siddhāntāviruddha
pañcāvayavopapannaḥ pakṣapratipakṣaparigraho vādaḥ. 1/2/1

The first characteristic of *vāda* is '*pakṣapratipakṣaparigraho*'. Before analyzing this characteristic, we have to keep in mind that this is a character which is not only entitled with *vāda* alone. It is the characteristic of *jalpa* and *vitaṇḍā* (other two types of *kathā*) as well. So, we can clearly assume that this is a general characteristic of *kathā*.

Every debate should have a topic or an object of debate. The debate regarding that object will be initiated only if there is two opposite assumption or alternative views about that object. If a particular object is known clearly and all among the knowers are agreed with a single particular opinion about that object then there will be no need for having debate about that object. It is also a fact that something, whatever it may be, cannot be regarded as the object of debate if it is unknown to everyone. Only the scenario becomes effective for a debate if the object of that particular sense is dubious.[xxix] If someone holds a particular point of view about a particular object and someone confronts him with an

opposite point of view about that object then it will initiate debate between them.

As an example, in the commentary of *Nyāyasūtra* 1/2/1, Vātsyāyana has mentioned the case of existence of self. If someone holds the view, with conviction, that self is eternal and on the other hand someone holds, with conviction, that self is not eternal then hearing these, someone (other than the first two) may become doubtful about the eternity of self. The two parties who hold their view with conviction are not confused at all. But who has no conviction about the eternity and non-eternity of self, in the Nyāya Philosophy, is recognized as *madhystha*. To solve the doubt of this *madhyastha vyakti,* the above-mentioned parties being opponent to each other, would participate in debate.

Here, the two opposite view, which we have discussed earlier about self, is called *pakṣa* and *pratipakṣa*. One party is claiming that eternity is the property of self. On the other hand, being its opponent, another party is claiming that non-eternity is the property of self. Here, both are assuming themselves as proponent (*vādi*) and other selves as opponent (*prativādi*). This present scenario is elevated because of the nature of *pakṣa* and *pratipakṣa*.

Now it is time to discuss about the term '*parigraha*'. In *Vātsyāyana bhāṣya*,'*parigraha'* means '*abhyupagama-vyavasthā*'. It means upholding or accepting something in a certain system. In a debate, the two parties should accept their own view as *pakṣa* (thesis) and others view as *pratipakṣa* (counter-thesis). In this regard they have to accept themselves as proponent and other selves as opponent. They must uphold that their own view about the object of debate is right one and opponents view as wrong and vice-versa. They also have to admire that the defeat of one or winning will entail the winning or defeat of the other. This kind of systematic affirmation or agreement is called '*parigraha'*.

Hence, it is clear that the term '*pakṣa*' and '*pratipakṣa*' clearly indicates the technical opposition of the views in the debate. It explains the technical or structural building of the opponent and proponent of a debate. But the term '*parigraha*' indicates the mutual agreement between the opponent and proponent. If both of the parties of debate holds opposite view to each other and disagrees to be defeat at any cost then it will not be a justified debate. Without this kind of psychological

affirmation about a systematic participation, the debate will turn into an awful quarreling.

Pramāṇa-tarka-sādhanopālambha:

The term '*pakṣapratipakṣaparigraha*' is not a characteristic of *vāda* type of debate alone. It is also a characteristic of other two types of debate (*jalpa* and *vitaṇḍā*). This is a general character to all three types of *kathā*. Hence, if we use the term '*pakṣapratipakṣaparigraha*' alone to define *vāda* type of debate then the definition will come under the charge of the fallacy of too wideness. To avoid this fallacy Maharṣi Gautama has introduced '*pramāṇa-tarka-sādhanopālambhaḥ'*.

In the Nyāya philosophy, the word '*pramāṇa'* simply refers the valid source of knowledge. '*Tarka*' refers an inductive reasoning which helps out the instruments of valid knowledge to grasp a fully determined knowledge about an object. Sometimes, due to doubt about an object the instruments of valid knowledge become ineffective to achieve the knowledge about the dubious object. By eliminating the doubt or the possibility of doubt (cause of doubt) *tarka* helps them in their approach. The term '*s̄adhana'* refers the substantiation of own view or establishment of own view as true. '*Upālambha'* means the elimination of others view or the establishment of opponents view as false. The process of '*sādhana'* and '*upālambha'* should be done with the instruments of valid knowledge and inductive reasoning in case of this kind of debate.

The Inclusion of these words as defining characteristics of *vāda* not only performs as the defining characteristic of it, but also performs as the distinguishing characteristic of it from its class. We already know that '*pakṣapratipakṣaparigraho*' is a general characteristic of *vāda, jalpa and vitaṇḍā*. But the establishment of own view preceded by the elimination of opponents view with the help of instruments of valid knowledge and inductive reasoning is the special character to only *vāda*. By analyzing the *Nyāyasūtra* 1/2/2 and 1/2/3, we can clearly understand that in *jalpa* and *vitaṇḍā* type of debate, one can use perversion (*chala*), casuistry (*jāti*) and all types of points of defeat (*nighrasthāna*) to ensure the winning of own self and defeat of opponent. The use of the term '*Pramāṇa-tarka-sādhanopālambhaḥ'* in the defining characteristic of *vāda* indicates that in this kind of debate, the opponent and proponent both are instructed to use only instruments of valid knowledge and

inductive reasoning to eliminate others view and substantiate their own view as true. No one in this debate is allowed to use perversion, casuistry and all types of points of debate to make sure winning.

Now a question may arise in this regard. Maharṣi Gautama has prescribed that in *vāda* type of debate both the parties (opponent and proponent) have to use the instruments of valid cognition and inductive reasoning to eliminate opponent's view and establish their own view to find out the truth. The question is that is it possible for both opposing parties of debate to use equally the instruments of valid cognition and reasoning to eliminate opponent and substantiate their own view. The opponent and proponent hold opposite view to each other about an object of debate. Only one of them will be correct and other one will be incorrect. Two opposite views cannot be correct together at a same time. Hence, the instruments of valid cognition and reasoning cannot be effective for both of the parties in eliminating opponent's view. Then why Maharṣi Gautama has prescribed to use the instruments of valid cognition and reasoning to both parties. In the answer of this question, we have to understand that only one of the participants will be capable of using instruments of valid cognition and reasoning to eliminate opposite view and substantiate his view. On the other hand, the other participant will pretend to use them to do the same, though actually they are pseudo instruments of valid cognition (*pramāṇābhāsa*) and pseudo reasoning (*tarkābhāsa*). Until and unless the debate has come to an end, both the parties will think that they are using instruments of valid cognition and reasoning to do the elimination and substantiation. But at the end of debate the tools for an elimination and substantiation of one of the participants who holds the correct alternative, will be recognized as genuine instruments of valid cognition and reasoning. And the tools used by the other participant who holds the incorrect alternative, will be recognized as pseudo instruments of valid cognition and pseudo reasoning. So, before the substantiation of the truth, both the parties should apply the aforesaid tools pretending as genuine tools. This was the intended meaning of using the term *pramāṇa* and *tarka* to both of the parties of debate.

Siddhāntāviruddha: In the commentary of *Nyāyasūtra* 1/2/1, Vātsyāyana has explained why Maharṣi Gautama has included the term '*siddhāntāviruddha'* in the defining characteristics of *vāda*. In general, it

means that the *vāda* type of debate cannot go against the doctrines which are pre-validated. Vātsyāyana has specified its reference in his commentary. According to him, Maharṣi Gautama has included this term to mean that no pseudo probans should be used in *vāda* type of debate. Only a genuine probans can lead someone to establish truth. Thus, the use of genuine probans in *vāda* can lead it to its aim. The use of pseudo probans will always go against the pre-validate doctrine.

Pañcāvayavopapanna: Maharṣi Gautama has prescribed that a *vāda* type of debate should be done through the fivecomponents inference that is *pañcāvayava nyāya*. In the Nyāya philosophy there are two types of inference. One is for oneself which is called *svārthānumāna*. Other one is for the knowledge of other selves which is called *parārthānumāna*. This *parārthānumāna* is built with five components (sentence) i.e.,*avayava*. Here Vātsyāyana, in his commentary, has explained that the term '*pañcāvayavopapanna*' refers that in *vāda* type of debate *'nyūna'* and '*adhika*' – these two clinchers are applicable. In five component inference the components are i) *pratijñā* (preliminary statement of thesis) ii) *hetu* (the statement of probans) iii) *udāharaṇa* (the statement of the example) iv) *upanaya* (the statement of the re-affirmation) v) *nigamana* (the final conclusion). If someone, in debate, does not use the *hetu* statement or the *udāharaṇa* statement then the inference will be charged under the clincher of *nyūna* and if someone uses more than one *hetu* statement or *udāharaṇa* statement in his inference then it will be charged under the clincher *adhika*. By pointing out these clinchers one can claim defeat of the user. These two may cause obstacles two the substantiation of truth (*tattvanirṇaya*).

By analyzing all these terms, we can clearly understand that the aim of this kind of debate is nothing but substantiation of truth. The use of instruments of valid knowledge and reasoning in elimination of others view and substantiation of own view ultimately will end in the elimination of incorrect view and substantiation of the correct one. The prohibition of *chala, jāti* and *nighrasthāna* will cause the substantiation of truth. The prohibition of pseudo probans, *nyūna* and *adhika* clinchers will also ensure the substantiation. Thus, it is understandable that anything which will cause harm to the substantiation of truth, should be excluded from *vāda* type of debate. If someone holds will for win instead of substantiation of truth then he should not inter into *vāda* type of

debate. Only the people who want to find out the truth about an object, like to homogeneous disciples or teacher and student, should avail *vāda* type of debate.

Jalpa is the second type of *kathā*. As the defining characteristics of *jalpa* in *Nyāyasūtra* 1/2/2, Maharṣi Gautama says –

"*yathoktopapannaśchala-jāti-nigrahasthāna-sādhanopalambho jalpaḥ*". 1/2/2

The *sūtra* has started with the term '*yathoktopapanna*'. The commentator explains the meaning of the term as it indicates us to understand that all the defining characteristics of *vāda*, like '*pramāṇa-tarka-sādhanopālambhaḥ'*, '*siddhāntāviruddha'*, '*pañcāvayavopapannaḥ'*, '*pakṣapratipakṣaparigraho*', are the defining characteristics of *jalpa* too. To this extension both are sharing aforesaid characteristics. But *jalpa* is not a *vāda* type of debate. To distinguish *jalpa* from *vāda*, Maharṣi Gautama has introduced the phrase - '*chala-jāti-nigrahasthāna-sādhanopalambho'* in the *sūtra*. It means in *jalpa kathā*, *chala* (perversion), *jāti* (casuistry) and all type of *nighrahasthāna* are allowed to apply. But in *vāda* type of debate *chala* and *jāti* are extremely prohibited. A few numbers of clinchers are legitimate for *vāda*, but not all of them.

Now a question may take place here. As *chala, jāti* and *nighrasthāna* are tricky in nature, how they can be the tools for substantiation of truth? Only justified *pramāṇa* and *tarka* and likewise *saduttara* can substantiate truth. Being tricky in nature, is it possible for them to substantiate truth? It may be asked also, how they perform to eliminate incorrect view?

According to Vātsyāyana, it is true that *chala* etc. are not directly capable of doing the aforesaid substantiation. But they are indirectly eligible to substantiate the truth. Only *pramāṇa* along with *tarka* through five component inference can establish the correct alternative about the object of analysis. In *vāda kathā* this substantiation is the one and only aim. After the substantiation of truth, the *vāda kathā* ends with success. But in *jalpa* and *vitaṇḍā kathā* substantiation of truth is not the only aim, but also conquering the opponent even he is correct in his opinion. In *jalpa* and *vitaṇḍā kathā,* one must be careful about the protection of his own view. An opponent can even attack the proponent with these tools who is upholding the correct view. Vāsyāyana says, to protect one view

which is established by *pramāṇa* and *tarka*, one need to know about *chala, jāti* and *nighrasthāna*. The substantiation of truth or the validity of procedure to the substantiation of truth can make the opponent, who knew that his own view is incorrect, feels nervous. In this regard, the opponent will try hard and self, by hook and crook, to re-establish in front of audience that his view about the object is correct. As winning the debate is foremost priority of *jalpa* type of debate, this type of attitude of an arguer is allowed here. So to protect one's view from these kind of tricky opponent, one must use *chala, jāti* and *nighrasthāna* or *pramāṇa* and *tarka* to eliminate his opponent.

Vitaṇḍā is the third type of *kathā* or debate. In the book 'NyāyaPhilosophy' by D. P. Chattopadhyaya and M. K. Gangopadhyaya, it has been translated as destructive debate. In this kind of debate, the party who holds the way of argumentation of *vitaṇḍā* is called '*vaitaṇḍika*'. Maharṣi Gautama, in his *Nyāyasūtra* 1/2/3, has mentioned '*sapratipakṣasthāpanāhīno vitaṇḍā*'. In the commentary of this *sūtra*, Vātsyāyana has cleared that all the defining characteristics of *jalpa* are the defining characteristics of *vitaṇḍā*except "*svapakṣasthāpana*". We have already come through the defining characteristics of *jalpa.* In *vitaṇḍā* they are all same except that *vaitaṇḍika* has no thesis to substantiate. The only aim of this debate is to win by anyhow. Like *jalpa*, in *vitaṇḍā* one can apply *chala, jāti* and *nighrasthāna* to conquer. But in *jalpa kathā*, even in *vāda*, the debater must go for the refutation of others view followed by the establishment of his own thesis. But in *vitaṇḍā*, a *vaitaṇḍika* is one who has no thesis to establish. His role, in this kind of debate, is centralized with the refutation of his anti-thesis.

It may be asked that if a *vaitaṇḍika* holds no thesis to substantiate then what is the need of his participation in this kind of debate? The question may take place in another form. If a *vaitaṇḍika* has no thesis to substantiate then why would he engage himself in debate? What is the aim of a *vaitaṇḍika*? In regard to these questions, the answer is that through in the *sūtra* 1/2/3, it has been mentioned that in a *vitaṇḍā* type of debate, a *vaitaṇḍika* holds no view to substantiate, but we have to understand it in the manner that vaitaṇḍika-s are not a debater who have no view or opinion to substantiate. Actually, they don't put effort separately for the substantiation of their own view. It has been discussed earlier that the thesis and the anti-thesis (*pakṣa-pratipakṣa*) of a debate

are opposite in nature and related in such a manner that the substantiation or the refutation of one of them will entail the refutation or substantiation of the other one. Keeping this relation in mind, *vaitaṇḍika* exercises to refute opponent's view which will automatically conclude the substantiation of his own view. In this kind of debate, a vaitaṇḍika will never announce his thesis in front of audience as his thesis to be protected, but he has the thesis in mind. Thus, this kind of debate claims differentiation from *vāda* and *jalpa*.

Many philosophers and scholarly persons have recommended people to avoid *jalpa* and *vitaṇḍā* type of debate. D. P. Chattapadhyaya and M. K. Gangopadhyaya have translated *vitaṇḍā* as destructive debate. Now question is that why this kind of debate is extremely prohibited for the novice in debate? Why it is called "destructive"?

If I am in a fight and I don't know or I can't see my opponent then it will be hard for me to win by finding out the weaknesses of the opponent. I cannot even deliver a single punch or kick to knock down the fantom. In this case, my opponent will be destructive to me. He has whole bunch of attacking moves where I have only my defensive moves useful. A continues rigorous attack will destroy my wall of resistance in few minutes. In case of *vitaṇḍā kathā*, *vaitaṇḍika*-s are like the fantom. He has continues attacks on his opponent and he announces nothing as his thesis. So, to his opponent he is destructive. His opponent has no counter thesis in front of him to eliminate. He can only defense his own thesis. May be that is the reason for which it is interpreted as 'destructive debate'.

Now again a question may take place. In *Nyāyasūtra* 1/1/1, Maharṣi Gautama has suggested sixteen *padārtha*-s to be understood in detail which will lead the knower (self) step by step to liberation. But in the present context, we have come to know that the *jalpa* and *vitaṇḍā* type of debate are not good at all. Sometimes they are helpful to achieve the truth about an object like *vāda*, but not always. *Jalpa* and *vitaṇḍā* can be used in sense of winning a debate illegitimately. That is why in these kinds of debates, all kinds of illegitimacy like *chala*, *jāti* can be applied. It is also clear that in these kinds of debates one can hinder his opponent and make sure his winning by crook or hook no matter he is holding a wrong view about the object of analysis. It is also known to us that these two are not prescribed to the students and the truth seeker as they can

mislead someone from truth. Then why Maharṣi Gautama has prescribed them as some of the sixteen *padārtha*-s to be known to achieve liberation?

First of all, we should keep in mind that though *jalpa* and *vitaṇḍā* are not good in their attitude, still they can lead someone sometimes to the truth. In this regard, they are very much helpful to substantiate the truth. In another way, they are useful also. A disciple or a follower of a particular philosophical system can be in need of *jalpa* and *vitaṇḍā*, not to substantiate but to protect his substantial truth. It is a duty to the subscribers of a particular philosophical system to resist its enemies, to protect their view from the attacks of innumerous enemies. So, to do so sometimes *jalpa* and *vitaṇḍā* can be helpful very much. From the characterization of the three debates, it is understandable that only the *vāda* type of *kathā* is related to the self-realization of truth. But also there is a need of substantiation of truth in front of the audience who are confused about the truth of the object of analysis. So, after the self-realization of the truth about an object, the substantiation of the truth in front of audience is also required. In this second part after self-realized truth by legitimate source of knowledge, one can be in trouble if a cunning devil opponent applies various tricks in a way that the audiences get impressed with the devils argument and pretend it as true instead of real one. For a proponent it is prescribed that he should know all the characteristics of *jalpa* and *vitaṇḍā* to identify his opponent's attitude and his tricks and illegitimate futile rejoinders to change his mode of debate. If the opponent is a *vādī*, then the proponent should be in the mode of friendly debate. If the opponent is a *jalpic* or *vaitaṇḍika* then to have the audience in confidence, the proponent must go with the mode of *jalpa* and *vitaṇḍā*.

Through this article, I have tried to offer some glimpse of this system so that the intellectual readers of this journal feel attracted to theNyāya philosophy. I hope this attraction will enhance the quest for knowledge of our readers about the cultural history and philosophy of India.

References:

1. *Nyāyadarśana of Goutama*, edited by Prof. Anantalal Thakur, Vol. 1, Mithila Vidyapith, Varanasi, 1967, p.597.
2. "*…nanapravakttṛkavicāraviṣayā vākyasaṁdṛbdhiḥ katheti sāmānyalakṣaṇam…*", *Nyāyavārttikatātparyatīkā* - 1/2/1.
3. *Nyāyasūtravṛtti* - 1/2/1.
4. "*Tatra - nānupalavdhe na nirṇītearthe nyāyaḥ pravarttate, kiṁ tarhi? saṁśyitearthe.*" - *Nyāyasūtra Bhāṣya* 1/1/1.

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal Published Thrice aYear

পত্রিকা দেখুন ওয়েবসাইটে

www.ebongprantik.in

Ebong Prantik
2582 3841

Ebong Prantik
2348 487X

Published By : Ashis Roy, Chandiberiya Sarada Palli, Kestopur, Kolkata - 700 102
Ph : 9804923182, 8250595647
Email : ebongprantik@gmail.com
Website : www.ebongprantik.in

₹ 850/-